বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ.

দ্বিতীয় সেমেস্টার

B-CORE-205

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কাব্যকবিতা

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১.	বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২.	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
ড. শ্রাবন্তী পান — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০২২

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Manas Kumar Sanyal, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পত্র - B-CORE - 205

শিরোনাম : উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কাব্য কবিতা

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মেঘনাদবধ কাব্য : মধুসূদন দত্ত (নির্বাচিত ২টি সর্গ- চতুর্থ ও ষষ্ঠ) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. কবিমানস

একক ২. চতুর্থ সর্গ

একক ৩. ষষ্ঠ সর্গ

একক ৪. রসবিচার

পর্যায় গ্রন্থ : ২ বৃত্রসংহার কাব্য : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. সমসাময়িক যুগ ও কবিমানস

একক ৬. উৎস ও সর্গ বিন্যাস

একক ৭. চরিত্র বিচার

একক ৮. জাতি বিচার

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ জীবনানন্দ দাশ এর নির্বাচিত কবিতা (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. বনলতা সেন, শিকার

একক ১০. নগ্ন নির্জন হাত, গোধূলি সন্ধির নৃত্য

একক ১১. রাত্রি, তিমির হননের গান

একক ১২. ১৯৪৬-৪৭ , দিনরাত

পর্যায় গ্রন্থ: ৪ আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত – সংবর্ত, যযাতি, উটপাখি

একক ১৪. সমর সেন – মহুয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী

একক ১৫. শক্তি চট্টোপাধ্যায় – অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে, চাবি, সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়

একক ১৬. শঙ্খ ঘোষ – বাবরের প্রার্থনা, হেতালের লাঠি, আত্মঘাত

সূচিপত্র

B-CORE- 205

B-CORE-205	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	কবিমানস	ড. শ্রাবন্তী পান	**১-৬**
	২.	চতুর্থ সর্গ	ড. শ্রাবন্তী পান	**৬-৭**
	৩.	ষষ্ঠ সর্গ	ড. শ্রাবন্তী পান	**৭-১০**
	৪.	রসবিচার	ড. শ্রাবন্তী পান	**১০-৩০**
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	সমসাময়িক যুগ ও কবিমানস .	ড. নন্দিনী ব্যানার্জী	**৩১-৩৪**
	৬.	উৎস ও সর্গ বিন্যাস	ড. নন্দিনী ব্যানার্জী	**৩৪-৩৫**
	৭.	চরিত্র বিচার	ড. নন্দিনী ব্যানার্জী	**৩৫-৩৮**
	৮.	জাতি বিচার	ড. নন্দিনী ব্যানার্জী	**৩৮-৫২**
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯	বনলতা সেন, শিকার	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	**৫৩-৫৮**
	১০	নগ্ন নির্জন হাত, গোধূলি সন্ধির নৃত্য	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ড. রাজশেখর নন্দী	**৫৮-৬০**
	১১	রাত্রি, তিমির হননের গান	ড. রাজশেখর নন্দী ও ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	**৬০-৬৪**
	১২	১৯৪৬-৪৭ , দিনরাত	ড. রাজশেখর নন্দী	**৬৪-৯৫**
পর্যায় গ্রন্থ : 8	১৩	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত – সংবর্ত, যযাতি, উটপাখি	ড. শ্রাবন্তী পান	**৯৬-১০১**
	১৪.	সমর সেন – মহুয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী	ড. শ্রাবন্তী পান	**১০১-১০৩**
	১৫.	শক্তি চট্টোপাধ্যায় – অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়েআছে, চাবি, সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়	ড. শ্রাবন্তী পান	**১০৩-১০৬**
	১৬.	শঙ্খ ঘোষ – বাবরের প্রার্থনা, হেতালের লাঠি, আত্মঘাত	ড. শ্রাবন্তী পান	**১০৬-১২৫**

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-১

কবিমানস

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.১.১ : ভূমিকা

৬.১.১.২ : ব্যক্তিজীবন

৬.১.১.৩ : সাহিত্যকর্ম

৬.১.১.৪ : মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাগ্‌ভাষ

৬.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.১.১ : কবিমানস

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণগর্ভের পরিপুষ্ট জাতক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। নব্য-বাংলাকাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই বাঙালি কবি। 'মাইকেল' ও 'মধু' দুটি বিজাতীয় নামের সমন্বয়ের ইতিহাসে স্বরচিত তাঁর কাব্যজীবন। ক্ষণায়ু জীবনচক্রে তিনি বাংলা সাহিত্যকে যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার সমর্পণ করেছেন তাতে তাঁর শক্তিমত্তা ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতা সবার কাছে ঈর্ষণীয়। বুৎপন্ন কবিপ্রতিভার সঙ্গে ইতিহাসের নীরব মেলবন্ধনে যে স্বতন্ত্র কাব্যকলা নির্মাণশৈলী তৈরি হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'মধুসূদন রচনাবলী'। আসলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যদর্শন ও সাহিত্যের অভিঘাতে ইতিহাসের অভ্যন্তরে এক নির্মাণকলা চলছিল, তা হল প্রবর্তকস্রষ্টার খোঁজে ছিল ইতিহাস। শতাব্দীর সেই ক্রমস্ফুট অভিপ্রায়কে ধারণ করার জন্য যোগ্য প্রজননক্ষম কবি প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসের সেই যোগক্রিয়ার ক্ষণে প্রস্তুত কবি মধুসূদন মহাকাব্য-গীতিকাব্য-সনেট-পত্রকাব্য-নব্যছন্দের প্রবর্তনার পসরা সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। কালের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধুসূদন নিজের অভিষেক ঘটান বাংলা সাহিত্যে নব্য আঙ্গিকের প্রবতর্ক রূপে। নাটকেও সেই আনুষ্ঠানিক আহ্বান এলো সিংহভ্রাতাদের (বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ) কাছ থেকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণাকে মনোধর্মে পরিণত করে মধুসূদন ইংরেজ কবির সমকক্ষতা অর্জনের অভিলাষে বিদেশে পাড়ি দেন। প্রবাসে থেকেও তিনি দেশকে যেভাবে মনের আঙিনায় মণিকোঠায় স্থান দিয়েছেন, তার প্রতিলিপি পাই ছন্দবদ্ধ সনেটের আঙ্গিকে রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬)। আত্মায়ুর স্বল্পতার কোনো নিঃশব্দ তর্জনী যেন মধুসূদনকে তাড়া করছিল।

তাই আত্মবল ক্ষয় হবার পূর্বে তিনি অস্থির উদ্দীপনার আবেগে তাঁর সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করেছেন, ১৮৬০ এ পাঁচটি এবং ১৮৬১ তে ৪টি, ২ বছরে মোট নয়টি নাট্য ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে। বাংলা কাব্যধারার যে পুনরুজ্জীবন মধুসূদনের হাত ধরে ঘটেছিল তাই সুষ্ঠুরূপে স্বভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে পরিণতি পেয়ে নিঃশেষিত হয়। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ একালের ভাবধারার পারস্পরিক সাহিত্যতরঙ্গ। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মোটামুটি ৪০ বছর কাল বাংলা সাহিত্যে সুস্থভাবে বাঙালিত্ব বজায় ছিল। পরবর্তীকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্যে সেই জাতীয় চেতনা থেকে বিযুক্তি ঘটে। আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও বঙ্গসাহিত্যের সেই প্রাক্‌পর্বকে আমরা কোনোভাবেই চিরবিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারিনি। তা সত্ত্বেও বাঙালিচিত্তে যদি কখনও মনে হয় এই আদি পর্ব অনাবশ্যক; সেই ক্ষণকে স্মরণ করে মধু কবি নিজেই তাঁর সমাধিলিপিতে আহ্বান করে গেছেন বঙ্গবাসীকে—‘‘দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে’’—কবির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউই আর এই বিজাতীয় কবির প্রতিভার স্পর্শে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠতে পারেনি। বীরপতনের সেই শ্রেষ্ঠ উপমা ‘বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!’ শ্রবণে বাঙালি আজ আর ক্রন্দনে আকুল হয় না। এই ঈর্ষাযোগ্য হৃদ্যতার কল্যাণস্পর্শ ঘটেছিল ‘কবি শ্রীমধুসূদন’ দত্ত রচিত ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’, যা তার কবিত্বকে সর্ব প্রত্যাঘাত থেকে বর্মের মতো রক্ষা করে গেছে, এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

৬.১.১.২ : ব্যক্তিজীবন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় জীবনের এক সংকট মুহূর্তে মধুসূদন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষ রূপে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। বহির্জীবন ঘটিত ‘মাইকেল’ নামক যে বিজাতীয় শব্দটি সংযুক্ত ছিল, তাকে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি। নিজমানসেই তাঁর সেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল, নিজের সমাধি-লিপিতে—

মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

সমাধি লিপি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী অধুনা পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ (মতান্তরে ১৮২৩) খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শনিবার এক সম্পন্ন জমিদার বংশের কায়েস্থ পরিবারে কবি শ্রীমধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রথমে তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দুবছর পড়ার পর ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৩৪ সালে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি ‘নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব’ আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে

তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তী জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে মধুসূদন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কলেজের পরীক্ষার তিনি বরাবর বৃত্তি পেতেন। এ সময় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন তাঁর কবিতা জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এ সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিলেত যাওয়ার। তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে। তাই পিতা তাঁর বিবাহ ঠিক করলে তিনি ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এভং তখন থেকে তাঁর নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায় মধুসূদনকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়। তাই ১৮৪৪ সালে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৭ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান। এইসময় ধর্মান্তরের কারণে মধুসূদন তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একসময় পিতা অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেন। অগত্যা ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। প্রথমে মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে (১৮৪৮-১৮৫২) এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫২-১৮৫৬) করেন।

মাদ্রাজের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত। এখানেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি Eurasion (পরে Eastern Guardian), Madras Circulator and Chronicle ও Hindu Chronicle পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং Madras Spectator এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৮৪৮-১৮৫৬)। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive Lady (১৮৪৮) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ Visions of the Past প্রকাশিত হয়। রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ এখানেই সংঘটিত হয়। মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়া, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন।

এরমধ্যে পিতা-মাতা উভয়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ করেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা এ সময় তাঁকে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজেও ভেতর থেকে এরূপ একটি তাগিদ অনুভব করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী (১৮৫৮) নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন এবং তাঁর মধ্যে তখন বাংলা নাটক রচনার সংকল্প জাগে। এই সূত্রে তিনি কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এমন একটি পরিস্থিতিতে নাট্যকার হিসেবেই মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ ঘটে। তিনি মহাভারতের দেবযানী-যযাতি কাহিনি অবলম্বনে ১৮৫৯ সালে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন শর্মিষ্ঠা নাটক। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক এবং একই অর্থে মধুসূদনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। পরের বছরই মধুসূদন দুটি প্রহসন রচনা করেন ; একেই কি বলে সভ্যতা

(১৮৬০) এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। প্রথমটিতে তিনি ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের মাদকাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে কটাক্ষ করেন এবং দ্বিতীয়টিতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আচারসর্বস্ব নীতিভ্রষ্ট সমাজপতিদের গোপন লাম্পট্য তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রেও মধুসূদন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রহসন দুটি কাহিনি, সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে আজও অতুলনীয়।

মধুসূদনের কাব্যে উনিশ শতকীয় নারী কণ্ঠের স্বর বেশ স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তাঁর বীরাঙ্গনা (১৮৬২) কাব্যের পৌরাণিক নায়িকাগণের পত্রাকারে কামনা-বাসনা অভিমান ও অভিযোগ রূপে প্রকাশিত। মধুসূদনের অপর দুটি রচনা হল ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) রাজপুত উপাখ্যানে রচিত একটি অবলম্বনে রচিত বিয়োগান্তক নাটক। এ পর্বে মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং কিছুদিন হিন্দু প্যাট্রিয়ট (১৮৬২) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৬২ সালের ৯ জুন মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যান এবং গ্রেজ-ইন-এ যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৮৬৩ সালে তিনি প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে যান এবং সেখানে প্রায় দু'বছর অবস্থান করেন। ভার্সাইতে অবস্থানকালে তাঁর জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এখানে বসেই তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় এটিও এক বিস্ময়কর নতুন সৃষ্টি। এর আগে বাংলা ভাষায় সনেটের প্রচলন ছিল না। দ্বিতীয় বিষয়টি হল ভার্সাই নগরীতে থেকেই তিনি যেন মাতৃভাষাকে নতুনভাবে এবং একান্ত আপনভাবে দেখতে ও বুঝতে পারেন, যার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'বঙ্গভাষা' 'কপোতাক্ষ নদ' ইত্যাদি সনেটে। তাঁর এই সনেটগুলি ১৮৬৬ সালে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নামে প্রকাশিত হয়।

ভার্সাই নগরীতে দুবছর থাকার পর মধুসূদন ১৮৬৫ সালে পুনরায় ইংল্যাণ্ড যান এবং ১৮৬৬ সালে গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইর্কোটে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে ১৮৭০ সালের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইর্কোটের অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন। দুবছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবারে তিনি সফল হন, কিন্তু অমিতব্যায়িতার ব্যাপারটি ছিল তাঁর স্বভাবগত। একই কারণে তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও একবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সেবার উদ্ধার পান। ১৮৭২ সালে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও এর ম্যানেজার ছিলেন।

জীবনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েও মধুসূদন কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে ১৮৭১ সালে তিনি রচনা করেন হেক্টরবধ। তাঁর শেষ রচনা মায়াকানন (১৮৭৩) নাটক। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর ১২টি গ্রন্থ এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ৫টি গ্রন্থ রয়েছে।

মধুসূদন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি তাঁর কাব্যের বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত সংস্কৃত কাব্য থেকে, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনদর্শন ও রুচি উপযোগী করে তিনি তা কাব্যে রূপায়িত করেন এবং তার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ মধুসূদন তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করে এই ভাষা ও সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধন করেন, এর ফলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'মধুকবি' নামে পরিচিত।

বাংলার এই মহান কবির শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ঋণের দায়, অর্থাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। শেষজীবনে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বাংলার এই মহান কবি কপর্দকহীন অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

৬.১.১.৩ : সাহিত্যকর্ম

বাল্যকাল থেকেই চরিত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, প্রথমটি অধ্যয়নস্পৃহা, দ্বিতীয়টি কাব্যপ্রীতি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে মধুসূদন শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা, যৌবনে হিন্দু কলেজ অথবা বিশপস্‌কলেজ সহপাঠীদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান করে নিয়েছিলেন। শৈশবে মায়ের কাছে তন্ময়চিত্তে শোনা অত্যন্ত প্রিয় রামায়ণ—মহাভারত আর অন্যদিকে বাল্যকালে শুনে অভ্যস্ত গ্রাম্য আগমনী—বিজয়ার পালাগান এই ছিল তাঁর কবিজীবনের ভিত্তিস্বরূপ—'বিসর্জ্জি প্রতিমা দেন দশমী-দিবসে' জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে রিক্ত হৃদয়ের আলংকারিক উপমা রূপে এ যেন বাঙালির চিরন্তন সেতুবন্ধ। ১৮৫৯-৬২ এই চার বছর এবং তিন বছরের টানা বিরতির পর আবার ১৮৬৬। বিষয় ধরলে পর্যায় তিনটি, ১৮৫৯-৬০ নাট্যচর্চা, ১৮৬০-১৮৬২ কাব্যচর্চা এবং ১৮৬৬তে আবারও কাব্যচর্চা-'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। মোট চার বছরকেই (ধারাবাহিক) তাঁর পরিণত প্রতিভার সৃষ্টিকাল বলা যায়। চতুর্দশপদী কবিতাবলী ক্লান্ত অবসিতপ্রায় প্রতিভার বহিঃপ্রকাশমাত্র। ১৮৬০-এ পাঁচটি এবং ১৮৬১-তে ৪টি, দুয়ে মিলে ২বছরে নয়টি নাট্য ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চয়ই কৌতুকের বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য "উল্কার জীবনে উদয়-অস্ত, তাহার দীপ্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি নাই...মধুসূদনের মত প্রচণ্ড potential প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে সুদুর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহার সম্ভাবনা যেমন বিরাট ছিল পরিণতি তেমন ফলবান হয় নাই।"

(ক) প্রকাশিত গ্রন্থাবলি : মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করেন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই তিনি নাটক লেখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, যথা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ 'পদ্মাবতী' নাটক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি অমিত্রাক্ষরে লেখেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। এরপর একে একে রচিত হয় 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১) নামে মহাকাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতা (১৮৬৬), হেক্টরবধ (১৮৭১), মায়াকানন (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৮৭৪)

এছাড়াও মধুসূদনের কিছু অসম্পূর্ণ বাংলা রচনাবলি পাওয়া যায়—(১) বীরাঙ্গনা কাব্য (২য় ভাগ) (২) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (২য় ভাগ) (৩) সিংহল বিজয় কাব্য (৪) পাণ্ডব বিজয় কাব্য (৫) সুভদ্রাহরণ কাব্যা (৬) দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্য (৭) মৎস্যগন্ধা (কাব্য) (৮) বিষ না ধনুর্গুণ (নাটক) (৯) নীতিমূলক কবিতাবলী (১০) রিজিয়া (নাট্যকাব্য) (১১) বিবিধ কবিতাবলী।

মধুসূদনের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কিছু অপূর্ব নমুনা বর্তমান—১) Captive Ladie (Poetry) and Visions of Past (Poetry) (1849) ২) Rizia : Empress oflnde (Drama) (1849) ৩) The Anglo-Saxon and the Hindu (1854) ৪) Ratnavali (1858) (Drama : translated from the Bengali) ৫) Sermistha (1859) (Drama : Author's translation of his Sermistha ৬) Tilottoma (Poem, Incomplete) ৭) Queen Sita (Poem, Incomplete) ৮) Upsori (Poem, Incomplete) ৯) Miscellaneous Poem ১০) Letters ১১) Nil Durpan (The Indigo Planting Mirror, A Drama Translated from the Bengali/By A Native with Introduction by Rev. j. Long (1861)

৬.১.১.৪ : মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাগ্‌ভাষ

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিতীয় কাব্য। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসের এটি অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হলে বাংলা কাব্যের যথার্থ নবযুগ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি। এ কাব্যের প্রথম সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আশ্বিন ১২৭৪, ১৮৬৭ সাল)। উনিশ শতকীয় নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় রামায়ণ কাহিনিকে নতুন করে মধুসূদন রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেও বলা যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম কীর্তিস্থাপনের প্রথম ধাপ। সেজন্যই এ কাব্যপ্রকাশিত হবার প্রায় দেড় বছর পরও নানাকারণেই বাংলার পাঠক-সমালোচকেরা অবহেলা করতে পারেন নি। এই দেড়শ বছর নানা ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে মেঘনাদবধের মূল্যবিচারের চেষ্টা হয়েছে এবং বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিবিধার্থসংগ্রহের কালীপ্রসন্ন সিংহ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ থেকে গৃহীত হয়েছে। রামানুজ লক্ষণ কর্তৃক রাবণ পুত্র মেঘনাদের নিধনই হল এর মূল বর্ণিতব্য বিষয়। প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য বহু গ্রন্থপাঠী মধু পাশ্চাত্যের বহু কাব্য থেকে নানা উপকরণ আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন। হোমারের ইলিয়াড, দান্তের ডিভাইনা, কমেডিয়া, টাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তু সাহায্যে অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর সৌন্দর্য সাধিত হয়েছে। এতে তাঁর কাব্যের মৌলিকত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি বরং বৃদ্ধি হয়েছে। কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে প্রথাগত পদ্ধতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করে এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দনা-গীতি গেয়েছেন। এখানে গ্রীক কবি হোমার, ইতালীয় কবি ভার্জিল ও ইংরেজ কবি মিলটনের প্রভাব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়।

রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করে রচিত হলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ অনেক নতুনত্ব বর্তমান। রামচন্দ্রসহ রঘুকুলের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই ছিল রামায়ণের কবিগণের উদ্দেশ্য। কিন্তু মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' এ এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করে রাক্ষসদিগের প্রতি সহানুভূতিসহ অনুকম্পা

প্রদর্শন করেছেন। কবির বর্ণনাগুণেও আমরাও রাক্ষস পরিবারের জন্য অশ্রুমোচন না করে পারি না। রাক্ষস পরিবারে স্বজাতিপ্রেমে আমরা মুগ্ধ হই। রাক্ষসগণ বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে সাধারণ মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও, তারাও মানুষ, মানবত্ব আরোপিত তাদের চরিত্রে। দেবগণের পূজা, যজ্ঞ আচার-আচরণ সবই পালন করেন। এমনকি রাক্ষস কুলবধূ স্বামীপুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃতা হন। মধুসূদন রাক্ষসকুলকে এভাবেই মানবেতর না করে মানবজাতিরই এক অংশ করে এঁকেছেন। কবির নিজের স্বদেশপ্রীতির প্রতিফলন ঘটেছে রাক্ষসকুলের সমবেদনায়। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাম পরবাসী হয়ে রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ করে। সেখানে নিজের মাতৃভূমিকে সুরক্ষার জন্য তাদের যে প্রাণপণ লড়াই এবং শেষে পরাজয়। এই চিত্রকে তিনি ইংরেজ আক্রান্ত ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাদৃশ্য করেছেন। লঙ্কার বীরবধূগণ যখন বৈধব্যবেশে ভূষিত, ঠিক সেইসময় জাতির রাজার চিত্রটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ—'ধুতরার মালা যেন ধূর্জ্জটীর গলে'। আসলে রাবণ ও মেঘনাদ, বীরবাহু প্রমুখ বীরগণের স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ পরাধীন এবং পরবাসে অভিজ্ঞ কবি মধুসূদন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারেননি।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরস-প্রধান। যদিও কবি কাব্যের প্রথমেই বলেছেন 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত', তা সত্ত্বেও কাব্যের অদ্যপান্ত বিচার করলেই দেখা যায় করুণরসই প্রধান, স্থানে স্থানে বীররসই উৎসারিত হয়েছে মাত্র। সমগ্র কাব্যে এক সুকরুণ সুর ধ্বনিত হয়ে কাব্যটিকে অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। ক্রৌঞ্চবধূর ক্রন্দন আদি কবি বাল্মীকির হৃদয়বীণায় যেমন করুণ রসের স্রোতধারার সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তেমনভাবেই মধুসূদনের হৃদয়তন্ত্রও ভগ্নহৃদয় দশানন এবং পুত্রশোকাতুর মন্দোদরীর বিলাপে যে করুণসুরের ঝঙ্কার উঠেছিল, রক্ষোনরের সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদও সেই করুণসুরকে অতিক্রম করতে পারে নাই। মেঘনাদকে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা-সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলের রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্য লাভ করেছে। কাব্যের আরম্ভ হয়েছে রাবণের বীরবাহুর মৃত্যুতে করুণ বিলাপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমলীলার সহমরণ ও রাবণের করুণ মর্মভেদী আর্তনাদে। পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর বিষয়বস্তু এবং কাব্যে বর্ণিত ঘটনাপরম্পার কেন্দ্রস্বরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্য-এ মধুসূদনের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পরিণতি—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দেখে সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সত্যিই 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহনে করুণ সুর এবং বীরোচিত ভাব উভয়ই অতি চমৎকারভাবে উৎসারিত হয়েছে। পয়ারের বেড়ি ভেঙে মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। জানতেন কাব্যের বাহন হল ছন্দ; এর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য চাই শৃঙ্খলমুক্তি। বাঙালির স্বাভাবিক বাগ্‌রীতির বিষয়ে তিনি যথেষ্ট শক্ত বা উপযুক্ত নয় তা তিনি জানতেন। ফলে তিনি বহুবার বহুজনকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়ে মনযোগী করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী ছন্দ-ধারায় মধুসূদনের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাত ধরেই গৈরিশ ছন্দের আবির্ভাব। তাঁর পূর্বে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতির ব্যবহার বাংলায় ছিল না। তিনি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হিসাবে মিশ্রবৃত্তকেই কাব্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে মিশ্রবৃত্তের সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎস হিসাবে কবি মধুসূদনকেই ধরা হয়। যদিও ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘনাদবধের বিরোধী সমালোচনাকে তিনি নিজেই 'অল্পবয়সে স্বর্ধাভরে... কাঁচা সমালোচনা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেই সমালোচনারও একটা দিক ছিল ছন্দ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন—"আধুনিক বাঙলা কাব্য সাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথম ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে...একথা সত্য, বাঙলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ মাইকেল বাংলা ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন, যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটি মাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাঙলা ভাষায় স্বভাবকে মেনে চলেননি।" আর এখানেই মাইকেলের স্বাতন্ত্র্যতা এবং অভিনবত্ব।

৬.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন?

২। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন সংক্ষেপে লেখো।

৩। মধুসূদনের কবিমানস সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৪। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রেক্ষাপটটি নিজের ভাষায় লেখো।

৫। মেঘনাদবধ কাব্যটিতে মোট কটি সর্গ বর্তমান? সর্গগুলির নাম লেখো।

৬। মেঘনাদ কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

৭। কাব্যটির ভূমিকা কে লেখেন?

৬.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার

২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)

৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত

৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী

৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত

৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-২

চতুর্থ সর্গ

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.২.১	:	ভূমিকা
৬.১.২.২	:	কথাবস্তু
৬.১.২.৩	:	চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা
৬.১.২.৪	:	কাব্যসৌন্দর্য
৬.১.২.৫	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.১.৬	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.২.১ : ভূমিকা

মেঘনাদবধ কাব্যের নয়টি সর্গের মধ্যে কবি সুকৌশলে লঙ্কাযুদ্ধের তিনদিন ও দুই রাত্রির ঘটনা গ্রথিত করেছেন। কাব্যের বিষয় প্রধানত লক্ষ্মণের হাতে বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদের নিধন। কাব্যের সূচনা পুত্র বীরবাহুর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা শুনে রাবণ এবং বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার শোকপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। শেষ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে শোকার্ত রাবণের লঙ্কাপুরীতে ফিরে আসায়। কাহিনির মূল গঠন প্রধান ঘটনা, বাল্মীকির রামায়ণ থেকেই গৃহীত। তবে মাঝে মাঝে নতুন চরিত্র এবং ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। এতে অবশ্য মূল বিষয়ের গতি বা কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট হয়নি এবং মেঘনাদের নিধন ব্যাপারটি আরও তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সর্গের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি প্রত্যেকটি সর্গের নামকরণ করেছেন। সর্গগুলির কবিপ্রদত্ত নামগুলি হল যথাক্রমে—অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তনির্ভেদ, প্রেতপুরী, সংস্ক্রিয়া।

৬.১.২.২ : কথাবস্তু

সর্গারম্ভে নমস্ক্রিয়া ও আর্শীবাদ প্রার্থনাকে মহাকাব্যের অন্যতম শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। চতুর্থ সর্গে 'সাহিত্যদর্পণ' কাব্যের এই শর্তটি মধুসূদন পালন করেছেন সহর্ষে। এর কারণ এ সর্গে তিনি

সরাসরি অনুসরণ করেছেন বাল্মীকিকে। বাল্মীকিকে অনুসরণ করেই ভবভূতি রচনা করেছিলেন ‘উত্তরচরিতম্’ ও ‘বীরচরিতম্’ নাটক, ভর্ত্তৃহরি রচনা করেছিলেন রামচরিতাত্মক ভট্টিকাব্য, কালিদাস লিখেছিলেন ‘রঘুবংশম্’ এবং বাংলায় কৃত্তিবাস রচনা করেছিলেন অনুবাদাত্মক রাম-পাঁচালি। কবির বিশ্বাস, বাল্মীকি দয়া না করলে এই সব কবিদের এইসব কবিদের পাশাপাশি কাব্যবিশ্বে তিনি ‘নূতন মালা’ গাঁথতে পারবেন না। লক্ষণীয়, এই বাল্মীকি-বন্দনায় পরোক্ষে কবি স্বীকার করে নিলেন যে এ-সর্গ রচনায় তিনি রসদ সংগ্রহ করবেন বাল্মীকি থেকেই। অর্থাৎ মাইকেল এখানে নিঃশেষে মগ্ন ভারতীয় ঐতিহ্যে।—সর্গটির নাম ‘অশোকবন’, এই নাম-শব্দটিও বাল্মীকিরই উদ্ভাবিত। কোন কথাবস্তুতে প্রতিফলিত করতে আদিকবি উদ্ভাবিত ও নামশব্দে সর্গের নামকরণ করলেন মধুসূদন এবং সে-নাম কতদূর শিল্প সার্থক হল। তা পর্যালোচনা করতে আমরা প্রথমে দেখে নেব এ সর্গে কথাবস্তুর সমায়োজন।

অশোকবনে বন্দিনী সীতার সঙ্গে বিভীষণ পত্নী সরমার মধুর কথোপকথন চতুর্থ সর্গে পরিবেশিত হয়েছে। মেঘনাদ সেনাপতিত্বে বৃত হয়েছেন, সমস্ত লঙ্কাপুরী আজ উৎসব মুখরিত। ভীষণ চেড়ীর দল সীতাকে একাকিনী অবস্থায় এই অশোকবনে রেখে উৎসবে যোগ দিতে গেছে। এই অবকাশে সরমা এসে বসলেন সীতার পায়ের তলায় এবং সীতার কাছ থেকেই শুনতে চাইলেন তাঁর অপহরণ বৃত্তান্ত। রাক্ষসাধিপতি রাবণ পঞ্চবটী বন থেকে কেমন ভাবে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে এলেন, সরমার কাছে সীতা সেই বৃত্তান্ত প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রকাশ করলেন। চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা সংবাদ অবশ্যই ‘মেঘনাদবধ’ এর মূল ঘটনা প্রবাহের অন্তর্গত নয়। একে বলতে পারি শাখা কাহিনি। এই শাখা কাহিনির মধ্য দিয়েই কবি চমৎকারভাবে অনেকগুলি অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনার ওপর আলো ফেলেছেন।

৬.১.২.৩ : চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা

সাহিত্যিক মহাকাব্য রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের উচ্চতার শিখর গগনস্পর্শী। নয়টি সর্গের কথাবস্তুতে তিনি রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছেন। পৌরাণিক রসের প্রথাগত পরিণতির পরিবর্তে তিনি রাক্ষসকুলের গর্ব মেঘনাদের বধের ঘটনাটিকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করেছেন, যা কিনা করুণরসের আকর রূপে গঠন করেছে। কিন্তু বীররসের মহাকাব্যে চতুর্থ সর্গটি একমাত্র শান্তরসের সর্গ, সেক্ষেত্রে এই সর্গটির গুরুত্ব কতখানি। এ প্রসঙ্গে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন “I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Book to the rest, to a friend. He said your silence about Promila’s entry into Lanka in the III Book surprised him. The silly fellow went on to say that episode roused him like the clang of a martial trumpet!”****

মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের কবি আত্মার পূর্ণ জাগরণ কী করে ঘটল তা রহস্যাবৃত। সীতার প্রতি কবিচিত্তের দুর্বলতার ফলে এ সাফল্য এসেছে বলে সমালোচকগণ মনে করে থাকেন। সীতা চরিত্রটি চিত্রণের ক্ষেত্রে কবিচিত্তের কোমলতা ছিল এটা ঠিকই কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ বলে সবশেষ হয়ে যায় না। মধুসূদনের বাঙালিয়ানাকেও অনেকে এর কারণ বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন, এই সঙ্গেই প্রশ্ন আসে তাহলে অন্য কোনো সর্গের ক্ষেত্রে সেটি দেখা যায়নি কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতেই আমাদের আলোচ্য সর্গটি গুরুত্ব বিচার করব।

মধুসূদনের শিল্পবোধে একটা সুসামঞ্জস্য ছিল। অন্তত মেঘনাদবধ কাব্যের বহু অংশে এই সিদ্ধি অনাবৃতভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদ্রোহী কাব্য-সংস্কারের বাসনা, ব্যক্তিগত জিগীষাবৃত্তি শিল্পচেতনাকে আদৌ আচ্ছন্ন করতে পারেনি, তার প্রমাণ এ কাব্যে অজস্র ছড়িয়ে আছে। চতুর্থ সর্গে কবি আপন আত্মস্বরূপ রাবণকে ধিক্কৃত করেছেন, কিন্তু রাম-বিভীষণের মত মানুষের মুখে যে ভৎর্সনা তাকে স্বয়ং কবি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেননি। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সেই ভৎর্সনা শত্রুর ক্রোধ-ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র হয়ে আছে। কিন্তু রাবণের দ্বারা অপহৃতা সীতার প্রতি কবির সুকোমল ও গভীর সহানুভূতি রাবণকাহিনির অন্য একটি দিক উন্মুক্ত করেছে। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার মৃদু গুঞ্জনে যে যবনিকা দুলছিল, সীতার বিবরণে তা উন্মোচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পী মধুসূদনের জীবনজিজ্ঞাসার একটা গভীরতার দিক প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের কবিচিত্তের অন্তরে আত্মপ্রসারণ ও আত্মপ্রতিফলন সত্ত্বেও তিনি কাব্যরচনায় অদ্ভুত এক নৈবর্ক্তিক মন ছিল। প্রত্যক্ষ ক্লাসিক পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনে এই ভাববীজের অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ বারবার ঘটলেও সীতাকাহিনির পরিকল্পনাকেন্দ্রে ও রূপায়ণসাফল্যে সেই বীজটি প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

সম্ভবত সীতাকাহিনির উপস্থাপনার পিছনে কবির সচেতন উদ্দেশ্যে ছিল তিনটি। প্রথমত, সীতাহরণ-কাহিনিটি বিবৃত করা। বীরবাহুর মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য সব কিছুর পিছনে ঘটনার দিক থেকে যে মূল কারণটি বিদ্যমান সেই সীতাহরণ এই সর্গে কৌশলে বিবৃত হয়েছে। উপরন্তু সীতাহরণের পর থেকে লঙ্কাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্তও সীতার স্বপ্নবিবরণের মধ্যে স্থানলাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, রসসৌন্দর্যে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা। মোহিতলাল ঠিকই বলেছেন যে, সমগ্র মেঘনাদবধের রথরথী— অশ্ব-গজে কম্পিত মেদিনীতে জন্ম-মৃত্যু-যুদ্ধ-হাহাকারের মধ্যে এই চতুর্থ সর্গে একটি কোমল শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ক্রন্দন আছে, কিন্তু অগ্নিস্রাবী বিশ্ববিদারী আর্তনাদ নেই, এখানে ক্রোধের কারণ আছে কিন্তু ক্রোধ নেই, বীরত্বের বর্ণনা আছে কিন্তু বীররসের প্রাধান্য নেই। এখানে প্রকৃতি মধুবর্ষী, রুদ্রডম্বরুর তালে তালে বসে নৃত্য করে নি। এই রসবৈচিত্র্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্তমান সর্গে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

তৃতীয়ত, রাবণের পাপকে লুকিয়ে রেখে তার মহিমায় ট্র্যাজেডি অঙ্কন না করে—পাপের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তার চরিত্র গৌরবের প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় সর্গ রচনার পর চতুর্থ সর্গের এইরূপ সৃজনের পিছনে শুধু স্বাতন্ত্র্য নয়, আছে শিল্পবোধের নৈপুণ্য যা গভীরভাবে এই সর্গের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রসহ সমগ্র সর্গের মধ্যে নারীচরিত্রগুলির ভাব ও বোধের ক্ষেত্রে এক বৈচিত্র্যের সুর জাগ্রত করেছে।

৬.১.২.৪ : কাব্যসৌন্দর্য

"সোনার তরী" কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবির ধর্ম ও অভিপ্রায় কী, তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কবি জানিয়েছেন,

...শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,

বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।...

এই আনন্দবাদই কাব্যের শেষ লক্ষ্য কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে কবিতাপাঠে আমরা সবাই সৌন্দর্যস্বরূপ আনন্দাবেগে আপ্লুত হই। কবি আমাদের সামনে সৌন্দর্যের জগৎ উন্মোচিত করে তাকে মূর্ত করতে উন্মুখ। 'তোমায় চেয়ে বসে আছি পথের ধারে, সুন্দর হে'—এই আকুলতা যেমন প্রেমিকের, তেমনি কবিরও।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি সৌন্দর্যের পূজারী? তিনি কি রোমান্টিক? এমন প্রশ্নের সামনে আমরা স্বাভাবিকভাবে একটু থমকে যাই কারণ ক্লাসিক কবি শ্রীমধুসূদনের স্বীকারোক্তি—একজন গ্রীকের মতো তিনি লিখতে চান। তাই গীতিকাব্যের বদলে বেছে নেন মহাকাব্য। এইজন্যই তিনি বাঙালির কাছে মহাকবি মধুসূদন দত্ত। তবু সনেট বা ওড কিংবা খণ্ডকবিতা রচয়িতা মধুকবির এটাই তার শেষ পরিচয় নয়। সেরকমই তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যও শুধুই এপিকের গাম্ভীর্যে গড়া ভাস্কর্যমাত্র হয়নি। নয়টি সর্গে গড়া এই মহাকাব্যেরও কয়েকটি সর্গে আছে অশ্রুজলের রোমান্টিক লিরিকের স্পর্শ। স্বপ্ন সুন্দরের বেশে রোমান্টিক কবিকে শান্তির আশ্রয় দেয় আর সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কবি আর্তনাদ করে ওঠে—I fall upn the thorms of life. I bleed. কবি শেলির মতো মধুকবির কণ্ঠেও সেই আর্তি শুনি—'মজিনু বিফল তাপে অবরণ্যে বরি'। অন্যদিকে দৈবাহত শোকার্ত রাবণ বলে

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!

এই স্বেচ্ছানির্বাসন ও আত্মবিলাপের মূলে আছে সৌন্দর্য জগৎ থেকে তাঁর বিচ্ছেদ। নঞর্থক ভঙ্গিতে রাবণ যা বলেছে, যা সেই সৌন্দর্যেরই ধ্যান—

কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;

এই সুন্দরের সন্ধান মধুসূদন প্রথম করেছিলেন তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে। বিশ্বকর্মার অপরূপ সৃষ্টি তিলোত্তমা সৌন্দর্যের সারাৎসার—যাকে পেতে সুন্দ-উপসুন্দ দুই দৈত্য ভ্রাতৃত্ব ভুলে পরস্পরকে সংহারে ব্যস্ত। যে সুন্দরের আদর্শ, মহৎ সে চিরকালই অধরা থেকে যায়। তাকে গৃহবন্দী বা তালুবন্দী করা যায় না। পুরাণে

যেমন তা সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় তেমনি তা সত্য। নবকুমারও ব্যর্থ হয়েছে পরম সৌন্দর্যকে মৃন্ময়ী করতে। আসলে তিলোত্তমা শুধু সৌন্দর্য প্রতিমা, কামনার ধন নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে একালের শিশিরকুমার দাস পর্যন্ত সকলেই মনে করেন—এই প্রথম শুরু হলো সুন্দরের সন্ধান এবং 'আদর্শ সুন্দরের জন্য দ্বিমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব'। আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এ ধরণের কোনো মানস সুন্দরীর বন্দনা পাই না। কবির সৌন্দর্য পিপাসা কিংবা সুন্দর অন্বেষা এক্ষেত্রে ঠিক তাত্ত্বিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে ড. শিশিরকুমার দাশের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"বাংলাদেশের রোমান্টিক আন্দোলনের নায়ক মধুসূদন। যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য জাতির চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারই প্রকাশ সেখানে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব সেদিনের সাহিত্য চিন্তায়, দর্শনে, সমাজভঙ্গীতে দেখা দিয়েছিল—আধুনিক কাল পর্যন্ত সে ধারাই চলেছে। সেই ব্যক্তিত্ব খুঁজছে সুন্দরকে, রহস্যময়কে, ঐশ্বর্যকে, রাবণের মতো elemental শক্তিকে।" (মধুসূদনের কবিমানস)

জীবনটাকে সুন্দর ও সাবলীল করতে মধুসূদন চেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ ও যশ, দুইই পেয়েছিলেন। তবু তার অন্তহীন প্রত্যাশার সঙ্গে কখনোই মেলবন্ধন ঘটেনি। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব বারংবার বোধ করে পীড়িত হয়েছেন। মধুকবির সেই ভাঙা স্বপ্নগুলিই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবে যা পাননি, সাহিত্যে তাকেই চরম প্রাপ্তিতে নিয়ে গেছেন। যার নিদর্শন দেখে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ থেকেই আমরা বিস্মিত ও ব্যাগ্র হয়ে উঠি—

১. কনক আসনে বসে দশানন বলী
   হেমকূট

২. ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
   পদ্মরাগ, মরকত হীরা।
   হৈম শিরে শৃঙ্গবর যথা
   তেজঃপুঞ্জ।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় রামায়ণ থেকে আহরিত হলেও তা মধুসূদনের অপূর্বনির্মাণ প্রতিভায় শুধু মহাকাব্য নয়, যুগোচিত মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে মেঘনাদ হত্যায় ইন্দ্রের আগ্রহ এবং রাম লক্ষ্মণের উদ্যোগেই এই কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি সেক্ষেত্রে রাম নয়, রাবণকে বরণীয় মনে করেছেন। তাঁর কাছে একজন দেশবৈরী, অন্যজন দেশপ্রেমিক; কিন্তু ভাগ্যহত। যেমন মধুসূদন নিজে নিয়তি লাঞ্ছিত পুরুষ। তাঁর নিজ সত্তাই মেঘনাদ, সে দৈব বা ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে চায় কিন্তু তাকেও অকালে অন্যায় ষড়যন্ত্রে মারা যেতে হয়। মধুসূদনের 'ফেভারিট হীরো' কে মারার পরামর্শ বা আয়োজন যেখানে ঘটেছে, সেখানে কবি অকরুণ হতে পারেননি—

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,-
একটি রতনভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কুজনি পাখি পশিল কুলায়ে;

এখানেও আছে সৌন্দর্য দর্শন। শুধু রাজপুরী, স্বর্গপুরী, প্রকৃতি বর্ণনা নয় বীরমূর্তি, এমনকি বীরাঙ্গনা মূর্তিতেও তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞান অসাধারণ। প্রমীলা মূর্তি তারই দৃষ্টান্ত—

রোষে লাজ-ভয় ত্যাজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা, কিরীট ছটা কবরী-উপারি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বরী শিরে
ইন্দ্রচাপ।

চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের এই কবি আত্মার সৌন্দর্যরূপের যথার্থ জাগরণ ঘটেছে। শিল্পসার্থকতা অনন্য। এই জাগরণের কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তার স্বরূপ লক্ষণের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

পূর্ববর্তী সর্গে বীরাঙ্গনা রূপে যদি আমরা চমকিত, ভীত হই, তবে চতুর্থ সর্গে শোকবর্ষিতা সীতার বিষাদিনীরূপে আমরা অন্য এক সৌন্দর্যের আভাস পাই—

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে!

মধুকবির বাঙালিয়ানা তাঁর সৌন্দর্য চেতনায় কতখানি মিশেছিল, তাও বোঝা যায় এই চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার রূপ বর্ণনায়—

আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ।

বনবাস রাজ্য সুখভোগ অপেক্ষা কত ভালো, তা সীতার ''ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে'' ইত্যাদি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আরণ্যক জীবনযাত্রায় অপূর্ব ছবি কবি এঁকেছেন, যা পড়তে গিয়ে শকুন্তলার কথা মনে পড়ে—

কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ;

মধুসূদনের চিত্ররচনায় বর্ণ ও ঐশ্বর্যময় শোভাযাত্রার প্রাধান্য। রাজসিকতকায় তাঁর মনের তার বাঁধা, তুলির রঙেরও ঐ একই উৎস। কিন্তু সীতার অশোকনিবাসিনী মূর্তির যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা একেবারে ভিন্নজাতের। তাই চতুর্থ সর্গ পাঠশেষে পাঠকের মনে ও চোখ বিদ্ধ হয়ে থাকে সেই বিষাদময়ী, শোকাকুলা স্মৃতিভারমন্থরাসীতার রূপ—'একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।'

সীতা চরিত্র অঙ্কনসহ সমগ্র চতুর্থ সর্গে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি কখনও প্রত্যক্ষ ভাষায়, কখনো উপমায় এমন এক মায়ালোক সৃষ্টি করেছে মধুসূদনের কবিকল্পনার দিক থেকে যায় অভিনবত্ব ও বিস্ময়কর—

'হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী'

যদিও হীনপ্রাণা হরিণী অপেক্ষা বাঘিনীর ক্রুদ্ধবীর্যেই মধুসূদন চিরকাল অধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন, সীতা রূপ হীনপ্রাণা হরিণী কবিকে মুগ্ধ করেছে। আবার যখন সরমাও সীতার কথোপকথনে উঠে আসে যে সখ্যতা তার চিত্রণে—

কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা—রত্ন যথা!

এই চিত্রগুলির মধ্যে একটা পেলবতা, বিষণ্ণ একাকিত্ব, ক্বচিৎ একটা সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন ভেসে এসেছে। একটা সাত্ত্বিক ভাব—পরিবেশ রাজসিক চেতনামত্ত মধুসূদনের রচনায় সার্থক হয়ে উঠল কী করে তা ভাববার মত। মধুসূদনের রাজসিকতার মধ্যে বিপুলকে চাইবার একটা প্রেরণা ছিল। সমস্ত ক্ষুদ্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে, প্রাপ্তির অতীতলোকে পৌঁছে যাওয়া; এটাই ছিল তাঁর কামনা ও সাধনা। এইধরণের রাজসিকতা সাত্ত্বিকতারই অপর পিঠ।

চতুর্থ সর্গে সীতা কাহিনির চারপাশে সাত্ত্বিকতার যে একটা পূত পরিবেশ ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবি আত্মার কতগুলি নিগূঢ় উপলব্ধি এই সূত্র ধরে চতুর্থ সর্গে প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের কাব্যে প্রকৃতির আমন্ত্রণ ঘটেছে বারবার। কোথাও উপমাদি প্রয়োজনে, কোথাও পরিবেশ রচনায়, কখনও মণ্ডনের উদ্দেশ্যে। তিলোত্তমায় প্রকৃতি-চিত্রণে রোমান্টিক সৌন্দর্যসৃষ্টি কতকাংশে প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনাদবধে এবং অন্যত্র প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু চতুর্দশপদীর কয়েকটি মাত্র কবিতায় উৎসমুখী কবি এই বোধ-কেন্দ্রে পৌঁছেছেন।

আখ্যানকাব্যে প্রকৃতি বর্ণনায় দুটি ভিন্ন রীতি প্রচলিত। এক। সুখদুঃখাদি মানবমনোভাবকে বহন করা। স্থান, ঋতু, প্রভাত-সন্ধ্যাদি কাল প্রভৃতির পরিবেশ সৃষ্টি। দুই। প্রকৃতির রূপমুগ্ধ বর্ণনা। প্রথমক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রয়োজন সিদ্ধ করে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কবির একটি বিশিষ্ট মুড ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এমন একটা আস্বাদের সৃষ্টি করে যা আখ্যানাংশের অধীন নয়। প্রথম রীতির পরিচয় মেঘনাদবধে বারবার আছে। চতুর্থ সর্গেও সীতার বিষণ্ণ একাকীত্বের ছায়ায় অশোককাননের শোকমুহ্যমান চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাসী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ!

পঞ্চবটী বনে রাম-সীতার সুখকর জীবনের সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু তার প্রাণময়তা রূপাঙ্কনে কবি যখন সীতাকে দিয়ে স্বীকার করান—

ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!

তখন রাজনন্দিনীর পূর্ব সুখের কথা ভুলে যাওয়া প্রকৃতির সাহচর্যে, এর আর বড় স্বীকৃতি প্রকৃতির সৌন্দর্যের কী হতে পারে! মধুসূদনের কাব্যে এরূপ ভাবনা অদৃষ্টপূর্ব। নানাদিক থেকে তাই মনে হয় যে চতুর্থ সর্গের কল্পনার উৎসেই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। সমগ্র কাব্যে পৌরাণিক চরিত্র, কাহিনি প্রায় সার্ধশতবর্ষের প্রান্তে এসে কেমন জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, আমরা তাই দেখি। এই প্রাণশক্তির মূলে হয়ত অনেক কিছুই আছে; কিন্তু কবির রোমান্টিকতা, সুন্দরের ধ্যান যে শেষপর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠেছে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৬.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের নাম কী?

২। চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।

৩। কাব্যে চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

৪। মেঘনাদবধ কাব্যে চতুর্থ সর্গের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৫। মহাকাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে চতুর্থ সর্গের পরিকল্পনা কতদূর সার্থক বিবেচনা করো।

৬.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার।

২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)।

৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী।

৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-৩

ষষ্ঠ সর্গ

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.৩.১	:	বিষয়বস্তু
৬.১.৩.২	:	শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা
৬.১.৩.৩	:	Climax পর্ব
৬.১.৩.৪	:	বর্ণনার স্রোতের গতিমুখ
৬.১.৩.৫	:	মুখ্য ঘটনা
৬.১.৩.৬	:	মহাকাব্যিক বিস্তার
৬.১.৩.৭	:	উপযোগিতা
৬.১.৩.৮	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.৩.৯	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.৩.১ : বিষয়বস্তু

ষষ্ঠ সর্গের নাম 'বধো'। এই পর্বে মেঘনাদকে বধ করা হয়। মায়াদেবীর বরে রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিভীষণ সভা শিবিরে পৌঁছে দেয়। তাকে মায়াদেবী বর দিয়ে বলে যে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আচমকা বাঘের মত আক্রমণ করে মেঘনাদকে হত্যা করতে। এবার রামের পরামর্শ চাইলে রাম বলে যে, সর্পবিবরে কী করে প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে পাঠাবে। লক্ষ্মণ প্রশ্ন করে ''নাহি কাজ মিত্রবর সীতায় উদ্ধারি'', কিন্তু রাম দৈব আশীর্বাদ পুষ্ট। অতএব তাঁর ভয়ের কারণ নেই। বিভীষণও তার সঙ্গে একমত হয়ে বলে, দেবতার আদেশ মানা কর্তব্য। আমিও লক্ষ্মণের সাথে যাব। তখন রাম লক্ষণের মা সুমিত্রার কথা স্মরণ করে, যার অনুরোধ ছিল লক্ষ্মণকে রক্ষা করা। তাই রাম বলে, ''নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।'' সরস্বতী সহসা আবির্ভূত হয়ে ভবিষ্যত দেখায়। এবং বলে দেববাক্যে তার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এবার রাম রাজি হয়ে লক্ষ্মণকে প্রস্তুত করে এবং বিভীষণকে বলে, আমি ভিখারী রাঘব আমার অমূল্য রত্ন লক্ষ্মণকে আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার জীবন তোমার হাতে। বিভীষণ-লক্ষ্মণ লঙ্কা যাত্রা করল।

৬.১.৩.২ : শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা

মেঘনাদবধ কাব্য মধুসূদনের একটি অন্যতম সৃষ্টি। এই কাব্যের কবিরও প্রথম সর্ববহিঃরাবরণ মুক্ত বিশুদ্ধ রসপ্রেরণার সৃষ্টি মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধ কাব্য নয়টি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যটি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা হয়েও বিতর্কের আকর হয়ে রয়েছে। যেমন এর ছন্দ-ভাষা বৈদেশিক উপাদান নিয়েও বিতর্ক দেখা যায়। সেইরকম এ কাব্যের কোন সর্গটি শ্রেষ্ঠ এ নিয়েও বিতর্ক কম নেই। বিভিন্ন সমালোচকের মতে, বিভিন্ন সর্গ শ্রেষ্ঠ কারণ প্রত্যেকের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ভিন্ন। আমাদের মনে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গই শ্রেষ্ঠ।

৬.১.৩.৩ : Climax পর্ব

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনিবৃত্তের climax ষষ্ঠ সর্গ। কেবল ঘটনার দিক থেকে নয়, রচনার দিক থেকেও এর সৌন্দর্য অতুলনীয়। ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনাভঙ্গীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার আগে পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণের স্বার্থ ও প্রয়োজনবোধের বর্ণে বর্ণানাংশ চিত্রিত। তাদের ভীতি সংশয় আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুর সেখানে মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ লক্ষণের লঙ্কাপ্রবেশের পূর্বমুহূর্ত থেকেই কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই সুরটি পটভূমিতে ধরে রেখেছেন কবি। কিন্তু সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লঙ্কার অতুল বৈভব বীরত্ব ও অপরূপ সৌন্দর্য। বিভীষণের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও লক্ষ্মণের পরমক্রোধ এবং শত্রুতাও যেন স্তম্ভিত হয় গেছে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য বৈভব ও বীরত্বে। আর নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য বর্ণনা, লক্ষ্মণ বিভীষণকে সম্পূর্ণ বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করেছে। ইন্দ্রজিৎ অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মহাপরাক্রমশালী বীরযোদ্ধা হওয়ার সত্বেও সে নিরস্ত্র, তার এই অসহায়তার চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন অতুলনীয়ভাবে।

৬.১.৩.৪ : বর্ণনাস্রোতের গতিমুখ

ষষ্ঠ সর্গের শুরুতে রামের শিবিরে ভীতি ও আতঙ্কের একটি ভাবপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্মণকে একাকী নিষ্কুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রেরণ করতে গিয়ে রামচন্দ্র আকুল হয়ে উঠেছেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণ লঙ্কার বৈভব ও বীরত্ব দর্শনে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এই আকুলতা যেমন স্পষ্টত মেঘনাদের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে, এই সৌন্দর্য ঐশ্বর্য বীরত্ব মুগ্ধতা তেমনই ঐ একটি নামের চারিপাশে আন্দোলিত। ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদের আবির্ভাব বহু পরে ঘটলেও কবি প্রথমাবধি ঐ একটি ব্যক্তির দিকে আলো ফেলেছেন। এই সর্গের সমগ্র বর্ণনার স্রোত শুরু থেকেই যজ্ঞরত ইন্দ্রজিতের দিকে ধাবমান রামচন্দ্র বারবার সভয়ে বলেছেন—

নাহি কাজ মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি
ফিরি যাই বনবাসে। দূর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের এই বীরত্ব আজ মৃত্যুর মধ্যে সমাহিত হবে। গল্পের চমকরক্ষার জন্য কবি সেই

অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে আবৃত করে রাখেননি। বরং মেঘনাদের বীরত্বের ও আসন্ন ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন বারবার। লক্ষ্মণ আশ্বাস দিয়ে দেবকুলের আশীর্বাদের কথা বলেছেন। বিভীষণ বলেছেন—

দেবকুলে প্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু! অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রী শূর মেঘনাদ শূরে!

কবি এই সর্গে লক্ষ্মণের তুলনায় বিভীষণকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। এই সর্গে মেঘনাদই মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে।

৬.১.৩.৫ : মুখ্য ঘটনা

মেঘনাদবধ কাব্যের মুখ্য ঘটনা হল মেঘনাদবধ, তা এই কাব্যের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। এই মেঘনাদবধের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ষষ্ঠ সর্গে। সমগ্র কাব্যের নায়ক রাবণের উৎসাহ, উত্তেজনা, ক্রোধ সর্বোপরি প্রতিহিংসাকে দেখানোই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। এই রাবণের সমস্ত উৎসাহ উত্তেজনা নির্ভর করে আছে মেঘনাদবধ অর্থাৎ ষষ্ঠ সর্গের উপর। মেঘনাদের মৃত্যু বা হত্যা এই সর্গে সংঘটিত না হলে এই সর্গটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেত না। কাব্যের ষষ্ঠ সর্গটি সমগ্র কাব্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলা যায়। এদিক থেকেও উক্ত সর্গটি শ্রেষ্ঠ।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের প্রতিপক্ষ রূপে মধুসূদন দাঁড় করিয়েছেন লক্ষ্মণকে কিন্তু লক্ষ্মণকে কবি বীরোচিত চরিত্র করে আঁকেননি। লক্ষ্মণ হয়তো বাহ্যিক দিক থেকে বীর কিন্তু তাকে প্রকৃত বীর বলা যায় না। কারণ নিরস্ত্র অবস্থায় একজনকে হত্যা করা প্রকৃত বীরের ধর্ম নয়। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করেছে; তখন ঊষাকাল, ইন্দ্রজিৎ পূজায় মগ্ন, চতুর্দিকে পূজোপকরণ, পরিধানের শুচিবাস,

বসেছে একাকী—
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূর যেন।

চোখ খুলেই লক্ষ্মণকে দেখে ভ্রমবশত বৈশ্বানরকে মনে করলেন এ বর্ণনায় মেঘনাদের প্রতি কবিহৃদয়ের সম্ভ্রম প্রকাশিত। মিহির, গরুড় বা মহাদেবের সঙ্গে তুলনায় তার সেই মহিমা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মণকে কবি বারে বারে কলি, রাহু, সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে উপমিত করেছেন। ফলে এই সর্গেই একদিকে বীর ইন্দ্রজিতের ধর্মবোধ তার মাহাত্ম্য অন্যদিকে লক্ষ্মণের হীনতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

৬.১.৩.৬ : মহাকাব্যিক বিস্তার

অন্তিম মুহূর্তে মেঘনাদের বর্ণনায় কবি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ মানবীয় মহিমায় ভূষিত করেছেন। এদিক দিয়েও ষষ্ঠ সর্গ শ্রেষ্ঠত্বর অধিকার পাবার যোগ্য। শেষমুহূর্ত আসন্ন জেনে মেঘনাদ পিতামাতার পাদপদ্ম এবং প্রেমময়ী প্রমীলাকে স্মরণ করেছে। মৃত্যুকালে লক্ষ্মণের প্রতি অসীম ঘৃণা এবং রাবণের প্রতিশোধের

কথা ব্যক্ত করেছে। অসহায়, নিরস্ত্র, অভিমানী বীরের মনোবিশ্লেষণে আধুনিক কবি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর কল্পনার আধুনিক ভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে বিশেষভাবে ষষ্ঠ সর্গেই। মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির পতনকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন এখানেই। বীরের পতনকে কবির বক্তব্য—

থরহরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব—আরাবে
সহসা পূরিল বিশ্ব,
মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে!

এ মৃত্যু আর বহুশত মৃত্যুর একটি হয়ে রইল না। সমগ্র কাহিনির গতির মূল আকর্ষণস্থল হয়ে উঠল। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি মেঘনাদের মৃত্যু ঘটনাকে মহাকাব্যিক বিস্তার দিলেন।

৬.১.৩.৭ : উপযোগিতা

ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদ হত্যার পরিপ্রেক্ষিতেই সপ্তম সর্গের সূচনা বলা যায়। মধুসূদন নিজেও এই সর্গটিকে নিয়ে অসম্ভব অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন—'It was a struggle whether Meghnad, will finish me or I finish him.' আমরা দেখেছি ইন্দ্রজিতের অসম্ভাব্য মৃত্যুর প্রতিবিধান করতেই সপ্তম সর্গে রাবণ যুদ্ধাযাত্রা করেছেন। প্রথমেই দূতের ছদ্মবেশে বীরভদ্রের মুখে অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ শরবিদ্ধ সিংহের মত ভূতলে পরিণত হয়েছেন। পরে শিবের প্রেরিত রুদ্রতেজে রাবণ শোকভুলে রণসাজে সজ্জিত হয়েছেন। লঙ্কাদ্বীপ রণনাদে ভরে উঠেছে। স্বর্গবাসী দেবতারাও চকিত হয়েছেন। এতকিছুর কারণ কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের হত্যা। ফলে এই সর্গের উপযোগিতার কথা সহজেই স্মরণে আসে।

নয়টি সর্গে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য যা বীরবাহুর মৃত্যু দিয়ে কবি শুরু করেছিলেন তারই চূড়ান্ত পর্যায় বা climax রচনা করেছেন ষষ্ঠ সর্গে। কাব্যসাহিত্যের দ্বন্দ্বজটিল চূড়ান্ত অবস্থাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্যান্য অংশগুলি চূড়ান্ত অবস্থার রূপদানে সাহায্য করে। ঘটনার পরিণতি ও নির্ভর করে climax এর উপর। মেঘনাদবধ কাব্যে তাই হয়েছে। ফলে ষষ্ঠ সর্গকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলতে পারি কাব্যে এই সর্গের উপযোগিতাও অনন্য।

৬.১.৩.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মেঘনাদবধ কাব্যের মোট কয়টি সর্গ?

২। ষষ্ঠ সর্গের নাম কী?

৩। এই সর্গের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।

৪। তোমার মতে মেঘনাদবধ কাব্যের কোন সর্গটি শ্রেষ্ঠ? যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৫। ষষ্ঠ সর্গের উপযোগিতা কী তা বর্ণনা করো।

৬। মেঘনাদবধ কাব্যের climax কোন সর্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে? এটি সংগঠনে কবি কতদূর সার্থক হয়েছেন বিবেচনা করো।

৭। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু কোন সর্গে ঘটেছে?

৮। কাব্যের নামকরণে ষষ্ঠ সর্গের উপযোগিতা সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

৯। ষষ্ঠ সর্গের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৬.১.৩.৯ : সহায়ক গ্রন্থ

১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার।

২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)।

৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী।

৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-৪

রসবিচার

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.৪.১	:	ভূমিকা
৬.১.৪.২	:	বীররস
৬.১.৪.৩	:	করুণরস
৬.১.৪.৪	:	রৌদ্ররস
৬.১.৪.৫	:	অদ্ভুতরস
৬.১.৪.৬	:	ভয়ানক ও বীভৎস রস
৬.১.৪.৭	:	হাস্যরস
৬.১.৪.৮	:	শান্তরস
৬.১.৪.১০	:	উপসংহার
৬.১.৪.১১	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.৪.১২	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.৪.১ : ভূমিকা

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এটাই কাব্যের মূলসূত্র। অর্থাৎ রস যার আত্মা এমন যে বাক্য, তাই বাক্য। শব্দ ও অর্থ যে কাব্য পুরুষের শরীর, উপমাদি যার অলংকার, মাধুর্য্যাদি যার গুণ, ধ্বনি যার জীবন, রস সেই কাব্য-পুরুষের আত্মা অর্থাৎ সারস্বরূপ। আলংকারিকগণ কাব্যে দশ প্রকার রসের কথা উল্লেখ করেন, যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বাৎসল্য ও শান্ত। যে ভাব স্থায়ী হলে যে রসের উৎপত্তি হয়, সেই ভাবকে সেই রসের স্থায়ীভাব বলা হয়। আর স্থায়ীভাব পুষ্ট করে কাব্যমধ্যে আরও যেসব গৌণভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাকে সঞ্চারী বলা হয়। কাব্যে লক্ষ করা উচিত যখন স্থায়ীভাবের ফলে রসের উৎপত্তি হয়। তখন অন্যভাবের আগমনে যেন ভাবান্তর ঘটে রসভঙ্গ না হয়। তাহলে সে কাব্য অনুপভোগ্য হয়ে ওঠে।

যাইহোক আমরা দেখব মেঘনাদবধ কাব্যে কমবেশি সকল প্রকার রসেরই প্রকাশ আছে। এর মধ্যে বীররস ও করুণরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই আমরা প্রথমে বীররস ও করুণরস নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য গৌণরসের অধিকার লক্ষ করার চেষ্টা করব।

৬.১.৪.২ : বীররস

দান, ধর্ম, দয়া ও যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে উৎসাহ থেকে বীররসের উৎপত্তি। তা পাঠক বা শ্রোতার মনে বীরভাব উদ্দীপিত করে। লঙ্কা যুদ্ধ এবং তার উদ্যোগায়োজন যে কাব্যের বিষয়; রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ যে কাব্যে যোদ্ধৃ বীরপুরুষ এমনকি যুবরাজ মহিষী প্রমীলা ও তার চেড়ীগণ যে কাব্যে বীর রমণী রূপে বর্ণিত, সে কাব্যে তো বীররসের প্রাধান্য থাকবেই। তাই কবি স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলেছেন—

‘গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত’

কবি বাংলা কাব্যে ছন্দক্ষেত্রে যেমন এক সুন্দর নতুনত্ব দিয়েছেন। তেমনই নতুন ছন্দে বীররসের যে কেমন চমৎকার অভিব্যক্তি হতে পারে, তার আদর্শ দিয়ে গেছেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে মধুসূদনের যেমন অতুলনীয় কীর্তি, তেমন ঐ ছন্দে বীর রসের চমৎকার অভিব্যক্তিতেও তার অসাধারণ কৃতিত্ব।

কাব্যারম্ভেই ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্ব কাহিনি শুনে শোকার্ত রাবণের হৃদয় বীরোচিত উৎসাহে পূর্ণ হল—

“—সাবাসি, দূত, তোর কথা শুনি
কোন্ বীর—হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে?”

পুত্রশোকে কাতর হয়েও তার উক্তি—

“বীরশূন্য লঙ্কা মম। কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ, হে বীরেন্দ্র-বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ।”

লঙ্কার যোদ্ধাগণ রামকুলের সঙ্গে সমরে প্রায় সকলেই মৃত। এই বীরশূন্য লঙ্কা মহাসংকটে পতিত। তাই রাক্ষস কুলের মান রাখতে রাবণের এরূপ উক্তি। এইরূপ উৎসাহব্যাঞ্জক উক্তিতে উদ্যোগে বীর রস সত্যই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী অংশে আমরা দেখি রাক্ষসকুলের একমাত্র সহায়সম্বল মেঘনাদকে রাবণ বারবার যুদ্ধে পাঠাতে অনিচ্ছুক হলে, মেঘনাদের উৎসাহব্যঞ্জক উক্তি—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র! থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুষিবে জগতে।"

একথা তো একজন সত্যিকারের বীরই বলতে পারে। মেঘনাদের এই বীরভাবসম্পন্ন উক্তি আমাদের মনে বীরভাবের উদ্রেক ঘটায়।

এছাড়া তৃতীয় সর্গে প্রমীলা পতি মেঘনাদের অনুসন্ধানে লঙ্কাপুরে যেতে চাইলে, সখীগণ রাঘবসেনা থাকায় তার যাত্রাপথে আশঙ্কার কথা বলেন। এই আশঙ্কা নস্যাৎ করে প্রমীলার উক্তি—

দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃ কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,-
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ—বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এ তো একজন বীরাঙ্গনা নারীরই কণ্ঠস্বর। শুধু কথা নয় তাদের সাজ সজ্জাতেও বীরাঙ্গনার প্রকাশ পাওয়া যায়—"যথা যাব পরন্তপ পার্থ মহারথী-"

শুধু রক্ষোকুল নয়, রাঘবকুলেও আমরা বীররসের ভাব লক্ষ করি। মেঘনাদের মৃত্যুতে গোটা স্বর্ণলঙ্কা যখন শোকে আকুল, তখন এই শোকে প্রতিশোধ স্বরূপ লঙ্কারাজ রাবণ চতুরঙ্গ সহযোগে যুদ্ধে রাঘবকুলকে আহ্বান করে। এই বিশাল রাক্ষস বাহিনীর কাছে রাঘবকুলের সেনাবাহিনী সত্যই তুচ্ছ। তাই একমাত্র সহায় অনুজকে আশঙ্কা প্রকাশ করে এই কাল সমরে যেতে নিষেধ করে। এবং ভ্রাতা লক্ষণের রাবণের বীররসাত্মক উক্তি

ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুল পতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্যকর, রথি, আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।

এ তো সম্মুখ সমরের এক যোদ্ধার অপর যোদ্ধাকে আহ্বান।

এছাড়াও রাঘবকুলের সমুদ্রবন্ধন, বালীবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বে বিশল্যকরণী লতার আনয়নে, সর্বোপরি পুনরায় লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে গমনে এতো বীরভাবের পরিচায়ক। যদিও রাঘবকুলের সহায়করূপে দেব-দেবী ছিলেন। কিন্তু দেব-দেবী যে কুলের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ তো সত্যই বীরত্বের পরিচায়ক।

এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক যুদ্দোদ্যোগ বর্ণনা কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান—পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গের অনেকস্থলেই বর্ণনায় ও বাক্যে বীর রস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। কব্যখানিমূলত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বীররসাত্মক স্বয়ং কবি মধুসূদন এই অঙ্গীকার করলেও এর নানাস্থলে করুণ রসের অতিসুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাই, বিশেষত; শেষ সর্গে করুণ রস যেন মূর্ত্তিমান হয়ে পাঠককে অভিভূত করে তোলে।

৬.১.৪.৩ : করুণরস

সাধারণত ইষ্টনাশে বা অনিষ্টপাতে বা প্রিয়বিয়োগে যে শোক, তা থেকেই এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত আলংকারিকগণ শাস্ত্রে তা কপোতবর্ণ ও যম দেবতা বলে বর্ণনা করেহচেন। শোক এর স্থায়ীভাব; শোকার্ত ব্যক্তি বা বিষয় এর আলম্বন বিভাব, তদ্বিষয় দর্শন, শ্রবণ, মননাদি এর উদ্দীপন বিভাব এবং ক্রন্দনাদি এর অনুভাব।

একাব্যে বীর রসের পরেই করুণ রসের প্রাধান্য এবং অসামান্য তুলিকা গুণে এ কাব্য করুণ রসের অভিব্যক্তি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। কাব্যের শুরুতেই মূর্ত্তিমান করুণরস—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুল পতি,
বাক্য-হীন পুত্র-শোকে। ঝরঝর-ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা, তিতিয়া বসনে

বীরবাহুর শোকে রাবণের বিলাপ—‘‘নিশার স্বপ্নসম, তোর এ বারতা।’ লঙ্কার রণক্ষেত্র বর্ণন, সভাস্থলে বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন; অষ্টম সর্গে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করে রামের ক্রন্দন এবং সর্বশেষে নবম সর্গে মৃত মেঘনাদের সামরিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনা ও প্রমীলার সহমরণ—এইসব স্থলের করুণরস কেবল বাংলা সাহিত্য কেন, যে কোনো সাহিত্যেই গৌরবের বিষয় হতে পারে। তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। চিতারোহণ কালে প্রমীলার মুখে—

‘‘-লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলাস্থলে”

এবং তারপরে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতা সমক্ষে ‘‘বিশাদ বস্ত্র” ও ‘‘বিশদ উত্তরী” রাবণের মুখে—

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;

এ তো করুণরসের উৎসদ্বার। যা নির্ঝরের মতো ঝরে মেঘনাদের শবদাহ করার পর কাব্যের সমাপ্তিতে—

করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

এ তে পাঠকের মনে সপ্ত দিবানিশির অপেক্ষাও যে বেশি দিন কাঁদতে হয়, তা কবি নিজেও জানতেন। লিখতে লিখতে তিনি নিজেও অশ্রুসিক্ততা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন—"I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakhana, for Promila. I never thought. I was such a fellow for the pathetic."

৬.১.৪.৪ : রৌদ্ররস

এই দুটি অঙ্গীরস ছাড়াও আমরা অন্যান্য রসের প্রকাশ দেখতে পাই। যেমন রৌদ্ররস যা ক্রোধ থেকে জাত। এর প্রকাশ বহুস্থলে লক্ষ করি। যেমন বাসন্তী প্রমীলাকে লঙ্কায় যেতে বারণ করায় প্রমীলার উক্তি—"কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? আবার এছাড়া মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ছদ্মবেশী অগ্নিদেব বলে ভ্রম হলে, দাশরথির রুষ্ট বচন। তাছাড়া সপ্তম সর্গে রাক্ষস সৈন্যদিগের প্রতি মেঘনাদ বধের প্রতিবিধানে উদ্যোগী রাবণের ক্রোধান্বিত অভিভাষণ—

দেব দৈত্য নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ অনীকিনি"

এতো রৌদ্ররসের সুন্দর উদাহরণ স্থল।

৬.১.৪.৫ : অদ্ভুতরস

অদ্ভুতরস যার উৎপত্তি আশ্চর্য জনক বিষয়ে বা দৃশ্য থেকে। যুদ্ধাদির ব্যাপার নিয়ে যে কাব্যের বর্ণনা সে কাব্যে যদি প্রেতপুরীর বর্ণনা থাকে সেখানে তো অদ্ভুত রসের প্রকাশ ঘটবেই। প্রথম সর্গে বিস্ময় ও ভয়ে ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনি বর্ণনা। তৃতীয় সর্গে বীরবেশধারী প্রমীলাকে দেখে হনুমানের বিস্ময়ভাবাত্মক উক্তি। এবং নৃমুণ্ডমালিনীকে বিদায় দিয়ে বিভীষণের কাছে রামের উক্তি—'দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া' তাছাড়া লক্ষ্মণের চণ্ডী পূজার্থে বনে গমন। এসবই অদ্ভুত রসের সুন্দর উদাহরণ।

৬.১.৪.৬ : ভয়ানক ও বীভৎস রস

এছাড়া ভয়ানক ও বীভৎস রস উভয়ই আমাদের একসঙ্গে প্রেতপুরী ও নরকবর্ণনা অংশে একসঙ্গে ধরা পড়ে। শৃঙ্গারসের প্রকাশ আমরা মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্যলীলায় দেখি। তাছাড়া কিছুটা প্রেতপুরীতে কামাতুর প্রেত-প্রেতিনীর আচার-আচরণে।

৬.১.৪.৭ : হাস্যরস

হাস্যকৌতুকের প্রকাশও গৌণ হলেও লক্ষ করা যায়। যেমন প্রমীলা বাহিনীর হনুমানের প্রতি কথোপকথন এবং সুগ্রীবের প্রতি রাবণের উক্তি—

হাসিয়া কহিলা—

লঙ্কানাথ—'রাজ্যভোগ ত্যাজি কি কুক্ষণে

বর্বর, আইলি তুই এ কনক-পুরে?

৬.১.৪.৮ : শান্তরস

শান্তরস শান্তি বা নির্ব্বেদ থেকে এই রসের উৎপত্তি। বীরবাহুর শোকে রাবণের উক্তি। সীতার মুখে পঞ্চবটী বাস বর্ণনায় করুণ রসের সঙ্গে শান্তরসের সুন্দর অভিব্যক্ত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে রাবণের খ্যাতি দেখে লক্ষ্মণের ঐশ্বর্য মহিমা জ্ঞাপন করলে বিভীষণের শান্ত রসাত্মক উক্তি—

এক যায়, আর আসে, জগতের রীতি,
সাগর-তরঙ্গ যথা!

৬.১.৪.৯ : বাৎসল্য রস

উপরিউক্ত নয় প্রকার রস ছাড়াও সংস্কৃত আলংকারিকগণ বাৎসল্যকেও একপ্রকার রস বলে গণ্য করেছেন। স্নেহ থেকে যার উৎপত্তি। সংসারের যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্যে যাঁহাদের কাছে করজোড়ে কল্যাণ প্রার্থনা করতে হয়, সেই সর্ব কল্যাণদায়ী লোক মাতৃকাগণ ভিন্ন বাৎসল্যরসের দেবতা আর কে হতে পারে? উদাহরণ মেঘনাদের প্রতি রাবণের উক্তি—

এ কাল সমরে

নাহি হে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা

বারম্বার।

মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরীর স্নেহ, চিত্রাঙ্গদার বীরবাহুর প্রতি স্নেহ। তাছাড়া রামের ভ্রাতৃস্নেহ তো মাতৃস্নেহ হত কিছুমাত্র কম নয়—'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,/প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।'

৬.১.৪.১০ : উপসংহার

এইসব রসের বিশেষত বীররস ও করুণরসের সংযত সমাবেশে মেঘনাদবধ কাব্যখানি সত্যই উপভোগ্য। এতে ছন্দের স্বাধীনতা ভাষা রসোপযোগিতা ও বিবিধ অলংকারের পরিপাট্য সর্বত্রই রসের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন করেছে।

তবে মেঘনাদবধ কাব্যে কোন রসের প্রাধান্য, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। একদল সমালোচকের মতে এটা বীররসের কাব্য। আবার অন্যদল এর মতে করুণ রসই প্রধান। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এ সম্পর্কে বলেছেন—'মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য।' একথার যুক্তি বলা যেতে পারে যে, আমরা দেখি বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের সূচনা এবং মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার চিতারোহণে লঙ্কার নর-নারীর করুণ বিলাপে এর শেষ। এর আদি, মধ্য, অন্ত সমস্ত বিষাদপূর্ণ। এজন্যই আমরা মেঘনাদবধে বীররস অপেক্ষা করুণরসের প্রাধান্য লক্ষ করি। কিন্তু এর বিপক্ষে একটি তর্ক সহজেই কবির অঙ্গীকার—'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।' এ তো কাব্যের গুণের একটা বড় ব্যর্থতা বলে আমরা মনে করি কিন্তু এর কারণ যদি অনুসন্ধান করতে চাই তাহলে তা কবির জীবনের মধ্যেই এর উত্তর খুঁজতে হবে। একটু ঘনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষণ করলে মেঘনাদবধের রস-বিচারে রস প্রাধান্য নির্ণয়ে মতানৈক্যের কোনো অবসর নাই। বীররস এ কাব্যের আভরণ মাত্র, দেহখানি করুণরসেই অভিসিঞ্চিত। কাব্যখানি যেন একেবারে তার জীবনের প্রতিচ্ছবি—উপরে সাহেবী পোশাকে আচ্ছাদিত সাহেবীয়ানা, অন্তরে সেই স্নেহকোমল বাংলা মায়ের দরদী সন্তান।

তবে আবরণ হোক, আর আভরণই হোক যতটুকু বীররস এই কাব্যে দেখতে পাই, তার সমকক্ষ বাংলা কাব্যের আর কোথাও এখনও পর্যন্ত দেখতে পাই না। হয়ত দীর্ঘ জীবন পেলে তিনি তার নিজের স্বপ্নে সত্যই সফল হতেন কারণ মধুসূদনের মত প্রচণ্ড Political প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোনো দেশের ইতিহাসেই দুর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তার সৃষ্ট সাহিত্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই মধুসূদন যে কাব্য লিখতে চেয়েছিলেন, যার জন্য তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি। তিনি পাঠককুলকে আশ্বস্ত করে গেছেন এই বলে—'Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Viraras."

৬.১.৪.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। আলংকারিকগণের মতে রস কয়প্রকার ও কী কী?

২। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রধান দুটি রস কী?

৩। বীররসের কাব্য হিসাবে মেঘনাদবধ কাব্যের সার্থকতা বিচার করো।

৪। মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক এরূপ মন্তব্য করেছেন—'সামগ্রিকভাবে ইহার মধ্যে যে রস বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে এবং তাহার বিপরীতধর্মী রস করুণরস'—এই অভিমত কতখানি গ্রহণযোগ্য বিচার করো।

৫। মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার করো।

৬.১.৩.৯ : সহায়ক গ্রন্থ

১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার।

২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)।

৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী।

৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

পত্র - B-CORE - 205

পর্যায় গ্রন্থ : ২ বৃত্রসংহার কাব্য : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ৫ - সমসাময়িক যুগ ও কবিমানস

বিন্যাসক্রম

২০৫.২.৫.১ : সমসাময়িক যুগ

২০৫.২.৫.২ : কবিমানস

২০৫.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.২.৫.১ : সমসাময়িক যুগ

আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই ইংরেজ শাসনের নানা ফল ফলতে শুরু করেছিল তার মধ্যে যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল ভারত তথা বাংলার আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা নতুন তাৎপর্যের ইঙ্গিত। ইংরেজরা যে পরিবর্তনগুলো আনল অর্থনীতির দিক থেকে সেগুলি নিম্নরূপঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ং সম্পূর্ণতার ধ্বংস হল, আমদানী ও রপ্তানীর মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সঙ্গে বিশ্বের ধনতন্ত্রের একটা যোগাযোগ তৈরি হল, আর্থিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে পণ্যবিনিময় নয় নগদমূল্যে পণ্য কেনা-বেচার সূচনা ঘটল। আর যেটি হল, সামাজিক ক্ষেত্রে ইংরেজরা সামাজিক সংগঠনের একটা বিরাট পরিবর্তন আনল, ছোট ছোট সামাজিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙে যেতে লাগল। এই পরিবর্তনকেই মার্ক্স এশিয়ার একমাত্র সামাজিক বিপ্লবের আখ্যা দিয়েছেন। যাইহোক এই সকল আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে নতুন তিনটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল।

প্রথমটি হল জমিদারশ্রেণি। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে কর্ণওয়ালিসের সময় পর্যন্ত যারা ইংরেজের প্রভূত সাহায্য পেল কিন্তু প্রকৃত জমিদার বা সামন্তের ভূমিকা পালন করল না কারণ জমির সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ তৈরি হল না, তারা

কলকাতায় কলকাতার বাবু হয়ে নতুন এক সমাজব্যবস্থার নির্মাণ করল। এদের সাথে সাথেই আর এক শ্রেণির উদ্ভব হল। এদের সামাজিক বা বংশগত ঐতিহ্য ছিল না। কিন্তু হাতে হঠাৎ এল প্রচুর কাঁচা পয়সা, এরা উঠতি ব্যবসাদার-মুৎসুদ্দি। আর এই দুই শ্রেণি ছাড়া আর একটি শ্রেণি গড়ে উঠল যেটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সেটি হল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। জমিদারের উপসত্ত্বভোগী এবং তাদের ছত্রছায়ায় লালিত এই মধ্যবিত্তদের সামাজিক প্রভাব ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এদের সঙ্গেই ক্রমশ যুক্ত হল শিক্ষিত সম্প্রদায় যারা হিন্দু কলেজ বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হয়ে এল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই তথাকথিত বাংলা রেনেসাঁসের ও সাহিত্যের অগ্রগতির বাহন।

এই রেনেসাঁসকে যথার্থ রেনেসাঁস বলে অনেকেই মানতে চাননি। তাঁরা দেখেছেন সামন্ততন্ত্রের বন্ধন থেকে এই মধ্যবিত্ত পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি, তাদের শিক্ষায় রয়েছে ত্রুটি, কর্মেও ছিল নানা ভুলভ্রান্তি। ইংরেজী সভ্যতা সংস্কৃতি আমাদের যে মানসিক উন্নতি ঘটাল ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের দিকে তার সাথে সংগতি তৈরি হল না। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কালান্তরে যা বলেছেন তা স্বীকার করতেই হবে,-“য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ—যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে কোনো চির-প্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।” তাই তো হাজারো স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও এই যুগেই নতুন বোধি ও চৈতন্য নিয়ে বহু মনীষী জ্বাললেন মনীষার মশাল। রেনেসাঁ মানে যদি নবজন্ম হয় তবে উনিশ শতকে বাঙালীর নবজন্মকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না।

রেনেসাঁ বাঙালীর মনে সৃজনীর যে ইচ্ছালোকে নির্মাণ করল তাই সে যুগের সাহিত্যের আতুরঘর। ইংরেজ প্রাণ খুলে বাঙালীর জীবনে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো

এনে দিতে চেয়েছিল একথা কখনো সত্য নয় কিন্তু শাসন শোষণের প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এল, নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেটুকু ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শ পাওয়া গেল তাতেই ক্রমাগত নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল বাঙালী এবং তার মনোভূমি সৃষ্টির নানা ফসল ফলানোর জন্য প্রস্তুত হল, উদগ্রীব হল।

এই প্রস্তুতিপর্বের বাংলা কাব্যের পুরোহিত অবশ্যই ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের রচনার দ্বিধাদ্বন্দ্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তারা যুগপৎ বিগত দিনের চিহ্নকে বহন করেছেন আবার অনাগত দিনের লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে তাদের রচনায়। এদের মধ্যে-ঈশ্বর গুপ্তের টানটা ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে আর রঙ্গলাল ছিলেন আধুনিকতার পূর্বসুরী অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকদের মধ্যে প্রথম আধুনিক যিনি তখনো কাব্যরচনায় পূর্ব ঐতিহ্যও অনুসরণ করছেন। এ সবই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের চিত্রটি বদলে যেতে লাগল স্পষ্টভাবেই। ১৮৫৫-৫৬-তে ঘটল সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহ যতটা জনসমর্থন প্রত্যাশা করেছিল তা কিন্তু পাওয়া গেল এমনকি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এ বিষয়ে উদাসীন থাকল। একমাত্র কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গ ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কবিতা ছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো বা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এই সময় নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে বাসা বেঁধেছিল এ তারই ফলশ্রুতি।

সিপাহী বিদ্রোহে মধ্যবিত্ত বাঙালী প্রতিক্রিয়া না দেখালেও নীলবিদ্রোহে (১৮৫৮-৬০) কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা বিরাট। পূর্বোক্ত বিদ্রোহগুলিতে মধ্যবিত্তের উদাসীনতার কথা আমরা বলেছি কিন্তু এবার মধ্যবিত্ত বাঙালী আর নিষ্ক্রিয় থাকল না। একদিকে যশোহর, নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষককূল স্বতোপ্রণোদিত হয়ে যোগ দিল এই আন্দোলনে। ইংরেজদের

সম্বন্ধে পূর্বকথিত শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবে ভাঙন দেখা দিল শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই। এসময় থেকেই জাতীয় সত্তা সম্বন্ধে একটা সচেতনতা, নতুন একটা শক্তির প্রকাশ বাঙালি নিজের মধ্যে অনুভব করতে শুরু করেছে যা আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা বিকাশের প্রথম ধাপ অবশ্যই। যথার্থ পথ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে কিন্তু পথ খোঁজা যে শুরু হয়েছে তার চিহ্ন স্পষ্ট।

১৮৬১ তে রাজনারায়ণ বসু সুরাপান নিবারণী সভা ও জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় সমসাময়িক সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বড়ো রকমের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যেটিও কিনা শিক্ষিত বাঙালীকে নাড়িয়ে দিল। এবং সামগ্রিক ভাবে জাতীয়তাবোধ বিকাশের পথ যেন আরো সুগম হয়ে উঠল। আর এ সবই পরিণতি পেল নবগোপাল মিত্রের (১৩৬৭) হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার মধ্যে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে দুর্গতদের সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই এক একটা পদক্ষেপ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সাথে বাংলাকে যুক্ত করছিল। স্বাধিকার, আত্মনির্ভরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাঙালীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৭৬-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। উনিশ শতকে বাঙলায় যে জাগরণ ছিল মূলত হিন্দু-জাগরণ সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটা সর্বভারতীয় রূপ দিলেন। এই হিন্দু মেলা, আর ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনেরই পরিণতি জাতীয় কংগ্রেস।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সংস্কার-প্রতি সংস্কারে যে উতরোল হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয়ার্ধে তা পরিণত হল সমন্বয়ী আদর্শে। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সংস্কারবাদীদের সংশোধনস্পৃহা আর রক্ষণশীলদের ঐতিহ্য অনুরাগ সব মিলে মিশে একটা সমন্বায়িত সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস সে যুগের মনোভাবকেই ব্যক্ত করেছে। এরই বহিপ্রকাশ দেখা গেল সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই। শতাব্দীর এ অধ্যায়ের সমন্বয়ী সাধনার বাণীরূপ বঙ্কিমচন্দ্র।

এ সময়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ঢেউগুলো উঠছিল তাতে যে নামগুলি উঠে এল ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের নিরিখে সেগুলি হল কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু। সেখানে বহু মতবাদের চাপান-উতোর চলল বটে কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় জীবনের বিকাশে তারও সামাজিক ও নৈতিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব মুক্ত বিচার বুদ্ধি থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে হিন্দু ঐতিহ্যের নানা বিচারসহ যে চিন্তা ও অনুশীলন করলেন তারই বিবর্তিত রূপ পেলাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবতাবাদী ধর্ম-চর্চায়।

এইসব ঘটনার পাশাপাশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দু-একটি অন্য ঘটনার দিকে চোখ ফেরানো যাক। যেমন রেলপথ নির্মাণ ও রেলগাড়ি চালু হওয়া, কাঁচা ও পাকা সড়কের নির্মাণ। যানবাহনের উন্নতি, বস্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটাল, তার ফলে যে মুনাফা পাওয়া গেল তা অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য কাজে লাগান-হল। দ্রুত শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হতে লাগল। তার ফলও পাওয়া গেল। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের থেকে অর্থনীতি যে রসদ লাভ করল স্বাভাবিক ভাবে তার শুভ প্রভাব পড়লো সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল। প্রতিষ্ঠিত হল বহু স্কুল, কলেজ, নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, ডিগ্রীধারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রচলন, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ, ধর্মের ক্ষেত্রে নানা মতের সংঘাত ও নতুন মতের জন্ম ইত্যাদি নানা আলোড়ন-উত্থান ব্যক্তির মানসলোকে এমন রসায়ন ঘটাল যা আমরা আগে দেখিনি।

এখানে ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক। ১৮২৬ খ্রীঃ হিন্দু কলেজে শিক্ষক রূপে যোগদান করেন ডিরোজিও। আমরা জানি তাঁর শিক্ষা ছাত্রদের শুধু পাঠ্যবস্তুর সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে রাখল না, নানাবিধ বিষয়ে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলল আগ্রহ। তারা বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সাথে পরিচিত হল। তিনি চাইলেন ছাত্ররা হয়ে উঠুক শাণিত

তরবারির মত ক্ষুরধার মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী।

কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁর ভাবধারাকে বাস্তবে কতটা গ্রহণ করতে পেরেছিল তার শিষ্যরা। দেশের রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের কোন চিন্তা তারা করেনি, তারা শুধু তৎকালিন সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করেছিল এবং সেটাও যেন শুধু ভাঙনের নেশায়। গড়ার কোন লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা গেল না। উপরন্তু দেখা গেল ইংরেজ সরকারের কর্মচারী হয়ে, ধর্ম পরিত্যাগ করে কিংবা বক্তৃতা দিয়েই তাদের বিদ্রোহ শান্ত হয়ে গেল।

এখানে আরেকজনের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য-তিনি রামমোহন রায়। আমরা সবাই তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারা, প্রগতিশীলতা এবং সমাজসংস্কারমূলক কর্মধারার সাথে সুপরিচিত। তার বিস্তারিত আলোচনায় এখানে যাব না। শুধু কয়েকটি দিক তুলে ধরব যা যুগপরিবর্তনের সহায়ক। ১৮১৫ খ্রীঃ তিনি আত্মীয়সভা স্থাপন করে বেদান্ত ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচারের পথ উন্মুক্ত করলেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত চলল তাঁর ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা। যে সব রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি চাইলেন সমাজের বুকের ওপর জমে থাকা যুগসঞ্চিত অন্ধকারের অপসারণ। খুব স্বাভাবিকভাবেই তার যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ, আধুনিকতার পরিচয়বাহী আদর্শমূহ সে সমাজ বুঝতে পারল না এবং মেনে নিল না-বাঁধল যুদ্ধ-মসীযুদ্ধ। সে ইতিহাস আমাদের জানা। এখানে শিক্ষা বিষয়ে রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। ১৮১৭ খ্রীঃ গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দুকলেজ শুরু হয়েছিল। ১৮১৫ খ্রীঃ তার নিজস্ব বাসভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগটি রামমোহনই নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁর বীজ এবং তার পরিপূর্ণ বিকশিত না হতে পারা এ সব কিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

উল্লেখ্য যে, হেমচন্দ্রের জন্ম ১৭ই এপ্রিল, ১৮৩৮ খ্রীঃ অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ বাঙালী যখন আত্মবিকাশের পথ খুঁজছে, আর তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের

প্রকাশ হচ্ছে ১৮৬১ খ্রীঃ-এ।

২০৫.২.৫.২ : কবিমানস

হুগলী জেলার বল্লভঘাটে ৬ই বৈশাখ ১২৪৫ বঃ, ১৭ই এপ্রিল, ১৮৩৮ খ্রীঃ, মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন হেমচন্দ্র। পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা আনন্দময়ী দেবী, কবিরা ছিলেন ছয় ভাইবোন। তারমধ্যে তাঁর ভাই ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যে সুবিদিত তার 'যোগেশ' নামক রোমান্টিক আখ্যান কাব্যটির জন্য।

হেমচন্দ্রের বংশ অভিজাত হলেও পরিবারে অর্থসংকট ছিল। তাঁর মা তাঁর মাতামহের একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাঁরা মাতামহের বাড়িতেই থাকতেন। ছোটবেলায় ন'টি বছর তার কেটেছে রাজবল্লভ হাটে। সেখানকার শান্ত পল্লীপ্রকৃতির কোলে শান্ত ধীর ছেলেটির শিশুকাল অতিবাহিত হয়েছে। এখানেরই পাঠশালায় ভর্তি হন তিনি। বেশ খানিকটা হেঁটে পাঠশালায় যেতে হত। ছোট থেকেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

মাতামহ রাজচন্দ্র বল্লভঘাটের জমিজমা দেখাশোনার পাশাপাশি কলকাতার খিদিরপুরে মোক্তারি করে সংসার চালাতেন। মোটামুটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু বিধি বাম। হেমচন্দ্র ছোট থাকতেই মারা গেলেন রাজচন্দ্র। সংসারে দারিদ্র নেমে আসতে দেরী হল না। কবির পিতা কৈলাসচন্দ্রের সাংসারিক বুদ্ধি কোনদিনই ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি ব্যবসা করা শুরু করলেন বটে কিন্তু সে ব্যবসাও ভালভাবে করতে পারলেন না। এতগুলি ছেলে মেয়ে অতিথি অভ্যাগত নিয়ে সংসার চালাতে তার হিমসিম অবস্থা। অন্যদিকে কবি মাতাও ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং পরদুঃখকাতরা। সংসারে অভাবই হয়ে উঠল নিত্যসঙ্গী। হেমচন্দ্র এলেন কলকাতায়। সেখানে খিদিরপুরের এক পাঠশালায় কিছুকাল পড়াশোনা চলল। হেমচন্দ্রের যখন পনের বছর বয়স তখন তাঁর মাতা হিন্দু কলেজের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর শরণাপন্ন হলেন পুত্রের

ছোটখাট একটা চাকরির আশায়। প্রসন্নকুমার, যিনি পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি কিন্তু হেমচন্দ্রকে দেখেই তাঁর ভিতরে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছাত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারলেন। তিনি নিজেই তার পড়াশুনোর ব্যয়ভার বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি অধ্যক্ষ সাটক্লিফকে জানালেন ছাত্রটির মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তির পরিচয় তিনি পেয়েছেন। অতঃপর হেমচন্দ্রের ভাগ্যের দরজা খুলে যেতে দেরি হল না। তিনি হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন (১৮৫৩ খ্রীঃ)। এইখানে ধীরে ধীরে হেমচন্দ্র পরিচিত হতে লাগলেন নতুন এক পৃথিবীর সঙ্গে। অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের বহু কৃতি সন্তানের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তার পরিচয় ঘটতে লাগল। অন্যদিকে প্রসন্নকুমারের সহায়তায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠগ্রহণ চলতে লাগল সঠিক পথে। অন্যান্য অধ্যাপকরাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন বলে জানা যায়। পড়াশোনায় তাঁর মনোযোগের কথা পূর্বেই বলেছি। অক্লান্ত পরিশ্রমও তিনি করতে পারতেন। আসলে তিনি ছিলেন অভাবী সংসারটির জ্যেষ্ঠ সন্তান। যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে তা তিনি কখনোই বিস্মৃত হননি। অধ্যাপকদের কাছে ছাড়া বন্ধুবান্ধব মহলেও তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল।

১৮৫৪ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ এই দুটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। যাইহোক ১৮৫৫ খ্রীঃ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় হেমচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান পেয়ে মাসিক দশটাকা বৃত্তি লাভ করেন।

এই সময়ে হেমচন্দ্রের বর্ণনা দিয়ে সমালোচক লিখছেন-"উচ্চতর শিক্ষার রুদ্ধদ্বার করাঘাত করিবার পূর্বেই হেমচন্দ্রের জন্য উন্মুক্ত হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; ঊষার আলো আঁধারি দূর হইয়া গিয়াছে, নবারুণ রাগে ভবিষ্যত দিগন্ত সোনার তুলিতে ভাবীকালের মধুর চিত্র রচনায় বিভোর। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন সর্ব অবয়বে পরিস্ফুট, যৌবনের দীপ্তি সংযত শালীনতায় প্রকাশমান,

উদ্ধত চাপল্য নাই একটা কঠিন নিয়মের নিগড়ে যেন দেহ মন নিয়ন্ত্রিত।”

বই পাঠরত অবস্থাতেই পিতা মাতার কথায় তিনি বিবাহ করলেন ভবানীপুরের কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কামিনী দেবীকে।

সংসার যত বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকভাবে তার দায়ভারও প্রবল হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে পড়তেই ১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি শিক্ষকতার পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। যাইহোক এ চাকরি তিনি তখন গ্রহণ করেননি। ১৮৫৭ খ্রীঃ তিন ‘সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিলেন এবং চতুর্থ হয়ে পঁচিশ টাকা বৃত্তি পেলেন। এই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই বছরই সর্বপ্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হল। হেমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় অন্য যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের নামও স্মরণীয়-তারা হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য কৃষ্ণকমল প্রমুখ। অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও হেমচন্দ্রের অধ্যবসায় আমাদের চমকিত করে। এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেশবচন্দ্র সেন কলেজে তর্কসভা চালু করেছিলেন। এমনি এক তর্কসভায় হেমচন্দ্র ‘শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত’ পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটি রেভারেন্ড লঙের এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি এটি প্রকাশ করেছিলেন। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির মুক্তাঙ্গনে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। সংসারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করাটা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। তিনি তখন কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র (১৮৫৯ খ্রীঃ)। তাকে কাজের সন্ধান করতেই হল। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরি গ্রহণ করলেন হেমচন্দ্র। যতটুকু জানা যায় পড়াশুনো পরিত্যাগ করে সংসারের জন্য চাকরি করতে হলে তা তিনি সানন্দেই করেছিলেন, প্রিয়জনের জন্য কিছু করাটা তার কাছে আপন স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক ছিল।

কিন্তু পড়াশুনোও ছিল তার গভীর ভালবাসার জায়গা। চাকরির ফাঁকে ফাঁকেই

চলল তার বি, এ পরীক্ষার প্রস্তুতি। ১৮৫৯-এ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হলেন বি, এ পরীক্ষায়। মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে তাকে 'A real B.A' বলে সম্বোধিত করলেন।

১৮৫৯-এ কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। হেমচন্দ্র পূর্বের চাকরি ছেড়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে এই স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক হলেন বিদ্যাসাগর। 'মেট্রোপলিটান ইনস্ষ্টিটিউসান' নামে পরে এটি পরিচিত হয়। হেমচন্দ্র শিক্ষকতা করে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর তার শিক্ষকতার প্রশংসা করতেন। এই সময় কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়িতে তার পুত্রদের গৃহশিক্ষক রূপে তিনি যেতে শুরু করেন।

মানুষের জীবনের কোন বাঁকে কি অপেক্ষা করে থাকে তা কেই বা জানে! রমাপ্রসাদ রায়ের সাথে হেমচন্দ্রের এই যোগাযোগ তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তন করে দিল। রমাপ্রসাদের আইনজীবী রূপে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা তাকেও এই পেশার দিকে আকর্ষণ করল। তিনিও আইনশাস্ত্র পাঠ করা শুরু করলেন। চাকরী, গৃহশিক্ষকতা ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে আইন বিষয়ক পড়াশোনা করার জন্য তিনি কলকাতার চাঁপাতলার মেসে' পর্যন্ত থেকেছিলেন। যাইহোক তাঁর মতো মেধাবী, মনোযোগী মানুষ নিশ্চয় আইনশাস্ত্র পাঠে ফাঁকি দেননি, কিন্তু পরীক্ষার ফল ভাল হল না তিনি বি, এল. পরীক্ষায় (১৮৬১) উপযুক্ত নম্বর পেলেন না এবং ঐ ডিগ্রীও পেলেন না। তবে এল. এল উপাধি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন। পরে অবশ্য ত্রিশ টাকা ফি দিয়ে তিনি বি, এল উপাধি (১৮৬৬ খ্রীঃ) লাভ করেন। এই ১৮৬১ সালেই প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী'।

এল, এল উপাধি পাওয়া হেমচন্দ্র এবার হাইকোর্টে আইনব্যবসায় যুক্ত হলেন আইনজীবী হিসাবে। ১৮৬২ খ্রীঃ তিনি স্বাধীন আইনব্যবসা ছেড়ে মুন্সেফ রূপে প্রথমে হাওড়া এবং শ্রীরামপুরে কিছুকাল চাকরী করেন। এই সময় তিনি হে এন্ড কোম্পানীর

অনুরোধে আইন বিষয়ক গ্রন্থ Narton's Law of Eviedence.গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন 'নিদর্শন তত্ত্ব' নামে এবং প্রায় দুহাজার টাকা পারিশ্রমিক পান। আর একটি বিষয়ও উল্লেখ্য, তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ বিভাগে পাঠ্য হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু কাব্য। প্রবল দেশপ্রেমই এই কাব্যের পটভূমি। হেমচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই মুন্সেফের চাকরী ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করলেন (১৮৬৬)। হয়তো অর্থ কিংবা, যশের জন্য তিনি বিচারক হয়েছিলেন কিন্তু সেই কাজে তিনি কোন আনন্দ পেলেন না। বিচারক হিসাবে তিনি কৃতিত্বও দেখাতে পারেন নি। বরং সংবাদপত্রে তাঁর বিরূপ সমালোচনাই প্রকাশিত হয়েছিল।- "হাওড়ার মুন্সেফী আদালতটি....ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছে...এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফী আসন অধিকার করিয়াছেন। ইনি উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক ইহার দ্বারা সদ্বিচার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার একটী কার্য্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। -সাত্রাগাছি"

আবেগপ্রবণ কবিস্বভাবের মানুষ হেমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ সমালোচনা সহ্য করা সত্যই অসম্ভব ছিল। তিনি যথার্থ ভাবেই বিচারকপদ পরিত্যাগ করে আবার ওকালতি শুরু করলেন। একাধারে কবি এবং উকিল হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। শোনা যায় এ সময়ে তাঁর দৈনিক আয় দু হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল। সে যুগের বিচারে যা সত্যই চমকপ্রদ।

কাব্যের কথায় ফিরে যাই। আমরা পূর্বেই বলেছি হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী'। এই কাব্যখানি সৃষ্টির পেছনে একটি ঘটনা ছিল। ১৮৬০ খ্রীঃ নাগাদ আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকলম ভট্টাচার্য্য আত্মহত্যা করেন। হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষও আত্মহত্যা করেন। যে আশা ও উদ্দীপনা সে যুগের যুবক সম্প্রদায় দেখেছিল তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি সেই হতাশা তাদেরকে ঠেলে

দিচ্ছিল নিজেদেরকে শেষ করে দেওয়ার পথে। এই পরিণাম হেমচন্দ্রকে খুবই ব্যথিত করেছিল যার আবেগ-মথিত প্রকাশ “চিন্তাতরঙ্গিনী’। যদিও কাব্যগ্রন্থটিতে উচ্ছ্বাসের বন্যায় বাকি সব কিছুই ভেসে গেছে তবু হেমচন্দ্রের এই প্রথম প্রয়াসে যুগের যে পরিচয় ধরা আছে সেখানেই এই কাব্যখানির মূল্য নিহিত আছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রকাশিত ‘বীরবাহু’ কাব্যের ভূমিকায় হেমচন্দ্র অকপটভাবে স্বীকার করেছিলেন “জন সমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে” তিনি এই কাব্য লিখেছিলেন। এই কাব্যে একটি কাল্পনিক গল্পের মাধ্যমে কবি দেশপ্রেমের মশাল জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন। এখানে কাণ্যকুব্জের যুবরাজ বীরবাহু পরাজিত করেছে এক পাঠান নরপতিকে। বীরবাহুর দেশের মুক্তির জন্য কামনা, তার দেশপ্রেম, ব্যথিত চিত্ত প্রকাশের ভাষা সবই উনিশ শতকের যুবক চিত্তকে প্রতিবিম্বিত করেছে। সে যুগের শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই ভেতরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতার সমন্বয় ঘটছিল যার যার নিজের মতো করে। হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও দেখব একদিকে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলালের প্রভাব যেমন পড়েছে তার সৃষ্টিসত্তায় তেমনি ইংরেজী গীতিকবিতার অন্তর্লীন ধারাটিও এসে মিশেছে সে কাব্যপ্রবাহে।

‘বীরবাহু’ প্রকাশের পর বেশ কিছুকাল হেমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টি করেননি। বাইরের জীবনে নানা কাজের চাপে হয়তো সারস্বত সাধনা সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু মনের ভেতরে নিঃশব্দে নিশ্চয়ই দেবীর আরাধনা চলেছিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ কবি হেমচন্দ্রকে পেলাম নাট্যকার রূপে। ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হেমচন্দ্র সেক্সপীয়রের ‘টেম্পেষ্ট’ নাটকের অনুবাদ করেন নলিনী বসন্ত’ নামে।

এডুকেশন গেজেট ও তার বিখ্যাত সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা আমরা জানি। এই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে হেমচন্দ্রের। ‘এডুকেশন গেজেট’ তার কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। হেমচন্দ্রের কবি জীবনের এ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এডুকেশন গেজেটে ‘হতাশের আক্ষেপ’ (১৮৬৯) নামে কবিতাটি

প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত হেমচন্দ্রের প্রায় ২০টি কবিতা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত কবিতা হেমচন্দ্রের পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই পত্রিকার পাতাতে প্রকাশিত 'ভারত-বিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' সে যুগের বিখ্যাত কবিতা যার মধ্যে নিহিত দেশপ্রেমের বাণী মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। শোনা যায় হেমচন্দ্র প্রথমে 'ভারত-সঙ্গীত' লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠান কিন্তু ভূদেব এ জাতীয় কবিতা প্রকাশ না করার জন্য হেমচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। হেমচন্দ্র তখন 'ভারত-বিলাপ' লেখেন। পরে অবশ্য 'ভারত-সঙ্গীতও ছাপা হয় এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সংশয় কে বাস্তবে পরিণত করে ইংরেজ সরকার সম্পাদকের কৈফিয়ৎ তলব করেন। ভূদেব অবশ্য কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন যে সরকারী রিপোর্টার ছিল সেই রবিনসনের অনুবাদের ত্রুটি দেখিয়ে অব্যাহতি পান। 'এডুকেশন গেজেটে'র পাশাপাশি 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাতেও হেমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। 'ইন্দ্রের সুধাপাত্র' কবিতাটি তারমধ্যে প্রথম প্রকাশিত কবিতা। 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর এগারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়' শীর্ষক কবিতা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কবিতা কামিনী কুসুম'। এই বঙ্গদর্শনের পাতাতেই মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে হেমচন্দ্রের লেখা 'স্বর্গারোহণ' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। আর একটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১২৮১ সালের ১৮ই পৌষ বঙ্গদর্শনে অসম্পূর্ণ 'বৃত্রসংহার (১১টি সর্গ) প্রকাশিত, ঠিক তার পরবর্তী মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যটির সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেট' ও 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিকে নিয়ে প্রকাশিত হয় কবিতা সংকলন 'কবিতাবলী' (১৮৭০)।

১৮৬৯-৭০-এই সময়টি কবি হেমচন্দ্রের জীবনের খুবই সুসময়। তিনি তখন হাইকোর্টের প্রথিতযশা উকিল। প্রভূত বিত্ত, প্রচুর নাম। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাঁর সাহিত্য তরণী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। যদিও পরিণত বয়সেই তিনি মারা

গেলেন, হেমচন্দ্র কিন্তু পিতৃবিয়োগে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর সনাতন হিন্দুধর্ম মেনে তাঁর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করলেন। শুধু তাই নয়, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে পিতৃতর্পণ প্রভৃতিও সম্পন্ন করলেন। কেশবচন্দ্র সেন,হেমচন্দ্রের এই সংস্কারকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন যে হেমচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা উচিত অথচ তিনি তা না করে হিন্দুর কুসংস্কার ও আচার-বিচার মেনে চলেছেন। এতে তিনি নিজেই তার বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করছেন। বলাবাহুল্য এ হেন বক্তব্যে হেমচন্দ্র খুশী হননি। এর বিরুদ্ধেই তিনি লিখলেন Brahmo Theism in India (১৮৬৯ খ্রীঃ)।

১৮৭৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর আসা উপলক্ষে বহু খ্যাত অখ্যাত কবি কবিতা লিখলেন। একদা যে কবি ‘ভারত সঙ্গীত’ লিখেছিলেন তিনিও এ ঘটনা উপলক্ষ্যে লিখলেন ‘ভারত-উচ্ছ্বাস। এ কবিতা রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্যই লিখিত সন্দেহ নেই কিন্তু তার মধ্যেও হেমচন্দ্র অতীত ভারতের গৌরবকে যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি ভারতবাসীর দুঃখ বেদনার কথাও তুলে ধরেছেন। হাইকোর্টের জুনিয়র গভর্মেন্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যুবরাজ বন্দনার উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হেমচন্দ্র লেখেন ‘বাজিমাৎ’। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম সবসময়ই প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। দেশবাসীর অত্যাচারিত শোষিত অবস্থা তাকে পীড়া দিয়েছে সে কথার প্রকাশ যেমন আছে কবিতায়, তেমনি তাঁর প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয়ও আমরা পাই, কখনো আবার ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে দিয়েও প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দেশাত্মবোধ।

১৮৭৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় হেমচন্দ্রের ‘আশাকানন’। প্রকাশক ছিলেন হাইকোর্টের আইনজীবী উমাকালী মুখোপাধ্যায়। তিনি এই কাব্যটির জাতিবিচার করে কাব্যখানিকে ‘সাঙ্গরূপক কাব্য’ বলেছেন। কাব্যখানি দশটি কল্পনায় বিভক্ত। স্বপ্নে মোহিনীবেশধারী আশার সঙ্গে পরিভ্রমণ করতে করতে মানুষের বিচিত্র প্রবৃত্তির সাথে

সাক্ষাৎ হয়েছে। যখন আগুনে নৈরাশ্যকে নিক্ষেপ করে হতাশা থেকে মুক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছে তখনি কবির ঘুম ভেঙে গেছে। এ কাব্যের বিষয় এমনি। এইসময় হেমচন্দ্র একদিকে যেমন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডব্লিউ, সি ব্যানার্জী, উমাকালী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে সাহিত্যালোচনা করছেন, অন্যদিকে এই সময়কার প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ন্স, ইন্ডিয়ান লীগ', 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতির সাথেও রয়েছে তার যোগাযোগ। তবে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে তাকে কখনো অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

আমরা পূর্বেই বলেছি 'বৃত্রসংহার' (অসম্পূর্ণ) প্রকাশমাত্রেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তার সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হল এর আরো ১৩টি সর্গ। বাঙালী সারস্বত সমাজ মধুসূদনের যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া গিয়েছে মনে করে চমৎকৃত হয়ে উঠল।

মহাকাব্য রচনায় হেমচন্দ্রের খ্যাতি জুটলেও তার প্রতিভার মূল সুরটি বাঁধা ছিল গীতিকবিতার তারেই। উনিশ শতকের কবিকূলের দিকে তাকালে এমনটিই বারেবারে দেখতে পাব। তাঁরা যতই মহাকাব্য রচনার কথা ভাবুন না কেন বাঙালী যে মূলত গীতিপ্রাণ সে কথাই যেন বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

'বৃত্রসংহারের' জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখেও বলা যায় হেমচন্দ্র মূলত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁর গীতিকবিতাগুলির জন্যই। তাইতো দেখি এই সময়কালে তাঁর 'কবিতাবলী'র তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে। সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশ করা শুরু করলে হেমচন্দ্রও কবিতা প্রকাশ করলেন। এইসময় কবি একের পর এক গীতিকবিতা লিখছেন। 'কাশী দৃশ্য', 'শিশুর হাসি', 'গঙ্গার মূর্তি', 'চিন্তা', 'গঙ্গা', 'বিন্ধ্যগিরি', 'মণিকর্ণিকা ইওরোপ এবং আসিয়া', 'পদ্মফুল', 'রেলগাড়ী', 'বিশ্বেশ্বরের আরতি, 'বাঙ্গালীর মেয়ে' এই কবিতাগুলি নিয়ে কবিতাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৮৮০ খ্রীঃ)। কবিতাগুলিতে একদিকে যেমন আছে কোমল গীতিপ্রাণতা অন্যদিকে

তেমনি সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতিও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ড কবিতাবলী প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হল হেমচন্দ্রের আর একখানি কাব্যগ্রন্থ ছায়াময়ী', দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' অনুসরণে এটি রচিত। গ্রন্থখানি সাতটি পল্লবে' বিভক্ত। যদিও তিনি নিজেই কাব্যখানিতে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র ভূমিকা স্বীকার করেছেন তথাপি তিনি নরক বর্ণনা ইত্যাদিতে প্রাচ্য সংস্কারকেই অনুসরণ করেছিলেন। এখানে দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে কবির শিল্পীসত্তা অপ্রকাশিত থাকেনি।

মানুষের জীবন সবসময় একইভাবে চলে না। বিশেষত ব্যবসা কিংবা আইনব্যবসাতেও ওঠাপড়া থাকে। জীবিকার ক্ষেত্রে যে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন হেমচন্দ্র তাতে যেন ভাটার টান শুরু হল। নাম যশ আগের মত থাকলেও তার আয় আগের মত হচ্ছিল না। এদিকে হেমচন্দ্রের ব্যয়ের হাতটিও ছিল প্রবল। প্রচুর দানধ্যানও করতেন তিনি। আয়টি যে আগের মতো নেই সেই দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন না। ভেতরে ভেতরে ক্ষয় শুরু হয়েছে। তা যেন তিনি বুঝতেই চাইলেন না। এই সময়ের একটি উল্লেখ্য ঘটনা হল কবির জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা শ্যামাচরণের দৌহিত্রী ইচ্ছাময়ীর বিয়ে।

১৮৮২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'। কাব্যটির বিষয়বস্তু পৌরাণিক আখ্যান। তবে কবি নিজে এটিকে আখ্যান না বলে কবিতা বলতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন -"পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি।" কালি, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি চামুন্ডাতন্ত্রে' উল্লিখিত আদ্যাশক্তির দশটি রূপের সাহিত্যিক ব্যাখ্যা করেছেন কবি। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি পৌরাণিক কাহিনীকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন-"He also tried to explain Puranic religion and culature by

means of European logic, philsophy and history" যে যুগের শিক্ষিত মানুষ হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্যকে যে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল এ যেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বটে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে হেমচন্দ্র মূলত কবি, তিনি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনটিই নন। তাই হয়তো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্বই তিনি শেষপর্যন্ত দাঁড় করাতে পারেন নি বরং সেই তত্ত্ব কথার অলিগলিতে কবি প্রতিভা মাথা খুঁড়ে মরেছে। সবশেষে শিবের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলিটুকু যেন সেই খুঁজে ফেরা থেকে একটু মুক্তি। পাশাপাশি দেখব এই সময়কার ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখছেন হেমচন্দ্র যেমন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন ছাত্রীর উপাধি প্রাপ্তি কিংবা ইলবার্ট বিল আন্দোলন। এই আন্দোলন তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হল অনৈতিক ভাবেই। ক্ষুব্ধ কবি লিখলেন 'মন্ত্রের সাধন' নামক কবিতা -

"শিখিবে ভারত-শিখিবে একথা
চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা
একদিকে কোটি প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তার।"

'রীপন-উৎসব-ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' নামক কবিতাতে হেমচন্দ্র এক অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা যেন বলতে চেয়েছিলেন, তারই পরিণতি রূপ যেন 'ভারত-তীর্থ' ও 'জন-গণ-মন' তে আমরা দেখতে পাব। এই সময়েই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন করেন এবং তার প্রথম সভাপতি হন। উমেশচন্দ্রের সাথে যে হেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল সেকথা আমরা আগেই বলেছি। 'নবজীবন', 'প্রচার' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও এই সময় লেখা বেরোচ্ছে হেমচন্দ্রের।

এবার তাকানো যাক হেমচন্দ্রের অন্তঃপুরে। যৌবনের একেবারে শুরুতে মা বাবার আদেশে তিনি যে বিবাহ করেছিলেন তা বোধহয় সুখী দাম্পত্য গড়ে তুলতে পারেনি। কামিনী দেবী একেবারেই লেখাপড়া জানতেন না। গুছিয়ে সংসার করার

দক্ষতাও তাঁর ছিল না। প্রচুর অর্থ সম্পদ রোজগার করলেও সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। বহু আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত সংসারে ঝামেলাও কম ছিল না, কবি-পত্নী সে সব সামলাতে পারতেন না, সামাজিক কর্তব্য ইত্যাদি পালনেও তিনি অপারগ ছিলেন। কবিকেই সে সব সামলাতে হয়েছে। তাঁর পুত্র সন্তানরাও তাঁর আশানুরূপ মানুষ তো হয়ইনি বরং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পথে চলে গিয়েছিল। এ সব নিয়ে কবির মনোকষ্ট তো ছিলই উপরন্তু বৃহৎ পরিবারে রোগ-ব্যাধি মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবে বার বার হানা দিয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীঃ মারা গেলেন কবি জননী। তারপর থেকে একের পর এক বন্ধু-বিয়োগ, আত্মীয়-বিয়োগ ঘটেই চলল হেমচন্দ্রের জীবনে। মারা গেলেন হেমচন্দ্রের পরম বন্ধু মহেশ চৌধুরী। ১৮৯১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু, ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব চৌধুরীর পরলোকে গমন হেমচন্দ্রকে গভীর আঘাত দিয়েছিল। পরিবারেও যেন মৃত্যুর মিছিল। পরপর মারা গেলেন কবির তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র ও তার স্ত্রী, কবির কনিষ্ঠ পুত্র মারা গেল তার বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই, কবি ভ্রাতা সাহিত্যিক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন আত্মহত্যা। একের পর এক শোকে বিপর্যস্ত কবি চোখে কম দেখতে শুরু করেছেন। এমন সময় তার পত্নীরও উন্মাদ রোগ দেখা দিল। তবে এরমধ্যে কবির জীবনে একটি ভালো ঘটনাও ঘটে যা তাকে কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছিল। ১৮৯০ খ্রীঃ তিনি হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি এক বিরাট প্রীতিভোজেরও আয়োজন করেছিলেন। ১৮৯৫ তে প্রকাশিত হল 'রোমিও-জুলিয়েত। গতানুগতিক অনুবাদ এটি, প্রতিভার কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৮৯৭ খ্রীঃ হেমচন্দ্রের চোখে অস্ত্রোপচার হল কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না। অন্ধত্ব যেন তাঁর চোখ শুধু নয় সমস্ত জীবনেরই আশার দীপগুলো একে একে নিভিয়ে দিচ্ছিল। খিদিরপুরে আঢ্যদের রোকড়ের দোকানে বেশ কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন হেমচন্দ্র সে অর্থও পেলেন না তিনি। এমতাবস্থায় ১৮৯৮ খ্রীঃ গেলেন বারাণসী। সেখানে গিয়ে কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন কবি। তাঁর মনের এই সময়ের করুণ অবস্থাটি

ধরা রইল একুশটি গীতিকবিতায় যা প্রকাশিত হল 'চিত্তবিকাশ' নামে। তার হৃদয়ের দুঃখ দেশবাসীর হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল।

১৮৯৯ খ্রীঃ চাকরি ছেড়ে দিলেন হেমচন্দ্র। আবারও মৃত্যু এসে দাঁড়াল সামনে। স্নেহবৎসল কবির সামনেই মারা গেল বোন নৃত্যকালী। পরম বন্ধু রমেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হল। তার মৃত্যুতে কবি লিখলেন 'এবে কোথা চলিলে'। এটিই কবির প্রকাশিত কবিতার মধ্যে শেষতম।

হেমচন্দ্র তার 'চিত্তবিকাশে' নিজের করুণ অবস্থাকে এমনভাবে চিত্রিত করেছিলেন যে দেশবাসী বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষত মধুসূদনের পরিণতির স্মৃতি তখনো টাটকা। তরুণ রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন হেমচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য। মূলত তারই প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজনীর রানী অভয়েশ্বরী দেবী, কাশিমবাজারের রাজা, কোচবিহারের রাজা, কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ মল্লিক রায়বাহাদুর তাকে মাসোহারা প্রদান করে সাহায্য করেন। কিন্তু এখানে যেকথা বলার সেটি হল কবির অবস্থা বাস্তবিক এতটা খারাপ হয়নি। তার বিষয় সম্পত্তি তখনো অনেকই ছিল। তাঁর ভাই কাশীর ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। চোখের অন্ধত্ব তাঁর আত্মসম্মান বোধের ওপরও বোধহয় কালোছায়া বিস্তার করেছিল। তার এহেন ব্যবহারে তার ভাই পূর্ণচন্দ্র, তাঁর বড়ো মেয়ে খুবই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। যাইহোক দেশবাসী সকলের চেষ্টায় ১৯০০ খ্রীঃ থেকে তার জন্য সরকার থেকে মাসিক ২৫ টাকা অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। .

তবে দুর্ভাগ্য কবির জীবনকে একেবারে গ্রাস করতেই উদ্যত হয়েছিল। মারা গেল তার বড়ো মেয়ের ছেলে প্রবোধ এবং উক্ত ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র যিনি কবিকে খুবই সাহায্য করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। ১৯০২-এ মারা গেল কবির অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ কন্যা। এভাবেই বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে নিঃশ্বাস বায়ুটুকুর প্রয়োজন তা যেন ফুরিয়ে আসতে লাগল একেবারেই। বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা হয়ে উঠল কবির কাছে। অবশেষে ১৯০৩ খ্রীঃ ২৪ শে মে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

একক ৬ – উৎস ও সর্গ বিন্যাস

বিন্যাসক্রম

২০৫.২.৬.১ : সূচনা

২০৫.২.৬.২ : উৎস

২০৫.২.৬.৩ : সর্গ বিন্যাস

২০৫.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.২.৬.১ : সূচনা

বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় তাঁর সৃষ্ট বৃত্রসংহার' কাব্যটির জন্য। কাব্যটি প্রকাশের পরে এটিকে ঘিরে উচ্ছ্বাস এবং পরবর্তীতে তার ত্রুটি নির্ধারণ করে মত প্রকাশ দুইই প্রবল ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়েছিল। 'বৃত্রসংহার' প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ১৮৭৪ খ্রীঃ (১২৮১ বঙ্গাব্দ)। এই খণ্ডে ছিল ১১টি সর্গ। এই খণ্ডটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এর সমালোচনা প্রকাশ করেন (মাঘ, ১২৮১)। হেমচন্দ্রের প্রশংসা এর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। মধুসূদনের মৃত্যুর (১৮৭৩ খ্রীঃ) পর বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র, ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, -

"কিন্তু বঙ্গকবি সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।"

১৮৭৭ সালে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হল বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৭৮ খ্রীঃ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় বলা হল,-"এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত।"

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার' কাব্যে প্রবেশের পূর্বে আমরা হিন্দুপুরাণের বিভিন্ন কাহিনীর দিকে একবার নজর দেব। ঋগ্বেদে বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধকাহিনী সুত্রের আকারে যেভাবে বর্ণিত আছে তা অনেকটা নিম্নরূপ-

১। ইন্দ্র পর্বতস্থিত অহিকে হনন করেছিলেন; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। তারপর যে রূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করেছিলেন ২। ইন্দ্র বৃষের মত বেগের সঙ্গে সোম গ্রহণ করেছিলেন। তিন প্রকার যজ্ঞে অভিযুত সোমপান করেছিলেন। মঘবান্ সায়ক বজ্র গ্রহণ করেছিলেন ও তার দ্বারা অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করেছিলেন। ৩। যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করলে, পর সূর্য ও ঊষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করে আর শত্রু রাখলে না। ৪। জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করে বিনাশ করলেন, কুঠার ছিন্ন বৃক্ষ স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া আছে। ৫। দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করে) মহাবীর ও মহাবিনাশী ও শত্র-বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। ইন্দ্রের বিনাশ কার্য থেকে রক্ষা পেল না, ইন্দ্র শত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হলেন) নদী সমুদয় পিষে ফেলল। ৬। হস্ত পদশূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করল, ইন্দ্র তার জানুতে বস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন। যেরূপ পুরষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করতে বৃথা চেষ্টা করে বৃত্রও সেইরকম বৃথা চেষ্টা করলেন এবং বহুস্থানে ক্ষত নিয়ে ভূপতিত হল। ৭। ভাঙা তীর কে অতিক্রম করে নদ যেমন করে বহে যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করে যাচ্ছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করে রেখেছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করল। ৮। বৃত্রের মাতা তির্যকভাবে থাকলেন তখন ইন্দ্র তার অধ্যোভাগে অস্ত্রাঘাত করলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রইল তারপর বৎসের সাথে ধেনুর মতো বৃত্রের মাতা দনুও শুয়ে পড়ল।”

বেদব্যাসের মহাভারতের বনপর্বে বৃত্রাসুরের প্রসঙ্গ আছে। সে কাহিনী খানিকটা এইরকম—"সত্যযুগে কালকেয় নামে দুর্দান্ত দানবগোষ্ঠী বৃত্রাসুরকে অধিপতি করে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র আয়ুধ নিয়ে গজেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করেছিল। অমর দেবতাগণ তখন পুরন্দর কে সামনে রেখে করজোড়ে ব্রহ্মার আরাধনা করলেন। তখন ভগবান কমলাসন দেবগণকে বললেন-হে দেবগণ আমি তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হয়েছি। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কিভাবে তোমরা বৃত্রাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবে। দধীচি বলে এক বিখ্যাত উদাবরী মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে তার কাছে গিয়ে বর প্রার্থনা কর। সেই ধর্মাত্মা যখন খুশী মনে বরপ্রদান করতে উদ্যত হবেন তখন তোমরা তাঁকে বলবে, আপনি, ত্রিলোকের হিতের জন্য নিজের অস্থি প্রদান করুন। তখন তিনি অস্থি প্রদান করার জন্য নিজের শরীর পরিত্যাগ করবেন। তার দ্বারা সহস্র ভীমগর্জন সমন্বিত সুদৃঢ় বজ্র নির্মিত হবে। পুরন্দর সেই বজ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করবেন। আমি যা বললাম তোমরা সেইমত কার্য অনতিবিলম্বে সমাধা কর।

তখন দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে সরস্বতী নদীর ধারে দধীচ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে নানাবিধ তরুরাজি গুল্ম লতা অপূর্ব সৌন্দর্য্য রচনা করেছে সেখানে ষটপদসমূহের সঙ্গীতধ্বনি যা কিনা সামগানের মতো তা জীবজ্জীবক ও পুস্কোকিলকুলের কলরব সহ উত্থিত হচ্ছে, সেখানে মহিষ, বরাহ, সূমর ও চরগণ শার্দুলের ভয় পরিত্যাগ করে নেন। কমলমনি কমতে কমতে করেরেণুকার সঙ্গে ক্রীড়া করছে, সেখানে গুহাকরে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য বনচর প্রাণীরা ঘনঘটার ন্যায় গর্জন করছে। দেবতাগণ সেই স্বর্গসদৃশ শশাভায় পরিপূর্ণ আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন প্রভাকরের মতো প্রভাবান ঋষি দধীচ স্বয়ং ব্রহ্মার মতো দীপ্যমান কলেবরে বিরাজ করছেন। তখন দেবতাগণ তাঁর চরণ গ্রহণ করে অভিবাদন করে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট বর প্রার্থনা করলেন।

দধীচমুনি দেবতাগণের প্রার্থনা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন,-"হে

দেবগণ! আমি প্রাণ পরিত্যাগ করেও আপনাদের উপকার করব; কোনক্রমেই অভিলষিত বরপ্রদানে বিরত থাকব না।" এই কথা বলে মহর্ষি প্রাণ ত্যাগ করলে দেবতাগণ তার অস্থিসকল গ্রহণ করলেন। তারপর তারা জয়লাভ নিশ্চিত করতে হৃষ্টচিত্তে বিশ্বকর্মার নিকটে এসে নিজেদের প্রয়োজন জানালেন। বিশ্বকর্মা তা শোনামাত্রই অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে যত্ন সহকারে দধীচ মুনির অস্থি দ্বারা অতিশয় উগ্রকান্তি ভীষণ দর্শন এক বজ্র নির্মাণ করে পুরন্দরকে বললেন, হে দেবরাজ ইন্দ্র! এই বজ্রদ্বারা ভীষণ সুরারিগণকে নিধন করে স্বগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় স্বর্গরাজ্য নির্বিবাদে শাসন করুন। এরপর পুরন্দর আনন্দিত হয়ে বিশ্বকর্মার কাছ থেকে বজ্রগ্রহণ করলেন।

বজ্রগ্রহণ সমাপ্ত হলে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করবার জন্য যাত্রা করলেন। যত শক্তিশালী দেবতাগণ ছিলেন তারা ইন্দ্রের রক্ষার জন্য নিযুক্ত হলেন। এদিকে বৃত্রাসুর স্বর্গমর্ত্য অধিকার করে রয়েছে। মহাকায় কালিকেয়গণ শৃঙ্গধারী শৈলরাজের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করে তার চতুর্দিক রক্ষা করছে।

এরপর দেবতা আর দানবের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। বীরগণ ভীষণাকৃতি খড়্গ উত্তোলন করে পরস্পরের উপর আঘাত করতে লাগল, সেই খড়্গ বিপক্ষের শরীরের উপর পড়া মাত্রই ভীষণ শব্দ উত্থিত হতে লাগল এবং বীরগণের সমস্ত মাথা গাছ থেকে খসে পড়া তাল ফলের মতো ধরাতলে পড়তে লাগল।

এই ঘোর সংঘর্ষে কালের দানবগণ হেমকবচ পরে পরিঘাস্ত্র নিয়ে দাবদগ্ধ পর্বতের ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করল। অসুরেরা এত বেগে এত দর্পের সাথে দেবতাদিগের দিকে ধাবিত হল যে দেবতারা সেই বেগ সহ্য করতে না পেরে ভয়ে ইতস্ততঃ পালাতে লাগলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র দেখলেন বৃত্রাসুরের শক্তি উত্তরোত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে আর দেবতারা ভয়ে পলায়ন করছে। এই দেখে তিনি মুচ্ছিত অবস্থায় পতিত হলেন এবং নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। তখন ভগবান বিষ্ণু তাঁর এই মোহাবিষ্ট অবস্থা পরিদর্শন করে স্বীয় তেজ তাকে প্রদান করে তার বলবর্ধন করলেন।

নারায়ণের এরকম কার্য প্রত্যক্ষ করে তখন তাঁরাও নিজ নিজ তেজ ধারণ করলেন। এইভাবে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বিষ্ণুর দ্বারা প্রযত্ন পেয়ে সকল দেব ও ঋষিগণের সাথে মিলিত হয়ে অধিক বলবান হয়ে উঠলেন।

বৃত্রাসুর ইন্দ্রের এইরূপ শক্তিবৃদ্ধি প্রদর্শন করে ক্রুদ্ধ হয়ে অতিভীষণ সিংহগর্জন করতে লাগলেন। সে গর্জনে মহীতল, দিকসকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হতে লাগল। দেবরাজ সেই ভীষণ গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে বধ করার জন্য কুলিশ নিক্ষেপ করলেন। কাঞ্চনমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র ইন্দ্র প্রযুক্ত কুলিশ পাতাভিহত হয়ে বিষ্ণু করমুক্ত মহাগিরি মন্দরের ন্যায় নিপতিত হল। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রভয়ে এরূপ ভীত হয়েছিলেন যে, তিনি তো বজ্র নিক্ষেপ করলেন কিন্তু তাতে বৃত্রাসুর নিহত হয়েছে কি হয়নি তা বুঝতে না পেরে প্রাণরক্ষার জন্য পালিয়ে গিয়ে সরোবরে প্রবেশ করলেন। বাকি দেবগণ দেখলেন বৃত্রাসুর প্রকৃতই নিহত হয়েছেন তখন তারা মহানন্দে ইন্দ্রের স্তব করতে লাগলেন এবং বৃত্রবধে ছত্রভঙ্গ বাকি দৈত্যগণকে বধ করতে লাগলেন।”

আমরা দেখতে পেলাম ঋগ্বেদ সংহিতা বলছেন, ত্বষ্টা নির্মিত সুদূরপাতী বজ্র দ্বারা দেবরাজ বৃত্রকে বধ করেন। এইখানে দধীচি মুনির উপাখ্যান নেই। বেদব্যাসের মহাভারতে দেখলাম বৃত্রবধের উপায় জানবার জন্য ইন্দ্রসহ ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং ব্রহ্মা দেবগণকে বলে দিলেন দধীচি মুনির কাছে গিয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করে তার দ্বারা বজ্র নির্মাণ করে বৃত্রবধ করতে। দেবতাদের প্রার্থনায় প্রীতমনে দধীচি দেহত্যাগ করলে তার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মিত হল। তারপরে ঘোরযুদ্ধ বাঁধলে ইন্দ্র নারায়ণের বলে বলীয়ান হয়ে বৃত্রবধ করলেন। কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতেও এই কাহিনীকেই অনুসরণ করেছিলেন সেখানেও দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রের দ্বারা বৃত্রবধের উপাখ্যান আছে। বিশ্বকর্মা অস্থির দ্বারা বজ্র নির্মাণ করলে ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করে বিষ্ণুবলে বলীয়ান হয়েই বৃত্রসংহার করলেন।

২০৫.২.৬.২ : উৎস

আমরা পূর্বেই বলেছি হেমচন্দ্র নিজেই বৃত্রসংহারের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই কাব্যের উৎস পুরোপুরি সংস্কৃত নয়, বরং ইংরেজী গ্রন্থের প্রভাব এতে থাকাটা স্বাভাবিক কারণ তিনি বাল্যাবধি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করেছেন। হেমচন্দ্র উক্ত সংস্কৃত উৎসের কোনটিই পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিজয়ী শিবভক্ত বৃত্রাসুরকে স্ত্রী-বশ, দাম্ভিক-রূপে অঙ্কন করেছেন। স্ত্রীর অন্যায় ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে হরণ করেছেন। এদিকে বৃত্র কর্তৃক পরাজিত বিতাড়িত ইন্দ্র নিয়তির আরাধনা করে তার নির্দেশে কৈলাসে গেলে কৈলাসপতি তাকে বৃত্রবধের উপায় বলেছেন। শচীর লাঞ্ছনায় মহামায়া ক্ষুব্ধ হলে মহাদেবেরও রুদ্ররোষ জাগ্রত হয়েছে। শেষে ইন্দ্র নিজের তপস্যার শক্তিতে বৃত্রকে বধ করেছেন। বৃত্রের পাশাপাশি হেমচন্দ্র তার পুত্র বীর রুদ্রপীড়ের চরিত্রকেও অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত করেছেন। তিনি বেদব্যাসের ‘দধীচ’ নামটি গ্রহণ না করে ‘দধীচি’ নামটি গ্রহণ করেছিলেন। যাইহোক, হেমচন্দ্র কাহিনীতে অনেক নতুন বিষয় সংযোজিত করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের স্বাদেশিকতা বোধ, মানবতাবাদ ইত্যাদি তিনি এর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। তবে একদিকে স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, সংস্কারমনস্কতা অন্যদিকে ইংরেজী কাব্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে কিছুটা দোলাচলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যার ফলে যে অভিনবত্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা তিনি তৈরি করেছিলেন তা কার্যকরী করতে পারেন নি। তবে অসুরদের কাছ থেকে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য উদ্ধার, জগতের মঙ্গলের জন্য দধীচি মুনির আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য, অন্যায়কারীর ধ্বংস, দম্ভের পরাজয় যেসব উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে তা ‘বৃত্রসংহারে’র উপাখ্যানকে নিঃসন্দেহে গাম্ভীর্য দান করেছে ও মহিমান্বিত করেছে।

২০৫.২.৬.৩ : সর্গ বিন্যাস

বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত, লাঞ্ছিত দেবতাগণের পাতালপুরীতে গুপ্ত মন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বৃত্রসংহার কাব্যের **প্রথম সর্গের** সূচনা। দেবতাদের আগের সেই জ্যোতি নেই, দীপ্তি নেই তাদের বিষাদ মলিন বিমর্ষভাব যথার্থ দক্ষতায় ফুটিয়েছেন হেমচন্দ্র -

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন নির্বাণ যথা সূর্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটিমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনুঃ-
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।

পাতালপুরীর বর্ণনায় কবি যে শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন তা পাতালের নিস্তব্ধ ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে, -

নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।
যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার –
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদা –
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।

এহেন পাতালপুরীতে স্বধর্মচ্যুত দেবতাদের এই অবস্থা থেকে জাগ্রত করতে চাইলেন দেব সেনাপতি স্কন্দ, তিনি বললেন, -

হা ধিক্! ধিক্ দেব! অদিতি-প্রসূত।

সুরভোগ্য স্বর্গে এবে দনুজের বাস।

চিরদিনের পরাধীনতার জ্বালা এখানে ঘোষিত হয়েছে। স্কন্দের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্যে দেবগণ বিচলিত হয়ে উঠলেন, তাদের মধ্যে জাগতে লাগল ক্রোধ। দেব বৈশ্বানর নিজেদের অবস্থা বর্ণিত করে বললেন, -

চতুর্দশ লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাঞ্ছিত।

এই কি দেবতার দশা হতে পারে! -

তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্ত্যগণ ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,
.সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?

যথার্থ তাঁর যুক্তি, দেব মহিমা যদি দানবের হাতে লুণ্ঠিত তবে আর দেবত্ব কিসের? তিনি তীব্র তেজে বলে উঠলেন, -

ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।

অগ্নির বচনে আদিত্যগণ-‘ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পুরী রসাতল’। কিন্তু বরুণ দেবগণকে যুদ্ধ ঘোষণার আগে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখতে বললেন। সেইসঙ্গে তিনি এও মনে করিয়ে দিলেন। সবাইকি ভুলে গেছে বৃত্রাসুর বিধাতার বরপ্রাপ্ত। এই বৃত্রাসুরের হাতে পরাজিত হয়েছে সমস্ত দেবকুল। এই বৃত্রাসুর দুর্নিবার তেজ যুক্ত ইন্দ্রবাণ বক্ষেতে ধারণ করেছিল। যদি তাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হত তাহলে, -

কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্বরণজয়ী
দনুজমর্দন নিত্য শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,

আর,

কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় করিয়া মানসে,
সুমেরু শিখরে একা কাটাইছে কাল, -
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত?

প্রচেতার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে কবি কৌশলে একদিকে যেমন অসুরপতি বৃত্রের শূলপাণি কর্তৃক বরপ্রাপ্তির এবং অসীম বীরত্বের সংবাদ দিলেন, তেমনি সুরপতি ইন্দ্রের অবস্থানটিও জানিয়ে দিলেন। যাইহোক বরুণ যতক্ষণ না ইন্দ্র আসছেন ততক্ষণ যুদ্ধ না করাই উচিত বলে মত দিলেন। কিন্তু প্রখরতেজা সূর্য এসব কথা মেনে নিলেন না, সকলকে আহ্বান জানালেন যুদ্ধে, -

চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হয়ে আমরা বেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল, যুগ-যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।

এরপর কবি সংক্ষেপে অথচ যথার্থভাবে দেবতাদের অসুরবধে যাওয়ার চিত্র অঙ্কন করেছেন, -

চারিদিক্ হতে দেব ছুটিতে লাগিল,
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

সংহার-অনলে বিশ্ব হয়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমনি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।
সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসময়ের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

এইখানেই প্রথম সর্গের সমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বিতীয় সর্গের যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখব স্বর্গের নন্দনকাননে 'দানব-রমণী' বৃত্রবধূ ঐন্দ্রিলা দৈত্যপতি বৃত্রের সাথে বিলাস ক্রীড়ায় রত। অপূর্ব শোভাময় পরিবেশে বৃত্রমহিষী বিরাজ করছেন, মদন পত্নী রতি তার সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু এই সুখস্বপ্ন রচিত হয়েছে যাকে ঘিরে সেই ঐন্দ্রিলা খুশী নন।

বৃত্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ঐন্দ্রিলা জানালেন তিনি সব সুখ পেলেও আজও 'সর্বজন-পূজিতা' নন

এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমনি সুখেতে বিরাজে
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।

উপরন্তু রতি ঐন্দ্রিলাকে জানিয়েছে শচীর বিহনে সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন'। ঐন্দ্রিলার আত্মঅহংকার বড়ো বিঘ্নিত হয়েছে। তিনি জানিয়ে দিলেন, -

এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কিনা পুনঃ সুমেরু আলো।

দৈত্যপতি প্রিয়ার অনুরোধ রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কন্দর্পকে ডেকে জেনে নিলেন শচী এখন মর্ত্যবাসী, নৈমিষ অরণ্যে তাঁর অবস্থান, প্রিয়াকে তিনি কথা দিলেন,

"সুন্দরি
পাবে শচীসহ শচী সহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ।।"

ঐন্দ্রিলার এই আকাঙ্ক্ষা, এই অহংকার চরিতার্থ করার যে পরিকল্পনা তার ভেতরেই বৃত্র নিজের পতনের বীজ উপ্ত করে দিলেন। আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ্য। ঐন্দ্রিলা যে ভাষায় যে ভাবে শচীকে দাসী করার লালসা প্রকাশ করেছেন (বৃত্র বলেছিলেন, আর কি লালসা বল তো এখন') তাতে ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের পত্নীর যে আভিজাত্য, মর্যাদাবোধ, দাঢ্য থাকা প্রয়োজন ছিল তা বিনষ্ট হয়েছে।

তৃতীয় সর্গর শুরুতে বৃত্র বিজিত ইন্দ্রপুরীর শোভা অঙ্কন করেছেন হেমচন্দ্র। সে বর্ণনায় বিশেষত্ব কিছু নেই, তা খানিকটা গতানুগতিক। ইন্দ্রপুরীর রাজসভায় এবার প্রবেশ করলেন বৃত্র। বৃত্রাসুরের যে বর্ণনা হেমচন্দ্র দিয়েছেন তাতে কিন্তু যথেষ্ট কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, বৃত্রের বিশালতা তাতে ফুটিত হয়েছে চমৎকার ভাবে, -

প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জয়;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয়।
ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শোভার।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস;
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়!-
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমনি সভায়।

সভাতলে প্রবেশ করেই বৃত্র তাঁর মন্ত্রী সুমিত্র কে নির্দেশ দিলেন ভীষণ নামক দৈত্যকে নৈমিষারণ্যে প্রেরণ করতে শচী হরণের জন্য। উত্তরে সুমিত্র জানালেন তিনি যেমনটি নির্দেশ করেছেন তেমনটিই হবে কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি দৈত্যনাথকে জানালেন স্বর্গে দেবতাদের পুনরাবির্ভাব হচ্ছে অমনটি দেখা গিয়েছে।

বলাবাহুল্য দেব আগমনের এ সংবাদে দৈত্যকুলপতি এতটুকুও বিচলিত হলেন না। বিশ্বাসই করলেন না সেকথা বরং অত্যন্ত দম্ভ ভরে বলে উঠলেন, -

দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া!
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ,
যাক কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ।

কিন্তু ঋক্ষভ ইত্যাদি দৈত্য যখন নিশ্চিত করে বলল যথার্থই দেবগণের আবির্ভাব ঘটেছে তখন বৃত্রের উক্তির মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর শক্তি, সাহস, বীর্যের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন -

দেবতা আসিছে সত্য কিবা তাহে ভয়?
... ...
সঙ্কল্প করিনু অদ্য শুন দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের স্পর্শিয়া ত্রিশূল-
সূর্য্যেরে রাখিব করে রথের সারথি,
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি,
... ... ইত্যাদি।

এইভাবেই প্রধান প্রধান দেবতাদের দাস করার সঙ্কল্প নিয়ে বৃত্র সভা ভঙ্গ করলেন। চারিদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল, ‘দানবসাজে দানবগণ সজ্জিত হল। এরই মধ্যে আমাদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হল বীর বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড়ের। যুদ্ধের সংবাদে তিনি

উল্লসিত। তার বর্ণনা দিয়ে কবি বললেন, -

বৃত্রাসুর-পুত্র বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে দেখিতে সুঠাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হতে যার অসীম সাহস।

তিনি যুদ্ধবিষয়ে নানা আলোচনার জন্য মন্ত্রী সহ আপন আলয়ে গমন করলেন।

চতুর্থ সর্গের প্রেক্ষাপট নৈমিষারণ্য, যেখানে স্বর্গচ্যুতা ইন্দ্রাণী শচী তার সখী চপলা তথা বিদ্যুতের সাথে কথোপকথনে রত। পূর্ব সর্গে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধসাজের মধ্যে যে বীররসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তার বিপরীতে এই সর্গে যে করুণ রসের সৃষ্টি করেছেন কবি তা হৃদয়স্পর্শী। খুব স্বাভাবিক ভাবেই শচী তাঁর অবস্থা স্মরণ করে সখীর কাছে বিলাপ করছেন, -

বল আর কত দিন এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো এ ভাবে পড়িয়া।।
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।

তাঁর কাছে মানুষের এ পৃথিবী কারাগার' মনে হয়েছে, এখানে হাঁটতে গেলে, -

হায়! এ মাটীর ক্ষিতি পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ।

'অমরতা' কে এখন তাঁর অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে কারণ এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য। তিনি যে মৃত্যুবরণ করবেন সে উপায়ও তো নেই, -

অমর মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।

হয়তো এ মাটির পৃথিবীই তাঁর ভাল লাগত যদি না স্বর্গসুখ, স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য তিনি দেখতেন। কিন্তু সে সুখ যে ভোগ করে এসেছে তার পক্ষে এ বড়ো যাতনার। কবি খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন, -

আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে।

শচীর কেবলই মনে পড়ে স্বর্গের সেই দিনগুলো, ইন্দ্রের ইন্দ্রানী হয়ে ইন্দ্রের সাথে যখন কেটে যেত আনন্দের সেই মুহূর্তগুলি, -

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কামুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের সঙ্গে, খেলাতিস কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে।

তিনি আকুল হয়েছেন যখন মনে পড়েছে সেই দৃশ্য, -

সুমেরু শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ।
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত-নক্ষত্র-পূর্ণ
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।।

এর থেকেও করুণ হয়ে উঠেছে তার মন যখন তিনি স্বর্গের বর্তমান অবস্থাটি চিন্তা করেছেন। আজ দেবদুর্লভ পারিজাত দুলছে দৈত্য-দৈত্যজায়ার গলায়, ইন্দ্রের শয়নাগারে প্রবেশ করেছে বৃত্র, যে শয়নাগারে, ইন্দ্র ছাড়া কোন দেবতারও প্রবেশাধিকার ছিল না এখন সে শয়নাগারে সে শয়ানে বৃত্র সুখে নিদ্রা যায়, এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে, এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে, -

সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,

ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়।

আমার মুকুট-রত্ন, অমরী করিত যত্ন,

কুবের আনিয়া দেয় তায়।।

শচী যখন এমনি করে চপলার কাছে বিলাপ করছেন তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মদন। তিনি বৃত্রকে বলে দিয়েছিলেন বটে শচীর বর্তমান অবস্থানটি কিন্তু শচীর কাছে এসে তাঁকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে যেন বিশ্বাসঘাতকতার দোষ খণ্ডন করেছেন। এখানে মদনের সঙ্গে শচী বিশেষ করে তার সখী চপলার কথোপকথনে যথেষ্ট নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। অসুরের দাসত্ব গ্রহণকারী দেবকুলত্যাগী মদন কে বিদ্রুপে জর্জরিত করেছে চপলা। শচীও মদনকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। কিন্তু তার বক্তব্যে চপলার চাপল্য নেই, আছে স্বর্গের রাণী সুলভ গাম্ভীর্য।

মদন শচীকে তার আসন্ন বিপদের কথা জানালেন। জানালেন ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা শচী তার সেবা করবে। সে কথা রাখতে বৃত্র ভীষণ নামক দৈত্যকে নৈমিষ অরণ্যে প্রেরণ করেছেন শচীকে হরণ করার জন্য। সে কথা শুনে শচীর প্রতিক্রিয়াকে এইভাবে চিহ্নিত করলেন কবি, -

নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতন অচেতন,

নিঃশ্বাস না সরে নাসিকায়।

অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,

হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আজ এই বিপদে কাকে স্মরণ করবেন তিনি? ইন্দ্র তপস্যায় রত। আর যত দেবগণ সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, পবন সকলেই হতবীর্য। হতশ্রী ইন্দ্রাণীর উদ্ধার কল্পে তাঁরা আজ কেউই আসবেন না। তখন তাঁর মনে পড়েছে পুত্র জয়ন্ত'র কথা। তিনি স্মরণ করেছেন তাঁকে, পাতালে জয়ন্ত'র মনে গিয়ে পৌঁছিয়েছে সে কথা। তিনি মর্ত্যে আসার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

করুণ রসাশ্রিত এই সর্গে হেমচন্দ্র শচী চরিত্রটি যথাযথ চিত্রিত করেছেন। বিশেষত পূর্ব সর্গের ঐন্দ্রিলার সাথে যদি তাঁর তুলনা করি তাহলে দেখব ঐন্দ্রিলা যেখানে দৈত্যাধিপতির স্ত্রীর আভিজাত্য থেকে চ্যুত হয়েছে শচী কিন্তু এত দুঃখেও সেই আভিজাত্য ধরে রাখতে পেরেছেন। বিলাপ কালেও তিনি বলেছেন, -

জানি সখী গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি
মহা ঝড় তরুতেই রহে।
জানি সর্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় খিন্ন
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে।

এমন কি যখন তিনি তাঁর হরণের বৃত্তান্ত শুনেছেন তখনও তিনি একেবারে অস্থির আকুল না হয়ে রাজ্ঞীজনোচিত স্থৈর্য্যেরই পরিচয় দিয়েছেন এবং পতির অনুপস্থিতিতে উচিত ভাবেই পুত্রকে স্মরণ করেছেন।

পঞ্চম সর্গ শুরু হয়েছে কিন্তু জয়ন্ত তখনো নৈমিষারণ্যে এসে উপস্থিত হয়নি। শচীর নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তিত চপলা শচীকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন তিনি যেন বৈকুণ্ঠ কিংবা শিবলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শচী কিন্তু স্বর্গের রাণীর মতোই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন -

সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।

এখানে যেন পরাধীন ভারতবাসীর পরাধীনতার জ্বালা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দুই-ইব্যক্ত করেছেন হেমচন্দ্র। পরাধীনতার জ্বালায় লিখেছেন, -

পরবাসে পরবশ, সদা চিতে মলা,
আশ্রয়দাতার মতি-গতি বুঝে চলা;
চিন্তিত সতত ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই;

পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই।

আর স্বাধীনতার মহিমা ব্যাখ্যায় লিখেছেন, -

স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস;

যাইহোক পরগৃহে যাওয়ার প্রস্তাবে ইন্দ্রাণী রাজী না হলে চপলা তাকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে বললেন শচীও তখনো আত্ম-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে বললেন,-

চিরদিন যেই রূপে জানে সর্বজন,
সহচরি, যেই রূপ শচীর এখন
আসিছে দংশিতে ফণী করুক দংশন-
নিজ রূপ, সখী, নাহি ত্যজিব কখন।

চপলা তখন মায়াবলে নৈমিষ কাননকে নন্দনবনে পরিণত করলেন যাতে মায়ামুগ্ধ দানব শচীকে স্পর্শ করতে না পারে। এমনসময় সেখানে জয়ন্ত এসে উপস্থিত হলেন। বহুদিন পরে জননী ও পুত্রের মিলন হল। সে মিলনদৃশ্য কবি বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করে বড়ো সুন্দর করে তুলেছেন, -

পুত্র পেয়ে শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত ঐশ্বর্য তাহার ।
বারংবার শিরোঘ্রাণ; চিবুক আঘ্রাণ
লইয়া; ধরিলা কোলে পুলকিত প্রাণ।

পুত্রবক্ষে ক্ষতচিহ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন শচী। জয়ন্ত দৃপ্ততার সাথে জানালেন, -

মাতা, আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে;

কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবারে ধরেছি বক্ষে-না হও ব্যাকুল
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়,
শিবের ত্রিশুল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।

অর্থাৎ শিবের ত্রিশূল ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রে তিনি বিক্ষত হননি। জননীর বিপদে তিনি বারবার সে প্রহার.সহ্য করতে সমর্থ একথাও জানিয়ে দিলেন। এদিকে যথারীতি ভীষণ এবং আরও এক দৈত্য নৈমিষে এসে উপস্থিত। কিন্তু চপলার মায়াসৃষ্টিতে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা চপলাকে কখনো শচী, কখনো কমলা বলে ভুল করেছে। অতঃপর সত্য সত্যই শচীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে ভীষণ, তার সেই স্তম্ভিত অবস্থার বর্ণনায় কবির কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে, -

বিশ্বসৃষ্টি করি যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব-চিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নবসূর্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই চিন্তা নাই নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য পরাণ।

ভীষণের মনে হল, সত্যিই ইনি স্বর্গের রাণী হওয়ার যোগ্য-'কোথায় ঐন্দ্রিলা-বুঝি দাসীর সে দাসী', এদিকে ভীষণকে দেখেই তাকে চিনে ফেললেন জয়ন্ত এবং খড়্গের আঘাতে ধড় থেকে তার মুন্ড বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ভীষণের অনুচরকে তুচ্ছ মনে করে তাকে আঘাত করলেন না জয়ন্ত, সে স্বর্গ অভিমুখে যাত্রা করল ভীষণের মৃত্যুর খবর নিয়ে।

ষষ্ঠ সর্গের শুরুতেই বীররস আর রৌদ্ররসের সমাবেশ। দেবতারা স্বর্গ ঘিরে ফেলেছেন। অসুরগণ সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদেরকে রোধ করছে স্বর্গে প্রবেশের থেকে।

নিত্য নিত্য ঘোর সংগ্রাম, নিত্য নিত্য জয়-পরাজয়, কখনো দেবতার, কখনো দৈত্যের। যুদ্ধের বর্ণনায় হেমচন্দ্র লিখলেন, -

জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।

এদিকে সভাসীন অসুরপতি বৃত্র গর্জন করে উঠে বললেন -

যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও দেবতা!

এতো দেবজয়ী দানবের লজ্জা। এবার তিনি নিজেই যাবেন যুদ্ধক্ষেত্রে, বললেন,

আন্ রে সে শিবশূল-আন্‌রে অমর
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর।

এবার তার সামনে এসে দাঁড়ালেন পুত্র রুদ্রপীড়। জানালেন পিতার আগে তিনি চান যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে। যথোচিত শ্রদ্ধা পিতাকে জ্ঞাপন করে যুক্তিসহ বললেন, -

যশস্বিন্ যশঃ যদি সকলি আপনি
মন্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায় তবে,
আত্মজ আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি?
কোন্ কালে আমরা তব হব যশোভোগী?

তাই তিনি আজ ‘বীরের বাঞ্ছিতযুদ্ধে যেতে চান, পিতার প্রজ্জ্বলিত যশোদীপকে প্রদীপ্ত রাখতে চান।

তাঁর এই কথায় যথার্থ বীরের ধর্মই প্রকাশিত, পুত্রের এমন উক্তিতে পিতা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজী হলেন। এই সময়ে নৈমিষ কানন প্রত্যাগত সেই দৈত্য ভীষণের নিহত হওয়ার সংবাদ দিল। স্বাভাবিকভাবেই এ সংবাদে দানবপতি গর্জন করে উঠলেন এবং রুদ্রপীড়কে নির্দেশ দিলেন তখনি শত বীর যোদ্ধা নিয়ে

অমরাবতী থেকে শচীকে নিয়ে আসার জন্য ধরাধামে যেতে। মন্ত্রী সুমিত্র বললেন শিবদত্ত ত্রিশূল ছাড়া দেবতাদের পরাজিত করা অসম্ভব, তাহলে রুদ্রপীড় কিভাবে দেবব্যূহ ভেদ করে যাবেন বা শচীকে নিয়ে ফিরে আসবেন। তবে কি স্বয়ং দানবঈশ্বর কুমারের সাথে যাবেন? বৃত্র জানালেন তিনি যখন রুদ্রপীড়কে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন যুদ্ধে সেই যাবে কিন্তু তিনি তার ত্রিশূল'রুদ্রপীড়কে দেবেন। কিন্তু রুদ্রপীড় প্রবল আত্মবিশ্বাসে জানালেন তাঁকে বাসব ছাড়া আর কেউ বধ যেমন করতে পারবেন না, তেমনি তিনি ঐ ত্রিশূল ব্যবহারের অধিকারী নন -

বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ

তাই তিনি ত্রিশুল ছাড়াই রওনা হলেন। কিন্তু তার সঙ্গী যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে রাজী হলেন না। যদিও রুদ্রপীড় জানালেন 'ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত' তথাপি কপটতার আশ্রয়ই গ্রহণ করা হল। দেবতাদের বলা হল, -

ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে
গন্ধর্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিত সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে;

দেবতাগণ এইকথা শুনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন কেউ কেউ অমত করলেও শেষে দৈত্যগণকে তারা গন্ধর্ব রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মহানন্দে তারা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

সপ্তম সর্গে দেখব ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। এতদিন বাদে ধ্যান থেকে জেগে উঠে চারিদিকের পরিবর্তিত পরিবেশ দেখে তিনি অবাক হয়েছেন, যেমন,

যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,
কুমেরু-শরীরে এবে নিরখি সেখানে

প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত-শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত।

কবি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন কত দীর্ঘকাল ব্যাপী ইন্দ্র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু এতকাল কেটে গেলেও যার ধ্যানে নিরত ছিলেন ইন্দ্র তিনি যে আজও তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন না। সুতরাং ইন্দ্র আবার বৃত্র বধের উপায় জানবার জন্য কল্পান্তব্যাপী পূজার আয়োজন করতে বসবেন তখনি নিয়তি এসে আবির্ভূত হলেন।

তিনি ইন্দ্রকে জানিয়েছেন 'নিয়তি নহেক তুষ্ট কিংবা রুষ্ট কভু'; সৃষ্টির শুরু থেকে এই তার কাজ। কোনো ভাবেই বিধাতার লিখন তিনি ব্যর্থ করতে পারেন না। নিয়তির ভূমিকাকেও বড়ো যুক্তিসিদ্ধভাবে চিহ্নিত করেছেন কবি, -

বিকলাঙ্গ হবে, বিশ্ব-মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু-
বিশৃঙ্খল হবে স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।

এসব তো ইন্দ্রের অজানা নয়, তবে কেন তিনি নিয়তির পূজো করছেন? ইন্দ্র বললেন তিনি নিয়তির নিয়মলঙ্ঘনকারী কোন কিছু চান না। তিনি শুধু জানতে চান, -

কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্য-কুলপতি বৃত্র;

নিয়তি বললেন যদিও তার একথা বলাও অনুচিত তবুও তিনি জানালেন, -

ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,-
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে।

তখন ইন্দ্র স্বপ্নদেবকে ডেকে জানালেন তিনি এখন কৈলাসে শিবের কাছে গমন করবেন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়েছে এবং তিনি বৃত্রবধের উপায় জানতে কৈলাসে যাচ্ছেন

এ সংবাদ যেন স্বপ্নদেব দেবতাদের জানান। স্বপ্নদেব একথা দেবতাদের জানাতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা উল্লসিত হয়েছেন।

অষ্টম সর্গটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘাত-প্রতিঘাতের বাইরে এক কোমল শান্ত রমণী হৃদয়ের পরিচয় উদঘাটনে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব যে গীতিকবি হিসেবে সে পরিচয়ও এ স্বর্গে পেয়ে যাব।

দৈত্যকুলের বধূ হয়েও যে রমণী মনের মধ্যে রমণীয় গুণগুলিকে ধরে রাখতে পেরেছে, দানবীয়তা যাকে মানায়না সে বৃত্রের পুত্র রুদ্রপীড়ের পত্নী ইন্দুবালা।

নবীন কিসলয় কিংবা পূর্ণ চাঁদের আলোয় স্নিগ্ধ সুষমাকেই কবি যেন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ইন্দুবালা চরিত্রে। অমন বীর রুদ্রপীড়ের পত্নী হয়েও তাই যুদ্ধের কথায় তার কপালে দেখা গেছে ঘর্মবিন্দু। তার পতি মর্ত্যে শচীকে হরণ করে আনতে গেছে সে জানে। পতি বিহনে কাতর, উদ্বিগ্ন ইন্দুবালা রতির কাছে জানতে চেয়েছে –

পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায় ?
নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ
যশস্বী কি রণে তেঁহ?

অর্থাৎ সে জানতে চায় কতদিনে আবার তার সাথে তার পতির দেখা হবে ? মর্ত্যধামে কি বড়ো বড়ো বীরদের সাথে তাঁকে লড়তে হবে? তাতে কি তাঁর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে? রতি তাকে বলেন রুদ্রপীড়ের মতো বীরের পত্নী হয়েও তার এত ভয় কেন ? উত্তরে সে যা বলে তা চিরন্তন নারীর পতিচিন্তারই স্বাক্ষর।

ইন্দুবালা কে অতঃপর শাশ্বতী নারীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন কবি, তিনি যখন

শচীর জন্য একজন নারী হিসেবে চিন্তা করেছেন তখন সে মহিমাই প্রকাশিত হয়েছে,-

আমিও রমণী রমণীও শচী
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলে ধরায়?
কি হবে শচীর পতি নাই কাছে
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!

ইন্দুবালা এমন কথাও বলেছেন ঐন্দ্রিলার যদি এতই দাসী রাখবার সখ সে নিজে তার দাসী হতো, কেন তিনি শচীকেই তার দাসী করতে চাইছেন! শুধু তাই নয়, ইন্দুবালার মনে হয়েছে এই যে তার স্বামী রমণী হরণ করবেন এতো তাঁর মত বীর পুরুষের বীরত্বে কলঙ্ক লেপন করে দেবে, -

কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি
রমণীর প্রতি বল!

শচী কে অমরায় যদি ধরেও আনা হয়, সে তাকে কিছুতেই কিঙ্করী হতে দেবে না। দেবতা দানবের এই নিরন্তর যুদ্ধের পরিণতি ভেবেও ব্যথিত হয়েছে ইন্দুবালা,- তার মুখ দিয়ে যেন যুদ্ধের বিষময় ফল ঘাোষণা করতে চেয়েছেন হেমচন্দ্র, -

কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী
কত পিতা পুত্রহীন,
কত দেব-তনু পড়িয়া মুর্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ!
যুদ্ধেতে কি লাভ যুদ্ধ করে কারা

বিচারিয়া যদি দেখে,

তবে কি সে কেহ যশের আকর

বলিয়া উল্লেখে একে?

দৈত্যপুরীর ভেতর এমন কোমলপ্রাণা শান্ত স্বভাবা পরদুঃখকাতরা নারীকে আবিষ্কার করে কবি করুণ-মধুর রসের আবহ সৃষ্টি করেছেন।

নবম সর্গে শচী যখন পুত্র জয়ন্তের সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবতার সংবাদ নিচ্ছেন তখন হঠাই। আকাশপথে শোনা গেল রণশখের ভীষণ ধ্বনি। সে দৈত্য আরাব' শুনে মাতৃরক্ষার ব্রত গ্রহণকারী জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, -

কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে,
কিরণ শত তরঙ্গের,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম করিল ভাস্বর।

এবার নৈমিষে রুদ্রপীড়ের মুখোমুখি হলেন জয়ন্ত, প্রাচীন কাব্যে দেখা যায় যুদ্ধের পূর্বে বীরগণ পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। হেমচন্দ্রও এখানে সেই রীতি অবলম্বন করে উভয়কে বাক্যুদ্ধে রত করেছেন। জয়ন্ত এখানে রুদ্রপীড়ের বীরত্বকে স্বীকার করে নিয়েও এক্ষণে তার আচরণকে তস্করের ন্যায় বলে ধিকৃত করেছেন এবং বলছেন বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় এখন আর তিনি তো পাবেন না,-

রুদ্রপীড়, তার সনে,
সুখ বটে বুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।

রুদ্রপীড় ও তার জবাবে কিছুটা হীনভাবেই আক্রমণ করেছেন জয়ন্তকে, -

কি যুদ্ধ আমায় দিবি।
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ;
জানে সে অমরগণ
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে পড়ে হারায়ে সংবিৎ।

... ...

হারায়েছি শতবার
হারাইব আরবার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার।

এই বাক্‌যুদ্ধ শেষে দুই বীরই এবার যথার্থ বীর ধর্ম পালনে ব্রতী হয়েছে। শুরু হয়েছে ভীষণ যুদ্ধ, -

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ
দেব-দৈত্য যুদ্ধরব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি বাণের গর্জন।

দিন শেষ হয়ে এল-সূর্য অস্তে গেলেন। নিয়মানুসারে যুদ্ধ সেদিনের মতো শেষ। জয়ন্ত অবশ্য জানালেন তিনি সমর সজ্জাতেই থাকবেন, রুদ্রপীড় রাত্রেও তাকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন। এরপর তিনি যখন একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছেন নিস্তব্ধ রজনীতে চাঁদের আলো পড়েছে তার চোখে মুখে চপলাসহ শচী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধক্লান্ত সন্তানকে দেখে একদিকে যেমন তাঁর গর্ব হল, বললেন, -

বিষ্ণু-প্রিয়া কমলারে,
ঈশান-প্রিয়া উমারে,

দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন।

একা যে করিল রণ,

সহ দৈত্য শত জন,

সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড়াসুরে;

অন্যদিকে হৃদয়ে জাগছে পুত্রের জন্য আশংকা যা একজন জননীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, হেমচন্দ্র জননীর সে চিন্তাকে যথাযথ ব্যক্ত করেছেন,-

আবার অন্তরে ভয়,

না জানি যে কিবা হয়,

কালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইল প্রভাত;

রুদ্রপীড় মহাবীর,

জয়ন্ত ক্লান্ত-শরীর,

অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত ।।

রাত্রি শেষ হলে সুমধুর সুরে পুত্রকে জাগ্রত করে শচী বলেছেন তিনি আশীর্বাদ করছেন যে তাঁর পুত্র রণে জয়ী হবে তথাপি তার চিত্ত আজ এক অজানা ভয়ে বড়োই অস্থির হয়ে উঠছে। মায়ের হৃদয় বোধহয় আগে থেকেই বিপদ সংকেত পায়। তাঁর, কেবলই মনে হচ্ছে, জয়ন্ত যেন-'জননি জননি' বলি করিছ নিনাদ। তবে কি জয়ন্ত অন্য কোন দেবতার, স্মরণ নেবেন? জয়ন্ত বীরপুত্রের মতোই জবাবে বলেছেন এ সবই মায়ের স্নেহজনিত চিন্তা। তিনি একাই যুদ্ধে যাবেন, -

একাকী এ যুদ্ধে যাব,

নহে বড় লজ্জা পাব,

দেব-দৈত্য উপহাস করিবে আমায়;

ওদিকে রুদ্রপীড়ও চিন্তান্বিত। শতজন যোদ্ধার মধ্যে নব্বই জন জয়ন্ত হস্তে নিহত। তবে কি, -

ইন্দ্র-হস্তে হবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল।

পরক্ষণেই শঙ্করকে স্মরণ করে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। শুরু হল আবার মহাযুদ্ধ, -

আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ-সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল,

সাপেদের সঙ্গে যেমন করে গরুড় একাই লড়াই করেছিল তেমনি করে জয়ন্ত দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। যখন পূর্বাহ্ন গত হল, জয়ন্তের শরে আরো পাঁচজন দৈত্য নিহত হল। তখন রুদ্রপীড় এক প্রকাণ্ড দ্রুঘণ দিয়ে প্রচণ্ড তেজে চূড়ান্ত প্রহার করলেন জয়ন্তকে। সে আঘাত সহ্য করতে পারলেন না জয়ন্ত, পড়ে গেলেন মাটিতে। দেবতাদের মৃত্যু নেই, তারা মৃত্যুসম মূর্ছা প্রাপ্ত হন। সে অলৌকিক মৃত্যু তথা মূচ্ছা কে কবি চমৎকারভাবে বর্ণিত করেছেন, -

মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল;

স্বাভাবিকভাবেই দানবদল উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, সে চীৎকারে শচী গভীর রাতে শববাহীর হরিধ্বনি শুনে মানুষ যেমন ভয় পায় তেমনি শিহরিত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে এসে দেখলেন প্রিয় পুত্র মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। কোলে তুলে নিলেন সে দেহ। তারপর পুত্র কোলে শোকস্তব্ধ জননীর যে ছবি আঁকলেন হেমচন্দ্র তা সত্যই তুলনারহিত। ভাস্কর্যের তৈরী কোন প্রস্তর প্রতিমার যেন নিখুঁত বর্ণনা দিলেন তিনি,-

না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাব,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,
নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন,
কমল-পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।

শোকের এমন নীরব প্রকাশে চপলাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে পারেন না। সব থেকে উল্লেখ্য রুদ্রপীড়ও সে মূর্তি সম্ভ্রমে সংকোচে স্পর্শ করতে পারেনি। তখন তিনি নিকন্ধর নামে এক দৈত্যকে আদেশ দিলেন শচীকে ধরার জন্য। নিষ্ঠুর নিকন্ধর শচীকে জড়ায়ে.তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ। তারপর শচীকে নিয়ে তারা শূন্যমার্গে গমন করল। কিছুক্ষণ পর শচীর জ্ঞান ফিরলে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর সেই কান্নায় ত্রিলোকের জীব কেঁদে উঠল, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরীতে পৌঁছে গেল সে বিলাপধ্বনি। ওদিকে স্বর্গও তখন দেব অবরোধ মুক্ত হয়েছে বৃত্রের প্রতাপে। নিকন্ধর শচীকে নিয়ে প্রবেশ করল বৃত্রের সভায়। এরপর কবি একটি অভূতপূর্ব পংক্তি রচনা করেছেন,-

শচীমূর্তি দেখে স্বয়ং দৈত্যপতি,--
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

এই সর্গে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে কবি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এখানে একাধারে বীর, রৌদ্র ও করুণ রসের সহাবস্থান ঘটেছে। শচীর সঙ্গে ব্যবহারে রুদ্রপীড় এবং বৃত্র উভয়েরই চরিত্রের গুণ প্রকাশিত হয়েছে। শচীর চরিত্রের গরিমাও এতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সমগ্র সর্গটি পয়ার ছন্দে লিখিত হয়েছে।

দশম সর্গের শুরুতে দেখি ইন্দ্র নিয়তির কথন অনুসারে সুমেরু থেকে কৈলাসে গমন করছেন। সে যাত্রাপথে কবি যেন চিত্রকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পুরাণে প্রধানত

কৈলাসের অবস্থান হিমালয়ে। এ হেন কৈলাসে মহাদেব মহামায়ার সঙ্গে নানারূপ তত্ত্বালোচনায় রত। হিন্দু ধর্ম দর্শনের মূলসূত্রগুলিকে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেভাবে কাব্যরসের ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন হেমচন্দ্র তা নিঃসন্দেহে তাঁর কবিপ্রতিভার উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করছে।

হেনকালে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন দেবরাজ। তার বিমর্ষ বদন দেখে পার্বতী এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি সবিস্তারে জানালেন কিভাবে শিববরে বলীয়ান, শিবদত্তত্রিশূলধারী বৃত্র দেবতাদের চরম লাঞ্ছনা দিয়ে স্বর্গচ্যুত করেছে, শচী আজ মর্ত্যবাসী (তিনি তখনও শচীহরণ বৃত্তান্ত জানেন না। পার্বতী জানালেন সত্যই তাঁরা তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন বলে এসব জানতে পারেন নি। মহাদেব তখনো ধ্যানমগ্ন। কাত্যায়নী উমা বললেন, এখনি মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করে তাকে সব জানাবেন।

বললেন,-

উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন উপায়।

শিব জানালেন ব্রহ্মদিবা অবসানে বৃত্রের নিধন সম্ভব। ইন্দ্র এ উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না, একথা তো তিনি নিয়তির কাছেই শুনেছেন। আজ যে শিবের বরে তাঁর এই দুর্গতি তার সামনে তিনি আজ আর ক্ষোভ লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বললেন,-

এ কোদণ্ড-তেজে দৈত্যে না বধিছে কারে,
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার ?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি।

ইন্দ্র যখন এমন করে খেদ প্রকাশ করছেন তখন হঠাৎই ব্যোমকেশের জটা ঈষৎ কেঁপে উঠল, উমার চোখ থেকে ঝরে পড়ল অশ্রু। উভয়েই বুঝলেন কোন ভক্ত

বিপদে পড়ে তাঁদের স্মরণ করছেন। উমা তৎক্ষণাৎ জানতে পারলেন শচী হরণের কথা। স্বাভাবিক ভাবেই এ খবরে দিশাহারা ইন্দ্র ক্রোধে ফেটে পড়লেন তখনি অস্ত্র নিয়ে স্বর্গের দিকে রওনা দিলে শিব তাঁকে আটকালেন, স্বয়ং মহাদেবকে পর্যন্ত তিনি বলতে ছাড়লেন না,-

ধূর্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহাও দনুজে,
সমর্পিলা এত দিনে মৃত্যুজয়ী দেব?

এত অনুযোগে শিরেরও এবার ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠল। তিনি ধারণ করলেন রুদ্র-রূপ, সংহার মূর্তি, হেমচন্দ্র সে রূপের সার্থক বর্ণনা দিয়ে লিখলেন, -

ব্রহ্মান্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।

মহামায়া দেখলেন এই সর্বসংহারী প্রলয়মূর্তির তান্ডব যদি শুরু হয় সমগ্র সৃষ্টিই তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। রুদ্ররূপী মহাদেবকে অনুরোধ করে বললেন, -

কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টিনাশ হবে;-
ভবিতব্য লিপি দেব, না কর খণ্ডন
সংবর সংহার-মুর্তি ঈশ উমাপতি।

পার্বতী বাক্যে শিব ক্রোধ পরিত্যাগ করলেন এবং ইন্দ্রকে জানালেন বৃত্রবধের উপায়, -

পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধানে,

মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ পবিত্র-হৃদয়।

তিনি আরও জানালেন দধীচির অস্থি নিয়ে এবার তা তুলে দিতে হবে বিশ্বকর্মার হাতে। তিনি তখন-সেই পবিত্র অস্থি দিয়ে তৈরী করবেন এমন এক অস্ত্র যার তেজ সংহার ত্রিশূল তুল্য এবং যাতে সর্বসময় প্রলয় বিষাণের ন্যায় নিনাদ ধ্বনিত হবে। বজ্র নামক সেই অব্যর্থ অস্ত্রেই হবে বৃত্রসংহার। এই নির্দেশানুসারে পুরন্দর তখনি বদরী আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। যেখানে অবস্থান করছেন দধীচি মুনি।

একাদশ সর্গে দেখা গেল দানবেরা সবাই যুদ্ধজয়ের আনন্দে উল্লাস করছে। দানববালাগণ শচীকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ছুটে যাচ্ছে। চারদিকে বৃত্র এবং তার বীরপুত্র রুদ্রপীড়ের জয়ধ্বনি উঠছে। এক্ষণে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে উপস্থিত রয়েছেন বৃত্র এবং ঐন্দ্রিলা এবং রদ্রপীড় বৃত্র এবং ঐন্দ্রিলা উভয়েই শচী হরণ বৃত্তান্ত এবং তার বীরত্বের কাহিনী শুনতে চাইলেন রুদ্রপীড়ের কাছে। রুদ্রপীড় নিজের বীরত্বের গর্ব শোনানো অপেক্ষা পিতা কেমন করে দেবকুলকে পরাজিত করলেন সে কাহিনী শুনতে চাইলেন। বৃত্র জানালেন এবার দেবতাগণ তাদের পূর্ণশক্তি দিয়ে লড়াই করেছেন। দৈত্যকুলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল।

তখন তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তবে এর পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে শিবের ত্রিশূল হস্তে প্রবেশ মাত্রই সকলে পাতালে পলায়ন করেছিল কিন্তু এবার দেবতাগণ,-

করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অদ্ভুত বিক্রম;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম।

শেষে তিনি শিবদত্ত ত্রিশুলের প্রহারে সকলকে একেবারে মূর্চ্ছিত করে দিয়েছেন। এরপর রুদ্রপীড় তার জয়গাথা পিতা মাতার সামনে বর্ণনা করেছেন।

ঐন্দ্রিলা সে হরণ বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে শচীর রূপ কেমন তা পুত্রমুখে শুনবার

জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। তখন রুদ্রপীড় সে রূপের বর্ণনা দিয়ে বললেন,-

শচী অতি রূপবতী
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী,
রূপ হতে গাম্ভীর্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয়;
দেবী বটে,বটে শচী শত্রুর বনিতা,
তথাপি সে মূর্তি চিত্তে আছে প্রভান্বিতা।

নিজের সন্তানের মুখেই শচীর এই রূপ-ব্যক্তিত্বের গুণগান শুনে ঐন্দ্রিলার হৃদয়ে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি বৃত্রকে বললেন আর তিলার্ধকাল অপেক্ষা করে এখনি শচীকে এখানে কিঙ্করীর বেশে নিয়ে আসা হোক। বললেন, -

রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমনে সে চামর চুলায়,
দেখি আগে হাতে দিয়ে তাম্বুল আধার,
দেখি সে কেমনে জানে অঙ্গের সংস্কার;

এখানে হেমচন্দ্র ঈর্ষাকাতর নারী মনস্তত্ত্ব অঙ্কনে অত্যন্ত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। রুদ্রপীড়, ঐন্দ্রিলার বীর সন্তান, মায়ের এই নীচতা মেনে নিতে পারেন নি। বিনীত বচনে হলেও প্রতিবাদ করে বলেছেন,-

দাসী হতে আসিয়াছে, হইবে সে দাসী;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি?

এতেও ঐন্দ্রিলার মনের কোন পরিবর্তন হয়নি বরং তার আক্রোশ আরো বেড়ে গেছে। স্পষ্ট ভাষণেই তিনি বলে উঠেছেন,-

নারীমাঝে আমা হতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ-
হৃদে জ্বলে হলাহল-সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম;

এবং তারপর সেই দাম্ভিক ঘৃণিত উচ্চারণ,-

শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন-
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।

ঐন্দ্রিলার এই দম্ভোক্তি কৈলাসে শিবানীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি শচীর জন্য ব্যাকুল হলেন এবং ঐন্দ্রিলার প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মহেশকে সেকথা জানালেন,-জ্বলে উঠল মহেশের ক্রোধানল, বেজে উঠল প্রলয় বিষাণ ভীষণ শব্দে, সংহার মূর্তিতে দেখা দিলেন শিব। তার ফলশ্রুতিতে কি কি ঘটল তা কবি মহাকাব্যোচিত ভাবেই বর্ণনা করেছেন,-

সংহার ত্রিশুলাকৃতি জ্যোতির বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপুরে।
চমকিত ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম উঠে অদ্রিবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কম্পিত;
উতাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধুনিত;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জয়
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে;
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,

মুচ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয়;

এদিকে সকল মূর্চ্ছিত দেবতা চেতনা ফিরে পেলেন অন্যদিকে সুমেরু শিখর ভীষণ ভাবে দুলে উঠল, অমরাবতীর পতাকা বৈজয়ন্ত প্রচণ্ড বায়ুবেগে কাঁপতে থাকল, ঐন্দ্রিলার হাত থেকে খসে পড়ল কঙ্কণ, রুদ্রপীড়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, আর সবথেকে বড় কথা, -

নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি চিহ্ন" জ্বলিয়া উঠিল।

রুদ্রের ক্রোধাগ্নি প্রকাশ ও বৃত্রের চোখে পলক পড়ার মধ্যে দিয়ে বৃত্রসংহারের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে।

'বৃত্র-সংহারে'র **১**ম খণ্ড সমাপ্ত হওয়ার আড়াই বছর পর প্রকাশিত হয় এর ২য় খণ্ড। কাহিনী সূত্রকে কবি অবিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছেন এত দিন পরেও। **দ্বাদশ সর্গের** শুরুতে দেখছি একাকী দানবপতি বৃত্র যেখানে উত্তুঙ্গ সুমেরু শৃঙ্গ গগনমার্গে উঠেছে স্বর্গীয় শোভা নিয়ে সেখানে পর্বতের উপর অঙ্গ ন্যস্ত করে দূরে নিরীক্ষণ করছেন—সেই সেখানে যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিয়েছিল। এখানে চিন্তান্বিত বৃত্রের বর্ণনায় মহাকাব্যসম চিত্র শশাভিত হয়ে উঠেছে,-

সুমেরু অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ গিরি যেন কোন (ও)
অন্য কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত
ভীমদৃষ্টি ভয়ানক কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন সুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি!

বারবারই বৃত্রের মনে পড়ে যাচ্ছে রুদ্রের সেই রোষবহ্নির কথা, বারবারই মনে হচ্ছে, -

সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে-
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্বাণ?
পণ্ড শিব-আরাধনা! সামর্থ্য নিষ্ফল।

তিনি ভাবছেন দয়ার্দ্র চিত্ত দেব আশুতোষ ইন্দ্রজায়া শচীর হরণেই নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। 'বৃত্রের সম্বল-চন্দ্রশেখরের দয়া' বোধহয় এবার বিলীন হবে। এই প্রথম তাই দেখতে পাচ্ছি বৃত্র ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন ঐন্দ্রিলার প্রতি,-

সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হইতে বামা-
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মুল তো হতে।

কিন্তু বৃত্রের এ সকল কথাতে ঐন্দ্রিলার এতটুকু পরিবর্তনও হল না। বরং কখনো যুক্তি দিয়ে কখনো আবেগ দিয়ে কখনো বা বৃত্রের পৌরুষত্বে আঘাত দিয়ে তার প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ঐন্দ্রিলা, জাগাতে চাইলেন তার বীরত্বকে।

যেন দংশন করার আগে ফণা তোলা সাপের মতো ঐন্দ্রিলার এই মূর্তি। তার মূর্তি দেখে এ যুক্তিতে বৃত্রের মনে পুনরায় দর্প প্রত্যয় ফিরে এলো। ঐন্দ্রিলা তখনো বলে চলেছেন তীব্র বিদ্রুপে,-

স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি-শচী ফিরে দাও।
ফিরে দাও শচী পতির নিকটে,
নিজে ভেট বাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ, আমি তার দাসী হয়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র-করে।

বৃত্রের তেজ ফিরে এলেও এত কথা শুনেও তিনি কিন্তু নিঃসংশয় হতে পারছেন না তখনো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন,-

শচীরে ছাড়িব আমি তুষিত মহেশে।

বৃত্র যত শিবভক্তই হন না কেন এখানে যেন তার ভক্তি নয়, ব্যক্তিত্বহীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। যাইহোক তিনি রতিকে পাঠিয়েছেন শচীকে কারাক্লেশ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য।

এই কাব্যে **এয়োদশ সর্গটি** খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সর্গেই বর্ণিত হবে দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনী। শূন্য পথে দধীচির আশ্রমের দিকে যেতে যেতে ইন্দ্র লক্ষ করলেন এক সুরম্য অরণ্য। এখানে কবি তাঁর কল্পনার অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ দেখছি সেখানে দিব্যাঙ্গনারা বিভিন্ন জীবজন্তুর ছদ্মবেশেধারণ করেছেন, যেমন,-

কুরঙ্গিনী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা,
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্তহর।

ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হলে সেই অঙ্গনাগণ তাঁকে ঘিরে ধরে 'পশুপক্ষি রূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে, থাকার যন্ত্রণা প্রকাশ করেছে এবং তারপর তারাই ইন্দ্রকে দধীচির পবিত্র আশ্রমের পথ নির্দেশ করেছে। তারা একথাও জানিয়ে দিয়েছে,-

জীব-চূড়ামণি
আপনি দিবেন দেহ দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত, অমরপতি।

ইন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন দধীচি মুনির আশ্রম যেখানে আছে সেই তপোবনে, সেখানে তখন,-

শিষ্যবৃন্দ আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য-অনন্যমানস;

ইন্দ্রের আবির্ভাবে আনন্দিত ঋষি দধীচি যথার্থ অতিথি সৎকার করলেন। ইন্দ্র যখন তাঁকে নিজ অভিপ্রায় জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত তখন ধ্যানেতে সে অভিলাষ জানতে পেরে নরশ্রেষ্ঠ এই ঋষি আত্মত্যাগের মহান ব্রতে ব্রতী হতে পারবেন বলে উফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন,-

পুরন্দর, শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি-পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি।
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত।

তিনি দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর শিষ্যবৃন্দ অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন। মহাঋষি তখন তাঁদেরকে জীবনের সার সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বললেন,-

এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় ক জন?
... ...
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতধারা-ক্ষয়,
হায়, অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
ত্যাজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?
হে ক্ষুদ্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,

নরেের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।

এ হেন ঋষিকে বরদান দেবতারও অসাধ্য। তিনি তো ত্যাগের জন্য বর চাননা। এ হেন নিষ্কাম সাধক বলেই তো তাঁর মতো মানুষের পুণ্যফল আজ দেবতার প্রয়োজন হয়েছে। দেবেন্দ্র পুরন্দর ঋষি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বললেন,-

সাধু-শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক,
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন।

তিনি এই বলে ঋষিকে শুভাশিষ জানালেন,-

তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব-
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে।

এবার শতবাহু বটমূলে গঙ্গাজল শোধিত যে আসন পূর্বেই দধীচি মুনির শিষ্যরা প্রস্তুত করেছিলেন সেখানে উপবিষ্ট হলেন ঋষি। চারদিকে চতুর্বেদ গান এবং হরিসঙ্কীর্তন শুরু হল। নয়নবন্ধ করে ঋষি ধ্যানে বসলেন। কবির কলমে তাঁর দেহত্যাগের দৃশ্যটি পরম মহত্বে ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে,-

মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভঃস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন-লতা-তরুকুল শোক-অবনত।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি-
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ-ক্ষণে শূন্যে উঠি-

মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য-হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ জুড়ি
পুষ্পাসার বরষিলে মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

দধীচির এই সুমহান আত্মত্যাগ মানবজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে। যুগে যুগে তার ত্যাগে উজ্জীবিত হয়েছে স্বার্থত্যাগী মানুষ। দেবতার দেবত্বও যেন এই ত্যাগের কাছে লঘু হয়ে গেছে।

চতুর্দশ সর্গে দেখি শচীকে অমরায় ফিরে পেয়ে অমরাবতী পুনরায় হাসিতে-পুষ্পেতে প্রফুল্লিত হয়ে উঠেছে। সবাই যেন বন্দিনী শচীর দুঃখহরণ করতে চাইছে। চপলা পূর্বের সুখস্মৃতির প্রতি শচীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বলেছেন,-

স্বর্গ নহে, চপলা, এ ইন্দ্রাণীর কারা।

দানব অধিকৃত স্বর্গভূমি তার দুঃখকেই আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেছে। রতির মুখে তিনি পুত্র জয়ন্তর চেতনা প্রাপ্তির সংবাদ শুনেছেন,-এইটুকু যা সান্ত্বনার। এমন সময়ে রতি এসে জানিয়েছে শিব ক্রোধানলে ভীত দনুজ-ঈশ্বর বৃত্র,-"ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।" শচী স্বর্গের রাণী সুলভ ব্যক্তিত্ব, আত্মস্বাতন্ত্র্য, গরিমার পরিচয় দিয়ে প্রথমে বলেছেন এসবই দৈত্য পত্নী ঐন্দ্রিলার কূটখেলা কিম্বা দৈত্যেশ্বরের ছলনা। না হলে যার কেশ আকর্ষণ করে স্বর্গে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে তারা ছেড়ে দেবে এত সহজে? আর তারপরেই বলেছেন, ছেড়ে যদি দেয় তাহলেও তিনি সে দয়ার দান গ্রহণ করবেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন,-

শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তারে বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,

অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?
রতি, কহ গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।

এই সর্গে একদিকে শচীর এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে, স্বর্গের শোভাহীনতার দুঃখপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে যেমন দেশপ্রেমের বাণী উচ্চারণ করতে চেয়েছেন হেমচন্দ্র-অন্যদিকে তেমনি দৈত্যদের সে শোভাহরণকারী রূপকে তুলে ধরেছেন,-

অই সেই কমলার কমল-আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা! দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার।

পঞ্চদশ সর্গে আবার বীররস আর রৌদ্ররসের দেখা পাব কারণ এই সর্গের বিষয় হল দেবতা আর দনুজের সংগ্রাম। স্বর্গপুরীর উত্তর তোরণে স্বয়ং বৃত্র রুদ্রপীড়কে সেনাপতিপদে বৃত করে যুদ্ধে রত হলেন। সেখানে দেবতাদের মধ্যে থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন বায়ুদেবতা প্রভঞ্জন, জলদেবতা মার্তন্ডদেব, শিব-পুত্র দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়। পূর্বদ্বারে দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করছেন অনল দেব এবং শচীপুত্র জয়ন্ত।

পূর্বদ্বারে যুদ্ধে জয়ন্তের পরাক্রমে দৈত্যসেনা ছত্রভঙ্গ হল। রুদ্রপীড় অসম্ভব পরাক্রম দেখিয়েও দৈত্যদের ফেরাতে পারলেন না। তখন তিনি রুধিরাক্ত কলেবরে নিজেই রণভঙ্গ দিলেন। ওদিকে বায়ুকুলপতির বীরত্বের কাছে পরাভূত হয়েছে জটাসুর, মার্তণ্ডের জ্বলন্ত প্রতাপে পরাভূত দানব দন্তবক্র, বরুণের হস্তে পরাজিত দৈত্য সিংহতুন্ড। দেখতে দেখতে-

ছাইল সমরাঙ্গন দৈত্য-শব-দেহ

এই পরিস্থিতিতে দানবের পরাজয় সহ্য করতে না পেরে এবার প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন বৃত্র,-

তুলিয়া তখন মহা খড়গ-ভিন্দিপাল-
বিশাল জ্বলন্ত প্রান্ত খড়গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম-ভিন্দিপালে,
সহিতে লাগিলা বেগে দেব-চমুরাশি।

সে পরাক্রমের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না দেবতারা। জ্বলনে অস্থির, অস্ত্র-প্রহারে আকুল' হয়ে তারা স্বর্গতল ছেড়ে অন্তরীক্ষে গমন করে সেখান থেকে যুদ্ধ শুরু করলেন। অসংখ্য দৈত্য-সেনার পতন হতে লাগল। বৃত্র কিন্তু তখনো অজেয়, তখনো তার অদ্ভুত বীরত্ব-

দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি সঘনে বাহু ঘন লক্ষ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার-ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর-শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈল ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদুরে নিক্ষেপি।

তখন দেব সেনাপতির নির্দেশে দেবতারা আরো দূর অন্তরীক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। লন্ডভন্ড হল দৈত্যব্যূহ।

তখন বুত্র নিরুপায় হয়ে শিবশূল নিক্ষেপ করলেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে। দেবতারা তখন এক অদ্ভুত আঁধার সৃষ্টি করে নিজেদেরকে সে আঁধারে লুক্কায়িত করলেন। সংহারশূল অন্তরীক্ষে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে ফিরে এল বৃত্রেরই হাতে। সেই প্রচণ্ড অন্ধকারে একমাত্র প্রজ্জ্বলিত শূলের কিরণে বৃত্র দেখলেন এ তো

রণস্থল নয়, শবস্থল। সে প্রাঙ্গণে তিনি একা দন্ডায়মান, অদূরে ধূলি-বিলুণ্ঠিত দৈত্য-পতাকা। তখন তিনি সে পতাকা নিজে তুলে নিয়ে চিন্তিত মুখে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যোড়শ সর্গে অপূর্ব সুন্দর নন্দন কাননে ঐন্দ্রিলা বৃত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সময়ে রতি এসে জানালেন শচী কারাবাস যন্ত্রণা সহ্য করবেন বলে জানিয়েছেন কিন্তু তিনি দৈত্য অধিকৃত প্রাসাদে কখনোই যাবেন না। এ সংবাদে ঐন্দ্রিলা বিদ্রূপের সুরে বললেন,-

সাবাস মানিনি
বৃথা কি হবে সে অসুরের বাণী
'শচীর, উদ্ধার'?-যাবে লো আপনি
এ সব রাখি।।

তারপর রতিকে বললেন তাকে এমন করে সাজিয়ে দিতে যাতে তিনি যুদ্ধক্লান্ত বৃত্রের শ্রান্তি অপনোদন করে তার মনোহরণ করতে পারবেন ও নিজের কার্যসিদ্ধি অর্থাৎ শচীকে দাসী বানানোর ইচ্ছা সফল করতে পারবেন। পরে বৃত্র আসলে তার পরিকল্পনাই সফল হয়েছে, ঐন্দ্রিলার বাক্যে তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী শচীর উপর দৈত্যের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি ঐন্দ্রিলাকে বলেছেন,-

যে বাসনা তব তার দর্প হরি,
পুরাও মহিষি,-ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী।

এ সর্গটির উপস্থাপনা ত্রুটিযুক্ত। আগের সর্গে যুদ্ধদৃশ্য সৃষ্টিতে কবি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তারপরে এই সর্গটিকে তিনি বড় বেশি লঘু করে ফেলেছেন। ঐন্দ্রিলার মুখে শচীর না আসার কথা শুনে বৃত্র যেমন করে চুল ছিঁড়েছেন তাঁর মতো বীরের পক্ষে তা বড়োই বেমানান আর বারবারই ঐন্দ্রিলার ছলাকলার কাছে তার বাঁধা পড়ে

যাওয়া এটিও তার ত্রিভুবনজয়ী কৃতিত্বকে ছোট করে দিয়েছে।

সপ্তদশ সর্গে বৃত্রের সভায় মন্ত্রী সুমিত্র জানাচ্ছেন যে,-

দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে,
মরি লাজে কত হায়, না হয় গণনা-
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে।

তিনি আরো জানালেন,-

অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা।

এমন সময়ে রুদ্রপীড় এসে তার হারের জন্য তিনি যে লজ্জিত তা জানালেন এবং পুনরায় যুদ্ধের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু এইবার পুত্রকে অনুমতি দিতে বীর বৃত্রের কোথায় যেন বুক কেঁপেছে কারণ তিনি জেনেছেন দেবেন্দ্র এবার ফিরে এসেছেন যুদ্ধে যোগ দিতে। তিনি সমরে দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্র ছাড়া আর কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না, এমতাবস্থায় একজন পিতা কিভাবে পুত্রকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে পাঠাতে পারেন? তিনি যত বড়ো যোদ্ধাই হন।

তার সনে সমরে পশিবি একা তুই?
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।

রুদ্রপীড় কিন্তু বীর পিতার বীর পুত্রের মতোই জবাব দিয়ে বলেছেন,-"মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া। বৃত্র এ হেন বাক্যে তাকে অনুমতি না দিয়ে পারেননি, বলেছেন-

যাও রণে, অরিন্দম পুত্র রণজয়ী।

পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রুদ্রপীড় গেছে মাতার আর্শীবাদ নিতে।

হেমচন্দ্র বোধ হয় এ সর্গে-দেখতে চেয়েছেন যে যত কঠোর কঠিনই কিংবা কুটিলই হা◌েক না কেন, সন্তান-স্নেহ সকলের অন্তরেই প্রবহমান। ঐন্দ্রিলার মতো দানবী-স্বভাবাও রুদ্রপীড়কে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছেন। তার চোখও জলে ভিজেছে। রুদ্রপীড় নিজের অন্তিম অবস্থা উপস্থিত হতে পারে ভেবে যখন মা কে বলেছে-

রেখো মা চরণে ইন্দুবালা সরলারে

তখন ঐন্দ্রিলা তাকে বলেছে,-

একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর ত্রিশূলে।
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।

রুদ্রপীড় স্বভাবতই তার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় একথা জানিয়ে পত্নীর কাছে গিয়েছেন এবার বিদায় চাইতে। ইন্দুবালাও তাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু রুদ্রপীড় তাকেও স্নেহচুম্বন প্রদান করে যুদ্ধে চলে গেছেন। তখন ইন্দুবালা পতির মঙ্গলকামনায় শিবপুজো করতে গেছে কিন্তু সেখানে বিপত্তি ঘটেছে যা কিনা অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে হয়েছে ইন্দুবালার,-

সহসা কাঁপিল হস্ত দানবালার,
কাঞ্চন-মঙ্গল-ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেবমূর্তি পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।

ইন্দুবালা অচেতন হয়ে পড়েছে এই ঘটনায়। তখন রতি তাকে শচীর দুঃখ কাহিনী বিবৃত করে সান্ত্বনা দিয়েছে। ইন্দুবালা এই সর্গে যুদ্ধবিরোধী যে মনোভাব প্রকাশ করেছে তা একদিকে যেমন ইন্দুবালার কোমল প্রাণের প্রকাশ অন্যদিকে কবির যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণারও প্রতিফলন।

অষ্টাদশ সর্গে দেখা যায়, শচীর পায়ের কাছে বসে ইন্দুবালা শচীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে স্বর্গের অতীত গৌরবের কথা, কৈলাস, বিষ্ণুলোক ও ব্রহ্মলোকের বৃত্তান্ত শুনছিল। এমন সময়ে রতি খবর দিল চেড়ী দল নিয়ে বাঘিনীর মতো ঐন্দ্রিলা আসছে। রতি ইন্দুবালাকে লুকাতে বললে, শচী চপলাকে দেব অনলের কাছে পাঠিয়েছেন ইন্দুবালাকে রক্ষার নিমিত্তে।

ঐন্দ্রিলাও প্রথমে শচীর নিরাভরণ সৌন্দর্য্যে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে,-

নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন;

নিজের অজান্তেই এ নিজেকে প্রশ্ন করেছেন,-

কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা?

কিন্তু তারপরেই সম্বিৎ ফিরে এসেছে তার এবং মনের মধ্যে ঈর্ষার আগুন আরো দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠেছে যখন তিনি দেখেছেন শচীর পদতলে বসে আছে ইন্দুবালা। প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি বলে উঠেছেন,-

আমার কিঙ্করী,-তার পদতলে
স্থান নিলি তুই?

চেড়ীদের বলেছেন ইন্দুবালাকে বেঁধে ফেলতে এবং ইন্দ্রাণীকে বলেছেন তিনি ইন্দ্রজালের দ্বারা ইন্দুবালাকে বশ করেছেন এবং তারপরেই তিনি ইন্দ্রাণীকে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন,-

ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ,
শচী বক্ষঃস্থল করে নিরীক্ষণ;

এমন সময়ে সেখানে চপলার সাথে অনল এবং জয়ন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন

শচী তখন তাদেরকে ইন্দুবালাকে রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন। জয়ন্ত ঐন্দ্রিলাকে বন্দী করতে চাইলে তিনি ভীষণ খঙ্গ তুলে আক্রমণোদ্যতা হয়েছেন। অনল আর জয়ন্ত যখন তিনি নারী বলে তার অঙ্গে শর নিক্ষেপ করতে ইতস্তত করছেন তখন সেখানে কৈলাসের দূত বীরভদ্র উপস্থিত হয়ে শচী এবং ইন্দুবালা উভয়কেই নিয়ে কৈলাসে গমনোদ্যত হয়েছে এবং যাওয়ার আগে ঐন্দ্রিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে গেছে,-

শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরু শিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে-
অসুরনিধন নিকট অতি।

ঐন্দ্রিলার মতো ভীমা রমনীও এবার অচল হয়ে পড়েছেন।

এই সর্গে কবি কিছু কিছু নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন শচী ও ইন্দুবালাকে ঘিরে যে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা চেড়ীসহ ঐন্দ্রিলার আগমনে কলুষ কঠোর হয়ে ওঠা, চেড়ীদের ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা, শচীকে লক্ষ্য করে ঐন্দ্রিলার পদাঘাতে উদ্যত হওয়া,বীরভদ্রের আগমন ইত্যাদি মুহূর্তগুলি যথেষ্ট নাটকীয় হয়েছে।

উনবিংশ সর্গের বিষয় বিশ্বকর্মা কর্তৃক বজ্র নির্মাণ। তিনি পাতালে তাঁর শিল্পশালায় দধীচির পবিত্র অস্থির সাথে বিবিধ ধাতুর মিশ্রণে বজ্র নির্মাণ করেছেন। এই স্থলে প্রথমে বিচিত্র ধাতুর বর্ণনা যেভাবে উঠে এসেছে তা বিজ্ঞানের দিক থেকেও প্রশংসার্হ-

কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী গর্ভে-শত শত যেন-
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী-জঠরে, কোনখানে শোভে

শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত আলোকে
আভাময়;

এরপর রয়েছে অগ্নি প্রজ্জ্বলন যন্ত্রের বর্ণনা,-

জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে
নলজি অন্যমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িতে জাঁতা ধাতু বিনির্গত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি-ছুটিছে পবন।
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।

এহেন যন্ত্র নিয়েই কর্মে রত বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মা-

বিপুল শরীর
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লৌহবৎ
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়;

এইস্থলে আবির্ভূত হলেন বাসব। তাঁকে জানালেন বৃত্রবধ হেতু বজ্র নির্মাণের কথা। বিশ্বকর্মা সেই সব শুনে দধীচির অস্থি নিয়ে প্রবেশ করলেন কর্মশালায়। তারপর শুরু হল বজ্র নির্মাণ প্রক্রিয়া। অপূর্ব দক্ষতায় সে নির্মাণের বর্ণনা দিয়েছেন হেমচন্দ্র,-

অষ্ট জ্বালামন্ত্রে অষ্ট কটাই বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে,
দিলা অষ্টধাতু তায় লৌহাদি কাঞ্চন;
দাঁড়াইলা শূমী-পাশে সাপটি মুদগর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্টধারে একেবারে-দৃশ্য ভয়ঙ্কর;

ঘন ঘন মুদগরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,
করি ভীম পিন্ডাকৃতি শিল্পিকুলরাজ
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি
গলিত না হয় তাহা অত্যুষ্ণ অনলে
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্মা দুরন্ত উত্তাপে
ধরি তড়িত্তাপ-যন্ত্র, দুই কেন্দ্রে ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর।

এবার অষ্টধাতু পিন্ডের সাথে সেই পিন্ড মিশিয়ে বিশ্বশিল্পী বজ্রের গঠন আরম্ভ করলেন।

এরপরে সেই বজ্রে করা হল নানা অলংকরণ। সাত দিন সাত রাত ব্যাপী চলল সে নির্মাণকার্য তারপর অষ্টম দিবসে সম্পূর্ণ হল মহাকার্য। এরপর বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে বর্জ্য ব্যবহারের নিয়মবিধি জানালেন,-

হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক হ'তে
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ
লোহিত শ্যামল শ্বেতবরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিলা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এভাবেই তাঁদের তেজোরাশি দান করলেন বজ্রদেহে। তখনি ভীষণ শব্দে সেই বজ্র গর্জন করে উঠল। তার তেজে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তাকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র সেই, ব্রজ্রধারণ করে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য

গমন করলেন।

বিংশ সর্গে আবার দেবাসুরের সংগ্রাম। হেমচন্দ্র বিস্তৃত বিবরণ এঁকেছেন সে সংগ্রামের। এই সর্গে রুদ্রপীড় তাঁর অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। পূর্বে তাঁর জয়ন্ত ও অনলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল এবার যেন তার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। এবার আবার তাঁরা মুখখামুখি হয়েছেন,-

ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর
ভীমরুদ্র মূর্তি ভীম ধ্বজে যার-
ছোটে জয়ন্তের অরুণ স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোরদরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন পথ।

ওদিকে সুমেরু শিখর থেকে শচী এবং চপলা এই যুদ্ধ দেখছিলেন। রুদ্রপীড়ের বীরত্ব দেখে শচী জানতে চাইলেন একাদশ রুদ্রের সাথে যুদ্ধরত ঐ বীর কে? সঙ্গে আছে ইন্দুবালা সে শচীদের কাছ থেকে যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে লাগল। রুদ্রপীড়ের বাণে জর্জরিত হলেন একাদশ রুদ্র। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য বৈশ্বানর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এবার বহ্নির সাথে যুদ্ধ বাঁধল রুদ্রপীড়ের। অগ্নিদেব রুদ্রপীড়ের রথ ভেঙে দিলেন। এবং যখন তিনি ভগ্নরথে উঠে রুদ্রপীড়ের ধনুভঙ্গ করছেন তখন রুদ্রপীড় এক অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি গিয়ে দখল নিলেন অগ্নির রথের। এবং অগ্নির অস্ত্র দিয়ে তাঁকেই আঘাত করলেন,-

নিলা অনলের ধনুর্বাণ তূণ,
কামুকে বসায়ে দিব্য নব গুণ,
গর্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গের প্রায়
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি।

সবাই রুদ্রপীড়কে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। বৈশ্বানরকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলেন জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার। বৃত্র তখন অনলের গলা লক্ষ করে বাণ নিক্ষেপ করলে তার শ্বাসরোধ হয়ে এল। যাইহোক, তাকে উদ্ধার করে জয়ন্তের রথে তা়েলা হলে কুবেরের সাথে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ বাঁধল। কুবেরকেও পরাজিত করলেন রুদ্রপীড়। তখন শচী চপলাকে দিয়ে জয়ন্তকে বলে পাঠালেন রুদ্রপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধ না করার জন্য। জয়ন্ত রণে ভঙ্গ দিলে রুদ্রপীড় দেবসৈন্যকে বিপুল বিক্রমে পরাভূত করতে লাগলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তার কাছে পরাজিত হলেন। উপায় না দেখে দেবসেনারা পালাতে লাগলেন। শচী সেই বীরত্ব দেখে বলে উঠলেন,-

আমার তনয় হইলে এখনি,
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি,
কি বীর্য সাহস কি শিক্ষা-কৌশল!
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শত্রু বটে ধন্য বীর বাখানি।

স্বাভাবিকভাবেই দেবতাদের মধ্যে রুদ্রপীড়ের বিধ্বংসী যুদ্ধ নিয়ে আললাড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তবে কি বৃত্র এবং রুদ্রপীড় দুজনেই অজেয়? তখন সূর্যদেব বললেন যে প্রথায় যুদ্ধ করা হচ্ছে। তা ত্যাগ করে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ প্রলয় মূর্তি ধারণ করা উচিৎ,-

নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ।

যখন সবাই সেইমত রূপ ধারণ করতে প্রস্তুত জলদেব বললেন এতে তো বিশ্ব লয় হয়ে যাবে! দুজন কে পরাস্ত করার জন্য সমগ্র প্রাণীকুলের বিনাশ কি যুক্তিযুক্ত? এটি কি দেবতাদের উচিত কার্য হবে? এভাবে যখন দেবতাদের মত বিনিময় চলছে শূন্যে শোনা গেল ভৈরব নির্ঘোষ, সে সিংহনাদ শুনে অমর, দানব সকলেই শুন্যেতে চাইলেন, দেখা গেল ইন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেবতারা সকলে আনন্দে সিংহনাদ

করে উঠলেন, শচীর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মহিমায় ইন্দুবালার মুখের দিকে চেয়ে তিনি উল্লাস প্রকাশে বিরত থাকলেন।

এদিকে কৈলাসে শচীকে পদাঘাতকারিণী ঐন্দ্রিলার ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ মহামায়ার ক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সূত্রপাত ঘটেছে **একবিংশ সর্গের**। তিনি জানালেন ঐন্দ্রিলার দম্ভ তিনি মুহূর্তেই নাশ করতে পারেন বৃত্র বর করে। কিন্তু তিনি বৃত্রকে বধ করলে যে ইন্দ্রের অগৌরব। অতঃপর মহামায়া ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।

এভাবেই সৃষ্টিকার্য দেখতে দেখতে তিনি উপস্থিত হলেন ব্রহ্মলোকে। বিরিঞ্চিকে তিনি ঐন্দ্রিলার দুষ্কর্মের কথা জানিয়ে বললেন মহেশ কে তিনি এ সংবাদ দিতে পারছেন না, পাছে প্রলয়তাণ্ডবে সৃষ্টি ধ্বংস হয় কিন্তু ঐন্দ্রিলা বা বৃত্রের শাস্তি না হলে কেউ আর পরচিত্তে পীড়া দিতে শঙ্কিত হবে না। ইন্দ্রের পত্নীরই যদি এ দশা হয় তবে অন্যান্যদের কি উপায় হবে। অনুরোধ করলেন,-

দর্প চূর্ণ কর দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ-কর বিধি,

বিরিঞ্চি ও উমা অতঃপর গেলেন বৈকুণ্ঠে এবং তিনজনে মিলে উপস্থিত হলেন কৈলাসে। সেখানে মহাদেব তখন ধ্বংসের অপূর্ব গতি নিরীক্ষণে মগ্ন। কবি অপূর্ব দক্ষতায় বর্ণনা দিলেন সে দৃশ্যের,-

দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে।
সে লয়, প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।

এই যোগীবরকে এবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরী মিলে শচীর অপমানের কথা বিদিত করলেন এবং তাঁর কাছে এর প্রতিবিধান চাইলেন। সে সব কথা শুনতে শুনতে মহাকালের ক্রোধমূর্তি জাগরিত হয়ে উঠলে বিষ্ণু তাঁকে শান্ত করলেন। তখন মহেশ বিষ্ণুকে বললেন তাঁর বরেই বৃত্র আজ দুর্বিনীত, কিন্তু ভক্তের ডাকে কোন দেবতাই বা

সাড়া না দিয়ে পারেন। আজও বৃত্রের জন্য তিনি ব্যথিত হলেন। অত্যাচারী নিজ কর্মদোষেই মজে একথাও সত্য তাই এবার তিনি বিষ্ণুকেই অনুরোধ করলেন বৃত্রকে ধ্বংস করার জন্য। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু তখন বৃত্রের ভাগ্যলিপি নাশে সম্মত হলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনই অন্তর্হিত হয়ে একত্রে মিলিত হয়ে পর-ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হলেন। এবং ঘোরশূন্যে ঘোরধ্বনি শোনা গেল,-

বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত

ওদিকে ভাগ্যদেব বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বসে জগতের প্রাক্তন-লিপি প্রত্যক্ষ করছিলেন। সে ভাগ্য আলেখ্যপটে বৃত্রের বিশালচিত্র উজ্জ্বলরূপেই প্রতিভাত হচ্ছিল। অকস্মাৎ শাোনা গেল উক্ত দৈববাণী এবং দেখা গেল বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমামণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে,-

বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমা-মণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে-শোভা-বিরহিত।

দ্বাবিংশ সর্গে দেখি ঐন্দ্রিলার অপরাধপ্রবণতা এখনো শেষ হয়নি, এখনাে নেভেনি ঈর্ষার আগুন। তিনি বৃত্রের কাছে বিষণ্ন বদনে উপস্থিত হয়েছেন। বৃত্র তখন পুত্রের বীরত্বে উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত। ঐন্দ্রিলাকে এহেন বিষাদাচ্ছন্ন দেখে তিনি অবাক হয়েছেন।

দ্বাবিংশ সর্গে তখন ঐন্দ্রিলা কত না ছলনা করে বৃত্রকে জানালেন যে তিনি ইন্দুবালা কে হারিয়েছেন, -"ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার।" এখানে বৃত্রের কোমল হৃদয়ের সন্ধান পাব যখন তিনি ভেবে নিলেন ইন্দুবালা মৃত এবং বলে উঠলেন,-

ইন্দুবালা নাই মম, সে সুধাংশু নিরুপম,
ডুবেছে কি অস্তাচলে?- পাব না কি আর
দেখিতে সে নিরমল পীযুষ-আধার ?

ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুঃখে জানালেন এমন কথা বৃত্র যেন মুখেও না আনেন। আসলে 'সাপিনী' 'কুটিলা' শচী কপট ছল করে তাকে নিজের সাথে নিয়ে গেছে। তিনি বৃত্রকে নিয়ে স্বর্গ প্রাচীরে উঠে সে দৃশ্য দেখালে বৃত্র কুপিত হয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই সে দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রুদ্রপীড়ের উপর। তিনি তখন বীরবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। তিনি সব ভুলে মহানন্দে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। রুদ্রপীড় জানতেন বাসব সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। তাই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে তাঁর মৃত্যু হলেও হতে পারে কিন্তু পরক্ষণেই মৃত্যুর কথা ভুলে তিনি পণ করেছেন সুরাসুর আজ অদ্ভুত যুদ্ধ দেখবে। এবং যদি মৃত্যুও হয়,-

দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন,

শুধু সারথিকে তিনি বলে দিলেন সে যেন দেখে মৃত্যুর পর তাঁর দেহ কেউ যেন পদদলিত না করে, রাক্ষস পিশাচে ভক্ষণ না করে, যে অগ্নিচক্র রথ তিনি যুদ্ধে অগ্নিকে হারিয়ে লাভ করেছেন তা যেন তাঁর পিতাকে দেওয়া হয়, মায়ের দেওয়া অর্ঘ্য তিনি মৃত্যুকালেও মাথায় ধরে রেখেছেন তা যেন মাতাকে বলা হয়। আর ইন্দুবালাকে স্মরণ করে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে। এসবই বীর রুদ্রপীড়ের কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক।

এরপর বেঁধেছে ঘোর যুদ্ধ। যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ্রের যে পারদর্শিতা আমরা এ যাবৎ দেখেছি এ স্থলে তা আরো উৎকর্ষ লাভ করেছে। রুদ্রপীড়ের সাথে একে একে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ভাস্কর, বরুণ, কার্তিক, পবন। তিনি সবাইকেই পরাস্ত করেছেন। ভাস্করের রথচূড়া ভেঙ্গে গেছে, বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে হয়েছে অস্থির, বৃত্রসুত তেজে জর্জরিত হয়েছেন পার্বতীপুত। এহেন বীরত্বে দেবাসুর সকলেই মুগ্ধ হয়েছে,-

চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত,

উন্মত্ত অসুর দল, হেরি দৈত্যসুত বল,

সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন,

"সাধু রুদ্রপীড়-সাধু বৃত্রের নন্দন।"

সে গর্জনধ্বনি শুনে বৃত্র প্রাচীর শিখরে পুত্রকে আশীর্বাদ হেতু উঠে দাঁড়ালে তার সেই মহাকাল স্বরূপ দেহ, তিন নেত্রে রক্তিমাভা দেখে দেবযোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

তিনি হাত প্রসারণ করে পুত্রকে আশীর্বাদ করলে রুদ্রপীড় ধনু হেলিয়ে তার জবাব দিয়েছেন। বৃত্র পুত্রকে জানিয়েছেন অবিলম্বেই তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। এই বলে তিনি যোদ্ধাবেশ ধারণ করতে গিয়েছেন।

দেবতারা এবার একত্রে আক্রমণ করেছেন রুদ্রপীড়কে। তাঁরা প্রথমেই রুদ্রপীড়ের রথকে ভঙ্গ করেছেন। রুদ্রপীড় তখন রথ থেকে নেমে এসে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। কখনো তরবারি দিয়ে পবনের গদাকে শতখণ্ড করেছেন, কখনো শরাঘাতে বিপর্যস্ত করেছেন প্রভাকর কিংবা বরুণকে। তার বীরত্বে,-

লণ্ডভণ্ড দেব-রথী বিমান-মণ্ডলী।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শিলামুখে বরিষণ,
ধাতুর বর্তুল পিন্ড ঝলকে ঝলকে,-
ভাঙ্গে রথ ধনু অস্ত্রে পলকে পলকে;
ভাঙ্গে প্রভাকর-রথ ক্ষার দন্ধ যেন;
বরুণের দিব্য যান, ক্ষণমধ্যে খান খান,
কোটিখণ্ডে কার্তিকের বিমান ভাঙ্গিল,
দেবরথি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

এইবার দেবেন্দ্র প্রবেশ করলেন যুদ্ধস্থলে। প্রচণ্ড বেগে মহাশর দিয়ে আঘাত করলেন রুদ্রপীড়ের ধুমদণ্ডের উপর। তার হাত থেকে দণ্ড খসে পড়লে ইন্দ্র রুদ্রপীড়ের কাছে গিয়ে তার বীরত্বের প্রশংসা করলেন এবং তাকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বললেন। রুদ্রপীড়ের জবাব প্রত্যাশিতই ছিল, তিনি বললেন যদি মরতেও হয়

তিনি মৃত্যুবরণ করবেন কিন্তু এ সমরক্ষেত্র ছেড়ে যাবেন না। ইন্দ্র তখন সারথি মাতলিকে আদেশ করলেন ভগ্নরথ রুদ্রপীড়কে নতুন রথ এনে দিতে। এরপরে শুরু হল সমান দুই প্রতিপক্ষের ভীষণ যুদ্ধ। এক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের বর্ণনা মহাকাব্যোচিত প্রতিভার দাবী রাখে,-

কিবা কোদণ্ডের গতি-শিঞ্জিনীর ক্রীড়া,
ফিরিছে বিমানদ্বয়, রণক্ষেত্রে সমুদয়,
ক্ষণে দূরে-ক্ষণে কাছে-ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন আবার অন্তরে।
ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু,
ধড়া অঙ্গ কেহ কার, যেন রঙ্গে নিত্যকার,
নর্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ-মন্দিরে-
না ঠেকে বাহুতে বাহু-শরীরে শরীরে।
কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,
পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোত দূরে, শূন্যে যেন ঘুরে
দুই বাজপক্ষী ফেরে পক্ষ, সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ রুধিরে ভিজিয়া।

এইভাবেই যুদ্ধ চলতে লাগল কিন্তু একসময় রুদ্রপীড়ের তূণ শেষ হয়ে এল আর তখনি ইন্দ্রের প্রচণ্ড শাঘাত এসে পড়ল তার শরীরে। খসে পড়ল তার মুকুট, খসে পড়ল তার ধনু। এই নক্ষত্রপতনের বর্ণনা দিয়ে কবি লিখলেন,-

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত,
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান,   অচ্ছিদ্র নাহিক স্থান,
ত্রেতায় করপতি শরেতে অস্থির।
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু শরীর।
উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল;   বক্ষঃ ভিজাইয়া জল,
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন;
নীরব অমর-দল বিষন্ন বদন।

এই সংবাদ সুমেরু শিখরে পৌঁছানো মাত্র ইন্দুবালা শচীর কোলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। রুদ্রপীড়ের শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সারথি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছে রুদ্রপীড়ের অঙ্গ আচ্ছাদন, কবচ, শীর্ষক, ধনু, রথ যেন সসম্মানে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ইন্দ্র সে কথা শুনে বলেছেন,-

এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে; .
চিন্তা নাহি কর চিতে,   আমি সে দিব বহিতে,
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ-
ইথে লয়ে পূর্ণ কর, বীর-মনোরথ।।

এই সর্গে রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালার মৃত্যু সমগ্র পরিবেশকে গভীর বেদনায় অশ্রুসজল করে তুলেছে।

এয়োবিংশ সর্গে দেখি পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রাসাদে ফিরে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বৃত্র। এমন সময় বিমানমার্গে ঘোর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল। বৃত্র উদগ্রীব হয়ে উঠে মন্ত্রীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানেন তাঁর পুত্র প্রভঞ্জন কিংবা বারিকুল, কুবের কিংবা জয়ন্তের সাথে লড়াই করতে পারবে একাকী কিন্তু ইন্দ্রের মুখোমুখি হলে যে সর্বনাশ। সেই সর্বনাশই যে হয়েছে তা বুঝতে

দেরি হল না। বহ্লিক, রুদ্রপীড় সারথি রুদ্রপীড়ের চিহ্ন সকল সযত্নে রাখল সভাস্থলে বৃত্রের পদতলে। হাহাকার করে বৃত্র বলে উঠলেন,-"দৈত্যকুলোজ্জ্বলবি গেছে অস্তাচলে। দূরে ফেলে দিলেন শূল। বুকে চেপে ধরলেন পুত্রের রণসজ্জা। সভাস্থ সকলে শোকে যখন মুহ্যমান, বহ্লিক রুদ্রপীড়ের শেষ সংগ্রামের অপূর্ব বীরত্বের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন।

-সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু
সে বীরের বীরদর্প-কিন্তু কভু হেন
অদভূত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু
না শুনিনু এ শ্রবণে! বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।

শুনতে শুনতে বৃত্রের শোকাশ্রু প্রতিশোধের আগুনে পরিণত হল। ভীষণ ভৈরব শুল দাপটে ধরে চীৎকার করে উঠলেন—

সাজ, রে,দানববৃন্দ-সংহারের রণে।

এমন সময় সেখানে প্রবেশ করলেন আলুলায়িত কেশ ঐন্দ্রিলা। তাঁর হৃদয় তখন তীব্র পুত্রশোকে জ্বলে উঠে প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় উন্মাদবৎ। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বৃত্রকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেছেন,-

দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও-
পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি-দিবে প্রতিশোধ-

ঐন্দ্রিলাকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে বৃত্র পুত্রের অন্ত্যেষ্টি সমাধা করার জন্যে সুমিত্রকে যখন নির্দেশ দিচ্ছেন তখন শিবদূত বীরভদ্র প্রবেশ করলেন এবং জানালেন ইন্দ্রাণী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ত্রিদিব শিখরে রুদ্রপীড় আর ইন্দুবালার দেহ একসাথে সৎকার করবেন যাতে তাদের স্মৃতি অমর হয়ে থাকে। ইন্দুবালার মৃত্যুর কথা শুনে বৃত্র আরো

দুঃখিত হয়ে উঠেছেন এবং রুদ্রপীড়ের দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মতি জানিয়েছেন। এরপর নেমে এসেছে এক কাল-রাত্রি। এ যুদ্ধের পরিণাম যেন জানা হয়ে গিয়েছে দৈত্যকুলের তবু যুদ্ধে যেতে হবে। অমরায় দৈত্যদের গৃহেগৃহে এ এক অদ্ভুত মুহূর্ত। প্রিয়জনকে বিদায় দিতে কারই বা মন চায়। মাতা-পুত্রে, পিতা-পুত্রে, সন্তানে-পিতায়, স্বামী-স্ত্রীতে এ যেন সেই চিরবিদায়ের আগের অভূতপূর্ব মিলন দৃশ্য। কবি নিপুণ দক্ষতায় বড়ো হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন সেই দৃশ্য-

পুড়িছে সবার বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ-চুম্বনে বিহ্বল।
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে! কেহ বা কাঁদিছে!
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল নিশাতে
বিদায় কতই মত। সখায় সখায়
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে।
আলিঙ্গন পিতা পুত্রে-জননী-আশিস,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত।

করুণ গাম্ভীর্য যুক্ত মহিমায় এই সর্গটি উপস্থিত করেছেন কবি।

শেষ অধ্যায়- শেষ যুদ্ধ দেবাসুরের। প্রভাত হতেই দেখা গেল দুপক্ষের সমুদ্রের মতো সৈন্য সমাবেশ।ইন্দ্র প্রধান দেবতাদের রণকৌশল নির্ধারণ করার জন্য ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল প্রত্যেকেই কমবেশী আহত হয়েছেন রুদ্রপীড়ের অস্ত্রের আঘাতে। সকলেই বজ্র নিক্ষেপে বৃত্রকে বধের আবেদন রাখলেন ইন্দ্রের কাছে। কিন্তু ব্রহ্মদিবা তখনো অবসিত হয়নি। কিন্তু দৈত্যের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেবকুল সেই ক্ষণ পর্যন্তও অপেক্ষা করতে চাইলেন না এবং ইন্দ্রের সমালোচনা করতে লাগলেন। ইন্দ্র সকলকেই নিরত করতে চেষ্টা করলেন এবং আত্মকলহ করতে নিষেধ করলেন।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন শিবদূত মহাকাল। জানালেন,-

বৃত্রের খন্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে। হে শচীবল্লভ,
বিলম্ব না করে আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃচুর্ণ কর তার; ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।

বৃত্র এবং ইন্দ্রের এই যুদ্ধ দেখবার জন্য যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ, দেবর্ষি, মহর্ষি সবাই জড়ো হলেন। ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোকও সে যুদ্ধ দেখতে কৌতুহলী হয়ে উঠল। হেমচন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বর্ণনা দিয়েছেন ইন্দ্রের ব্যূহ রচনার। পুষ্পক রথ এক্ষণে রুদ্রপীড়ের শব বহন করেছে অতএব ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবার পিঠে চড়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন স্থির হল। হেনকালে সুমেরু থেকে পুষ্পকে করে চপলা সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং শচীর বার্তা ইন্দ্রকে শোনাল। ব্রজকে দেখে চপলার রাঙা গণ্ডতল, সলজ্জ ভঙ্গিমা কিংবা চপলাকে দেখে বজ্রের ভীমরূপ ত্যাগ করে দিব্য তেজোময় অপূর্ব মূর্তি ধারণ ইন্দ্রের চোখে পড়েছে এবং তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখে তিনি চপলার স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন। যুদ্ধের পূর্বে রণভূমি আনন্দের সাক্ষী হল।

এদিকে ঐরাবত পৃষ্ঠে বৃত্র প্রবেশ করলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মহাকাব্যোচিত বর্ণনায় কবি লিখলেন,-

সাজিয়াছে রণসাজে দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর-বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গন্ডারের দৃঢ় চর্মপেটি
দুই উপবীতাকারে বান্ধিয়াছে ঘেরি
বক্ষোদেশে! বাম করে ধরেছে ফলক

সূর্যের মন্ডলবৎ-প্রচণ্ড, বৃহৎ,
দক্ষিণে ভৈরব-দত্ত শূল বিভীষণ;
ঐরাবত-করি পৃষ্ঠে বসেছে অসুর
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন।

দুই পক্ষের যুদ্ধ শুরু হল। ইন্দ্রের হাতে দৈত্যসেনা নিধন হতে দেখে বৃত্র তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন বৃত্রের সঙ্গে ভয়ে সমরে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সাধারণ সেনাদের বধ করছেন। তিনি ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে মহাশূল নিক্ষেপ করতে গেলে ইন্দ্র সুতীক্ষ্ণ শায়কে বিদ্ধ করলেন ঐরাবতের কর্ণমূল। ভীষণ যন্ত্রণায় সে দিশাহীন হয়ে ছুটতে লাগলে বৃত্র লাফ দিয়ে নেমে মনঃশিলাতলে শূল হস্তে দাঁড়ালেন, দূরে দেখতে পেলেন জয়ন্ত-পতাকা। তাকে দেখেই নিজ পুত্রশোক, ঐন্দ্রিলার বাক্য মনে পড়ে গেল তাঁর, মনে পড়ে গেল প্রতিজ্ঞার কথা। তিনি দেবরথীদের মথিত করে জয়ন্তর দিকে ধাবিত হলেন, ইন্দ্রও ওদিকে প্রচণ্ড বিক্রমে বধ করে চলেছেন কম্বোজ, হলায়ুধ, মহাসুর, খরখুর, খড়খড়ি, পিঙ্গল, শ্বেতকেশ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষদের। দৈত্যদল রণে ভঙ্গ দিতে লাগল।

জয়ন্তের দিকে বৃত্রাসুরকে ছুটে আসতে দেখে অনল, দিবাকর, অম্বুপতি, প্রভঞ্জন, প্রত্যেকেই তাকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলে যমের সাথে বৃত্রের প্রচণ্ড লড়াই বেঁধে গেল। কিন্তু প্রেতপতি যমও বৃত্রের গদার আঘাতে পরাস্ত হলেন। তখন দৈত্যরাজ জয়ন্তের পতাকা লক্ষ করে শূল তুললে ইন্দ্রের আদেশে পুষ্পক রথ জয়ন্তকে আচ্ছাদন করে দাঁড়াল। ইন্দ্র পুষ্পক ছেড়ে উচ্চৈঃশ্রবার পিঠে উঠে যুদ্ধ শুরু করলেন, তার হস্তোধৃত দম্ভোলি ডেকে উঠল প্রচণ্ড গর্জনে। বৃত্র তখন পিতাপুত্র দুজনকে লক্ষ করেই শূল ছুঁড়ে দিলেন,-

ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মুর্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল

প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে!

কিন্তু কৈলাসে শ্বেতবাহু সেই শুল দেখতে পেয়ে তা আকর্ষণ করে নিয়ে অদৃশ্য হলেন, -"অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে"। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বৃত্র বলে উঠলেন,-

হা শম্ভু তুমিও বাম।

প্রলয়ের বেগে ছুটে এসে তিনি ইন্দ্রের হাতের বজ্র ধরে টানতে গেলে তার ভীষণ জ্বালা সহ্য করতে পারলেন না। বিকটু চীৎকার করে তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ছিড়তে লাগলেন নক্ষত্রমণ্ডলী। ত্রিভুবনে প্রলয়ের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তিনলোক ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস হবার উপক্রম হল,-

উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণু প্রায়।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের লোক থেকে শুরু করে সবাই একত্রে বলে উঠলেন,-

হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপ
বধ বৃত্রে-বধ শীঘ্র বিশ্ব-লোপ হয়।

বৃত্রের প্রলয়কারী শক্তির সামনে ইন্দ্র যেন হতচেতন হয়ে পড়েছিলেন, সেই বিপুল কোলাহলে স্বপ্নে জাগ্রতের মতো হয়ে ছেড়ে দিলেন বজ্র,-

ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল-শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য; ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে-পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।

এতদিনে সম্পূর্ণ হল বৃত্রসংহার। কিন্তু ঐন্দ্রিলা কোথায়, ঐন্দ্রিলা? যাঁর ঈর্ষা,

দম্ভ, অহংকার এই সংঘটনের মূল! ঐ যে তিনি-সন্তান হারিয়ে, স্বামী হারিয়ে, সর্বস্ব হারিয়ে উন্মাদিনী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরছেন। এই তাঁর নিয়তি! মৃত্যুর মধ্যে যে শান্তিটুকু থাকে তার থেকেও তিনি বঞ্চিত।

সমগ্র সর্গটিতেই কবি অভূতপূর্ব ভাবে বীর ও রৌদ্ররসের সাথে গাম্ভীর্যময় করুণ রসের সহাবস্থানে এবং পরিমিতিবোধে, শব্দচয়নে, কল্পনার ঐশ্বর্যে মহাকবির আখ্যা পাওয়ারই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এখানেই চতুর্বিংশ সর্গ ব্যাপী বৃত্রসংহার' কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে।

একক – ৭ – চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম

২০৫.২.৭.১ : বৃত্র

২০৫.২.৭.২ : রুদ্রনীড়

২০৫.২.৭.৩ : ইন্দ্র

২০৫.২.৭.৪ : দধীচি

২০৫.২.৭.৫ : ঐন্দ্রিলা

২০৫.২.৭.৬ : ইন্দুবালা

২০৫.২.৭.৭ : শচী

২০৫.২.৭.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.২.৭.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.২.৭.১ : বৃত্র

'বৃত্র-সংহার' কাব্যের সর্গ পরিক্রমার শেষে আমরা এবার চরিত্রগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবো। প্রথমে বৃত্র চরিত্রটির আলোচনায় আসা যাক। প্রথম সর্গ থেকে শুরু করে শেষ সর্গ পর্যন্ত বিভিন্ন সর্গে রয়েছে তাঁর উপস্থিতি। বৃত্র চরিত্রটির উল্লেখ যেমন ভারতীয় পুরাণে এবং মহাকাব্যে রয়েছে তেমনি এর উৎস খুঁজতে শুরু করলে ইরাণীয় সংস্কৃতিতেও তার খোঁজ পাওয়া যাবে। ইরাণী ভাষায় অহুর অর্থাৎ যাকে ইন্দ্রের সমতুল্য ধরা যেতে পারে তাঁর সঙ্গে বৃত্রের যুদ্ধের কথা বর্ণিত আছে। সেখানে অহুর বা অহুরমেজদার হাতে বৃত্র নিহত হচ্ছেন বলে অহুরমেজদা 'বেরেত্রেঘ্ন' বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

হেমচন্দ্র বৃত্র চরিত্র পরিকল্পনায় পুরোপুরি পৌরাণিক আদর্শ অনুসরণ করেননি তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন আমরাও পূর্বে পুরাণ কিংবা মহাকাব্যে এই কাহিনীর উল্লেখ আলোচনা করেছি এবং সেইসুত্রে দেখা যাচ্ছে হেমচন্দ্র পৌরাণিক উৎসের সাথে

স্বীয় কল্পনা মিশ্রিত করেই বৃত্র চরিত্রের কল্পনা করেছেন।

হেমচন্দ্রের কাব্যের নামকরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে বৃত্রের বধই এই কাব্যের মূল বিষয়। সেইদিক থেকে বিচার করলে বৃত্রকেই কাব্যের মূল বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব, মহত্ব, বীরত্ব, চরিত্র দ্বন্দ্ব কিংবা শেষে তার পতনজনিত কারণে ট্রাজেডির গভীর শোকার্ত কোন কিছু পুরোপুরিভাবে বৃত্রচরিত্রটিতে দান করে চরিত্রটিকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেননি হেমচন্দ্র। বৃত্রের শিবভক্তি এবং বীরত্বের খবর প্রথম সর্গে দেবতাদের মুখ থেকেই শোনা গেছে, শোনা গেছে তাঁর প্রতাপে সুরবৃন্দ পাতালে প্রবেশ করেছে এবং তাঁর প্রতি 'সুপ্রসন্ন বিধি'।

যিনি তপস্যা দ্বারা শিবের মন জয় করে দেবজয়ী শক্তি অর্জন করেছেন, যার ভয়ে দেবতারা পাতালে প্রবেশ করেছে তাঁকেই কিন্তু দেখা গেল কত সহজেই স্ত্রী-র কথার বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। শচীর প্রতি ঐন্দ্রিলার বাক্যে যেখানে ঈর্ষা স্পষ্টতই বোঝা গেছে সেখানে বৃত্র তাকে রোধ না করে তার ইচ্ছাকেই পূর্ণ করবেন আশ্বাস দিয়ে নিজের ত্রিভুবনজোড়া বীরত্বের মহিমাকে খর্ব করেছেন। যখন তিনি বলেছেন,-

পাবে শচীসহ শচী সহচরী
অচিরে তোমার পূরিবে আশ।

তখন তিনি একবারও ভেবে দেখেন নি নিরস্ত্র পর-স্ত্রী কে হরণ করে নিয়ে এসে নিজের স্ত্রী-র দাসী নিযুক্ত করা এটি কখনো তাঁর মত শিবভক্ত বীরের কাজ হতে পারে না। হয়তো তীব্র জাতিবৈরিতা থেকেই এই হীনকর্ম করতে তিনি রাজী হয়েছেন।

বৃত্র যে বীর এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সে পরিচয় হেমচন্দ্র তুলে ধরেছেন বারবারই। দেবতাগণ পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করছে শুনে তৃতীয় সর্গে বৃত্র বলে উঠেছেন, প্রলাপ বাক্য, এখনো সত্য হতে পারে না তার কারণ-

দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।

কিংবা যদি সত্যই তাঁরা আসেন, ভয় কি?-

দেবতা আসিছে সত্য কিবা তাহে ভয়?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।

অর্থাৎ বৃত্র কখনোই যুদ্ধে ভীত নন। কিন্তু এই শক্তি, সাহস তাঁর নিজস্ব না সবটাই যে দেবতারা তাঁর শত্রু, যাদের তিনি বিতাড়িত করেছেন সেই দেবতারই শক্তির উপর নির্ভরশীল সেই প্রশ্ন উঠে আসে। পুত্রকে যখন তিনি দেবতার সঙ্গে তার যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন নিজের বীরত্বের কথা বলেও শিবদত্ত ত্রিশূল প্রহারেই যে 'বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে' সে কথা জানিয়েছেন। তবে শিব কৃপা অর্জন যে সহজে হয় নি সে তথ্যও দিয়েছেন হেমচন্দ্র। সে কৃপা অর্জনের জন্য ভীষণ তপশ্চর্যার প্রয়োজন তাও আমরা জানব কিন্তু সে বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় খণ্ডে। আপাতত প্রথম খণ্ডে একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক যা বৃত্রের চরিত্রের মহনীয়তা কে প্রকাশ করেছে। বৃত্রের সভায় নিকন্ধর নামক দৈত্য শচীকে নিয়ে এলে বৃত্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে,-

শচীমূর্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

এই প্রথম খণ্ডের শেষেই, শচীহরণে রুদ্রের ক্রোধ-বহ্নি দেখা গেছে এবং নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়েছে।

নিঃশঙ্ক বৃত্রের চোখে কেন পলক পড়েছে তার কার্যকারণ এবং ফলশ্রুতি বিবৃত করেই দ্বিতীয় খণ্ডের সূত্রপাত। এখানেই প্রকাশ পেয়েছে বৃত্রের দৈব নির্ভরতা যা কিছুটা তার চরিত্রকে ব্যক্তিত্বহীনতা, কাপুরুষতার লক্ষণাক্রান্ত করেছে। এখানে কবি বৃত্রের দেহের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মহাকাব্যোচিত এবং প্রণিধানযোগ্য,-

সুমেরু-অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন(ও)
অন্য কোন গিরি অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত
ভীমদৃষ্টি ভয়ানক কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি!

এ হেন ভয়ানক বৃত্রকেই দেখব শিবের ক্রোধাগ্নি চিহ্ন দেখে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, মনে তাঁর চিন্তারাশি পুঞ্জীভূত হয়েছে, এস্থলে তাঁর স্বগক্তোক্তির মধ্যে দিয়ে একদিকে নিজের পরিণতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তার পরিচয় যেমন উঠে এসেছে তেমনি কোন কঠোর তপস্যায় তিনি শিবসন্তুষ্টি বিধান করতে পেরেছিলেন তার পরিচয়ও কৌশলে তুলে ধরেছেন কবি,-

শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জিল কি ঐখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে-জানাতে তাহারে
তাহার দিবস-অন্ত? কৃতান্ত-শর্বরী
আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে?
দর্পে যার প্রকম্পিত পল্লবের প্রায়,

ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে মর্ত্যে দৈত্যনাম নিত্যপুজণীয়!
মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!

সেই সঙ্গেই বৃত্র এও জানিয়েছেন,-

সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে

শিবভক্ত এই দৈত্য শিবের স্বরূপও ভালই জানেন,-

হবে বা দয়াদ্র চিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচীর হরণে?

এই প্রথম আমরা বৃত্রকে ঐন্দ্রিলার প্রতি কুপিত হতে দেখব। তিনি ঐন্দ্রিলাকে স্পষ্টই সবকিছুর জন্য দোষান্বিত করে বলেছেন,-বৃত্রের সম্বল-চন্দ্রশেখরের দয়া', এবং আজ সবকিছুই তার জন্য বিনষ্ট হতে বসেছে। এখানে শিবভক্তির যে শক্তির উপর বৃত্রের সাম্রাজ্য অধিষ্ঠিত তাতে যেন চিড় ধরেছে, ভক্তি অপেক্ষা ভীতি দানা বেঁধেছে মহাবীর বৃত্রের হৃদয়ে, যা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়। তাঁর পত্নী ঐন্দ্রিলার কাছেও তাকে তাই তিরস্কৃত হতে হয়েছে। বৃত্রের চিন্তাকে 'রোগীর প্রলাপ' বলে ঐন্দ্রিলা বলেছেন,-

আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে

ঐন্দ্রিলার এ হেন বাক্যে কিছুটা প্রত্যয় ফিরে পেলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু বৃত্র এই সিদ্ধান্তই নিয়েছেন,-

শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশে।

পঞ্চদশ সর্গে বৃত্রকে আবার সমরক্ষেত্রে দেখতে পাব প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রত। হেমচন্দ্র তার বীরত্বের ছবি এঁকেছেন এইভাবে,-

দাঁড়াইয়া রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি সঘনে বাহু ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর-শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈল ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।

এই বৃত্রকেই পরবর্তী সর্গে ঐন্দ্রিলার ছলনায় ভুলে যেতে দেখলে কিংবা তার মিথ্যা বাক্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখলে আমাদের মনে হয় চরিত্রের সঙ্গতি বিঘ্নিত হয়েছে।

বৃত্রের বীরত্বের আড়ালে যে স্নেহশীল পিতৃহৃদয় লুকিয়ে আছে হেমচন্দ্র সেটির উপর আলোকপাত করেছেন বিশেষভাবে। যাতে তার পৌরাণিক অসুর সত্তার দানবীয় মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়েছে অনেক সমালোচকের। কিন্তু সেই সাথে আমাদের এটুকু দেখা উচিৎ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বৃত্রের শোককে কবি দানব সম্রাট সুলভ সংযত ভাবেই প্রকাশ করেছেন এবং এতটাই সংযত ছিলেন তিনি যে ঐন্দ্রিলা তাকে বলে উঠেছেন,-

তুমি পিতা হয়ে
এখনো অসাড় দেহ না সরে চরণ?

শেষ অধ্যায়ে পুত্রঘাতী ইন্দ্রের সঙ্গে দনুজেন্দ্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শিব-দত্ত শূল অদৃশ্য হয়ে গেলেও তিনি কিন্তু এমন ভীষণ যুদ্ধ করেছেন যে প্রলয় উপস্থিত হয়েছে এবং ইন্দ্র প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছেন। এ যুদ্ধ কিন্তু বৃত্র নিজের শক্তিতেই লড়েছেন কারণ তিনি তো তখন চন্দ্রশেখরের দয়া থেকে বঞ্চিত। তবু তার শক্তিতে ‘ব্রহ্মাণ্ড’ উচ্ছিন্ন প্রায়, কাঁপিল জগৎ। এরপরতো বৃত্র বধ প্রত্যাশিতই ছিল।

বৃত্রের পতনকে কিন্তু ট্রাজিক বলা গেল না। কারণ ট্রাজিক চরিত্রকে যে দ্বন্দ্ব-বিধ্বস্ত জীবন-পথ পরিক্রমা করতে হয় বৃত্র তা করেননি, একমুখী গতিতেই তার জীবন পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্রণাক্লিষ্টসার হাহাকার সেখানে ধ্বনিত হয় নি আবার পৌরাণিক অসুরের দানবীয় বিশালতাও সবটা বৃত্র চরিত্রে সঞ্চারিত করতে পারেন নি হেমচন্দ্র। বৃত্র তাই মহাকাব্যের নায়কের গৌরব থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন।

মেঘনাদবধের রাবণ চরিত্রের সঙ্গে বৃত্র-সংহারের বৃত্রের একটা তুলনা করেন সমালোচকরা। মাইকেল যখন রাবণ চরিত্র পরিকল্পনা করেছিলেন তখন যুগজীবনজাত যে যন্ত্রণা তিনি নিজে উপলব্ধি করেছিলেন তারই যেন প্রতিরূপ দেখেছিলেন তার মধ্যে। রাবণের পৌরুষ, দম্ভ, দুর্বলতা, যন্ত্রণা, পুত্রশোক সবই নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের মহিমা প্রাপ্ত। বিপরীতে বৃত্র অনেকটাই দেবশক্তিতে শক্তিমান এবং অদৃষ্টের ভয়ে ভীত। এতটাই ভীত যে, যে কার্যের দায়ভাগ ঐন্দ্রিলার মতো তারও, কারণ তিনিই তো ঐন্দ্রিলার বাক্যে রাজী হয়ে ভীষণকে এবং পরে রুদ্রপীড়কে নৈমিষারণ্যে পাঠিয়েছেন কিন্তু যখন শিবক্রোধ দেখা গেছে তিনি সবটার জন্য ঐন্দ্রিলাকে দায়ী করেছেন। এটি পুরুষোচিত নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু বৃত্রর মহিমা রাবণের থেকে বেশী বলা চলে। রাবণ কিন্তু ত্রিভুবনজয়ী নন এবং দেবতারা তাঁর কাছে পরাস্ত নন। বৃত্র জয়ী, ত্রিভুবন জয়ী, দেবজয়ী বীর। তিনি শচী হরণে যে অন্যায় করেছেন সে সম্পর্কে সচেতন, রাবণ কিন্তু নিজের কার্যকে পাপ বলে কখনো মেনে নেন নি, শচীর প্রতি বৃত্র নিজে কোন অসম্মানজনক আচরণ করেননি, তাঁর প্রতি সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন এমনকি তাকে সরাসরি দাসীতে পরিণত করেননি। তবে উপস্থাপনার দিক থেকে পৌরাণিক বিশালতা কিংবা আধুনিক দ্বন্দ্ব-জটিলতা দুটোই বৃত্র চরিত্রে অনুপস্থিত থাকায় চরিত্রটি মহাকাব্যোচিত গরিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

২০৫.২.৭.২ : রুদ্রপীড়

বৃত্রসংহার কাব্যের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছেন বৃত্রের বীরপুত্র রুদ্রপীড়। এই

চরিত্রটি কবিকল্পনার প্রসাদ ধন্য হয়েছে। যদিও বৃত্র-সংহারের কোনো চরিত্রেই দ্বন্দ্ব-জটিল উত্থান পতন নেই, সবকটিই খুব সরলরেখায় এগিয়েছে বলে সবগুলিই টাইপ চরিত্র কিন্তু তারমধ্যেও রুদ্রপীড় পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাকে প্রথম দেখা যায় তৃতীয় সর্গে। কবি তার দেহের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথেই জানিয়ে দেন সে বীর এবং যুদ্ধে যেতে সদা উৎসুক, পূর্বের যুদ্ধেও সে বিপুল যশ লাভ করেছিল,-

বৃত্রাসুর-পুত্র বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, দেখিতে সুঠাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হ'তে যার অসীম সাহস,
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট-শীরষে,
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ-হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ,
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশঃ যুঝিয়া অমরে।

ষষ্ঠ সর্গে দেখব রুদ্রপীড় বীরত্ব প্রকাশে যে যশপ্রাপ্তি ঘটে তাকেই জীবনের লক্ষ বলে। পিতার কাছ থেকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইছেন, চাইছেন সেনাপতিপদে বৃত হতে। পিতার কীর্তি এভাবেই তো বেঁচে থাকবে পুত্রের মধ্যে, নাহলে আর বীর পিতার পুত্র হওয়া কেন? যুদ্ধে জয়ী হয়ে না ফিরলে,-

জন্ম বৃথা! কর্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি।
কীর্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!

তাই পিতার কাছে রুদ্রপীড়ের অনুরোধ,-

কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসের আজ

সেনাপতি-পদে তব সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে—
ধরিব মস্তকে দেখ ওই পদরেণু।

পুত্রের এমন অনুরোধ কি বীরপিতা পূরণ না করে পারেন? তিনিও সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন,—

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে;

পিতার অভিলাষ অচিরেই পূরণ করেছে বীরপুত্র রুদ্রপীড়। নৈমিষারণ্যে শচীকে হরণ করে আনতে গেলে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সাথে যুদ্ধ বাঁধে রুদ্রপীড়ের এবং সেই যুদ্ধে জয়ন্তকে রুদ্রপীড় মূর্ছিত করে দেয় জয়ন্তকে ভীষণ আঘাত হানার মুহূর্তে রুদ্রপীড়ের বীরত্ব বর্ণনা করে কবি লিখেছেন,—

ভীষণ হুঙ্কার রবে,
শূন্যেতে তুলিয়া তবে,
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি;
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।

এই প্রহারই সংবরণ করতে না পেরে জয়ন্ত মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। এরপর শচীকে হরণ করার জন্য রুদ্রপীড়ের সামনে আর কোন বাঁধা ছিল না। কিন্তু মুর্ছিত পুত্রকে কোলে করে স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে থাকা শচীকে হরণ করা তো দূর কথা তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি রুদ্রপীড়,—

ভাবে দৈত্য সুত মনে,

চাহিয়া শচী-বদনে,

পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে।

এখানে দৈত্যকুল জাত হলেও রুদ্রপীড়ের মধ্যে যে রুচি ও শিক্ষার পরিচয় মেলে তা । আমাদের বিস্মিত করে। ঐন্দ্রিলার জিজ্ঞাসার উত্তরে রুদ্রপীড় যখন শচীর বর্ণনা দিয়েছে। তখনো তার বক্তব্যে সম্ভ্রম ঝরে পড়েছে,—

রূপ হইতে গাম্ভীর্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার(ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয়
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্তি চিত্ত উঠিল শিহরি;
দেবী বটে, বটে শচী শত্রুর বনিতা,
তথাপি সে মূর্তি চিত্তে আছে প্রভান্বিতা।

পুত্রের মুখে শচী প্রশংসা শুনে ঐন্দ্রিলা যখন তীব্র কটুবাক্য উচ্চারণ করেছেন তখন বৃত্র নিশ্চুপ থাকলেও রুদ্রপীড় কিন্তু বলে উঠেছে,ম্ভ্র

মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি?

বীরত্বের পাশাপাশি রুদ্রপীড়ের এই স্বভাব কবি প্রকাশ করে চরিত্রটিকে মহনীয় করেছেন। শুধু তাই নয় আমরা দেখব বৃত্র তার বিজয় কাহিনী শুনতে চাইলে রুদ্রপীড় সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে যেভাবে আগে বৃত্রের বীরত্বের কথা শুনতে চেয়েছে তাতে তার বিনয়ী সত্তার পরিচয়টিও চমৎকার ফুটেছে, সে বলেছে,—

সামান্য সে পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আমি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—

রুদ্রপীড়ের চরিত্রে কঠোর বীরত্বের দীপ্তি অঙ্কনের পাশাপাশি তার কোমল হৃদয়ের পরিচয়ও দিয়েছেন হেমচন্দ্র। তার পত্নী ইন্দুবালা পতি সম্পর্কে বলেছে,—

সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয়;
হেন সুকোমল হৃদয় তাহার
কেমনে কঠোর হয়?

আবার সংগ্রামে যাবার পূর্বে যখন রুদ্রপীড় ইন্দুবালার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে তখন সে মেনে নিয়েছে ‘পালিতে বীরের ধর্ম-দিলাম বেদনা/তোমার হৃদয়ে। রুদ্রপীড় সে হৃদয়েরই অধিকারী ছিল তাইতো মাতার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মাতার কাছে শেষ অনুরোধ করে গেছে,—

মাতঃ, এ মিনতি মম,
রেখো মা চরণে ইন্দুবালা সরলারে
পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।

বীরত্ব বা যশের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার প্রেমময় সত্তা আমাদের মুগ্ধ করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সারথির কাছে রুদ্রপীড় জানিয়েছে সে যুদ্ধশেষে বীরের মৃত্যু চায়,— ‘দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন।’ আর জানিয়েছে সে যখন শেষ শয়নে থাকবে যেন শত্রুপক্ষের কেউ তার দেহ ঘৃণার সাথে পদদলিত না করে। তার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার দৃঢ় আত্মসম্মান বোধ। পিতা-মাতার প্রতি সে কতটা শ্রদ্ধাশীল তাও প্রকাশিত হয়েছে এবং বীরপিতার বীরপুত্র মৃত্যুর পর পিতাকে জানাতে বলেছে,—‘বলো-রুদ্রপীড় সাধ হয়েছে সাধন!’ এখানে তার প্রেমময় রূপও প্রকাশিত হয়েছে যখন দেখি ইন্দুবালার কথা মনে করে এই একবার মাত্র রুদ্রপীড়ের চোখে জল

এসেছে, তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে—

বলো তারে, সারথি হে, বলিতে বলিতে
কপোল বহিল ধারা ঝরে হিমবিন্দু-ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়মহী স্নেহের পুতলী;
ঘনশ্বাসে কণ্ঠরোধ-নীরবিলা বলী।

রুদ্রপীড়ের শেষ যুদ্ধের সাক্ষী আমরা পূর্বেই হয়েছি। একা রণে ভাস্কর, প্রভঞ্জন জলাধিপতি, দেবসেনাপতি সহ বহু দেবতাকে পরাস্ত করেছে সে। সুরেন্দ্রের সাথেও তার যুদ্ধ হয়েছে সমানে সমানে। ইন্দ্র তাকে রণক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে সে জানিয়েছে,—

বৃথা আকিঞ্চন তুব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ করিয়া তা উদ্‌যাপন,
আজি পূরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা
মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে,

সে যুদ্ধই করেছে বটে রুদ্রপীড়, যতক্ষণ তার তৃণে শর ছিল বাসব তাকে হারাতে পারেনি, তূণ নিঃশেষ হলে দেবেন্দ্রের শরাঘাতে তার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তবুও রুদ্রপীড় মহাকাব্যের নায়কের মর্যাদা পাবে না, কারণ হেমচন্দ্র তাঁর চরিত্রদের বড়ো সরলরৈখিক করে উপস্থাপিত করেছেন। তাকে কেন্দ্র করে এ কাব্যে যেমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি তেমনি তার মৃত্যুও স্বাভাবিক সেখানে আত্মযন্ত্রণা জর্জর কারোর অপ্রত্যাশিত পতনের হাহাকার নেই। তবু এ কাব্যপাঠে রুদ্রপীড় চরিত্রটি বীরত্বে, মহত্ত্বে আমাদের মনে চির জাগরূক থাকবে। তাই চরিত্রটি পরিকল্পনায় কবি মেঘনাদ তো বটেই তার সাথে মহাভারতের অভিমন্যু ও হেক্টরের চরিত্রের ছায়াপাত ঘটিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

২০৫.২.৭.৩ : ইন্দ্র

দেবেন্দ্র বাসব - দেবতাদের মধ্যে প্রধান চরিত্র। পৌরাণিক ইন্দ্র চরিত্রে কবি উনিশ শতকের পরাধীন জাতির জীবন চেতনার কিছু বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। মেঘনাদবধের, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইন্দ্র চরিত্রের কিছু প্রভাবও পড়েছে এই চরিত্রটিতে। সপ্তম সর্গে ইন্দ্রের সাথে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে তখন তিনি যুগান্তব্যাপী নিয়তির তপস্যা শেষে সবে ধ্যান ভেঙে জেগে উঠেছেন। তার সেই ধ্যানভাঙ্গা মুহূর্তটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কবি। পরিচিত পূর্বের জগতের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে যেখানে তরুর চিহ্ন ছিল না সেখানে কত মহীরুহ জন্মে এখন আকাশ স্পর্শ করছে। এর দ্বারা কবি বোঝাতে চেয়েছেন কত কালান্ত জুড়ে ইন্দ্র তপস্যা করেছেন সেই তথ্য। যাইহোক ইন্দ্রের মনে হয়েছে এই কালান্তব্যাপী সাধনার পরও নিয়তি বোধহয় তুষ্ট নন তার প্রতি, তাই তিনি যখন আবার কালান্ত জুড়ে তপস্যায় বসার আয়োজন করেছেন তখন নিয়তি এসে দেখা দিলেন। নিয়তি প্রথমে তাকে খানিকটা ভৎর্সনাই যেন করেছেন এই বলে তিনি তো জানেন ভবিতব্য লিপি খণ্ডন করা তার পক্ষে অসাধ্য তবে কেন তিনি এ সাধনা করছেন।

ইন্দ্র কিন্তু ক্রুদ্ধ না হয়ে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,—

না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে।
কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্য-কুলপতি বৃত্র;

ইন্দ্রের এই ধৈর্য্যশীল মূর্তিটি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন কবি। যাইহোক, কৈলাসে গেলে ব্রহ্মা দিবা অবসানে বৃত্রের বিনাশ কিরূপে হবে ইন্দ্র তা জানতে পারবেন একথা বলে নিয়তি অন্তর্হিত হলে ইন্দ্র কৈলাসে পিনাকপাণির নিকট গমন করেছেন।

কৈলাসে পৌঁছে প্রথমে শিবানী এবং তারপর ধ্যানভঙ্গ হলে শিবকে ইন্দ্র আপন দুঃখের কথা ব্যক্ত করেছেন,—

ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে,
বৃত্রভূজদর্পে-রণে হয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য নহে অবিদিত,
এ্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।

এইকথা বলতে বলতে তাঁর তেজ জাগ্রত হয়েছে, তিনি ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মূক ধারণ করেছেন। এই সময়েই উমা জানিয়েছেন শচী হরণের বৃত্তান্ত। খুব স্বাভাবিক ভাবেই শচীপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন এবং তখনি স্বর্গে যেতে চেয়েছেন ভীষণ হুঙ্কার করে কার্ম্মক ধারণ করে। শিব তাকে নিবারণ করলে এই একবারই তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে এবং শিবকে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন-

ধূর্জটি তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?
... ...
নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ পশুপতি, এবে কোদণ্ড সহায়ে
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।

কিন্তু এই বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি করার পর রুদ্রের তেজ জেগে উঠলে ঈশানীর পশ্চাতে লুকিয়ে পড়া কিন্তু ইন্দ্রের চরিত্রের মহিমাকে খর্ব করেছে।

ত্রয়োদশ সর্গে দেশি সুরাঙ্গনাগণ ইন্দ্রের সমালোচনা করে বলছে-

ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত।

ধিক ইন্দ্র—জিষ্ণুনামে কলঙ্ক তাঁহার।

ইন্দ্র কিন্তু স্বকর্ণে একথা শুনেও ক্রোধিত হননি, বরং তাদের আশ্বাস প্রদানে শান্ত করেছেন। এটি তাঁর চরিত্রের রাজোচিত গুণেরই প্রকাশ। এই সুরাঙ্গনাগণই ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথনির্দেশ দিয়েছে। ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে ঋষিবাক্যে, ঋষির আতিথ্যে মুগ্ধ হয়েছেন। ঋষিকে প্রাণদানের কথা সহজে তিনি বলতে পারেন নি। এখানে হয়তো ইন্দ্রের পৌরাণিক চরিত্রের মহিমা ক্ষুন্ন হয়েছে কিন্তু কবি হয়তো তাকে অধিকতর মানবিক করেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তাই বোধহয় ঋষি দধীচি যখন ধ্যানেতে জেনে মহানন্দে প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছেন তখন দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে মানবমহিমার জয় ঘোষিত হয়েছে,—

বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু পরিমাণে
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগর গর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ-দ্বীপাকার-ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,
তেমতি এ নুরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্যে মানবের প্রতি অহরহঃ।

উনবিংশ সর্গে বজ্র নির্মাণের পর সেটির নির্মাতা শিল্পী বিশ্বকর্মা সেটিকে আর ধারণ করে রাখতে পারেন নি কিন্তু ইন্দ্র সেটিকে অবলীলাক্রমে ধারণ করেছেন যা তার শক্তির পরিচায়ক। ইন্দ্রকে এবার দেখব এয়োবিংশ সর্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে। রুদ্রপীড়ের অসামান্য বীরত্ব করে ইন্দ্র তাঁর প্রশংসা করেছেন যা দেবমহিমার পরিচায়ক,—

নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্ন-বদনে,
শত সাধুবাদ দিয়া,   বৃত্রসুতে বাখানিয়া

কহিলা "সুধন্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব,
দেখাইলা বীরবীর্য আজি অসম্ভব;

রুদ্রপীড়ের মৃত্যুর পরও ইন্দ্র যেভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং বীরের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য-রুদ্রপীড়ের সারথিকে তিনি বলেছেন,—

শুনরে সূত, দৈত্যসূত অদভূত,
দেখাইলা রণে আজি সমর-কৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।
এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে,
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুস্পরথ—
ইথে লয়ে পূর্ণ কর, বীর-মনোরথ।

তবে চতুর্বিংশ সর্গে বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বৃত্রঘাতক দম্ভোলি হাতে ধরেও বৃত্রের বীরত্ব দেখে যেভাবে হতচেতন হয়ে গেছেন দেবেন্দ্র তাতে তার চরিত্রের দৃঢ়তা, সাহসিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এক্ষেত্রে দেবরাজের চরিত্র অনেকটাই লঘু হয়ে গিয়েছে। এই কাব্যে দেবতাদের মধ্যে দেখেছি মদন এবং কুবের বৃত্রের দাসত্ব স্বীকার করে স্বর্গে রয়ে গেছেন। চিরদিনই কাম এবং ধন-সম্পত্তি ক্ষমতার দাসত্ব করে এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে মদন নৈমিষকাননে শচীকে সাবধান করে দিয়ে এবং শেষে কুবের দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধ করে কিছুটা দেবত্বের পরিচয় দিয়েছে।

২০৫.২.৭.৪ : দধীচি

এই কাব্যে একমাত্র মানবচরিত্র ঋষি দধীচি। যাঁর আত্মত্যাগ এই কাব্যের মূল স্তম্ভ, বৃত্র-সংহারের মূল উপায়। কিন্তু কবি যেন এই চরিত্রটিকে সেই অর্থে খুব কমই স্থান দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বজগতের পরিত্রাণ যাঁর উপর নির্ভরশীল সেই মহান মানবচরিত্রের

উপর কাব্যে হয়তো আরো একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন ছিল। তবে এই ধরনের চরিত্র যা একটা আইডিয়ার প্রকাশক তাতে ক্রমবিকাশের সুযোগ কমই থাকে। তবে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও কবি দধীচি মুনির প্রসন্ন সুন্দর জ্ঞানীরূপ এবং তাঁর জীবনত্যাগের দৃশ্যটি সুপরিকল্পিত ভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন।

এয়োদশ সর্গে দধীচিকে যখন দেখি তিনি তপোবনে শিষ্যগণকে জ্ঞানের অমৃতফল বিতরণ করছেন। বোঝাচ্ছেন সৃষ্টিতত্ত্ব, বোঝাচ্ছেন কবে থেকে মানুষে মানুষে কলহ শুরু হল এবং অবশ্যই এ কলহের ফল যে বিষময় সে কথাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বরের কাছে রাখছেন শান্তির প্রার্থনা,—

কবে নরকুল-অবনী-সীমন্ত-রত্ন-
মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা, যথা যেন সুখদা
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি মাঝে
ছড়ান সলিলধারা মানবে রক্ষিতে।
হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর।
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে-
ভ্রান্ত নরকুলে দেব, কর চিরসুখী।
হৃষীকেশ, ইও প্রভো, মানবে সদয়।

এ হেন মানব যে জগতের শান্তির জন্য নিজের জীবন সানন্দে বিসর্জন দেবেন তাতে সন্দেহ কি!

ইন্দ্র যখন তাকে প্রাণদানের কথা বলতে ইতস্তত করছেন তখন তিনি নিজেই ধ্যানে সবকিছু জানতে পেরে ইন্দ্রের চিত্তভার লাঘব করে বলে উঠেছেন,-

পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি-পবিত্র আশ্রম।

এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নেরও (ও) অতীত।

শিষ্যগণ তাঁর জন্য অশ্রুপাত করলে তিনি তাঁদের পরহিতের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করেছেন—

এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পার কয় জন?
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয় বেদনা?
হায়রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা ক্ষয়,
হায়, সে কতই রূপে! কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত সাধনে?
হে ক্ষুব্ধ তাপবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।

অর্থাৎ জীবন তো একদিন মৃত্যুর মধ্যে অবলুপ্ত হবে, প্রতিদিনই তো একটু একটু করে ক্ষয় হয় আয়ু। তবে সে মৃত্যু যদি পরের মঙ্গলের জন্য হয় তার থেকে মহৎ আর কি হতে পারে?

কবি ইন্দ্রের উক্তির মধ্যে দিয়ে একথাও জানিয়েছেন যে ইন্দ্র এই কার্যের জন্য

তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি সে বর গ্রহণে অস্বীকার করে মহানতার পরিচয় দিয়েছেন। ত্যাগ তো এমন নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থই হওয়া উচিত। ইন্দ্র তাই নিজের থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন,—

—কি বর অর্পিব আমি নিষ্কাম তাপস,
চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে।

তিনি বলেছেন দধীচির বংশে জন্মে মহর্ষি দ্বৈপায়ন জগতে খ্যাত হবেন। এরপর দধীচির প্রাণবায়ু নির্গতের পবিত্র ক্ষণটিকে বড়ো সুন্দর, স্নিগ্ধ ভাবে চিত্রিত করেছেন হেমচন্দ্র। দানব নাশের জন্য দেবতা এসে দাঁড়িয়েছে যে মানবের দ্বারে তার মহান কার্যকে এভাবে উল্লেখ করেছেন,—

দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

এক পরাধীন জাতির জীবনে এভাবেই হয়তো আত্মত্যাগের মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে দেশহিতের ব্রতে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন হেমচন্দ্র।

২০৫.২.৭.৫ : ঐন্দিলা

বৃত্র-সংহারের দ্বিতীয় সর্গে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। নন্দন কাননে পতি সাথে সুখক্রীড়া রত অবস্থাতেও তার মনে নিজের বাসনা কিভাবে পতিকে দিয়ে চরিতার্থ করে নেবেন সেই চিন্তা জাগ্রত হয়েছে। রতিকলায় পতিকে বশ করে তিনি নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শুধু তাই নয় প্রথম থেকেই এই চরিত্রে ব্যক্তিত্ব ও তেজ লক্ষ করা যাবে। স্বর্গপতি দৈত্যেশ্বর কে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন গন্ধর্ব কুলোদ্ভবা হয়েও তিনি যে তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ংবরা হয়ে তাঁর ভেতর মহেন্দ্র-লক্ষণ দেখেই, তিনি বীর বলে এবং রাজা হওয়ার উপযুক্ত বলেই। আর আজ কিনা সে ত্রিভুবনপতির পত্নীরই মনস্কামনা পূরণ হবে না! আর মনের বাসনাই যদি পূরণই না

হয় তবে স্বর্গের অধীশ্বরী হয়েই বা কি লাভ! আর হয়তো আজ যৌবন বিগত প্রায় বলে পূর্বের সে ভালবাসাও আর নেই। তাই কি আজ দানবপত্নীর ইচ্ছাপূরণে এত বাধা? স্বাভাবিকভাবেই পত্নীর এ হেন অভিযোগে বৃত্র বলে উঠেছেন,-

দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমতি মাণিকমণ্ডলে,
তুমিও তেমনি নারীতে আজ।।
... ...
আছে কিবা বাকী দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয়?

ঐন্দ্রিলা তখন অকপটে জানিয়েছেন আজও যে তিনি নারীকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হন নি, আজও জগতের মাঝে পরাজিত দেবেন্দ্রের রাণী শচীর গৌরবই বিদিত,আজও যে তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতিই জগতে প্রচারিত। তাই,—

এই বাঞ্ছা চিত্তে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কিনা পুনঃ সুমেরু আলো।।

বৃত্র তখন তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন অচিরেই তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে। দেখা যাবে কখনো ভালবাসায় বশ করে, কখনো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ত্রিভুবনজয়ী দানবকে দিয়ে নিজ কার্যসিদ্ধি করিয়ে নিতে সক্ষম ঐন্দ্রিলা।

একাদশ সর্গে বৃত্রের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট ঐন্দ্রিলা। শচীহরণ করে ফিরে এসে রুদ্রপীড় সভাস্থলে এসে উপস্থিত। ঐন্দ্রিলা পুত্রের কাছে শচীর বর্ণনা যেভাবে অনুপুঙ্খভাবে শুনতে চাইলেন তাতে তার ঈর্ষার প্রকাশ স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়ল। তিনি এখন স্বর্গের অধীশ্বরী, তার যে প্রকাশ্যে এমনটি করা উচিৎ নয়, সে বোধ এখানে হেরে গিয়েছে ঈর্ষার কাছে, এমন কি পুত্রের কাছে কোন নারী সম্পর্কে এরূপ জিজ্ঞাসা

করা যে উচিৎ নয়, সে বোধও অন্তর্হিত। তার এই ঈর্ষাপরায়ণা দিকটি কবি একজন মনস্তাত্ত্বিকের দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, শচী পুত্রকে বললেন,—

কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন;
কিরূপ বসন-ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত কিবা তার রূপ;
হাব-ভাব, হাসী-ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ-জিজ্ঞাসয়ে শতবার
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভুরু কি প্রকার;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন
শতবার শতচ্ছলে করিলা শ্রবণ।

রুদ্রপীড় উত্তরে যখন জানালেন যে মূর্তি দেখলে সম্ভ্রমের উদয় হয়, জানালেন,-

দেবী বটে, বটে শচী শত্রুর বনিতা।

ঐন্দিলার ঈর্ষার গতি চরম আকার ধারণ করল। তার বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ। বহুদিন থেকে তিনি শচীর রূপের গরিমার কথা শুনে আসছেন। কিন্তু সে লোকমুখে এবং শচীও। ছিলেন দূরে। আর এখন শচী নিকটে আর স্বীয় পুত্রের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে সেরূপ ব্যক্তিত্বের প্রশংসা। শচীর এখনকার মনের চিত্রটি সফল ভাবেই তুলে ধরেছেন হেমচন্দ্র।

ঈর্ষার বেগ লুকোতে না পেরে তিনি রাগে ছিড়ে ফেললেন গলার হার। দম্ভে রাগে অন্ধ হয়ে বলতে লাগলেন দাসী হিসেবে শচী কেমন তার পরীক্ষা নেবেন এবং তারপরে ভেবে দেখবেন দাসী হিসেবেও তাকে নিযুক্ত করা যায় কিনা।

আর তারপরে বৃত্রকে আর বিলম্ব না করে এখনি শচীকে আনার জন্য আদেশ দিতে বলেছেন,—

আন তারে দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,

মাতার এ হেন আচরণে রুদ্রপীড় যখন বিনম্রতার সাথে জানিয়েছেন, দাসী করার জন্যই তো শচীকে আনা হয়েছে তবে কেন এমন ব্যবহার করে তিনি নিজেই নিজের মহত্ত্বকে লঘু করে দিচ্ছেন? উত্তরে ঐন্দ্রিলা যা বলছেন তাতেও কবির নারী-মনস্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে। ঐন্দ্রিলা স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন,—

নারীমাঝে আমা হতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ-
হৃদে জ্বলে হলাহল-সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম;

আর তারপরে তার সেই উদ্ধত, দাম্ভিক উক্তি,—

শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন-
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।

যা শুনে কৈলাসে ঈশানী বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে মহেশকে সবকিছু জানিয়েছেন এবং জ্বলে উঠেছে মহেশের ক্রোধানল।

রুদ্রের ক্রোধের চিহ্ন দেখে বৃত্র যখন সংশয়ান্বিত ও ভীত হয়ে পড়েছেন ঐন্দ্রিলা তখনও কিন্তু দৃপ্ততার সঙ্গে তার অন্তরের ভয় দূর করতে চেয়েছেন, তার মনে প্রত্যয় জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এতটা নিঃশঙ্কতা হয়তো বা অপরিণামদর্শিতা যা বৃত্রের জীবনে ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে এনেছে কিন্তু এই তেজ বোধহয় তাকেই মানায়। এক্ষেত্রে ঐন্দ্রিলা শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথকে মনে করিয়ে দেয়।

বৃত্রের বক্তব্যকে ‘রোগীর প্রলাপ’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ঐন্দ্রিলা। বলেছেন,

রুদ্রের ক্রোধানল বলে বৃত্রের যা মনে হয়েছে তা হয় 'নিসর্গের খেলা' কিংবা ইন্দ্রজাল'। দৃপ্ততার সাথে তাঁকে বলতে শোনা গেছে,—

শিবভক্ত শিবপ্রিয় তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাতে বিমুখ শম্ভু ? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা? কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত, ধূর্জটির নামে।
আমি যদি দৈত্যপতি, তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ।
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে,
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে।

ঐন্দ্রিলার এহেন বাক্যেই "দৈত্যের মনে দর্প উপজিল। শুধু একবার ঐন্দ্রিলাকে বৃত্র 'বামা তুমি' বলে কিছু বলতে গিয়েছিলেন কিন্তু ঐন্দ্রিলার দম্ভের ছটা দেখে তিনি নীরব হয়েছেন ঐন্দ্রিলার এ উদ্ধত মূর্তি অঙ্কন করে কবি লিখেছেন,—

দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে।
সঘনে গর্জিয়া যথা প্রসারয়ে ফণা।

সেই ফণিনী বলে উঠেছেন,—

বামা আমি, দনুজেন্দ্র। রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা-মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

হয়তো এখানে উনিশ শতকের নব জাগরণের প্রেক্ষাপটে নারী ব্যক্তিত্ব, নারী-

স্বাতন্ত্রের প্রকাশ ঘটানোর যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার উক্তির মধ্যে দিয়ে তারই প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন।

যোড়শ সর্গে আবার ঐন্দ্রিলার অন্যরূপ। শচী দৈত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন এ সংবাদ বৃত্রের কানে তোলার জন্য ঐন্দ্রিলা মোহিনী বেশে সজ্জিত হয়েছেন। তিনি কোন অবস্থাতেই তাঁর কামনা পরিত্যাগ করবেন না, তিনি স্বগতোক্তি করেছেন,—

"ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে?"

কহিলা দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে—

"হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসবপ্রিয়ারে
ধরাব পায়।"

রণক্লান্ত বৃত্র কে তিনি সেই মাধুরী দিয়ে শান্ত করে মোহবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ আগেও যে বৃত্র যুদ্ধে দৈত্যক্ষয়ে চিন্তিত হয়ে বলেছিলেন,—

প্রতি রণে যদি দৈত্যকুলক্ষয়
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে?

তিনিই ঐন্দ্রিলার রূপ-লাবণ্যে বিভোর হয়ে আদেশ দিয়েছেন,-

তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্রহচরী
যে বাসনা তব তার দর্প হরি
পূরাও মহিষি—ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী।

সম্রাজ্ঞীর পক্ষে এ হেন বিলাসকলার সাহায্য নিয়ে স্বামীকে বশ করার প্রচেষ্টা

মোটেও শোভনীয় হয় নি।

ষোড়শ সর্গে পাব জননী ঐন্দ্রিলাকে। তিনি বীরপুত্র-জননীই বটে। একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করতে তাঁর এতটুকু বুক কাঁপেনি। আশির্বাদী অর্ঘ্য মস্তকে বেঁধে দিয়ে বলেছেন-

যাও রণে রণজয়ী অরিন্দম বীর।

অষ্টাদশ সর্গে চির বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাঘিনীর মতো চেড়ীদল নিয়ে শচীর সমীপে উপস্থিত হয়েছেন ঐন্দ্রিলা। তার দৃষ্টির উপমা দিয়ে কবি লিখেছেন-

নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট গরল-শিখা।

শচীর সামনে এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলেও পুনরায় জ্বলে উঠেছে ঈর্ষা। শচী পদতলে পুত্রবধূ ইন্দুবালার উপস্থিতি সেই ঈর্ষায় ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি বলেছেন পুত্র যদি তাকে রক্ষার অনুরোধ না করে যেত তিনি ইন্দুবালাকে এখনি অসির আঘাতে হত্যা করতেন। চেড়ীদের ইন্দুবালাকে বাঁধার নির্দেশ দিয়ে তিনি ইন্দ্রাণীকে কটুকথা বলে তার বক্ষঃস্থল উদ্দেশ্য করে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন। শচীকে উদ্ধার করতে অগ্নিদেব এবং জয়ন্ত উপস্থিত হলে এই উদ্ধত দৈত্যসম্রাজ্ঞী নিঃশঙ্ক চিত্তে তাদের কে আঘাত করার জন্য খঙ্গ-কৃপাণ তুলেছে। কবি তার বর্ণনায় লিখেছেন—

নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বনে।।

দ্বাবিংশ সর্গে আবার ঐন্দ্রিলা ছলনার আশ্রয় নিয়ে বৃত্রকে জানিয়েছেন ইন্দুবালা এখন শচীর আশ্রয়ে এবং তাকে ইন্দুবালার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। কবি মন্তব্য করেছেন,—

ধন্য রে ঐন্দ্রিলা তোর পণে বলিহারি।

চলেছে নদীর বেগে, চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে,

সাধন করিতে নিজ সাধের মনন;

জানে না হৃদয় কভু নিরাশা কেমন।

কবির এই মন্তব্য সত্য বটে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। দনুজেন্দ্র বৃত্র স্বয়ং সে মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন—দূরে নিক্ষেপ করেছেন সংহার ত্রিশূল, এমন সময় সেখানে আলুলায়িত কেশ বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা ঐন্দ্রিলা প্রবেশ করেছেন শাবক হারা সিংহীর মত। ঈর্ষা হলাহলে জ্বলে মরা এক প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী নারী নিজের স্বামী-পুত্র তথা সমস্ত জাতির জীবনে বিপদ ডেকে এনেছেন। অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত— শোককে অনলে পরিণত করে বলেছেন,-

কি কর, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু

সংগ্রামের প্রকরণ, ঐন্দ্রিলা কামিনী।

নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন

ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?

জ্বালাতাম ঘোর শিখা চিত্তদহে যাহে,

সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার

জ্বালাতাম পুত্রশোক-চিতা ভয়ঙ্কর,

জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।

এই অনল উদ্গীরণের পর এবার তার হৃদয় পুত্রহারা জননীর শোকাশ্রুতে ভরে যাবে,-

হা পুত্র! হা রুদ্রপীড়। বলি উচ্চৈঃস্বরে

লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া

পুত্রের সমর-সজ্জা-দেখিলা শীর্ষকে

সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমনি।
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া,
কাঁদিল মায়ের প্রাণ! হায় রে! পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ!

এখানে চিরন্তনী জননীর শোকাশ্রুতে মিশে গেল দম্ভের জ্বালা, ঔদ্ধত্য, অহংকার, ঈর্ষা, কিন্তু তিনি ঐন্দ্রিলা-দৈত্য-সম্রাজ্ঞী, তাই পরক্ষণেই এ দুরন্ত শোক সংবরণ করে, অশ্রু মুছে, তেজঃপূর্ণ বচনে স্বামীর কাছে নিয়েছেন শেষ প্রতিশ্রুতি,-

দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—
পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ-

সে প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয় নি আমরা জানি, জানি ইন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছেন বৃত্র। এই স্বামীহারা সন্তানহারা রমণীকে যখন শেষ দেখা যাচ্ছে তখন তিনি উন্মাদিনী।

২০৫.২.৭.৬ : ইন্দুবালা

ঐন্দ্রিলার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে তাঁরই পুত্রবধূ ইন্দুবালা। সুকুমার, সরল-মতি এই বালিকাটি যেন ঐন্দ্রিলার প্রদাহের পাশে মাটির প্রদীপ। হেমচন্দ্রের যে প্রতিভা সার্থক গীতিকবিতা সৃষ্টি করেছে ইন্দুবালা সে মনেরই সৃষ্টি। সে সহানুভূতিশীল, পরদুঃখকাতরা, প্রেমের প্রতিমা। ইন্দুবালা যেন দৈত্যকুলে দেবীর ভূমিকা নিয়েছে। চিরন্তনী নারীর গুণ তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত, প্রকাশিত জীবনের শান্ত, শান্তিকামী সৌন্দর্য্যের দিকটি। আবার এই কুসুমকোমল নারীও যে স্বতন্ত্র পদক্ষেপ নিয়েছে নিঃশব্দে তাও কবি তারমধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তার পরদুঃখকাতর মনটি তাকে শচীর কাছকাছি নিয়ে এসেছে।

অষ্টম সর্গে ইন্দুবালার স্নিগ্ধ সুন্দর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন কবি,-

পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর

পূর্ণকান্তি সুশোভন,

যেন কিসলয় চারু মনোহর

তেমনি দেহ-গঠন।

সে ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে রতিকে জিজ্ঞাসা করেছেন অমরাবতী থেকে পৃথিবী কত দূর, সেখানে শচীর রক্ষার্থে কি কোন বীর আছেন? তাঁর এ জিজ্ঞাসার কারণ তাঁর পতি যে এখন সেখানে গেছেন শচী হরণের নিমিত্তে। তাই তাঁর মনে এ জিজ্ঞাসা। রতি তাকে বলেছে বীরপত্নীর এত চিন্তা করা মানায় না, কিন্তু বীরপত্নী হলেও সে তো প্রেমময়ী নারী পতির চিন্তায় যে সতত আকুল। বীরপত্নী হওয়াতে পতির বীরত্বে গর্বিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধজনিত ভয় তার মধ্যে কাজ করেছে,-

পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে

কত যে সতত ভয়,

জানে সে ক'জন ভাবে সে ক'জন

বীরপত্নী কিসে হয়!

রতির কাছে সে স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে সে তুলে ধরেছে স্বামীর সাথে তার যে মধুর মুহূর্তগুলি কেটেছে তার ছবি। সে ভেবে পায়নি এমন প্রেমময় রুদ্রপীড় কি করে যুদ্ধে কঠোর হয়। শচীকে না চিনেও, তিনি শত্রুপক্ষের রাজমহিষী জেনেও তার জন্য উতলা হয়েছে ইন্দুবালা। সে একজন নারী তাই যে কোন নারীর দুঃখকে তার নিজের বলেই মনে হয়েছে,-

আমিও রমণী রমণীও শচী

তবে তিনি কেন তায়,

না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর

ধরিতে গেলা ধরায় ?

কি হবে শচীর পতি নাই কাছে।

মহাবীর পতি মম,

আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন

বিপদে শচীর সম!

এরপর ইন্দুবালাকে দেখি স্বামীর মঙ্গল কামনায় শিবপূজা করতে কিন্তু মঙ্গল ঘট থেকে সবিশ্বজল ঢালার সময় তার হাত থেকে ঘট পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। পতির অমঙ্গল আশঙ্কায় সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

এইবার এই সুকোমলা নারী অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছে। দৈত্যকুলবধূ হয়েও এবং ঐন্দ্রিলার স্বভাব জানা সত্ত্বেও সে শচীর অনুগতা হয়েছে। স্বামী বিরহে তার তপ্ত হৃদয় শীতল হয়েছে শচীর বাক্যে। সে শচীকে কারাগার থেকে নিজের আলয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। ঐন্দ্রিলা যখন তাদের দিকে চেড়ীদল সহ বাঘিনীর মতো ধেয়ে এসেছে তখন ভয়ে রতি লুকিয়ে পড়লেও ইন্দুবালা কিন্তু লুকায় নি। শচীর সাথে ইন্দুবালাও অতঃপর শিবালয়ে স্থান পেয়েছে। রুদ্রপীড়ের মৃত্যু সংবাদে এই পতিপ্রাণা প্রেমময়ী নারীর শচীর কোলেই মৃত্যু ঘটেছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, ঐন্দ্রিলা যতই তাকে 'দানবকুল-কলঙ্কিণী' 'কালভুজঙ্গিনী' বলুন না কেন বৃত্র কিন্তু ইন্দুবালার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন এবং তাকে নিরমল পীযূষ আধার বলে উল্লেখ করেছেন, তার কথায় তাঁর হৃদয় শীতল হয় সেকথাও জানিয়েছেন, তার মৃত্যুর খবরে হাহাকার করে বলেছেন,-

ও ছাড়িলা যখন

রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর

দৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম,

এত দিনে অসুরকুলের অবসান!

২০৫.২.৭.৭ : শচী

দেবীগণের মধ্যে প্রস্ফুট চরিত্রটি হল শচীর। তাঁকে অপমান করার মধ্য দিয়েই অকালে

বৃত্র বধের বীজ উপ্ত হয়েছে। শচী চরিত্রের মধ্যে একদিকে রাজোচিত মহিমা, গাম্ভীর্য ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে নারী চরিত্রের স্নিগ্ধতা, স্নেহশীলতা, শোভনতা, সুষমাকে হেমচন্দ্র বিকশিত করে তুলেছেন সযতনে। তবে এ কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের মতো শচী চরিত্রটিও উত্থান পতনহীন সরল রৈখিক চরিত্রই হয়ে থেকেছে। স্বর্গহারা, স্বামী-বিচ্ছিন্না শচীর কারুণ্যে সমগ্র চতুর্থ সর্গ যখন ভারাতুর তখন নৈমিষ কাননে শচীর সাথে আমাদের প্রথম দেখা। সায়াহ্নের অল্প আলোয় দেখি তিনি ম্লান, বিষণ্ন হৃদয়ে সখী চপলার সাথে নিজের ভাগ্য নিয়ে আলাপে রত।

শ্রীহীনা শচী বলছেন,—

বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকির লো এ ভাবে পড়িয়া।

স্বর্গের কথা মনে ভীড় করে আসে, কিছুতেই ভুলতে পারেন না। এ পৃথিবীর মৃত্তিকা তার পায়ে বড়ো বাজে, তিনি মেঘবাহনের পত্নী, মেঘের দেশে বাস। স্বর্গের অধীশ্বরীর কাছে এ মর্ত্যভূমি বড়ো ক্ষুদ্র মনে হয়, মনে হয় সকলি হেথা স্থূল'। আজ তাঁর কাছে অমরতা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর মাঝে শান্তি পাবেন সে উপায়ও যে নেই,—

অমর মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখন ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই
চিরদিন কেমনে সহিব।

স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে বাসবের সাথে কাটানো সুখের সে মুহূর্তগুলি, চপলাকে বলেন,—

কেমনে ভুলিব বল মেঘে যবে আখণ্ডল

বসিত কামুক ধরি করে।

তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,

ঘটা করি লহরে লহরে।

এই স্মৃতিচারণা করতে করতেই ফিরে আসে তাঁর রাজকীয় আভিজাত্য বোধ, তিনি বোঝেন অবস্থার বিপাকে শোকে ভেসে যাওয়া তাঁকে মানায় না। যে বড় তার উপর দিয়েই তো ঝড় ঝাপটা যায়। তাই শচী বলেন,-

জানি সখী গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি

মহা ঝড় তরুতেই বহে।

জানি সর্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় ভিন্ন,

অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে।।

মন তবু ভেবে চলে,-

সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে

ঐন্দ্রিলার কটি তটে হায়।

আমার মুকুট-রত্ন অমরী করিত যত্ন।

কুবের আনিয়া দেয় তায়।।

এমন সময় মদন এসে উপস্থিত হন নৈমিষ-কাননে। তাকে দেখেই চপলা তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁকে বৃত্র-ঐন্দ্রিলার দাস বলে বিদ্রুপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছে। শচীও মদনকে ভৎসনা করেছেন কিন্তু চপলার সাথে তার ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য চিনিয়ে দেয় শচী সত্যই কতটা আভিজাত্যের গরবে গৌরবান্বিত,-

চপলা রে গঞ্জনা দিও না মারে,

সুখে আছে সুখে থাক কাম।

এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,

পুরাইত কিবা মনস্কাম?

যাইহোক মদনের কাছ থেকে শচী জানতে পেরেছেন তাকে ঘিরে চক্রান্ত রচনা করেছেন বৃত্র-ঐন্দ্রিলা। আজ ইন্দ্র যখন অনুপস্থিত কে তাঁর সহায় হবে? তাঁর মনে পড়েছে পুত্রের কথা, এই বিপদে স্মরণ করেছেন পুত্র জয়ন্তকে।

জয়ন্ত নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হলে শচীর মধ্যে চিরন্তনী জননীকে দেখা যাবে। চিরকালই মা'রা বহুদিন বাদে সন্তানদের দেখলে বলেন তার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে, শচী যতই স্বর্গের অধীশ্বরী হন আর জয়ন্ত দেবেন্দ্রের পুত্র তাকে দেখে জননীর শাশ্বত সত্তা জাগ্রত হয়েছে। তিনিও মানবী জননীর মতোই বলে উঠেছেন,—

দেখ সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
পলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন।

পুত্রের অঙ্গে যুদ্ধের ক্ষত দেখে আরো উতলা হয়েছেন তিনি। ঐন্দ্রিলা যেখানে পুত্র কে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফেরার আশীর্বাদ দিয়েছেন শচী সেখানে অত্যন্ত স্নেহ বৎসলা হয়ে বলেছেন তাঁকে উদ্ধার করার কোন দরকার নেই। বলেছেন,-

শতবার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব,
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব;
তোমার কমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।

রুদ্রপীড়ের প্রহারে মূর্ছিত জয়ন্তের দেহ কোলে নিয়ে স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে থাকা শচীর নীরব শোকপ্রকাশের দৃশ্যে তিনি এতটাই অনন্যা যে চপলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারেনি। আর যে রুদ্রপীড় নৈমিষারণ্যে এসে মরণপণ যুদ্ধ করেছে শচীকে হরণ করার জন্য সেও এই শোকস্তব্ধ মূর্তিকে স্পর্শ করতে পারে নি।

দৈত্য নিকন্ধরকে দিয়ে সেই হরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। নিকন্ধর যখন সেই শচীকে নিয়ে গিয়ে স্বর্গে বৃত্রের সভায় হাজির করেছে স্বয়ং বৃত্রও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

স্বর্গে ফিরেছেন শচী। কিন্তু এ কোন স্বর্গ ? যেখানে দেবতা নেই, নেই দেবেন্দ্র বাসব। তার এ উক্তি খুবই স্বাভাবিক,-"স্বর্গ নহে, চপলা, এ ইন্দ্রাণীর কারা।" দৈত্য তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে তারপর বৃত্র রুদ্রের ক্রোধবহ্নির প্রকাশ দেখে রতিকে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে কারাগার থেকে প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য। রতি সেকথা শচীকে জানালে তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রিয় ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। কোনখানে কোন বাড়াবাড়ি অভিব্যক্তি নেই, সবকিছুর মধ্যেই একটা অভিজাত সংযম, সৌম্য কে যে শচী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য করে তুলতে চেয়েছেন হেমচন্দ্র এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বর্গের অধীশ্বরীর মতোই অনমনীয় দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি বলে উঠেছেন,-

শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।

এই বিপদকালেও তাঁর বিভাময়ী রূপের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা চিরদিন মনে রাখার মত,-

নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ। প্রভাতিল যেন

তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-রাশিতে
আভাময়-আভাময় করি দশ দিক্।

দৈত্যকুল বধূ ইন্দুবালাকেও শচী যেভাবে আপন করে নিয়েছেন, স্নেহের ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ করেছেন পতি বিরহিত তার চিত্তকে তা তো তাঁকেই মানায়। ভক্তবৎসলা দেবী ইন্দুবালার ইচ্ছা পূরণ করতে না পেরে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন,-

রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে,
অনুগত জনে মনে আশা ক'রে
পাইল ফল তাহার নিকটে!
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায়।।

আবার রুদ্রপীড়ের মত অসম সাহসী যোদ্ধাকে দেখে শত্রু-মিত্র ভুলে, এই রুদ্রপীড়ই। জয়ন্তকে পরাজিত করে তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনা ভুলে তার প্রশংসাই শুধু করেন নি শচী, তাকে নিজের সন্তানের মতোই ভেবে বলেছেন,-

আমার তনয় হইলে এখনি,
ভবিতাম ওরে জগতের মণি,
কি বীর্য সাহস কি শিক্ষা-কৌশল!
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শত্রু বটে, ধন্য বীর বাখানি!

সুমেরু শিখরেও শচী ইন্দুবালাকে যেভাবে ভুলিয়েছেন তাতে বারবারই মাতৃস্নেহের প্রকাশ ঘটেছে। রুদ্রপীড়ের মৃত্যুর পরও শচীর কোলের উপরেই ইন্দুবালার মৃত্যু ঘটলে শচী দুজনকেই একসাথে সুমেরু শিখরে সৎকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে তারা অনন্ত মিলনে মিশে যেতে পারে। শচীর সখী হিসেবে চপলা চরিত্রটি যথাযথ। সে শচীর রক্ষার্থে নৈমিষারণ্যকে মায়াকাননে পরিণত করেছে। মদন নৈমিষারণ্যে আবির্ভূত হলে সে যেভাবে তাকে তিরস্কার করেছে তা বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

একক – ৮ – জাতি বিচার

বিন্যাসক্রম

২০৫.২.৮.১. : বৃত্রসংহারের জাতি বিচার

২০৫.২.৮.২. : বৃত্র সংহার ও মেঘনাদবধ কাব্য তুলনামূলক দৃষ্টিতে

২০৫.২.৮.৩. : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.২.৮.৪. : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.২.৮.১. : বৃত্রসংহারের জাতি বিচার

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রসঙ্গে বারবারই যে প্রশ্নটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় যে এটি মহাকাব্য কিনা এবং সে প্রসঙ্গেই বারবার আসে মেঘনাদবধের কথাও। যাইহোক, বৃত্রসংহারের গঠন কৌশল যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব কাব্যটির গঠনকে অখণ্ড ও সমন্বিত করতে পারেননি কবি। এর ঘটনাবিন্যাসে, তথ্যসমাবেশে, ভাবকল্পনা প্রবাহে রয়ে গেছে অনেক শিথিলতা যা মহাকাব্যের ক্ষেত্রে কখনোই কাম্য নয়। কাব্যটির আকার বিশাল হয়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু তার অন্তর্বয়ন নিটোল ভাবে সুগ্রথিত নয়। এই অবিন্যস্ততার জন্য ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। বৃত্রসংহারের দুটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডটির পুরোটিকেই বলা যেতে পারে দ্বিতীয় খণ্ডটি অর্থাৎ যে খণ্ডটিতে বৃত্র বধ হয়েছে তার ভূমিকা। শচীকে হরণ করে নিয়ে এসে তাকে দাসীতে পরিণত করার জন্য ঐন্দ্রিলার অপরাধ আর সেই অপরাধে প্রশ্রয় দানের জন্য বৃত্রের অধর্ম পালন জনিত পতন এই মূল ঘটনারই মুখপাত হয়েছে প্রথম খণ্ডে। পাতালে দেবতাদের নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে দীর্ঘশ্বাস মোচন, তার থেকে মুক্তির জন্য মন্ত্রণা, কলহ, অতঃপর অসুরদের সাথে মহাসংগ্রামের সঙ্কল্প, শচীকে দাসী করবেন বলে ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা প্রকাশ, শচীকে ধরার জন্য ভীষণের নৈমিষকাননে গমন ও জয়ন্তের হাতে তার মৃত্যু, রুদ্রপীড়ের আগমন তার হাতে জয়ন্তের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি ও কেশ আকর্ষণ করে নিকন্দর কর্তৃক শচীর হরণ, রুদ্রপীড় কর্তৃক। শচীর রূপ বর্ণনায় ঐন্দ্রিলার ঈর্ষা, রুদ্রের

ক্রোধের প্রকাশ এ সহ বিস্তৃতভাবে বলা চলে, বহুবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে এখানে। কবি হয়তো এখানে এসব কিছু একটু অপরিমিতভাবে বর্ণনা করেছেন যা আর একটু সংহত, নিটোল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঘটনা প্রবাহের অকারণ আয়োজন ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে এই প্রথম খণ্ডের পক্ষে। ঘটনাধারায় তার স্পর্শ ও স্বাভাবিকতা বজায় থাকলেও বিস্তৃতিই এখানে এ কাব্যের মহাকাব্য হয়ে ওঠার জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃত্র-সংহার তাই পৌরাণিক আধ্যায়িকা কাব্যের বেশী কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাবলী তুলনায় অনেক দ্রুত সংগঠিত হয়েছে যার ফলে একটা গতি এসেছে কাহিনীর মধ্যে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, বস্তুর আয়োজন অনেক কম। তার মধ্যেও নগেন্দ্রবালার তত্ত্বালোচনাটির কাব্যগুণ কম থাকায় তা নীরস তত্ত্বকথায় পরিণত হয়ে কাব্যটির ভার বৃদ্ধি করেছে। মেঘনাদবধে কোন আদি-অন্ত সমন্বিত কাহিনী নেই কিন্তু বৃত্রসংহারে আমরা আদি-অন্ত সমন্বিত একটি কাহিনী পেলাম।

তবে সে সঙ্গে একথাটাও আবার বলতে হয়, পুরাণে যে ঘটনা আছে তারই একটু উন্নত কাব্যরূপ বৃত্রসংহার, নতুন কোন ভাবাদর্শ, কোন সর্বকালীন গ্রহণযোগ্যতা, নবতর ব্যঞ্জনা এখানে ধ্বনিত হতে পারেনি, শিথিল কাহিনী সমন্বয়, ঢিলেঢালা গঠন, সুমহান ভাবকল্পনার অভাব, গুরুতর সাংকেতিকতা না থাকায় বৃত্র-সংহার মহাকাব্যের মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে আর বলাবাহুল্য অখণ্ড রসের অভিব্যক্তি, নিবিড়তম জীবনবোধ, নব ব্যঞ্জনার চূড়ান্ত প্রকাশেই মেঘনাদবধ মহাকাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

মধুসূদন তার প্রতিভাবলে যা করেছিলেন সেটি হল বস্তু প্রধান বীর রসাত্মক মহাকাব্যের মধ্যে করুণরসের প্রবাহকে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের বাস্তব বীভৎসতার পরিবেশে সে করুণ রসের ধারা এমন এক ভাব পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল যা পাঠকের হৃদয়ে যুদ্ধায়োজনের নীরসতাকে মানবীয় রসে রসসিক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এই ভাবপ্রবাহ কোথাও অতিরিক্ত হয়ে কাব্যের ধ্রুপদী গড়নকে

বিঘ্নিত করেনি। বহিরঙ্গের ঘটনা সমূহ যে উচ্চগ্রামে পৌঁছবে অন্তরঙ্গ ভাব অনুভূতি সেইখানটি ছুঁয়ে গেছে। হেমচন্দ্রও ঘটনার ঘন বস্তু পুঞ্জের মধ্যে প্রাণ রসধারা প্রবাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে রোমান্টিক পরিবেশ তৈরী করেছেন, মানবীয় প্রেম-হিংসা-শোক ইত্যাদির অবতারণা করেছেন। কিন্তু বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে অন্তরের এই প্রাণরসধারা একই ঐক্যে মিলে যেতে পারেনি। বস্তুভারকে লাঘব করতে পারেনি হৃদয়ানুভূতির কাব্যরস। হেমচন্দ্র একটি সর্গে বাস্তব পরিস্থিতির ঘটনা বাহুল্য তুলে ধরার পরই পরের সর্গকে অনুভূতি প্রধান করে তুলেছেন কিন্তু মেঘনাদবধে এই দুটি ধারা যেমন মিলে গিয়েছে হেমচন্দ্র তাকে মেলাতে পারেননি। দুটি পৃথক সমান্তরাল ধারা হিসেবেই থেকে গিয়েছে।

রসপরিণতির দিক থেকে দেখলে দেখা যায় মহাকাব্যে বহু বিচিত্র দিক থেকে বিচিত্র ভাব নিয়ে প্রবাহিত সমস্ত ঘটনা এবং অনুভূতি শেষে এসে মেলে এক অখণ্ড ভাবানুভূতির মহাসমুদ্রে। মেঘনাদ বধে মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণের হাহাকার, সম্পূর্ণ জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস, নিয়তির কাছে মানবশক্তির পরাভবতার বেদনা সেই মহাসমুদ্র যেখানে সমগ্ন ঘটনা প্রবাহ তার ভাবনুভূতির সমাপতন ঘটেছে। কিন্তু বৃত্র-সংহারে বৃত্রের পতন শুধুমাত্র একটা ঘটনা যা অনেকটা প্রত্যাশিতও ছিল, সেই পতনের সাথে সাথেই কাব্যের সমাপ্তিও ঘটে গেছে তার পরবর্তীতে আর কিছুই ঘটেনি এবং এ পতন পাঠকের মনে কোন ভাবের উদ্বোধনও ঘটায়নি। সুতরাং একটি অখণ্ড ভাবসমুদ্রের সন্ধান সেখানে মিলল না। বিচিত্র দিক থেকে বিচিত্র গতিতে কাহিনী নদীর মত এল ঠিকই কিন্তু মিশে যাওয়ার জন্য মোহনা পেল না। রসপরিণতির দিক থেকেও এখানে ত্রুটি রয়ে গেল।

মেঘনাদবধে স্পষ্টতই মধুসূদনের সহানুভূতি ছিল রক্ষোকুল রাবণ কিংবা মেঘনাদের দিকে। সৃষ্টির পূর্বেই মেঘনাদবধের সুর বাঁধা হয়েছিল প্রচলিত সংস্কারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। ভারতীয় পুরাণ ভারতীয় সংস্কারে রাক্ষস কিংবা অসুর বরাবরই

অধর্মাচারী। অধর্মের উত্থান যখন যখন হয়েছে তখনি তো আবির্ভূত হয়েছেন অবতারগণ সে গ্লানিকে দূর করে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। নবরূপে রামের জন্মও সেই কারণে, দধীচির আত্মত্যাগও সেই কারণে। মধুসূদন কিন্তু স্পষ্টতই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার কলমের সমস্ত শক্তি, সহানুভূতি উজাড় করে দিলেন রাবণের জন্য এবং এমন করে পাঠকের সামনে তাকে নিয়ে এলেন যে পাঠকের একবারও মনে হল না রাবণ, মেঘনাদরা অসুর অতএব বর্জনীয়। বরং প্রথমাবধি পাঠকের সহানুভূতিও তাদের দিকেই গেল—তখন তারা কোন রাক্ষসকুলের প্রতিনিধি নন, পীড়িত মানবাত্মার প্রতিনিধি। কিন্তু হেমচন্দ্র কখনোই বৃত্রের জন্য বা রুদ্রপীড়ের জন্য সে সহানুভূতি আদায় করতে পারেন নি। কারণ তার নিজের সহানুভূতি থেকেই তার সৃষ্ট চরিত্ররা বঞ্চিত হয়েছে। তার সহানুভূতি স্বদেশ হারানো দেবকুলের দিকে না বৃত্রের দিকে তা সঠিক ভাবে বোঝাই যায় না। দেবকুল এবং ইন্দ্র, অসুরকুল ও বৃত্র প্রায় সমান গুরুত্বই পেয়েছে এবং বৃত্রকে তিনি অসুর রূপেই চিহ্নিত করেছেন তাই তার পতনে অসুরশক্তির পরাজয় ও দেবশক্তি জয়ের চিরকালীন নীতিকথাই বিঘোষিত হয়েছে। নতুনতর কোন জীবনবোধের উদ্বোধন ঘটে নি। মেঘনাদ বধের আত্মপ্রকাশের পর এই চিরাচরিত আদর্শকেই জয়ী করা কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মেঘনাদবধে মেঘনাদের মৃত্যুর সাথে দধীচির আত্মত্যাগকে কেউ কেউ তুলনা করেন। কিন্তু দুটি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দধীচির আত্মত্যাগ সুমহান কিন্তু সেই ত্যাগ এতটাই নীরবে ঘটে গেছে এই কাব্যে, কবি এত বিশাল কাব্যে তার জন্য এত সংক্ষিপ্ত জায়গা ব্যয় করেছেন যে পাঠকের অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার আগেই সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। দধীচির মনেও কোন আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা তৈরী করতে পারেন নি লেখক যা ঘটেছে সবই যেন তিনি জানতেন। এর ফলে দধীচির আত্মত্যাগ মেঘনাদের মৃত্যুর মতো গরিমা প্রাপ্ত হয়নি। মেঘনাদের মৃত্যুই রাম-রাবণের যুদ্ধে চূড়ান্ত Climax তৈরী করেছে কিন্তু এ কাব্যে দধীচির আত্মত্যাগ সে চূড়ান্ত মুহূর্ত তৈরী করেনি। এমনকি রুদ্রপীড়ের মৃত্যুও সেই Climax তৈরী করতে পারেনি। আসলে বৃত্রসংহার সেই চূড়ান্ত বিন্দু যা

অনুভূতির ক্রমবিন্যাসের সূত্র ধরে তৈরী হয় তা তৈরী হতে পারেনি। দুই পক্ষের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই হয়েছে এবং যে পক্ষের পরাজয় হওয়ার কথা সে পক্ষের পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই সে বিরোধের অবসান ঘটেছে।

চরিত্রায়ণের দিক থেকে দেখলে মেঘনাদ বধের রাবণ চরিত্রের সমকক্ষ বৃত্র কখনোই হয়ে উঠতে পারেননি। রাবণ মহাদেবের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন একথা ঠিক কিন্তু সেটিই তার শক্তির একমাত্র কারণ নয়, রাবণ নিজ বীর্যেই বলীয়ান। পাঠকের কখনো মনেই পড়ে না যে তিনি শিবশক্তির আশীর্বাদ ধন্য। কিন্তু বৃত্র নিজেই জানিয়ে দেন,'বৃত্রের সম্বল— চন্দ্রশেখরের দয়া এবং শিবক্রোধের ইঙ্গিত মাত্র দর্শনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন,-শচীরে ছাড়িব আমি ভূষিতে মহেশে।" তাহলে বৃত্রের নিজ শক্তির উপরে তার স্রষ্টাও আশ্বাস রাখতে পারেন নি।

বৃত্রসংহারের সূচনা লগ্নে যে বৃত্র বলেছিলেন,—

> সঙ্কল্প করিনু অদ্য শুন দৈত্যকুল,
> সঙ্কল্প করিনু হের স্পর্শিয়া ত্রিশূল-
> সূর্য্যেরে রাখিব করে রথের সারথি,
> চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি,
> পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জনী ধরি,
> অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি।

পরবর্তীতে সে সঙ্কল্প অন্তর্হিত হয়েছে। এমনকি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরও তাঁকে তাঁর পত্নীর নিষ্ক্রিয় বলেই মনে হয়েছে এবং তাকে তার শক্তি, সঙ্কল্প মনে করিয়ে দিয়েছেন ঐন্দ্রিলা,-

> কি কর, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
> সংগ্রামের প্রকরণ, ঐন্দ্রিলা কামিনী!
> নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন

ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?

....

জ্বালাতাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর।

জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।

কিন্তু দানবের প্রতিহিংসা দেখাতেও ব্যর্থ বৃত্র। সে শক্তির স্ফুরণও তার মধ্যে দেখা যায়নি। তাই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপী বিরাট আয়োজন থাকলেও বৃত্রের পতনে মহাকাব্যের ট্রাজিক নায়কের পতনের মুছনা বেজে উঠল না। কিন্তু অজেয় শক্তিধারী রাবণ যখন নিয়তির কাছে পরাজিত হয়ে যাচ্ছেন সে ট্রাজেডি পাঠকের হৃদয়কে করুণ রসে জারিত করে দেয়। রাবণকে বিরাট শক্তিধর করে অঙ্কিত করেছেন মধুসূদন কিন্তু সে শক্তিকে কোথাও রাক্ষস শক্তিরূপে চিহ্নিত করেন নি। কিন্তু বৃত্রকে বরাবরই অসুররূপে চিহ্নিত করে দিয়েছেন হেমচন্দ্র। ঐন্দ্রিলার পাপ ইচ্ছাকে সহজেই মেনে নিয়ে তিনি সেই কার্যকে সিদ্ধ করবার ব্যবস্থা করেছেন যা অসুর শক্তির প্রকাশ ও প্রচলিত ন্যায় ধর্মের বিরোধী। যদি এই কার্যকেই বৃত্রের পতনের কারণ হিসেবে ধরা হয় তাহলে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা তো কাব্যে পাওয়া পেল না। দেবতারা শচী হরণের পূর্ব থেকেই স্বর্গ উদ্ধারের জন্য দানবদের সাথে লড়াই করছেন। শচী হরণের পর তাদের মধ্যে নতুনতর কোন উদ্দীপনা দেখা যায়নি তাকে উদ্ধারের জন্য। যেটুকু যা করার মহাদেব, মহামায়া আর শচী নিজের উদ্যোগেই করেছেন, অন্য দেবতারা তার জন্য বৃত্রের পৃথক শাস্তির কোন ব্যবস্থা করেন নি, তাহলে শচী হরণ বৃত্রের সেই অপরাধ নয় যার জন্য তার পতন হল। শচীকে বৃত্র প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অপমানও করেননি। তাঁকে কারাগার থেকে জোর করে ধরে আনতে পারতেন, বৃত্র তাও করেন নি। ঐন্দ্রিলা তাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, বৃত্র নয়। তাহলে কোন পাপে তার পতন? সে স্বর্গ অধিকার জনিত পতন? কিন্তু কেউ যদি নিজ শক্তিতে অপরকে পরাজিত করে সেটি কি তার পাপ? আর তাই যদি হয় তবে বৃত্র বা অসুরকুলের বৃত্তান্তকেই হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের কেন্দ্রে কেন রাখবেন, স্বভূমি উদ্ধারে ব্রতী দেবতাদের

না রেখে? এসব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে নেই। কারণ পরিকল্পনার মূলেই দোলাচলতা থেকে গেছে। মধুসূদনের মতো হয়তো হেমচন্দ্র সংস্কারের বিপরীতে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই দেব হস্তে অসুর নিধনই সাধিত হয়েছে। সুতরাং কার্য্যকারণ, সূচনা-সমাপ্তি একটি সুপরিকল্পিত চিন্তার বয়ানে গ্রথিত হতে পারেনি যা কিনা মহাকাব্য তাে বটেই আখ্যায়িকা কাব্যের জন্যও জরুরি। পৌরাণিক কাহিনীর কোন নবমূল্যায়ন হেমচন্দ্র করতে পারেন নি, বৃত্রকেও দিতে পারেন নি। কোন নতুন গরিমা, তার পতনের কারণ কে বড়ো করে দেখিয়েছেন, তার দুর্বলতাকে পদে পদে চিহ্নিত করেছেন তবে আর তার শক্তিশালী রূপ অঙ্কনের সার্থকতা থাকল কোথায় ? তার পতনের মাহাত্মও এইভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

এইসব উল্লেখের পাশাপাশি যে কথাটি অবশ্যই থাকতে হবে যুগোচিত ব্যঞ্জনা ধ্বনিত না হলেও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপী এই কাহিনীর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা বিশালতা আছে আর আছে বীরত্বের কল্পনায় কবির অসাধারণ দক্ষতা। যুদ্ধ বর্ণনায় বীররস আর রৌদ্ররস সৃষ্টিতে কবি প্রতিভার দ্যুতি এতটাই বিচ্ছুরিত হয়েছে যে তা মধুসূদনের যুদ্ধ বর্ণনার কৃতিত্বকেও ছাপিয়ে গেছে। আসলে মধুসূদন সে অর্থে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বর্ণনা করেননি কারণ ঘটনা বস্তুর বর্ণনা অপেক্ষা অনুভূতিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন আর হেমচন্দ্র তার বিপরীত তথাপি যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব অবশ্যই উল্লেখ্য। বীর এবং রৌদ্ররস হেমচন্দ্রের প্রিয় রস রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। বীর রসাত্মক ঘটনার সমাবেশ, অবিরত যুদ্ধবর্ণনায় পাঠককে উদ্দীপিত করেছেন হেমচন্দ্র। প্রথম সর্গ, তৃতীয় সর্গ, পঞ্চম সর্গ, ষষ্ঠ সর্গ, নবম সর্গ, একাদশ সর্গ, দ্বাদশ সর্গ, পঞ্চদশ সর্গ, সপ্তদশ সর্গ, বিংশ সর্গ, দ্বাবিংশ সর্গ, চতুর্বিংশ সর্গে কখনো বীর রস, কখনো ভয়ানক রস আবার কখনো রৌদ্ররস প্রধান হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে চারটি সর্গ একেবারেই যুদ্ধের বর্ণনা নির্ভর। সে বর্ণনা কোথাও বীরত্ব মহিমাব্যঞ্জক কোথাও গাম্ভীর্যদ্যোতক আবার কোথাও বা বিস্ময়কর। দেব-দৈত্য সংগ্রামের চিত্র-

মিলিল দুদল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মাদ
যেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ অঙ্গে
দু'নদ বিস্তার সমূহ জুড়ি।
শিঞ্জির নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ;
সেনার গর্জন, তূরী-শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি অশ্ব-হ্রেষা-নাদ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোতে।

দেবতাদের সঙ্গে রুদ্রপীড়ের সংগ্রামের বর্ণনা,-

বাজিল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমর শঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে
ছুটে যথা প্রহেলিকা গাঢ় অভ্রমুখে।
চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীমশব্দে একেবারে, নিনাদিলা চারিধারে,
ছুটিলা কলম্বকুল তারারাশি হেন;
ছুটে ঘনঘটা কোলে তড়িল্লতা যেন।

পুত্রঘাতীর পুত্রকে রুখে বৃত্রের যুদ্ধেচ্ছা—

ছুটিল উন্মত্ত যেন মথি সুররথী
লুক্কায়িত শার্দুলেরে যথা বনমাঝে
খুজে ব্যাধ বনরাজি আন্দোলন করি,

কিংবা পক্ষিরাজ বাজ কপাতে হেরিয়া
যায় যথা শূন্যপক্ষে ছুটিলা দিতিজ

দৈত্যকুলের সাথে ইন্দ্রের সংগ্রাম,-

হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে। তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসব সঙ্গে। কম্বোজ, খড়ক,
খরখুর ধবলাক্ষ ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে; সুরপতি,
যুঝিতে লাগিলা রণমদে।

এভাবেই বৃত্রসংহার কাব্যে বারবার এসেছে যুদ্ধের চিত্র যাতে যুদ্ধবিমুখ বাঙ্গালি জাতির কবি হয়েও যুদ্ধের বিচিত্র ছবি ফুটিয়েছেন হেমচন্দ্র, রৌদ্ররস ও বীররসের প্রবাহ ছুটিয়েছেন। যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রেও অবশ্য যদি মধুসূদনের সঙ্গে তুলনা করতে হয় তাহলে দেখব মধুসূদন যুদ্ধের বাহ্যিক আয়োজন কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যত না আগ্রহ দেখিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার অন্তর্নিহিত বেগের তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে। তাই মধুসূদনের যুদ্ধচিত্র সংক্ষিপ্ত ও অন্তর্দীপ্ত অন্যদিকে হেমচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনা অযুত উপকরণে সজ্জিত ও 'চিত্রল'।

২০৫.২.৮.২ : বৃত্র-সংহার ও মেঘনাদবধ কাব্য তুলনামূলক দৃষ্টিতে

এইবার আমরা বৃত্রসংহার সম্পর্কে কতগুলি সাধারণ আলোচনায় প্রবেশ করব। বৃত্রসংহার কাব্যের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গ। 'মেঘনাদবধ কাব্যের একটি মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন হেমচন্দ্র। উভয়ে প্রায় একই সময়ে কাব্যরচনা করলেও উভয়ের জগৎটাই ছিল আলাদা। তাঁদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, ঐতিহ্য চেতনা সবই ছিল পৃথক। সবথেকে বড়ো কথা উভয়ের প্রতিভার জাতই ছিল ভিন্ন। কলমের শক্তিই বলি আর মেজাজই বলি সবই

ছিল আলাদা। তবে মধুসূদনহেমচন্দ্রের সম্পর্কেরও একটা দিক উল্লেখ করে রাখি।'হেমচন্দ্র মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের একবার ১৮৬২ সালে আর একবার ১৮৬৭ সালে, এই দুই বার দুটি ভূমিকা লেখেন আর মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ কে লেখেন,- Meghnad is going through a second edition with notes and a 'real' B.A. has written a long critical preface, echoing your verdict-namely, that is the first poem in the language. 62210 ch মেঘনাদবধের রূপাত্মাকে অনুধাবন করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রভূত শ্রদ্ধা। কিন্তু তিনি পুরোপুরি মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেন নি। তাঁর সাহিত্য, শিক্ষা, রস-রুচি সবটাই ভিন্ন পথে হেঁটেছে।

'বৃত্র-সংহারে' 'মেঘনাদবধে'র প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'-এ লিখেছেন, "বৃত্র-সংহারকাব্য-হেমবাবুর প্রণীত সকল পুস্তক অপেক্ষা বৃহত্তর। হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধের টীকা লেখেন, বোধহয়,তকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মেবৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।" তিনি খুব সংক্ষেপে এই দুই কাব্যের চরিত্র সমূহের মধ্যে একটা তুলনাও করেছেন,-"রুদ্রপীড়ও ইন্দুবালা মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয়। তন্মধ্যে রুদ্রপীড় কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রজিতের অনুরূপ হইলেও ইন্দুবালা প্রমীলা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথবিধ পদার্থ। ইন্দুবালার পতিপ্রেম, পতিকৃত সামরিক নিষ্ঠুর কার্য্যের চিন্তায় মনের সেই সেই ভাব, পরদুঃখকাতরতা পতির নিধন শ্রবণেই মৃত্যু—এ সকল কোমলতা ও মধুরতার একশেষ! কিন্তু দৃঢ়তার অভাব।"

বিস্তারিত আলোচনায় আমরাও দেখি হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর প্রসঙ্গে মনে পড়ে মধুসূদনের রাবণের কথা, রুদ্রপীড়ের মধ্যে অবশ্যই খুঁজে পাব ইন্দ্রজিতকে, ইন্দ্রের সঙ্গে মিল আছে রামের। এঁদের মধ্যে হুবহু মিল যদিও নেই কিন্তু একই কল্পনালোক

থেকে এদের উদ্ভব বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। এমনকি বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রমীলা ও ইন্দুবালার মধ্যে সহজেই সম্পর্ক তৈরি করা যায়। সরমা ও চপলা যেন একগোত্রের। সীতা ও সরমা সংবাদের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে শচী ও চপলা সংবাদে। অন্যদিকে ঐন্দ্রিলা যেভাবে ভীমা মুর্তিতে শচীর কাছে এসেছে তা যেন প্রমীলার লঙ্কপ্রবেশ। কিন্তু এসব প্রভাব সবটাই বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গের ভাব প্রেরণায় মিল নেই এমনকি উক্ত প্রভাব বা অনুকরণের ক্ষেত্রেও। প্রমীলা ও ইন্দুবালা চরিত্রের কিছু মৌল পার্থক্যের দিকে আলোকপাত করা যাক যা বুঝিয়ে দেবে মূল জীবনদৃষ্টিতেই উক্ত দুই কবির পার্থক্য রয়ে গেছে। ইন্দ্রজিত যখন প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলার কাছে বিদায় নিতে গেছেন তখন প্রমীলার প্রতিক্রিয়া বীরপত্নী সুলভ সংযত, সংহত কিন্তু বলিষ্ঠ। তিনি যুদ্ধকে ভয় পান না বরং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গিনী হতে চান। তিনি যখন পতির পদাশ্রিত হতে চেয়েছেন তখনো পতির সান্নিধ্য কামনায় তার আন্তরিকতা কিন্তু আত্মহারা হয়ে পড়েনি। কিন্তু ইন্দুবালার মনে একদিকে যেমন যুদ্ধ সম্বন্ধে ভয় কাজ করেছে অন্যদিকে তেমনি তাকে দেখা গেছে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়তে এমনকি মুচ্ছা যেতে। সে বলেছে,-

ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে-
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ ?
খোল, প্রভু, রণসাজ-না পারি সহিতে।
যাবে নাথ?—যাবে কি হে ছিড়িয়া এ লতা?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি!
ছিড়ি কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া?....ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রমীলা একাধারে গৃহলক্ষ্মী ও বীরাঙ্গনা, যেখানে ইন্দুবালা নিতান্তই যেন

বাঙালী ঘরের গৃহবধূ। পুরুষের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই, যুদ্ধক্ষেত্রকে তার ভয়, প্রেমালিঙ্গনে স্বামীর সাথে বাঁধা পড়ে থাকাকেই সে মনে করেছে জীবনের সার্থকতা। জীবনের ছোট ছোট সুখ ভালবাসা নিয়েই সে সুখী, এর চেয়ে বেশী কোন আকাঙ্ক্ষা তার নেই। বোঝাই যায় দুজনের চরিত্রের মৌল সত্তাতেই পার্থক্য রয়ে গেছে। এ বিষয়ে বিদগ্ধ সমালোচক জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,-"নিজের বিশ্বমানবিক মন ও রুচি নিয়ে মধুসূদন বাঙালীর জগৎ থেকে যতটুকু সরে গিয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি পরিমাণে হেমচন্দ্র বাঙালীর জীবনে ফিরে এসেছেন। এখানেই তাঁদের সুস্পষ্ট ভেদ। এবং সেই ভেদের দিকে লক্ষ্য রেখেই বৃত্রসংহারের বিচার বাঞ্ছনীয়।"

সে বিচারে বসে মেঘনাদবধের সাথে বৃত্রসংহারের তুলনা প্রতিতুলনা থেকে উঠে আসবে আর একটি প্রসঙ্গও, সেটি হল "বৃত্রসংহার" কাব্যের জাতি কি? বৃত্রসংহারের আখ্যানভাগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব মেঘনাদবধের কাহিনীরও উৎস পুরাণ এবং পুরাণের একটি ছোট কাহিনীকে পল্লবিত করেছেন হেমচন্দ্র। কিন্তু মেঘনাদবধ তো কেবল পুরাণ কাহিনীর পল্লবিত প্রকাশ নয়, তাতে পুরাণের কাহিনীর পুনর্বিচার, পুনবিন্যাস, সে তো নতুন যুগের এক কবির সমগ্র জীবনমন্থন করে উঠে আসা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, নব যুগচেতনার ভাষ্য। এ সব বৃত্রসংহারে কোথায়? প্রচলিত কাহিনী, লোকবিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিতকে নবমহিমা দিয়েছেন মধুসূদন। হেমচন্দ্র পৌরাণিক উৎস থেকে যে কাহিনীটি পেয়েছিলেন সেখানে দধীচির আত্মত্যাগ কিংবা দেবতাদের হৃত স্বর্গ পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম অধর্মের ফলে বৃত্রের পতন ইত্যাদির নবমূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে তিনি মহাকাব্যোচিত মহিমায় একটি কাহিনীর অবতারণা করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি শুধু কাহিনীর বিশালতার দিকেই নজর দিলেন। তাতে নবজীবনচেতনা সঞ্চারিত করতে পারলেন না, প্রচলিত কাহিনী ধারা ও সিদ্ধরসেরই অনুবর্তন করলেন। আসলে প্রচলিত কিছুর বিরুদ্ধাচারণের জন্য যে শক্তি, সাহস, প্রতিভার

প্রয়োজন মধুসূদনের সবটুকুই ছিল। পাঠকের সংস্কারকে দূর করে নবজীবনের নবব্যাখ্যাকার হিসেবে এক নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হেমচন্দ্র আঁকড়ে থাকলেন পৌরাণিক সংস্কারকেই। পাঠকের সংস্কারকে পরিবর্তন করা নয়, তাদের মনের দরজায় পৌঁছে যশপ্রাপ্তি লক্ষ ছিল হেমচন্দ্রের। এই কাহিনী থেকে তিনি সেই রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন বোধহয়।

তবে উনিশ শতকের বাঙালীর নবজাগ্রত বিবেক, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বাঙ্গালীর হৃদয় বেদনা এখানে অনুপস্থিত নয়। দেবতাদের স্বর্গোদ্ধারের বাসনা এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে সে বাসনা পরিস্ফুট হয়েছে। অসুর কর্তৃক স্বর্গবিজয়, স্পষ্টতই ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিজয়ের রূপক। দেশপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে এখানে। স্বর্গচ্যুত দেবতাদের বিষাদাচ্ছন্নতায় সেই স্বাধীনতাহীনতার যন্ত্রণাই প্রতিবিম্বিত, পরাধীন বাংলা যেন ধূমান্ধ পাতালপুরী,—

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব, চিন্তিত, আকুল,
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।

সেখানে,

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন নির্বাণ যথা সূর্য ত্বিষম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে;

কিন্তু স্বভূমি বিস্মৃত হয়ে কেউ কি থাকতে পারে? সে মানুষই হন বা দেবতা, তাই তো তারা,-

স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্বক্ষণ-
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জয় অসুরে।

স্কন্ধের কথায় যেন কবিকণ্ঠের প্রতিধ্বনি, তিনিও যেন স্বজাতির উদ্দেশ্যে চলতে চেয়েছেন,-

এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল-দেশে,
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?

এবং এরপর দেবতারা প্রতিশ্রুত হয়েছেন-

দৈত্যের কণ্টক হয়ে আমরা বেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল, যুগ-যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে
... ...
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে .
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।

এবং শেষে পররাজ্যলোভী বৃত্রের পতন ঘটেছে।

সমকালের ভাবনা এভাবেই প্রবেশ করেছে 'বৃত্র-সংহারে' তবে তা অভিনব জীবন নীতিকে কতটা যুগোপযোগী ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অবশ্য এ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,-"হেমচন্দ্র জাতিবৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি-ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ...জাতিবৈরের কাব্যের হিসাবে 'বৃত্র-সংহার' বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—ভাবে, রসে, ঝাঁঝে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে; এমন হয় নাই, বুঝি বা এমন হইবে না।"

আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতেই পারে। হয়তো সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সিপাহীবিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে হেমচন্দ্রের মনে এই বোধ জাগ্রত হয়ে থাকবে যে শুধু বীরত্ব প্রদর্শনেই কাঙ্ক্ষিত কার্য সমাধা করা যায় না, তার সাথে প্রয়োজন হয় ইন্দ্রের মতো কল্পান্তব্যাপী কঠোর তপস্যা এবং দধীচির মতো আত্মত্যাগের আদর্শ। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বোধগুলির প্রয়োজন পড়েছিল বইকি!

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও বৃত্র-সংহার অনেকাংশে হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের যুগ পরিবেশের প্রতিচ্ছবি—বিষয়টি উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করো।

২। 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের সর্গ-বিন্যাস চিহ্নিত করে দেখাও একটি আখ্যানকে কাব্যের রূপ দিতে কবি কতটা দক্ষতা দেখিয়েছেন।

৩। 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের জাতিবিচার করো।

৪। 'বৃত্র-সংহার' কি 'মহাকাব্য' হয়ে উঠতে পেরেছে না একটি উৎকৃষ্ট আখ্যানকাব্য হয়ে থেকে গেছে—বিষয়টি নিজের ভাষায় পরিস্ফুট করো।

আকর গ্রন্থ

১। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী—প্রকাশক সনৎকুমার গুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬০

সহায়ক গ্রন্থ

১। ঘটক কল্যাণীশঙ্কর—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবলী

২। ঘোষ দামোদর—কবি হেমচন্দ্র

৩। দাশগুপ্ত শশিভূষণ—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ

৪। মুখোপাধ্যায় তারাপদ—আধুনিক বাংলা কাব্য

৫। সরকার অক্ষয়চন্দ্র—কবি হেমচন্দ্র

৬। সেন সুকুমার—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)

পর্যায় গ্রন্থ-৩

জীবনানন্দ দাশ আটটি নির্বাচিত কবিতা

একক-৯

বনলতা সেন

বিন্যাস ক্রম :

৬.৩.৯.১ : ভূমিকা

৬.৩.৯.২ : কবিপরিচয়

৬.৩.৯.৩ : কাব্যভাবনা

৬.৩.৯.৫ : বনলতা সেন : সবুজ ঘাসের দেশ

৬.৩.৯.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৩.৯.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই যে-সব কবি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের প্রধানত তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে পারি। প্রথমত, নিজেদের কাব্যপ্রতিভা থাকলেও যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবি এই শ্রেণিতে পড়তে পারেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডল থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেছেন। এঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিতও হয়েছেন, যেমন দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দেহবাদী কবি মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। তৃতীয় পর্যায়ের কবিরা রবীন্দ্রযুগ অতিক্রম করার সচেতন অভিপ্রায় নিয়েই একটি রবীন্দ্রোত্তর কবিতার যুগ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মনের কথা সংহত হয়েছে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক, ১৩৬৬ সংখ্যা) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'আবিষ্কার' কবিতার এই কটি পংক্তিতে :

> 'পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।'

এই পর্যায়ের কবিরা হলেন অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

৬.৩.৯.২ : কাব্যপরিচয়

শুধু বর্ষীয়ান কবি বললে অবশ্য জীবনানন্দ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা সাধারণভাবে যাকে 'আধুনিক কবিতা' আখ্যায় ভূষিত করা হয়, সেই পর্যায়ের সবচেয়ে আলোচিত কবিও তিনিই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়', অন্যান্য অনেকেই অনেক রকম অভিপ্রায় ভূষিত করেছেন তাঁর কবিতাকে। কবি সে সব জানতেন বলেই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা-র' ভূমিকায় তিনি বলেছেন—'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার, কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে।'

> *রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যো জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে আলোচিত এবং অনুভবী কবি। আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত, নাগরিক জটিলতায় আক্রান্ত, মানসিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যা অনেকটা মনের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার সিটি কলেজে। ছোটবেলায় কবিতা রচনার হাতে খড়ি হলেও প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলি হল—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) এবং 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ-'রূপসীবাংলা' (১৯৫৭) এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১)। জীবনানন্দের কবিতায় জীবন, প্রেম এবং যাবতীয় সমস্যাকে ভূগোল বা সময়ের প্রায় এক অখণ্ডতাতেই ধরতে চেয়েছেন, তাকে বিশেষ করে গণ্ডিবদ্ধ করেননি।*

জীবনানন্দের কবিতায় এই রকমের সব অভিধা প্রযোজ্য কিনা সেটা কবিতাভিত্তিক স্বতন্ত্র আলোচনায় লক্ষ করার চেষ্টা করা যাবে, কিন্তু যে কথাটা নিঃসন্দেহে এবং বিনা দ্বিধায় বলা যায় সেটা হল এই পর্যায়ের সব চেয়ে অনুভবী কবি জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিক্রিয়াতেই এই পর্বটির আবির্ভাব এবং সম্ভবত সেই কারণেই মন অপেক্ষা মননের প্রভাব, হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বেশি। বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিকতার মূল উৎপাটন করার জন্য, যতটা শৈল্পিক কারণে তার চেয়ে বেশি প্রতিবাদী প্রমাণ করার চেষ্টায়, কঙ্কাবতীর 'নতুন ননীর মতো তনু'-র পেছনে দেখতে পেয়েছেন 'কুৎসিত কঙ্কাল', সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ক্ল্যাসিকাল কাব্যরুচির যেখানে শব্দকে ব্যবহার করা হয় তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, বিষ্ণুদের কবিতা বুঝতে গেলে ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণ প্রায় সমান ভাবে জানতে হয়, একথা সমকালেই শোনা গিয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে জীবনানন্দ অনেক বেশি অনুভূতি নির্ভর, তাই তাঁর ভাষায় চাকচিক্য দেখতে পাইনা আমার- তাঁর অসংলগ্ন শ্লথ চিন্তার মতোই ভাষাতেও যেন একটা অসংলগ্নতা আছে। দীর্ঘ এলায়িত পংক্তি, অধিকাংশ সময়েই তান প্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দের শ্লথ ভঙ্গি, ক্রিয়াপদে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ—অথচ তা সত্বেও ভাষা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা জানেন এটাও একটা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ভাষা এবং কবিভাষা।

৬.৩.১.৩ : কাব্যভাবনা

জীবনানন্দের কবিতা অনুভূতি প্রধান, এ কথা বলতে আমরা কিন্তু কখনোই বলতে চাইনি মনন সেখানে উপেক্ষিত। আসলে আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত, নাগরিক জটিলতায় আক্রান্ত মানুষ বুদ্ধির অভিশাপ থেকে মুক্তি

পাননা। তাঁর মানসিকতা তৈরিই হয় বিবিধ চিন্তার উত্তেজক আক্রমণে। সেই জটিল মানসিকতাই তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নির্ভর করেছেন অনেকটাই মনের ওপর। তাই অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধির প্রদীপ জ্বেলে অগ্রসর হতে হয়, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় বোধের উচ্চতায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাঁর অনুভূতির সঙ্গে সংলগ্ন হতে চেষ্টা করার। সমালোচকের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি যে বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন, সেখানে চোখে 'অক্ষম পিচুটি'-ওয়ালা সমালোচকদের 'কবিদের মাংসক্রিমি' না খুঁটে কবির ভাবনার উচ্চতায় আরূঢ় হতে বলেছেন এবং এই সমারূঢ় হওয়াকেই প্রকৃত সমালোচকের কর্তব্য মনে করেছেন।

আদিনিবাস ঢাকার বিক্রমপুর হলেও জীবনানন্দ দাশগুপ্তের জন্ম (পরে পদবির শেষাংশ বর্জন করে 'দাশ' হয়েছেন) বরিশাল শহরে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি। পিতা সর্বানন্দ দাসগুপ্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন, মা কুসুমকুমারীও ছিলেন কবি, তাঁর এই দুটি পংক্তি এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে :

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।",

বরিশাল স্কুল এবং কলেজে শিক্ষাজীবন শুরু করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসন সান্মানিক ইংরেজি নিয়ে পড়তে। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার সিটি কলেজে। বিভিন্ন কারণে অনেক কলেজ পরিবর্তন করতে হয় জীবনানন্দকে। দিল্লির একটি কলেজে কিছুদিন কাজ করার পর দেশে অর্থাৎ বরিশাল ফিরে যান। দেশবিভাগের পরে চলে আসেন কলকাতায়। একটি পথদুর্ঘটনায় ১৯৫৪ সালে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন তিনি ছিলেন হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক।

অত্যন্ত ছোটবেলায় কবিতা রচনার হাতে খড়ি হলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম আত্মপ্রকাশ 'কল্লোল' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩২ সংখ্যায়, কবিতার নাম ছিল 'নীলিমা'। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী এই রকম-'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) এবং 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ-'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১)।

জীবৎকালে জীবনানন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও-উপন্যাস তো নয়ই, গল্পও সম্ভবত প্রকাশিত হয় নি। অথচ মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'সুতীর্থ'। সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মাল্যবান' এবং সাময়িকপত্রে সতেরো কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'জলপাইহাটি'। এই তিনটি উপন্যাসই একই বছরে লেখা (১৯৪৮ সাল)। এরপর 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনা বিভাগ থেকে দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী যখন প্রকাশিত হতে থাকে তখন আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। আমরা বুঝতে পারি কবিতার তুলনায় তাঁর গল্প উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম বারোটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নটি উপন্যাস, তিরানব্বইটি ছোটগল্প এবং দুটি বড়ো গল্প।

'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থকে জীবনানন্দের কাব্যসাধনার প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। কবির নিজস্বতা সেখানে খুব ভালোভাবে প্রকাশিত হয়নি, চিন্তাতেও না, কবি-ভাষাতেও না। অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই কবির দুর্বল চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করছে, যেমন—'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—

ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল',

কবিকে সার্বিক ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে। প্রথম দিকের কিছু কবিতায় অত্যন্ত, মিল আছে, যেমন—

'রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'

কিন্তু এই মিল বর্জন করেছেন, এমন কবিতার সংখ্যাই বেশি, যেমন—

'চারিপাশে বনের বিস্ময়
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন;' (ক্যাম্পে)

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' মূলত প্রেমেরই কবিতা, যদিও সে প্রেমে ব্যক্তিগত প্রেমের সংরাগ ততটাই, যতটা আছে প্রেমের বিস্ময় এবং ব্যাপ্তি। অবাক লাগে ভাবতে, প্রেমের মূল তাৎপর্য কবি এর মধ্যেই ধরতে পেরেছেন। প্রেমে যে অজস্র দুঃখ আছে, তা সত্ত্বেও প্রেমেই যে জীবনের সব কিছু, এই বোধ কবির জন্মেছে।

জীবৎকালে জীবনানন্দের তৃতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন' হলেও প্রকাশকালের বিচারে 'রূপসী বাংলা'ই তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ। সেই কারণে ভারবি সংস্করণ 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতায়' এই কাব্যই আগে এসেছে। 'রূপসী বাংলা-য় বাংলার পল্লীপ্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে বললে কিছুই বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এক 'চিত্ররূপময়' বললে কিছুটা বোঝা যাবে, আরো স্পষ্ট হবে বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করলে :

'প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ।' এই মন্তব্য একেবারে ঠিক বলেই মনে হয় আমাদের, কারণ জীবনানন্দের প্রকৃতি-প্রীতি রোমান্টিক প্রকৃতি-বিলাস নয়, একেবারেই জীবনের সঙ্গে অন্বিত। কয়েকটি পংক্তি মনে ধরা যাক :

'পৃথিবীর কোনো পথে নরম ধানের গন্ধ-কল্‌মীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের,
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত-শীত হাতখান,
(আকাশে সাতটি তারা)

'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাশের প্রতিভার পূর্ণ নিদর্শন বলে অনেকেই মনে করেন। বনলতার মতো এক-একটি বিশেষ নামের নায়িকা অনেকগুলি আছে—'চোখে যার শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার' সেই শঙ্খমালা আছে, পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন যার শরীর সেই সুদর্শনা আছে, 'পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতন' সুরঞ্জনাও আছে। শেষ অভিধাই প্রমাণ করে দেবে, বিশেষ হয়েও এরা কেউ বিশেষ নারী নয়। উপলক্ষ বা সূত্র বিশেষ নারী থাকতে পারে, কবিতায় তাকে কবি বিশ্বময় ছড়িয়েই দিয়েছেন। এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই প্রেমের কবিতা, কিন্তু সেই একই কথা আবার বলতে হবে, ঠিক ব্যক্তিবিশেষের গণ্ডি বা প্রথাবদ্ধ প্রেমের কবিতাও এগুলি নয়। এই কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা আলোচনার সুযোগ আমরা পাবো, তখনই প্রসঙ্গটি বিশদ করা যাবে।

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের কিছু অসাধারণ কবিতা আছে। যে শঙ্খমালা নায়িকার নাম আমরা উল্লেখ করেছি সেই শঙ্খমালা আছে—সেই সঙ্গে আছে আরো তিনটি এমন কবিতা যা আমাদের পৃথকভাবে পড়তে হবে। এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের সেই মানসিকতার পূর্ণ প্রতিফলন আমরা পাই যে মানসিকতার জন্য তিনি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। ১৯৪৮ সালের একেবারে শেষের দিকে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার অর্থ, যে তিনটি উপন্যাসের উল্লেখ আমরা করেছি সেগুলি এখন লেখা হয়ে গিয়েছে। কাজেই জীবনানন্দের 'কবিজীবনের একটি যুগান্তর' বলে এই কাব্যগ্রন্থকে যদি সমালোচক চিহ্নিত করেন তাতে আমাদের আপত্তি করার কথা নয়।

সুতরাং মেনে নিতে হয় 'সাতটি তারার তিমির' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'-র মধ্যে ভিন্ন গোত্রের বা ভিন্ন ভূমিকার জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তা যে পাওয়া যাবে, এ কথাও মিথ্যা নয়। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা সাধারণভাবে নির্বিশেষে ভৌগোলিক প্রেক্ষিত, পরিব্যাপ্ত ইতিহাস এবং প্রায় অখণ্ড একটি সময়কেই পাই। কবির এই ইতিহাস-চেতনা এবং কালচেতনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন ভাবেই অনেকে একে দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু সহজ কথাটা এই যে, জীবনানন্দ জীবন, প্রেম এবং যাবতীয় সমস্যাকে ভূগোল বা সময়ের প্রায় এক অখণ্ডতাকেই ধরতে চেয়েছেন, তাকে বিশেষ করে গণ্ডিবদ্ধ করেন নি। 'কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন—কালজ্ঞান—এ কথা তিনি বলেছিলেন 'উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে। শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থে আমাদের মাঝে-মাঝেই মনে হয় একটি বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ সময়ের প্রতিক্রিয়ায় কবি কবিতাগুলি রচনা করেছেন। ফলে ওই প্রবন্ধে কবির যে স্বীকারোক্তি, 'সময় ও সীমা প্রকৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি নিযুক্ত দেখতে আমি ভালোবাসি', পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে মাঝে মাঝেই লঙ্ঘিত হয়েছে। এই দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি মাত্র কবিতাই আমাদের পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত, সেই জন্য কথাটি উল্লেখ করে নিতে হল।

৬.৩.৯.৫ : বনলতা সেন : সবুজ ঘাসের দেশ

একটি বিশেষ নাম বা বিশেষ কবিতা কোনো কোনো কবির প্রায় ট্রেড মার্কে পরিণত হয়, এই সময়েও হয়, যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-আন্দোলনের অগ্রপথিকদেরও হয়েছিল। বুদ্ধদেব

বসুর ছিল কঙ্কাবতী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শাশ্বতী, আর জীবনানন্দ দাশের বনলতা-শুধু বনলতা নয়, একেবারে পদবী এবং সাকিন শুদ্ধ, 'নাটোরের বনলতা সেন।' আরো অনেক নারীর নামে কবিতা লিখেছেন তিনি, সবকটি প্রবাদে পরিণত হয়নি, বনলতা হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে অনেক, জল্পনা-কল্পনাও হয়েছে—ব্যাখ্যাও হয়েছে প্রচুর। ব্যাখ্যার মূল প্রশ্ন একটাই, একে আমরা প্রেমের কবিতা বলবো অথবা বলব না। সন্নিহিত প্রশ্ন এই নারী কাল্পনিক অথবা এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। এ সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আমরা দেব, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলবো যে এর চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতাটির মর্মকথা বোঝা, কারণ জীবনানন্দ সারা জীবনে যে-কটি অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, এই আঠারো পংক্তির কবিতাটি তার একটি।

জীবনানন্দ সারা জীবনের যে কটি অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে 'বনলতা সেন' কবিতাটি অন্যতম। অনেক নারীর নামেই কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বনলতা অসাধারণ হয়েছে। এটি আসলে একটি প্রেমের কবিতা। সাধারণ ভাবে মানুষের কথাই কবি বলেছেন; মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম, সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের হৃদয়কে ক্লান্ত করে তোলে। তখন মানুষ শান্তি পাবার জন্য চাইতেই পারে বনলতা সেনকে। আসলে বনলতা সেন একটি নারীর নাম, মানবীর নাম।

কবিতাটির প্রকাশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই, অর্থাৎ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার একটা কারণ তো অবশ্যই এই যে কবিতা হিসাবে এটি অসাধারণ, কিন্তু এর অন্য কারণ এই যে এরকম পদবিসহ গোটা নাম বাংলা কবিতায় খুব বেশি পাওয়া যায় নি। এ সম্বন্ধে যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর তখন পাওয়া যায় নি, পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক দিন পর দেবেশ রায় সম্পাদিত জীবনানন্দ সমগ্রের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে এবং ভূপেন্দ্র গুহ সম্পাদিত জীবনানন্দের দিনলিপি বা Literary Notes প্রকাশিত হবার পর। রাম না জন্মাতে রামায়ণের মতো, 'বনলতা সেন' কবিতার এক বছর আগে লেখা প্রায় আত্মজৈবনিক উপন্যাসে জীবনানন্দ এই নামের মেয়েটিকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। উপন্যাসের কোনো নামকরণ করেন নি কবি, সম্পাদকই এর নামকরণ করেন 'কারুবাসনা'। সেই উপন্যাসে আমরা পাই :

ক) 'কিশোর বেলায় সে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল', (আমাদের মনে পড়বেই 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'কুড়ি বছর আগে' কবিতার সেই পংক্তি—'আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!')

খ) 'সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছর আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার (কেদার বাবু) তার লম্বা, চেহারা, মাঝ গড়নের মানুষ—সাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে; বহুদিন হয় তিনিও এই পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ।'

দিনলিপিতে বনলতা সেনের নাম নেই, কিন্তু Y নামে চিহ্নিত এক নারীর কথা আছে যে Y সম্ভবত তাঁর অপ্রকাশিত উপন্যাস 'শচী'র নায়িকা, ব্যক্তিগত জীবনে যে কবির খুড়তুতো বোন বুলুর বান্ধবী। দিনলিপিতে আছে Y কে দেখে 'সেই মেয়ের' কথা মনে পড়েছে তাঁর—'A rural girl beloved who might flavour my life with love : Y wakes that but Y is far from that.'

এই 'প্রিয়তমা গ্রাম্য বালিকা কি বনলতা? হতেই পারে। হতে যে পারে জীবনানন্দের আরো বেশ কিছু কবিতা থেকে তা বোঝা যায়। তবে উপলক্ষ যাই হোক, 'বনলতা সেন' কবিতাটি সেই উপলক্ষ বা কবির উল্লিখিত সেই গ্রাম্য নারীকে অতিক্রম করে অনেক দূর চলে গেছে, এতটাই দূরে যে সত্যিই সেই নারী যদি এর প্রাথমিক অবলম্বন হন, তিনিও ধন্য হতে পারতেন এমন একটি কবিতার উৎসমুখ খুলে দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকন্যার একটি আবদার শুনে 'যেতে নাহি দিব' নামে যে কবিতা লেখেন, শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাকে আখ্যা দিয়েছেন 'ক্ষুদ্রতম মহাকাব্য', আমরা মনে করি এটিও মানুষের সভ্যতার মহাকাব্য। তাহলে এই কবিতার বিষয় কী? প্রেম নয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করতে পারি, বনলতা সেন প্রেমের কবিতা এবং একশো ভাগ প্রেমের কবিতা, কিন্তু প্রেমকে যে সংকীর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে আমরা অভ্যস্ত, সেই অর্থে নয়; প্রেম যেখানে জীবনের পরমার্থ, প্রেম যেখানে মৃত সঞ্জীবনী আশ্রয়, সেই প্রেমই এই কবিতার বিষয়।

কথাটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, সেই ব্যাখ্যা অবশ্যই করা হবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখাও উচিত, কবিতার ব্যাখ্যা কবিতাপাঠকের নিজের। পাঠকের রুচিভেদ অনুযায়ী ব্যাখ্যার তারতম্য হতেই পারে, তা ভিন্ন মাত্রাও লাভ করতে পারে, কিন্তু তাতে কবিতার মূল্য কমে না, সেটি সম্বন্ধে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয় না। বস্তুত, কবিতা যখন কবিতা হয়ে ওঠে তখন কবির কল্পনা পাঠকের অন্তরেও সংক্রমিত হয় এবং পাঠক নিজের মতো হয় তার রসগ্রহণ করেন। কাজেই এই ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূত না হতে পারে, সকলে গ্রহণ নাই করতে পারেন, কিন্তু একজন পাঠকের রসগ্রহিতা হিসাবে তার মূল্য কিছুতেই কমবে না।

মাত্র তিনটি স্তবকের কবিতা, প্রত্যেক স্তবক পংক্তির সংখ্যা ছয়। প্রত্যেক স্তবকে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এবং তিনটি প্রসঙ্গ মিলিত ভাবে এক মহাকাব্যিক ধারণা পরিস্ফুট করেছে।

প্রথম স্তবকের শুরুতেই যখন কবি বলেন 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি', তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, বাস্তব অর্থে এই পদচারণার কথা বলা হচ্ছে না, এবং ব্যক্তিবিশেষের সর্বনাম হিসাবেও 'আমি' ব্যবহার করা হয়নি। ধরে নেওয়াই যেতে পারে, সাধারণ ভাবে মানুষের কথাই কবি বলেছেন, কারণ 'পৃথিবীর পথে' মানুষ হাজার বছরও নয়, হাজার হাজার বছর ধরে হাঁটে। আমাদের এই ধারণা সমর্থিত হয় পরের পংক্তিতেই, যেখানে কবি বলেন তিনি সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর পর্যন্ত ঘুরেছেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে যদি ব্যাপ্ত ভৌগোলিক সীমার কথা বলে থাকেন, তৃতীয় পংক্তিতে তবে এসেছে কালগত বিস্তৃতির কথা, কারণ 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' যদি অবস্থানের কথা বলেন এবং তা আরো পিছিয়ে ভারতবর্ষের পৌরাণিক নামে চিহ্নিত 'বিদর্ভ নগর' পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে বুঝতে হবে যুগ যুগ ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের যে পথ পরিক্রমা তার কথাই কবি বলতে চান। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক', এই কারণে হতে পারে যে কবি দীর্ঘদিনের পথপরিক্রমার কথা বলেছেন, কিন্তু তারপরই 'জীবনের সমুদ্র সফেন' ইঙ্গিত দেয় মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি—'সুচেতনা' কবিতায় যাকে বলেন 'পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা', তার কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন। এগিয়ে মানুষকে যেতে হবেই, কিন্তু কেবলই পার্থিব উপকরণের বাহুল্যের জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম, সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের হৃদয়কে ক্লান্ত করে তোলেই। তখন মানুষ শান্তি পাবার জন্য চাইতেই পারে বনলতা সেনকে।

প্রথম স্তবকে যদি মানুষের material prosperity-র জন্য নিরন্তর জীবনসংগ্রামকে বোঝাবার চেষ্টা কবি করে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয়, স্তবকে কবি ব্যক্তিগত পরিচয়ের এই নাটোরের বনলতা সেনের' প্রকৃতি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। কবি যখন বলেন—

‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;’

—তখন এ কথা আমাদের মনে না হয়েই পারে না যে বিশেষ নারী, বিশেষ সময়ের নারী এমন কী বিশেষ স্থানের নারীকেও তিনি বোঝাতে চাইছেন না, তিনি বলতে চাইছেন না, তিনি বলতে চাইছেন নারীর কথা। রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ নাটকে নন্দিনীর কথা ভূমিকায় বলতে গিয়ে বলেছেন—নারী এল, নন্দিনী এল; অর্থাৎ নারী ও নন্দিনী সেখানে সমার্থক। অন্যত্র বলেছেন ‘শুধু মনে রাখুন এটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।’ আমরাও তাই জানি, বনলতা সেন একটি নারীর নাম, মানবীর নাম। এই নারী কী করে, কী তার সত্যিকারের ভূমিকা, সেটা বোঝা যায় কবিতার পরের অংশ পাঠ করলে। অতি দূর সমুদ্রে হাল ভেঙে দিশা হারিয়েছে যে বিপর্যস্ত নাবিক, তার কাছে বনলতা সেনের সাক্ষাৎ কীরকম, একটি অসাধারণ উপমায় ফুটিয়েছেন কবি—‘সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর’ দারুচিনি মানে রসকষহীন শুকনো বল্কল মাত্র, যে দ্বীপ সেই রকম নীরস কাঠিন্যে ভরা, সেখানে বনলতা সেন এক সবুজ ঘাসের দেশ। বিপর্যস্ত নাবিকের কাছে নারী যে কত বড়ো আশ্রয় তা স্পষ্টতর হয় তার ‘পাখির নীড়ের মতো’ গূঢ় আশ্রয়ী চোখের উপমায়।

কোনো কোনো সমালোচক ‘বনলতা সেন’ কবিতাটির সঙ্গে আমেরিকান কবি Edgar Allan Poe এর ‘To Helen’ কবিতাটির, বিশেষ করে এই দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে Poe-এর কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করেছেন। সেটি এইরকম :-

‘On desperate seas long want to roam,
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have bought me home
To the glory that was Greece,
And the grandeur that was Rome.’

মিল নিশ্চয়ই কিছু আছে, শব্দ ব্যবহারের মিলই বেশি, জীবনানন্দ যা বলতে চেয়েছেন তার ব্যাপ্তি আরো বেশি। সভ্যতা এগিয়ে চলবেই, জীবনের সফেন সমুদ্রে মানুষকে আন্দোলিত হতে হবেই, এবং সেই কারণে মাঝে মাঝে ক্লান্তিও তার আসবেই। সেই ক্লান্তির অপনোদন করতে পারে নারীর সুগভীর আশ্রয়, নারীর লালিত আশ্রয় ছেড়ে মানুষ কিসের লোভে দিনরাত্রি এত ছুটে বেড়াচ্ছে, এ প্রশ্ন সেই ‘hyacinth hair’ এবং ‘classic face’ এর অধিকারিণী নারীর—‘এত দিন কোথায় ছিলেন?’ ক্লান্ত মানুষকে নতুন করে যাত্রার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, মানুষ যে আসলে মানুষ সে কথা বুঝবার জন্য তাকে আসতেই হবে তার নারীর কাছে, নইলে মানুষ নতুন করে সভ্যতার অগ্রগতিতে কাঁধ মেলাবে কেমন করে। সভ্যতার এই অমানবিক অগ্রগতি এবং মাঝে মাঝে নারীর আশ্রয়ের এই গূঢ় মর্যাদা যদি ‘বনলতা সেন’ কবিতায় এখনো অস্পষ্ট থাকে তবে ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থেরই ‘মিতভাষণ’ কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে :

‘মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
....

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো:
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।'

এই 'তুমি' যে বনলতাই তার প্রমাণ আর-একবার পাই 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে :

"শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে? শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

কবিতায় তৃতীয় স্তবকে কোনো কোনো সমালোচক সমগ্র কবিতার অনিবার্য অঙ্গ মনে করতে পারেননি; প্রেমকে যে উচ্চতায় কবি অনুভব করেছেন সেই স্বর্গ থেকে পতন ঘটে ব্যাপ্ত নৈরাশ্য কবিতাকে ঘিরে ধরেছে, এমনটাও মনে হয়েছে কারো। আমরা এই ধারণার সঙ্গে একমত নই, আমাদের মনে হয় সমস্ত কবিতায় একেবারে উপযুক্ত ও অনিবার্য উপসংহার এটাই। 'অন্ধকার' শব্দটি বার বার আছে বলেই তাকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। অন্ধকার জীবনানন্দের কবিতায় অনেক অনুষঙ্গে এসেছে। 'রূপসী বাংলা'-য় সন্ধ্যার অন্ধকারই সবচেয়ে রোমান্টিক। 'অন্ধকার' কবিতার মতো কীর্তিনাশা 'অনন্ত মৃত্যুর মতো' অন্ধকার সর্বত্র নেই, কখনো তা 'অরব' অন্ধকার, কখনো বা নিঃসৃত অন্ধকার যাকে তাঁর মনে হয় 'রাত্রির মায়ের মতো।' অন্ধকারের প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রেখে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা স্মরণ করবো, 'বনলতা সেনের' তৃতীয় স্তবকটি বুঝে নেওয়ার জন্য।

কবিতার নাম 'ঝড়ের খেয়া', 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে ৩৭-সংখ্যক কবিতা হিসেবে যেটি স্থান পেয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মাঝে মাঝে এমন এক-একটি সময় আসে যখন স্থিরকরা কিছু মূল্যবোধ, সংস্কার ইত্যাদি ভেঙেচুরে যায়। তখন এইসব মূল্যবোধের দ্বারা গড়ে তোলা বন্দর ত্যাগ করে নতুন বন্দর খুঁজে নিতে হয়—নিতেই হয়, কারণ মানুষের অগ্রগতি তো বন্ধ থাকে না।

'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়ে ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী হাঁকিছে তাই বুঝি—
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

একটু লক্ষ করা দরকার 'বেচাকেনা' শব্দটি, কারণ এর সঙ্গে বেশ মিল আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতার 'জীবনের সব লেনদেন'-এর। শুধু এইটুকু মিল নয়, আমি মনে করি মানব সভ্যতার অগ্রগতির কথা জীবনানন্দও বলেছেন, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষের ক্লান্তির কথাও বলেছেন, কিন্তু কাণ্ডারীর পরিবর্তে তিনি বলেছেন নারীর কথা, প্রেমের কথা। সভ্যতার একটি পর্বান্তরে পুরনো সঞ্চয় শেষ হয়—'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী'—মানুষকেও

নতুন করে সঞ্জীবনী শক্তি সংগ্রহের জন্য তার নারীর কাছে ফিরে যেতে, কোমলতা সঞ্চয় করতে হয়। যে অন্ধকারে 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' থাকে সে অন্ধকার 'রাত্রির মায়ের মতো', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা, 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?' তপস্যার চেয়ে প্রেম অনেক কার্যকর, কারণ মানুষকে তা মানুষ করে তোলে। মনে রাখতে হবে মানুষের যাত্রা কখনোই শেষ হয় না, তার পর্বান্তর হয় মাত্র, তাই 'পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে' ও—

'পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিল মিল;'

কাজেই দেখা যায় 'বনলতা সেন' কবিতাটি অসংবদ্ধ নয়, তার তৃতীয় স্তবক বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন অনুভূতিলব্ধ নয়—গোটা কবিতায় একই সুর শুনিয়েছেন কবি: মানুষের যান্ত্রিক সভ্যতার যাত্রার মাঝে মাঝে ক্লান্তি, স্থবিরতা তাকে দূর করার জন্য নীরব লালিত আশ্রয়, প্রেমের প্রশ্রয় প্রয়োজন, তারপর নতুন করে পাণ্ডুলিপি লেখা হয়, সব সঞ্জীবনী শক্তিতে মানুষ নতুন করে সভ্যতার যাত্রাপথে অগ্রসর হয়।

৬.৩.৯.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি?

২। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত?

৩। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম বল?

৪। 'বোধ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

৫। 'বোধ' কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন?

৬। 'কারুবাসনা' কি ধরনের রচনা?

৭। 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন?

৮। 'বনলতা সেন' কবিতাটি কোন পত্রিকায়, কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল?

৬.৩.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।

২। আমার জীবনানন্দ : হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু।

৪। জীবনানন্দ : অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।

৬.৩.১২.২ : পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম ঘাতক

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতার সঙ্গে কী গভীর সাদৃশ্য অনেকদিন আগে লেখা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ক্যাম্পে' কবিতাটির। শুধু যে উপাদানের মিল তা নয়—যদিও উপাদানের মিলও আমাদের বার বার সচকিত করে—সেই হরিণ, অরণ্য, শিকার, নদী, বন্দুকের শব্দ; আমরা বিস্মিত হই অনুভূতিরও অভিন্ন সংবেদন লক্ষ করে। 'শিকার' কবিতা পড়তে গেলে যে অনিবার্য বিষণ্ণতা ও নিরাশ্রয়তার দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, সেটাই যে 'ক্যাম্পে' কবিতারও বিশিষ্ট অনুভূতি সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই কবির নিজেরই দেওয়া ব্যাখ্যা স্মরণ করলে। এই ব্যাখ্যা অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে, ১৯৭৪ সালে, 'শতভিষা' পত্রিকার একচল্লিশতম সংকলনে, সেখানে কবি বলেছিলেন, 'যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের-মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়...স্থূল শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে।'

> *'শিকার' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্ট মানসিকতায় লালিত এক অনুভূতি। 'শিকার' কবিতাটি আখ্যানধর্মী, কিন্তু আখ্যান অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। যদিও সেটি ইমেজিস্ট কবিতা এবং কাব্যআঙ্গিকের প্রাণ যে চিত্রকল্পের অনুপম ব্যবহার এই কবিতা হতে পারে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কবিতাটির প্রধান সৌন্দর্য দুভাবে বিচার্য, তা হল পরিবেশ চিত্রণে এর বর্ণবৈভব এবং সংযমের ঐশ্বর্য। সৃষ্টির নিয়ত শিকারে বিপন্ন কবির অন্তরে আসলে কী গভীর জীবনতৃষ্ণ, একথা যেমন বোঝা যাবে এই চিত্রকল্প থেকে, তেমনি এই অসহ্য রোমান্টিক পংক্তি আমাদের বুঝিয়ে দেবে রোমান্টিকতার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে কী সুতীব্র জীবনবাদ। জীবনানন্দ যাঁদের আনন্দ দেন, জীবনানন্দ যাঁদের বিষণ্ণ করেন, এ কবিতা তাঁদের নতুন করে ভাবাবেই।*

ভাবতে অবাক লাগে, এটি 'শিকার' কবিতার ব্যাখ্যা নয়, এবং সেই সঙ্গেই অনিবার্য প্রশ্ন জাগে এটি কি 'শিকার' কবিতারও ব্যাখ্যা নয়। আসলে এটা অনেক কবিতারই ব্যাখ্যা, এটি জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্ট মানসিকতায় লালিত এক অনুভূতি। সৃষ্টি এগিয়ে চলে, সভ্যতা এগিয়ে চলে, সমস্ত পৃথিবীতে—যেমন বলা হয়েছে 'বনলতা সেন' কবিতায়, হাজার বছর ধরে অবিরাম সক্রিয় সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত ক্লান্তির পরিক্রমা চলবেই। কিন্তু 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।' সভ্যতার এই প্রখর সূর্যালোকের ক্লান্তি সহনীয় করার জন্য থাকে প্রেম। সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গ থেকে যে মানুষকে নিয়ে আসতে পারে এমন এক 'নিঃসৃত অন্ধকার', যা 'রাত্রির মায়ের মতো', যেখানে সমস্ত সত্তা জানে, পাখির নীড়ের মতো এক সুনিশ্চিত আশ্রয়ের দৃষ্টিপ্রলেপ রয়েছে। কাজেই সৃষ্টির বিশাল কর্মযজ্ঞে মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যায়, যে মানব মনুষ্যত্বের জীবের মতোই, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শিকারী সৃষ্টির ফাঁদে পা দেয়। হয়তো কারণটা এই যে, এই প্রেম মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, মৃত্যুভয়কে সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে। 'ক্যাম্পে' কবিতায় হরিণ ছুটেছিল এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনে, 'শিকার' কবিতাতেও

কি হরিণ শুধু নিজের প্রয়োজনে নদীর জলে নেমেছে নাকি আরো এক প্রচ্ছন্ন আবেগ সেখানে কাজ করেছে, যার উল্লেখ কবি এই ভাবে করেছেন—

'এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার ম'তো জেগে উঠে

সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।'

'শিকার' কবিতার ব্যাখ্যা এরপরও কিছু বাকি আছে বলে আমার মনে হয় না, অন্তত কবিতার ব্যাখ্যা যাকে বলে। তবু নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্টতর করে নেওয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় কথাও কিছু বলবো।

'শিকার' কবিতাটি আখ্যানধর্মী, কিন্তু আখ্যান-অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। অরণ্যের একটি ভোরের দৃশ্যে কবিতার সূত্রপাত, যখন সূর্যোদয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে অথচ রাতের একটি তারাও জ্বলজ্বল করছে। সারা রাত দেশজ মানুষের শরীর উষ্ণ রাখবার জন্য আগুন জ্বেলে তাপ নিয়েছে আর সুন্দর বাদামী হরিণ চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে বনে। ভোরের আলোয় তার সাবধানতার অবসান হয়েছে ভেবে যে মুহূর্তে সে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছে সেই মুহূর্তেই বোঝা গিয়েছে চিতাবাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক কোন আততায়ী আত্মগোপন করেছিল এই অরণ্যেই। নাগরিক সেই শিকারীর আচমকা গুলিতে প্রাণ হারিয়ে হরিণ তাদের ভোজ্যে পরিণত হয়েছে।

'শিকার' কবিতাটি এক কথায় অসাধারণ, কিন্তু এর অসাধারণত্বের কারণগুলি যতোখানি অনুভবগম্য, ততোটা ব্যাখ্যেয় নয়। কবিতা বিচারের যে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক খুপরি আমরা বানিয়ে রেখেছি, আমাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, কবিতাটি তার চেয়ে মাপে অনেক বড়ো—কেটে ছেঁটে কোনও একটা খোপে তাকে ঢোকাবার চেষ্টা করতে পারি, এরকম চেষ্টা আগেও অনেক হয়েছে; কিন্তু তাতে কবি, কবিতা এবং কাব্যপাঠক কারো প্রতিই সুবিচার করা হবে না। আমরা বলতে পারি এটি একটি ইমেজিস্ট কবিতা, বস্তুত অনেকেই সে কথা বলেছেন। ফবিস্টদের কবিতায় যে চড়া রঙের ব্যবহার থাকে, এখানে তাও আছে। কেউ যদি ইম্প্রেশনিস্ট কবিতার আস্বাদ এখানে পেতে চান, নিঃসন্দেহে তাও তিনি পেয়ে যাবেন। একটি সংবেদনের মধ্যে একাধিক ইন্দ্রিয়-সংবেদনের অবস্থান, এক কথায় যাকে আমরা বলি সাইনেস্থিসিয়া, আর উদাহরণও এই কবিতায় নির্ভুলভাবে পাওয়া যাবে। এবং কাব্যআঙ্গিকের প্রাণ যে চিত্রকল্পের অনুপম ব্যবহার, এই কবিতা হতে পারে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একে ঠিক কোনও একরকমের কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করতে গেলে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই সমূহ।

সুতরাং সমস্ত তত্ত্ব কথা ছেড়ে বলা যাক, কবিতাটির প্রধান সৌন্দর্য দুভাবে বিচার্য-এক।। পরিবেশ চিত্রণে এর বর্ণবৈভব, দুই।। এর সংযমের ঐশ্বর্য। প্রথম ব্যাপারটিকে আমরা চিত্রকল্পের অনুরূপ কোন প্রক্রিয়া মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারে জীবনানন্দের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। দ্বিতীয় ব্যাপারটি কতো গুরুত্বপূর্ণ তা জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতার সঙ্গে এ কবিতার তুলনা করলেই বোঝা যাবে। একই রাগিণীর বিস্তৃত আলাপ যদি হয় 'ক্যাম্পে' কবিতা, তবে তার দ্রুত লয়ের কিছু তান বলা যায় 'শিকার' কবিতাকে। কবিতা যে 'সবচেয়ে ভালো শব্দগুলির সবচেয়ে ভালো সজ্জা, তারও সুনিশ্চিত দৃষ্টান্ত এই কবিতাতেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিকারের এক টান টান উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে সমগ্র কবিতায়। অবশ্য এই শিকারযজ্ঞে যে অরণ্যে বহিরাগত নাগরিক মানুষও আছে, সে কথা আমরা জেনেছি কবিতার একেবারে শেষ পর্বে—এমনকি শিকারের যে একটি আয়োজন আছে, হরিণীকে চিতাবাঘিনীর ভয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে, সে কথাও আমরা জানতে পারি কবিতার মধ্য পর্বে। এর আগে শুধুই প্রভাত ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে মায়াবী এক আরণ্য ভোরবেলার পটভূমি চিত্রণ।

কী অসাধারণ নৈপুণ্যে, এবং বর্ণসচেতনতায়, এবং অনুভূতির গাঢ়তায় এ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কবিতাটি বার কয়েক পড়লেই সে কথা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে। 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের বর্ণসচেতনতার নৈপুণ্য বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, লাল রঙের ব্যবহারে তাঁর বৈচিত্র্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখে। ঠিক সেই ব্যাপারটির দিকেই আমরা অঙ্গুলিসঙ্কেত করতে পারি, তবে অতিরিক্ত শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখতে বলবো যে, এই রক্তিম বর্ণবৈচিত্র্য কেবল ইন্দ্রিয়জ বর্ণবৈভব নয়, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হৃদয়ও সেখানে সদা সক্রিয় রয়েছে।

যে আগুন গভীর রাতে জ্বেলেছিল দোয়াশালী মানুষ, সে আগুন ছিল, 'মোরগফুলের মতো' লাল। অন্ধকারের পটভূমিকায় ওইরকমই লেগেছিল তাকে। কিন্তু ভোর বেলায় যখন আসন্ন সূর্যালোকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন অশ্বত্থপাতা পোড়ানো সেই আগুনই অনেক ফিকে মনে হয়। কবি বলেন তার রং এখন আর কুঙ্কুমের মতো নেই, তা এখন হয়েছে 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো'। কী বলা যাবে এ অলংকারকে তা নিয়ে পণ্ডিতেরা বর্ষব্যাপী বিতর্কে রত হতে পারেন, কিন্তু একমাত্র কবিই জানেন নিতান্ত রুগ্ন শালিখেরও হৃদয় থাকে, তার বিবর্ণ ইচ্ছাকে কবিই ছুঁতে পারেন এবং শুধু তিনিই জানেন, সেই ইচ্ছেরও একটা পাণ্ডুর রং থাকে।

শুধু লাল রং নয়, রঙের প্রায় শোভাযাত্রা এই কবিতায় আমরা দেখি—অথবা অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায়, উপমাচিত্রের মধ্যে। আকাশের রঙে এখন কবি খুঁজে পান ঘাসফড়িঙের দেহের নীল, চারদিকের পেয়ারা ও নোনা গাছে টিয়াপাখির পালকের সবুজ, অন্ধকার তাঁর হাতে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে 'মেহগনির' সঙ্গে তুলনায়, হরিণকে তিনি বলেন বাদামী, আকাশে জেগে থাকা একটি মাত্র তারাকে একবার বাসরঘরের সবচেয়ে গোধূলিমদির মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কবির মন পড়ে গিয়েছে তিনি হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন পদচারণায় ক্লান্ত মানুষ। তাই এবার আকাশের সেই তারাকে দেখে তার মনে পড়ে যায় 'মানুষীকে', মিশরদেশের মানুষী, তাঁরই মানুষী এবং নীল আকাশের মধ্যে একটিমাত্র তারাকে এবার, তাঁর মনে হয়, তাঁর নীল মদের গেলাসে রাখা মিশরের সেই মানুষের বুকের থেকে বার করা মুক্তো। সৃষ্টির নিয়ত শিকারে বিপন্ন কবির অন্তরে আসলে কী গভীর জীবনতৃষ্ণা, এ কথা যেমন বোঝা যাবে এই চিত্রকল্প থেকে, তেমনি এই অসহ্য রোমান্টিক পংক্তি আমাদের বুঝিয়ে দেবে রোমান্টিকতার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে কী সুতীব্র জীবনবাদ!

লাল রঙের ব্যবহারের আর একটি দৃষ্টান্তের কথা এখনও বলা হয়নি, ইচ্ছা করেই। বড় নির্মম সে পংক্তি, কবিতার একেবারে শেষ স্তবকে আছে। কবির ঈর্ষণীয় সংযমের ভালো দৃষ্টান্ত আছে এই শেষ স্তবকেই। পৃথিবীর একটি নির্মমতম ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই স্তবকে, যাকে সবিস্তারে লিখবার প্রলোভন সংবরণ করাই শক্ত। যে হরিণ, হরিণরা বরাবরই বোধহয় একচক্ষু হয়, বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচাটাকেই সবচেয়ে কঠিন মনে করে অন্ধকারের

মোড়কে নিজেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র জন্তু যে দিনের আলোয় অসঙ্কোচে দূর থেকে প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, তা বোধহয় তার জানা ছিল না। অরণ্যে কারোরই বোধহয় তা জানা থাকে না, সেই জন্যই শেষ স্তবকের প্রথম পংক্তি 'একটি অদ্ভুত শব্দ'। তারপরই বিক্ষত সেই পংক্তি—'নদীর জল মচকাফুলরে পাপড়ির মতো লাল।' আমরা যারা মচকা ফুল কখনো দেখিনি, তাদের চোখের সামনে এখন ফুলের পাপড়িতে ছিটকে লাগে হরিণের রক্ত। মৃত্যুর আয়োজনে একটুও সময় অপব্যয় না করে 'উষ্ণ লাল' হরিণের মাংসের ভোজে আমাদের উপস্থিত করেন কবি। ঘাতকদের পরিচয় তিনি দিয়েছেন কয়েকটা মাত্র বাক্যাংশে—'সিগারেটের ধোঁয়া/টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;/এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক'।

অব্যর্থ এবং অপরিহার্য শব্দ ব্যবহারের এমন নিপুণ দৃষ্টান্ত মহৎ কবিদের রচনাতেও খুব বেশি পাওয়া যায় না।

জীবনানন্দ যাঁদের আনন্দ দেন, জীবনানন্দ যাঁদের বিষণ্ণ করেন, এ কবিতা তাঁদের নতুন করে ভাবাবেই। কারণ জীবনানন্দে আমরা যে রমণীয় স্ববিরোধিতা দেখি—'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত' এ কথা বলার পরও যিনি বিশ্বাস করেন 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'—তাঁর সেই স্ববিরোধী সত্তার এক কাব্যিক সমীকরণ আমরা 'শিকার' কবিতাটিতে পাই, এটিই কবিতাটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৬.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩। 'শিকার' কবিতায় জীবনানন্দ কি বলতে চেয়েছেন?

৪। 'শিকার' কবিতাটি কোন পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল?

৫। রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের স্বাতন্ত্র্য কোথায় বুঝিয়ে দাও।

৬। 'জীবনানন্দ জীবনের কবি'।—আলোচনা করো।

৭। জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিফলিত কবির মৃত্যুচেতনার পরিচয় দাও।

৮। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবনানন্দের কবিতা 'চিত্ররূপময়।' তোমার পঠিত কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটির সারবত্তা নির্ণয় কর।

১০। 'বনলতা সেন'-কে প্রেমের কবিতা বলা সংগত কিনা বিচার করো।

১৩। ‘শিকার’ কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

১৪। ‘নগ্ননির্জন হাত অথবা তিমির হননের গান’ কবিতাটি সম্পর্কে একটি রসগ্রাহী আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।

১৫। জীবনানন্দের কবিতায় ভিড় করে এসেছে অনেক নারীর নাম, কিন্তু প্রকৃত বিচারে মনে হয় তাঁরা সকলেই একই নারী।—ব্যাখ্যা করো।

১৬। জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ কবিতায় বনলতা প্রেম, প্রকৃতি, না মৃত্যুর প্রতীক, ব্যাখ্যা করো।

১৭। জীবনানন্দের বহু কবিতায় মানবেতর প্রাণীদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। পঠিক কবিতা অবলম্বনে এই ভূমিকা পরিস্ফুট করো।

৬.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু।

২। জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।

৩। জীবনানন্দ দাশ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

৪। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৫। আমার কালের কয়েকজন কবি : জগদীশ ভট্টাচার্য।

৬। আমার জীবনানন্দ : হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু।

৮। কবিতায় অন্তরঙ্গ পাঠ : জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে : সুমিতা চক্রবর্তী।

৯। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় : অশ্রুকুমার সিকদার।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

জীবনানন্দ দাশ আটটি নির্বাচিত কবিতা

একক-১০

নগ্ন নির্জন হাত,

বিন্যাস ক্রম :

৬.৩.১০.১ : ভূমিকা

৬.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৩.১০.১ : নগ্ন নির্জন হাত : স্মৃতির মধু

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'নির্জন হাত' কবিতাটি পড়ার আগে দুটি উক্তি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সেগুলি আগে উদ্ধার করি :

১) 'The expressed aim of Surrealism was a revolution against all restraints on the free creeativity, including logical reason, standard morality, social and artistic conventions and norms, and all control over the artistic process by forethought and intention. To ensure the unhampered operation of the deep mind which they regarded as the only source of valid knowledge as well as art, surreatists turned to 'automatic writing' (writing delivered over to the prompting of the unconscious mind) and to exploiting the material of dreams, of states of mind between sleep and waking, and of natural or artificially induced hallucinations."—A Glossary of literary Terms : M.H. abrams.

[অর্থাৎ কিনা, সুররিয়ালিজম হ'ল স্বাধীন সৃষ্টিক্ষমতার ওপর সমস্ত রকমের বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-যুক্তিগ্রাহ্যতা, নৈতিকতা, সামাজিক ও শৈল্পিক রীতিনীতি, এমন কী শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারেও শিল্পীর পূর্ব পরিকল্পনা এবং অভিপ্রায়, সমস্ত বাদ। সঠিক জ্ঞান আর শিল্পকলার একমাত্র উৎস হচ্ছে এক গভীর মন, তার ক্রিয়ায় যাতে কোনোরকম বাধা না পড়ে সেজন্য সুররিয়ালিস্টরা পক্ষপাতী ছিলেন 'স্বতঃস্ফূর্ত রচনার', মানে সচেতন মন চিন্তাভাবনা না করেই যা লিখে যেতে পারে; সেই সঙ্গে তাঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছেন উপাদান, আর জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা, স্বাভাবিক বা শৈল্পিক অভ্যাস।]

২) "স্মৃতির মধু যাকে স্পর্শ করলে সেই রূপটি জলে স্থলে আকাশে অসীম রূপের সঙ্গে কালের অতীত জিনিষ হয়ে দুলতে থাকল। জগতের যে কেউ এবং যা কিছু মন বিঁধলে তারই স্মৃতি রইল মনে, স্মৃতি যখন রূপ

পেতে চলল, তখন মনোহর পথ ধরে প্রকাশ করতে চলল আপনাকে।'—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতি ও শক্তি/ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

প্রথম উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করার কারণ 'নগ্ন নির্জন হার্ত কবিতাটি যে শিল্পে ও সাহিত্যে সুররিয়ালিজম আন্দোলনের ফসল, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। সেই জন্যেই এই আন্দোলনের মূল কথাটি কী, তা আমাদের জেনে রাখা ভালো বলে আমাদের মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি উদ্ধারের কারণ, শৈল্পিক অনুভবে একজন প্রকৃত শিল্পী শিল্পসৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সাহায্যেই কবিতাটি সবচেয়ে ভালো ভাবে বোঝা যাবে মনে করেছি। আসল কথাটি আমরা কোনো বিশেষ তত্ত্বে, ভিতরে প্রবেশ না করেও বুঝে নিতে পারি।

কবিতা, বিশেষ করে আধুনিক কবিতাকে কোনো মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় অভ্যস্ত চোখে অনেক সময়ই দুর্বোধ্য মনে হয় এই জন্য যে, কবিতার ভাষা প্রতিদিনের আটপৌরে ভাষা নয়, তার একটা নিজস্ব ভাষা আছে— না, ভুল বললাম ভাষা আসলে নেই, কবিদের তা তৈরি করে নিতে হয়, সেই জন্যেই আমাদের প্রাত্যহিক ভাষার সঙ্গে তার এত অমিল। কবিরা অনুভূতিকে বেশি মূল্য দেন বলেই বাইরের যাবতীয় কৃত্রিম ব্যাপার—নৈতিকতা, সামাজিকতা, যুক্তি-অনুশাসিত জীবন তাঁদের সহ্য হয় না, তার খাঁচায় ঢুকে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এমন কী শিল্পসৃষ্টিরও যে-সব বাঁধা গৎ আছে তার মধ্যে তাঁরা বদ্ধ থাকতে চান না। একদিকে শিল্পীদের এই বন্ধনমুক্তির চেষ্টা, অন্যদিকে নিজস্ব চিন্তার জন্য এক নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নেবার আকুলতা-এটাই যখন একটা শৈল্পিক মতবাদে পরিণত হয় তাকে আমরা বলি সুররিয়ালিজম। জীবনানন্দ এই আন্দোলনের শরিক ছিলেন এমন কথা বলা শক্তে, কিন্তু তার কিছু কিছু কবিতায়, যেমন এই কবিতাতে তার আমেজ ফুটেছে আর ভাষার যে ব্যাপারটা আরো লক্ষনীয় ভাবে ফুটে উঠেছে সেটা বোঝবার জন্যই আমরা অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা তুলে ধরেছি—স্মৃতির মধু। বলতে পারি এক স্মৃতির কিংবা নির্যাস, শুধুই একটা বস্তুর প্রতীক। খুব স্থূল ভাবে যদি বলি, একটা বেত দেখে কড়া মাস্টার মশাইয়ের শাসনের ছবি ভেসে উঠতে পারে, যেখানে মাষ্টার মশাই নেই, তাঁর অস্তিত্বের নির্যাসটুকু আছে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুশোক' অংশে বলেছেন ছোট বেলায় মাকে হারানোটা অত ভালো বোঝেন নি, বুঝেছেন বড়ো হয়ে। বলেছেন, চাদরের প্রান্তে যে বেলফুলের অনতিস্ফুট কুঁড়িগুলি থাকতো, সেই চিকুণ কুঁড়িগুলির ওপর হাত বুলিয়ে তিনি মায়ের হাতের স্পর্শ পেতেন। এখানেও মানুষটা নেই, আছে তাঁর নির্যাস, স্মৃতির মধু। এই কথাগুলো বুঝতে পারলেই বুঝতে হবে আমরা 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতা পড়বার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছি, কারণ কবি এখানে কোনো মানুষের কথা বলেন নি, শুধু স্মৃতির মধুগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে অসাধারণ ব্যঞ্জনায়—সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্যতা, নৈতিকতা, সামাজিক ও শৈল্পিক প্রথাবদ্ধতার ধার না ধেরেই।

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটি 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি যে শিল্পে ও সাহিত্যে সুররিয়ালিজম আন্দোলনের ফসল এমন কতা কেউ কেউ বলেন। একদিকে শিল্পীদের বন্ধনমুক্তির চেষ্টা, অন্যদিকে নিজস্ব চিন্তার জন্য এক নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নেবার আকুলতা—এটাই যখন একটা শৈল্পিক মতবাদে পরিণত হয় তাকে আমরা বলি সুররিয়ালিজম। কবি এখানে মানুষের কথা বলেননি, শুধু স্মৃতির মধুগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে অসাধারণ ব্যঞ্জনায়-সমস্ত যুক্তি গ্রাহ্যতা, নৈতিকতা, সামাজিক ও শৈল্পিক প্রথা বদ্ধতার ধার না ধরেই।

তবে উপলক্ষ তো একটা থাকেই, এবং থাকে সেই বাস্তব যা কবিতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সুরভি ছড়াতে থাকে। কবি যে তাঁর বাস্তব প্রেমকে সমগ্র দেশে কালে পরিব্যাপ্ত করার ক্ষমতা রাখতেন যে আমরা জানি, কিন্তু বাস্তবের

সেই ভূমিকা কী। এটা জানবার জন্য আবার শরণাপন্ন হতে হবে তাঁর 'কারুবাসনা' উপন্যাসে। একটু মনে করি 'চারিদিকে ছায়া জমে গেছে; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের অন্ধকার।...কিশোর বেলায় যে কালো মেয়েটিকে ভালো বেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙ্গিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—আজ সেই যেন পূর্ণযৌবনে উত্তর আকাশে দিগঙ্গ না সেজে এসেছে।...মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুধারা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দুখানা হাত, ম্লান, ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লির দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।'

কবিতায় প্রথমেই সেই প্রেক্ষিত যা 'কারুবাসনায়' আমরা পেয়েছি। আগেই বলা হয়েছে অন্ধকার কবির কাছে বঙ্গভাবে প্রতীকায়িত, এখানে তা কবির মনে এই অন্ধকার অনেক দেখা ও না-দেখা ধারণার বাস্তবায়িত ছবি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, তাই এই অন্ধকারের বিশেষণ 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরা।' এখনকার অবস্থাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও বলতে পারি আমরা—

'আজ যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ যা তারি ভিড়।'

খুব কাছ থেকে ক্রমশ দূরে যাচ্ছেন কবি, আর এই ভাবেই সৌন্দর্য, মাদক অনুভূতি এবং প্রেম চেতনা ছেড়ে অচেতন, সীমা ছেড়ে অসীমের ব্যঞ্জনার দিকে চলে যাচ্ছে। 'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে'—কবি নিশ্চিতভাবেই জানেন যে বেসেছে এবং আমরাও অনেকটা নির্দিষ্টভাবেই জানি সেই 'কালো মেয়েটি'-র কথাই বলা হয়েছে। (বনলতা নামটা উল্লেখ করলেই বা ক্ষতি কী)। কবি তার মুখ দেখেননি, মানে তেমন করে দেখেন নি যাকে তিনি বলেন 'ছুঁয়ে ছেনে' দেখার কথা। অন্ধকার ও সেই নারী এক হয় কী করে! আমরা যারা কবিতা পড়ি তারা জানি এমনটা হতে পারে, নইলে রবীন্দ্রনাথের গানে 'তুমি যে চেয়ে আছো আকাশ ভরে'—, এটা হয় কেমন করে।

এখান থেকেই কবির মনে হয় 'বিলুপ্ত নগরীর কথা।' কেন? কারণ এই যে সুপ্ত প্রেম সেও তো এক বিশাল নগরী যে নগরে প্রেমের প্রাসাদ ছিল একটা! এইবার শুধুই ধারণার মূর্তিময় প্রকাশ, শুধুই ব্যঞ্জনা, শুধুই পৃথিবীর যত কিছু মূল্যবান সামগ্রী—এই মূল্যবান প্রেমের মতোই যারা হারিয়ে গিয়ে শুধু ধারণার রয়ে গিয়েছে। কী নেই সেখানে :

'মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা, প্রবাল,
শুধু কি তাই, তার চেয়ে আরো মূল্যবান :
'আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী'—

কোথায় পাবো তারে, কোথায় পাওয়া যায় সেসব! কবি রবিনসন ক্রুশো নন, অতো নিখুঁত করে জানবার কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি শুধু জানেন তারা আছে—

'ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে'।

ভূমধ্যসাগর কিম্বা টায়ার সিন্ধুর পার থেকে কবি চলে যান প্রকৃতির মূল্যবান মুক্তাঙ্গনে, যে প্রকৃতি তাঁকে তাঁর প্রেমের অনুষঙ্গ দেয়। তাঁর মনে পড়ে অনেক কমলা রঙের ঝকমকে রোদের কথা, মনে পড়ে কাকাতুয়া পায়রার কথা, মনে পড়ে মেহগনি গাছের ছায়াঘন পল্লবের কথা। কিন্তু সমস্ত স্মৃতি-গন্ধবহ প্রকৃতির বর্ণনা একটিই উদ্দেশ্যে—'আর তুমি ছিল;/তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না।'

কবি যা বলতে চান তা যেন আমরা এইবার বুঝি। পৃথিবীর যত অভিজাত অনুষঙ্গ, তাঁর জীবনের নারীও সেই আভিজাত্যের মূল্যেই মূল্যবান, এবং সবচেয়ে মূল্যবান। কী সেই অভিজাত ও মাদকতাময় ব্যাপারগুলি! এই রকম?

'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস'—

এইবার যে তিনটি ব্যঞ্জনার স্ফটিক খণ্ড কবি আমাদের উপহার দেন সেগুলি যথাক্রমে সৌন্দর্য, মাদকতা এবং প্রেমের প্রতীক—

'পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;'

শেষ পংক্তিতে ঝলসে উঠেছে প্রেমই, কিন্তু রক্তাভ রৌদ্র আর তরমুজ মদের সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়ে তাতে যে মাদকতাময় কামনার লাস্য ফুটেছে, কবি কিছু ব্যবধানে তা আরো একবার ব্যবহার করায় নিঃসঙ্গ এই পংক্তিটি পবিত্র প্রেমের ব্যঞ্জনার স্বাদ হয়ে উঠেছে।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩ জীবনানন্দ দাশের নির্বাচিত কবিতা

একক - ১০ - গোধূলি সন্ধির নৃত্য

বিন্যাসক্রম

২০৫.৩.১০.১ : ভূমিকা

২০৫.৩.১০.২ : মূলপাঠ

২০৫.৩.১০.৩ : নামকরণ

২০৫.৩.১০.৪ : রাজনৈতিক কবিতা

২০৫.৩.১০.৫ : কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখা

২০৫.৩.১০.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.৩.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.৩.১০.১ : ভূমিকা

'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ইংরেজি ১৯৩৮ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটি ১৯৩৭ খ্রি: লেখা হয়েছিল। সেইসময় জাপান-চীন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শক্তিশালী দেশ জাপান, সাংহাইতে এসে বাধা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে সাংহাইয়ের পতন ঘটেছিল। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটিতে সাতটি স্তবক রয়েছে। মোট পংক্তির সংখ্যা ৩২টি।

২০৫.৩.১০.১ : মূলপাঠ

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে পড়ে আছে—শব্দহীন ভাঙা
সেইখানে উঁচু উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল-রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায় - জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর সফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া - নিস্তব্ধতা -
বাদামি পাতার ঘ্রাণ-মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো;
পুরুষ তাদের; কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে; নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী,—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই; —এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে-বরুণে

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে - জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব; —বিনুনিতে নরকের নির্বাচন মেঘ
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক - কর্কট -তুলা - মীন।

২০৫.৩.১০.৩ : নামকরণ

জীবনানন্দ দাশ ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতার মধ্যে বলতে চেয়েছেন দিন চলে যাচ্ছে, রাত ঘনিয়ে আসছে। গোধূলি শব্দের অর্থ সূর্যাস্তকাল। হালকা ধূসর আকাশ আর তার নীচে নীল সন্ধ্যা। আমরা সকলেই জানি সন্ধি বাংলা ব্যাকরণে শব্দ গঠনের একটি মাধ্যম। এর অর্থ মিলন। আর নৃত্য শব্দটি সাধারণত শারীরিক নড়াচড়ার প্রকাশভঙ্গীকে বোঝায়। এর প্রকাশভঙ্গী পারিবারিক -সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণত মনোরঞ্জনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সমগ্র কবিতাটির মধ্যে একটি অন্য অর্থ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে, মর্মভেদী আলোচনার দিক থেকে ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতাটির মধ্যে দুর্বোধ্যতা লক্ষ্যণীয় বিষয়। ভালোবাসাহীন ও বিবেকহীন সভ্যতার সংকট কবিতাটির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সভ্যতা বলতে পৃথিবীর যে রক্তাক্ত সাম্রাজ্যবাদ, দুর্বল মানুষের শোষণ এবং তাদের অত্যাচার করে নিজেদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আর এক শ্রেণীর মানুষের দ্বন্দ্ব লক্ষ্যনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। এক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ অন্যধর্মে বিশ্বাসী মানুষের উপর শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে। এক দেশ, আর এক দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। পৃথিবীর যুদ্ধোন্মাদনা, ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হত্যা প্রভৃতির সংকটময় দিক জীবনানন্দ দাশ কবিতাটির মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন’। ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতার মধ্যে ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় জাপান-চীন যুদ্ধের কথা উঠে এসেছে। আমরা সকলেই জানি নাংকিঙে জাপানের অত্যাচারের বীভৎসতার কথা সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। চীনের সাংহাই শহরের আর্থ-সামাজিক সংকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সাংহাই একটি বিশ্বমানের শহর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সংস্কৃতি, প্রযুক্তির ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল জাপানের আক্রমণের ফলে। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—‘বিনষ্ট হতেছে সাংহাই”। জীবনানন্দ দাশ বরিশালে থেকেও পৃথিবীর ভয়াবহ চেহারা অনুভব করতে পেরেছেন। যেদিন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশ স্থাপনের খেলায় মেতেছে, সেদিন থেকে ছলে বলে কৌশলে কিভাবে বেশী সম্পদ আত্মসাৎ করা যায়। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি শক্তিবান শ্রেণী শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে, তাদের ধন-সম্পদ লুঠ করেছে। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ এই খেলায় জনগন মেতে উঠেছে। মুল্লুক অর্থ দেশ, রাজ্য ইত্যাদি বোঝায়। জোর যার মুল্লুক তার, কথাটি বলতে যার বেশি শক্তি বা ক্ষমতা রয়েছে দেশের বা অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা তার হাতেই রয়েছে। সেই দিক থেকে

‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতা সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—“গোধূলিসন্ধি বলতে সভ্যতার সন্ধিক্ষণ, মহাযুদ্ধে কেঁপে উঠছে যে সভ্যতা, যেখানে রাত্রি আসন্ন বিষয় হিসেবে এই কথাগুলো শুনতে বড়ো, কিন্তু কবিতায় এ বিষয় ব্যবহৃত বহু ব্যবহৃত, অনেকটা মূল্যহীন ও-সব চিন্তা কবির ছেলেমানুষি, এ কবিতায় নৃত্যই প্রধান। এই কবিতার নাম হওয়া উচিত ছিল শুধু ‘নৃত্য’। কারণ, বিষয় হিসেবে তিনি যুদ্ধ এবং সভ্যতার সংকট বেছে নিলেও, তাতে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন, কবিতায় ঠিক মানাতে পারেননি, সেইজন্য গোধূলির উল্লেখমাত্র করে মুহূর্তে চলে গেছেন জ্যোৎস্নায়। জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচ যে তাঁর প্রিয় বিষয়। সম্পূর্ণ নাচের উৎসবটাই হচ্ছে জ্যোৎস্নায়, গোধূলিসন্ধি অনেক পিছনে পড়ে রইলো, যুদ্ধের পর পৃথিবী সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায়নি।” (পৃ. ১০১)

নরেশ গুহ বলেছেন এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা। —“ইতিহাসের ‘ক্রূর পথ’ এই নিস্তেজ, নিরুদ্বেগ, নিচু পৃথিবীর মাঠ থেকে রণরক্তময় চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাস-বরুণকে অতিক্রম করে অন্য এক হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায় এদের নিয়ে যাবে যেখানে নিরাময় লভ্য এবং যেখানে তুলোর বালিশে মাথা রেখে মানবীয় ঘুমের চাইতে প্রগাঢ়তর চুম্বন কাম্য। কবিতার শেষ তিন পঙক্তিতে সেই ভাবীকালের স্বপ্ন। যূথচারী ঈশ্বরীদের পায়ের তলায় সেদিন হঙকঙের তৃণ থাকবে না, থাকবে সৃষ্টির রাশিচক্র।” অরুণকুমার সরকার ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতা সম্পর্কে বলেছেন—“এই কবিতায় যে-ছবিগুলি আসছে যাচ্ছে, তালগোল পাকিয়ে মিশে যাচ্ছে, প্যাঁচাই তার একমাত্র নীরব দর্শক। তার দৃষ্টি মোহমুক্ত। সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর ডিবের মতো চাঁদ—দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—“তার চোখের সামনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছে। সোনার বল আর রুপোর ডিবের উপমাটা তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই গতানুগতিক এবং কিছুটা বা শ্লেষাত্মক। এই কবিতায় উপস্থাপিত ছবিগুলি যে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ম্লান জ্যোৎস্নাই তার একমাত্র কারণ নয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালের ঘটনা এখানে এসে মিলিত হয়েছে বলেও বটে।” (পৃ. ১০৫)

<u>২০৫.৩.১০.৪ : রাজনৈতিক কবিতা</u>

‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি একটি রাজনৈতিক কবিতা। যে কবিতার মূল বিষয়বস্তু হলো রাজনীতি বা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সংঘাত বা প্রতিবাদ তাকে রাজনীতি

বিষয়ক কবিতা বলা হয়। জীবনানন্দ দাশের 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতায় ১৯৩৭ খ্রি: দ্বিতীয় জাপান-চীন যুদ্ধের আক্রমণের কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে। দুই পক্ষের সংঘাত বা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জনজীবন ব্যাহত হয়েছিল। দুইদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধের পরিণতিতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরপরেই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বহুবিধ সমস্যায় সাধারণ মানুষ জর্জরিত হয়ে উঠেছে। আমরা সকলেই জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ত। জীবনানন্দ বাংলাদেশের বরিশালে থেকেও রাজনৈতিক সংকটের ভয়াবহ চেহারা আঁচ করতে পেরেছিলেন। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতায় কবি বলেছেন—"বিনষ্ট হতেছে সাংহাই"। আসলে এই গোধূলি বরিশালের আকাশের গোধূলি নয়, কলকাতার আকাশের গোধূলিও নয়। তাই যদি হতো, তবে কবিতার মধ্যে 'সাংহাই' এর কথা কবি উল্লেখ করতেন না। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতায় রাজনীতির কথা থাকলেও মানুষ যে মানুষের বিপদে হাত বাড়িয়ে দিতে চায়, মানুষের পাশে থাকতে চায় এটা কবি সত্য বলে জানেন। "ফলত গোধূলিসন্ধির নৃত্য" ভিন্নতর কারণেই পাঠককে আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ সম্ভবত এই কবিতার প্রবহমান কালচেতনা। এখানে শুনতে পাচ্ছি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অবিরাম পাতা ঝড়ে পড়ার শব্দ; দেখতে পাচ্ছি জ্যোৎস্নার আলো আঁধারে শব্দহীন ভাঙা দরদালানের ভিড়, শত শত সাম্রাজ্যের কীর্তিসৌধ ও মিনার-প্রাসাদের, ধ্বংসাবশেষ; অনুভব করছি গোপন জল ম্লান হয়ে আবার কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

২০৫.৩.১০.৫ : কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

"দরদালানের ভিড়-পৃথিবীর শেষে
যেইখানে পড়ে আছে-শব্দহীন-ভাঙা।"

দরদালান বলতে আমরা সকলেই বুঝি ছাদওয়ালা প্রশস্ত বারান্দা। ঘরের লাগোয়া বড়ো বারান্দা বা বাইরের দালান।

আমাদের মনে একটা প্রশ্ন সব সময় ঘোরাফেরা করে, তা হল পৃথিবীর শেষ প্রান্ত কোথায়? একজন মানুষের পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে। আসল কথা হলো মানুষের পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পৌঁছানো খুব সহজ কাজ নয়।

হরিতকী একটি ভেষজ গাছ। এটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে বেশি করে হরিতকী গাছ পাওয়া যায়। আমরা সকলেই জানি হরিতকী ফল বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

রূপসী বাংলার কবিকে আমরা চিনি, মাটির প্রতি, বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রতি কবির টান কত খাঁটি সে বিষয়ে। হেমন্ত ঋতুতে কুয়াশা দেখা গেছে, কুয়াশার ফলে চারদিক ঝাপসা হয়ে উঠেছে। শরৎ কাল শেষ হতেই হেমন্তর আগমন লক্ষ্য করা গেছে। খুবই অল্প সময়ের জন্য প্রকৃতিতে হেমন্ত ঋতুর আগমন হয়েছে কেননা হেমন্ত বিদায় নেবার পরেই শীত দরজায় কড়া নেড়েছে। কবি বলতে চেয়েছেন হেমন্তের সকালে শিশির ভেজা প্রকৃতিজগৎ নূতন সূর্যকে স্বাগত জানিয়েছে। আর বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের গোল রাঙা সূর্যকে বিদায় জানিয়েছে বিকেলের শিশির। একই দিনের একই সূর্যের দুই প্রান্তের রূপ কবির কাছে ধরা দিয়েছে দুই রকমভাবে। হেমন্তের বিকেলে আমন ধানের মাঠে রঙিন আভা ছড়িয়ে দিয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ হেমন্ত ঋতুকে ভালোবাসেন। ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতায় হেমন্ত প্রকৃতি ও কবির আত্মমগ্নতা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কবি বলেছেন—

“সেইখানে উঁচু উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল-রাঙা-
চুপে-চুপে ডুবে যায়-জ্যোৎস্নায়
পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।”

বৈচিত্র্যময় এক রূপের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ছয় ঋতুর প্রকৃতির খেলা চোখে না দেখলে বোঝানো খুব মুশকিল। বারেবারেই প্রকৃতি তার নানারূপের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রকৃতির রঙ নানা ঋতুতে নানা রঙের। হেমন্তের আবির্ভাবে গ্রাম-বাংলার মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। কৃষিজীবি মানুষের মুখে স্বপ্নজয়ের রাঙাহাসি লক্ষ্য করা গেছে। মাঠ ভরা সোনালি ফসল ভরে উঠেছে। জীবানন্দ দাশ প্রকৃতি রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা করেছেন নিপুণ তুলির সাহায্যে। কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে অসাধারণ এক

উপমা চিত্র সৃষ্টি করেছেন। ‘সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।’ সন্ধ্যায় চাঁদের আলো থাকলে দূরের মাঠ ঘাট যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি সুন্দর লাগে গ্রামের বাড়িতে ঘাসের উঠোনে চাঁদের আলোর প্রতিফলন। উঠোনের ঘাস আলোয় চকচক করেছে। সন্ধ্যার আকাশ যখন রাঙা হয়েছে অন্ধকারের দু-একটা তুলির পোঁচ পড়েছে আকাশের গায়, তখন ‘পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা চেয়ে দেখে।’ প্রকৃতির এই দৃশ্য কত সুন্দর লাগে কবি সেটা লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা না থাকলে এই দৃশ্য অনুভব করা যায় না।

“হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর সফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া - নিস্তব্ধতা -
বাদামি পাতার ঘ্রাণ-মধুকূপী ঘাস।”

হরীতকী শাখার নিচে একটি মূল্যবান রত্নের স্ফুলিঙ্গের মতো চৈতন্য উদ্‌ভাসিত মুহূর্ত দেখা গেছে। যেটি কিনা স্ফটিকের মতো সাদা জলের উল্লাস অর্থাৎ বর্তমানকালকে গণ্য করা হয়েছে। নৃমুণ্ডের আবছায়া নিস্তব্ধতা, বাদামী পাতার ঘ্রাণকে অতীতকাল বলে মনে হয়েছে। সেইসঙ্গে কবি মধুকূপী ঘাস অর্থে ভবিষ্যৎকালকেও পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন।

“মানুষের সমস্ত উদ্যম, উত্তেজনা এবং উৎসাহের পিছনে এক বা একাধিক নারীরূপী সৃষ্টিক্রিয়া কাজ করছে। সৃষ্টিধর্ম অদৃষ্টকে স্বীকার করে না, অবধারিতকে পায়ের নিচে রেখে দেয়, নিত্য-নব নরকের, অর্থাৎ নবতম যন্ত্রণাকে ভূমিষ্ঠ করে এবং অবশেষে মানুষকে ক্রুর পথে উলঙ্গ সত্যের সামনে টেনে নিয়ে যায়। তখন সেই গোধূলিসন্ধির হীরকোজ্জ্বল মুহূর্তে মানুষের চৈতন্য জেগে ওঠে, বালিশে মাথা রেখে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না, চেয়ে দ্যাখে দরদালানের ধ্বংসস্তুপ, শেষ নিয়তি-নির্দিষ্ট তার যে পরিণতি।” (পৃ. ১০৫)

জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতায় ঘুরে ফিরে নরকের কথা এসেছে। কবি তাঁর ডায়েরিতে নানা প্রসঙ্গে দান্তের ইনফের্ণো বা নরক যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন। সর্বত্রই হাহাকার, অবক্ষয় লক্ষ্য করা গেছে। যাদের সামান্য হলেও আজও আস্থা আছে মানুষের প্রতি, মানবতার প্রতি; তাদের হৃদয় আজ হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছে।

"কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো;
পুরুষ তাদের; কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে; নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।"

জীবনানন্দ দাশ খোঁপার চুলের মধ্যে যে নরকের নবজাত মেঘ দেখতে পেয়েছেন। সেটির সঙ্গে দান্তের নারীমূর্তির 'hellish furies' এর তুলনা করা যেতে পারে। কবিতাটিতে কয়েকটি নারীদের কথা কবি বলেছেন, যারা ঈশ্বরীর মতো। তারা কল্যাণকারী, সমাজের, পরিবারের মঙ্গলদাত্রী। এই নারীদের মাথার চুল আলুলায়িত নয়। তাদের খোঁপা বাঁধাকে সহজ-সরল না ভেবে জটিল চিন্তার পরিচায়ক ভাবা হয়েছে। এমনকী তাদের চুলের বিনুনির মধ্যেই কল্পনা করা হয়েছে 'নরকের নবজাত মেঘ'।

"মেঘ মানে সম্ভাবনা, নবজাত, তাই এখনো তার কথা ফোটেনি। প্রশ্ন উঠতে পারে নরককে টেনে আনা হল কেন? মানুষের যে-কোনো উদ্যম, মহাকালের চোখে, শেষ পর্যন্ত অনর্থকারী, নবতর যন্ত্রণারই জনক। তাই কি? যাই হোক, এই নারীদের পায়ের নিচে একবার দেখতে পাচ্ছি তৃণদের, অর্থাৎ নতুন সৃষ্টি এবং আগামীকালের সম্ভাবনাকে, অন্যবার দেখতে পাচ্ছি বৃশ্চিক, কর্কট, তুলা, মীন ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় রাশিচক্রকে। এর মানে হল এই নারীরা ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ অথবা অদৃষ্টকে পদদলিত করছে।" (পৃ. ১০৫)

"সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।"

হঙকঙ তাহলে একটি পোড়োবাড়ির মতো। ইংরেজরা দখল করেছে। সেটি ভাঙা, চারিদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কবির মনে হয়েছে হঙকঙ যেন জীর্ণ, বন্ধ্যা একটি উপনিবেশ। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, ১লা জুলাই, ১৯৯৭ খ্রি: হংকং চিনের ভূখণ্ডে ফিরে এলো। এশিয়ার বুকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের শান্তিপূর্ণ, রক্তপাতহীন যবনিকাপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যদি ৫০ বছর আগের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার উষালগ্নটির

খোঁজ করি, তাহলে দেখবো এরকমই সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। অহিংস, রক্তপাতহীন এই শব্দগুলো সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি হচ্ছে বৃহত্তম জয় যা সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই অর্জিত হয়েছে অহিংস পথ ধরে। কিন্তু ঘটনা হল, এই খণ্ডিত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের যে পরিমাণ মূল্য দিতে হয়েছে তা পৃথিবীর আর কোনও অহিংস বিপ্লবকে দিতে হয়নি। বিপুল প্রাণনাশ ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর এই ঘটনাটি অহিংস পথের চরম ছলনাভরা অতি কথাটির সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দলিল। সেইসময় অবিভক্ত দেশে এই নির্মম ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে হাজার হাজার পুরুষ-মহিলা-শিশুর মৃত্যু হয়েছে, আর ততোধিক বেশি সংখ্যক মানুষকে উৎখাত করা হয়েছে তাদের ভিটে-মাটি থেকে, ইতিহাস থেকে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান শহীদেরা নিশ্চয় এরকম এক অমর্যাদাকর পরিসমাপ্তির জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেননি।"

'সেখানে গোপন চোরা জল সূর্য নিভে গেলে অন্ধকার হয়, রাত গভীর হলে চাঁদের আলোয় দেখা দেয় ঝকঝকে হয়ে। সেখানে সারাক্ষণ নিঃশব্দে গাছের পাতা বড়ো হয়, বড়ো হয়ে, ঝরে পড়ে, আবার বড়ো হয়—সব ঢেকে ফেলে দেয়, পরিণত হয়ে যায় কোনো আদিম জঙ্গলে—সমস্ত প্রক্রিয়াটা 'উৎসরণ'—চলে নিঃশব্দে, গোপনে, টের পেতে না দিয়ে। তবু সেখানে পৌঁছোয় কামানের গর্জন, সভ্যতার স্থবির অপচেষ্টার ফল, সাংহাইরা নষ্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, টের পাওয়া যায়। একই সঙ্গে আদিম জঙ্গলের পাশেই সভ্যতার আধুনিক সমরোপকরণ ও লোভ বসিয়ে দিয়ে দুটোর মধ্যে যোগাযোগ দেখান জীবনানন্দ, বুঝিয়ে দেন এই আদিম জঙ্গলটি এখনো চাঁদের আলোয় ডাইনির নাচে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এবং জঙ্গলটি বিবর্ধমান।" (পৃ. ১০৯)

"সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী,—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।"

'বাসমতীর উপাখ্যান' ১৯৪৮ খ্রিঃ লেখা। ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট। কলকাতা ও বাসমতী বা বরিশাল যে দুটো ভিন্ন দেশের সীমানার

মধ্যে পড়ে তা জীবনানন্দ দাশ জানেন। বাস্তবে কবি তখন কলকাতার বাসিন্দা। আর হয়তো বরিশালে ফিরবেন না বা ফেরারও কোনো সম্ভাবনা নেই। উপন্যাসটিতে বরিশালের প্রতি সহমর্মিতার কথা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু ১৯৩০-১৯৩৫ খ্রি: সময় তিনি বরিশাল থেকে মুক্তির খোঁজে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছেন। বেশিরভাগ সময় বরিশালে কাটিয়েছেন। তখন তিনি আমাদের সুন্দর সুন্দর কবিতা উপহার দিয়েছেন। আবার কলকাতায় যখন ছিলেন, মানসিক অস্থিরতা, দাঙ্গা, দেশভাগে বিপর্যস্ত কবি, গদ্যের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। যাইহোক যূথ শব্দটি হাতিদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, নারীরা কী করে যূথচারী হবে? আসলে এক একটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো। তাদের পায়ের তলায় নরকের নবজাত মেঘ। কেন আর দেশ-বিদেশের পুরুষেরা যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে মেতে উঠবে না। তা খুব অল্প সময়েই বোঝা যায়। যখন দেখতে পাওয়া যায়—আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছ যন্ত্রণা?' আসলে পুরুষ মানুষটি নিজের ভোগবাসনার জন্য নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটিয়েছে। অর্থ উপার্জনের নেশায় না মেতে পতিতাপল্লীতে সেই নারীর আমন্ত্রণে হাজির হয়েছে। তার ফলে এদের খোঁপার ভিতরে চুলে নরকের মেঘ জন্ম নিয়েছিল। আর যেহেতু তারা নরকের, মেধাবিনী, ঈশ্বরীর মতো সেইজন্য "তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে স্বাদ নেই।"

"এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে-বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে-জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট-তুলা-মীন।"

"অনন্ত নক্ষত্র বীথি জুড়ে এই নৃত্য চলেছে, এই নৃত্যের হিল্লোলেই কেঁপে কেঁপে উঠেছে সৌরপরিবার। যে সব তারা ও নীহারিকায় মানুষের ভাগ্য জড়ানো, তারা সবাই এই চঞ্চল পায়ের ভঙ্গির নিচে কম্পমান। অন্তহীন মরণের নৃত্য চলেছে অবিশ্রাম।" (পৃ. ১১০)

'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতা প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—"ওদিকে কামানের গর্জনে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাংহাই, যাক, কয়েকটি নাচের পায়ের ভঙ্গির নিচে পড়ে আছে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ, পুরুষরা নিবিড় চুম্বনে সেই নারীদের বিছানায় টেনে নিয়ে গেলেও,

ঘুমে আর তৃপ্তি নেই। যেখানে পৃথিবী যুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে—সেখানেও ভেসে যাচ্ছে এই নাচের লহরী। বস্তুত এ-কথাই ঠিক, যুদ্ধে আর পৃথিবীর কিছুই ভাঙতে পারবে না, মানুষের নিজের মধ্যে ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে। কবিতার 'বিষয়' এই টুকুই, বাকি সব আবহাওয়া—অর্থাৎ বিষয় বাদ দিয়ে বাকি অংশই কবিতা।" (পৃ. ১০১)

২০৫.৩.১০.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটির সারাংশ আলোচনা করো।

২। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটির নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটিকে রাজনৈতিক কবিতা বলা যায় কি? আলোচনা করো।

৪। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটি সম্পর্কে একটি রসগ্রাহী আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।

২০৫.৩.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী

২। আমার কালের কয়েকজন কবি—জগদীশ ভট্টাচার্য

৩। জীবনানন্দ শ্রাবস্তীর কারুকার্য—ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

৪। জীবনানন্দ এবং—তপন গোস্বামী

পর্যায় গ্রন্থ - ৩ জীবনানন্দ দাশের নির্বাচিত কবিতা

একক - ১১ - রাত্রি

<u>বিন্যাসক্রম</u>

২০৫.৩.১১.১ : ভূমিকা

২০৫.৩.১১.২ : মূলপাঠ

২০৫.৩.১১.৩ : নামকরণ

২০৫.৩.১১.৪ : কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

২০৫.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.৩.১১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.৩.১১.১ : ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশের 'রাত্রি' কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবিতাটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। 'কবিতা' পত্রিকায় ও নিরুক্ত পত্রিকায় 'রাত্রি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'রাত্রি' কবিতাটিতে মোট আটটি স্তবক রয়েছে এবং কবিতাটির মোট পংক্তির সংখ্যা হল ৩২টি।

২০৫.৩.১১.২ : মূলপাঠ

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয়ে জল,
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে

দাঁড়ালাম বেন্টিক্ স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে;
চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রয়ী কবে;
রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব-অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

২০৫.৩.১১.৩ : নামকরণ

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করে আমরা জানতে পারি তিনি আধুনিক জীবনের নানাবিধ সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক’ প্রকাশিত হয় ১৯২৫-২৭ সালে। জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসর পান্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২), ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪), ‘সাতটি তারার তিমির’ (১৯৪৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫৪ খ্রি: জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ হলো—‘রূপসীবাংলা’ (১৯৫৭) এবং ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৯৬১)। জীবনানন্দ দাশের ‘ঝরাপালক’, ‘বনলতা সেন’ কাব্যগুলি কবির নির্জনতম পর্যবেক্ষণ মাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাশের কবি কল্পনার প্রকৃতি থেকে প্রেমে রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’ প্রভৃতি কাব্যগুলিতে নানাবিধ জটিলতায় আক্রান্ত মানসিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯), মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি জীবনসমস্যা জীবনানন্দ দাশের কাব্যগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রতিকূল পরিবেশে, শত হতাশার মধ্যে কবি বহুবিধ সমস্যাকে অনুভব করতে পেরেছেন। জীবনানন্দ দাশের ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘রাত্রি’ কবিতার নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কবি অন্ধকারময় পরিবেশে, নানাবিধ প্রতিকূলতার কথা বলতে চেয়েছেন। রাত্রির আগমনে পরিবেশ-পরিস্থিতি নিস্তব্ধ। দিনের অবসানে সমাজ পরিবেশে সন্ধ্যা নেমে আসে, তারপর বাংলার গ্রামে-শহরে নেমে আসে রাত্রি। আমরা সকলেই জানি, আমাদের বাড়ির মা-কাকিমারা সেইসময় তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দেন, বাড়ির সকলের মঙ্গলকামনার উদ্দেশ্যে। যারা বাড়িতে আছে বা বাড়ির বাইরে নানাবিধ কর্মে গেছে, তারা যাতে সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে বাড়ি ফিরতে পারে সেই আশাতে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ এই কবিতার মধ্যে এক দুঃস্বপ্নের রাত্রির কথা বর্ণনা করেছেন। অন্ধকারময় পরিবেশে, বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনসমস্যাকে কবি অনুভব করেছেন। ‘রাত্রি’ কবিতার মধ্যে কলকাতা নগরীর জীবনচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কলকাতা শহরে রাত্রির নির্জনতা ভঙ্গ করে মোটরগাড়ি, রিক্সা চলে যাওয়ার কথাও কবি বলেছেন। অপরদিকে সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে। কালোবাজারি, মজুতদারী

করে তারা বাজার থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছে। সেই উপার্জিত অর্থ তারা নিজেদের কামনা-বাসনার জন্য ব্যয় করেছে। সেই সকল মানুষ রাত্রে ইহুদী রমনীর গান শুনেছে। জীবনানন্দ দাশ অন্ধকারময় পরিবেশ দেখে বলতে চেয়েছেন, সংকটময় পরিবেশে কলকাতার ব্যস্ততম শহরে মানবিকতার কোনো জায়গা নেই। সংকটময় পরিস্থিতিতে রাত্রির অন্ধকারে মানুষ, নিজের মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মানবিকতাকে পিছনে ফেলে সেইসকল সুবিধাভোগী মানুষ জান্তব প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। সমাজ পরিবেশে কবি লক্ষ্য করেছেন—মানুষের বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত, অথচ সমাজের এক শ্রেণির মানুষ তা না করে সাধারণ মানুষকে দাঙ্গার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। অন্ধকারময় পরিবেশে জীবনে সর্বত্র হাহাকার নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে রয়েছে। সেইদিক থেকে 'রাত্রি' কবিতাটির নাম সার্থক বলে আমাদের মনে হয়।

২০৫.৩.১১.৪ : কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

জীবনানন্দ দাশ 'রাত্রি' কবিতার মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনসমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দাঙ্গা, মন্বন্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষের হাহাকারের চিত্র কবিতাটির লক্ষণীয় বিষয়। কবিতার প্রথম স্তবকে দেখা যায়—

> "হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয়ে জল,
> অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
> এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
> একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে।"

কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ খাবার না খেয়ে জল খেয়ে কোনোক্রমে বেঁচে রয়েছে। শহরের নানা জায়গার ফুটপাতে বা খোলা আকাশের নীচে কখনও বা রেলস্টেশনে এইসব কানা, খোঁড়া, কুষ্ঠরোগীর দল বসবাস করেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একমুঠো ভাতের জন্য তাদের হাহাকার খুবই বেদনাদায়ক। সেইসব সাধারণ মানুষের কোনোদিন খাবার জোটে, আবার কোনোদিন খাবার জোটে না। তখন পেটে খিদে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। দরিদ্র মানুষগুলি এখান-ওখান ঘোরার পর খাবার

না পেয়ে, ক্লান্ত হয়ে একপেট জল খেয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে কলকাতা নগরীর ব্যস্ততা রাত্রির অন্ধকারে অন্যমাত্রায় পেয়ে গেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন রাত্রির অন্ধকারময় পরিবেশে ভয়-ঘৃণা তখন পরস্পর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনে হাহাকারের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ দিশাহীন। 'রাত্রি' কবিতাটির মধ্যে কলকাতা নগরীর রাত্রির নির্জনতা ভেঙ্গে দিয়ে মোটরগাড়ি যাওয়ার দৃশ্যও কবি বর্ণনা করেছেন।

"অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।"

কবির মনে হয়েছে অন্ধকারময় পরিবেশে কতকিছু ঘটে যায়। আমরা তার খবর রাখি না। দেশভগের পরবর্তী সময়ে চারিদিকে অসহযোগিতা, অবক্ষয়, হাহাকারের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। সময়ের পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ-পরিবেশের হাহাকার তেমনি রয়ে গেছে। মানুষ কম সময়ে দ্রুত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে বলে রিক্‌শার পরিবর্তে মোটরকার ব্যবহার করেছে। একদিকে মানুষের হাহাকার, অপরদিকে প্রতিযোগিতা সর্বস্ব জীবন। এরফলে সংকটময় পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। চারিদিকে হতাশার মধ্যেও একটু আশার আলোর জন্য সাধারণ মানুষ আগামী দিনের জন্য প্রতীক্ষা করেছে। নিরন্ন অবস্থায় একমুঠো ভাতের জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম সাহিত্যের পাতায় যুগ যুগ ধরে লেখা থাকবে। কবি বলেছেন—

"আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিক্ স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে;
চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।"

'রাত্রি' কবিতাটির মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন জায়গার নাম রয়েছে। রাত্রির অন্ধকারময় পরিবেশে প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশার ছবি কবি অনুভব করেছেন। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কবিরও মনে হয়েছে প্রতিযোগিতা সর্বস্ব জীবন মানুষের মনের সবুজতা, কোমলতা নষ্ট

করে দিয়েছে। তারফলে কলকাতা কেন্দ্রিক নগর জীবনে অভ্যস্থ, নাগরিক জটিলতায় আক্রান্ত সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। কবি বাস্তবভাবে নিপুণ তুলির সাহায্যে মানুষের হাহাকারের চিত্রকে অঙ্কন করেছেন। জীবনানন্দ দাশের 'রাত্রি' কবিতায় দেখা যায়—

"মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।"

মাইলের পর মাইল হেঁটে কবি কলকাতার আধুনিক জীবনে অভ্যস্থ মানুষদের কামনা-বাসনার চিত্র লক্ষ্য করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে এবং স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা ব্যাহত হতে শুরু করেছিল কলকাতার জীবনের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের মানুষের। একদিকে গরীব-অসহায় মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছে, অপরদিকে সমাজের ধনী শ্রেণীর মানুষেরা বিলাস-বহুল জীবন অতিবাহিত করেছে। বাড়িতে রাত্রি না কাটিয়ে সেইসব শ্রেণীর মানুষ 'মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে'। কলকাতার নাগরিক জীবনের চারিদিকে সামাজিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা গেছে। সমাজ পরিবেশে অস্থিরতার মধ্যে অর্থের বিনিময়ে কামনা-বাসনার অন্ধকারময় দিক কবি লক্ষ্য করেছেন। অপরদিকে সেইসময়ের একেবারে মাটির কাছাকাছি থাকা জনজীবনের চিত্র কবি তুলে ধরেছেন 'রাত্রি' কবিতার পরবর্তী স্তবকে—

"টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্তিলা।"

সমাজজীবনে সর্বত্র সংকট থাকায় রাত্রির কলকাতার জীবন বর্ণনা কবির চোখে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। কবি এই প্রসঙ্গে হুণরাজ অ্যাটিলার কথা তুলে ধরেছেন। একালের হিটলাররা জান্তব শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। কবি ইতিহাসের সেই প্রাসঙ্গিক তথ্যকে সামনে নিয়ে এসেছেন।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকের জীবনে হাহাকার নেমে এসেছিল মহাজনদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণগ্রহণ করার জন্য। সেই পরিস্থিতিতে সমাজের সুবিধাবাদীরা ও চোরাকারবারিরা ইচ্ছেমতো নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিয়েছে। অপরদিকে দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর মানুষের সৃষ্টি করা সংকটের ফলে শহরের পরিবেশেও মানবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। মুনাফাখোর, মজুতদারীর দল প্রচুর ধনসম্পদ হাতিয়ে নিয়ে টাকার পাহাড়ে বসে রয়েছে। পঁচা টাকার গন্ধে সেইসকল মানুষের মনের কোমলতা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সমস্ত মানুষ কালো টাকার মালিক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মনে প্রেম-ভালোবাসার চিহ্ন মাত্র নেই। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ব্যাহত হয়েছে, আর তাদের জীবনে নেমে এসেছে অস্থিরতার পরিবেশ। সেইসময় নানাবিধ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শহরের মানুষ ও গ্রামের মানুষ। মানুষ সামাজিক জীব। অপরের সাহায্য ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের কল্যাণে ও উপকারের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নয়, বরঞ্চ সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই মানব জাতির সমাজ বন্ধনের মূল ভিত্তি। তাই মানুষে-মানুষে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হোক, কবি তা আশা করেন, কিন্তু সংকটময় পরিস্থিতিতে তা ব্যর্থতায় পর্যুদস্তু হয়েছে।

‘রাত্রি’ কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে কবি বলেছেন—

> “নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
> গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
> পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
> আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।”

অর্থের বিনিময়ে কামনা-বাসনার যে অন্ধকারময় দিক রয়েছে, কবি তা লক্ষ্য করেছেন। সমাজের সর্বত্র অভাব থাকার জন্য এক মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য ইহুদী রমনীরা এই কাজে নেমে পড়েছে। পেটের জ্বালা মানুষের বড় জ্বালা, তাই ক্ষুধা নিবারণের জন্য ইহুদী রমনীরা এই বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে অর্থের বিনিময়ে তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রেমিকা নারীও যে মনের সুখে গান ধরতে পারে তা কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি। অপরদিকে কবিতাটির মধ্যে সোনা, তেল, কাগজের কলের পাশে গান ও প্রেমকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংকটময়

পরিস্থিতিতে কলের কারখানার নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিষাক্ত বর্জ্য মিশ্রিত পরিবেশে ঐ সমস্ত মানুষ বসবাস করার ফলে তাদের নানারকম চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে হয়েছে। ভোগবাদীজীবনে ইহুদী নারীর গান শুনতে এসেছে যে পুরুষটি, তার অর্থের অভাব হয়তো নেই, কিন্তু নানারকম জটিল রোগে সে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকী অর্থের বিনিময়ে ইহুদী রমনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতেও পারে। বাড়িতে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারা বাড়ির বাইরে ইহুদী রমনীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কবি সামাজিক সংকট লক্ষ্য করে বলেছেন—

“ফিরিঙ্গি যুবক ক’টি চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।”

কবিতা পাঠে আমরা জানতে পেরেছি, ইহুদী রমনীরা ভালোবেসে গান গেয়েছেন। অর্থ উপার্জনের আশায় তারা মায়াবী সাজে সজ্জিত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে তাদের গান শুনতে শহরের নানা জায়গা থেকে ব্যবসায়ী ও ফিরিঙ্গি যুবকরা এসে হাজির হয়েছে। আমরা সকলেই জানি গান হল সুকুমার প্রবৃত্তি, যা মানুষকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তোলে। মানুষের মনে নতুন আলো, নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। কবি বলতে চেয়েছেন দাঙ্গা বিধ্বস্থ শহরে যে জীবন প্রবাহিত হচ্ছে, তার থেকে এই যুবকরা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে এরা মুক্তি পেতে চেয়েছে। নিগ্রোদের কিছুই নেই, কিন্তু মনে কামনা আছে। কঠিন পরিস্থিতিতে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ভালো করে, সোজা হয়ে তারা দাঁড়াতেও পারে না। সেইজন্য তারা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতায় দেখা যায়, ফিরিঙ্গি যুবকদের জীবন ধারণ পদ্ধতি দেখে নিগ্রো শ্রেণীর মানুষরা হেসেছে। কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি নিগ্রোরা সেই দিকে না গিয়ে জীবনের তাপ খুঁজে পেয়েছে ‘ব্রায়ার পাইপ’ এ। তারা সময় নষ্ট না করে জীবনের তাপ জীবনের নানা কাজের জন্যেই ব্যবহার করেছে। তবুও ইহুদী রমনীদের কাছে নিগ্রোরা হাজির হননি। বেশিরভাগ নিগ্রো শ্রেণীর মানুষ কোনো কাজ করে

না। তারা সবসময় ধূমপান করে জীবন অতিবাহিত করেছে। ধূমপানের আসক্তি থেকে নেশার ঘোরে ইহুদী রমনীদের হাতছানিকে তারা উপেক্ষা করেছে। আমরা সকলেই জানি গরিলা, বানর মানুষের পূর্বজ। গরিলাদের আচার-আচরণ মানুষের মতো। এরা স্তন্যপায়ী ও তৃণভোজী। এদের দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গলে। শিম্পাঞ্জীদের পরে এরাই মানুষের নিকটতম সমগোত্রীয় প্রাণী। 'রাত্রি' কবিতার সপ্তম স্তবকে কবি গরিলাদের প্রসঙ্গ টেনে, আদিম সভ্যতার সরলতার, সহজতার কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। আমরা সকলেই জানি অরণ্য জীবনের সরলতা, সবুজতা মানুষের মনকে নির্মল করে তোলে। অরণ্যের কোলে প্রাণের নিঃশ্বাস পেয়ে মানুষ সুন্দর ভাবে জীবন অতিবাহিত করেছে। জীবনানন্দ দাশ অনুভব করেছেন, কালের পরিবর্তনে, গতিশীল জীবনে, মানুষ যত সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, ততই মানুষের সভ্যতা হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। এমনকী মানুষের জীবনে বহুবিধ সংকট লক্ষ্য করা গেছে।

জীবনানন্দ দাশ 'রাত্রি' কবিতায় কলকাতার বিভিন্ন স্থান ঘুরে সেখানকার জীবন-ধারণ পদ্ধতিকে নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কলকাতার নাগরিক মানুষ রাত্রিতে সবাই সর্তক থেকেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। অস্থির পরিবেশে নানাবিধ জীবন যন্ত্রণার কথা কবি তুলে ধরেছেন। ফিয়ার লেন ছেড়ে বেন্টিক স্টিট গিয়েছেন, তারপর টেরিটিবাজারে গিয়ে কবি লক্ষ্য করেছেন—"এ যেন এক অচেনা দেশ।" দিনের আলোতে কলকাতার এই সমস্ত এলাকার জীবন-ধারণ পদ্ধতি একেবারে আলাদা। "এই কবিতায় বাঙালী পথিক ছাড়াও ইহুদী রমনী, ফিরিঙ্গি যুবক, লোল নিগ্রো-র উপস্থিতি শহরের 'কসমোপলিট্যান' চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রচনা করেছে। কিন্তু যে কবি 'পৃথিবীর পথে' অনায়াসে উধাও হতে চাইতেন একদা, দেখা গেল বিপরীত সময়ের ষড়যন্ত্রে তাঁর পরিক্রমা পথ কলকাতার প্রায় নিষিদ্ধ কিছু এলাকায় এসে সীমায়িত হয়েছে।" (পৃ. ১২২)

'রাত্রি' কবিতার শেষ স্তবকে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—

"নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব-অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।"

আমরা সকলেই জানি লিবিয়ার জঙ্গলে নিশ্চিত মৃত্যুকূপের দিকে স্বেচ্ছায় কেউ এগিয়ে যায় না। লিবিয়ার জঙ্গলের নানা বিপদ থাকায় যারা নিশ্চিত মৃত্যুকূপের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে, তারা জেনে শুনেই বিপদ ডেকে এনেছে। জীবনানন্দ দাশ 'রাত্রি' কবিতার মধ্যে মানুষের জীবনের প্রতিকূলতার, অস্থিরতার রূপটি তুলে ধরেছেন। প্রতিকূল পরিবেশে নানাবিধ সংকট থাকা সত্ত্বেও মানুষের হাহাকারময় জীবনে আশার আলোকবর্তিকা থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ আশা করে একদিন না একদিন তাদের সুদিন ফিরে আসবে। অর্থাৎ শত যন্ত্রণার মধ্যেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠে। মানুষ নিজের সুখের প্রয়োজনে সামাজিক সংকট ডেকে এনেছে ঠিকই কিন্তু কলকাতার নাগরিক জীবনে নানা রকম অসহায়তার মধ্যেও হাহাকারের মধ্যেও আশার আলো নিয়ে মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। সমাজ পরিবেশে শত সংকটের মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে বলে নগরীর মানুষেরা লজ্জাবোধ করে চলেছে। যে লজ্জাবোধের মধ্য দিয়ে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আশা আর স্বপ্নই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মানুষ সাবধানে বাঁচে, সচেতনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। তাই জীবনানন্দ দাশের অনুভবে 'রাত্রি' মহৎ রাত্রি বলে মনে হয়েছে, কলকাতা লিবিয়ার জঙ্গল হয়েও সম্পূর্ণভাবে মৃত্যুকূপের দিকে এগিয়ে যায়নি, আদিম হয়ে ওঠেনি। আমাদের সমাজে হাহাকারের মধ্যে মানুষ কাপড় পরিধান করেও পশুতে পরিণত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের বাসস্থান কলকাতার নগরে হলেও জঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'রাত্রি' কবিতার শেষ স্তবকে জীবনানন্দ দাশ বলতে চেয়েছেন, মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। মানুষের বিপদে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। জ্ঞানের আলোয় মানুষের বিবেক জাগ্রত হয় বলে মানুষ নিজেই কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, বুঝতে পারে। আবার সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে থাকে, তার সমস্ত পাশবিক সত্তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন মানুষের মন হয়ে ওঠে পবিত্র। কবি বলতে চেয়েছেন, জ্ঞানহীন মানুষ ভেতরের পশুশক্তির তাড়নায় নানা ধরনের খারাপ কাজ করে চলেছে। টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষেরও মনের হিংস্রতা বেড়ে গেছে। তার ফলে মানুষের মনের সবুজতা নষ্ট হয়ে গেছে। এ ধরনের মানুষদের পশু সুলভ আচরণে সমাজে জন্ম হয় হিংসা, মারামারি, দাঙ্গা, লোভ-লালসা, খুন-ধর্ষণসহ নানা অপরাধ। সেইজন্য সুবিধাভোগী মানুষকে কবি পরিধান

আবৃত পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর তার বাসস্থানকে তুলনা করেছেন অরণ্যের সঙ্গে। সর্বোপরি বলা যায় মানুষের মনের পশুশক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে সুন্দর মানসিকতা নিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

২০৫.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রাত্রি' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ কি বলতে চেয়েছেন? তা আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্রোত্তর কবি গোষ্ঠীর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের স্বাতন্ত্র্য কোথায় বুঝিয়ে দাও।

৩।' জীবনানন্দ জীবনের কবি'—মন্তব্যটি বিশদ করো।

২০৫.৩.১১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। জীবনানন্দ শ্রাবস্তীর কারুকার্য—ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

২। জীবনানন্দ এবং—তপন গোস্বামী

৩। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ—হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। কবির্মনীষী : কবির কলমে—ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

৫। কল্লোলের কাল—জীবেন্দ্র সিংহরায়

৬.৩.১১.২ : তিমির হননের গান : তবুও মানব থেকে যায়

'তিমির হননের গান' কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতা 'রচনার' উপলক্ষ্য জানলেই কবিতাটি আমাদের কাছে সুবোধ্য হয়ে আসবে।

কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫০ সালের পৌষ সংখ্যায়। তেরোশো পঞ্চাশ বাংলার বুকে এই দগদগে ক্ষতচিহ্ন, এই সময়েই ঘটেছিল বীভৎস সেই পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেই মন্বন্তরকে নিয়ে কবিতা, গল্প, নাটক অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রায় যেটা অসম্ভব ছিল—সেদিনের সেই নির্মম অপচয়ের আঁচ লুকিয়ে রেখে কিছু লেখা, লিখতে গিয়ে প্রচারধর্মী না হয়ে ওঠা অথচ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া— সেই কাজই সম্ভব করেছে জীবনানন্দের এই কবিতা। আমায় বলেছিলেন তিনি নির্বিশেষ কালচেতনা ও ভৌগোলিক চেতনার কবি-নিজেকে যিনি সর্বকালের ও সর্বভূমির বলে মনে করতে পারেন, তিনি কেমন করে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা লিখতে নিজেকে রাজি করালেন, কেমন করে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিলেন, সেটাই বিস্ময়।

> *'তিমির হননের গান' কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তেরোশো পঞ্চাশ বাংলার বুকের দগদগে ক্ষতচিহ্ন জীবনানন্দের এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। মন্বন্তরে কত মানুষের জীবন গিয়েছিল, কত মানুষ, মানুষের সেই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদরা, সমাজতাত্ত্বিকেরা তার হিসাব করেছেন। আজ ভালোবাসাহীন জীবনে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। সমস্ত জীবনজুড়ে এখন কৃত্রিম প্রবঞ্চনা, নিজেকেই ঠকাবার আয়োজন।*

ব্যপ্তি এই কবিতারও অবশ্য স্বভাবধর্ম। কবি শুরু করেছেন একেবারে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব থেকে—

'কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের মনে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকট
আমাদের জীবনের আলোড়ন'।

সেই এককোষী জীব অ্যামিবার মধ্যে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল জলে, শতাব্দীর সূর্য সাক্ষী ছিল তার। তারপর প্রাণের বিবর্তন ঘটে চলল। 'স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে' জীবনকে ভালোবেসেই প্রাণীর জীবনের বিবর্তন ঘটেছে—জল থেকে স্থলে, উদ্ভিদ থেকে জীবে, এককোষী থেকে বহুকোষী জীবে, পতঙ্গ থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি। এই ভাবে বিবর্তনের পথে আজ আমরা এসেছি শেষ পর্বে—হোমো

স্যাপিয়েন্স। কিন্তু গুহাবাসী মানুষ যখন সভ্য হল, মারণ অস্ত্র আবিষ্কার করতে শিখল তখন সে যে একদিন ভালোবেসে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিল, সব ভুলতে শুরু করল :

‘সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখে মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।

আজ ভালোবাসাহীন জীবনে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। সমস্ত জীবনজুড়ে এখন কৃত্রিম বঞ্চনা, নিজেকেই ঠকাবার আয়োজন :

‘সূর্যালোক নেই — তবু —
সূর্যালোক মনোরম মনে হলে হাসি।

দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি, শাসক ইংরেজের প্রথম লোভ এবং দেশীয় মানুষের হৃদয়হীন কালোবাজারির ফলেই তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। কত মানুষের জীবন গিয়েছিল, কত মানুষ মানুষের সেই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ্রা, সমাজতাত্ত্বিকেরা তার হিসাব করেছেন। কবি শুধু যেসব ‘কালো কালো ছায়া লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে’, বাঁচার চেষ্টা করেছিল, তাদের কথা বলেছেন, বাঁচে নি তো আরো অনেক। তাদের দেখে আমাদের কী প্রতিক্রিয়া? আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের :

‘এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে — তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন — অন্তহীন বেদনার পথে।’

আশ্চর্য লাগে কীভাবে সেদিনও আমরা বেদনাহীন ছিলাম, সমব্যথী হতে পারি নি কেন? আমরা নিতান্ত উদাসীন ছিলাম এই ভেবে যে এসব নিরন্ন গ্রামবাসীদের দুর্ভোগ, আমাদের এখন স্পর্শ করবে না। আমাদের এই হৃদয়হীন নির্মম মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে কবি বলেছেন :

‘সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হলে হাসি...
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।’

অর্থাৎ আত্মরতিতে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত তখনও সব কিছু ঠিক আছে ভেবে তৃপ্ত থাকতে চেয়েছে।

লক্ষ করবার মতো, কবিতার শেষে কিন্তু কবি বিশ্বাস বিসর্জন দেননি। ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ কাব্যগ্রন্থের ‘মানুষের মৃত্যু হ’লে’ কবিতায় কবি বলেছেন ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়’, এখানেও বলেছেন তিমিরবিলাসী আমরা নই, আমরা তিমির বিনাশী। শেষ পর্যন্ত তিমির বিনাশ করতেই চাই, এ বিশ্বাস কবি রেখেছেন—এই কবিতায় তো বটেই, ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের, ‘বিভিন্ন কোরাস’, ‘প্রতীতি’ প্রভৃতি কবিতাতেও।

৬.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসার যে ছবি 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটিতে আছে তার দুটি প্রমাণ দাও?

২। সনেট কাকে বলে?

৩। বাংলার বুকে কোন সময় মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল?

৪। 'তিমির হননের গান' কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কি?

৬.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় : অশ্রুকুমার শিকদার।

২। আমার জীবনানন্দ : হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু।

৪। জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু।

দ্বিতীয় সেমেস্টার, বিষয় : বাংলা

পত্র – B-Core – 205

পর্যায় গ্রন্থ - ৩ জীবনানন্দ দাশের নির্বাচিত কবিতা

একক - ১২ - ১৯৪৬ - ৪৭

বিন্যাসক্রম

২০৫.৩.১২.১ : ভূমিকা

২০৫.৩.১২.২ : দেশভাগ

২০৫.৩.১২.৩ : দাঙ্গার পটভূমি

২০৫.৩.১২.৪ : নামকরণ

২০৫.৩.১২.৫ : কবিতার প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২০৫.৩.১২.৬ : আধুনিক কবিতার আঙ্গিক

২০৫.৩.১২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.৩.১২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৫.৩.১২.১ : ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। জীবনানন্দ ছিলেন আধুনিক কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও শিক্ষাবিদ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি ওপার বাংলার বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সত্যানন্দ দাশ, মাতা ছিলেন কুসুমকুমারী দাশ। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক’ ১৯২৭ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়াও তিনি লিখেছিলেন ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২) , ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪), ‘সাতটি তারার তিমির’ (১৯৪৮), ‘রূপসীবাংলা’ (রচনাকাল ১৯৩৪, প্রকাশকাল ১৯৫৭) ও ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থগুলি। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন একজন কালসচেতন ও ইতিহাসচেতন কবি। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। সেইজন্য তিনি ‘রূপসীবাংলার কবি’ হিসেবেও খ্যাত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে ‘নির্জনতম কবি’ বলে মনে করেন। আবার অন্নদাশংকর রায় তাঁকে ‘শুদ্ধতম কবি’ অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। এখন আমাদের আলোচ্য জীবনানন্দ দাশের ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতাটি। আমরা সকলেই জানি ১৯৪৬-৪৭ খ্রি: সময় মানুষের

জীবন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাল। যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজারি, দুর্নীতি সবকয়টি উপসর্গ সমাজজীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রি: ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে বহুবিধ সমস্যায় ভারতের জনজীবন ব্যাহত হয়েছিল। সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট, ধর্মনৈতিক সংকট, নৈতিক সংকট, অস্তিত্বের সংকটে সাধারণ মানুষ জর্জরিত। 'পেটের জ্বালা মানুষের বড় জ্বালা', এক মুঠো ভাতের জন্য হাজার হাজার মানুষকে লঙ্গরখানায় লাইন দিতে হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে, রেললাইনের ধারে, পোড়ো বাড়িতে পেটে খিদে নিয়ে বসবাস করতে হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর খাবার না জুটলে তারা মারামারি করেছে। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, ক্ষরা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় সাধারণ মানুষ একেবারে দিশেহারা। সংকটময় পরিস্থিতিতেও তারা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়, আর তাদের বাঁচার জন্য চাই নিরাপদ পরিবেশ পরিস্থিতি। 'একমুঠো ভাত, একমুঠো জীবন' যাদের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিনিয়ত তারা সংগ্রাম করেছে।

<u>২০৫.৩.১২.২ : দেশভাগ</u>

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ চলেছে। আজকের দিনেও কাশ্মীরে সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে জঙ্গিদের দ্বারা। কাশ্মীর সমস্যা বহুবিধ সংকটের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সকলেই জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ খ্রি:, চলেছিল ১৯৪৫ খ্রি: পর্যন্ত। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষ নানাভাবে হাহাকারের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। আমরা সবাই জানি, ১৯৪৬ খ্রি: ১৬ আগস্ট নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। বাংলার মুসলিম লীগ সরকার ঐ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করেছিল। তার ফলে কলকাতার পরিবেশ-পরিস্থিতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে বনধ্‌ের চেহারা নিয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে বহুবিধ সমস্যার কারণে দেশভাগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। চারিদিকে হাহাকারের মধ্যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সাধারণ জনজীবন একেবারে স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। আবার প্রায় একই রকম দাবিদাওয়া নিয়ে ১৯৪৭ খ্রি: এপ্রিল মাসে হিন্দু মহাসভা কোলকাতায় বন্ধ ডেকেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা ও দেশভাগের যন্ত্রণার কথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা ঐতিহাসিক সত্য বলে পাঠকদের মনে রাখতে হবে।

"দেশভাগে দাঙ্গাবাজরা যেমন উল্লাসিত হয়েছিল, আশ্রয় ভীরু নিশ্চেষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙালিরা যেমন ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিল, তেমনি সীমান্তের এপারে ওপারে অসংখ্য প্রতিবেশী হারা বন্ধুহারা শিক্ষকহারা মানুষ বেদনায় নীল হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দু প্রতিবেশীকে বাঁচাতে গিয়ে মুসলমান দাঙ্গাবাজদের হাতে যে যুবকটি প্রথম প্রাণ দেয়, সে কিন্তু ছিল মুসলমান।" মানুষে-মানুষে হিংস্রতা, সামাজিক স্তরের মানসিক সংকটের বার্তা বহন করে চলেছে। দেশকে দু-টুকরো করে ফেলার মানসিক যন্ত্রণা খুবই ভয়াবহ। পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ও মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের জীবনে অস্থিরতার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। বা বলা যেতে পারে এই যন্ত্রণাই হয়ে উঠেছে দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণাম। আমাদের আলোচ্য '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ দুই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের আত্মিক যন্ত্রণার ছবি নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন।

২০৫.৩.১২.৩ : দাঙ্গার পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) রাজনৈতিক সমাজপতিদের প্রতিযোগিতার অনিবার্য পরিণাম হল দাঙ্গা। সমাজব্যবস্থায় কালোবাজারী, মজুতদারীর পরিমান বেড়ে গিয়েছিল। যারা মালিক শ্রেণী, তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। অপরদিকে যারা নিরন্ন, একমুঠো ভাতের জন্য যাদের পশুতে-মানুষে কাড়াকাড়ি করতে হয়েছে (বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক) তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—

> "বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে,
> পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
> অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দুজনের হাতে।
> পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
> সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।"

জীবনানন্দ দাশ সংকটময় পরিস্থিতিতে কোথাও আলো দেখতে পাচ্ছেন না শুধুমাত্র চারিদিকে হাহাকার, মানুষে-মানুষে হানাহানি লক্ষ্য করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল দিশাহীন। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দাঙ্গার ভয়াবহতার ছবি লক্ষ্য করা গেছে। "স্মরণে রাখা ভাল, তাঁকে বরিশাল ছেড়ে কোলকাতায় ভাইয়ের আশ্রয়ে

উঠে আসতে হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। বহিরাগত মুসলমানদের উৎপাতের আশঙ্কায় প্রতিবেশী মুসলমানেরাই তাঁদের দেশত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে কবি পত্নী লাবণ্য দেবী জানিয়েছেন।”

বরিশালে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাসের সময় কবি স্থায়ী অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে কবির জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা নেমে এসেছিল। বেকারত্বের জ্বালা, অর্থনৈতিক হাহাকার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও জীবন সংকটময় করে তুলেছিল। বহুবিধ সমস্যায় কবিও যে পড়েছিলেন, ইতিমধ্যে জীবনানন্দ গবেষকদের সৌজন্যে তা আমরা জানতে পেরেছি। তাই কবির চোখে দেখা এই কষ্টের বা দুঃখের বাস্তবমূল্য অনেক বেশি। কবি বলেছেন—‘নিভে গেছে সব’। হিংসার পরিণামে মানুষের আত্মিক সংকট লক্ষ্য করা গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমাদের ন্যায়-নীতির নির্মিত জগৎটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমরা-ওরার বিভাজনে একে-অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কবির চোখেও যে স্বপ্ন ছিল, সংকটময় পরিস্থিতিতে তা ভেঙ্গে গিয়েছে। চলতি বছরে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালনে সমস্ত ভারতবর্ষে ১৯৪৬-৪৭ সালে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও তাঁদের ছিন্নমূল হওয়ার করুণ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। ১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় দাঙ্গার পটভূমি কবি তুলে ধরেছেন এইভাবে—

“দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা,
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে,
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।”

<u>২০৫.৩.১২.৪ : নামকরণ</u>

আমরা সকলেই জানি সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য ভাষার চল রয়েছে। গদ্য ভাষার মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। পদ্যের এখনো বিশেষ শ্রেণী ভাগ (ছন্দ ছাড়া) দেখতে পাওয়া যায় না। কবিতা-গদ্যরূপে কাব্যেও স্বীকৃতি পেয়েছে। কবিতার নামকরণ থেকেই কবির জীবনদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। নামকরণের মধ্যেই থাকে কবিতার সকল রহস্য এবং সকল সত্য। আধুনিক বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ ছিলেন অন্যতম আধুনিক কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। আমাদের আলোচ্য ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতাটির নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলে

দেখা যাবে, কবি একটি সময়ের উল্লেখ করেছেন। ঐ সময় বহুবিধ সংকটে বাংলার সাধারণ মানুষ হাহাকারের মধ্যে, অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। সেইসময় দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অজন্মা, খরা ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যায় সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি বিষয়বস্তু অনুযায়ী কবিতার নামকরণ করা হয়েছে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

"ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা, দুঃখ নিরক্ষরতায়
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।
আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন।"

'জীবনানন্দ শ্রাবস্তীর কারুকার্য' গ্রন্থে ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কবিতা গ্রন্থের অন্তর্গত '১৯৪৬-৪৭' কবিতার নামকরণেই যে দ্বিধা ফুটে উঠেছে, তা এক বিমূঢ় যুগের উদ্‌ভ্রান্তিকে ইঙ্গিত করে। শতাব্দীর রাক্ষসীবেলায় দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন, লোভ, হিংসা, রণ, রক্ত, অঙ্গার কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ যেন এক নষ্ট পৃথিবী; যেখানে অদ্ভুত আঁধারের আনাগোনা।" (পৃ. ১৬৮) তবু আমাদের বলতে হয় ভারতবর্ষ দেশটি মহান। এত ভেদাভেদ, এত সংঘাত, এত অবিচার এসব সহ্য করেও খানিকটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কবি পেয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি স্বরপ '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছেন।

২০৫.৩.১২.৫ : কবিতার প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়" গ্রন্থে দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন—'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ'। জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রত্তোর আধুনিক কবি। জীবন ও জগতকে গভীরভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিভিন্ন কবিতায় সৌন্দর্যের খোঁজে যেমন এগিয়ে গেছেন তেমন যুগদর্শনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ বাস্তব মুখিনতার সঙ্গে কবিতার আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিদিনকার সামান্যতম বিষয়ের মধ্যে অসাধারণত্বকে আবিষ্কার করেছেন রোমান্টিক মন নিয়ে। জীবনের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে কবির বিস্ময়বোধ লক্ষ্যণীয়। তাঁর কবিতা

যেমন আমাদের বিস্মিত করে তেমন কবির জীবন ও জগতের বিচিত্রতা দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি। দশটি স্তবকে কবিতাটি রচিত হয়েছে। কবিতাটির মধ্যে গদ্যকবিতার সকল লক্ষণ যুক্ত রয়েছে। প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন—

"দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে;
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে-মনে হয়,
জলের মতন দামে।" পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বহুবিধ সমস্যা থাকার জন্য নিজের সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরে মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। জীবন প্রবাহে প্রবাহিত হওয়ার সময় পথে-ঘাটে, ট্রাক-ট্রামলাইনে, ফুটপাতে মানুষের কর্মব্যস্ততার ছবি লক্ষ্য করা গেছে।

আমরা সকলেই জানি দেশভাগ, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রিঃ দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ ওপার বাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে। পাকিস্তান থেকেও সর্বস্ব খুইয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এপারবাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেইসময় লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অস্তিত্বের সংকট। একদিকে খাদ্যাভাব, অর্থনৈতিক সমস্যায় একমুঠো ভাতের জন্য তাদের হাহাকার লক্ষ্য করা গেছে। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের হাহাকার-অবক্ষয়ের চেহারাটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশভাগজনিত ছিন্নমূল মানুষের বেদনা জীবনানন্দ দাশকেও সহ্য করতে হয়েছিল। কবি বলেছেন—

"বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।"

সেইসময় কোলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতি ধোঁয়ায়, বারুদের গন্ধে ভরপুর থাকলেও কবি দিনের আলোর মতন সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন। মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবনধারণ পদ্ধতি সবই তিনি উপলব্ধি করেছেন। কবির মনে হয়েছে কালোবাজারী, মজুতদারী করে একটি শ্রেণী প্রচুর কালো টাকা উপার্জন করেছে। নিজের সুখের জন্য, ভোগবিলাসের জন্য, কামনা-বাসনার জন্য সেইসকল বড় লোক শ্রেণীর মানুষ শেষপর্যন্ত নারীকেও অবহেলা করেছে। ভোগবাদী দুনিয়ার সেইসমস্ত মানুষের মন যে পরিষ্কার নয় তা কবি বলতে চেয়েছেন। এই কবিতার মাধ্যমে কবি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজে এক শ্রেণীর মজুতদারেরা, মুনাফাকারীরা প্রবল প্রতাপ নিয়ে বসবাস করেছে। তারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুন্ঠন করেছে, অত্যাচার করেছে, শোষণ করেছে, ধন-সম্পদ লুট করে বড়লোক হয়েছে। বড়লোক শ্রেণীর মানুষ অর্থ, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করতে পিছুপা হন না। শেষপর্যন্ত ধনিক শ্রেণীর মানুষ ভোগবিলাসের জন্য 'সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।'

'১৯৪৬-৪৭' কবিতার পরবর্তী স্তবকে কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—

"বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে - পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে।"

পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সংকট থাকার জন্য সাধারণ মানুষ কোথায় হারিয়ে গেছে। সেইসব অবহেলিত, নিরন্ন মানুষেরা জীবনের গতি প্রবাহে প্রাণে আশা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। তাদের চোখে স্বপ্ন রয়েছে। নিরন্ন মানুষগুলি আশাবাদী হয়েছে। তাদের জীবনে সকল অন্ধকার দূর হয়ে নতুন সকালে পূর্বদিগন্তে নতুন সূর্য উদিত হবে। সময়ের পরিবর্তনে জীবনে নতুন আলোয় আলোকিত হয়ে তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেবে। তারা মনে করে, বারবার হোঁচট খেয়ে, ঘুরে দাঁড়াতে হবে নিজের চেষ্টায়। তাদেরকে দুর্গম পথ অতিক্রম করে, অভাবের সংসারে টিকে থেকে নতুন সূর্যের আলোয় আলোকিত হতে হবে। আমরা সকলেই জানি শিক্ষার আলো, অন্যায়-অবিচার, সন্ত্রাস সবকিছু দূর করে দিয়ে মানুষকে আবার নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারে। সংকটময় পরিস্থিতিতে কবি আশা

করেন আমাদের সমাজের চারিদিকের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, নতুন আলোয় সবকিছু আলোকিত হয়ে উঠবে। সেই আলোটুকু আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নিজের জীবনে ব্যবহার করতে হবে। কবি বলেছেন—

“পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হয়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিনীকে অধিকার করে নিতে হবে।
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হয়ে যায়।”

কবি মনে করেন পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতর মিশে গিয়ে নতুন আশা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। নতুন কিছু সৃজনশীল সৃষ্টির প্রতি নতুন রঙিন স্বপ্নের দিকে সবার লক্ষ্য থাকবে। সমাজের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাই আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। সমাজ পরিবেশে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা নিয়ে সবাই একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হবো। ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

“কোনো কোনো অঘ্রাণের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের
হৃদয়ের পথে মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয়;
তা হলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হতো।”

কবিতাটির মধ্যে পারিবাবিক-সামাজিক সংকট উপস্থাপিত হয়েছে। উচ্চবিত্ত মানুষদের ভোগ বিলাসিতা নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনে দুঃখ বয়ে নিয়ে এসেছে। আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত, নাগরিক জটিলতায় আক্রান্ত মানুষের চাহিদার শেষ নেই। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যে নিত্য নতুন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। কবি মনে করেন সবাইকে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে হাতে হাত রেখে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে মানুষের দুর্দিনের ভয়াবহতা কেটে যাবে, দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই পাবে। মানুষ সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে পরিবার জীবন অতিবাহিত করবে। জীবনানন্দের প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে রোমান্টিক প্রকৃতি বিলাস নয়, তা যে একেবারেই জীবনের সঙ্গে অন্বিত। সেই মানসিকতাই কবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চতুর্থ স্তবকে কবি বলেছেন—

"বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্ত চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই।"

একদিন যে বাংলার গ্রাম সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ছিল। আকাশে-বাতাসে সুমধুর সংগীত সুরভিত হতো। গ্রাম্য পরিবেশে নিসর্গের আঙিনায় পুষ্পগন্ধে চারিদিক আমোদিত থাকতো, সেখানে এখন বারুদের গন্ধ নাকে এসে লাগে। সেই পরিস্থিতিতে বহুবিধ সমস্যায়, দাঙ্গায় হাজার হাজার গ্রাম থেকে সাধারণ মানুষ পালিয়ে গেছে। বোধহয় কর্মসংস্থানের জন্য, অন্ন জোগাড়ের জন্য তারা গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়েছে। গ্রামীণ মানুষ তাদের নিজস্ব জীবনভঙ্গি র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন পরিবেশে তাদের জীবন ও জীবিকা পালটে গেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে হতাশা, মানসিক অসুস্থতা, বেকারত্ব লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে গ্রাম্যপরিবেশে নিস্তবব্ধতা এখনো রয়েছে বলে আলুলায়িত হয়ে তারা চেয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দ দাশ গ্রামের অতীত জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"বাংলার সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জীবনের পোশাক, খাবার, প্রার্থনা, পূজা-পার্বণ, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বাসস্থান, বাহন, জীবন সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব-বিরহ প্রভৃতির কথা স্মরণ করে কবি ব্যথিত হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের লেখনীর মধ্য দিয়ে গ্রাম্য জীবনের করুণ-দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন—

"কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।
এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনো পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো ...ও—পাড়ার দুলে বোয়েদের

ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত;
এখন টু শব্দ নেই সেইসব কাক পাখিদেরও
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়;
সময়ের হাতে অন্তহীন।"

'১৯৪৬-৪৭' কবিতায়, জীবনানন্দ দাশ 'মানুষ নেই' বলতে জনশূন্য গ্রামকে বোঝাতে চাননি। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কবি মানবিকতার অভাবের কথা বলতে চেয়েছেন। আমরা সকলেই জানি মানুষের মূল্যবোধের সংকটের ফলে সভ্যতা সংস্কৃতিতে হিংস্রতা লক্ষ্য করা গেছে। মানুষ একে-অপরকে বিপদের সময় সহযোগিতা করবে, তা না করে তারা প্রতিযোগিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে। আমাদের জীবনে মানবিকতা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের পরিবার থেকে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে আমরা তা গ্রহণ করি। সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি ভালো পরিবারই গড়ে তুলতে পারে মানুষের মানবিকতা। আর মানবিকতার অবক্ষয় বলতে আমরা বুঝি ধ্বংস। মানুষ এখন এত ব্যস্ত যে টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানবিকতা হারিয়ে ফেলেছে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কবি আপনার মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। তাই একদিন যে গ্রাম কালীঘাটের "পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী" ছিল, এখন তা শূন্যতায় পরিণত হয়েছে। কবি বলেছেন—

"ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হত
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি-বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে-বিবাহের কিছু পরে - সন্তানের জন্মাবার আগে।"

আমাদের গ্রাম্য সংস্কৃতিতে বেণু-বীণার সুমধুর ধ্বনির সঙ্গে বারে বারে কুহুধ্বনি, ভ্রমরের আনাগোনা, শ্যামা-দোয়েল পাখির ডাকে নিসর্গজগৎ ভরপুর ছিল। কিন্তু দাঙ্গা-মন্বন্তরের ফলে তা নষ্ট হয়ে গেছে। বারমাসে তের পার্বণ, ভাদু-তুসু, নবান্ন উৎসব, চাঁদনি রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ প্রভৃতির কথা স্মরণ করে কবি আজ ব্যথিত হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাঙালির গ্রাম-জীবনেও যে হাহাকার-অবক্ষয় নেমে এসেছিল, এই স্তবকের মধ্যে কবি তার কথা তুলে ধরেছেন।

"সে সব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোক সমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে
মৃত প্রায়; আজকের এইসব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে-অন্ধকারে-জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না।"

আমরা সকলেই জানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা ভোগ করার অধিকার পেয়েছিল। ব্রিটিশদের এই প্রথায় জমিদাররা নিযুক্ত হয়ে গ্রামের উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসালয় স্থাপন, কৃষির সম্প্রসারণের কাজে অগ্রবর্তী লাভ করেছিল। আগেকার দিনে গ্রাম্য জীবনে দুঃখ-কষ্ট ভুলে সবাই একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতো। ঐ আনন্দময় পরিবেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিছু মুনাফালোভী দালাল, মজুতদারের চক্রান্তে সেই লোক সমাজের জীবনধারণ পদ্ধতি ধ্বংস হয়েছে। তাই আকাশে-বাতাসে সুমধুর সংগীতের পরিবর্তে 'মানুষের হাড়-খুলি' পড়ে থাকতে দেখা যায়। সংকটময় পরিস্থিতিতে কবি বলেছেন—

"আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।
আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন।"

দাঙ্গা, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এযুগের মানুষ একেবারে দিশেহারা। গ্রামীণ জীবনে হাহাকার নেমে এসেছে। চারিদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির আঙিনায় সুমঙ্গ ল ধ্বনির পরিবর্তে অমঙ্গল, অশুভ বার্তার খোঁজ পাওয়া গেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষে-মানুষে মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি লক্ষ্য করা গেছে। কবি বলতে চেয়েছেন যে গ্রাম্য লোকায়ত সংস্কৃতি মধুময় সুন্দর ছিল, সংকটময় পরিস্থিতিতে তা বিষময় হয়ে উঠেছে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—

"অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ করে নেওয়ার রেওয়াজ
রয়ে গেছে; সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।
সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় - দ্বেষ।"

দেশভাগের ফলে দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে কবি কোথাও ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। চারিদিকে অন্ধকার, অবক্ষয়, সংকটময় পরিস্থিতিতে কোথাও আশার আলোর আভাস পাননি। এমনকী ভয়ানক দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন কোনও উদ্ধারকর্তার নির্দেশে তাও লক্ষ্যনীয় নয়। পারিবারিক সামাজিক জীবনে কবির স্বপ্নকে, আশার আলোকে নষ্ট করে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাই অন্ধকারময় পরিবেশে, হাহাকারের মধ্য দিয়ে কবির মনে হয়েছে— 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ'। বিয়োগ-বেদনায় মর্মাহত কবি সেই পরিস্থিতিতে ভাবেন— মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে সরলতা-মানবিকতার লেশমাত্র নেই। এমনকী মানুষ সত্য কথা বলতেও ভয় পেয়েছে। সেইজন্য 'সকলেই আড় চোখে সকলকে দেখে।' আমরা সকলেই জানি জীবের চারিদিকে ঘিরে থাকে পরিবেশ। মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মতার চিত্র জীবনের আদিলগ্ন থেকেই গড়ে উঠেছে। আকাশ, সমুদ্র, নদী, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি ভরা এই সমগ্র প্রকৃতিই প্রমাণ করে পৃথিবীর স্পন্দন জীবনের গুরুত্ব। মানুষের জীবনে চড়াই-উতরাই এর দ্বন্দ্ব অন্তহীন '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় কবি বলেছেন—

"প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজও ধায়;
মানুষ মেরেছি আমি - তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু হৃদয় কঠিন হয়ে বধ করে গেল।"

সমাজ-পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতার হানাহানি থেকে কবি নিজেকেও সরিয়ে রাখতে পারেননি। সেইসময় কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। দুই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের অত্যাচারের কাহিনী সেইসময় ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সংকটময় পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতার ভেদাভেদ লক্ষ্য করে কবি বলেছেন—“মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে।” সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ও মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের আত্মিক সংকটের চেহারাটি কবি ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন।

“আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব’লে ঘুমাতেছে।”

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে কলকাতার দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সমস্যা তৈরি হয়েছিল। বহুবিধ সমস্যা বহুবিধ সমস্যা কবি নিজের জীবনেও উপলব্ধি করেছেন। স্মরণে রাখা ভালো, তাঁকে ১৯৪৬ সালে বরিশাল ছেড়ে কোলকাতায় ভাইয়ের আশ্রয়ে উঠে আসতে হয়েছিল। বহিরাগত মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা উৎপাত করতে পারে এই আশঙ্কায় কবি যেমন বরিশাল ছেড়েছেন, তেমনি কোলকাতার পরিবেশ-পরিস্থিতিও সেইসময় জটিল আকার ধারণ করেছিল। অস্তিত্বের সংকটে জর্জরিত তখনকার কোলকাতার নাগরিক জীবনচিত্রে আতঙ্ক, হিংসা, হাহাকার কবি নিজের চোখে সবই দেখেছেন। মানুষের হাহাকারের ছবি ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় উদ্ভাসিত হয়েছে এইভাবে—

“যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি? আমার বুকের পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে

বলে যাবে, গগন, বিপিন, শশী পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—
কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে।”

মন্বন্তর পীড়িত, দাঙ্গা পীড়িত মানুষ খুবই অসহায়। কালোবাজারীর মহাজন শ্রেণীর মানুষ সাধারণ মানুষকে ইতর শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য করে। যারা কালোবাজারী করে, রেশনিং ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিতে চায়, তারা হলেন মুনাফালোভী, সুবিধাভোগীর দল। তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইতর শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করে চলেছে। সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের দরদাম করেছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের তৈরি করা জীবন সমস্যায় এরা ইতর শ্রেণীর মানুষ হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। জীবনে সর্বত্র হাহাকার থাকায় দরিদ্র নগরবাসী মানুষরূপে এরা কোনোরকমে বেঁচে থেকেছে। দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ও মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ একে-অপরের চোখে ঘোরতর অপরাধী। এই পরিস্থিতিতে কেউ কাউকে বিশ্বাস পর্যন্ত করেনি। যে রক্তের নদীতে ইয়াসিন, মকবুল, হানিফ মহম্মদ, করিম আজিজ কিম্বা গগন, বিপিন, শশীদের মতো মানুষেরা শুয়ে থাকে। সমাজ পরিবেশে তারা ভিন্নধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা মানুষ। লাল রক্ত প্রত্যেকের শরীরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যারা দুটি আলাদা সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও জীবনের ইতর শ্রেণীর মানুষ হিসেবে গণ্য হয়েছে। ‘সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ তাহার উপরে নাই’ এই আদর্শ নিয়ে, মানবিকতা নিয়ে কবি ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় বলেছেন—

“এইসব প্রাণকণা জেগে ছিলো—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে—
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে

কথা বলে; কাকে বলে? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ খন্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা ব'লে গিয়েছিলো; তবু—
অনন্ত তো খন্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা
অখন্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।"

আমরা সকলেই জানি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ইতর শ্রেণীর মানুষকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে, তারা হীনমন্যতায় ভোগে। নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভাবতে বাধ্য করা হয় যে তারা বিত্তবান শ্রেণীর মানুষদের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ। জীবনানন্দ শ্রাবস্তীর কারুকার্য গ্রন্থে—ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"গ্লানিকর প্রাণধারণের তুচ্ছতা নিয়েও তারা কিন্তু 'উজ্জ্বল চোখের মনীষী লোকের কাছে' সুন্দর হয়েছে। এ পৃথিবী যত রেণুর সংঘর্ষ জাগে, রোমাঞ্চিত হয়, সেখানে এই প্রাণকণার উদ্ভাসন অবহেলার নয়। তিল তিল সংগ্রহেই তো তিলোত্তমা, খন্ড জুড়েই অখন্ড। সেখানে কণাটুকু হারালে, নষ্ট বা উপেক্ষিত হলে কবিপ্রাণ হায় হায় করে ওঠে।" (পৃ. ১৭৩) কবি বলেছেন, দরিদ্র নগরবাসী হিসেবে তারা জীবন অতিবাহিত করেছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবন নির্ধারণের জন্য সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। জীবনযাত্রায় স্বাধীন ভাবনা প্রয়োগের সুযোগটুকুও তারা পায়নি। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরাই নানারকম অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে তাদেরকে সুস্থ সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর মানুষই আবার সহযোগিতার ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে ইতরশ্রেণীর মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারে। ঐ সকল নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের থেকে সমাজের বিত্তশালী মানুষরা গার্হস্থ্য ও পুর-পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। সর্বোপরি বলা যায়, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সমাজে ব্রাত্য থাকলে, সেই নগর বা সেই সমাজ কোনোদিনই তিলোত্তমা হবে না। জীবনানন্দ দাশ এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সমাজে কোথাও আলো দেখতে পাচ্ছেন না। সেই পরিস্থিতিতে কবির মনে হয়েছে দাঙ্গা যারা করেছে, তারা স্বভাবতই নিষ্ঠুর। দাঙ্গাবাজরাও মনে করে না যে খুনোখুনিটা খুব ভালো কাজ। তবুও তারা মারামারি করেছে, অসহযোগিতা করেছে, একে-অপরের ঘরে

আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ সেই পরিস্থিতিতে সেটাই তারা কর্তব্য মনে করেছিল। সেই ভয়ংকর দিনের কথা স্মরণ করে কবির মনে হয়েছে—"কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।" সামাজিক সংকটের কথা স্মরণ করে '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—

"এ যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদার গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশ্লেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু-বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।"

আমরা সকলেই জানি বিজ্ঞান বিশ্বের দূরত্ব অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। যোগাযোগের অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে। যার ফলে একে—অপরের সঙ্গে যোগাযোগ খুব সহজ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, চাকার আবিষ্কার এবং বিদ্যুতের আবিষ্কার পৃথিবীর মানচিত্রে নগর-বন্দর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। জীবনানন্দ দাশ বিজ্ঞানের স্মরণীয় আবিষ্কার উন্নতি মেনে নিয়েও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কবির মনে হয়েছে—"বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু।" অথচ নাগরিক জীবনছন্দে বিশ্বাসী মানুষেরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কারণে যে সুবিধাভোগ করে থাকে, তা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবী সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষের মাঝে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিয়ে শ্রেণী বিভাজন ছিল না। সময়ের পরিবর্তনে আত্মকেন্দ্রিক কিছু মানুষের জন্য সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ঘটেছে। মানবসভ্যতার অভিশাপরূপে

বিবেচ্য এই সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় জীবনে ক্ষতি ডেকে এনেছে। আমরা সকলেই জানি বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ভারতবর্ষের নাগরিক। সেইজন্য অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দেখানো মানুষের কর্তব্য। যেখানে পৃথিবীর সব ধর্মের মূল কথা প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতি। ধর্মকে কেন্দ্র করে হীন মানসিকতার পরিচয় কতটা ভয়াবহ হতে পারে ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করেছে। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন মানবিকতার অভাবে মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দিন কাটিয়েছে। তাই কবির মনে হয়েছে—'মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল'। বাক্য, শব্দ, ভাষা অনুপম বাচনের রীতি অনুভূতিহীন। অবহেলার সেই বাক্যজাল কবির কাছে এলোমেলো হয়ে ধরা দিয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নিঃসঙ্গতার দরুণ কবির কোনো আক্ষেপ নেই, তবু সবকিছু শূন্য বলে মনে হয়েছে। অনুভূতিহীন ভালোবাসার জন্য কবির আর টান নেই। ব্যস্ত শহরেও প্রচুর মানুষের ভিড়ে কবি একাকিত্বে ভোগেন। শূন্যতা অনুভব কতটা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে, কবি উপলব্ধি করেন বলেই জ্ঞান ও প্রেম থেকে বহুদূরে থাকেন।

'১৯৪৬-৪৭' কবিতার শেষে কবি বলেছেন—

"এ যুগে কোথাও কোনো আলো-কোনো কান্তিময় আলো চোখের সুমুখে
নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রির মায়ের মতো; মানুষের
বিহ্বল দেহের সব দোষ প্রক্ষালিত করে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে।"

কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি কান্তিময় আলোর সন্ধানী জীবনানন্দ তিমির বিনাশে বারবার এগিয়ে গেছেন। তাই কবির কাছে অন্ধকার রাত্রি হয়ে উঠেছে 'মায়ের মতো'। মাতৃগর্ভের অন্ধকারে যে স্নেহরস ও নিরাপত্তা আছে তা সকলকেই নতুন আলোয় আলোকিত করে। আমাদের সেই জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। জীবনের গতি প্রবাহে সেই অঙ্গীকার আশার আলো নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কবি মনে করেন, এই অন্ধকার তো আলোর অধিক। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দেখা যায়—

"অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজও—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম করে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।"

সমস্ত পৃথিবীতে সৃষ্টি, সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। আর তাতেই সমগ্র দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষের জীবনে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, অবক্ষয় মানুষের এক নিদারুণ অপমান। তাই মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধকে সবার মধ্যে জাগিয়ে তোলার অঙ্গীকার আমাদের জীবনে ব্রত হওয়া উচিত। কবির জীবনপর্বে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে হিংসা, মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে কবিকে ভরসা রাখতে হয়েছে আগামী দিনের প্রতি। মানব জীবনে সর্বত্রই সংকট থাকা সত্ত্বেও সবুজ মন নিয়ে, মানুষের বিপদে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এই আশা নিয়ে কান্তিময় আলোর সন্ধানী কবি সামনের দিকে এগিয়ে যান। তবে এই সাধ তাঁর আমৃত্যু অপূর্ণই ছিল। 'তিমিরবিলাসী আমরা নই, আমরা তিমির বিনাশী'। শেষপর্যন্ত তিমির বিনাস করতেই চাই, এ বিশ্বাস কবি রেখেছেন। বিশ শতকের তিনের দশকের অন্যান্য কবিরা (বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু) সেইসময় বাধ্য হয়েই সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। জীবনানন্দ দাশও যে তার ব্যতিক্রম ছিলেন না তা আমরা বিভিন্ন কবিতা পাঠেই জানতে পারি। '১৯৪৬-৪৭' কবিতার রচনাকাল মানুষের জীবন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাল। পারিবারিক সংকট, সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, অস্তিত্বের সংকটে জীর্ণ অসহায় গ্রাম ও শহরের মানুষগুলির দুঃখপীড়িত জীবনই সেইসময় কবির নজরে এসেছিল বলে সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছিলেন।

২০৫.৩.১২.৬ : আধুনিক কবিতার আঙ্গিক

আমরা সকলেই জানি পদ্যের পদগুলি সুনিয়মিত ধ্বনিবিন্যাসে বাঁধা থাকে। অপরদিকে গদ্যকবিতার সে ধ্বনিবিন্যাস অনিয়মিত। গদ্যকবিতার এই ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। কেননা এতে ধ্বনির অলঙ্কারের বদলে ভাবকেই গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে দেওয়া হয়। জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সূচিমুখ পরিবর্তিত হয়েছে। কবিতার ভাব-ভাষা, রূপ-শৈলী, প্রকাশভঙ্গি, পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব সাহিত্যে এসে পড়েছে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতার শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগে সহজ গদ্যভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। দৈনন্দিনতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে কবি কলকাতার নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছিল। দেশি শব্দের ঢের, দ্বেষ প্রভৃতি শব্দ যোজনা জীবনানন্দ দাশ কবিতাটিতে ব্যবহার করেছেন। কবি গদ্যভাষাকে কবিতার ভাষা করে তুলেছেন খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। জীবনানন্দ দাশের বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।

> "আসলে কবিতার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা তো থাকতেই পারে, তাকে যুক্তিহীন, রহস্যময় ধরে নেব কেন? এক ধরনের দুর্বোধ্যতা আমার মতো এক মনস্ক পাঠকের অজ্ঞতা বা শ্রমবিমুখতা থেকে জাগে, সবগুলো উল্লেখ ধরতে পারি না, অভিপ্রায় বোঝার চেষ্টা করি না। আরেক ধরনের অস্পষ্টতা তৈরি হয় নানা আপাত সম্পর্কহীন অনুপুঙ্খ দিয়ে, যাদের মধ্যে টানাপোড়েন হতে থাকে, পড়ার পরেও অনেকক্ষণ মনের মধ্যে স্রোত, আবর্ত ও অধিজ্যতা জাগিয়ে রাখে—এবং আমরা ধীরে ধীরে সব গোপন সম্বন্ধ, অভিজ্ঞতা ও বিষক্রিয়া অনুভব করতে থাকি।" (পৃ. ১১১)

গদ্যভঙ্গির এই সাদামাটা চরণগুলিতে কবির ভালোবাসার অমৃতস্বাদ যত গভীরভাবে আমরা অনুভব করতে পারি—অলঙ্কৃত পদ্যে তার আবেদন এমনভাবে আমাদের মনকে স্পর্শ করে যেতে পারত না।

<u>২০৫.৩.১২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী</u>

১। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতার মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

২। '১৯৪৬-৪৭' কবিতার দাঙ্গার পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩। '১৯৪৬-৪৭' কবিতার নামকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। দেশভাগ কোন সময়ে হয়েছিল? তোমার পঠিত কবিতা অবলম্বনে দেশভাগের পটভূমি আলোচনা করো।

<u>২০৫.৩.১২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী</u>

১। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী

২। আমার কালের কয়েকজন কবি—জগদীশ ভট্টাচার্য

৩। জীবনানন্দ দাশ : উত্তরপর্ব—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। জীবনানন্দ এবং—তপন গোস্বামী

৫। জীবনানন্দ—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

৬। জীবনানন্দ—অমলেন্দু বসু

৭। জীবনানন্দ শ্রাবস্তীর কারুকার্য—ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

৮। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ—হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র - B-CORE - 205

পর্যায় গ্রন্থ - ৩ জীবনানন্দ দাশের নির্বাচিত কবিতা

একক - ১২ - দিনরাত

<u>বিন্যাসক্রম</u>

২০৫.৩.১২.১ : ভূমিকা

২০৫.৩.১২.২ : মূলপাঠ - দিনরাত

২০৫.৩.১২.৩ : প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

২০৫.৩.১২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৫.৩.১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

<u>২০৫.৩.১২.১ : ভূমিকা</u>

গতিশীল জীবনে নতুন কবিভাষায় আধুনিক কবিরা কথা বলতে শুরু করলেন। ফলে একই বক্তব্য এক-একজনের কাছে আলাদা আলাদা হয়ে গেল। এই কবিভাষাও মূলত নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকদের সামনে ধরা পড়েছে। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কবিরা হলেন—জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) প্রমুখ। যুগে যুগে কবিতার রূপ বদল, ভাষা বদল, চিত্রকল্প বদল লক্ষ্য করা গেছে। পুরনো পৃথিবীর নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংস্কার, নতুন মূল্যবোধ সাহিত্যে লক্ষ্য করা গেছে। কবিদের জীবনধারণ পদ্ধতিতে নতুন জীবনদর্শন নতুনরূপে ধরা দিয়েছে। সেইজন্য প্রত্যেক কবির রচনা রীতি আলাদা-আলাদা ভাবে লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক কবিতা বুঝতে হলে পাঠককে অবশ্যই হৃদয়বান হতে হবে, তাহলেই নতুন কবিতার ভাষা নির্মাণ বুঝতে পারবে। নিজস্ব পরিচিত পৃথিবীর ভাব-ভাষা নতুনরূপে আছে, সহৃদয় সামাজিক হয়ে পাঠককে তা উপলব্ধি করতে হবে। জীবনানন্দ দাশের ‘দিনরাত’ কবিতায় দুটি স্তবক ও ৮টি লাইন রয়েছে। জীবনানন্দ দাশের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সংকলনে কবিতাটি রয়েছে।

২০৫.৩.১২.২ : মূলপাঠ

দিনরাত

সারাদিন মিছে কেটে গেল;
সারারাত বড্ডো খারাপ
নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে; জীবন
দিনরাত দিনগতপাপ

ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণীমনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে; একটিও পাখি শূন্যে নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।

২০৫.৩.১২.৩ : প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

আমরা সকলেই জানি একবিংশ শতাব্দীতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ আমাদের জীবনে অনেক প্রতিকূলতা নিয়ে এসেছে। একবিংশ শতাব্দীতে করোনা ভাইরাসের ফলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ গৃহবন্দী। সমস্ত রকমের যানবাহন বন্ধ। মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক সংকট লক্ষ্য করা গেছে। পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। যারা অফিস-আদালতে কর্ম করে, তাদের বাড়িই হয়ে উঠেছে নতুন অফিস। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়িতে বসেই ইন্টারনেট সহযোগে অনলাইন মাধ্যমে ক্লাস করেছে। অনলাইন ক্লাসের পর আবার পরীক্ষাও নেওয়া হয়েছে Blended মাধ্যমে। তেমনি বিশ শতকের তিনের দশকের পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কালোবাজারী, মজুতদারী প্রভৃতি সমস্যাগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তখন তারা খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনে সামাজিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট, অস্তিত্বের সংকট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এ সময় জীবন হয়ে উঠেছিল বিবর্ন, শুষ্ক ও ধূলিধূসর। প্রতিকূল সময়ে কেবল নিজের ভালোর কথা ভাবা মানবজীবনের কর্ম নয়। পরস্পর - পরস্পরের

কল্যাণে ও উপকারের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। সেইজন্য প্রতিযোগিতা সর্বস্ব জীবন নয় বরঞ্চ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা মানুষের আসল কর্তব্য হওয়া উচিত। জীবনানন্দ দাশ ‘দিনরাত’ কবিতায় বলেছেন—

“সারাদিন মিছে কেটে গেল;
সারারাত বড্ডো খারাপ
নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে, জীবন
দিনরাত দিনগত পাপ।”

জীবনানন্দ দাশের ‘দিনরাত’ কবিতায় সেই সময়ের দেশ, সমাজ, মানুষের সংকটপূর্ণ জীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ ও সমাজের প্রতি কবির দৃষ্টি ছিল বাস্তববাদী। অসহায় মানুষগুলির আত্মিক সংকটকে কবি বাস্তবভাবে তুলে ধরেছিলেন। কবি বলতে চেয়েছেন দুঃখকে বাদ দিয়ে জীবনে সুখের আশা করা যায় না। সেইজন্য দিনরাত, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় ইত্যাদি নিয়েই আমাদের জীবন। একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এপার বাংলা-ওপার বাংলার দুই জীবনের সাথে কবির পরিচয় বেশ ভালো। ফলে দুটি বাংলার জীবনই কবিকে শিখিয়েছে বিস্তর। বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভর করে সংকটাপন্ন জীবনের কথা কবি বলতে চেয়েছেন—নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টির মাধ্যমে। ‘দিনরাত’ কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—

“ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণী মনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে; একটিও পাখি শূন্যে নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।”

কবি বলতে চেয়েছেন সংকটময় পরিস্থিতিতে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে সাধারণ মানুষ হাহাকারের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। সফলতার পথ কন্টকাকীর্ণ। সেইজন্য কাঁটার ভয়ে যে সেই পথে হাঁটে না, সে কখনো সফল হয় না। ফনী মনসার কাঁটার ডগায় স্নিগ্ধ শিশির জমে রয়েছে। পূর্ব দিগন্তে নতুন সূর্য উদিত হলে সেই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছায়। আর যারা দুঃখ-কষ্টে ভীত হয়, তারা সহজেই ঝরে পড়ে

সাফল্যের পথ থেকে। তাই সকল সংকটময় পরিস্থিতি বরণ করে মানুষকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। জীবনে একা থাকা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। এর যন্ত্রণা কতটা ভয়কংর সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারে না। আমাদের জীবনে চলার পথে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, নিজেকে একা মনে হয়েছে। নিজের কাছেই নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়েছে, তখন আমাদের বেঁচে থাকার আগ্রহ চলে গেছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাস কমতে কমতে আমাদের জীবনের আনন্দগুলোও ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। হিংসা মারামারি না করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক হওয়া উচিত। যখন এই ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ক্ষয় হয়ে গেছে, তখন সেটা আমাদের মানসিক শক্তি এবং শান্তি দুটোই নষ্ট করে দিয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায় যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, মনুষ্য সমাজ থাকবে, ততদিনই মানুষের জীবনে শূন্যতা থাকবে, হাহাকার থাকবে। আবার কর্মের জোরে সচেতন হয়ে মানুষকেই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। মানুষ একা আবাস তৈরি করতে পারে না বলেই একান্তবর্তী পরিবারের বা সমাজের সৃষ্টি। সেইজন্য মানুষকেই উদ্যোগী হয়ে, মনোযোগী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সবুজ মন নিয়ে, প্রকৃতির আঙিনায় মানুষকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। মানুষ নিজের জীবনকে ভালোবেসে, ভালোকাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পারলে সমাজের বহুমুখী সমস্যা বা সংকট দূর হবে। জীবন সবার একইরকম কাটবে বা সবসময় একইরকম যাবে, তাও নয়। জীবনানন্দ দাশ বলতে চেয়েছেন—মানুষের জীবনে দুঃখকে অতিক্রম করে শুভ চিন্তায় নতুনজীবনকে নিয়োজিত করতে হবে। তিনি মনে করেন, অনুভূতি যদি ইতিবাচক হয় তাহলে মানুষের জীবনে আনন্দ, প্রেম আসতে বাধ্য। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সৃজনশীল কাজে যুক্ত হতে হবে। জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, জীবন প্রবাহে গতিশীলতার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে প্রবাহিত হতে হবে। কেননা গতিশীলতায় জীবন। দিনের পর যেমন রাত্রি আসে তেমনি অমাবস্যার পর আসে পূর্ণিমা। জীবনে সুখ-দুঃখ, দিন-রাত্রি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকবে। তাতে দুঃখে ভেঙে পড়লে চলবে না আবার সুখে গা ভাসিয়ে দিলেও নয়। নিজের চেষ্টার মধ্য দিয়ে হাহাকারময় জীবনে সুদিন ফিরে আসবে, তারজন্য আমরা প্রতীক্ষা করে থাকি।

২০৫.৩.১২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দিনরাত' কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২। 'দিনরাত' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ কি বলতে চেয়েছেন, নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৩। জীবনানন্দ দাশের 'দিনরাত' কবিতার নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

২০৫.৩.১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। জীবনানন্দ শ্রাবস্তীর কারুকার্য

২। জীবনানন্দ—অমলেন্দু বসু

৩। জীবনানন্দ—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

৪। জীবনানন্দ এবং—তপন গোস্বামী

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক : ১৩

সুধীন্দ্রনাথদত্ত – সংবর্ত, যযাতি, উটপাখি

বিন্যাসক্রম:

২০৫.৪.১৩.১: কবিপরিচিতি

২০৫.৪.১৩.১.১: কর্মজীবন

২০৫.৪.১৩.১.২: সাহিত্যিক জীবন

২০৫.৪.১৩.২: সংবর্ত

২০৫.৪.১৩.৩: যযাতি

২০৫.৪.১৩.৪: উটপাখি

২০৫.৪.১৩.৫ : মূল্যায়ন

২০৫.৪.১৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নমালা

২০৫.৪.১৩.৭: সহায়ক গ্রন্থ

২০৫.৪.১৩.১: কবিপরিচিতি

বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের যে পাঁচ জন কবি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে আধুনিকতার সূচনা ঘটান তাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৬০জুন ২৫ -১৯০১অক্টোবর ৩০)অন্যতম। তাঁকে বাংলা কবিতায় "ধ্রুপদী

রীতির প্রবর্তক” বলা হয়।সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মায়ের নাম ইন্দুমতি বসুমল্লিক। কবির বাল্যকাল কাটে কাশীতে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাশীর থিয়সফিক্যাল হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯২২ সালে স্নাতক হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে ছবি বসুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু এক বছরের ভিতরেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালের ২৯ মে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রাজেশ্বরী বসুর সঙ্গে দ্বিতীয় বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন কবি পরলোকগমন করেন।

২০৫.৪.১৩.১.২ : কর্মজীবন

পিতার ল ফার্মে কিছু দিন শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকার পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চাকরিজীবন শুরু করেন লাইট অব এশিয়া ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানিতে। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ১৯৩১ সালে পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১২ বছর ধরে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্টেটসম্যান ও শরৎ বসুর লিটারারি কাগজে কিছু দিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

২০৫.৪.১৩.১.৩ : সাহিত্যিক জীবন

কবি জীবনানন্দ দাশ এর ধারণা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তই আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা। সর্বব্যাপী নাস্তিকতা, দার্শনিক চিন্তা, সামাজিক হতাশা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদ তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি। ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিরা অবিশ্বাসী হলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তই ঈশ্বরকে সরাসরি প্রত্যাখান করেছেন বলে সমালোচক হুমায়ুন আজাদ মনে করেন।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ছ’টি --

তন্বী (১৯৩০)

অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫)

ক্রন্দসী (১৯৩৭)

উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০)

সংবর্ত (১৯৫৩)

দশমী (১৯৫৬)

এ ছাড়াও তাঁর দু’টি প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে

স্বগত (১৯৩৮)

কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)

২০৫.৪.১৩.২ : সংবর্ত

সংবর্ত' কাব্যটি ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে লেখা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এই কাব্যের ভাষায় শব্দ নির্মাণকলার বিস্ময়কর পরীক্ষা-রীতি দেখা যায়। কাব্যের ভূমিকা অংশে কবি বলেছিলেন"আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ, এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য।" এখানে বাক্যে আছে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের ধ্বনিসাম্য "প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ।" দুরূহ শব্দ বিলাস কোথাও কোথাও দেখা যায় : "মাতরিশ্বা পরিত্ব কবির কণ্ঠশ্বাস" ('সংবর্ত')। এই কাব্যের নাম কবিতাটি আমাদের পাঠ্য।

কবিতাটির প্রেক্ষাপটে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতি। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ, বিজিগীষা ও মত্ত ক্ষমতা দম্ভ প্রবলরূপে প্রকাশিত। কবির ভাষায় "রুশের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মমি, হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন, মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন, কবন্ধ ফরাসীদেশ"। এই বিপর্যস্ত বিশ্বশক্তির যুদ্ধের নামে অবিবেকী আচরণের ফলে কোটি কোটি মানুষের মৃতদেহের ভারে আজ মেদিনী ভারগ্রস্ত। শব পচার দুর্গন্ধে কুলষিত মানুষের শ্বাসবায়ু। এ্যাটম বোমার ধ্বংসলীলায় আতঙ্কিত মানবজাতি স্বজাতির ধ্বংসস্তূপের উপরে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুবদলের স্বাদে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কখনও কখনও মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লেও অচিরেই বাস্তবের কাঠিন্যে ভেঙ্গে যায় সেই মোহ — 'সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান /দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে : ভুলে যাই/উত্তরচল্লিশ আমি' অতীতের সেই স্নেহমেদুর দিনগুলি আমোদ-আহ্লাদের স্মৃতিতে ভরপুর কিন্তু বর্তমানে তার কোনো আভাস নেই। কলের পুতলের মতো মানুষ ক্রমে চলে মৃত্যুর দিকে দিনগুণে। ক্লান্ত, অবসন্ন, উদ্যমহীন এই মানুষগুলির কাছে জীবনে বেঁচে থাকাটাই যেনো চ্যালেঞ্জ। স্বল্প পুঁজিতে কিভাবে টিকে থাকবে এটাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত হিসেব-নিকেশ ব্যর্থ করে দিনের শেষে কিংবা মাসের শেষে সেই হতাশাই ঘুরেফিরে আসে—

বীমাই জীবন
বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাসে মাসে কিস্তির যোগান
দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।

এ-বয়সে নিতান্ত নিশ্চয় ;
পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব গত্যন্তর নেই ;
এবং যেকালে আজও রয়েছি বেঁচেই,

মানুষের এই অসহায় অবস্থাকে কবি বিভিন্ন প্রতীক ও চিত্রকল্পের মোড়কে অনন্য শব্দের কারুকার্যে তাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এর সঙ্গে আছে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, যা সাধারণের কাছে বাঁচার সবথেকে বাঁধা। যদিও সরকার জানে মূল্যহ্রাস নিতান্ত জরুরি তবুও উপায় নেই। নির্বিকার শাসকের শাসানিকে ভয় করে নিশ্চুপ সকলে —

মূল্যহ্রাস
সর্বত্র সর্বথা
আবশ্যিক, – বোঝে না সে-সোজা কথা
শুধু যার ভূসম্পত্তি আছে ;
উদয়াস্ত ভেবে মরি, – খেয়ে, পরে, নেহাৎ যা বাঁচে,
নির্ভয়ে তা খাটাতে পারি না।

সাধারণ মানুষের অবস্থা অনেকটা যূপবদ্ধ ছাগের মতো। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ যেনো এভাবেই মাথা নুয়ে থাকা ছাড়া গতান্তর নেই। আগামী ভবিষ্যতের কোনো সুস্থ ঈশারা নেই তবু মাঝে মাঝে অতীতের স্বপ্নালু দিনগুলি স্মৃতি এলে কাতর হয়ে যায় কবি। এই প্রলয়কালীন মেঘে আসে দানবীয় হুঙ্কার স্বরূপ অশনী-সংকেত। সমাজের কিছু সুবিধাবাদী, মুনাফালোভী, কালোবাজারির দল যারা সুযোগ বুঝে নিজেদের অর্থভাণ্ডার স্ফীত করছে। এটাই বাস্তবতাকে মেনেই কবিতার অবয়ব নির্মিত হয়েছে —

বৃথা স্বপ্ন ; সংকল্প অক্ষম ;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিংবা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস,
কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে,

২০৫.৪.১৩.৩ : যযাতি

সংবর্ত কাব্যের অন্তর্গত 'যযাতি' কবিতাটির মধ্যে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পুরাণের নবতর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পুরাণ-কাহিনির নবনির্মাণ আধুনিক কবিদের এক অন্যতম লক্ষণ। বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পুরাণ কাহিনিকে গভীর আয়াসে আত্মস্থ করেছিল ।তাছাড়াও ক্ল্যাসিক কাব্যাদর্শ সুধীন্দ্রনাথকে পুরাণ-প্রসঙ্গের সংযোজনেও অনুপ্রাণিত করেছিল।তার কাব্যে পুরাণের উপস্থাপনা ঘটেছে দু'ভাবে; এক ঐতিহ্যানুসারী পুরাণ-প্রসঙ্গ, দুই, পুরাণের নবরূপে ব্যবহার।আলোচ্য কবিতায় দ্বিতীয় রূপেই পুরাণের অবতারণা ঘটিয়েছেন কবি।

'যযাতি' কবিতায় আছে পুরাণ প্রসঙ্গের সার্থক প্রয়োগ। পুরাণ প্রসঙ্গকে ভিন্নতর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যযাতি কবিতা। এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে কবির বক্তব্য রূপকের অন্তরালে প্রচ্ছাদিত। মহাভারতের রাজা যযাতি তাঁর দুই পত্নীর কলহের ফলে অকালে শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত হন। পুত্র পুরুর যৌবনের বিনিময়ে তিনি যৌবন ফিরে পান। পৌরাণিক যযাতিকে তিনি বর্তমান মানব সভ্যতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করলেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পাশাখেলায় পৃথিবী আজ অকালে জরাগ্রস্ত। কবি বলেছেন যে, তিনি শুক্রশাপে অভিশপ্ত হন নি। তাই অলৌকিক শক্তিবলে যৌবন পুনরুদ্ধারের সাধ বা সাধ্যও তাঁর নেই। তবু এই অকালবার্ধক্যই এ যুগের অনিবার্য নিয়তি। এখানে "আমি বিংশ শতাব্দীর/সমানবয়সী" ইত্যাদি উক্তির মধ্যে যেন 'যযাতি' বিশ শতকের 'অকপটতার' সাধক কবি বা প্রজ্ঞাবান মানবমূর্তি। তাই তিনি পুরাণের যযাতির বিপরীত কথা বলেন: "অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে/অজাত পুরুষ সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক / অর্থাৎ প্রকট বলে সম্ভোগের অনন্ত বঞ্চনা/পঞ্চাশে পা না দিতেই অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাক"। কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে মানবজীবনের হতাশা ও আর্তনাদ, নৈরাশ্যময় বেদনার প্রকাশ।

'সংবর্ত' কাব্যের বিশিষ্ট সমালোচক এই কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কবিতাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে লিখিত পুরাণ-কাহিনী অতিক্রম করা মহাভারতের 'যযাতি'-উপাখ্যানকে কবি মানব ইতিহাসের আদিপর্বে নিয়ে গেছেন। অলৌকিকভাবে পুত্রের সঙ্গে যযাতির যৌবন বিনিময়ের মধ্যে তিনি অতীত, বর্তমান তথা চিরকালের মানবসমাজের একটি বৈকল্য বা 'বৃথা বিলাপ' লক্ষ্য করেছিলেন। যে 'বিলাপ' মৃত্যুভয় বা 'আত্মোপলব্ধির অভাব' আজকের জড়বাদী বিজ্ঞান শক্তির অহমিকা প্রচারের যুগেও মানুষের মধ্যে গ্লানিকর রূপে দেখা দিয়েছে। একমাত্র আজকের চৈতন্যবান মানুষ (বা কবি স্বয়ং) যযাতির বিপরীত মেরুতে সাফল্য অনিশ্চিত এবং বিনাশ ধ্রুব জেনেও জড়ের সঙ্গে তাঁর অবিকল চৈতন্য সম্বল করা সংগ্রামে রত" (কমলেশ চট্টোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার' ১৯৮০)। অনুরূপভাবে 'সংবর্ত' কাব্যের 'জেসন্' কবিতাটিতে গ্রীক পুরাণের রূপসী মোহিনী মিডিয়ার সঙ্গে জেসনের প্রেমলীলা ও মোহভঙ্গের উপাখ্যানের নব রূপায়ণ ঘটেছে।এইভাবে দেখা যায়, ভাবকল্পনায়, শব্দসজ্জায়, আঙ্গিকের ও পুরাণের নবতম প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্যে অদ্বিতীয় কবি শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন।

আমরা যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো কবি অনেক সময় কাব্যিক মুক্তির জন্য পুরাণের শরণ নিয়েছেন। যেখানে পৌরাণিক চরিত্র বা শব্দসমূহ তার স্ববৈশিষ্ট্য ত্যাগ করা ভিন্নতর ব্যঞ্জনা ও বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে; যেমন 'বৈদেহী', 'ফাল্গুনী', 'ত্রিশঙ্কু', 'দ্বৈপায়ন' ইত্যাদি শব্দগুলি পুরাণ-প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে নবতর ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়েছে; কাব্যের ঊনত্রিশটি কবিতার মধ্যে এগারোটিতে পুরাণ-প্রসঙ্গ লক্ষিত হয়। সেখানে 'উর্বশী' রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বসৌন্দর্যের

প্রতিমা নয়, কবির ব্যক্তিগত ভাবনায় পরিবর্তিত : "আজকে তোমার চ্যুতবনের লীলাখেলা/ প্রাণে জাগায় অবহেলা/ওই যে, তোমার পাণ্ডু বুকের কৃষ্ণচূড়া/মধুতে তার নেই যে-সুরা/মর্মর প্রায় তোমার উরু আর না দহে/চুম্বনে হিম ঝিমিয়ে রহে।" অন্যত্র যেমন 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থে রাবণ, ইন্দ্র, ফাল্গুনী, শিব, মহাশ্বেতা, কালী ইত্যাদি পৌরাণিক চরিত্র নাম দেখা যায়। এছাড়া, 'বৈতরণী', 'অমরাবতী', 'ত্রিভুবন', 'অলকানন্দা', 'সুরধুনী' প্রভৃতি পৌরাণিক স্থানের নামোল্লেখ আছে। বর্তমানের ভয়াবহ অবক্ষয়ে যখন "দলিত সুন্দর শান্ত শিব পদতলে" তখন কবির মনে হয়েছে : "বৈতরণী পুনর্বার ডাকিবে আমারে অবিরত।" কবির কাছে মৃত্যু 'নীলকণ্ঠ' এবং রুদ্র 'মহাকাল' রূপে প্রতিভাত— "আসে মৃত্যু নীলকণ্ঠ, আসে মৃত্যু রুদ্র মহাকাল।" "মহাশ্বেতা' কবির কাছে 'ক্ষণিকা পরমা' 'ক্রন্দসী' কাব্যেও সঞ্জয়, অহল্যা, নীলকণ্ঠ, রুদ্র, দুঃশাসন, নটরাজ, শৈলসূতা, অশনি, চণ্ডী, নহুষ, নচিকেতা প্রভৃতি চরিত্র-নাম উল্লিখিত।

২০৫.৪.১৩.৪ : উটপাখি

"উটপাখি" ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ,কবিতাটি আত্মবিবরণ, আত্মপ্রতিফলন আর সমাজ- কল্পনায় অবগাহনের-পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনে বাস্তবতাভাবনামিশ্রিত এবং বিচিত্র চিন্তাজাগানিয়া বিবরণের বর্ণে মাখা। অভিভাবকীয় সুরে কবি এখানে নির্মাণ করেছেন কবিতার কথামালা; প্রাজ্ঞ এক সমাজ বিশ্লেষক-রূপে পরিচয় ঘটাচ্ছেন পাঠককুলকে তাঁর দেখা আসা সকল অনুভব, অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

কবিতাটির আরম্ভ হচ্ছে এভাবে:

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।

ফেলেমধ্যে রোমন্থনে কবি মাঝে মাঝে নিবিড় হয়ে ওঠেন। মধ্যে-প্রকৃতির স্মৃতি-আসা সময়ের ও চিন্তার গতি- :হয়তো কোনো প্রিয়মুখের অনুপস্থিতিও তাঁকে বিষণ্ন করে তোলে। তাঁর অনুভব"নিষাদের মন মায়ামৃগে মজে নেই;/ তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ। কোথায় পালাবে /? ছুটবে বা আর কত?/ উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা। বিগত সবাই /প্রাক্পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত /, তুমি অসহায় একা। /"

নিঃসঙ্গতা, অপারগতা আর সময়ের অপার শূন্যতায় মানুষের নির্মম পরিণতির কথা ভাবতে গিয়ে তিনি যেন অন্তসারশূন্য সমাজের ছবি দেখেছেন নিজের চোখে ও অনুভবে।

২.

মরুভূমিতে জল ঢেলে সবজি চাষের চেষ্টা বৃথা, যেমন ক্ষুধার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে চলার বোকামি সত্য। ইচ্ছা নামক ঘুড়িকে উড়তে দেওয়ার মধ্যে আছে স্বাধীনতা; সে স্বাধীনতা চিন্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার। বিপদ মোকাবিলা করার জন্য যে জাগতিক জ্ঞান দরকার তা বোধকরি সকলে আয়ত্ত করতে পারে না-- বিশেষত প্রতিভার প্রশস্ত বারান্দায় যারা ঠায় দাঁড়িয়ে মেধাবৃত্তির অমোঘ বাতাসে চুল ওড়াতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তারা তো ওই নিরেট সত্যের পাটাতন থেকে নিশ্চিত দূরত্বে আপন অবস্থান নির্মাণ করেন হয়তো বা নিজেরই অজান্তে; কোনো অলৌকিক আবেশের অপরিহার্য প্রবল টানে। এভাবেই তিনি জাগতিক কৃত্রিম জীবনব্যবস্থার চেয়ে প্রাকৃতিক -ন জীবনকেই হয়তো আরাধ্য জেনেছেন। নতুনের পথেসৌন্দর্য এবং স্বাভাবিক ও প্রতিযোগিতাহী; এবং তা অবশ্যই কৃত্রিমতাবিহীনতাঁর মানসিক পরিভ্রমণ এই কবিতায় একটা নিটোল ছ --বি হয়ে ধরা পড়ে পাঠকের সোজা চোখে—

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনও বিপদপ্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যেকোনও- নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥

শূন্য মরুর বুকে হতাশাগ্রস্ত জীবন স্বাভাবিক। সেখানে যেকোনো ধরনের আহ্বান তৃষ্ণার্তের জন্য মহার্ঘ্যতুল্য। কিন্তু যখন একজন তৃষ্ণার্ত আশ্রয়ভালোবাসার আহ্বানও নীরবে উপেক্ষা করে তখন আহ্-বানকারীরও আ্মর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তখন তারও মনে হতে পারে ‘ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে’। যে উটপাখিকে কবির মনে হয়, মরুদ্বীপের সমস্ত খবর জানা প্রাণী, তাকেই আবার স্মরণ করিয়ে দেন কবি__ ‘তুমি তো কখনও বিপদপ্রাজ্ঞ নও’। অর্থাৎ মানুষ বা প্রাণীসবাই অতীতের ঘটনা পর্যালোচনা করে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা

করতে পারে, ক্ষেত্র বিশেষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার কার্যকারণ সম্পর্কও আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু অতীতবর্তমানের - ঘটনা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চিত বার্তা কেউ দিতে পারে না; কেবল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। ফলে অতীতের সাক্ষী হয়েও কেউ কখনো সর্বজ্ঞ হতে পারে না। সঙ্গত কারণে চরাচরের নানা সম্পর্কের ধরন ও বিভেদের দায় একা কারও নয়।

৩.

আমরা যদি নিবিড়ভাবে দেখি তাহলে দেখবো সমকালের যাপিত জীবন ও পৃথিবীর চালচিত্রের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে লিপ্ত হয়ে আছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শরীর — রক্ত ও মাংসসমেত সমূহ প্রবণতা ও প্রস্রবন। মানবিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ব্যাপারে তাঁর ভাবনার অতলতাকে আমরা স্পর্শ করি তাঁরই নির্মিত কবিতা- কথনের ভেতর দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময়। আর সামাজিক এবংব্যক্তিগত দায় ও দায়িত্বের বিষয়েও যে তিনি প্রবল সচেতন, তাও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।"উটপাখি" কবিতার শেষাংশে তার স্পষ্ট উচ্চারণ :

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার-;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ওআত্মরতি।-
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

জাতির উদ্ধারকারী হিসেবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে শেষের চার পঙ্ক্তি অনন্যসাধারণ। আর 'অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে' একই সঙ্গে প্রশ্নশীল উপলব্ধি ও প্রবচন। পুরো কবিতায় পরার্থপরতাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। উটপাখি একটি প্রতীক মাত্র, আড়ালে সমাজ ও রাজনৈতিক বিমুখ, উদাসীন মানুষের প্রমূর্তি। তাই সতর্ক উচ্চারণ—'ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে'।মানুষ নিজের নিরাপত্তার জন্য নিয়ম তৈরি করে; নিজেই সে নিয়ম লঙ্ঘংঘন করে অন্যতর প্রয়োজনে। অন্যে যখন নিয়ম লঙ্ঘন করে তখন তার জন্য

শাস্তি কামনা করে, কিন্তু নিজের নিয়ম লঙ্ঘনকে দেয় বৈধতা। মানবচরিত্রের এই এক ভয়াবহ দ্বৈরথ। দ্বিমুখী স্বভাব তার। অন্যকে শাস্তি দিতে সে কুণ্ঠাহীন, নিজের দোষের ক্ষেত্রে তৈরি করে অন্য বিধি। যে কাজ অন্যের বেলা গর্হিত বলে প্রচার করে, সে কাজ নিজের জন্য করে তোলে গর্বের। অন্তত এমনটাই প্রচার করে সে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এ বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত।

২০৫.৪.১৩.৫ : মূল্যায়ন

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিকদের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর কবিতায় আবেগের চেয়ে প্রজ্ঞা, কল্পনার চেয়ে অভিজ্ঞতা এবং ভাবালুতার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহুল পরিমাণে বিধৃত। ফলে তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। এর কারণ কবিতা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানস্থ হওয়া এবং কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও ভাবনা প্রকাশের বাহন করে তোলা। এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্য সংগ্রহ'র ভূমিকায় লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো বলে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো বলে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন__ যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো__ যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে__ সের্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলোপ-না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, ''পরিশ্রমী হও।'' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য করে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।' শিক্ষা ও রুচিবোধ যাঁকে মার্জিত ও আবেগের সংহতি দিয়েছে, তাঁর পক্ষে প্রগলভতায় ভেসে যাওয়া দুরূহ। সুধীন দত্তের কবিতায় এমন এক মার্জিত রুচির প্রলেপ ছড়ানো যাকে দুর্বোধ্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না, সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাতে হয়। এ কথা সত্য__ তাঁর কবিতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের প্রীতিপূর্ণ কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; যা গড়ে ওঠে দীক্ষিত পাঠকের ক্ষেত্রে।

২০৫.৪.১৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১. 'সংবর্ত' কবিতাটির মূলভাব বিশ্লেষণ করো।

২. 'যযাতি' কবিতায় ভারতীয় পুরাণের নবনির্মাণ ঘটেছে — এ বিষয়ে আলোচনা করো।

৩. অভিভাবকীয় সুরে প্রাজ্ঞ সমাজ বিশ্লেষক রূপে কবি 'উটপাখি' তে নির্মাণ করেছেন কবিতার কথামালা। বিষয়টি আলোচনা করো।

৪. 'উটপাখি' কবিতাটির মর্মবস্তু আলোচনা করো।

২০৫.৪.১৩.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

---

১. কালের পুতুল – বুদ্ধদেব বসু।

২.আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ - আবুসয়ীদ আইয়ুব।

৩.আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় –দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৪ .সুধীন্দ্রনাথ কাব্যসংগ্রহ- দে'জপাবিলশার্স, কলকাতা।

পর্যায় গ্রন্থ ৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক ১৪

সমর সেন – মহুয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী

বিন্যাসক্রম

২০৫.৪.১৪.১ কবিপরিচয়

২০৫.৪.১৪.২ মহুয়ার দেশ

২০৫.৪. ১৪.২. ১ কবিতাটির বিষয়বস্তু

২০৫.৪.১৪.২.২ নামকরণের সার্থকতা

২০৫.৪.১৪.৩ একটি বেকার প্রেমিক

২০৫.৪.১৪.৪ উর্বশী

২০৫.৪.১৪.৫ আদর্শ প্রশ্নমালা

২০৫.৪.১৪.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২০৫.৪.১৪.১ কবিপরিচয়

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র সমর সেনের জন্ম ১৯১৬ সালে ১০ অক্টোবর, কলকাতার বাগবাজারে। কবির পিতৃ পুরুষের আদি নিবাস ছিল ঢাকার মানিকগঞ্জে। অরুণচন্দ্র সেন এবং চন্দ্রমুখী দেবীর সপ্তম সন্তান ছিলেন সমর সেন। ১৯৪১ সালের ২৮ এপ্রিল সুলেখা সেনের সঙ্গে সমর সেনের বিয়ে হয়।

প্রথম জীবনে বাড়িতেই কবির লেখাপড়া শুরু হয়। বারো বছর বয়সে মা-র মৃত্যুর পরে সমর সেন কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হন। কিন্তু স্কুলে কবি খুবই অনিয়মিত ছিলেন। তার উৎসাহ ছিল শরীরচর্চায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য সাধনায়। পারিবারিক সূত্রে নিজেকে গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন কবি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্দিনের মতো কবি, আব্বাস উদ্দিনের মতো গায়কের সান্নিধ্য যেমন ছিল, তেমনই ছিল বঙ্কিমবিহারী মুখোপাধ্যায়, রাধারমন মিত্রের মতো রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয়ও। ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কবি স্কটিশ চার্চ কলেজ পড়াশোনা শুরু করেন। ইংরেজী সাহিত্যে কবির দক্ষতা শীঘ্রই প্রকাশ পায়। একদিকে ছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম', এর মতো পত্রিকার প্রভাব, অন্যদিকে ইয়েটস বিভিন্ন রচনাই তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। ১৯৩৬ সালে বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এরপর ১৯৩৮ সালে কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় নগরজীবনের বিশেষত মধ্যবিও সমাজের চেতনার ক্লান্তি আর অবক্ষয়ের নিপুণ রূপকার ছিলেন সমর সেন। বিষয় নির্বাচন এবং রচনারীতিতে রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ম ভাষার ব্যবহার তার কবিতা গুলিকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের জগতে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। ১৯৩৩ সালে 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় সমর সেনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর সঞ্জয় ভট্টাচার্য এর 'পুবার্শা' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাতেও তার কবিতা প্রকাশ পায় । ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় সমর সেনের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'গ্রহণ'। এর পরের বছরই প্রকাশিত হয় তার তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ – 'নানা কথা'।এর পরে 'তিনপুরুষ', 'খোলা চিঠি' ইত্যাদি কবিতার গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়ার পরে ১৯৪৪ সাল থেকেই কবিতা লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ক্রমশ কমে আসে । ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিষ্ণু দে মহাশয় কে কবি লেখেন "গদ্য কবিতা কেন, কোনো কবিতা সম্পর্কেই এখন আর উৎসাহ নেই" । ১৯৪৬ সালে 'জন্মদিনে' কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কবি জীবনের উপসংহার টানেন । কবি খ্যাতির শীর্ষে থেকে তাঁর এই স্বেচ্ছা নির্বাসন পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছরের জীবদ্দশাতেও তিনি বজায় রেখেছিলেন।

১৯৪০ সালে কাঁথি কলেজে সমর সেনের অধ্যাপনা জীবন শুরু হয়। পরে তিনি দিল্লিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। তবে কবিতার পাশাপাশি কবি অধ্যাপনার জীবনেও সেচ্ছায় ইতি টানেন। অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 'অল ইন্ডিয়া রেডিও', 'দা স্টেসটম্যান'— এ সম্পাদনার কাজে যোগ দেন তিনি। এরপর ১৯৫৭ সালে অনুবাদকের চাকরি নিয়ে তিনি মস্কোয় যান। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদক থাকাকালীনই ১৯৮৭ সালে ২৩ আগস্ট সমর সেন প্রয়াত হন ।

২০৫.৪.১৪.২ মহুয়ার দেশ

২০৫.৪.১৪.২.১ কবিতাটির বিষয়বস্তু :

‘মহুয়ার দেশ’ কবিতাটি সমর সেনের “কয়েকটি কবিতা” কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

সমর সেন মুখ্যত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের কবি হিসাবে পরিচিত। নগরজীবন ও তার যান্ত্রিকতা, প্রাণহীনতা, ভণ্ডামি ইত্যাদি বারবার সমর সেনের কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। “তিলে তিলে মৃত্যু রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু আমাদের প্রাণ,/দিকে দিকে আজ হানা দেয় বর্বর নগর” –এটাই ছিল কবি সমর সেনের উপলব্ধি।

‘মহুয়ার দেশ’ কবিতাতেও এই নগরজীবনই পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে। যখন সন্ধ্যার জলস্রোতে অলস সূর্য এঁকে দেয় ‘গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ' তখনই নগরজীবনে সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতার মধ্যে “ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে/শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।”

নগরজীবনের যান্ত্রিকতা, দূষণ আর অবসাদে বিধ্বস্ত কবি তার যৌবনের উপবন সাঁওতাল পরগণার সুনির্মল ছায়াঘেরা প্রকৃতির মধ্যে দুদন্ড শান্তি পেতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গেই তার কবিতায় ঘুরেফিরে এসেছে মহুয়ার দেশের কথা।

কবির কাছে মহুয়ার দেশ ছিল ‘সব পেয়েছির দেশ’ যেখানে সব স্বপ্ন সত্য রূপে ধরা দেয়, যা তাকে অবসাদ থেকে মুক্তি দেয়। শান্তি দেয়। তাই অনেক দূরে হলেও কবির কাছে তা ‘মেঘ-মদির’। তার আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ -

“অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ মদির মহুয়ার দেশ,”

এরপরই তিনি সেদেশের বর্ণনায় মনোনিবেশ করেছেন। কবির স্বপ্নের সে মহুয়ার দেশ এর প্রকৃতি নির্মল। অনাবিল তার সৌন্দর্য। সে অবাধে মেলে দিয়েছে নিজেকে। ঢেলে দিয়েছে তার স্নেহ। তাই একরাশ স্নিগ্ধতা তার মেঘ মদির আকাশে। তার পথের দু'ধারে মাথা তুলে দাঁড়ানো দেবদারুর ছায়া। নিবিড় অরণ্যানী বেষ্টিত সে দেশ মনের গভীরে রহস্যময়তার সঞ্চার করে। সেখানে রাত্রি নির্জন, নিস্তব্ধ। দূর সমুদ্রের জলকল্লোল রাতের সে নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে। মহুয়া ফুলের গন্ধ আর স্পর্শ তাকে নিবিড় ভাবে ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ। সে দেশ যে ক্লান্তি-হরণী ,শান্তি- দায়িনী তা কবির প্রত্যাশা থেকেই বোঝা যায় —

“আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।”

কিন্তু পরক্ষণেই কবি মহুয়ার দেশের এক ভিন্ন চিত্র এঁকেছেন, যা নির্মম এবং ভয়ঙ্কর। মানুষের লোভ আর বর্বরতায় ধ্বংস হয়েছে তার অনাবিল সৌন্দর্য আর স্নিগ্ধতা। এখন সে দেশ "অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে" আচ্ছন্ন। লোভী মানুষ সেখানে সন্ধান করেছে কয়লাখনি। বড় বড় যন্ত্র বসিয়ে শুরু হয়েছে কয়লা তোলার কাজ। মহুয়ার দেশের আকাশ বাতাস কম্পিত তারই গভীর বিশাল যান্ত্রিক শব্দে। সেখানে শিশির ভেজা সকাল আসে। কিন্তু ফিরে আসেনা প্রাণোচ্ছলতা। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আরণ্যক সন্তানরা আজ খনি শ্রমিক। সবুজ সকালেও তাদের চোখ নিদ্রাহীন। শরীর ধূলোর কলঙ্কের দাগ। জীবন দুঃস্বপ্ন গ্রস্ত। এভাবেই যন্ত্রসভ্যতার আঘাতেই মহুয়ার দেশ এর বিবর্তনের রূপটি ফুটে উঠেছে কবি সমর সেনের "মহুয়ার দেশ" কবিতায়।

২০৫.৪.১৪.২.২ নামকরণের সার্থকতা :

কবি সমর সেনের একটি অনন্য কবিতা হল "মহুয়ার দেশ"। কবিতাটিতে সুন্দরভাবে দুটি বিপরীত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে — একদিকে নগরজীবনের যান্ত্রিকতা ও পক্ষান্তরে নির্মল মমতাময়ী প্রকৃতির রূপলাবণ্য।

কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ। অস্তগামী সূর্য দিনান্তের রশ্মিপাতে যে উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ অঙ্কিত করে তা কবির চোখে গলিত সোনার মত দেখায়। কিন্তু ধোঁয়ার বিষাক্ত নিঃশ্বাস দুঃস্বপ্নের মত চরম আঘাত করে অকস্মাৎ। এই নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন কবির মনে ভেসে ওঠে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশের কথা। প্রতিটি মুহূর্তে পথের দুধারে সেই দেশে ছায়াপাত করে রহস্যময় দেবদারু বৃক্ষের দল।কবির মনে প্রতিটি মুহূর্তে জেগে ওঠে মহুয়ার মাহাত্ম্য। তিনি হৃদয় থেকে চাইছেন যে, তার ক্লান্তির অবসাদের অবসান ঘটাক মহুয়ার ফুল, আবেশ বিকিরণ করুণ মহুয়ার সুগন্ধ। অন্যদিকে দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস রাতের নির্জনতাকে করে আলোড়িত।

মমতাময়ী প্রকৃতির কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে কবি তার মনকে শান্ত করতে চেয়েছেন। তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে নাগরিকজীবনের শাণিত ক্ষতকরা যান্ত্রিকতা কবিকে দেয় না মুক্ত হতে। এমনকি তার স্বপ্নের জগৎ মহুয়ার দেশেও হানা দিচ্ছে সেই অসহনীয় যান্ত্রিকতা। কবি সর্বক্ষণ শুনতে পাচ্ছেন মহুয়ার বনের ধারের কয়লাখনির প্রবল শব্দ আর শিশিরসিক্ত সবুজ সকালে দেখা যায় খনি শ্রমিকদের শরীরে লেগে থাকা ধূলিকলঙ্ক।

নগরজীবনের ক্লান্তিকর যান্ত্রিকতা থেকে আত্মরক্ষা হেতু কবি মহুয়ার দেশে নিয়েছেন রোমান্টিকতার আশ্রয়। কিন্তু কবির সেই সাধের দেশেও হানা দেয় নাগরিক জীবনের অসহনীয় কঠিন বাস্তবতা। এইমর্মে কবিতার নামকরণ যথার্থ ও সুসংগত হয়েছে বলা যায়।

২০৫.৪.১৪.২: একটি বেকার প্রেমিক

সমর সেনের ‘কয়েকটি কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা ‘একটি বেকার প্রেমিক’। প্রথমেই কবিতাটার নাম নিয়ে আলোচনা করা যাক। সাধারণত আমরা ব্যক্তি বোঝাতে ‘একজন’ ব্যবহার করি, আর ‘একটি’ ব্যবহার করি বস্তু বোঝাতে। বস্তুর প্রাণ নেই, সে যেখানে থাকে সেখানেই থাকে। তাকে ঠেলে সরাতে হয়। তার স্বত্তার অভাব সর্বোচ্চ। আমাদের কৌতূহল জাগে কবি কি তাহলে ‘একটি বেকার প্রেমিক’ বলতে বেকার প্রেমিককে ব্যঙ্গ করে নির্জীব বস্তুর দলে ফেলে দিলেন? বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে – *‘চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি’।* চোরাবাজার, মানে চোরাই মাল যেখানে বিকোয়। কবিতার বেকার প্রেমিক চরিত্রটি সেখানে দিনের পর দিন ঘোরে। লাইনটায় হতাশার যন্ত্রণাকাতর আর্তি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঠিক কী বিষয়ে এই হতাশা সেটা পরিষ্কার না হলেও বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না এ এক দৈনন্দিন রিক্ততার অব্যক্ত অন্তঃকথন। তাদের মধ্যে অন্য অনেক অপ্রাপ্তির মধ্যে বড় ছোট ভেদ থাকতে পারে। তারই মধ্যে কোনটাকে প্রথমে তুলে আনবেন প্রথম পরিচয়ের ধাক্কায়, সেটাই বিস্ময়! পরক্ষণেই দেখি বেকার প্রেমিক মহাশয় একটু ধাতস্থ হন। আসে তার নিত্যকর্মের বিবরণ -

সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে-মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি--
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।

নিত্যকর্মের বিবরণ খুব দ্রুতই অনুভবের কোলাহলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। যেখানে সারা রাত সেবা দিয়ে সকালে টিউব ওয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত রূপজীবী নারীগণ বচসা করছে। বেকার প্রেমিকের অন্তরাত্মায় সে শব্দদূষণ আঘাত করে। সেই বচসার বাক্যাবলী হয়তো তার কানে ঢোকে না। কিন্তু দৃশ্যটা তার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, এই যে রাতভর যারা মিথ্যে প্রেম বিক্রি করে সকাল বেলায় কোলাহল করছে, বেকার প্রেমিক নিশ্চয়ই তাদের চেয়েও নিঃসঙ্গ এবং মূল্যহীন!

একসময় বেকার প্রেমিকের মন প্রকৃতির কোন এক নিঃসঙ্গ ধ্বনির দিকে চলে যায়। খিদিরপুর ডকে রাতের বেলা জাহাজের শব্দ। কেমন শব্দ? হুইসেল? নোঙর তোলার ঘড়ঘড়ানি? খালাসিদের খিস্তি? অথবা সবকিছু মিলিয়ে একটা আদিভৌতিক আবহসঙ্গীত? জাহাজ একা, তাকে সমুদ্রের মধ্যে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিতে হয়। জাহাজের শব্দ আর বেকার প্রেমিকের মনের মধ্যে দৌড়াতে থাকা কথাগুলো মনে হয় একইরকমের। অনেক কথা, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে শুধু না-থাকার আর্তি!

ক্লান্তি আসে, কিন্তু ভাবনার স্থিরতা আসে না। প্রেমের দেবতার কাছে বেকার প্রেমিকের কোন চাওয়া নেই।

কারণ, সে হয়তো বুঝে গেছে ঐসব প্রার্থনায় কোন ফল ফলে না। তবু, তার কিছু অভিযোগ আছে। অভিযোগটা তার ঘুম না আসার ব্যাপারে। কেন তার ঘুম আসে না? সে তো ক্লান্ত, নিয়ম বলে তার ঘুম আসা উচিৎ। সে সিগারেট টানে। সে শহরের রাস্তায় তীব্র দৃষ্টিতে দেখে ইংরেজ মেয়েদের উদ্ধত নরম বুক। সে হীনতায় ভোগে। তার এক অপ্রাপ্তি অন্য অপ্রাপ্তির বদখত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। এরপর সে আর থাকতে না পেরে প্রেমের দেবতার কাছে আর্জি জানায় :

মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।

এইখানে মৃত্যুহীন প্রেম কথাটা খুব সুন্দর। বেকার প্রেমিক যে প্রেমে বসবাস করে, তার মৃত্যু নেই। সে প্রেম তার নিজের ভেতরই উত্তপ্ত ফেনার মতো ফুটতে থাকে। কিন্তু বাষ্পীভূত হয় না। যন্ত্রনাটা থেকেই যায়। ঐ রকম প্রেম সে চায় না। তার চেয়ে সেই প্রেম সে চায়, যে প্রেমের যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। যে কোনো সময়েই সে প্রেম শেষ হয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবনের মতো ক্ষণস্থায়ী বৈদ্যুতিক প্রেম। তার নতুন পৃথিবীর প্রয়োজন। তার ইস্পাতের মতো ঝকঝকে দিন প্রয়োজন। হৃদয়ের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোক রেখা যে বেকার প্রেমিকের আছে, সেটা এখানে বোঝা যায়।

এরপর আবার সে ফিরে যায় সকালের কলতলার দৃশ্যে:

সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক-সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

এখানে একটা সুর বোঝা যায় স্পষ্টভাবে। বেকার প্রেমিকের একটি বিদ্রোহী রাজনৈতিক হৃদয় আছে। তার রক্তের দহন শুধু অপ্রাপ্তির বা হতাশার নয়। সভ্যতার ভেতরের যে জায়গাটা নষ্ট, সেটা যে মরুভূমির মতোই শূন্য, এবং অর্থহীন, সেটা সে আহতের মতো অনুভব করে। এখানে সবকিছু বিক্রি হতে পারে, ভালোবাসা-প্রেম? হ্যাঁ সেটাও। এভাবেই কবিতাটিতে একটি যুগের বাস্তব চালচিত্র নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে।

২০৫.4.১৪.৩: উর্বশী

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কয়েকটি কবিতা’র অন্তর্গত ‘উবর্শী’ কবিতা। এটি কবির জীবনের এক গভীরতম ভাবসত্যকে প্রকাশ করেছে। কবির কাছে রোমান্টিকতার সংজ্ঞা একেবারে ভিন্ন স্বাদের। যাকে কোনো প্রথাগত কল্প পুরাণের গতানুগতিক চরিত্রের ছাঁদে ধরা যায় না, বাস্তবের মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে তাকে বিবর্তিত হতে হতে বিবর্ণ

হতে হয়, এভাবেই স্বর্গের অপ্সরা মধ্যবিত্তের নাগালের দূরহস্ত হয়ে যায়। তাঁর এই মনোভাবনা বিভিন্ন লেখালিখিতে যেমন পাই, তেমনই বক্তব্যেও তা পরিস্কার। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে সমর সেন বলেছিলেন “To be really progressive in our time and country, where only a fraction is literate, is to preserve the integrity of what is good in our past tradition...”। এলিয়ট ট্র্যাডিশনের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলেন। সমর সেনও তাই। ভারতীয় পুরাণ গুলির মূল্য তিনি বুঝতেন। জানতেন কী অনবদ্য রূপকল্প সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি থেকে। কিন্তু রোমান্টিক উচ্ছ্বাস তাঁর মনঃপূত ছিল না। কারণ তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন ‘Poetry is not a turning loose of emotion’। তিনি আরো বলেছেন –

“এ ভুজমাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে
অমরাবতী হতে দেবীরা সুধা এনে
গরল নিয়ে নরকে চলে গেছে।

এ ধরণের রচনা আমার অনুরাগ আকর্ষণ করে না। প্রেমের সঙ্গে দার্শনিকতার সংমিশ্রণ সহজে ঘটে না। সেটার অতিচেষ্টা একটু হাস্যকর হয়। শেলী থেকে লরেন্স তার নিদর্শন...”। ‘কবিতা’ পত্রিকায় পৌষ ১৩৪৮ এ প্রকাশিত কবির এই মনোভাবকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব প্রেমের ইন্দ্রিয় বোধের তীব্র অস্তিত্বে সমর সেনের যতটা আস্থা ছিল, ইন্দ্রিয়াতীত মধুরতার অস্তিত্বে তাঁর সে বিশ্বাস ছিল না। অল্প সংখ্যক কবিতায় বিরহ বা প্রেমের তীব্র সত্যতা বোধের উপলব্ধি সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ কবিতায় বিরহ বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের প্রতি এক বিরূপ মনোভঙ্গি। আমাদের পাঠ্য ‘উর্বশী’ কবিতাটিও সেই সাক্ষ্য বহন করে।

‘উর্বশী’ কবির লেখার প্রেমের অন্যতম প্রতীক। পুরাণের উর্বশী স্বর্গের নর্তকী। রূপ-যৌবনের মোহমায়ায় আচ্ছন্ন ক’রে তপস্বীর তপোভঙ্গ করাই তার কাজ। পৌরাণিক কাহিনিতে মাঝেমাঝে তাকে বন্দী করেছে মানুষের প্রেম। তবু সব সময় তাকে আবর্তিত করেছে এক অলৌকিক দেবদ্যুতি। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে করায়ত্ত করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ‘উর্বশী’কে এঁকেছেন ‘নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ’রূপে। যে কি না সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী। প্রত্যেকের মনের মাঝে সুন্দরের একটি রূপ অঙ্কিত থাকে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার সংযাগ সে আনয়ন করতে চায় না। সৌন্দর্যবোধের উপলব্ধি আলাদা। বিমূর্তসৌন্দর্যকে ধরার বাসনা থাকে মনে। তাই স্বর্গলোকে উর্বশীদের কল্পনা করে সৌন্দর্য আরাধনাকারীরা তৃপ্তি পায়। সে সৌন্দর্য তথা অরূপকে অনুভবের উপলব্ধি, সৌন্দর্যের নির্মল চিত্র আছে এ কবিতায়। যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়, ভোগ করা যায় না। ভোগাতীত সৌন্দর্য, অপার্থিব সৌন্দর্যকে পাওয়ার ব্যাকুলতা আমাদের মাঝে জাগিয়ে দেয় বিরহ। যুগে যুগে এ

অরূপের অন্বেষণ চলেছে। তাকে না পাওয়া থেকে বিরহীর এত ক্রন্দন। সীমা থেকে অসীমলোকে যার পরিতৃপ্তি। রবীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্যের একটি মূর্তি গড়েছেন উর্বশীর মাঝে —

"যুগ যুগান্ত হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী

হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।'... এক প্রবল রোম্যান্টিক অনুভূতির প্রতীক রবীন্দ্রনাথের উর্বশী। কিন্তু সমর সেনের কবিতায় সেই উর্বশী সম্বন্ধে সর্বোচ্চ দাবী —

"তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!
কিম্বা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী," ...(সমর সেনের কবিতা - উর্বশী)
অথবা

"তাহলে আমার সমস্ত শরীরে কি আবার চকিতে আসবে

সমুদ্র মদির উর্বশীর স্বপ্ন?" (মৃত্যু, সমর সেনের কবিতা)।

যা ছিল আরাধ্য, স্বপ্নজগৎময় তাকেই ধূলিময় পৃথিবীতে বাস্তবলগ্নতায় সত্যময় করে তোলেন সমর সেন। তিনি 'উর্বশী'কে একেছেন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের নৃত্যরতা নারীরূপে। রবীন্দ্রনাথ যাকে ধরায় বাঁধতে পারেননি, 'ফিরিবে না, ফিরিবে না' বলে ক্রন্দন করেছেন তাকে সমর সেন বেঁধেছেন মধ্যবিত্তের জীবনে দুরন্ত মেঘের মতো। মধ্যবিত্তের জীবনে সমর সেন সৌন্দর্যরূপিনীকে কোথাও খুঁজে পাননি। তিনি দেখেছেন মর্তের উর্বশীরা মনোরঞ্জন করতে করতে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। নারীকে তিনি ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। সৌন্দর্য উপলব্ধির এ বাঁধাকে তিনি মানুষের ভেতরের সমস্যা মনে করেননি। বাইরের আত্মবিরোধ, ধনিকের লোভ, ব্যভিচারের প্রতাপ, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, রোগ, দুর্ভিক্ষ, পঙ্কিলতাই এর জন্য দায়ী। তাই এ যুগের উর্বশীরা কালের তপোভঙ্গে হয়ে ওঠে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

প্রাচীন সাহিত্য থেকে নেওয়া আর যে বা যাঁদের তিনি প্রেমের কবিতায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন তাঁরা হলেন -- 'অগ্নিবর্ণ', ' 'পাণ্ডু' এবং 'ধৃতরাষ্ট্র'। রঘুবংশম কাব্যে আমরা রাজা অগ্নিবর্ণকে পাই। সংযত দাম্পত্যজীবন যাপনকারী দিলীপ রঘু ও রামচন্দ্রের বিখ্যাত বংশে নিষ্ফল যৌন- যথেচ্ছাচার ও আনুষঙ্গিক সুরায় লিপ্ত হয়ে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুদর্শনের পুত্র বংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ। এসব কিছুকেই তিনি কাব্যে মধ্যবিত্তের আঙ্গিনায় এনে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

আসলে বারো বছরের সাহিত্য রচনার সীমানায় নগর জীবনের বিকার, হতাশা, নৈরাশ্য, বিক্ষোভ, স্খলন জীবনের চেতনার গভীরে প্রবেশ করে যার মানসিকতাকে করে তুলেছিল অস্থির, অকপট তিনি সমর সেন (১৯১৬-৮৭)। সমর সেনের চেতনায় সেই অস্থির বোধের সঙ্গে ছেয়েছিল সামাজিক সংঘাত, শ্রেণি সংঘর্ষ, নাগরিক জীবনের অবক্ষয়। আধুনিক কবিতার ভিত সবেমাত্র তৈরি হয়েছিল। তিরিশের কবিদের রবীন্দ্রোত্তর চিন্তা তাকে করতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়ার বাসনা নয়, রবীন্দ্র কবিতার ভাবকে অবলীলায় অতিক্রম করে কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা সমর সেনের কবিতায় খুব স্বতস্ফূর্তভাবেই এসেছিল।

এইকারণেই মধ্যবিত্ত জীবন, সমকালীন সমাজকে উপেক্ষা করে প্রেমের আত্মিক প্রকাশ তার কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় না। গতি, আশাবাদ, নান্দনিক দৃষ্টি কোনোটাই শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপড়েনকে ছাপিয়ে কবিতার বিষয় হয়ে ওঠেনি। ভাবের এই বৈপরীত্য রবীন্দ্রোত্তর কবিদের থেকে কিভাবে সমর সেনকে আলাদা আসন দিয়েছে তার অন্যতম উদাহরণ আলোচ্য কবিতাটি। কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই রবীন্দ্র কবিতার ভাবকে তিনি কবিতায় অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সমর সেন তা-ই আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

২০৫.৪.১৪.৫: আদর্শ প্রশ্নমালা

---

১. 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবি নগরজীবনের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

২. 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবি সমর সেন কীভাবে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি থেকে শান্তি পাওয়ার কথা বলেছেন?

৩. 'মহুয়ার দেশ' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

৪. 'একটি বেকার প্রেমিক' কবিতাটির ভাববস্তু আলোচনা করো।

৫. উর্বশী' কবিতায় কবি সমর সেন কিভাবে প্রথাগত সৌন্দর্যভাবনার বাইরে এসে মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তার পরিচয় দাও।

২০৫.৪.১৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

---

১) সমর সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা – অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক)।

২) আধুনিক কবিতার দিগ বলয় - অশ্রু কুমার সিকদার।

৩) আধুনিক বাঙলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায় - সুমিতা চক্রবর্তী।

৪) অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

পর্যায় গ্রন্থ: ৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক ১৫

শক্তি চট্টোপাধ্যায় – অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে, চাবি, সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়

বিন্যাসক্রম :

২০৫.৪.১৫.১ : কবিজীবনী

২০৫.৪.১৫.২ : অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

২০৫.৪.১৫.২.১: অন্তর্নিহিত ভাব

২০৫.৪.১৫.৩ : চাবি

২০৫.৪.১৫.৪ : সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়

২০৫.৪.১৫.৫: আদর্শ প্রশ্নমালা

২০৫.৪.১৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

২০৫.৪.১৫.১ : কবিজীবনী

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বহড়ু গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালের ২৭ নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম বামানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম কমলা দেবী। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান এবং দাদুর বাড়িতে বড় হন। তিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতার বাগবাজারে আসেন এবং সেখানে একটি স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলের এক জন শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি প্রথম মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রগতি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রগতি নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করা শুরু করেন পরে ওই ম্যাগাজিন বহ্নিশিখা নামে মুদ্রিত আকারে বের হয়।

১৯৫৬ সালের মার্চে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় তাঁর যম কবিতাটি ছাপা হয়। পরে তিনি কৃত্তিবাস ও অন্যান্য পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। এরই মধ্যে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য কোর্সে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি হন। কিন্তু এখানেও তিনি পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কের ইতি টানেন।

বাংলা সাহিত্যে স্থিতাবস্থা ভাঙার আওয়াজ তুলে, ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে, শিল্প ও সাহিত্যের যে একমাত্র আন্দোলন হয়েছে, তার নাম হাংরি আন্দোলন। আর্তি বা কাতরতা শব্দগুলো মতাদশর্টিকে সঠিক তুলে ধরতে পারবে না বলে, আন্দোলনকারীরা শেষাবধি হাংরি শব্দটি গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায়। শেষোক্ত তিন জনের সঙ্গে সাহিত্যিক মতান্তরের জন্য ১৯৬৩ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দেন। পরবর্তী কালে কৃত্তিবাসের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম সাহিত্যিক মহলে একত্রে উচ্চারিত হত, যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখক হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে, নাম 'কুয়োতলা'। কিন্তু কলেজ জীবনের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আড়াই বছর থাকার সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক জন সফল গীতিকবিতে পরিণত হন। নিজের কবিতাকে তিনি বলতেন পদ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে; হে প্রেম হে নৈশব্দ্য (১৯৬০), ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৭), সোনার মাছি খুন করেছি (১৯৬৮); অন্ধকার নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকার (১৯৬৮); হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯); চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৯৭০); পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি (১৯৭১); প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (১৯৭২); সুখে আছি (১৯৭৪); ঈশ্বর থাকেন জলে (১৯৭৫); অস্ত্রের গৌরবহীন একা (১৯৭৫); জ্বলন্ত রুমাল (১৯৭৫); ছিন্নবিচ্ছিন্ন (১৯৭৫); সুন্দর এখানে একা নয় (১৯৭৬); কবিতায় তুলো ওড়ে (১৯৭৬), ভাত নেই পাথর রয়েছে (১৯৭৯); আঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল (১৯৮০); প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (১৯৮১); যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮৩); কক্সবাজারে সন্ধ্যা (১৯৮৫); সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার (১৯৮৬); এই তো মর্মর মুর্তি (১৯৮৭); বিষের মধ্যে সমস্ত শোক (১৯৮৮); আমাকে জাগাও (১৯৮৯); ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে (১৯৯১); জঙ্গলে বিষাদ আছে (১৯৯৪); বড়োর ছড়া (১৯৯৪); সেরা ছড়া (১৯৯৪); টরে টক্কা (১৯৯৬); কিছু মায়া রয়ে গেল (১৯৯৭); সকলে প্রত্যেকে একা (১৯৯৯); পদ্যসমগ্র ১ম খণ্ড থেকে ৭ম খণ্ড ইত্যাদি।

কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ পুরস্কার ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালের ২৩ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

২০৫.৪.১৫.২ অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত কবিতাটি ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতায় কবির অরণ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভ্রমণকাহিনিতে বিবৃত হয়েছে অপূর্ব কাব্যিক ভঙ্গিতে। ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’-র অধিকাংশ কবিতাই সিংভূমের জঙ্গল কেন্দ্র করে। সিংভূম সদর চাইবাসা এবং তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর গল্প এতরকম ভাবে লেখা হয়েছে যে আর একবার শুধু ছুঁয়ে যাওয়া যেতে পারে। ’তবে শুধু সিংভূম নয়, বাংলার পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ি-বাঁশপাহাড়ি-কাঁকড়াঝোড় থেকে ডুয়ার্সের অরণ্যে কিংবা মধ্যপ্রদেশের পান্না, বান্ধবগড়, কান্‌হা-কিসলী থেকে অসমের কাজিরাঙা, সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ। কবির লেখায় অরণ্য ভ্রমণ প্রাধান্য পেলেও পাহাড়-সমুদ্র, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ম স্থান পর্যটনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে কবির ভ্রমণকাহিনির পাতায়। সার্বিকভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভ্রমণপিপাসু।

২০৫.৪.১৫.২.১: অন্তর্নিহিত ভাব

‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন ‘আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্য পাঠকদের হাতে’। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথে কবিতাটির নামকরণ নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়। সেই আলোচনায় উঠে আসা উত্তরগুলি এরকম: ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ মানে ‘ভালোতেও আছো খারাপেও আছে’, ‘এদিকেও আছো ওদিকেও আছো’, ‘অপরিবর্তনেও আছো পরিবর্তনেও আছো’, ‘ধর্মেও আছো অধর্মেও আছো’ ইত্যাদি। এরপর আসি ‘জিরাফ’ কেনো? জিরাফ বিবর্তনবাদের প্রতীক। বিবর্তন মানেই সময়ের পরিবর্তন। তাই ‘অপরিবর্তনেও আছো পরিবর্তনেও আছো’ এই অভিব্যক্তিটি এখানে খুব স্পষ্ট হয়ে যায়।

‘অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে’ কবিতাটিতে হৃদয়ের অদ্ভূত এককোণ উন্মোচিত। কবিতাটিতে অতীত ও বর্তমানের যুগপৎ সন্ধিক্ষণ বর্তমান। এখানে কবি অপ্রচ্ছন্নভাবে নিজের সুপ্ত স্বপ্নকেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেছেন এবং সমগ্র কবিতা জুড়ে সেই মায়াময় ভাবালাপ আমাদের চোখে পড়ে। কবির অধরা স্বপ্ন যেনো আকাশের জাজ্বল্যমান নক্ষত্র। যাকে স্পর্শ করা প্রায় অসম্ভব কারণ সেই উজ্জ্বল আলোকিত দিনগুলি আজ অতীত। স্মৃতির সারণি বেয়ে আজ তাই সে নক্ষত্র হয়ে শুধু উপস্থিতির জানান দেয়। যুগের অন্ধকারের কালিমায় সেসব মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু কবির মনে তার সুপ্ত আশা এখনো বর্তমান। তাই মাঝে মাঝেই সেই ভ্রমণপিপাসু মন হৃদয়ের কোণে তাকে ‘উজ্জ্বল চাঁদ’ ন্যায় লুকিয়ে রেখে গোপন পর্যটন করে ফেরে।

কবিতার প্রথম থেকেই দেখব অতীতের উজ্জ্বল দিনগুলির প্রতীক রূপে ‘দেয়ালি’র কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সেই দিন আর নেই। আলোকিত দিনগুলির নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কিন্তু সেগুলির মৃত চিহ্ন রূপে ‘ঝরা পাখা’, বালুচরের ‘চিকিচিকি মাছ’, পাখির ‘খসে যাওয়া পালক’ ইত্যাদিকে কবিতায় চিত্রায়িত করা হয়েছে। আসলে আমরা যদি একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, সাধারণভাবে আমরা আমাদের প্রিয় ঘনিষ্ঠ মৃত মানুষদের উপমায় ‘উজ্জ্বল নক্ষত্র’ এর উপমা ব্যবহার করে থাকি, সেক্ষত্রে কবিও তার এককালের দেখা প্রিয় আকাঙ্ক্ষা রূপ স্বপ্ন, যা আজ কালের অতলে তলিয়ে গেছে, তাকে তিনি এই উপমাতেই উপমিত করেছেন, এটা ভাবলে ভুল হবে না।

কিন্তু কবি আশাবাদী তিনি তার নক্ষত্ররূপ স্বপ্নকে নতুন দিশা দিতে চান —

এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন।
পৃথিবীর সমস্ত রঙ্গিন
পর্দাগুলি নিয়ে যাবো,নিয়ে যাবো শেফালির চারা
গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখীপাড়া-

নতুন জীবন যাকে কবি আগামী মহীরুহের 'কিশলয়' রূপে কল্পনা করেছেন। তাকে অত্যন্ত গোপনে সযত্নে লালন করছেন হৃদয়ে। জীবন মানে গতি, সেখানে স্থবিরতার কোনো জায়গা নেই। যেভাবেই হোক জীবনে বাঁচার রসদ জুগিয়ে রাখা। হতাশা, দৈনতা যখন নিত্যদিনের পাথেয় হয়ে উঠেছে সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নবীন সুগন্ধে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাতে তৎপর আগামী প্রজন্মকে। এ এক দুঃসাহসিক প্রয়াস । সময়ের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেও এক সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল ক্রম প্রয়াসের সাক্ষর রাখে আলোচ্য। তাই কবিতার নাম 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে' । অর্থাৎ তলহীন অতলে নিমজ্জিত যে আশার আলোক, সেই ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও তিনি নতুন দিগন্তে মুক্তি দিতে চান । এই প্রত্যয়েই কবি রুদ্ধশ্বাসে বলে ওঠেন —

ভুলে যেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে |

২০৫.৪.১৫.৩ : চাবি

'ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের অপর একটি কবিতা 'চাবি'। 'চাবি' কবিতাটি প্রথম 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

কবিতাটি পাঠ করতে গিয়ে আমাদের চোখের সামনে প্রতিবিম্বিত হয় একটি চিঠি। প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথনকে রূপকের আড়ালে একটি চিঠির আকার দিয়েছেন। এখানে কোনো আবেগতাড়িত সম্ভাষণ নেই। নেই কোনো সম্বোধন। একপ্রকার কৈফিয়ৎ এর ছলে কবি সরাসরি প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন,

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে

তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি

কেমন করে তোরংগ আজ খোলো?

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কবি তোরঙ্গ এবং তার চাবি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন? এর উত্তরও আমাদের ভাবনায় সহজেই এসে যায়, যে তোরঙ্গ আসলে প্রেমিকার হৃদয় বা মন আর তার চাবিকাঠি হলো কবির

ভালোবাসা। যা আজ অতীত। কিন্তু কবি মনে করেন সেই হৃদয়ের দ্বার উন্মোচনের ক্ষমতা একমাত্র তার হাতেই আছে। যে অসীম ভালোবাসায় তিনি তার প্রেমিকাকে আদৃত করেছেন, সে আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই তার প্রেমিকার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন সন্দেহাতীতভাবেই অসম্ভব। আসলে 'তোরঙ্গ' এবং 'চাবি' দুটোই রূপক। প্রেমাসিক্ত হৃদয়ের চিত্রকল্প রূপে কবিতায় তা পরিকল্পিত।

এরপরেই আসে কবির হৃদয়ে সদা জাগরুক প্রেমিকার সৌন্দর্যের বর্ণনা, যা ইঙ্গিত দেয় নতুন শুরুর। আবার নতুন করে হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যম রূপে তাই আসে চিঠির প্রসঙ্গ —

থুৎনিপরে তিল তো তোমার আছে
এখন? ও মন, নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো ।

পড়েই বোঝা যায় যাকে তিনি হঠাৎ বলছেন, এ আসলে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। একদিনের জন্য কবি প্রেমিক হৃদয় তাকে ভুলতে পারেনি, অপেক্ষা করেছেন প্রত্যাগমনের কিন্তু বাধ সেধেছে সময় এবং বিরূপ পরিস্থিতি। সেই খেয়ালেই আবার কবি হৃদয়ের গহন দ্বারে উঁকি মেরে প্রেমিকাকে ফিরে পেতে চান। সেই ব্যাকুলতাই প্রকাশিত —

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো —
লিখিও, উহা ফিরত্ চাহো কিনা?

চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় প্রেমিক কবি হৃদয়। অভিমানী মনের বেদনার্ত সুর কবিতার প্রত্যেকটি লাইনে বর্তমান। যে ভালবাসা কালের নিয়মে, বাহ্যিক সম্পর্কের সূত্রে প্রাক্তন, কিন্তু প্রেমিক হৃদয়ে তার কোনো রেখাপাত ঘটেনি। তাই খুব সহজ সুরে প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলে ওঠেন —

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরত্ চাহো কি না?

২০৫.৪.১৫.৪ : সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়

এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির মধ্যে সমকালীন যুগগত যে অস্থিরতা তা খুব স্পষ্ট। কবিতাটি শুরু হয়েছে 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,'। এই যে টলমল অবস্থা এ তো যুগকেই ইঙ্গিত করে, যেখানে শিক্ষিত বেকার যুবসম্প্রদায় শান্তির ঘুমের জন্য আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ফুটপাতে। যুব সমাজ অপসংস্কৃতির অবনমনের পাঁকে ক্রমশ জর্জরিত হয়ে পড়ছে। তাই ক্লান্ত পায়ে 'বাড়ি ফেরার

সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি. পায়ের ভিতরে পাপ, বুকের ভিতর বুক' সহ ঘরে ফেরে। অর্ধমগ্নচৈতন্যে যুগের রহস্য উন্মোচনে রত কবি তাই কবিতার নামেই কালের নির্মম সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কী সেই কাল এখন সেটাই দেখব।

বাংলা সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ ও অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে ওঠা তিরিশ-চল্লিশের দশক 'শাশ্বত' কাব্যভুবন ছেড়ে সমাজ ও ব্যক্তিচেতনার সংকটে জারিত হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিভিন্ন তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ, নানা ইউরোপীয় মতবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা অনিবার্য ভাবে বাংলা কবিতাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। আমরা ক্রমশ বুঝে নিতে শিখলাম শুধু অর্থ, কীর্তি কিংবা সচ্ছলতা নয়, আরও কোনও এক বিপন্ন বিস্ময়ে আমরা আক্রান্ত। এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সহবাস অনেকের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিজেকে একা করে দেয়। আর তখনই আলোড়িত ব্যক্তিচেতনা সামাজিক অবক্ষয়ের দর্পণে নিজের মুখ দেখে নেয়

এমনই এক সময়ের গর্ভ থেকে উঠে আসছে পঞ্চাশের দশক। উঠে আসছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যে সময় মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ, কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান পেরিয়ে কলকাতার বদলে যাওয়া ফুটপাথের চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করেছে চোখের সামনে। এ এমন এক সন্ধিক্ষণ, যেখানে তেরঙ্গার স্বাদ দ্রুত বদলে যায়। মুখ্য হয়ে ওঠে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' কিংবা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। এত দিন পর্যন্ত বোহেমিয়ান বলতে বুঝতাম 'মেঘে ঢাকা তারা'র শঙ্করদের। যাদের ভবঘুরে জীবনযাপনের পিছনে কোনও সচেতন দর্শক ছিল না। পঞ্চাশের দশক জন্ম দিল কয়েক জন সচেতন বোহেমিয়ান কবির, যাঁদের সমাজ-নির্লিপ্ততা, পারিবারিক দায়িত্বহীনতার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি উপস্থিত। বোহেমিয়ানিজম কথাটাকেই সে দিন নতুন করে দেখা শুরু হল যেন।

প্রথাবদ্ধ সময়কে প্রতিনিয়ত ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলা পঞ্চাশের দশক আরও নানা সাড়া জাগানো মুহূর্তকে আত্মস্থ করে নেয়। কলকাতা দেখে ফেলে কবি অ্যালেন গিনসবার্গকে। মধ্য রাত্রির শাসন কিংবা অরণ্যে দাপিয়ে বেড়ানো মুহূর্ত এক সময়ে ছুঁয়ে ফেলল হাংরি আন্দোলন। যদিও ১৯৬১ সালে শুরু হওয়া হাংরি জেনারেশনের অনিয়ন্ত্রিত স্পর্ধা বেশি দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। হাংরি বুলেটিনের ঘোষণা ছিল: মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত। কিন্তু সমসময় তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করেনি।

ইতিমধ্যে নেশা জাগানো বামপন্থী ঘরানার মধ্যেও ফাটল ধরতে শুরু করেছে। এক দল গণতান্ত্রিক অবস্থানের সঙ্গে অভিযোজনের পক্ষপাতী, আর একটি অংশ চরমপন্থী ভাবধারার খাদের কিনারায় পা রেখেছে। আর এরই মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে সত্তর ও আশির দশক। পত্রিকা, পোস্টার, এনকাউন্টার পেরিয়ে লাঞ্ছিত তারুণ্যের মোহভঙ্গ নাড়িয়ে দিচ্ছে বাঙালিকে। এ বার মধ্যবিত্তের চাহিদা খানিক সুস্থিত।

পঞ্চাশের সেই তরুণেরা আশির দশকে এসে জীবিকা ও সংসারের প্রয়োজনে গোছানো সময়ের প্রতিনিধি। প্রথম ও প্রধান ব্যতিক্রম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখনও প্রকৃতির মধ্যে পরিবারকে খোঁজেন। এক বিপুল

আত্মক্ষয়ের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলা শিকড়হীন সমাজের জরায়ুতে মিশে যেতে যেতে শেষ বার ছড়িয়ে দেন মুক্তোর মালা। দরজায় কড়া নাড়ে নব্বইয়ের দশক। কলকাতার কংক্রিট চেহারা ক্রমশ আরও কংক্রিট হতে থাকে।

তার পর, '৯৫-এর রাজকীয় প্রস্থানের পর, বাঙালি কবিতার পোশাক থেকে ঝেড়ে ফেলে বোহেমিয়ানিজমের ধুলো। সবাই নন, নিশ্চয়ই। কিন্তু যাঁরা নন, তাঁরা ব্যতিক্রম। ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকা ব্যতিক্রম। ইতিমধ্যেই বদলে যাচ্ছে পুরনো কলকাতা। শহর আরও বেশি করে শহরে পরিণত হচ্ছে। যে নাগরিকতা আমাদের স্তব্ধ করে দেয়, চূড়ান্ত কর্মব্যস্ত করে, চেতনাকে সীমায়িত করে ফ্ল্যাট কালচারের চার দেওয়ালের মধ্যে। বাঙালি তার চিরন্তন মেজাজি আড্ডার আলস্য ঝেড়ে ফেলে কেতাদুরস্ত হয়েছে। শুধু কবি নয়, সামগ্রিক বাঙালি মানসে বোহেমিয়ান সত্তা টিকিয়ে রাখার কোনও সম্ভাবনাও আর অবশিষ্ট নেই। সমসময়ে নানা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে থাকল ছোট ছোট প্রচুর কবি-গোষ্ঠী। এক সময়ে যেখানে নানা গোষ্ঠী বিভাজনে আদর্শগত দ্বন্দ্ব মিশে ছিল, সেই জায়গায় মুখ্যত প্রাধান্য পেতে থাকল পুরস্কার প্রাপ্তি কিংবা জনপ্রিয় পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের প্রসঙ্গ।

এ ভাবেই, সময়ের দাবি মেনে নিয়েই, কবিতা থেকে ক্রমশ মুখ্য হয়ে উঠছে কবি। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে 'এই রোকো' বলে রুদ্ধশ্বাস গতিকে থামানোর সাহস আজকাল আর কেউ রাখেন না। বদলে যাওয়া কবি ও কবিতার সংজ্ঞায় বোহেমিয়ান স্বভাব এখন অনেক বেশি শান্ত, ঋজু এবং পোশাকি। নিরাপদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতি পদক্ষেপের পিছনে কাজ করে নানা হিসেবনিকেশ। কবিকেও এখন প্রায় আধা চলচ্চিত্রতারকার মতো দেহসৌষ্ঠব, মুখশ্রী, ফিটনেসের প্রতি নজর রাখতে হয়।

সেখানে দাঁড়িয়ে, আকণ্ঠ মদ্যপানের পর দাপিয়ে বেড়ানো শহর কলকাতার অলিগলির নানা কিংবদন্তি জানিয়ে দেয়, আসলে মানুষ বড় কাঁদছে। সেই কান্নায় সাড়া দিয়ে হয়তো কোনও এক দিন রূপকথার গল্পে ভর করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের দেওয়াল ভেঙে আবার দেখা হবে মানুষের সঙ্গে। যে কিনা অনায়াসে বলতে পারবে

'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ/ ফুটপাথ বদল হয়...'

আসলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামের মানুষটিই ছিলেন এক দুর্জেয় রহস্যের আধার। এত বৈপরীত্যে ছিল তাঁর চরিত্রে ভাবা যায় না। দুর্মর রোমান্টিকতা দিয়ে যার শুরু শেষ করেছেন বাস্তবতা দিয়ে। একদিকে যেমন ছিলেন চরম বেহিসেবী বিপরীতে হিসেবীও যে ছিলেন না জোর করে তাও কি বলা যাবে। এরকম 'সংসারে একদিকে সন্ন্যাসী লোকটা, অন্যদিকে গৃহী মানে গেরস্ত "সুখে আছি'র পাশাপাশি যে 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয়" কখনো চরম শক্তি সাধক আবার কখনো পরম বৈষ্ণব। এভাবে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ বা বিশ্বাসের এমন জলজ্যান্ত উদাহরণ আর একজন ভূমণ্ডলে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এমনকি কাব্যগ্রন্থের নামকরণে ও সেই একই দ্বিধা 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো।'

২০৫.৪.১৫.৫: আদর্শ প্রশ্নমালা

১. ‘অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে’ কবিতাটির ভাববস্তু আলোচনা করো।

২. ‘চাবি’ একটি রূপকধর্মী কবিতা –বিশ্লেষণ করো।

৩. ‘সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়’ কবিতাটিতে সমসাময়িক কালগত প্রভাব খুব স্পষ্ট — ব্যাখ্যা করো।

২০৫.৪.১৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

---

১. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

২. দশক পঞ্চাশ ও তিন কবি – তরুণ মুখোপাধ্যায়।

৩. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় –দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৪. কালের পুতুল – বুদ্ধদেব বসু।

পর্যায় গ্রন্থ: ৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক ১৬.

শঙ্খ ঘোষ – বাবরের প্রার্থনা, হেতালের লাঠি , আত্মঘাত

বিন্যাসক্রম :

২০৫.৪.১৬.১ : কবিজীবনী

২০৫.৪.১৬.২ : বাবরের প্রার্থনা

২০৫.৪.১৬.২.১: কবিতার বিষয়বস্তু

২০৫.৪.১৬.২.২: অন্তর্নিহিত ভাব

২০৫.৪.১৬.২.৩: ইতিহাস চেতনা

২০৫.৪.১৬.৩ : হেতালের লাঠি

২০৫.৪.১৬.৩.১: কবিতার বিষয়বস্তু

২০৫.৪.১৬.৪ : আত্মঘাত

২০৫.৪.১৬.৪.১ উৎস সূত্র

২০৫.৪.১৬.৪.২ ভাববস্তু

২০৫.৪.১৬.৫: আদর্শ প্রশ্নমালা

২০৫.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

২০৫.৪.১৩.১: কবিজীবনী

শঙ্খ ঘোষ (জন্ম, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২; মৃত্যু, ২১শে এপ্রিল ২০২১) এক জন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য সমালোচক। তিনি এক জন বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞও। তাঁর প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। যাদবপুর, দিল্লি ও বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনাও করেছেন। বাবরের প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, এ আমির আবরণ, উর্বশীর হাসি, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনায় নিয়মিত প্রতিক্রিয়া জানানো ও পথে নামার মধ্য দিয়ে শঙ্খবাবু আজও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির বিবেকের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন।

আমাদের এই সময়টাকে সবদিক দিয়ে সর্বার্থে জড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁরই কথায়, ‘শিকড় দিয়ে আঁকড়ে’ আছেন। তাই কবি শঙ্খ ঘোষ-এর কোনও বিশেষ পরিচয় হয় না। তাঁর অস্তিত্বই তাঁর পরিচয়। বাংলা কবিতায় প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি তৈরি করে নিয়েছেন এমন এক পথ, যে-পথে স্বল্প যাত্রী, যে পথে সামান্য আলো জ্বলে। সমালোচনায় নিয়ে এসেছেন সর্বজনবোধ্য এক জ্ঞানচর্চার দিশা, সংক্রামকভাবে বারবার সাড়া দিয়েছেন সংকট সময়ে।

তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য বই-এর মধ্যে রয়েছে: আদিম লতা গুল্মময়, মূর্খ বড়, সামাজিক নয়, কবির অভিপ্রায়, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, বাবরের প্রার্থনা, এ আমির আবরণ, জার্নাল, লাইনেই ছিলাম বাবা, ধূম লেগেছে হৃৎকমলে, গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ ইত্যাদি।

২০৫.৪.১৬.২: বাবরের প্রার্থনা

অধিকাংশই যখন চলমান সমাজের গতানুগতিকায় গা ভাসিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে অনির্দেশ্য পথে স্রোতের কুটোর মতো ছুটে চলে, তখনো কোনো কবি ছল ছল চোখে জেগে থাকেন। কেঁপে কেঁপে ওঠেন সময়ের ভবিতব্যে, শিউরে ওঠেন তাদের বেঘরো মানসিকতায়, পাঁচের দশকে সেই জেগে থাকা, কেঁপে ওঠা, শিউরে ওঠা কবি শঙ্খ ঘোষ। ‘বাবরের প্রার্থনা’র অন্তরালে সকল পিতার আত্যান্তিক প্রার্থনার শব্দ উচ্চারণ করেছেন। শান্তি, শান্তি, সুস্থ, ভালোবাসা ও সুখের প্রচেতনায় স্তব্ধতার এই কবিতা নিঃসন্দেহে আমাদের বাংলা কবিতার অঙ্গনে সজীব সংযোজন।

২০৫.৪.১৬.৪.২.১: কবিতার বিষয়বস্তু

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ ‘বাবরের প্রার্থনা’র নাম কবিতাটি আমাদের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় একটি সম্পূর্ণ মুঘল ইতিহাস উন্মোচিত হয়ে যায়। সে ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং বাবর। যিনি তার বাহুবল কূটনীতি ও আধুনিক সমরাস্ত্রের প্রয়োগে এই ভারতের ইতিহাসকে কণ্টকিত, কলঙ্কিত ও গৌরবদীপ্ত করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ এই কবিতার প্রাণকেন্দ্রে ইতিহাসের মূল সত্যটুকুকে স্থান দিয়ে বাকিটুকু কল্পনার রসে

রাঙিয়ে নিয়েছেন। আবুল ফজল উল্লিখিত বাবরের জীবনী ইতিহাস থেকে বাবর-পুত্র হুমায়ুনের অসুস্থতার সংবাদটুকু সংগ্রহ করে বিষয়টিকে নামিয়ে এনেছেন দেশ-কাল-পাত্রভেদে পৃথিবীর সকল পিতার কোমল হৃদয়ে। পিতার সন্তানস্নেহের যে কোনো বিকল্প হতে পারে না, এবং তা পৃথিবীর প্রতিটি পিতার হৃদয়েই সমানভাবে গুরুত্ব পায়। এই বিশেষ স্পর্শকাতর ব্যাপারটিকে কবি শঙ্খ ঘোষ অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানসিক আবেদনে পুষ্ট করেছেন।

কবি শঙ্খ ঘোষ ইতিহাসের অনালোচিত দিকটিকেই তার কবিতার কথ্যবস্তু করেছেন। সম্রাট বাবর দিনে ক'বার নামাজ পড়তেন বা তিনি কতবেশি ধর্মভীরু ছিলেন যে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। তবে এটুকু সত্য বাবর তার পুত্রের অসুস্থতার জন্য চিন্তিত হয়েছিলেন। কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে বাবর জানু পেতে পশ্চিমদিকে মুখ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনায় বসেছেন। বাবর তার সন্ততির সুখের জন্য নিজের ধ্বংস বা মৃত্যু কামনা করছেন। যদিও ব্যাপারটি অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক যে কারো পরমায়ু অন্য কারোর পরমায়ুর সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ করা যায়। জীবন-মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায়ভার ঈশ্বরের। তবুও বাবরের একান্ত ইচ্ছা যে আর পুত্র তার পরমায়ুর দৌলতে যেন বেঁচে থাকে।

বাবর তার পুত্রের উজ্জ্বল যৌবন মূর্ছা যাওয়ার জন্য যারপরণায় অনুতপ্ত। তিনি অনুভব করছেন কোনো এক গোপন দুষ্ট রোগ তার সন্তানের পরমায়ু, যৌবনের সব রঙ নষ্ট করে দিচ্ছে অহরহ। তার পুত্রের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে মৃত্যুর কালো দৃপ্ত দাগ, তার ফুসফুস, ধমনী, শিরা সব যেন অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং তার যন্ত্রণাজনিত প্রতিচ্ছবি তার সন্তানের চোখে মুখ ফুটে উঠছে—এই দৃশ্য পিতা হয়ে বাবরের পক্ষে সহনশীলতার ঊর্ধ্বে।

বাবর চাইছেন শহরে, গ্রামে, প্রান্তরে দিকবিদিক প্রতিধ্বনিত হোক আজানের ধ্বনি। যে আজান গান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প বা বৈদেশিক আক্রমণের প্রাক্কালে সমস্ত মানুষকে একযোগে তার প্রতিরোধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার উন্মাদনা জাগায়, বাবর এখন তাই করতে চাইছেন। তাঁর সন্তানের মৃত্যু-প্রায় অবস্থা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের চাইতে কম নয়। বাবর এক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাইছেন। কিন্তু এতে একটা তাঁর শর্ত আছে, সেটি হল তার পুত্রের অনন্ত যৌবন, পুত্রের প্রাণ।

সম্রাট পিতা বাবর প্রচণ্ডভাবে অনুতপ্ত এই ভেবে যে তাঁর পুত্রের এই মরণোম্মুখ অবস্থার জন্য তার নিজের পাপ কর্ম দায়ী। তিনি নিজেকে তাই ধিক্কার দিতে পিছপা নন, বাবর তাঁর নিজের বর্বর জয়ের উল্লাসে আজ নিজের ঘরে মৃত্যু ডেকে এনেছেন। এই রাজ্যজয়মূলক পাপ বা অপকর্মের জন্য তার পুত্রের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বাবর ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ জানাতে প্রার্থনায় বসেছেন। ঈশ্বরকে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন যে কারো পাপের পরিণতি অন্যের ওপর বর্তায় কীভাবে। শুধু তাই নয় বর্তমান সম্রাট বাবরের বিজয়োল্লাসে ভরা রাজপ্রসাদের আলোর রোশনায় পবিত্র, নিষ্পাপ, মানুষের হৃদয়, হাড় পুঁড়িয়ে দেয়। আলোকপ্রিয় পতঙ্গেরা যেমন আলোক স্পর্শ করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে ফেরে বাবরের রাজপ্রাসাদের আলোর দ্যুতি কি শেষ পর্যন্ত তার নিজের ছেলেকেই পুড়িয়ে দিল। এরকম নানা অনুশোচনামূলক উক্তি সম্রাট পিতাবাবর করে গেছেন। তাঁর সৃষ্ট রাজকীয় প্রসাদের অসামান্য

বৈভব ও সুখের উপকরণের বিনিময়ে এবং নিজেকে আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে যদি তার প্রিয় পুত্র দীর্ঘজীবন ও সুস্থজীবন লাভ করে তাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়। শেষপর্যন্ত বাবর তার পুত্রের সুখের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে বাবরকে কোনো রাজ্যলোভী সম্রাট হিসেবে না দেখে বরং পুত্রের সুখের জন্য নিজের জীবন বিসর্জনে অটল এক সাধারণ পিতাকে দেখে আমরা চমকিত ও আশ্চর্য হই। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বাবরের এই মাত্রাতিরিক্ত অপত্য স্নেহ আমাদের চোখের সামনে পিতা-পুত্রের ভালোবাসার এক ভুলে যাওয়া শিক্ষার নবীকরণ ঘটাতে পারি। কবিতার সার্থকতা এখানেই।

২০৫.৪.১৬.৪.২.২: অন্তর্নিহিত ভাব

মননে - মেধায় ঋদ্ধ, অথচ আধুনিক যে কবির ভাষা জলের মত স্বচ্ছ ও সঙ্গীতের মূর্ছনায় পাঠকের হৃদয় ও মনকে একই সঙ্গে আন্দোলিত করে বশীভূত করে ফেলে তাঁর নাম শঙ্খ ঘোষ। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেও স্বপ্নবিলাসী ও আদ্যন্ত নিসর্গ প্রেমিক এই মানুষটি ইতিহাসকে তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন বারবার। বস্তুতঃ তাঁর কবিতায় আমরা ইতিহাসকে দেখি বিপন্ন বর্তমানের আর্তির মাঝে। 'বাবরের প্রার্থনা'কবিতাটি তাঁর এই জাতীয় কবিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এক শঙ্কাতুর পিতা তাঁর রোগাক্রান্ত সন্তানের আরোগ্য প্রার্থনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনারত, যিনি প্রয়োজনে নিজ আয়ু প্রদান করেও সন্তানের সুস্থতা কামনা করেন। আলোচ্য কবিতায় কবি এমনই এক ইতিহাসের ধূসর ছবিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন। কবিতাটিতে কবির কালচেতনা ও ইতিহাস চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মুক্তির দশক হিসেবে চিহ্নিত সত্তরের দশকের তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা , হত্যালীলা - দেশকে ও দেশের যুবকদের ঠেলে দিচ্ছিল মৃত্যুর দিকে। একই সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতিতে দেখা দিয়েছিল চরম অস্থিরতার বাতাবরণ। বিবেকী কবি এই অস্থিরতার আবহে ব্যক্তিগত ভাবনাকে সমষ্টিগত রূপ প্রদান করে ইতিহাসের সেই শঙ্কাতুর পিতার মত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানান তাঁর সন্ততিদের সুস্থ জীবন প্রদান করতে।

ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও,
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কবির নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তার আরোগ্যলাভ ডাক্তারদের সাধ্যের বাইরে। এই পরিস্থিতে ইতিহাসের পদচারণায় তাঁর স্মৃতিপটে রোগশয্যায় শায়িত হুমায়ূনের ছবি ফুটে ওঠে এবং বাবরের মত তিনিও প্রার্থনা করেন তাঁর কবিতায়। তবে সেই প্রার্থনা কেবলমাত্র আত্মজার জন্য নয়, যুগের সমস্ত লাঞ্ছিত, স্বপ্নছিন্ন সন্তানের জন্য।

কবিতায় ব্যবহৃত 'বসন্ত'শব্দটি আনন্দ ও যৌবন - উভয় দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি কবি অস্তগামী সূর্যের আভাস, শূন্য বসন্ত —এই দুয়ের ইঙ্গিতে জানিয়েছেন—এই যুগ, এই কাল কিছু চায়। সন্ততির স্বপ্ন পূরণের

প্রার্থনার মধ্যে তা তাঁর আত্ম প্রক্ষেপও বটে। সন্তানের মাধ্যমে চরিতার্থ হতে চায় মানুষ; যে সাধ-বাসনা কবির একার নয়, সর্বজনের। সুদূর মধ্যযুগের অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনীর "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"- র সার্থক রূপ যেন বাঙময় হয়ে ওঠে শঙ্খ ঘোষের অসামান্য মিথ কথনের ভঙ্গিতে। সত্তর দশকের রক্ত বারুদে মাখা দিনগুলিতে সন্ততির সুখে থাকার এক আন্তরিক প্রার্থনা ফুটে ওঠে তাঁর কণ্ঠ এবং কবিতায় এবং তিনবার ধ্রুবপদের মতো ব্যবহৃত হয় – "আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক" - পংক্তিটি।

দ্বিতীয় স্তবকে কবি যখন উচ্চারণ করেন -

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয় !

তখন পিতা বাবরের সঙ্গে কবির খেদ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পদাঘাতে ভাঙতে চায় পথের সকল বাধা। সেইসব যুবকদের সমূহ পরাভব কোনমতেই মানা যায়না। কবি শঙ্খ ঘোষ লক্ষ্য করেছেন আজকের যুবকদের ফুসফুস-ধমনী-শিরা বিষিয়ে গেছে। তাদের আরোগ্য দরকার। সেই কারণেই তার প্রার্থনা শহরে, প্রান্তরে, ধূসর শূন্যে 'আজান গান'ধ্বনিত হোক। কবি শঙ্খ ঘোষ কিংবা সম্রাট বাবর তাদের জীবন, প্রাণচঞ্চলতা অনায়াসে দান করে দিতে চান যাতে সন্তান সুস্থ - সুন্দর ও স্বাভাবিক থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জীবনানন্দ দাসের কথা, যিনি 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'নির্দেশ করেও 'ভালো মানব সমাজ'গড়ার স্বপ্ন দেখেন। কবি শঙ্খ ঘোষও তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা'- কে করে তোলেন এই বিপন্ন সময় ও সমাজের তীব্র আকুতি।

২০৫.৪.১৬.৪.২.৩ : ইতিহাস চেতনা

'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক জীবন কাহিনি। ১৫২৯ সালে মোঘল সম্রাট বাবর গোগরার যুদ্ধে বাংলা বিহারের আফগান রাজশক্তিকে পরাজিত করে নিজে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিলেন। রাজ্যবিজয়ের আনন্দ ও উন্মাদনায় তিনি যখন মাতোয়ারা ঠিক সেই সময়টিতেই খবর আসে তাঁর ২১ বছরের সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র হুমায়ুন অত্যন্ত অসুস্থ। রাজ্যবিজয়ের সমস্ত আনন্দ নিমেষে ম্লান হয়ে যায় সম্রাটের কাছে। আল্লাহর কাছে নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্র হুমায়ুনের জীবন প্রার্থনা করেন বাবর। কথিত আছে, এই ঘটনার পরে পুত্র হুমায়ুন নবজীবন লাভ করলেও সম্রাট বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঐতিহ্যের প্রথানুগ এবং কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের আর্তি, পরম্পরাগত বিকাশের সঙ্গে লগ্ন করে শঙ্খ ঘোষ যেমন বিন্যস্ত করেন, তেমনটি বোধ হয় আধুনিক কবিদের আর কারো রচনায় পাওয়া সম্ভব নয়। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি এমন বিরল নিষ্ঠা ছিল বলেই ইতিহাসের পরম্পরাগত অবকাশ অনেকক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। 'বাবরের প্রার্থনা'কবিতাটির পশ্চাতেও বাবরের শেষজীবন ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত কাহিনিটি রূপকথার ন্যায় বিন্যস্ত।

আবুল ফজল বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক এই কাহিনিতে, সম্রাট বাবরের সন্তুতির জন্য আকুল প্রার্থনাকে উপজীব্য করেই কবি শঙ্খ ঘোষ নিজের সন্ততির জন্য প্রার্থনায় উন্মুখ হয়েছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রার কাছে প্রার্থনা জানাতেই তিনি আজ পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন। আসলে ব্যক্তি কবির আত্মচিন্তা ও সম্রাট বাবরের ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপুঙ্খ কোনো এক অদৃশ্য সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়, যখন দেখি প্রিয় কন্যার লাবণ্যহীন মুখ, শীর্ণ রোগগ্রস্ত দুটি চোখের কোণে পরাভবের কালো আঁধার ঘনীভূত। একই সঙ্গে ডাক্তারের অসহায়তা। ভালো করে ধরতে পারছেন না তিনি অসুখটা কোথায় ? ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সন্তানের আরোগ্য কামনায় বাবরের আত্মদানের মহতী ভাবনা কবির মনে আসে। অবশ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের এই অসহায়তাই নয়, অনুজের জন্য আত্মজের জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মের দিশাহীন নীরব অবক্ষয়ের জন্যও কবির প্রার্থনা ভাষামূর্তি পেয়েছে কবিতাটিতে।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে নয়, সম্রাট বাবর তার পিতৃসত্তার চরম প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন আত্মজের রুগ্নতাকে নিজ শরীরে ধারণ করে। ঐতিহাসিক কাহিনির প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বময় আর্তিটিকেই মনে রেখেছিলেন কবি। তাই সমকাল, ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক-সামাজিক টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজন্মবাহিত অবক্ষয় কবিকে প্রাণিত করেছিল সন্ততির সুস্থতা ও আরোগ্য কামনায়। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সন্ততিকে সুস্থ দেশ-কাল, নীরোগ শরীরের উজ্জ্বল প্রাণময় রূপ ফিরিয়ে দিতে চান তিনি। কবি অনুভব করেছেন দেশের তরুণ সম্প্রদায় যাদের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে একটি উজ্জ্বল ভারত, তাদের স্বচ্ছ সুন্দর যৌবন আজ অপসৃয়মান। কোনো এক গোপন ক্ষয়ে জীবনের সমস্ত প্রবাহ যেন স্তব্ধ করে দিতে চায় তাদের তারুণ্য। জীবনের সমস্ত পরাভব তাদের চোখের কোণে বিছিয়ে দিয়েছে অন্ধকারের ছায়া। বসন্তের সমস্ত শূন্যতার মাঝখানে, ধূসরতার বিবর্ণ প্রেক্ষিত জুড়ে কবি আজান গানকে গীত হতে দেখতে চান। কারণ আজান গান আসলে প্রার্থনার সাঙ্গিতিক আবহ রচনা করে। পশ্চিম দিগন্তে আজানের সুর ধ্বনিত হোক এমনটাই চেয়েছিলেন কবি। কারণ এই আজানের সুরই সম্রাট বাবরকে এনে দিয়েছিল সন্ততির সুস্থ জীবন। কবি ভেবেছেন তার শরীরে, রক্তকণায় হয়তো এতদিনের নিরন্তর পাপ বীজাণু হয়ে সুপ্ত ছিল। নানা সামাজিক রাজনৈতিক জয়ের বর্বর উল্লাসে আজ সেই বীজাণু পরবর্তী প্রজন্মের রক্তকণায় ছড়িয়ে গিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল সম্রাট বাবরের ক্ষেত্রে। জয়ের আনন্দে উদ্বেল হয়ে বিলাসিতার প্রবল প্রশ্রয়েই যেন উৎসবের আলোর ঝলকানি ব্যাধিগ্রস্ত সংখ্যাহীন ভয়ঙ্কর পতঙ্গকে ঘরে ডেকে এনেছে। তাইতো কবির দ্বিধাহীন স্পষ্ট উচ্চারণ -

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

সাম্রাজ্য জয়ের প্রবল আনন্দে উল্লসিত বাবর প্রাসাদ শিখরে যে বিলাসিতার ভোগ্যপণ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, সেই অবিলতাই মৃত্যুবাহী পতঙ্গের নির্মম আবির্ভাব হয়ে নিজের সন্ততির শরীরে ক্ষয় ধরিয়ে দিয়েছিল—

নাকি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার পরও যেমন বাবরের পক্ষে সন্তান হুমায়ুনের যন্ত্রণা সহ্য করা অসম্ভব, আর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু তো আরও বেশি দুর্বিষহ এবং কল্পনাতীত। পিতা তার উত্তরাধিকারীর জন্যই এই পৃথিবীর যাবতীয় অর্জন সঞ্চিত করে রেখে যান। বাবরের এই প্রভূত সম্পদ, সাম্রাজ্যবিস্তারের দুর্নিবার বাসনা তো উত্তরাধিকারীর জন্যই। কিন্তু হুমায়ুনের এই ব্যাধিগ্রস্ত দেহ, ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পিছনে সম্রাট বাবর কীভাবে যেন প্রভূত জয়ের পিছনে পরাজয়ের নির্মম ভ্রুকুটির অনিবার্য ফল লক্ষ করেছিলেন। বুঝেছিলেন সন্তানের মৃত্যু কতখানি দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে তার জন্য। ঈশ্বরের কাছে তাই তার নিঃশর্ত আকুতি —

ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কিন্তু এই আত্মবিসর্জন সে সফল হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। একটি দ্বান্দ্বিক আবহ যে রয়েছে একথা বলা যায়। কারণ এই অপরাধ বা পাপ ব্যক্তির দ্ব্যর্থসীমায়, বিচ্ছিন্নতায়, এবং আত্মমগ্নতায় নিবদ্ধ। একক সুখের নিশ্চিন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় উৎপন্ন যে পাপ সেই পাপ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন কবি সকলের সঙ্গে মিশে, এক যৌথ জীবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। কবিতাটিতে নামাজের আজানের অনুসরণ দেখানো হয়েছে। যে আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ছেন বা আজান গানে আকাশ ভরিয়ে তুলছেন তার জীবনের বসন্তদিন আজ শূন্য হয়ে গেছে। ঈশ্বরের কাছে জানু পেতে রসে নিজের সন্তান, এই দেশ-কাল-সমাজ সংসারের প্রতিটি তরুণ প্রাণের জন্য নিজের সবকিছু উজার করে দিতে চান তিনি। এই সন্তান যেমন মানুষের অস্তিত্ব বা বংশ পরম্পরার ধারণা ঠিক তেমনি অজস্র তরুণ প্রাণ, (এই দেশ, এই কাল যার শরীরে পাপের বীজাণু ছড়িয়ে দিয়েছে) সেও পূর্বসূরির ঐতিহ্য পরম্পরার ধারক। তাই শুধুমাত্র সন্তানের সীমায়িত ধারণায় নয়, পরবর্তী মানুষ ধরার জন্য, নিজের চিন্তা, সাধনা, সময়কে ধরে রাখবার আর্তিতেই নিজের জীবন বিসর্জনের এমন আকাঙ্ক্ষা। আত্মলোপের এই শপথ যার জন্য নিয়েছেন কবি অথবা সম্রাটরূপী বাবর, তার স্বচ্ছ যৌবন বিনষ্ট। পরাভবের গ্লানি ও ক্ষয় তার জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ফুসফুস ধর্মনী-শিরা যার বিষিয়ে উঠেছে।

কবিতাটির অন্তিম অংশে সম্রাট বাবর তথা কবি, সর্বোপরি ভারতের সমকালীন প্রেক্ষিতের সকল প্রাজ্ঞ মানুষের মনে একই প্রশ্ন জাগে। কেন এই ক্ষয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের সমস্ত স্বপ্ন, তাদের জীবন যৌবন কেন এই ব্যর্থতার

চোরাবালিতে হারিয়ে গেল। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আরও একটু পিছিয়ে যেতে হয়, মনে পড়ে মধুসূদনের সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথা—'মরে পুত্র জনকের পাপে'সম্রাট বাবরের শরীরের পাপ না ঐশ্বর্যের পাপ পুত্র হুমায়ুনের জীবন দীপ নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, তবে একটি স্ববিরোধ তিনি প্রকৃতিগত ভাবেই সম্রাট সত্তার পরতে পরতে লালন করেছিলেন। নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, নিজের পুত্রকে রক্ষার জন্য মসজিদের নতজানু প্রার্থনা গান উচ্চারণ করলেও সহস্র সহস্র প্রাণ সংহারের নির্মম খেলায় যুদ্ধক্ষেত্র রক্তাক্ত করেছেন তিনি। ষড়যন্ত্র করেছেন গোপনে। ওই মৃত্যুই যেন ফিরে ফিরে আসে পূর্বসূরি থেকে উত্তরসূরিতে এক প্রজন্ম থেকে অন্যপ্রজন্মে। কবির ভাষায়—

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই প্রাণ নেই ভবিষ্যের ?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে এ

বাবর নিজে এ প্রশ্নের উত্তর জীবিতকালে পাননি। কিন্তু একথা অনুভব করেছিলেন সন্তান যদি না-ই থাকে, তাহলে সকল ঐশ্বর্যই অর্থহীন বিড়ম্বনা। তাই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও পুত্রের মানুষের জীবন ও স্বপ্নকে জাগিয়ে রাখতে চাইছেন তিনি। এই যে আত্মবিলোপ, পরবর্তী প্রজন্মের মাটিকে শক্ত করে দেবার জন্য এই যে আত্মঅবক্ষয়, এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ব। কবিতাটির আঙ্গিকে মনুষ্যত্ব বোধের চরম পূর্ণতাকে বাবরের দ্বন্দ্ব বিক্ষত জীবন পরিক্রমায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। কবিতাটির নিবিড় পাঠে সমকালীন দেশীয় অবক্ষয়ের চোরাস্রোত-নকশাল আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলির অবলেশও ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু মানুষের হিতকর কার্যে আত্মবিসর্জনের যে মর্মান্তিক অথচ মনুষ্যত্বপূর্ণ ঐকান্তিক প্রেরণা তা ইতিহাসনিষ্ঠ সম্রাট চরিত্র বাবরের প্রার্থনায় সম্পূর্ণ ও অখণ্ড হয়ে উঠেছে। ইতিহাস চেতনার এমন সর্বব্যাপী প্রসারণে কবিতাটি আমাদের অতীত ঐতিহ্যেরও সার্থক প্রেরণা হয়ে উঠেছে একথা বলা যায়।

২০৫.৪.১৬.৩: হেতালের লাঠি

শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। পরে এটি 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আঠারোটি চরণে বিন্যস্ত এই কবিতাটি দুটি স্তবকে বিভক্ত।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এইসব অভাবনীয় ঘটনায় সাড়া দিতে গিয়ে তিনি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় এক মান্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। আর এ কেবল গদ্যেই নয়, কবিতায় তিনি ছিলেন একই রকম প্রখর ও জাগ্রত। আমাদের আলোচ্য 'হেতালের লাঠি'তেও সেই ধারাবাহিকতা বর্তমান। সামাজিক বৈষম্যকে চোখে আঙুল দিয়ে শুধু দেখিয়েই থেমে থাকেননি তার উপর প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে বিদ্রুপের তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। সতর্ক করেছেন সেইসব কুচক্রীদের যারা স্বার্থের জন্য সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে নিজেদের পাপের বোঝা বৃদ্ধি করছেন —

হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পক নগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারিদিকে।

২০৫.৪.১৬.৩.১: কবিতার বিষয়বস্তু

শঙ্খ ঘোষের কবিতা বহুমাত্রিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। আবেগ, মনস্তত্ব, বোধির সঙ্গে নানা রূপকে, নানা সঙ্কেতে উঠে আসে শ্লেষ, প্রতিবাদ। আবার কখনও লোককথার আঙ্গিকে বর্ণিত জটিল তত্ত্ব। এই জায়গাতেই শঙ্খ ঘোষ অনন্য। সরল ভাষায় জগতের চরম সত্য তুলে ধরতে সক্ষম তিনি। কখনও প্রেমিক, কখনও শিক্ষক স্বরে বলে ওঠেন... 'মেঘের কোমল করুণ দুপুর/ সূর্যে আঙুল বাড়ালে-/ তোমাকে বকব, ভীষণ বকব/ আড়ালে।' আসলে এই আড়ালটুকুর প্রয়োজন শুধু কবিতার ছন্দে নয়, প্রয়োজন জীবনে, প্রয়োজন মানুষের ভালবাসায়, যাপনে। প্রেম আড়ালে নিরাপদে সুরক্ষিত রাখবার জন্যই উচ্চারিত হয় 'তোমায় নিয়ে যাব অন্য দূরের দেশে'। চিরকাঙ্খিত এই আড়াল যখন দুর্লভ হয়ে ওঠে, তখন প্রয়োজন হয় 'হেতালের লাঠি'র।

বর্তমানের সমস্যা, বৈষম্য, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক রূপে তিনি বেছে নিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ বণিক ও তার হেতালের লাঠিকে। চাঁদসদাগর ও তার হেতালের লাঠি দুটোই অনমনীয়তার প্রতীক। মধ্যযুগের কাব্যের অন্যতম পুরুষকার হলেন চাঁদ সদাগর। হেতালের লাঠি তার সেই বিজয়ের গর্ব। নির্ভীক চাঁদ ও তার হেতালের লাঠি যেন প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ এই কবিতায়—

হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।

কবি হেতালের লাঠিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। মনসামঙ্গলে বিবাদের কারণে চাঁদসদাগরের পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু হয় প্রেমের প্রথম প্রহর বাসর রাতে কালনাগিনীর দংশনে। বিশ শতকে আটের দশকে দাঁড়িয়ে কবি এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অশুভ শক্তির হাত থেকে আজকের নিরপরাধ বেহুলা-লখিন্দরকে বাঁচাতে তৎপর। তাদের প্রেমের প্রহরে দিতে চান শুভ ভবিষ্যতের আশ্বাস—

আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে

সমগ্র কবিতায় কবি যেন প্রেমের প্রহরী হয়ে জেগে থাকেন হেতালের লাঠি হাতে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ বণিকের মত, যেন রাত্রির কোনও ফণা এসে না কুণ্ডল করে প্রেমের শিয়রে। এই কবিতায় প্রেমের জয়গানের পাশাপাশি প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান সময়ে এবং সভ্যতায় কি অতীতের মতই বারে বারে খর্ব হয় প্রেমের অধিকার? প্রেমের আসন কি কলঙ্কিত হয় 'নাগিনীপিচ্ছিল' অন্ধকার রাতের হিসেবি আঙুলের স্পর্শে? আশাবাদী কবি প্রেমকে জিতিয়ে দিতে চান; তাই 'চম্পকনগরে কানীর চক্রান্ত' ব্যর্থ করে দেওয়ার শপথ উচ্চারিত হয়।

২০৫.4.১৬.4 : আত্মঘাত

শঙ্খ ঘোষের 'আত্মঘাত' কবিতাটি তাঁর রচিত 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

২০৫.4.১৬.4.১ উৎস সূত্র

এই কবিতাটির বিষয়বস্তুর উৎসে আছে এক হৃদয়বিদারক সত্য ঘটনা — পঁচিশে বৈশাখের ভোরবেলায় গ্রাম থেকে আসা একটি তরুণ ছাত্র শান্তিনিকেতনে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে কবি শঙ্খ ঘোষ কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে আসা সমস্ত শিক্ষার্থীহৃদয়ের সার্বিক মুখ রূপে এই কবিতাটিতে তার প্রতিবিম্বন ঘটিয়েছেন।

২০৫.4.১৬.4.২ ভাববস্তু

তীব্র অপমানে আত্মঘাতী শান্তিনিকেতনের এক গ্রাম থেকে আসা ছাত্রের বেদনাকে কবিতায় প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর প্রথমেই মনে পড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়তে আসা গ্রামীণ ছাত্র দের কথা, যারা জাঁকজমকের শহর কেন্দ্রে এসে নিজেদের "সন্তর্পন দূরত্বে প্রচ্ছন্ন রাখার আয়োজনে বিব্রত থাকে"। তাদের মধ্যে সুদূর পদ্মাপার থেকে কলকাতার অভিজাত কলেজে পড়তে আসা প্রথম যৌবনের নিজেকেও খুঁজে পান তিনি। তাই শান্তিনিকেতনের সেই ছাত্রের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দেন যাদবপুরের সেই ছাত্রদের আর অনেকদিন আগের প্রথম যৌবনের নিজেকে "বুঝি না কখনো ঠিক এরা কোন নিজের ভাষায়/ কথা কয়, গান গায়, কী ভাষায় হেসে

ওঠে এরা/ পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিঃশ্বাস, সজলতা/কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ।” ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিময়তার অভিঘাত মিশে থাকলেও আমাদের বিশ্বাস এক ছাত্রদরদী অধ্যাপকের মরমী সত্তার সৃষ্টি এই কবিতাও।

পরবর্তী সময়ে পরিণত বয়সে 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'-র অধ্যাপক কবি কোন আড়াল রাখেন না আর। ছাত্র তার সন্তান, অকালে ঝরে যাওয়া সেই সন্তানের জন্য মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের মতোই মহাকালের ত্রিশূল এর আঘাত বুকে নেওয়া শোনিতাক্ত পিতার হাহাকার ঝরে পড়ে তাঁর কবিতাগুচ্ছের প্রতিটি ছত্রে-

আমার ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে। গ্রামের অশথ
মনে পড়ে। তাকে আর এনো না কখনো এইখানে।
এইখানে এলে তার হৃদয় পাণ্ডুর হয়ে যাবে
এইখানে এলে তার বিশ্বাস বধির হয়ে যাবে
বুকের ভিতরে শুধু ক্ষত দেবে রাত্রির খোয়াই।

এই ভাবেই চরম বেদনায় একবিংশ শতাব্দীর এক বুদ্ধিজীবী শিক্ষক পিতা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনায় প্রশ্ন তুলেছিলো। কারণ রবীন্দ্রনাথের তৈরি শিক্ষায়তনে এই ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত। তিনি বিশ্বাস করতেন অহং শূন্য অনাড়ম্বর নিরলস অধ্যাবসায়ের আদর্শক্ষেত্র রূপে বিশ্বভারতী ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান রূপে সকলের কাছে জয়মাল্য পরিধান করবে। অথচ কবির জন্মতিথিতেই এই শিক্ষার্থী ছাত্রের আত্মঘাত সবকিছুকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দেয়—

এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ?
এ কোন জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে?
এ তো আমাদের কোনো যোগ্য ভূমি নয়, এর গায়ে
সোনার ঝলক দেখে আমাদের চোখ যাবে পুড়ে।

পঁচিশে বৈশাখ এবং বাইশে শ্রাবণ আর আত্মঘাত মিলে যায়! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিশ্বমানের কবিই শুধু নন, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি সমন্বয়ের পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। গ্রাম-শহর, মেঠোপথ-রাজপথ সহ ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত মানুষকে এক সূত্রে গাঁথা মালার ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জাতীয় গীত রচনা করেছিলেন। যা তিনি নিজের জীবনাদর্শে পোষণ করতেন। তাঁর আদর্শে সমগ্র

ভারতবাসী বৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর সম্ভাবনার দিকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলে। এই নিহিত উজ্জ্বল আদর্শের শান্তিনিকতনে তরুণ ছাত্রের এই আত্মঘাত কে কেন্দ্র করে এযুগের কবি শঙ্খ ঘোষ সমকালের শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁক এবং আলোর রোশনাইয়ের পিছনে অন্ধকারকে সামনে এনেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন 'এখানে' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রাণের গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কিভাবে আগামী প্রজন্ম আলো খুঁজে পাবে! যেখানে নিয়ত অপমান! ভর্ৎসনা আত্মসমালোচনা একইসঙ্গে বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয় প্রতিবাদের স্বর —

আমার পৃথিবী নয় এইসব ছাতিম শিরীষ
সব ফেলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, শুধু জেনো
আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব
পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।

২০৫.৪.১৬.৫: আদর্শ প্রশ্নমালা

১। 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় ইতিহাস চেতনার যথার্থতা নির্ণয় করো। কবির কোন মানসিকতার এখানে ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

২। মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে কবি শঙ্খ ঘোষ নতুন ভাবে ব্যবহার করেছেন 'হেতালের লাঠি' কবিতায় — বিষয়টি পর্যালোচনা করো।

৩। 'আত্মঘাত' কবি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা বিশ্লেষণ করো।

২০৫.৪.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শঙ্খ ঘোষ – কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং।

২. শঙ্খ ঘোষ – কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ।

৩. বুদ্ধদেব বসু – প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং।

৪. পিনাকেশ সরকার – রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, প্যাপিরাস।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

দ্বিতীয় সেমেস্টার

B-CORE-206

রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সভাপতি
২. অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩. অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৪. অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫. ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৬. ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৭. অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম — বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০২২

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Manas Kumar Sanyal, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পাঠ্যক্রম

পত্র - B-CORE - 206

শিরোনাম : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায়গ্রন্থ : ১ সূর্যাবর্ত – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দশটি নির্বাচিত কবিতা) (সময় : ৩ ঘণ্টা)

(অহল্যার প্রতি, উর্বশী, সাধারণ মেয়ে, আফ্রিকা, দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া, আমি,বাঁশি)

একক ১. অহল্যার প্রতি, উর্বশী

একক ২. দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া

একক ৩. সাধারণ মেয়ে,বাঁশি,আমি, আফ্রিকা

পর্যায়গ্রন্থ : ২ রক্তকরবী (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৪. শিরোনামের তাৎপর্য

একক ৫. চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের দায়বদ্ধতা

একক ৬. রূপক-সাংকেতিক নাটক

একক ৭. নাট্যপরিণতি

পর্যায়গ্রন্থ : ৩ গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত ১০টি গল্প) (সময় : ৫ ঘণ্টা)

দেনপাওনা, পোস্টমাস্টার,ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিতপষাণ, স্ত্রীরপত্র, হালদারগোষ্ঠী,
তিনসঙ্গী (রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি)

একক ৮. ‘গল্পগুচ্ছ’ : বর্গীকরণ – সাধারণ পরিচিতি

একক ৯. হিতবাদী পর্ব

একক ১০. সাধনা ও ভারতী পর্ব

একক ১১. সবুজ পত্রের গল্প

একক ১২. শেষ পর্যায়ের গল্প

পর্যায়গ্রন্থ : ৪ গোরা (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

একক ১৪. চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

একক ১৫. গোরার জন্মবৃত্তান্ত : উপন্যাসে তার গুরুত্ব

একক ১৬. বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

সূচিপত্র

B-CORE-206

সপ্তম পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠপ্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	অহল্যার প্রতি, উর্বশী	ড. রাজশেখর নন্দী	১-১০
	২.	দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া	ড. রাজশেখর নন্দী	১১-২২
	৩.	সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, আমি, আফ্রিকা	ড. রাজশেখর নন্দী	২৩-৩৪
পর্যায় গ্রন্থ ২	৪.	রক্তকরবী শিরোনামের তাৎপর্য	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫-৩৬
	৫.	চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের দায়বদ্ধতা	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭-৪০
	৬.	রূপক-সাংকেতিক নাটক	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১-৪৩
	৭.	নাট্যপরিণতি	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪-৪৬
পর্যায় গ্রন্থ ৩	৮.	গল্পগুচ্ছ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৪৭-৫০
	৯.	হিতবাদী পর্ব	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৫১-৫৫
	১০.	সাধনা ও ভারতী পর্ব	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৫৬-৬৩
	১১.	সবুজ পত্রের গল্প	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৬৪-৬৭
	১২.	শেষ পর্যায়ের গল্প	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৬৮-৭৪
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১৩.	গোরা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৭৫-৮০
	১৪.	চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৮১-৮৫
	১৫.	গোরার জন্মবৃত্তান্ত : উপন্যাসে তার গুরুত্ব	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৮৬-৮৮
	১৬.	বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৮৯-৯২

পর্যায় গ্রন্থ-১

সূর্যাবর্ত

নির্বাচিত ১০টি কবিতা (অহল্যার প্রতি, উর্বশী, সাধারণ মেয়ে, আফ্রিকা, দু:সময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া, আমি, বাঁশি)

একক ১

অহল্যার প্রতি, উর্বশী

বিন্যাসক্রম

৭.১.১.১ : ভূমিকা

৭.১.১.২ : 'মানসী'-কাব্য পরিচিতি।

৭.১.১.৩ : কবিতা পরিচয়—অহল্যার প্রতি

৭.১.১.৪ : 'চিত্রা'—কাব্য পরিচিতি

৭.১.১.৫ : কবিতা পরিচয়—উর্বশী

৭.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.১.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজী ১৮৬১ খ্রি: ৭ই মে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য, আত্মচরিত,সঙ্গীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লেখনী চালনায় বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের স্মরণে মননে -শোণিত স্রোতে রয়েছেন। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, দৈনন্দিন জীবনে তিনি আমাদের অন্যতম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম এর মানবমুখিনতা। তাঁর প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী' ১৮৭৮ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্য 'শেষলেখা' (১৯৪১) মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার গৌরব প্রতিটি পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে শুধু দেবতার আসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই চলবে না। প্রতিটি রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠককে চেষ্টা করতে হবে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে যে জীবনের সঠিক দিশা রয়েছে তা উপলব্ধি করার। যদিও প্রতিটি পাঠকের রুচি ও মানসিকতা আলাদা। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ব্যক্তির জীবনধারণ পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সংকলন 'সঞ্চয়িতা' এর বহু বছর ব্যাপী জনপ্রিয়তার পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯ খ্রি: শঙ্খ ঘোষের

সংকলনে ও সম্পাদনায় রবীন্দ্র কবিতা সংকলন 'সূর্যাবত' প্রকাশ করলেন। 'সূর্যাবর্ত' সংকলনের সূচনায় শঙ্খ ঘোষ বলেছেন—''বইয়ের নামটির জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধের কাছে আমার ঋণ। সুধীন্দ্র-অনুসরণে রবীন্দ্র শতবর্ষের একটি প্রবন্ধ সংকলনও যে ছাপা হয়েছিল এই নামে, সে কথাও এখানে স্মরণযোগ্য।" এই গ্রন্থটিতে ছোট-বড় নানা কবিতা স্থান পেয়েছে। আবার 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থে যে সব কবিতা আছে, 'সূর্যাবর্ত' গ্রন্থে সেই সব কবিতার পুনরাবৃত্তিও হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় ২৭২ টি কবিতা এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। তার থেকে নির্বাচিত ১০টি কবিতা আমাদের নির্দিষ্ট পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্র কাব্যধারায় আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি কিছুটা ব্যতিক্রমী অবশ্যই। ঐ কবিতাগুলি পাঠ করে আমরা বিশ্বকবিকে নতুনরূপে আবিষ্কার করতে সমর্থ হই। আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে কবির জীবনচেতনার স্বরূপ যেমন জানা যাবে, তেমনি কবির জীবনের সমগ্রতার ও সৌন্দর্যবোধের সন্ধান মিলবে। এখন আমরা আমাদের পাঠ্য কবিতাগুলিকে তিনটি এককে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। একক-১ এর মধ্যে 'অহল্যার প্রতি' (মানসী ১৮৯০), 'উর্বশী' (চিত্রা ১৮৯৬) কবিতা দুটি। একক-২ এর মধ্যে 'দু:সময়' (কল্পনা ১৯০০), কৃপণ (খেয়া ১৯০৬), 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' (গীতাঞ্জলি ১৯১০), 'ঝড়ের খেয়া' (বলাকা ১৯১৬) কবিতাগুলি আলোচনায় স্থান পাবে। আর একক-৩ এর মধ্যে 'সাধারণ মেয়ে' (পুনশ্চ ১৯৩২), 'বাঁশি' (পুনশ্চ ১৯৩২), 'আফ্রিকা' (শ্যামলী ১৯৩৬), 'আমি' (শ্যামলী ১৯৩৬), এই চারটি কবিতার আলোচনায় অগ্রসর হবো।

৭.১.১.২ : মানসী কাব্য পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কবি। কবি নিজের জীবনধারণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করেছেন। সমাজ জীবনে বিভিন্ন সমস্যা যেমন দেখেছেন, তেমনি—নিজের জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সন্ধান ও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব অল্প বয়সে (৭-৮) কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কাব্যগুলির পরে তাঁর 'মানসী' (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যগুলিতে বিশ্বকবির সৌন্দর্যতত্ত্ব লক্ষণীয় বিষয়। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রবেশ দ্বার হলেও 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য থেকেই কবি কাব্য সফলতা অর্জন করেছেন। 'মানসী' কাব্য লেখার সময় কবি 'গাজিপুরে' বসবাস করতেন। ফলে সেখানকার পরিবেশ—পরিস্থিতি কবির কল্পনাকে কাব্য রচনায় প্রভাবিত করেছিল। এমনকী তখন থেকেই কবির জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। 'মানসী' কাব্যে যেমন প্রেমের কবিতা লক্ষণীয়, তেমনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবিতা ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কাব্য থেকেই অনুভব করা যায় ''কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিলেন।"

৭.১.১.৩ : কবিতা পরিচয়—অহল্যার প্রতি

আমরা জানি ভারতীয় পুরাণে বিশেষত 'রামায়ণ' মহাকাব্যে অহল্যা ছিলেন ঋষি গৌতমের পত্নী। দেবরাজ ইন্দ্র, গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে অহল্যার প্রতি আসক্ত হলেন। একদিন গৌতম মুনি কুটির থেকে স্নান করতে গেলে তার অনুপস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার কুটিরে প্রবেশ করেন। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর দেবরাজ ইন্দ্র যখন কুটির থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন গৌতম মুনির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে গৌতম

মুনি রুষ্ট হয়ে অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন। অহল্যা সেই অভিশাপের দ্বারা পাষাণী হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমোচন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রামায়ণ' মহাকাব্য থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিকে তাঁর মৌলিক কল্পনার দ্বারা নতুনভাবে অঙ্কন করেছেন। সর্বোপরি বলা যায় 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় অদ্যাবধি লাঙল দেওয়া হয়নি এমন জমিকে তিনি কর্ষণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। কবিতাটির প্রথমেই বিশ্বকবি বলতে চেয়েছেন—

> ''কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
> অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
> নির্বাপিত—হোম-অগ্নি তাপস বিহীন
> শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
> বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ—
> তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?''

পাষাণী অহল্যাকে কবি হলচালনার অযোগ্য অনুর্বর জমির প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন। ভারতবর্ষের কৃষকেরা অনুর্বর জমিতে শত পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও ফসল ফলাতে পারে না। এমনকী সেই অনুর্বর জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও জল প্রয়োগ করলেও কাজের কাজ কিছু হয় না। সব পরিশ্রম বৃথা হয়ে যায়। কেননা সেই মাটি যে রুক্ষ-শুষ্ক ও কৃষিকাজের উপযুক্ত নয়। কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন, তা হল পরিবেশ -পরিস্থিতিতে শত সংকট থাকলেও একদিন সেই ঘোর সংকট দূরীভূত হয়ে যাবে। তারজন্য অবশ্যই প্রতিটি মানুষের যেমন সদ ইচ্ছা থাকতে হবে তেমনি কর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিতে হবে। 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিতে ঐ অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য পরিণত করার জন্য রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার প্রাণ সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের ইচ্ছেতেই সেই অনুর্বর জমি আবার শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠেছে। কবিতায় দেখা যায়, কবি বলেছেন—

> ''যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
> ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি।
> আপনার বক্ষ-'পরে, দু:খশ্রম ভুলি
> ঘুমাত অসংখ্য জীব- জাগিত আকাশ-
> তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
> বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক।
> মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি জীব স্পর্শ সুখ—
> কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে?''

আমরা জানি, আমাদের এই গ্রহে তিনভাগ জল, আর একভাগ স্থল। তাই প্রকৃতি প্রেমিকদের তো মুখ ফিরিয়ে থাকা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রকৃতি প্রেমিক কবির যে প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের একাত্মতা থাকবে তা আমরা 'অহল্যার প্রতি' কবিতা পাঠ করলেই বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি প্রেম এক কথায়

বিশ্বানুভূতি। আর ঐ অনুভূতির ঠিক পরিচয় না পেলে এ জাতীয় কবিতা বোঝা বেশ মুশকিল। কবি এখানে অহল্যাকে বসুন্ধরা বা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ গ্রন্থে, প্রমথনাথ বিশী আমাদের আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন— "অহল্যা বসুন্ধরা, আর কেহ নহে। বসুন্ধরা জীব মাত্রেরই জননী, কিন্তু এক সময়ে সে লালনশীলা, স্নেহময়ী, অন্নদায়িনী ছিল না; সে অহল্যার মতোই অভিশপ্ত ও বন্ধ্যা ছিল— মেরুতে মরুতে ও নির্বান্ধব আদিম অরণ্যে শ্বাপদ সংকুল দুর্গম ভীষণতায়। কিন্তু এই অভিশাপ কাটাইয়া এখন বসুন্ধরা জননী হইয়া প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে জীব মাত্রকেই আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে কবি 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় তুলে ধরেছেন—

"যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে-
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্য রূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্রের' ভাষায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির জন্মান্তরের সম্বন্ধটি নির্জন নিসর্গে মুখোমুখি হলেই বোঝা যায়। এখানেও তেমনি বসুন্ধরার সঙ্গে কবির সম্পর্কটি 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি বলেছেন—

"যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলক প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরু দিগ্বিজয়ে।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অহল্যার অভিশাপ এখনো শেষ হয়নি, সে কেবলমাত্র রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে সমর্পণ করেছেন। এরপর সুদিন আসবে, তিনি অভিশাপ জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাবেন। মুক্ত হওয়ার পর নতুন জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে নব জন্মলাভ করবেন। কবি রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ এই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, এতদিন ধরে পাষাণী অহল্যা কিভাবে দিন গুজরান করলেন। এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমরাও। সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিত থেকে বিষয়টি দেখলে পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষদের দুর্বিষহ যন্ত্রণা কবি নিজের চোখে দেখেছিলেন। সমাজের সর্বত্রই হাহাকার তখনকার দিনের সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের অবস্থান কোথায়? বা এই সংকট থেকে ভারতবাসী কবে মুক্তি পাবে! তা কেউই বলতে পারে না। তবে ভারতবাসীর বহুবিধ সমস্যা থেকে একদিন যে পরিত্রাণ মিলবে, তাতে সকলেই আশাবাদী। এমনকী ব্রিটিশ সূর্য একদিন পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী হবে তার অপেক্ষায় সমস্ত ভারতবাসী দিন গুনেছে। এই কবিতায় কবি বলেছেন—

“চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরল ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।”

আসলে বিশ্বানুভূতি যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের আসল রহস্য তা জোর দিয়েই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতায় পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতার কথা বলেছেন। পৃথিবীতে সবুজ ঘাসে, শরতের আলোতে, সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গে নিশ্চুপ ও নিরিবিলি ভাবে পড়ে থাকার কথা বলেছেন। ‘বসু’ শব্দটির অর্থ হল প্রাণের ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্য। আর তাকে যিনি ধরে আছেন, তিনিই বসুন্ধরা। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় এই প্রাণের সম্যক প্রকাশ প্রকৃতি জগতে। তাই প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকে ঐ বসুন্ধরার সঙ্গে নি:শেষে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“এক বৃন্তে। বিস্মৃতি সাগর-নীলনীরে
প্রথম ঊষার মতো উঠিয়াছে ধীরে
তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চির পরিচয়—মাঝে নব পরিচয়।”

রোমান্টিক কবি ধর্মের সব লক্ষণ কবিতাটির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবি চিত্তে বারবার ধরা পড়েছে। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, কবির মনে মানসীকে পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। ‘রবীন্দ্র-পরিক্রমা’ গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “ ‘মানসী’ তে (১৮৯০) এই রহস্যচ্ছায়া আপতিত হয়েছে, প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতিমারূপে দেখা দিয়েছে। একদিকে প্রকৃতি সম্পর্কে সুদূর রহস্যময়তার উপলব্ধি, অপরদিকে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক যাপন -দুয়ে মিলে মানসী কাব্য এই নবতর সৌন্দর্যচেতনায় উন্নীত।” (পৃ. ২১১) আর ঐ কাব্যেরই ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় কবি প্রকৃতির সার্বিক লীলাময় রূপটি অঙ্কন করেছেন। তিনি নিজের আত্মার মধ্যে মন-প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে নিতে চাইলেন। রাত্রির অবসানে পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হবে, এই আশাতে অনুর্বর জমিতে চাষের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। অনেক দিন ধরে যে জমি পড়ে থাকে, সেখানে নানা পশু-পক্ষীর চলার আঘাতে

ও মানুষের পায়ের আঘাতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। তারফলে শক্ত জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলার জন্য অনেকবার সেই শক্ত জমিতে লাঙল দিতে হয়। তারফলে উর্বর সার ও জল প্রয়োগ করে ফসল উৎপন্ন করতে হয়। তেমনি পড়ে থাকা জমিকে চাষের কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে সমাজ-সভ্যতার বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তাও এই কবিতার উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রকৃতি চেতন কবি সেই শাশ্বত জীবন প্রবাহের সত্যতায় আস্থাশীল। যে প্রকৃতি কবির অনুভবের মধ্য দিয়ে এক আনন্দ ধারা বর্ষণ করেছে। তাই কবি অনুভব করেছেন-তার সঙ্গে মা ধরিত্রীর সম্পর্ক বহুদিনের। 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিকে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশী 'সোনারতরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতার প্রথম খসড়া বলে মনে করেন।

৭.১.১.৪ : চিত্রা—কাব্য পরিচিতি

'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের মধ্যে বিশ্বকবির মানস প্রেরণাদাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়াও কবির ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয় বিষয়। এমনকী 'চিত্রা' কাব্যের কবিতাগুলিতে সুখ-দু:খ, প্রেম ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার লীলা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি বলা যায় 'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা ও ব্যক্তিগত জীবন দুইই সমান তালে চলেছে। 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ গ্রন্থে'- প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"সোনারতরীতে কবি প্রতিভার যে দ্বন্দ্ব ও যে পরিণামের দিকে প্রাগ্রসর গতি দেখিলাম, চিত্রাতে তাহা পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত কবির প্রতিভা সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা পর্যন্ত এই পরিণামের দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে।" কবি তাঁর প্রতিভার যাদুতে সমস্ত শৃঙ্খল যেমন উন্মোচন করেছেন তেমনি বিশ্বজগৎকে নিজের জীবন দর্শনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছেন। তিনি উপনিষদ থেকে আনন্দের মূলতত্ত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছিলেন। আবার এই কাব্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই কবির মানসিকতায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন দিক লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কবি আপন জীবনের মর্মবাণীকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'চিত্রা' কাব্যের প্রথম কবিতা 'চিত্রা'-য় জীবনধর্মের দুটি দিককে প্রকাশ করেছেন —প্রথমটি হল

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিনী।'

আর দ্বিতীয়টি হল— "অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।"

৭.১.১.৫ : কবিতা পরিচয়—উর্বশী

'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হল 'উর্বশী'। কবিতাটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কবি মনে করেন একদিকে রূপলোক, অপরদিকে অরূপলোকে উর্বশীর অবস্থান। আসলে উর্বশী যে কে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। এই উর্বশী ইন্দ্রের ইন্দ্রানী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও নয়। তার কি স্বরূপ, তার কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে রবীন্দ্র পাঠকেরা দ্বিধাগ্রস্ত। অনেকেই

মনে করেন উর্বশী কী স্বর্গের নর্তকী না দেবলোকের অমৃত পান সভার সখী, তাও স্পষ্ট নয়। আবার কেউ মনে করেন নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ 'উর্বশী' তারই প্রতীক। এই প্রসঙ্গে 'চিত্রা' নামক কবিতাটির উপলব্ধি একাধারে অন্তর্মুখী ও বর্হির্মুখী হয়ে ধরা পড়েছে। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন—"জগতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিচিত্ররূপিনী মানসসুন্দরীকে, অন্তরের মধ্যে জীবনদেবতাকে। এই যুগলমূর্তির ধ্যানে বসেও রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো তাঁর জীবনে সত্য দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি, এঁরা তাঁরই আপন, মনের বাসনা ও কল্পনা দিয়ে গড়া মূর্তি।" (পৃ. ৪৭)

'উর্বশী' কবিতায় কবি বলেছেন—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহ প্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্র পাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।"

কেননা আমাদের কাছে উর্বশী মাতা, কন্যা, বধূ নয়। সে কেবল সুন্দরী রূপসী। মর্ত্যে সে বাস করে না, তার বাসস্থান স্বর্গ উদ্যানে। উর্বশী আমাদের পরিবারের বধূদের মতো শ্রান্ত দেহে, নত মস্তকে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায় না। এমনকী সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে নিয়েও পরিবারটির প্রতি কোনরকম মঙ্গলারতি করতে সে অভ্যস্থ নয়। সর্বোপরি বলা যায় পরিবার -পরিজনদের প্রতি উর্বশীর কোন দায়বদ্ধতা নেই, কোনদিন ছিলও না। আমাদের পবিবারের নব বধূদের মতো দ্বিধায় জড়িত নয় উর্বশীর পদযুগল। শুধুমাত্র প্রভাতের প্রথম আলোকের মতো উর্বশী অনবগুণ্ঠিতা এবং অকুণ্ঠিতা।

কবিতার ভাব ও রূপের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতো গভীরভাবে সচেতন ছিলেন, তা আমরা কবিতাটি পাঠ করলেই অনুভব করতে পারি। কবির ধারণায় উর্বশীর রূপ কবিতাটিতে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা হল—

"বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিল মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।"

তাহলে কী উর্বশী বোঁটা ছাড়া ফুলের মতো পিতৃপরিচয়হীন ভাবে প্রকৃতি জগতে ফুটে উঠেছিল! কাব্যের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নিপুণতা ও সচেতনতা দেখিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবুও আমাদের মনে হয় পুরাণে আমরা পাই সমুদ্র মন্থণকালে ডানহাতে সুধাপাত্র এবং বামহাতে গরলের পাত্র নিয়ে তিনি আবির্ভূতা। সেই পরিস্থিতিতে মহাসিন্ধু অনন্ত সৌন্দর্যময়ী উর্বশীর পদপ্রান্তে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো শান্ত হয়ে পড়েছিল। কুন্দফুলের ন্যায় সুন্দর ও শ্বেতাঙ্গী উর্বশী দেবরাজের বন্দনার যোগ্য। আবার প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উর্বশী প্রকৃতির মধ্য থেকেই আবির্ভূতা। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় প্রকৃতির কথা যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনি উর্বশীর রূপ বর্ণনায় তাঁর সকল পরিচয় ও মুদ্রিত হয়েছে। তাই কবি চিরযৌবনা, উর্বশীর বালিকা বয়সের খোঁজ খবর নিতে কৌতুহলী হয়েছেন। উর্বশী সমুদ্রের তলদেশে কিভাবে ছিলেন, কার সঙ্গে খেলা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা উর্বশী শাশ্বত যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রতীক। কবিতাটির ভাবের প্রতিধ্বনি দেখা যায় এইভাবে—

"কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী,
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা!
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে!
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে-গঠিতা,
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।"

যুগ যুগ ধরে উর্বশী সারা বিশ্বের প্রেয়সী হয়ে বিরাজমান। কেননা তার রূপ সৌন্দর্য দেখে পুরাণের কত মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। মুনিগণ 'আনন্দ মদিরা ধারা' পান করে উর্বশীকে কামনা করেছেন। আর উর্বশীর সৌন্দর্য সুধা পান করে তারা মত্ত হয়ে গেছেন। সেই পরিবেশ -পরিস্থিতি লক্ষ্য করে জীবনপ্রেমিক কবিরা ভ্রমরের ন্যায় উর্বশীর দিকে ধাবিত হয়েছেন। এই অনন্ত সৌন্দর্যকে চিরকালের অধরা বলেই তিনি অপ্রাপনীয়া।'চিত্রা' কাব্যে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। আসলে প্রকৃতি চেতনার, সৌন্দর্য পিপাসার এক অতি আশ্চর্য প্রকাশ কবিতাটিতে লক্ষণীয়। উর্বশীর অনাবিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়া মূর্তিটির পরিচয় নিতে পারি এই ছত্র কয়টি থেকে—

"সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল। "

আসলে উর্বশী হলেন মুক্তবেণী বিবসনা। বিকশিত বিশ্ববাসনারূপ পদ্মের ফুলের উপর তিনি বিরাজমান। তাঁর অনাবিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়া মূর্তি কবি অনুভব করেছেন। উর্বশী কবিতায় কবি বলেছেন—

"স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা।"

আমাদের মনে হয়, উর্বশীর যুগ আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তার জন্য সমস্ত বিশ্বজগৎ হাহাকার করেছে, তাঁর কান্নায় চরাচর আপ্লুত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্বশীর প্রথম সকালের রৌদ্র করোজ্জ্বল দেহখানি আর কোনদিনই দেখতে পাওয়া যাবে না। এমনকী যে গৌরব শশী অস্ত গেছে, তাও আর ফিরে আসবে না। রোমান্টিক কবিদের কাছে পূর্ণিমা রাত্রে, জ্যোৎস্নাধারায় বিকিরণের মধ্যে কত স্মৃতি জেগে ওঠে, তবু সে প্রাণহীন প্রতিমা। কবি জানেন, এই প্রকৃতির মানুষের সুখ-দু:খ বিষয়ে উদাসীন। এই প্রকৃতি জগতে মানুষের আবেগের কোন মূল্য নেই। অথচ রক্ত মাংসের পৃথিবীতে প্রতিটি নারীকে মনে হয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তারা সুনিপুণা হয়ে পরিবার -পরিজনকে ভালোবাসা দিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাই পৃথিবীর নারীরা আমাদের একান্ত আপনজন, ভালোবাসার ধন। আর যে প্রকৃতিতে উর্বশী নারীর আবির্ভাব, সেখানে ভালোবাসা নেই বললেই চলে। সেই প্রকৃতি বড়ই নির্মম ও নিষ্ঠুর। উর্বশী হলেন সেই প্রকৃতি জগতের অধিবাসিনী।

"প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে।"

সমালোচকেরা মনে করেন উর্বশী নামে নারীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উষার বর্ণনামাত্র এ কবিতার মূল লক্ষ্য নয়। সর্বোপরি বলা যায় অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই কবির মূল লক্ষ্য। আর সেই আলোর বা তাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি জগতে বীজ থেকে চারাগাছ জন্মায়, তারপর সেই চারাগাছ থেকে বৃক্ষে পরিণত হওয়া। এমনকী ফুল থেকে ফল, আবার ফল মাটিতে পড়ে তারপর বীজ অঙ্কুরিত হওয়া। এই যে জীবন প্রবাহ বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শূন্য থেকে শুরু আবার পরিবর্তনের ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কক্ষপথে আবর্তন। সবই কবির কাছে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই প্রেরণারই এক নারীরূপ চিত্তলোকে ধারণ করে আছেন উর্বশী কবিতায়। 'উর্বশী' কবিতায় কবি বলেছেন—

"ফিরিবে না, ফিরিবে না-অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী!
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উর্বশী' কবিতার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য-আকাশ-পৃথিবী সব কিছুই নারীর সৌন্দর্যে মহিমময় করে দিয়েছিলেন। 'উর্বশী' আসলে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। মানব জীবনে সুখ যেমন চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না, দু:খই হল চিরন্তন। তবু মানুষ সব কিছুকে মেনে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবুও

এক অবিচ্ছেদ্য আনন্দের টানে অনুভূতিশীল মানুষ তাঁর 'জীবনের সার্থকতা আস্বাদ পায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যে বেঁচে থাকার জন্য রসদ পায়, আনন্দ পায় এমনকী প্রেরণা পায়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার শেষেও তিনি বলেছেন—

"কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল -করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।"

উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবটি পুরূরবা-উর্বশী কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেছেন। সেখানে দেখা যায় উর্বশীর মিলন বৈদিক পুরাণেও ক্ষণস্থায়ী। কেননা মিলন হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার মধ্যে বিরহ দেখা দিয়েছে। কবি 'উর্বশী' কবিতায় সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ দেখিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা 'উর্বশী' কবিতার মূল লক্ষ্য।

৭.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়

২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

৩। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। রবি-রশ্মি— চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয়খণ্ড—সুকুমার সেন

৬। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী

৭। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

৭.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অহল্যার প্রতি কবিতার প্রকৃতিচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। অহল্যার প্রতি কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

৩। 'উর্বশী' কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

৪। 'উর্বশী' কবিতার সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

—::—

একক ২

দু:সময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া

বিন্যাসক্রম

৭.১.২.১ : ভূমিকা

৭.১.২.২ : ‘কল্পনা’—কাব্য পরিচিতি।

৭.১.২.৩ : কবিতা পরিচয়—দুঃসময়

৭.১.২.৪ : ‘খেয়া’—কাব্য পরিচিতি

৭.১.২.৫: কবিতা পরিচয়—কৃপণ

৭.১.২.৬ : ‘গীতাঞ্জলি’ —কাব্য পরিচিতি

৭.১.২.৭ : কবিতা পরিচয়—সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে

৭.১.২.৮ : ‘বলাকা’—কাব্য পরিচিতি

৭.১.২.৯ : কবিতা পরিচয়—ঝড়ের খেয়া

৭.১.২.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.২.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.২.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকে এবং মানব জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ভাবের উপস্থাপনায় বিচিত্রতা লক্ষণীয়। এই এককের মধ্যে আমরা ১৯০০ খ্রি: থেকে ১৯১৬ খ্রি: পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। ‘কল্পনা’ (১৯০০), ‘খেয়া’ (১৯০৬), ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) ‘বলাকা’ (১৯১৬) কাব্যের জনপ্রিয় ও বহুচর্চিত কবিতাগুলি আমাদের এখন আলোচ্য বিষয়। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি মানসিকতার প্রতিফলন নতুনরূপে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা গ্রন্থে, নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—“রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।” (পৃ.১) রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী, বহু বছর ধরে প্রতিভার স্বাক্ষর উপরোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করলে জানতে পারবো।

৭.১.২.২ : কল্পনা —কাব্য পরিচিতি

'কল্পনা' (১৯০০) কাব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রিয়তমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন কালিদাসের সময়ে। সেই নায়িকার সঙ্গে কবি, স্বভাবতই সাক্ষাৎ আদান-প্রদানের কোনদিনই সুযোগ পাননি। 'কল্পনার' এই বিষণ্ণ সুর কবির কাছে অতৃপ্তির বা নিরাশার বার্তা বহন করে এনেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থে, শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—''কল্পনা 'কথা' প্রভৃতির রচনার মধ্যে বর্তমানের বন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে এবং কাব্য -পুরাণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।" (পৃ. ৫৫) 'কল্পনা' কাব্যে কবি অতীত সৌন্দর্যলোকে মানসভ্রমণ করেছেন। বর্তমানকে বাদ দিয়ে, বাস্তব জীবন অনুভূতিকে বাদ দিয়ে কবি কল্পলোকে বিরাজমান হয়েছেন। আসলে পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কবি 'স্বপ্নলোকে উজ্জয়িণীপুরে' যেতে চেয়েছেন। সেখানে কবি কল্পনায় অতীতকালের স্বপ্ন সৌন্দর্যের মধ্যে পুলক বেদনা অনুভব করতে চেয়েছেন। 'কল্পনা' কাব্যে কোথাও পদ্মার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। আবার কল্পনাকে সঙ্গিনী করে রস সম্ভোগের কুঞ্জকাননে বেশী দিন থাকতেও পারলেন না। 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ' গ্রন্থে, প্রমথনাথ বিশী বলেছেন— ''এখানে তাঁহার বিচিত্র জীবনের শুরু, শেষ নহে। স্বভাবতই এই বর্তমান হইতে তাঁহার দৃষ্টি অতীতের দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এই অতীত ভারতবর্ষকে জানিবার ইচ্ছা হইতেই কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্যের জন্ম।" (পৃ. ৯১)

৭.১.২.৩ : কবিতা পরিচয়—দুঃসময়

'কল্পনা' কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতায় সারা পৃথিবীর যে সংকট কবি তা অনুভব করেছেন। ঐ সময় জীবন ধারণ পদ্ধতিতে যেমন সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তেমনি নানামুখী সমস্যা সাধারণ মানুষকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন—''সমস্ত পৃথিবীর বিষণ্ণ অবসাদ যেন কবি টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে, নিজের দুটি ক্লান্ত ডানার মধ্যে। নীড় কোথাও নেই, ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে এমন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না, আছে শুধু নিবিড়-তিমির-আঁকা মহানভ—অঙ্গন যে মহানভে উষার দিশা পর্যন্ত গেছে হারিয়ে।" (পৃ. ৫০) বহুবিধ সমস্যার জন্য কবি কোথাও বিশ্রাম পাচ্ছেন না, তখন একটু শান্তির জন্য বাস্তব পৃথিবী পরিত্যাগ করে কল্পলোকে হাজির হয়েছেন—

''যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা-
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের সর্বত্রই হাহাকার দেখে স্থির থাকতে পারেননি। দু:খ-যন্ত্রণা অনুভব করে কবির মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কবি লক্ষ্য করেছেন, উষার আলোতে প্রকৃতি জগতের সমস্ত কিছু প্রস্ফুটিত না হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য কবি ক্লান্ত বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন। 'দু:সময়' কবিতায় কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

"এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত,
ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে।"

পার্থিব জগতের সবকিছু শূন্যতায় ভরে উঠলেও কবি সাধারণ মানুষকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। কেননা কর্মময় জগতে প্রতিটি মানব-মানবীকে নিজের কাজ করে যেতে হবে। কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টি প্রতিভা বেঁচে থাকবে। যারা অনেকদিন ধরে কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট থেকেছেন সেই বিষয়ের উপর তাদের মোহ জন্মেছে। 'দু:সময়' কবিতায় মানবাত্মার প্রতীক হিসেবে বিহঙ্গকে 'অন্ধ' বলা হয়েছে, কবি ও মানবাত্মা তো অন্ধত্বের মধ্যে বন্দীত্বে বাঁধা অনেকখানি। কবি তাই বলেন—

"এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে;
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।"

'দুঃসময়' কবিতায় ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রি পার হবার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই পথ অতিক্রম করার সময় ক্লান্তি এলেও কবিকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির টানাপোড়েন নিয়ে কবির মন সংশয়ান্বিত। 'দুঃসময়' কবিতায় নিম্নোক্ত ছত্রগুলি পড়লে কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া;
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি,
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া;
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
'এসো এসো' সুরে করুণ -মিনতি মাখা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমান্টিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি উজ্জয়িনীপুরে সেখানকার জীবনচিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বাস্তব জগতের প্রতি কবির মনোভাব—সময় অতিক্রম হলেই দুর্দিন পেরিয়ে সুদিন আসবে। তখনই হয়তো মানবজীবনের সব আশা পূর্ণ হবে। কবির এই জীনবজিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে 'দুঃসময়' কবিতাটিতে।

আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন—

'ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন;
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।"

উপরোক্ত ছত্র কয়টি থেকে জানা যায় একেবারেই কোনো আশা নেই, তা নয়। কিছুক্ষণ পরেই সংকট কেটে যাবে বলে কবি দিশা দেখিয়েছেন। সর্বোপরি এই আশাবাদী মনোভাব কবির কাছে 'মিছে ছলনা' ছাড়া আর কিছু নয়। সবার কাছে এটা চরম বাস্তব কথা হলেও এটাই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কেননা প্রত্যাশা যত কম, সেখানে জীবন সুন্দর। সেই জীবনে কবি অতীতচারী হয়েছেন, পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সংশয় থাকার দরুণ। কিন্তু জগতের প্রতি কবির আকর্ষণ খুবই তীব্র। তাঁর কাছে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রেরণা স্বরূপ। সেখানেই তিনি সীমার মাঝে অসীমকে দেখেছেন। এমনকী নূতনকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই বর্তমান জীবনের মধ্যে থেকে কবি বার বার কল্পনা রাজ্যে হাজির হয়ে গেছেন। সবশেষে একথা বলা যায় 'দু:সময়' কবিতায় ক্লান্ত বিহঙ্গকে কোনভাবেই পাখা বন্ধ করতে দেওয়া হবে না। কেননা থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু। সেইজন্য পথ চলাতে আনন্দ এই রীতিতে বিশ্বাসী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চলার পথ কঠিন হলেও ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তাহলেই আগামী দিনে নতুন জীবনে প্রবেশ লাভ হবে।

৭.১.২.৪ : খেয়া—কাব্য পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রধান পর্বের কাব্যে প্রকৃতি প্রেমের অপরূপ সৃষ্টি যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্যে মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে যাত্রার বিবরণ ফুটে উঠেছে। প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"খেয়া কাব্যখানি কবির পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত।" 'খেয়া' কাব্যের মধ্যে জীবনের ছবিই প্রধান হয়ে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, বহুবিধ সমস্যার মধ্যে কবির জীবনে অস্তিত্বের সংকট লক্ষণীয়। তার ফলে কবির বিষাদ গ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় যেমন ধরা পড়েছে তেমনি সমগ্র জীবনটা আদর্শের তুলনায় তুচ্ছ বলে কবির মনে হয়েছে। কবি বলেছেন, এই খেয়ার মাধ্যমে যারা ঘরে ফেরার তারা ঘরে ফিরে গেছে। আর যারা দূরে যাওয়ার তারা পৃথিবী ছেড়ে খেয়া ঘাটে হাজির হয়েছে। এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে অপেক্ষারত ভেবে পাড়ি দিতে চেয়েছেন। 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"খেয়াতে এই বিদায়ের সুরই একমাত্র উপজীব্য নহে, নবতর জীবনের আভাসও তাহাতে আছে। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার আমাদের চক্ষুর সমস্ত দৃষ্টি ম্লান করিয়া দিয়া বিশ্বছবি মুছিয়া দেয়; কিন্তু কিছু পরেই আবার সেই অন্ধকারের বুকের মধ্যেই নবতর বৃহত্তর বিশ্বছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।" (পৃ. ১৭৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খেয়ার ভাব-উপজীব্যকে এখানে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। খেয়া কাব্যে কবি বিরহের কথা যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি নদী, নৌকা, খেয়াঘাট, মাঝি সবাইকে তিনি মৃত্যুর প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন। 'খেয়া' কাব্য রচনাকালেও কবি অধ্যাত্ম রসঘন

উপলব্ধিতে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এই সময় কবির ব্যক্তিজীবনে স্ত্রী ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। আবার শান্তিনিকেতনে এক কাছের বন্ধুর মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। তারপর থেকে কবি খুব সংকটপূর্ণ জীবন কাটাতে থাকলেন এবং প্রায়ই অসুখে ভুগতে থাকেন। তারও কিছুদিন পর কবির পিতার মৃত্যু ঘটেছে। পিতৃহারা কবির জীবনে আবারও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এমতাবস্থায় কবি মর্ত্যজীবনের প্রতি ধৈর্য্য হারালেন ও পরে আধ্যাত্মিকতার পথকে জীবনে গুরুত্ব দিলেন। প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তখন জীবন থেকে উত্তরণের জন্য আধ্যাত্মিকতাকে একমাত্র অবলম্বন করে মুক্তি চাইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে অহরহ ঈশ্বরপ্রেমের আবির্ভাব। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম-বিরহ দুই ই আছে। তবে 'খেয়া' কাব্যে যতটা প্রেমের, তার চেয়ে বেশি বিরহের সুর শোনা গেছে। সর্বোপরি বলা যায়, খেয়া মৃত্যুর বা বিরহের কাব্য নয়, তা হল নতুন জীবনের কাব্য। 'খেয়া' রবীন্দ্রনাথের অধিক আলোচিত কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি। সর্বোপরি 'খেয়া' কাব্যে কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের জগৎ ছাড়িয়ে ভক্তি ও অধ্যাত্মসাধনার পথেও যাত্রা করেছেন।

৭.১.২.৫ : কবিতা পরিচয়—কৃপণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে আসক্ত ছিলেন তা তাঁর কাব্য পাঠ করলেই বোঝা যায়। কবি কখনও সৌন্দর্য লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, কখনও আবার পার্থিব জগতের প্রতি। কবি প্রেম, সৌন্দর্য, মানুষের মহিমাকে প্রাণের মধ্যে ধরতে পেরেছিলেন। তবে সে সব বাদ দিয়ে কবির মনোভাব শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে ঈশ্বরের প্রতি। আর ঈশ্বর আরাধনা করতে গিয়ে সমস্ত কিছুই তিনি বিলিয়ে দিতে পারেননি। ফলে তাঁর মধ্যেও কৃপণতার ভাবটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর 'কৃপণ' কবিতার মধ্যে ঈশ্বরেরই সাধনায় অন্যতর অনুভব আত্মোপলব্ধির সঙ্গে আত্মশোচনা উপলব্ধ হয়। কবিতাটির শুরুতেই কবি বলেছেন—

> "আমি ভিক্ষা করে ফিরতে ছিলাম
> গ্রামের পথে পথে,
> তুমি তখন, চলেছিলে
> তোমার স্বর্ণরথে।"

এক ভিক্ষুক গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ায়। গৃহস্থের বাড়ি থেকে সে কেবল ভিক্ষা অর্জন করে, তার বিনিময়ে সে পরিবারটিকে কিছু দেয় না। কেননা তার তো দেওয়ার মতো কিছু নেই। একদিন ভিক্ষুক দেখল যে গ্রামে সে ভিক্ষা করে, সেখানে হঠাৎ এক রাজাধিরাজের প্রবেশ ঘটেছে। রাজা, ভিক্ষুকের কাছে সমস্ত খোঁজ-খবর নিলেন। তখন ভিক্ষুকের মনে হল এ কোন মহারাজ এই গ্রামে এসে পড়েছেন। এরপর মহারাজ, ভিক্ষুকের কাছে কিছু সাহায্য চাইলেন কিন্তু ভিক্ষুক বেশি কিছু দিতে পারল না। ভিক্ষার ঝুলি থেকে মহারাজকে এক ক্ষুদ্র কণা মাত্র দিলো।

> "আমায় কিছু দাও গো বলে
> বাড়িয়ে দিল হাত।"

তখন ভিক্ষুক মাথানিচু করে ভাবলো, মহারাজা আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন না তো! তখন ভিক্ষার ঝুলি থেকে একটি চালের কণা দিয়ে ভিক্ষুক বাড়ি চলে গেছে। তারপর বাড়িতে গিয়ে, ভিক্ষার সামগ্রীগুলো

মেঝেতে ঢেলে দেখলো, তার মধ্যে একটি সোনার কণা রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ভিক্ষুকের অনুশোচনা হতে লাগল। তখন ভিক্ষুক কেঁদে কেঁদে বললো—

"তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে।"

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেক পরিচয় তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাঁর বিপুল সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াও লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষকে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন। এমনকী বাংলাদেশে জমিদারি সূত্রে অবস্থান কালে বাংলার লোক ঐতিহ্যকে গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন।'কৃপণ' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন, আপনার দিকে কিছুই রাখিলে চলবে না। এই জগৎ-সংসারে সবাই আমার আমার করে মরে। আমার বাড়ি, আমার ছেলে-আমার মেয়ে, আমার টাকা, আমার নাম-যশ প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদির মধ্যে কোন আনন্দ নেই। সেইজন্য প্রতিটি মানুষের নিজের জন্য না ভেবে বা নিজের কাছে কিছু না রেখে সব বিলিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে 'কৃপণ' কবিতার ভিক্ষুকের মতো কাঁদতে হবে না। তখন সমস্ত কিছুতেই যে আনন্দ রয়েছে তা জীবনের পরম পাওয়া। তখন সেই জীবন সব দিক থেকে সার্থকতায় ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে ও ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হবে। ঈশ্বরের করুণা থেকে কবির মন-প্রাণ কখনই বঞ্চিত হবে না। ঈশ্বরের করুণা কবির মনে প্রাণে বিদ্ধ হয়ে ছিল বলে 'খেয়া' কাব্যের 'কৃপণ' কবিতায় তার স্বরূপটি তুলে ধরতে পেরেছেন। প্রেমিক যেমন সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমার উপস্থিতি কামনা করে। তেমনি ভক্ত যদি ভক্তি ভরে ঈশ্বরের পাদপদ্মে সবকিছু উজাড় করে দিতে পারে তাহলে তার জীবন ধন্য। সব কিছু বিলীন করে দিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে লীন হওয়াতে পরম পাওয়া। আর সেই পথে যে অগ্রসর হবে, তারই সাফল্য আসবে। সেই ব্যক্তি তখন নবজীবনে পা দিয়ে নব আনন্দে মুক্তিলাভ করবেন। 'কৃপণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আত্মনিবেদনের ভাবটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

৭.১.২.৬ : গীতাঞ্জলি—কাব্য পরিচিতি

'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ খ্রিঃ। প্রকাশক ছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে গান ও কবিতার মোট সংখ্যা ছিল ১৫৭। অনেক সমালোচকই মনে করেন 'গীতাঞ্জলি' পর্ব রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন—"গীতাঞ্জলি পর্বের রচনাতে দুঃখ ও অমঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে গ্রহণ করেছেন তা এই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন বলা ভুল হবে, কিম্বা জাগতিক দু:খ দুর্দশারূপ তমসার একেবারে পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখতে পাচ্ছেন, তা-ও ঠিক নয়। দু:খের বেশেই দেবতা নেমে আসেন ভক্তের দ্বারে।" 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে ঈশ্বরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এমনকী কবিও ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি প্রেমাস্পদ। তাই ঈশ্বরের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। আমরা বলি—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—প্রেম এই তিন থাকতে নয়। এই সচেতন বোধে বিশ্বকবি জাগ্রত ছিলেন। তাই গীতাঞ্জলির

গানগুলিতে ঈশ্বরের ভালোবাসা বা আশীর্বাদের প্রকাশ ঘটেছে। সর্বোপরি বলা যায় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন বিশ্বকবির অনুভূতিকে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। কাব্যের প্রথম কবিতাতেই কবি বলেছেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

প্রায় প্রতিটি গানেই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। এ যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিসার যাত্রা। তাই মনে হয় 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কবি' না হয়ে 'সাধকে' পরিণত হয়েছেন। সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই 'গীতাঞ্জলি' তে অনেকগুলি কবিতাকে মনে হয়—"শুদ্ধা ভক্তির কবিতা"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য। ঐসময় 'গীতাঞ্জলি' কাব্যটি বিশ্বসাহিত্যে সুনাম অর্জন করেছিল। পরবর্তী কালে অন্য এক সংকলিত কাব্যগ্রন্থ ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রি: এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

৭.১.২.৭ : কবিতা পরিচয়—সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে

আমাদের আলোচ্য 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' কবিতায় দেখা যায় কবি সৌন্দর্যের পূজারি ছিলেন। কবির জীবন পর্বের সূচনায় যে সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল, তা যেন 'গীতাঞ্জলি' পর্বে সুন্দরের উপাসক হিসেবে হাজির হয়েছে। 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' কবিতায় কবি বলেছেন—

"সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে—
বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন—পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুভূতি বিচিত্রময়, আমাদের পাঠ্য কবিতাটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কবির চিন্তন, মনন যত গভীর, প্রকাশের ভাষা তত সুন্দর। কবিতার ছত্রগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, পরমকে পাওয়ার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন।

"স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায়-লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।"

'গীতাঞ্জলি' জীবনের কাব্য, সেইজন্য 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের গান ও কবিতা গুলিতে ভাবের ঐক্য বজায় রয়েছে। জীবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরকে মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি জীবনের শেষ পর্যায়েও সাধক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের উপাসক। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট আলোচনায় বোঝা যায়, সাধারণ মানুষও জীবনধারণ পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা চলমান জীবনে সর্বত্রই সংকট ঘনীভূত। পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জীবন অতিবাহিত করা খুবই দুঃসাধ্যের বিষয় ছিল। জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে বিভেদ মানুষকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। সাধারণ মানুষকে কবি অভয় বাণী শোনাতে থাকেন—'অন্ধকার যায় বুঝি কেটে ওরে আর নেই ভয়।" কবি নিজেই সকল অহংকার ত্যাগ করে পরম স্রষ্টার কাছে হাজির হয়েছিলেন। বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করে পরমকে বা সুন্দরকে পেতেও চেয়েছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন। তাই সুন্দরের স্পর্শ পেতে কবির ধারণায় ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত চরণগুলি—

"কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি-উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।"

কবিতাটির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কবি তুলে ধরেছেন। কেননা প্রকৃতির ভেতরই তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন। প্রকৃতির অজস্র রূপের মধ্যে কবি তাঁর প্রিয়তমের আভাস পেয়েছেন। সেই বিশ্বাস ও ভক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আসলে ঈশ্বর ডাকলে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। সেইজন্য মর্ত্যজীবনের প্রতি ঈশ্বরের করুণা বর্ষণ সর্বত্রই বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' কবিতায় জীবনের নানা স্তরে যে দ্বন্দ্ব আছে, তা কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার কবি স্বজন হারানোর ব্যথা যেমন পেয়েছেন, তেমনি রোগ-ব্যাধির সময় মানবাত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করেছেন। কবি এমনও মনে করতেন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সবই একদিন সুন্দর ছিল। তাই কবি ঈশ্বরের করুণায় বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিশ্বাসী হয়ে নিজের জীবনকে সমর্পণ করে দিতে চেয়েছেন। তারফলে কবি তাঁর প্রিয়তমের স্পর্শে আনন্দে বিভোর হয়ে জীবনকে ধন্য মনে করেছেন। এই ভাবনায় অন্তরে আর্বিভূত হয় এক নবচৈতন্য-যা 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' কবিতায় লক্ষণীয়।

৭.১.২.৮ : বলাকা—কাব্য পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যটি ১৯১৬ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। 'বলাকা' কাব্যে মোট ৪৫টি কবিতা আছে। এই কাব্য রচনার আগে কবি অনেকদিন, প্রায় সতের মাস ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। বিদেশে গিয়ে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটেছিল। তার ফলস্বরূপ আমাদের দেশের জীবন প্রবাহেও তিনি পাশ্চাত্যের বেগবান্ স্রোত বইয়ে দিতে চাইলেন। 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে

নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—" 'বলাকা'র সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অফুরন্ত গতিবেগ, এই গতিবেগই অচল পাষাণের মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা স্থাণু, জড়, নিশ্চল তাহার মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলে, যাহার বলে তরুশ্রেণী পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে চায়, পর্বত বৈশাখের মেঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে চায়, পটে লিখা ছবি জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে; এই তৃণ এই ধূলি এরা অস্থির, সচল বলিয়াই এরা সত্য হইয়া উঠে।" (পৃ.১৩৭) বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতির বেগ অনুভব করেছেন। 'বলাকা' শব্দের অর্থ বকের শ্রেণী। যারা দল বেঁধে আকাশ পথে উড়ে যায়। এই প্রতীকই ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতিশীলতা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। 'জগৎ নিরন্তর গতিশীল'—ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ-এর গতিবাদ রবীন্দ্রজীবন দর্শনে প্রভাবিত। সেই প্রবহমান জীবনকে কবি তুলে ধরেছেন 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে।

'বলাকা' কাব্যে গতিবাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় উপনিষদের চরৈবেতি মন্ত্র। সর্বোপরি বলা যায় 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি সুলভ মনটিও লক্ষণীয়। যা রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কাব্য ভাবনার ফসল। তারফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থিতিকে কেন্দ্র করে গতির যে যাত্রা তা যেন ভক্ত হয়ে ভগবানের কাছে অভিসার যাত্রার কথাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরদিনই উন্নতির উপাসক ছিলেন, তা 'বলাকা' কাব্যের বিভিন্ন সংখ্যক কবিতা পাঠ করলেই বুঝতে পারি। এমনকী কবিতাগুলির মধ্যে গতির মহত্ব ও সৌন্দর্য ঘোষিত হয়েছে। যৌবনবন্দনা ও মহাযুদ্ধ চেতনার কথা থাকলেও 'বলাকা'-র প্রধান কথাই হল গতি।

৭.১.২.৯ : কবিতা পরিচয়—ঝড়ের খেয়া

'বলাকা' কাব্যের ৩৭ সংখ্যক কবিতাটির নাম 'ঝড়ের খেয়া'। কবিতাটির সূচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভয়াবহ সংকট লক্ষণীয়। যুদ্ধের এমন ঘনঘোর বর্ণনা কবিতাটির প্রথমেই দেখা যায়। যুগসংকটে বিশ্বযুদ্ধের দামামা ধ্বনিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

" দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ লক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।"

কবি নিজের কর্তব্যসাধনের জন্য বাড়ির পরিবেশ ত্যাগ করে বৃহত্তর জগতে পদার্পণ করেছেন। কবির ভাবনায় মানবধর্ম হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের মনুষ্যত্বই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। সমস্ত মানুষ সম মর্যাদা ও সম অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে এটাই কবির ইচ্ছে। তাই যুদ্ধ নয়, মানবতা ও শান্তি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এই ধ্রুব বিশ্বাস 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়।

"বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।"

ঝড়, সমুদ্র ও মাঝির উপমা দিয়ে কবি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পরিণতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি মানুষই সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, আবার মানুষই একে-অপরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আক্রমণ করে। কবি সেইজন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে মানুষকে ঐক্যের পথ দেখিয়েছেন। কবি বলেছেন, পুরনো সব ঝেড়ে ফেলে নতুন পথে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই মানবজীবন নতুন চেতনায় অগ্রসর হবে।

'বলাকা' কাব্যের 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাতে ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংকট চিত্রায়িত হয়েছে। নিম্নোক্ত ছত্রকয়টি পাঠ করলেই কবির জীবনদর্শন বোঝা যাবে—

"বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ-
বন্দরের কাল হল শেষ।"

কবি অনুভব করেছেন এই বিশ্বযুদ্ধ অনেকদিন ধরে মানুষেরই পাপের বা হিংসার প্রতিক্রিয়া। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

"অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ-
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।"

ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন সমস্যায় মানুষের মৃত্যু মিছিল দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— "এই যে মরণে মরণে আলিঙ্গন ইহার মধ্যেও জীবন -সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। জীবনের হাটে পুরানো সঞ্চয় নিয়া বেচা কেনা আর কত কাল চলিবে? দিনে দিনে সত্যের পুঁজি ফুরাইতেছে, বঞ্চনা বাড়িয়া উঠিতেছে; মরণ সমুদ্র পার হইয়া, মৃত্যু স্নানে শুচি হইয়া জীবনকে এখন নূতন করিয়া পাইতে হইবে।" (পৃ.১৪৬) কবি মানুষকে সংকটের মধ্যে দিশেহারা হতে নিষেধ করেছেন। সংকটের মধ্যেও মানুষ কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবে তার দিশা দেখিয়েছেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে মানুষ নতুন প্রভাতের ইশারায় দিন গুনেছেন। এমনকী আশা

নিয়ে নবজীবনের উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছেন, তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কবি বলেছেন—

"রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান-
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।"

এটাই কবির সান্ত্বনা বাণী। পৃথিবীতে যত দুঃখ, যত পাপ থাকুক না কেন সব কিছু অতিক্রম করে সুদিনের জন্য অগ্রসর হতে হবে। বহুবিধ সমস্যা থাকলেও আগামী দিনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সমস্ত বাধাকে নির্ভীকভাবে জয় করে নিতে হবে। সেইজন্য কাউকে নিন্দা করার যেমন দরকার নেই। তেমনি কারোর কাছে মাথা নত করাও উচিত নয়। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।"

'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতিময় জীবনে বিশ্বাসী। কবির মনোভাবে ধরা পড়েছে সৃষ্টির গতিকে একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে, তার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। কালের নিয়মেই সৃষ্টিও জীবন-মৃত্যুকে অতিক্রম করে নূতন গতির দিকে অগ্রসর হবে। তার ফলে নব জীবনে নব মুক্তির আনন্দে মানুষ দিশা ফিরে পাবে। নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে কবির সেই জীবনদর্শন প্রকাশিত—দুঃখ, মৃত্যু, অসারতা ও জড়তাকে নিঃশেষে পরাভূত করার সংকল্পে উন্মথিত হয় কবিচিত্ত :

"তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

কবি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করেন—"শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" কবিতার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রীদলকে বন্দর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে বলেছেন। কিন্তু কবিতার শেষের দিকে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মৃত্যুভেদ করেই মানুষ অমৃতকে পাবে, দুঃখকে অতিক্রম করতে পারলেই সুখের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

আমরা জানি সুখে-দুঃখে, ভালো-মন্দে মানুষের জীবন। মানুষ পথ চলার মধ্য দিয়ে মহাজীবনে প্রবেশ করে। যার শুরুও নেই, শেষও নেই। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী সেই জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের শরণ নেওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা সর্বকালে মানুষের ধর্ম, দর্শন ও নীতির কথা দেবতার অমর মহিমাতেই পূর্ণ হয়। তবে

সে দেবতার অধিষ্ঠান অবশ্যই মানবদেহ। কেননা মনের সুস্থতার কারণে, দেহের সুস্থতা বজায় থাকে। তার ফলে মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানুষ তার সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। তাই একজন কবির কাছে যেমন কাব্যফসল, তেমনি একজন শিল্পীর কাছে তার শিল্পসার্থকতা। সর্বোপরি বলা যায় 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির মূল ভাবনা হল মানবতার সপক্ষে কবির ইতিবাচক মনোভাব। প্রতিটি মানুষ দেশপ্রেমে ও উদার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। তাহলে দেবতার অমর মহিমা লাভের অধিকারী হবে। প্রকৃতির পটভূমিতে সেই দেবতার আশীর্বাদে মনের সবুজতা ফিরে আসবে। তারপর 'ঝড়ের খেয়ায়' উত্তীর্ণ হয়ে বহুবিধ জীবন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বলাকা' কবিতায় মানুষের জীবনের অবস্থার পরিবর্তন দেখাতে চেয়েছেন গতিশীলতার মধ্য দিয়ে।

৭.১.২.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়

২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

৩। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। রবি-রশ্মি— চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয়খণ্ড—সুকুমার সেন

৬। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী

৭। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

১.২.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দু:সময়' কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

২। 'কৃপণ' কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

৩। 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' কবিতার সৌন্দর্য চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার কাব্য সৌন্দর্য আলোচনা করো।

—::—

একক ৩

সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, আমি, আফ্রিকা

বিন্যাসক্রম

৭.১.৩.১ : ভূমিকা

৭.১.৩.২ : 'পুনশ্চ'—কাব্যপরিচিতি

৭.১.৩.৩ : কবিতা পরিচয়—সাধারণ মেয়ে

৭.১.৩.৪ : বাঁশি

৭.১.৩.৫ : 'শ্যামলী'—কাব্য পরিচিতি

৭.১.৩.৬ : কবিতা পরিচয়—আমি

৭.১.৩.৭ : আফ্রিকা

৭.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.৩.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, সঙ্গীতের জগতে সর্বত্রই তিনি প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের চিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। মানুষ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ কালের সবচেয়ে পূর্ণ প্রকাশ আমাদের কাছে। বাঙালির কাছে তিনি শুধু কবি নন. তিনি হলেন সমস্ত পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ জানতেন একজন মানুষ কেবল ভাত কাপড় নিয়েই বেঁচে থাকতে পারে না, সেই মানুষটির মনের খোরাক পূরণ করে তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এক সুখী সমৃদ্ধ পৃথিবীর কথা ভেবেছেন। মানুষের কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য তাঁর দেখবার ইচ্ছাটি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ এবং গভীর। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মূল বিষয় ছিল মানুষ ও প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই তাঁর কাব্যরচনার পর্ব থেকে পর্বান্তরের পরিক্রমায় এক সত্য থেকে আরো গূঢ় শাশ্বত সত্যের অন্বেষায় নিরন্তর ব্যাপৃত রেখেছেন আপনার সৃজনশীলতাকে। বর্তমান এককে আমরা 'পুনশ্চ' ও 'শ্যামলী' কাব্যের পর্বটি অবলম্বনে আলোচনা করতে প্রয়াসী হবো।

৭.১.৩.২ : পুনশ্চ—কাব্য পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুনশ্চ' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রি:। 'গদ্যকবিতা'র সার্থক প্রকাশ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। কাব্যটিতে ভাবের দিক থেকেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সংকট বা সংশয়, মানসিক দ্বন্দ্ব

অপরদিকে মানবিকতাবাদের সূত্রপাত 'পুনশ্চ' কাব্যের প্রধান বিষয়। জীবনের শেষ পর্বের কবিতায় কবি মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছেন। শেষ জীবনের কাব্য হওয়ায় কবি আত্মবিশ্লেষণ যেমন করেছেন, তেমনি ফিরে দেখেছেন প্রকৃতি জগৎ ও মানব জগৎকে। 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন--- ''পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী তে তিনি যে নূতন ছন্দরীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত মুক্তক ছন্দ নয়, অথচ সেই সার্থক পরীক্ষারই যুক্তি শৃঙ্খলাময় চরম পরিণতি, একথা বলিলে বোধ হয় খুব অন্যায় বলা হয় না।'' (পৃ. ১৯৬) গদ্য কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, তার যথার্থ ও সার্থক প্রকাশ এই চারটি শেষ পর্বের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— ''পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিইনি।'' গদ্যছন্দকে কবি বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। 'পুনশ্চ' কাব্যের অভিনবত্ব এখানেই। গদ্যের সহজ-সরল ভাষাকে কবি কল্পনার সাহায্যে নব চেতনায় রূপ দিয়েছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যের অভিনব আঙ্গিক পরবর্তীকালে সকলের কাছেই সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় কবি আরও বলেছেন—''গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি।''

৭.১.৩.৩ : কবিতা পরিচয়—সাধারণ মেয়ে

'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা। কবিতাটিতে বাংলার এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ের আবেদন -নিবেদন ব্যক্ত করা হয়েছে। মানুষের জীবনের অন্তবিহীন দু:খ সাধারণ মেয়েটির জীবনে গভীর সংকট ডেকে এনেছিল। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় কবি বলেছেন—

> ''আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
> চিনবে না আমাকে।
> তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
> 'বাসি ফুলের মালা'।
> তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
> পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
> পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি—
> দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে।''

সাধারণ মেয়েটি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছে, লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। কবিতায় সাধারণ মেয়েটি তার জীবনের নানা সমস্যার কথা বলতে চেয়েছে। শ্রেণী-শোষণ ও জাতীয় নির্যাতন সাধারণ

মানুষকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তাও এই কবিতাটিতে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার কুরূপ কবিতাটিতে লক্ষণীয়। সমাজ-সংসারে, স্নেহ-মমতা-সমবেদনা প্রভৃতি মানব মনের কোমল প্রবৃত্তিগুলি যখন সব নি:শেষিত হয়ে যায়, তখন সাধারণ মেয়েরা অসহায় হয়ে পড়ে। কবি বলেছেন—

> "নিজের কথা বলি।
> বয়স আমার অল্প।
> একজনের মন ছুঁয়েছিল
> আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
> তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,
> ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
> আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
> অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধারণ মেয়ে'র প্রতীকে আমাদের পরিবারের হাজার হাজার মেয়ের করুণ কাহিনী তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সর্বত্রই সংকট দানা বেঁধেছিল। তারফলে পরিবেশ-পরিস্থিতি জনগণকে কিভাবে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেইজন্য মানব-বিপর্যয়ের কাহিনী লিখতে হলে তো সাধারণ মেয়ের কথা উঠে আসবেই। দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমরা পেরিয়ে এসেছি। খরা, বন্যা, মন্বন্তরের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। তবু আমরা লক্ষ্যে অটল। হিরোশিমা বিস্ফোরণের পর সমাজে পারমাণবিক অস্ত্র উদ্যত হয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক পরিবারেই 'সাধারণ মেয়ে'-রা দিন দিন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে বহুবিধ সমস্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় বলেছেন—

> "তোমাকে দোহাই দিই,
> একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।"

বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের পরিবারের নারীদের আত্মিক সংকটের কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা নানা উপন্যাস ও ছোটগল্পে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন সাধারণ মেয়েদের হতাশা- নিরাশাকে তুলে ধরেছেন তেমনি—তাদের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণার কথা নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় বলতে চেয়েছেন সাধারণ নারীদের দুর্দশার চিত্র নিয়ে আগামী দিনে শরৎবাবু গল্প লিখবেন। সেই গল্পের নায়িকা হবেন রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে এক দীপ্ত নায়িকা। নায়িকার নামও তিনি দিয়েছেন, যার নাম রাখা হয়েছে মালতী। আর নায়ক বিলাত -প্রবাসী 'নরেশ'। 'নরেশ' কাল্পনিক নাম হলেও কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি—যুবকটি অল্প বয়সে ভালোবেসেছিল সাধারণ পরিবারের মালতীকে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে, মেয়েটিকে কাছে পাওয়াই ছিল নরেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অথচ সময়ের পরিবর্তনে নরেশের মনেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

নরেশ, বিলেতে পড়াশোনা করতে চলে গেলে, সেখানে 'লিজি' নামে এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়েছে। তারপর নানা কাজের চাপে মালতীর কথা একেবারেই ভুলে গেছে। কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

"গেল মেল এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।"

'সাধারণ মেয়ে' কবিতার দ্বিতীয় পর্বে মেয়েটি শরৎবাবুকে গল্প লেখার আবেদন করেছে। কারণ তারমতো সাধারণ মহিলাদের নিয়ে গল্প লিখে মূল সমস্যাকে সকলের সামনে তুলে ধরা সাহিত্যিকদের কাজ। যে সমাজের মেয়েরা অবহেলিত, সেই সমাজে সংকট নেমে আসতে বাধ্য। আমরা জানি, একজন লেখক সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বিষয় নিয়ে যেমন সমালোচনা করেন তেমনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সমকালীন সমাজ ও সংসারের একজন হয়েও ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। সবসময় তিনি আবার সমাজ, দেশ, কালের দ্বান্দ্বিকতা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি উদাসীনও থাকেননি। আর এই কাজ করতে গিয়ে কখনো লেখককে হতে হয়েছে রোমান্টিকতায় মেদুর, কখনও বা বেদনায় বিধুর। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাপে সাধারণ মহিলাদের দুর্দশার চিত্র কবিতাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। নারীদের উপর শত অত্যাচার হলেও তারা মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। প্রতিবাদী না হয়ে তারা শুধু অন্যায় সহ্য করে গেছে। মালতীর জীবনের মতো অনেক নারীর অসহায়তার কথা কবি এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে মানুষকে ভালোবাসার পরিবর্তে গভীরভাবে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করা হয়েছে। তারফলে আমাদের সমাজে অনেকেই অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছে। সুদিন কবে আসবে তার প্রতীক্ষায় সাধারণ মেয়েরা দিন গুণতে থাকেন। তাই 'সভ্যতার সংকট' নামক ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে মালতীদের মতো মানবীকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে বলে অনেক সমালোচকই মনে করেন।

"সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।"

সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছে মালতীর মতন এমন অনেক নারী আমাদের সমাজে আছে। যারা পরিবার—পরিজনদের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করলেও সেই পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে পেয়েছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। তাই তারা কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করে। সেই মালতীরা ইংরেজ, জর্মান, ফরাসি না জানলেও তাদের সম্মানে সভাহোক, সমিতি হোক। কবিতায় লক্ষ্য করা যায় —

"সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।"

'সাধারণ মেয়ে' কবিতার দ্বিতীয় পর্বে মালতীর ইচ্ছাপূরণের গল্প। তাতে যদি নরেশকে আরও কিছুদিন বিদেশে থাকতে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে মালতীও অনেক উন্নতি করতে পারতো বলে কবির বিশ্বাস। কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন নরেশের মতো লোকজন, আমাদের সমাজেও প্রচুর আছে। তারা সাধারণ মেয়েদের ব্যবহার করে দূরে সরে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন অহংমন্য নরেশ শেষ পর্যন্ত স্বদেশীয় কালো মেয়েটির কাছে পরাজিত হয়ে মনে মনে তার গুণকে স্বীকার করুক। দগ্ধ হোক আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায়।

"নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্য লিরিকের মাধ্যমে মালতীর মতো সাধারণ মেয়ের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীকে এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবি সেই সময়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসারের প্রতি ছিলেন কিছুটা ক্ষুব্ধ। আর সেই বীতশ্রদ্ধার বিষয়গুলিই তাঁর সাহিত্যরচনায় টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে আমাদের পাঠ্য কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। কবির সকরুণ হৃদয়বত্তার স্পর্শে মালতী ও তারই মতো বঙ্গললনাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সংকেতিত হয়েছে।

৭.১.৩.৪ : বাঁশি

'বাঁশি' কবিতাটি অমিল ও অসম পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। বাঁশির সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'তে আমরা দেখি কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধাকে ঘর-বার করতে হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য 'বাঁশি' কবিতায় হরিপদ কেরানির মতো মানুষ, যারা মাসে পঁচিশ টাকা মাইনে পেয়ে অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছেন। অর্থনৈতিক হাহাকারের জন্য ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী গ্রামের মেয়েকে হরিপদ কেরানি বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেনি। বাঁশি কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে, বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ।"

এ শুধু লোনাধরা দেয়ালের চিত্র নয়, পশ্চিমবঙ্গে সেইসময় আমরাও এই একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেইসময় জীবনের বহুবিধ সংকট, ঘাত-প্রতিঘাত কবিকে যেমন ব্যথিত করে তুলেছিল তেমনি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে করেছিল বিপর্যস্ত। শহর কলকাতার স্বার্থপরতা, সংকট ও অমানবিকতার বিবরণ 'বাঁশি' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনের মধ্যে ঘটে যাওয়া বাস্তব বিবরণ কবি নিজের চোখেই দেখেছিলেন।—

"বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্‌টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি;
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।"

নাগরিক জীবনছন্দে বিশ্বাসী মানুষেরা অনেকাংশে কুসংস্কারমুক্ত হলেও তাদের হাতে সময় খুব কম। অথচ সকলেই সাফল্যের মুখ দেখতে চায় খুব তাড়াতাড়ি। সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা প্রচুর পরিশ্রম করলেও অর্থ উপার্জনের বাইরে কিছু চেনে না তারা। প্রকৃত শিল্পমনস্ক মানুষ যাঁরা, তাঁরা মনে করেন, জীবনের সব মাত্রাকে টাকার মূল্যে দিয়ে মাপা যায় না। আর তা যারা করতে চায়, তাতে জীবনের পথ তাদের কাছে জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতায় হরিপদর মতো মানুষদের জীবনে হাহাকার সর্বক্ষণের। তাই তাদের মতো মানুষ সুন্দরী সুললিতা নারীকে নিজের জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার কথা ভেবেও আবার পিছিয়ে আসে। হরিপদর মতো মানুষদের কাছে আসলে জীবন এই রকম। অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বিয়ের লগ্ন ছেড়ে তারা চলে এসেছে, তারজন্য তাদের মনে কোন দুঃখ নেই, কেননা তা মেনে নিতে হয়। সমাজে শ্রেণি বিভাজনই এর জন্য দায়ী। এই সহজ মনে মেনে নেওয়ার পশ্চাতে যে এক নিরাসক্ত শিল্পীর জীবনদৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতেই রয়েছে সহজাত সিদ্ধি হয়ে।

"ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া-
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাঁশি' কবিতায় সমকালীন শোষণ-শাসন-নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। কবি জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছিলেন বলে কবিতাটিতে জীবনের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু

মাত্র বহুবিধ সংকটে আবদ্ধ মানুষের কথাই বলেননি। সেই সঙ্গে তিনি হরিপদ কেরাণীর মতো মানুষদের রোমান্টিক মানসিকতা দিয়ে জীবনকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন।—

“হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।”

হরিপদ যেন এক প্রেমিক মানুষ, যে তার প্রিয় চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী কল্পলতা মানসীকে বলতে চেয়েছে—

“যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।”

এখানে হরিপদর মতো মানুষদের ভেজা চোখেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঁশির সুরে জীবনের শূন্যতা ও বিরহের মূর্ছনাকে কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন। হরিপদও হাহাকারের মধ্যে অনন্ত কালধরে প্রেমিকার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হরিপদর জীবন সংকটকে ‘বাঁশি’ কবিতার মধ্যে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নানাবিধ জীবন সমস্যায় হরিপদর যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, তখনও সে আশাবাদী। সেইজন্য বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়েও জীবনকে ভালোবেসে হরিপদ এগিয়ে গেছে। আর এই ভালোবাসার নামই যে জীবন। কল্পনা সেই জীবনকে রোমান্সের রসে কখনো শুষ্ক জীর্ণ হতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বাঁশি’ কবিতায় জীবনের সেই সুরটিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। যে সুরের মধ্য দিয়ে জীবনকে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে মেনে নেওয়াতে যে মানবিক শক্তির প্রতিষ্ঠা, হরিপদর প্রিয়তমার জন্য অপেক্ষা তার নিদর্শন।

৭.১.৩.৫ : শ্যামলী—কাব্যপরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শ্যামলী’ কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রিঃ। ‘শ্যামলী’ কাব্যটি ‘গদ্য কবিতা’-র আঙ্গিকে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এই রীতির প্রথম স্রষ্টা। তবে এর সূচনা হয়েছিল ‘লিপিকা’ (১৯২২খ্রিঃ) কাব্যগ্রন্থে। ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা’ গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— “শ্যামলীর কতকগুলি কবিতায় চিত্তের একটা ক্ষণিক আবেগ, একটা হঠাৎ খুশি বা হঠাৎ খেয়াল, একটা বিশেষ ভাব-ঝলকিত বা অনুভূতি স্পষ্ট লঘু শিথিল মুহূর্তকে রূপে রহস্যে ধরিবার চেষ্টা আছে।” (পৃ.২০২) তাছাড়াও ‘শ্যামলী’ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় ভাবগত কল্পনার ঐক্য ও বর্ণনাভঙ্গির প্রাচুর্য্য ধরা পড়েছে। তবে কাব্যটিতে প্রেমের কবিতাও লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থির করেছিলেন, তাঁর শেষ-বেলাকার ঘরখানি তিনি তৈরি করবেন মাটি দিয়ে। তারপর সেই ঘরটির নাম রেখেছিলেন ‘শ্যামলী’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৫ খ্রিঃ ৭ই এপ্রিল ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্র লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ থেকে। উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—“একটি মাটির ঘর বানাতে লেগেছি।

জন্মদিনের মধ্যে সেটা হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ওই ঘরে প্রবেশ করব, তারপরে শেষ পর্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের ৪৪ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন—

"আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।"

৭.১.৩.৬ : কবিতা পরিচয়—আমি

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ব্রহ্ম এক। তাই তিনি বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র রূপে নিজের স্বদেশকেও দেখেছিলেন। কবিতাটিতে কবির কল্পনা বিশ্ব প্রসারী এবং তাঁর চিন্তা অত্যন্ত গভীরে প্রসারিত। 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা', গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় 'আমি' কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন—" 'শ্যামলীর' আমি' কবিতাতেও কবি ব্যক্তিত্ববিহীন অস্তিত্বের গণিততত্ত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রূপ গন্ধময় বর্ণস্পর্শময় ঐশ্বর্যকে দাঁড় করাইয়াছেন; এই কবিতাটিও মানবসত্তার দুরবগাহ বিস্মিত উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত।"(পৃ.২১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমি' কবিতায় বলেছেন—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।"

আবার একজন কবির আমিত্ব স্বাভাবিকভাবেই তার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। কবির নিজস্ব প্রকৃতি জগৎ এ বিচরণ, মর্মভেদী দৃষ্টি দ্বারা সম্ভব। প্রকৃতি সত্তা তাই কবিকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তারই অস্তিত্বের কথাকে। মানুষ নিজের মতো করে সব কিছু তৈরি করে নিতে পারে। এমন কোন কাজ নেই, যা মানুষ পারে না। তাই নিজস্ব বিবেক দিয়ে সব কিছুর বিবর্তন করতে পারে একমাত্র মানুষই। আর মানুষের কর্মের মধ্যে দিয়ে সেই চেতনা বারবার জাগ্রত হয়েছে। কবিতায় দেখা যায়—

"মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।"

মানুষই নিজের আমিত্বের জোরে দেশের জল,মাটি, মানুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন করেছে। তাই মানবজীবন সম্পর্কে একটা বিশুদ্ধ দার্শনিক বোধ কবির উপলব্ধির নির্যাস রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। 'আমি' কবিতায় কবি বলেছেন—

"ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলে আমি।"

পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ব্যাপক বেকারি এবং বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় ভারতবর্ষ ছিল জর্জরিত। ফলে ভারতের জাতীয় ঐক্য ব্যাহত না হয়ে পারে না। যখনই কোন অশান্তি দেখা গেছে, তখনই রাজনৈতিক সংকটের আভাস পাওয়া গেছে। যা অনিবার্যভাবেই জনজীবনে বিপুল টালমাটাল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাই—

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে"

মানুষের চিত্তপটেই প্রতিফলিত সমগ্র বিশ্বাত্মা।

"এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর'
আমি ভালোবাসি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন নরের মধ্যেই নারায়ণের বাস। আর মানব-মনোমন্দিরেই দেবতার অধিষ্ঠান। তাই জীব সেবাই হল শিব সেবা। এবং মানবপ্রীতিই হল ঈশ্বরপ্রীতি। যিনি মানুষের ঈশ্বর, তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হল এই হৃদয়ভরা প্রেম। সেইজন্য মানুষকে ভালোবাসলে, তবেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। 'আমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধরে?
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন—
কথা কও, কথা কও,
বলবেন বলো, তুমি সুন্দর,
বলবেন বলো, আমি ভালোবাসি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমি' কবিতায় মানুষের কৃতিত্বকে বড় করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের ঘরে চিরসত্য, শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজমান। যার মূলে রয়েছে মানুষের বোধের প্রকাশ। আমি যা কিছু ভালোবাসি, ভোগ করি—তার মধ্যে বিধৃত রয়েছে চিরন্তন বিশ্বসত্তা বা প্রকৃতিস্বরূপ।

৭.১.৩.৭ : আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রচনা। এই পর্বে ব্যক্তি জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই সংকটের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। সেইজন্য শেষ পর্বের কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত উন্মাদনা ও অসহায়তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে। আবার কিছু কিছু কবিতার উপর ঘনায়মান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ ও ভয়াবহ আবহের প্রভাবও পড়েছে। আমাদের আলোচ্য সেরকমই একটি কবিতা হল 'আফ্রিকা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের কবি

হয়েও আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের হিংস্ররূপ দেখেছেন। সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশ রক্ষা বা ধর্মরক্ষার তাগিদে বহু প্রাণ বলিদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ১৯৩৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমসাময়িক আফ্রিকার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা জানিয়ে লিখলেন—

"আফ্রিকা আজ অত্যাচারিত দেশের চরম বেদনা ভোগ করছে-বোধ হচ্ছে এইবার নাটসী জার্মানেরা ঐ হতভাগ্য দেশের অন্য আর এক প্রান্তে যুদ্ধ বাধাবে, হয়তো স্পেনের ব্যাপারে তাদের যোগদানের উদ্দেশ্য মরক্কো এবং West Africa-য় পরে আক্রমণ করা। Liberia-কে তো মেরে রেখেচে—ওখানে দ্বিতীয় Abyssinia কাণ্ড যে কোনো দিন ঘটতে পারে। শত লক্ষ নির্যাতিত দুঃখী আফ্রিকাবাসী রাষ্ট্রের সম্মিলিত চক্রান্ত এবং সাংঘাতিক যন্ত্রের আঘাতে জর্জরিত।"

('কবির চিঠি কবিকে', নরেশ গুহ সম্পাদিত, পৃ.১৭৮)

'আফ্রিকা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে লিখেছিলেন। আমরা সবাই জানি, আফ্রিকাকে 'অন্ধকার মহাদেশ' বলা হয়। নিরক্ষরেখার পূর্বে, আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে কবি 'আফ্রিকা' কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন—

"উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা।"

সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আফ্রিকার সাধারণ মানুষদের অসহায়তা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থির থাকতে পারেননি। ঔপনিবেশিক শক্তির লালসা-দম্ভ 'আফ্রিকা' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন। যেখানে সামাজিক দুর্নীতি, ক্ষয় ও সংকটের কথা প্রকটভাবে রূপায়িত। কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্য পথে

পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;
দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।”

কেননা নৈরাজ্য আর শূন্যতার মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ভয়াল দুর্ভিক্ষ ও মুদ্রাস্ফীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ আর দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে গোটা ভারতবর্ষে ভয়াবহ সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আফ্রিকা’ কবিতার শেষদিকে আফ্রিকার জন্য আজকের তথাকথিত সভ্য জগতের পক্ষ থেকে মার্জনা চেয়েছেন আফ্রিকার কাছে—

“আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, ‘ক্ষমা করো’—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।”

সবশেষে একথা বলা যায় ব্যক্তিজীবন তো কোনক্রমেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে হবে। তাহলেই রাজনীতি, প্রেম, ন্যায়-নীতি, সমকালীন অর্থনীতি ও বহুবিধ সংকটকে গ্রাস করে ব্যক্তি স্বাধীনতা বড় হয়ে উঠবে। আর ব্যক্তির শুভ ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশীলতা থেকেই সমাজ, দেশ, বিদেশ অগ্রগতি লাভ করবে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানবতার কথা ভেবে আন্দোলন হলে, সকল স্তরের মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৭.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়
২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী
৩। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪। রবি-রশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন

৬। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী

৭। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

৭.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার কাব্যসৌন্দর্য আলোচনা করো।

২। 'বাঁশি' কবিতার কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩। 'আমি' কবিতার কবির কল্পনা বিশ্ব প্রসারী এই সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। 'আফ্রিকা' কবিতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে পরিচয় ব্যাখ্যা করো।

৫। 'আফ্রিকা' কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

—::—

পর্যায় গ্রন্থ - ২

রক্তকরবী

একক ৪

শিরোনামের তাৎপর্য

বিন্যাসক্রম

৭.২.৪.১ : শিরোনামের তাৎপর্য

৭.২.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.২.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.২.৪.১ : শিরোনামের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন নাটকে বারংবার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, 'রক্তকরবী' নাটকের খসড়ায় যেমন, তেমনি প্রকাশের পরেও এই নাটকের রূপান্তর বারংবার করেছেন। যেমন নামকরণের প্রশ্নে। এখানেও তিনি যে বারংবার রূপান্তর করলেন, তার কারণ নাটকটিকে সত্যমূলক করে তোলা।

নাটকটির প্রথম খসড়ায় নামকরণ ছিল 'যক্ষপুরী'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ১৯ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছেন—

"যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্রমাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভালো হয়। অভিনয়ের পূর্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।..."

যক্ষপুরীর আসল পরিচয় পৃথিবীর যে কোনও স্থানে শোষকশ্রেণির শোষণের কেন্দ্রভূমি। তবু যক্ষপুরী বদলে পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাটকটির 'নন্দিনী' নামকরণের কথা ভাবলেন। এই নন্দিনী নামটিও রূপান্তরিত। যেমন নাটকের প্রথম খসড়ায় রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে নন্দিনীর পূর্ব নাম ছিল খঞ্জন। প্রথম খসড়া থেকে দৃষ্টান্ত :

> *নাটকটির প্রথম খসড়ায় নামকরণ ছিল 'যক্ষপুরী'। পরে 'যক্ষপুরীর বদলে পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাটকটির 'নন্দিনী' নামকরণের কথা ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত নাটকের নামকরণ 'রক্তকরবী' রাখলেন। 'রক্তকরবী' নামকরণের পিছনে দুটি সত্যমূলক ঘটনা আছে। প্রথমটি আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্ত ঝরার মধ্যে দিয়ে মহান মে দিবসের রক্তরাঙানো পতাকা শ্রমিকদের হাতে হাতে ফিরতো। দ্বিতীয়টি ১৯১৭ এর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম বিপ্লব, রুশবিপ্লব। আবার রক্তকরবীর লাল রঙ সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রাণ, লাবণ্য ও প্রেমের চিহ্ন বহন করে।*

১. কি পাগলী!

ঐ আসচে তোমার খঞ্জন। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমার (আমরা) যাই।

কেন, বেয়াই, খঞ্জনকে পেলে তোমার নেশায় পর্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন?

দ্বিতীয় খসড়ায় খঞ্জন বা খঞ্জনী পালটে লিখলেন নন্দিন বা নন্দিনী। দ্বিতীয় খসড়া থেকে :

নেপথ্যে : নন্দিন, একথা তুমি ছাড়া আর কেউ মুখে আনতে পারত না। সবার সঙ্গে মিলে আমি ধান কাটব?

তবু কেন নাটকের নামকরণ 'যক্ষপুরী' ও নয় 'নন্দিনী'ও নয়, শেষ পর্যন্ত 'রক্তকরবী' রাখলেন? তা ও ঐ নাটকটি সত্যমূলক করবার জন্য? এই পরিবর্তিত নামকরণের পিছনে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন একটি পত্রে ব্যক্ত করেছেন—

"আমার ঘরের কাছে একটি লোহা-লক্কর জাতীয় আবর্জনার স্তুপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়ে ছিল। ওটা চাপা দেবার সময় দেখতে পাইনি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এল। সে বললো, ভাই, মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই?"

'রক্তকরবী' নামকরণের পিছনে দুটি সত্যমূলক ঘটনা কাজ করেছে। প্রথমটি হল, আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তঝরার মধ্য দিয়ে যে মহান মে দিবস ও দুনিয়ার মজদুরের রক্তরাঙানো পতাকা শ্রমিকদের হাতে হাতে ফিরতো তার লাল রংটি। দ্বিতীয়টি হল ১৯১৭-এর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম বিপ্লব, রুশবিপ্লব।

আবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তকরবীর লাল রঙ সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রাণ, লাবণ্য ও প্রেমের চিহ্ন বহন করে। কাজেই নাট্য নামকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনও ব্যঞ্জনা রাখতে চাননি, বরং সতর্ক করে বলেছেন—

"রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।"

৭.২.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নাটকটির প্রথমে কি নাম ছিল?
২. রুশ বিপ্লব কত সালে হয়েছিল?
৩. 'রক্তকরবী' নটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৭.২.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।
৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।
৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

একক ৫

চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের দায়বদ্ধতা

বিন্যাসক্রম

৭.২.৫.১ : ভূমিকা

৭.২.৫.২ : মকররাজ

৭.২.৫.৩ : রঞ্জন

৭.২.৫.৪ : ফাগুলাল

৭.২.৫.৫ : গোঁসাইজী

৭.২.৫.৬ : মোড়ল

৭.২.৫.৭ : বিশু

৭.২.৫.৮ : সর্দার

৭.২.৫.৯ : চন্দ্রা

৭.২.৫.১০: নন্দিনী

৭.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.২.৫.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.২.৫.১ : ভূমিকা

ম্যাক্সিম গোর্কি, টলস্টয়, চেকভ প্রমুখরা সাহিত্যে বাস্তবতার ছবি আঁকার যে দায়বদ্ধতা তাঁদের রচনায় দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও রক্তকরবীতে সেই দায়বদ্ধতাতেই পৌঁছেছেন। এই নাটকের মধ্যে যাঁরা রূপক সংকেতের ব্যঞ্জনা খুঁজতে চান তাঁদের আমরা ভালো করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি আর একবার পড়তে বলি। এই নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যআঙ্গিকের সংকেত ভেঙে কিভাবে বেরিয়ে আসছে, সেটা দেখানো যাক।

৭.২.৫.২ : মকররাজ

তাল তাল সোনার সঞ্চয়ের উপর দাঁড়িয়ে আজ উপলব্ধি করে, সে যৌবনকেই হত্যা করেছে, বলে —''মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।'' রবীন্দ্রনাথ রাজার মধ্যে দুই বিপরীত মেরুর টানাপোড়েন দেখিয়েছেন। একদিকে ধনের মত্ততায় সে দানব, কৃষিজীবী মানুষদের গ্রাম থেকে নিয়ে এ যেন যক্ষপুরীর অন্ধকারে 'দশ-পঁচিশের

মকররাজ ধনের মত্ততায় দানব, কৃষিজীবী মানুষদের গ্রাম থেকে নিয়ে যক্ষপুরীর অন্ধকারে 'দশ-পঁচিশের ছকে' পরিণত করে। ঈর্ষায় হত্যা করে নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জনকে, বিলীন করে দেয় কিশোরকে, আর দুখ জাগানিয়া নন্দিনীর আপনজন বিশুকে করে বন্দী। এ হল তার বিভীষণ-সত্তা।

ছকে' পরিণত করে। এখানে সে যেন রাবণের মতো ভয়ঙ্কর। আবার নন্দিনীর সংস্পর্শে এসে তার শুষ্ক মরুভূমির চিত্তে প্রেমের অরুণরাগ ছড়িয়ে পড়ে। ঈর্ষায় হত্যা করে নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জনকে, বুদ্‌বুদের মতো বিলীন করে দেয় নন্দিনীর প্রিয় কিশোরকে। আর দুখজাগানিয়া নন্দিনীর আপনজন বিশুকে করে বন্দী। এ হল তার বিভীষণ-সত্তা। নাট্যপরিচয় অংশে রবীন্দ্রনাথ রত্নাকরের উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'ধর্ষণ বিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আর্শীবাদে তাঁর বীণা বাজল।'

মকররাজ আসলে পৃথিবীর যে কোনও পুঁজিপতির মতোই বাস্তবচরিত্র।

৭.২.৫.৩ : রঞ্জন

আদ্যন্ত প্রেমিক চরিত্র। বিপ্লবের নেতৃত্ব সেই দিয়েছে। নন্দিনীর প্রতিবাদী সত্তার মূল শক্তি সে। কাজেই তাকে বন্দী হতে হয়, নিহত হতে হয়।

৭.২.৫.৪ : ফাগুলাল

গোর্কীর 'মাদার' উপন্যাসে মাতাল শ্রমিকের জলছবি ফাগুলাল। কিন্তু সে ই একদিন প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠল। লড়াকু শ্রমিকে উত্তীর্ণ হল।

৭.২.৫.৫ : গোঁসাইজী

শোষকশ্রেণি যে ধর্মকে হাতিয়ার করে শোষিতদের দুর্বল করে রাখে, তার প্রমাণ গোঁসাইজী। এটি সত্যমূলক চরিত্র। তার সংলাপের মধ্যে এমন বাস্তবভাবে শ্রেণিশাসনের দৃষ্টান্ত খুব কম জায়গাতেই পাওয়া গেছে। গোঁসাইজী ধর্মের কথা বলে বটে কিন্তু ফৌজ রাখারও পরামর্শ দেয়।

৭.২.৫.৬ : মোড়ল

রবীন্দ্রনাথের কালে এবং একালের মোড়লের মতো দালাল, চাটুকার, লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র অজস্র আছে। এরাও ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে চায়। কাজেই এই চরিত্রটি নির্ভেজাল বাস্তব।

৭.২.৫.৭ : বিশু

একটি দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র। নন্দিনীকে ঘিরে রঞ্জনের প্রতি তার ঈর্ষা বাস্তবের নিখুঁত রূপায়ণ। যেন ধীরে ধীরে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যশেষে সামনের সারিতে উঠে এল।

৭.২.৫.৮ : সর্দার

সর্বকালে, সর্বদেশে শাসকশ্রেণি শোষণের হাতিয়ার হিসেবে সর্দারদের ব্যবহার করে।

৭.২.৫.৯ : চন্দ্রা

ফাগুলালের স্ত্রী। আদ্যন্ত গৃহসুখপরায়ণা নারী। যক্ষপুরীর শ্রমিক জীবন ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেতে উন্মুখ। স্বামীকে বলে—"কাজ ছেড়ে দাও না, চল না ঘরে ফিরে।" এমন আটপৌরে নারী চরিত্র রবীন্দ্রনাটকে খুব বেশি নেই।

৭.২.৫.১০ : নন্দিনী

ঈশানী পাড়ার সবাই তাকে নন্দিন বলে ডাকে। নন্দিনী ভয়কে জয় করেছিল। তার বাস্তব রূপের কাছে মকররাজ হেরে গেল, মুক্তি পেল বন্দীশালার সাধারণ মানুষ। নন্দিনী আসলে সত্যমূলক চরিত্র।

ঈশানী পাড়ার সবাই তাকে নন্দিন বলে ডাকে। গ্রামের ছেলে কঙ্কু তাকে দেখার জন্য ঘাটের পাড়ে বসে থাকত। অনুপ, শক্‌লু বিশু—কে না তার রূপে মুগ্ধ ছিল। এর মধ্যে বিশু বিয়ে করে ফেলল, সোনার আশায় যক্ষপুরীতে চলে এল গুপ্তচরের কাজ নিয়ে, কিন্তু সেই যক্ষপুরীতে নন্দিনী হাজির হবার পর বিশু পালটে গেল।

অর্থাৎ যক্ষপুরীতে নন্দিনী পৌঁছে আসলে শ্রমিকদের আবার তাদের পল্লীজীবন ফিরিয়ে দিতে চাইল। তার সব আচরণের মধ্যে বাস্তব নারীর উপস্থিতি।

নন্দিনী ভয়কে জয় করেছিল। তাই সে রাজাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে—"এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কি করতে পার কর।" নারীর এই বাস্তব রূপের কাছে হেরে গেল মকররাজ, হেরে গেল বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক। মুক্তি পেল বন্দীশালার সাধারণ মানুষ।

নন্দিনী সত্যমূলক চরিত্র। তার নাম আছে, গ্রামের পরিচয় আছে, তার প্রেমের মধ্যে সততা আছে এবং বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি আছে। তাই সে সাংকেতিক নাটকের চরিত্র নয়, সমাজ-বাস্তবধর্মী নাটকের মানবী চরিত্র।

৭.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. মকররাজ কাকে বন্দী করেছিল?

২. মকররাজ ঈর্ষায় কাকে হত্যা করেছিল?

৩. নন্দিনীকে সবাই কি বলে ডাকত?

৪. 'রক্তকরবী' নাটকে তিনটি চরিত্রের নাম বল।

৭.২.৫.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।

৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।

৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

একক ৬
রূপক সাংকেতিক নাটক

বিন্যাসক্রম

৭.২.৬.১ : ভূমিকা

৭.২.৬.২ : বাস্তব নাটক

৭.২.৬.৩ : 'একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ'

৭.২.৬.৪ : 'রক্তকরবী'—সত্যমূলক সৃষ্টি

৭.২.৬.৫ : 'রক্তকরবী' রচনার প্রেরণা

৭.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.২.৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.২.৬.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনায় বিষয় ভাবনার চেয়ে আঙ্গিক-চর্চার প্রতি যে বেশি আন্তরিকতা ছিল, তা গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঋতুনাট্য এবং নৃত্যনাট্য সব ক্ষেত্রেই সত্য। 'শারদোৎসব' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত সবগুলি নাটককে রূপক অথবা সাংকেতিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কেউ কেউ 'রথের রশি' ও 'তাসের দেশ' পর্যন্ত এই রীতি লক্ষ করেছেন। এর মধ্যে 'রাজা' এবং 'ডাকঘর' সরাসরি সাংকেতিক নাটক। আবার 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী' রূপক নাটক। রূপকে বস্তুমুখিতা বেশি, সংক্ষেপে ব্যঞ্জনা মাত্রা যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের আগেই বিদেশে এই ধরণের নাট্যরীতি নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে। সিঞ্জ, শ্লেগেল এবং মেটারলিঙ্কের নাটকগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।

> *'শারদোৎসব' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত সবগুলি নাটককে রূপক অথবা সাংকেতিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে 'রাজা' এবং 'ডাকঘর' সাংকেতিক নাটক ও 'অচলায়তন' এবং 'ফাল্গুনী রূপক নাটক।*

৭.২.৬.২ : বাস্তব নাটক

'রক্তকরবী'র ঠিক আগে লেখা 'মুক্তধারা' নাটকের বিষয়বস্তু, যন্ত্রের ওপর রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা। কবি যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু যে যন্ত্রের দ্বারা মুক্তধারার উপরে বাঁধ নির্মিত হওয়ায় শিবতরাই-এ কৃষিজীবী মানুষ চরম সংকটের মধ্যে পড়ে, সেই যন্ত্রসভ্যতা রবীন্দ্রনাথ মেনে নেননি। তাই অভিজিৎ তার প্রাণ দিয়ে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিল। কাজেই এ নাটকে এমন বাস্তব সমস্যা সরাসরি দেখানো হয়েছে, যার ফলে রূপক-সংকেতে, এর পরিচয় খোঁজা বৃথা।

৭.২.৬.৩ : 'একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন 'রক্তকরবী' নাটকে রূপক-প্রতীক-সংকেত নিয়ে নানা আলোচনার খবর। এ জন্য তিনি নিজেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ১৯৩১ সালে একটি অভিভাষণে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রানাথ বলেছিলেন—

"আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটির ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।"

'রক্তকরবী' খাঁটি রূপক নাটকও নয়, সাংকেতিক নাটকও নয়। বরং এটি একটি সমাজ-বাস্তবাশ্রয়ী নাটক। রাবণ ও বিভীষণ একই, তারা সহোদর ভাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—" আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।'

এই উক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রচলিত অর্থে কোনদিনই নাটক না লেখায় 'রক্তকরবী'তে সংলাপের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেওয়া হল। এটি খাঁটি রূপক নাটকও নয়, সাংকেতিক নাটকও নয়। বরং এটি একটি সমাজ-বাস্তবাশ্রয়ী নাটক। সেই জন্যই কবি সরাসরি বলেছেন—

"আদি কবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না। এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"

"বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক।"

৭.২.৬.৪ : রক্তকরবী—সত্যমূলক সৃষ্টি

রামায়ণের উপমাটুকু রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন এবং 'রক্তকরবী'র রাজাকে রাবণের প্রতিরূপ ভেবেও তিনি তাকে রাবণের মতো দশমুণ্ড ও বিশ হাত দেননি। তা থেকেই বোঝা যায়, রূপক নয়, 'রক্তকরবী' নাটকটিকে তিনি সত্যমূলকই করতে চেয়েছেন।

নন্দিনীর ক্ষেত্রেও এই সত্যমূলকতা স্পষ্ট। 'নাট্যপরিচয়' অংশে তিনি স্পষ্ট বলেছেন—

'এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। কাজেই রক্তকরবী নাটকটি রূপক নাটক নয়, সাংকেতিক নাটকও নয়, এটি সমাজ-বাস্তবাশ্রয়ী, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যমূলক নাটক।'

৭.২.৬.৫ : 'রক্তকরবী' রচনা প্রেরণা

'রক্তকরবী' নাটকের বিষয়বস্তু সত্য ঘটনা নির্ভর। ১৯২২-এ আমেরিকা ঘুরে এসে ১৯২৩-এ গ্রীষ্মকালে

কবি শিলং গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হল ড: রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের। বিশিষ্ট অর্থনীতিক রাধাকমল কিছুদিন আগে আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিকদের সঙ্গে দেখা করে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথকে শোনালেন। তাঁর বর্ণনায় শ্রমজীবী মানুষদের করুণ দুঃখের যে ছবি তার সঙ্গে 'রক্তকরবী' রচনার ঠিক আগে মাদ্রাজ, কলকাতা, জামসেদপুর ও আসামে যে শ্রমিক ধর্মঘট হয় তার সংবাদ সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' লেখেন। কাজেই এই নাটকটি অবশ্যই সাংকেতিক নাটক নয়, সত্যমূলক নাটক।

৭.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'রক্তকরবী' নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল?

২. রবীন্দ্রনাথের দুটি সাংকেতিক ও দুটি রূপক নাটকের নাম লেখ?

৩. 'রক্তকরবী' কি ধরনের নাটক?

৭.২.৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।

৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।

৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে— শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

একক ৭

নাট্যপরিণতি

বিন্যাসক্রম

৭.২.৭.১ : নাট্যপরিণতি

৭.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.২.৭.১ : নাট্যপরিণতি

রক্তকরবী যে সত্যমূলক নাটক তার প্রমাণ আছে এ নাটকের বিভিন্ন ঘটনায়, গানে, সংলাপে।

(ক) নাটকের যে নাচগান আছে তার মধ্যে শ্রমিক জীবনের সমস্যা হাজির। যেমন, খোদাই নৃত্য, হাতুড়ী নৃত্য, ফসল কাটার গান।

(খ) অনুপ-উপমনু-শক্‌লুর যোল ঘণ্টার শ্রমদান।

(গ) রঞ্জন-কিশোরের জীবন-উৎসর্গ।

রক্তকরবী নাটকের পরিণতি অংশ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। একথা সত্য যে ধনকুবেররা কখনও স্বেচ্ছায় তাদের ধনসম্পদ বিলিয়ে দেয় না। রক্তকরবীর মকররাজ হাজার বছরের সাধনায় যে ধন সঞ্চয় করেছে নাটকের শেষে তার প্রতি মকররাজের বিতৃষ্ণা কতটা সত্যমূলক এ প্রশ্ন উঠে থাকে। যে বন্দীশালা সে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল, সেই বন্দীশালা সে যে ভাঙল, তা কতটা বাস্তবসম্মত— এই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু তিনি লেনিনের মতোই বুঝেছিলেন— "Imperialism is the highest stage of Capitalism". মকররাজের বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে ধনিক শ্রেণির সেই ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় আঁকতে কবি দ্বিধা করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজার দুটি সংলাপ উদ্ধার করতে পারি—

ক. নন্দিনী : তারপরে কী হল তার? বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা : বুদ্‌বুদের্‌ মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

খ. ... তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙ্গে চুরে ফেলতে চাই।

কিন্তু নাটকের শেষে রাজাই পাল্টে গেল।

রাজা : কি হয়েছে তোমাদের? কী ধরতে বেরিয়েছ?

ফাগুলাল : বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা : ফিরবে কেন? ভাঙ্গার পথে আমিও চলেছি।

ঐ তার প্রথম চিহ্ন—আমার ভাঙ্গা ধ্বজা,

আমার শেষ কীর্তি।

'রক্তকরবী'র মকররাজ হাজার বছরের সাধনায় যে ধন সঞ্চয় করেছে, যে বন্দীশালা নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল, সেই বন্দীশালা সে যে ভাঙল, তা কতটা বাস্তব সম্মত। মার্কসীয় বিচারে, পুঁজিপতিরা কখনও স্বেচ্ছায় শ্রমজীবী মানুষকে তার সঞ্চয়ের অংশীদার করতে পারে না। সংগ্রাম অনিবার্য। কোনও সোস্যাল রিয়ালিস্ট লিখলে 'রক্তকরবী' নাটকটির পরিণতিটি কিন্তু অন্যরকম হত।

রাজা-নন্দিনী-শ্রমিক খোদাইকররা সর্দারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ফাগুলাল একা যক্ষপুরীর চাতালের উপর দাঁড়িয়ে। সর্দারের রাজছত্র তলিয়ে যাচ্ছে—বিলীন হচ্ছে রণডঙ্কার শব্দ। আর শোনা যাচ্ছে যুগাবসানে ফসল কাটার গান। মার্কসীয় বিচারে, পুঁজিপতিরা কখনও স্বেচ্ছায় শ্রমজীবী মানুষকে তার সঞ্চয়ের অংশীদার করতে পারে না। সেজন্যই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শ্রেণি সংগ্রাম অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথ যে তা জানতেন না, আমরা তা মনে করি না। কিন্তু যেহেতু কবি মার্কসবাদী ছিলেন না, তাই তিনি শ্রেণিসমন্বয় সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। কোনও সোস্যাল রিয়ালিস্ট লেখক 'রক্তকরবী' লিখলে এর পরিণতিটি অন্যতর হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শোষক-শোষিতের, মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার বিরোধের ভিন্ন পথে সমাধান চাইলেন। কাজেই কারও কারও পক্ষে মকররাজ-নন্দিনী-বিশু সমন্বিত শক্তির দ্বারা 'সর্দারতন্ত্রের' অবসান মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। আবার রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি'তে যে প্রক্রিয়ায় উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে তুলাদণ্ডের ভারসাম্য এনেছেন, আগে লেখা নাটক 'রক্তকরবী'তেও সেই দর্শনটি ব্যবহার করেছেন। সোস্যাল রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এর বাইরে হওয়া সম্ভব ছিল না।

৭.২.৭.১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'রক্তকরবী' নাটকে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি কে?

২. 'রক্তকরবী' নাটকে শোষিত কারা?

৩. 'রক্তকরবী' নাটকের পরিণতির শৈল্পিক দিকটি বিশ্লেষণ করো।

৪. রক্তকরবী নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৫. " আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ , সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"—রক্তকরবী নাটক প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করো।

৬. রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী চরিত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৭. রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসাবে রক্তকরবীর সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৮. রাজা ও রঞ্জন চরিত্রের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।

৯. রক্তকরবী নাটকে বিশুপাগলা চরিত্র সংযোজনের গুরুত্ব নির্দেশ করো।

১০. কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব রক্তকরবী নাটকে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করো।

১১. রক্তকরবী নাটকে সংগীত ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৭.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।

৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।

৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে— শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত ১০টি গল্প)

একক ৮

‘গল্পগুচ্ছ’ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

বিন্যাসক্রম

৭.৩.৮.১ : প্রেক্ষাপট

৭.৩.৮.২ : ‘গল্পগুচ্ছ’ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

৭.৩.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.৮.১ : প্রেক্ষাপট

কবিচিত্তের নব জন্মগ্রহণে ‘জীবনস্মৃতি’ যেখানে খাসমহলের দরজায় এসে শেষ হয়েছিল ঠিক সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছে’র শুভ উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর মানস-জগতে বিভিন্ন সময়ের সুখ-দুঃখ, বিলাস-বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করেছেন তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। সাজাদপুর-শিলাইদহ-কুষ্টিয়া-ত্রিবেণী তীর্থে প্রকৃতি ও মানুষের যে মহামিলন সৃষ্টি হয়েছিল, পল্লীজীবনের নানা টুকরো খণ্ডচিত্র কবিকে নাড়া দিয়েছিল তারই রূপ অঙ্কিত হয়েছে তাঁর এই পর্বের ছোট গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানাভাবে সেকথা ‘ছিন্নপত্রে’-র বিভিন্ন চিঠিতে স্বীকার করেছেন—‘অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধহয় পৃথিবীর সদ্য কোন কবি এত লেখেননি। কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওর কিনা জানি দশা হবে। কিম্বা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলবো আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। .....গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে।... ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।’

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে তাঁর মানসজগতের সুখ-দুঃখ, বিলাস-বেদনার খণ্ড চিত্র ধরা পড়েছে। জমিদারী পরিদর্শনের সূত্রে পদ্মা বিধৌত জনসমাজের সঙ্গে জটিলতর জীবনর ছবিও অঙ্কন করেছেন।

জমিদারী পরিদর্শনের সূত্রে পদ্মা বিধৌত জন সমাজের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগ সম্ভব হয়েছিল। পদ্মার চলমান বোটে অবস্থান করে তিনি স্থলভূমির বিচিত্র খণ্ডিত জীবনের চিত্র অবলোকন করেছেন, আর এই ছোট ছোট দৃশ্যগুলি মহৎ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—'আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম, ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা কেমন হঠাৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধহয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিকে হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে, যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তোমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম, সুখ-দুঃখ, উৎসব আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী। কী বিপুলা মানবসংসার!' এইভাবে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃশ্য-পটভূমি, সেখানকার মানুষ তাদের বিভিন্ন আচার আচরণ, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগ ইত্যাদি সবই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পদ্মা-বিধৌত পল্লীজীবনের রোমান্টিক ছবি ও জীবন ব্যাকুলতার চিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। পল্লীজীবনের সঙ্গে নাগরিক পরিবেশের জীবন-ধর্মেরও তুলনা করেছেন। জীবনের মর্মে, গভীরে প্রবেশ করে জটিলতর জীবনের ছবিও অঙ্কন করেছেন। আবেগের প্রচণ্ড আলোড়নে যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষের হতাশাকে তিনি দেখেছেন, ভালবাসার অপমান-অবসান, রোম্যান্টিক প্রণয়ের বেদনা-অভিসম্পাত সবই তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। আর এইভাবেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলি যথার্থ মানবজীবনের ও যুগযন্ত্রণার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

৭.৩.৮.২ : 'গল্পগুচ্ছ': বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

সমালোচকগণ রবীন্দ্রছোটগল্পের নানারকমের বর্গীকরণ করেছেন। এই বর্গীকরণগুলি যেমন কালানুক্রমিক তেমনি চরিত্রমুখ্যতা, ঘটনামুখ্যতা ও ভাবমুখ্যতা সাপেক্ষেও লক্ষ্য করা গেছে। আবার অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্রপত্রিকার চাহিদা অনুসারে এই ছোটগল্পগুলি রচনা করেছিলেন। ফলে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও গল্পগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে পারে। গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা' অন্যদিকে 'রাজপথের কথা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থ। এর প্রায় সাতবছর পরে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যথার্থ সূচনা বলে অনেকে মনে করেন।

'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সাতটি ছোটগল্প লিখেছিলেন—'দেনা পাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি, পোস্টমাস্টার', 'ব্যবধান', 'গিন্নী' ও 'খাতা'। আমাদের পাঠ্য 'দেনাপাওনা' ও 'পোস্টমাস্টার' এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। প্রথম গল্পটি নিতান্তই বিবৃতি সর্বস্ব হলেও সমকালীন সমাজের সমালোচনা অত্যন্ত বাস্তব সচেতন দৃষ্টিতে করা হয়েছে। পণপ্রথায় জর্জরিত এক বধূ এবং তার অসহায় পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে আমাদের কাছে হাজির করেছেন। গল্পশিল্পের বিচারে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিকে সমালোচকগণ এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি পদ্মা তীরবর্তী পল্লী বাংলার এক বালিকার 'বয়ঃসন্ধিলগ্নে হৃদয় উন্মীলনের বেদনা বিধুর' কথাশিল্প।

'হিতবাদী' পর্বের গল্প থেকে বেরিয়ে এসে 'সাধনা-ভারতী' পর্বে রবীন্দ্র ছোটগল্প আরও গভীরতর বিষয়কে আহরণ করেছে। আরও সংহত শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই সময়ের গল্পগুলির মধ্যে 'কঙ্কাল' 'অতিথি', 'ত্যাগ',

'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কাবুলিওয়ালা', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি তাঁর অন্যতম সেরা ছোটগল্প। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের সাধনা পত্রিকায় (পৌষ সংখ্যায়) 'ছুটি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। এক পল্লীশিশুর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে আলোচ্য গল্পে তুলে ধরা হয়েছে, শহরের কৃত্রিমতায় এক পল্লী শিশুর অকাল 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গল্পটিকে ইংরেজ আমলের এদেশের মানুষদের বিপর্যস্ত ও অসহায় অবস্থা রূপায়িত হয়েছে। ইংরেজ প্রভুদের দোর্দণ্ড প্রতাপের ফলে স্বদেশীয় মানুষদের যে দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে এই সমস্যামূলক গল্পটি রচিত হয়েছে। শেযোক্ত গল্পটি একটি রোমান্টিক স্বপ্নের মতো,যেখানে স্নায়বিক টেনসন টান টান করে ধরে রেখেছে সমস্ত গল্পের অবয়বকে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প 'ঘাটের-কথা, অন্যদিকে 'রাজপথের কথা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থ। 'হিতবাদী' পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'দেনাপাওনা' ও 'পোস্টমাস্টার'। 'সাধনা-ভারতী' পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে কঙ্কাল, অতিথি, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষাণ ইত্যাদি। সবুজপত্র পর্বে তিনি জীবনের সমালোচকও। নারী ও পুরুষ দুয়ের সামগ্রিক রূপই হল মানুষ। যা শেষ পর্বের গল্পে বিশেষ করে 'রবিবার', শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি ছোটগল্প প্রকাশিত।

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের এই বিবর্তন 'সাধন-ভারতী' পর্বের পরে 'সবুজপত্র' পর্বে পরিলক্ষিত হয়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প স্পষ্টতই বাঁক নিয়েছে। প্রাক 'সবুজপত্র' পর্বের গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় রসিক শিল্পীর মতো জীবনকে দেখেছেন, শিল্পীর তুলিতে সেই জীবনের টুকরো খণ্ড চিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু 'সবুজপত্র' পর্বে তিনি জীবনের নানা রঙ অঙ্কন করেই ক্ষান্ত থাকেননি এখানে তিনি জীবনের সমালোচকও বটে। বিশিষ্ট সমালোচক-এর মতে—'প্রাক্ সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প হল জীবনের রূপ রচনা : Impression of life। পক্ষান্তরে সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের ভাষ্য রচনা, Story around and impression (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ—তপোব্রত ঘোষ পৃ ৩২৩)। উত্তম পুরুষের জবানীতে রচিত এই পর্বের রচনাগুলিতে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাধর্মী বিস্তৃতি দেখা গেছে। সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে, ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে, সময় ঐক্য বিধানে তথা প্রতিবাদী মানসিকতায় নানা পরীক্ষা -নিরীক্ষার প্রয়াস দেখা গেছে। সবুজপত্রের ১৩২১ বঙ্গাব্দের যথাক্রমে-বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যায় 'হালদারগোষ্ঠী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীরপত্র', প্রকাশিত হয়। শেযোক্ত গল্পটিতে এক অবরোধবাসিনীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নারী ও পুরুষ এই দুয়ের সামগ্রিক রূপই হল মানুষ। অথচ নারী পুরুষের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভেদরেখা প্রায়ই সর্বত্র টেনে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন এই ভেদরেখা স্বীকার করেননি। মানবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানকে চরিত্রায়িত করে যখন পাঞ্চভৌতিক সভা সৃষ্টি হয় তখনই নারী চরিত্রের চিত্ত শক্তির প্রাখর্য পরিলক্ষিত হয়। সবুজপত্র পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারী-চরিত্রগুলিতে এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করা যায়। আর সেই বিশেষ দিকেরই সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প বিশেষ করে 'রবিবার' (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬), 'শেষকথা' (শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬), 'ল্যাবরেটরি' (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭) প্রভৃতি ছোটগল্প।

৭.৩.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. রবীন্দ্রনাথ কোথায় জমিদারী পরিদর্শনে গিয়েছিলেন?

২. রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্পের নাম কি?

৩. ‘হিতবাদী’ পর্বের দুটি গল্পের নাম বল?

৪. বর্গীকরণ সহ রবীন্দ্র ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭.৩.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ৯
হিতবাদী পর্ব

বিন্যাসক্রম

৭.৩.৯.১ : ভূমিকা

৭.৩.৯.২ : দেনাপাওনা

৭.৩.৯.৩ : পোস্টমাস্টার

৭.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.৯.১ : ভূমিকা

'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সাতটি ছোটগল্প লিখেছিলেন—''দেনা পাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা,' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', ' পোস্টমাস্টার', 'ব্যবধান', 'গিন্নী' ও 'খাতা'। আমাদের আলোচ্য 'দেনাপাওনা' ও 'পোস্টমাস্টার' এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প যেগুলি যথাক্রমে ১২৯৬ এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রথম গল্পটি নিতান্তই বিবৃতি সর্বস্ব হলেও সমকালীন সমাজের সমালোচনা অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে করা হয়েছে। পণপ্রথায় জর্জরিত এক গৃহবধূ ও তার অসহায় পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। গল্প শিল্পের বিচারে সমালোচকরা 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিকে এই পর্বের শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। এটি পদ্মাতীরের পল্লী বাংলার এক বালিকার বয়ঃসন্ধিলগ্নের হৃদয় উন্মীলনের বেদনা বিধুর এক কথাশিল্প।

৭.৩.৯.২ : দেনাপাওনা

১২৯৬ বঙ্গাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পটি শতাধিক বছর অতিক্রম করেও আজও প্রাসঙ্গিক, সমভাবেই প্রাসঙ্গিক। গল্পটিকে সমাজের এক নিষ্ঠুরতা ও অবক্ষয়ের প্রতি ব্যঙ্গের একটি দিক নির্দেশিত হয়েছে। মূলতঃ এই গল্পেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমাজ বাস্তবতার পরিচয় ফুটে ওঠে। এই ধরণের গল্প সাধারণতঃ যান্ত্রিকভাবে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব শিল্পকৌশলে গল্পের অবয়বটিকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছেন। আলোচ্য গল্পে পরিবেশ নির্মিত হয়েছে অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে। দরিদ্র রামসুন্দরের কন্যাদান, পণপ্রথার অমানবিক

> *১২৯৬ বঙ্গাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পটি একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিক। মূলতঃ এই গল্পেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র ছোট গল্পের সমাজ-বাস্তবতায় পরিচয় ফুটে ওঠে। পণপ্রথায় জর্জরিত এক গৃহবধূ ও তার অসহায় পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।*

নৃশংসতা এই দুইয়ের মধ্যে রামসুন্দরের অসহায়তাকে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বরের পিতার বাণিজ্যিক স্বভাবে বৃদ্ধ রামসুন্দর মিত্রের অসহায়তা আর এরই মধ্যে পিতার বিরুদ্ধে বরের প্রতিবাদ—''কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।' প্রবীণ রায়বাহাদুর উদ্ধত দুর্বিনীত পুত্রের ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন, উপস্থিত ভদ্রজনের সাক্ষী মেনেছেন, দু'একজন স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে বলেছেন—'শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারেই নাই, কাজেই...।' বর্তমান সভ্যতার বিষময় ফল নিজ সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে রায়বাহাদুর হতোদ্যম হয়েছে যথেষ্টই।

এরপরেই গল্পটি প্রচলিত পথে এগিয়েছে, বৃদ্ধ রামসুন্দর মিত্র পণের বকেয়া অর্থ প্রদানের তাগিদে সংগ্রহ করতে গিয়ে অশেষ লাঞ্ছিত হয়েছেন তথাপি তিনি যথাসর্বস্ব খুইয়েও কন্যাকে নিজগৃহে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছেন। নিরুপমা যখন এই অর্থসংগ্রহের নেপথ্য কাহিনি জানতে পেরেছে তখন সে দীপ্তকণ্ঠে জানিয়েছে, 'আমি কি কেবলই একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ দাম। না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না। তাছাড়া আমার স্বামীতো এ টাকা চান না।' স্বাভাবিকভাবেই রামসুন্দরবাবু টাকা না দিয়ে ফিরে গেছেন। শাশুড়ি এ খবর জানতে পেরে নিরুপমার প্রতি আক্রোশ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নিরুপমার শান্ত স্নিগ্ধরূপের কেউ স্তুতি করলে তিনি বলেন ওঠেন 'শ্রী তো ভারি, যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী'। এই ব্যঙ্গোক্তি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে গল্পের শেষাংশে। নিরুপমা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে শাশুড়ি জানিয়েছে—'ওর সমস্ত ন্যাকমি'। কখনো কখনো তার উক্তি ছিল 'নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরীবের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।' মৃত্যুশয্যায় নিরুপমা বাবা ও ভাইকে দেখতে চাইলে শাশুড়ি তখনও নিষ্ঠুরভাবে বলেছে—'কেবল বাপের বাড়ী যাইবার ছল'। নিরুপমা আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে তবে-'সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল'। এরপর নিরুপমার মৃত্যু হয়েছে। নিতান্ত অবহেলার অত্যাচারে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হলেও সৎকার করা হয়েছে রাজকীয়ভাবে। এরপর নিরুপমার স্বামী প্রেরিত চিঠি এসেছে। তাতে তার স্ত্রী অর্থাৎ নিরুপমাকে তাঁর কর্মস্থলে পাঠাতে বলা হয়েছে। পত্নী কর্মস্থলে না গেলেও পত্রের উত্তর গেছে ঠিকই। তাতে রায়বাহাদুর মহিষী লিখেছেন—'বাবা তোমার জন্য আরেকটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'। গল্পশেষের এই খণ্ড মুহূর্ত গল্পটিতে অন্যমাত্রা যোগ করেছে সন্দেহাতীতভাবেই।

গল্পটিকে 'নিতান্ত বিবৃতিসর্বস্ব' বলা অযৌক্তিক এবং সেই সঙ্গে বধূ নির্যাতন এবং বধূ হত্যার এই নির্মম ঘটনাকে কখনোই যান্ত্রিক বলা যাবে না। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনবীক্ষা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে। বিষয়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে যথেষ্ট মনঃসংযোগ করেছিলেন এবং গল্পের ক্রমিক উন্মোচনের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, তাই এক্ষেত্রে কোন শিল্পগত বিভ্রাট ঘটেনি। নিরুপমা এবং তার পিতা গল্পটিতে বারংবার লাঞ্ছনার শিকার তথাপি এই দৃশ্যগুলি আতিশয্যের দোষে দুষ্ট নয়। এখানে লক্ষণীয় পুরুষশাসিত সমাজে সব পুরুষ কিন্তু অত্যাচারের ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বরের পিতার ব্যবসায়িক মনোভাবের প্রতিবাদ বর নিজেই করেছে। গল্পটির বিভিন্ন খণ্ড দৃশ্যে বাস্তবানুগত্য লক্ষ্য করা যায়। ঋণের টাকা শোধ না করতে পারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে টাকা সংগ্রহ করে দীর্ঘ অনশনের পর রামসুন্দর যখন বেহাই বাড়ী পৌঁছে কন্যাকে দেখলেন তখন 'বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে দুই জনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না।'' এই দৃশ্যে হৃদয়ধর্মী বাস্তবানুগতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা গল্পে লক্ষ্য করেছি বিবাহের স্বল্পদিন পরেই নিরুপমার স্বামী 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' হয়ে দেশান্তরে

তলে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে তার (নিরুপমার) বিয়ের পণ পুরোপুরি শোধ না হওয়ায় বাপের বাড়ীর কারও সঙ্গে তার দেখাশোনা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব নিরুপমা চূড়ান্তভাবে একাকীত্বের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এই একাকীত্ব ও বহুমুখী নির্যাতন তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু অপরদিকে রাজকীয় সৎকার গল্পটির বাস্তবমূল্যকে জীবন্ত করেছে। গল্পশেষে নিরুপমার স্বামীর চিঠি প্রেরণ এবং নিরুপমাকে তার কর্মস্থলে পাঠাতে বলা এবং প্রত্যুত্তরে রায়বাহাদুর পত্নীর উক্তি ‘তোমার নতুন বিয়ে ঠিক করেছি এবারে বিশ হাজার টাকা পণ হাতে হাতে আদায়’ পণপ্রথার বাস্তব পরিস্থিতিকে অবিকৃতভাবে জ্ঞাপন করেছে। সুতরাং গল্পের এইসব খণ্ড দৃশ্য বাস্তবকার সীমা অতিক্রম করে যায়নি সেইসঙ্গে বধূ অত্যাচারে ও বধূহত্যার এই মর্মস্পর্শী চিত্র আমাদের সমাজ বিবেকের উপরে শিক্ষণীয় চাবুক হানতে সক্ষম হয়েছে যথার্থভাবেই। সুতরাং ‘দেনাপাওনা’ গল্পের প্রাসঙ্গিকতা এবং সার্থকতা অবশ্যই প্রশ্নের ঊর্দ্ধে।

৭.৩.৯.৩ : পোস্টমাস্টার

এই পর্বে আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য গল্প হল ‘পোস্টমাস্টার’ যেটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে পোস্টমাস্টার উপলক্ষ মাত্র। গল্পটিতে মূলতঃ রতন নামক বালিকার মৌলিক একাকীত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে গল্পটি রচনার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনে শুরু হয়েছিল শিলাইদহ পর্ব। রবীন্দ্রনাথ তখন নাগরিক জীবনের আভিজাত্যপূর্ণ জীবনচর্যা ছেড়ে নেমে এসেছিলেন পল্লীবঙ্গের বিস্তৃত পটভূমে এবং হিতবাদী পর্বের এই গল্পে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একখানি পত্রে লিখেছেন—

“তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম কাল ৭টার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে কেদারাটি টেনে যখন প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত.... অতএব পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হলো। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোলো তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাইহোক এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায় আমি চুপ করে বসে শুনি।” (পত্র-৬২, সাজাদপুর, ২৯শে জুন, ১৮৯২)

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রটি বর্ষাকালে (২৯শে জুন) লিখেছিলেন আর ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটিতেও বর্ষাকাল বিশেষভাবেই প্রভাব ফেলেছে। সুতরাং পত্রটির পোস্টমাস্টারের সঙ্গে গল্পের পোস্টামাস্টারের যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। গল্পটির পোস্টমাস্টার হলেন কলকাতার এক নব্য যুবক যিনি নিতান্তই দায়ে পড়ে উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারী করতে এসেছেন। এই অখ্যাত উলাপুর গ্রামের জীবনস্রোত অতি মন্থর। ‘পোস্টমাস্টারের কর্মভার স্বল্প, বেতনও তদইরূপ। তাঁর সমস্ত মন কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। এখানে তাঁর কোন মানসিক অবলম্বন নেই। পিরস্থিতিটা ঠিক এইরকম। এর কিছু পরেই তাঁর জীবনাকাশে আর্বিভূত হল রতন— পিতৃ মাতৃহীন এক বালিকা। অনেক কর্মহীন দুপুর আর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গী হয়ে উঠল এই বালিকা। অচিরেই সে সেবাকারিণী পরিচারিকা ভগিনী ও জননীর পদে অধিষ্ঠিত হল। পোস্টমাস্টার রোগশয্যায় শায়িত হলে ‘বালিকা রতন আর বালিকা রইল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল,

সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল...।' এর কিছুদিন পর পোস্টমাস্টার আরোগ্য লাভ করলেন এবং তারপরেই বদলির আবেদন করলেন। এদিকে রতন কিন্তু দ্বারের বাহিরে 'স্বস্থান' অধিকার করে রইল এবং পূর্বে পোস্টমাস্টারের শেখানো পড়া রোমন্থন করতে থাকলো—আশঙ্কা যদি যুক্ত অক্ষরগুলি গোলমাল হয়ে যায়। সহসা ঘরের মধ্যে ডাক পড়লে যদি সমস্ত মনে না পড়ে। এখানেই ভাবী বিচ্ছেদের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। এর কিছুদিন পরে একদিন পোস্টমাস্টারের ডাকে উদ্বেলিত মনে রতন ঘরে প্রবেশ করলো এবং তাঁর কর্মত্যাগ ও বিদায় বার্তা শুনলো। দীর্ঘ নৈঃশব্দের মধ্যে রতনের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি এক মুহূর্তেই করুণ রাগিনীতে আবিষ্ট হয়ে গেল। এদিকে 'মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল' আর 'একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।' গ্রাম ত্যাগের পূর্বরাত্রে ''বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে (পোস্টমাস্টারকে) জিজ্ঞাসা করিল 'দাদাবাবু আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে?' পোস্টমাস্টার প্রত্যুত্তরে বললেন 'সেকি করে হবে'। ব্যাপারটা যে কী কারমে অসম্ভব 'বোঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না'। ফলত ''সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল। 'সে কী করে হবে'। গ্রামত্যাগের দিন স্নানান্তে রতনকে ডেকে সস্নেহে ও সহৃদয় কণ্ঠে 'প্রভু কহিলেন, তাঁর জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে তিনি বলে দিয়ে যাবেন' তিনি 'তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি বলে যাচ্ছি তোকে কিছু ভাবতে হবে না'। কথাগুলি যদিও আন্তরিক 'কিন্তু নারীর হৃদয় কে বুঝিবে'। তাই 'যে রতন অনেকদিন প্রভুর তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না একেবারে উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, না না তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।' চলে যাওয়ার সময় রতনকে কিছু টাকা দিতে গেলে তখনও 'রতন ধূলায় তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না-বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।' অতঃপর পোস্টমাস্টার নিঃশ্বাস ফেলে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ছাতা নিয়ে এবং মুটের মাথায় টিনের পেটরা তুলে দিয়ে নৌকা অভিমুখে চললেন।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'হিতবাদীতে' প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে মূলতঃ রতন নামক বালিকার মৌলিক একাকীত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। পোস্টমাস্টার হলেন কলকাতার এক নব্যযুবক যিনি অখ্যাত উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারী করতে এসেছেন। গল্পটি পদ্মাতীরের পল্লীবাংলার এক বালিকার বয়ঃসন্ধি লগ্নের হৃদয় উন্মীলনের বেদনা বিধুর এক কথাশিল্প।

নৌকা যখন ছেড়ে দিয়েছে বর্ষার নদী বিস্ফারিত এবং ছলছলে প্রবাহিত তখন অতি সাধারণ পোস্টমাস্টারের মনেও 'একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মকথা প্রকাশ করিতে লাগিল।' একবার ইচ্ছা হলো, ফিরে গিয়ে 'জগতের ক্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস লাগিয়াছে....নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে তবে পোস্টমাস্টারের মনে যে তত্ত্বেরই উদয় হোক না কেন রতনের মনে 'কোন তত্ত্বের উদয় হইল না।' সে ব্যাকুল চিত্তে ভাবছিল যদি দাদাবাবু শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়? ডাকঘরের চারিপাশে তাই সে ঘুরছিল। তাই তো রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন 'হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তি শাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতর প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, সবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।'

'পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টার শেষ পর্যন্ত নদীপ্রবাহে ভাসমান উদাস হৃদয় পথিক। কিন্তু পুরুষের অনাসক্তি নয়, নারীর অবোধ অনুরক্তির মধ্যে দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পটিতে শ্রেণিচেতনা অভিব্যপ্ত হয়েছে। রতন যখন তার দাদাবাবুর সাথে তাঁর বাড়ী যেতে চাইল তখন দাদাবাবুর উক্তি ছিল 'সে কী করে হবে।' এই 'সে কী করে হবে'র মধ্যেই শ্রেণিচেতনার বীজ নিহিত রয়েছে। গল্পটির ভাষা বিবৃতিপ্রধান নয় রীতিমত নাট্য তাত্ত্বিক অনুসারী। এখানে পোস্টমাস্টার চরিত্রে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং রতন চরিত্রে আলো আঁধারে ভাব অভিস্থাপিত হয়েছে। গল্পটির সমগ্র পরিসরে রতনের ভালোবাসা বাঁধ ভেঙে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এখানে একটি সাধারণ বিচ্ছেদ বেদনার গল্পকে অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এখানে কালের পটভূমে বৃহৎ জীবনস্রোতে ভাসমান মানবজীবনের অনিবার্য বিচ্ছেদবেদনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে এক গ্রাম্য বালিকার বেদনাকে বিশ্বজনীন রূপ দেওয়া হয়েছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। জীবন ও প্রকৃতি দুয়ে মিলে গড়ে তুলেছে অখণ্ড সংগীত। এখানে প্রকৃতি অমোঘ বিশ্বনীতির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই বিশ্বনীতি জীবনে কোন কিছুকেই স্থায়ী বলে স্বীকার করে না, জীবনপ্রবাহে বিচ্ছেদকে অনিবার্য সত্য বলে ঘোষণা করে। এ গল্পের আরও প্রাপ্তি নবজন্ম-রতনের নবজন্ম। ত্রয়োদশী বালিকা ভালোবাসার স্পর্শে ও প্রত্যাখ্যানে যুবতীতে পরিণত হয়েছে যার হৃদয় যুক্তি প্রমাণ মানে না, বাস্তব বাধা মানে না, কেবল ভালবাসাতে ও ধরা দিতে চায়। সুতরাং সঠিক বিচারে একথা বলার আর কোন দ্বিধা থাকার কথা নয় যে পোস্টমাস্টার গল্পটিই হিতবাদী পর্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

৭.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নিরুপমার বাবার নাম কি?

২. 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'—এখানে লেখক কি বলতে চেয়েছেন?

৩. 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বালিকাটির নাম কি?

৪. 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টার কোন গ্রামে চাকরি করতে এসেছিলেন?

৫. 'দেনাপাওনা' গল্পে সমাজের যে কুপ্রথার কথা প্রকাশিত, সেটি উল্লেখ করে মূল গল্পের পরিণতি বিশ্লেষণ করো।

৬. পোস্টমাস্টার গল্পে যে তত্ত্বটি ব্যঞ্জনাকারে প্রকাশিত সেটি আলোচনা করো।

৭.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১০
সাধনা ও ভারতী পর্ব

বিন্যাসক্রম

৭.৩.১০.১ : ভূমিকা
৭.৩.১০.২ : ছুটি
৭.৩.১০.৩ : মেঘ ও রৌদ্র
৭.৩.১০.৪ : ক্ষুধিত পাষাণ
৭.৩.১০.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.৩.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.১০.১ : ভূমিকা

পূর্বে আলোচিত 'হিতবাদী' পর্ব অতিক্রম করে 'সাধনা-ভারতী' পর্বে রবীন্দ্রছোটগল্প আরও গভীরতর বিষয় আহরণের পথে যাত্রা করেছে এবং গভীর শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই সময়ের গল্পগুলির মধ্যে 'কঙ্কাল', 'অতিথি', 'ত্যাগ', 'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কাবুলিওয়ালা', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি তাঁর অন্যতম সেরা গল্প। আমোদের আলোচ্য গল্পসমূহের মধ্যে 'ছুটি' গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে এক পল্লীশিশুর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়েছে এবং শহরের কৃত্রিম আবহে পল্লীশিশুর এই অকালমৃত্যু গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। 'সাধনা' পত্রিকারই ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গল্পটিতে ইংরেজ আমলে এদেশীয় মানুষের বিপর্যস্ত ও অসহায় সহ্য করতে হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে এই সমস্যামূলক গল্পটি রচিত হয়েছে। শেষোক্ত গল্পটি একটি রোমান্টিক স্বপ্নের মতো, যেখানে স্নায়বিক টেনসন টান টান করে ধরে রেখেছে সমস্ত গল্পের অবয়বকে।

৭.৩.১০.২ : ছুটি

১২৯৯ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছুটি' গল্পটি শিশু মনস্তত্ত্বের এক ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। ছিন্নপত্রাবলীর নিম্নধৃত পত্রখানিতে গল্পটির প্রেক্ষাপট খুঁজে পাওয়া যায়—

"ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'শাবাস জোয়ান হেঁইয়া!'

সব কটায় মিলে চীৎকার এবং ঠেলা মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরেছি অমনি সকলের আনন্দের উচ্চাহাস্য"। (পত্র ২৪, সাজাদপুর, জুন ১৮৯১)।

ফটিক তার ভাই মাখনকে নিয়ে খেলছিল। ফটিকের প্রস্তাব মতো মাখনকে সহ ঐ কাঠ গড়াতে গেলে মাখন পড়ে যায়। এবং রেগে গিয়ে ফটিককে অন্ধভাবে মারতে থাকে। মাখন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে যায়। বাইরে থেকে একটি নৌকা ঘাটে এসে লাগে। অর্ধবয়সী এক ভদ্রলোক চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী কোথায় জানতে চাইলে ফটিক অনির্দিষ্টভাবে উত্তর দেয় 'ঐ হোথা'। পুনরায় প্রশ্ন করলে বলে 'জানিনে'। অচিরেই ফটিকের মা ফটিককে ডেকে পাঠান। মাখনকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়। মা ফটিককে প্রহার করেন। ফটিক মাকে ঠেলে দেয়। অর্ধবয়সী ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেন ইনি ফটিকের মামা। ফটিকের অবাধ্যতার জন্য মামা বিশ্বম্ভর ফটিককে নিয়ে কলকাতায় রওনা হন। কলকাতায় মামীর সঙ্গে ফটিকের সম্পর্ক তেমন সুখের হয়নি।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছুটি' গল্পটি শিশু মনস্তত্ত্বের এক ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। শহর বনাম গ্রাম এবং মামী বনাম মা অর্থাৎ উদার গ্রামের মাঠ-ঘাট-নদী ও মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতি বনাম শহুরে কৃত্রিম জীবন গল্পটিতে ফুটে উঠেছে।

মামীর স্নেহহীন চোখে সে যে দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হয় এতেই ছিল তার দুঃখ। শুধু তাই নয় গ্রামের খোলামেলা প্রকৃতির কাছে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কলকাতা শহরের পরিবেশ তার কাছে কারাগার সদৃশ হয়ে ওঠে। ফটিক এই অসহায় পরিস্থিতিতে মামাকে মার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বারংবার আবেদন করে। মামা বলেন স্কুলের ছুটি হোক। কিন্তু তার তখনো অনেক দেরি। ফটিক এর মধ্যে বই হারিয়ে মামীর কাছে তিরস্কৃত হয়। এভাবে ক্রমেই অভিমানপুঞ্জ ঘনীভূত হয়ে ফটিক প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়। সে বোঝে তার এই অসুখ মামী ক্ষমা করবে না। সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেদিন প্রবল বর্ষণ। অসুস্থ ফটিককে পুলিশের লোক গাড়ী থেকে নামায়। বিশ্বম্ভর পূর্বেই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। ফটিকের অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। সে মায়ের প্রতীক্ষায় থাকে এবং বিড়বিড় করে বকতে থাকে 'একবাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না'। কলকাতায় আসার পথে স্টীমারের খালাসিরা জল মাপছিল 'ফটিক তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না'। এমন সময় ঝড়ের বেগে ফটিকের মা ঘরে ঢুকে ফটিকের বিছানায় আছাড় খেয়ে পড়েন এবং ডাকেন 'ফটিক সোনা মানিক আমার'। ফটিক সাড়া দেয় কোনক্রমে। মা আবার ডাকেন—'ওরে ফটিক, বাপধ্ন রে, 'ফটিক ধীরে ধীরে পাশ ফিরে মৃদুস্বরে উত্তর দেয়, 'মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।'

গল্পটিতে এক পল্লীশিশুর মনস্তত্ত্বকে নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শহর বনাম গ্রাম এবং মামী বনাম মা অর্থাৎ উদার গ্রামের মাঠ-ঘাট-নদী ও মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতি বনাম শহুরে কৃত্রিম জীবন এইভাবে সাদৃশ্য বৈপরীত্যের সূত্রে গল্পটিকে হাজির করানো যেতে পারে। গল্পটির শেষ পর্বে ফটিকের প্রলাপ 'এক বাঁও মেলে না দো বাঁও মেলে-এ এ না' অন্তহীন বিস্তৃতিতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার এক বেদনাবিধুর পরিবেশ তৈরী করে। এ যেন গ্রাম জীবনের পরিচিত ক্ষেত্র ছেড়ে শহর জীবনে এসে নিষ্ঠুর নিয়ম শাসনের তলহীন সীমাহীন রূপের প্রতি শিশুমনের বিস্ময়।

৭.৩.১০.৩ : মেঘ ও রৌদ্র

'মেঘ ও রৌদ্র' মূলতঃ সমস্যামূলক গল্প যেখানে প্রধানত- ইংরেজ আমলে এ দেশীয় মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'সাধনায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'অপমানের প্রতিকার' শিরোনামে। সেই প্রবন্ধে তিনি যা বলেছেন সেই দেশের দুর্বল মানুষের অসহায়তার কথাই 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে বিন্যস্ত হয়েছে। সভ্য ইংরেজ জাতির বর্বর আচরণে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেইসঙ্গে স্বদেশবাসীর এক গোষ্ঠীর দাসসুলভ তাঁবেদারিতে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন 'স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠেতে পারে নাই।' তিনি আরও অনুভব করেছিলেন 'যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাঁহার সহায়তা করিতে যাইব তাঁহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না। কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নবপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে।' তবে রবীন্দ্রনাথ হতাশাবাদী নন। তিনি অটল ন্যায়প্রিয় 'দু-চারি জন' মানুষের প্রতি ভরসা করেন এবং তাঁদের হাতে জাতীয় বন্ধন এবং ন্যায়বিচার পাবার অধিকার আশা করেন। অতএব দেশ কাল সমাজের এই বহুবিধ সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে অতি সন্তর্পণে আলোড়িত করেছিল যার প্রতিফলন দেখা গেল আলোচ্য 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে দেশ-কাল-সমাজের এক বহুবিধ সমস্যা রূপায়িত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র শশিভূষণ আদর্শবাদী ও ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বভাবের। লেখক চেয়েছিলেন পদ্মার বোটে বসে গিরিবালা নাম্নী মানবীর মেঘ ও রৌদ্রের কাহিনি শোনাবেন, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির লীলা রচনায় বাধা পড়েছিল আমলাবর্গের উপস্থিতির কারণে।

রবীন্দ্রনাথ আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অত্যাচার সামন্ততান্ত্রিক নায়েব গোমস্তার অন্যায় ষড়যন্ত্র স্বাজাতির ইংরেজের তাঁবেদার হয়ে ওঠার চেষ্টা, সাধারণ গ্রামবাসী এবং শ্রমিক পল্লীসমাজের দুর্বলতাকে গভীর চোখে দেখেছিলেন। আলোচ্য গল্পে তারই রূপায়ণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের ১২৩ নং পত্রে (১৮৯৪, ২৭ জুন) ইন্দিরাকে লিখেছেন—'কাল থেকে আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট্ এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না। কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনি পৃথিবীর উপকার হয়, নিজের একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।' এভাবেই 'মেঘ ও রৌদ্র' রচনার সূত্রপাত। এই গল্পের প্রেরণা স্বরূপ একটি সত্য ঘটনা আছে। সেটি খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট বেট্সন্ বেল্ এর এক মুহুরীকে প্রহারের ঘটনা। এই নিয়ে মোকদ্দমা হয় এবং সেই বিচারের সওয়ালের সময় বাঙালী ব্যারিস্টারের অপমানকর স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে, যার ফসল পূর্বে উক্ত প্রবন্ধটি। এই সমস্ত প্রেক্ষিত মেঘ ও রৌদ্র রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের প্রধান চরিত্র হল শশিভূষণ যার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গল্পটিতে প্রধানত দুটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে যেগুলি সাধারণভাবে একে অপরের উপরে প্রভাব ফেলেনি। প্রথম কাহিনিতে ইংরেজের হাতে স্বদেশীয় লাঞ্ছনা এবং স্বচ্ছল এক শ্রেণির মানুষের তাঁবেদারির কথা, সেইসঙ্গে মহৎ প্রাণ শশিভূষণের ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনিতে শশিভূষণ-গিরিবালার ব্যক্তিগত কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। গল্পটির দ্বিতীয় কাহিনিতে গিরিবালা এক স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্যতা লাভ করেছে এবং এখানে শশিভূষণ গিরিবালার পারস্পরিক সম্পর্ক আলো আঁধারি আবেগে আচ্ছন্ন হয়েছে। শশিভূষণের স্বাতন্ত্র্য তাকে গ্রামের লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। শশিভূষণের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ সে কোন বিষয়বুদ্ধির কাজ করে

না এবং 'বিবাহ করিতে সম্মত নয়'। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন 'মানুষের মধ্যে তাহার সম্পর্ক ছিল গিরিবালার সহিত'। গিরিবালার পড়ুয়া দাদারা তাকে লেখাপড়া শেখাতে রাজী না হওয়ায় শশিভূষণের কাছেই গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে গিরিবালার বৈষয়িক বাবা হরকুমারের সঙ্গে শশিভূষণের আনুকূল্য চায় কিন্তু শশিভূষণ এ বিষয়ে একেবারেই নারাজ। একটি মোকদ্দমায় প্রজাদমনের জন্য শশিভূষণের আনুকূল্য চায় কিন্তু শশিভূষণ এ বিষয়ে একেবারেই নারাজ। একটি মোকদ্দমায় পরাজিত হয়ে হরকুমারের মনে হয় শশিভূষণই এজন্য দায়ী। তাই শশিভূষণকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে হরকুমার উঠে পড়ে লেগে যায়। শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির শশিভূষণ গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে উদ্যত হয় কিন্তু জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গ্রামে এসে পড়ায় এবং তাকে নায়েব ইচ্ছামতো খুশি করতে না পারায় হরকুমারকে ডাকিয়ে এনে লোকারণ্যের মধ্যে মেথরকে দিয়ে দৈহিক নিপীড়ন চালায়। এই অবস্থায় উত্তেজিত শশিভূষণ হরকুমারকে দেখতে গেলে হরকুমার শশির হাত ধরে ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকে। শশিভূষণ ব্যাকুল হরকুমারকে মামলা করবার পরামর্শ দেয়। একথা শুনে ভয় পেয়েও হরকুমার নিজের সম্মান রক্ষার্থে মামলায় রাজী হয় এবং শশিভূষণকে গ্রামে থেকে যেতে অনুরোধ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে হরকুমারের বিশ্বাসঘাতকতায় শশির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসন ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে শশি মামলা নিয়ে আইনের পড়াশোনায় ব্যস্ত ও বিব্রত থাকায় গিরিবালা তার হৃদয়ের উপচার নিয়ে বারবার গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। অভিমানে গিরিবালার দুচোখ ভরে জল আসে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায় ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মোকদ্দমা আকস্মিকভাবে মিটে গেছে। হরকুমার ম্যাজিস্ট্রেটকে তৈলমর্দন করে জেলার বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়। শশিভূষণ আবার আইনের কালো মোট বইগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং গিরিবালাকে খুঁজতে থাকে। গিরিবালা আর আসে না। শশিভূষণ গিরিবালার অসুখ করেছে ভেবে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারে গিরিবালার পাত্র স্থির হয়েগেছে। তার আগেই গিরিবালা 'শশিদার বাড়ি' যেতে গিয়ে বাবা হরকুমারের দ্বারা তিরস্কৃত হয় এবং সেদিন থেকে তার বাড়ির বাইরে পদক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়।

গল্পটিতে নায়িকার পিতা ধূর্ত স্বার্থান্ধ ভিলেনের ভূমিকা গ্রহণ করে। শশিভূষণ আদর্শবাদী, বিদেশী ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীস্বভাব এবং মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় গিরিবালার প্রতি মন দিতে পারে না। তাই সপ্তম পরিচ্ছেদে যখন গিরিবালার বিয়ের সানাই বাজছিল তখন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকাযোগে কলকাতা যাচ্ছিল। কিন্তু পথে আবার বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এখানে এক ইংরেজ আমলা তুচ্ছ কারণে গুলি করে নৌকা ডুবিয়ে এদেশের দরিদ্র মানুষকে বিপন্ন করে। মাঝিমাল্লা যারা বেঁচে ছিল তাদের নিয়ে শশি গ্রামে ফিরে আসে। অত্যাচারী সাহেবের বিরুদ্ধে পুলিশে দরখাস্ত করতে অনুরোধ করে মাঝিকে। সে সম্মত হয় না। দেশের অপদার্থতাকে ধিক্কার দিয়ে শশি একাই মোকদ্দমার কাজ চালায়। কিন্তু সাহেব ব্যারিস্টারী প্যাঁচ খাটিয়ে মুক্তি পায়। এই চিত্তদাহ নিয়ে শশিভূষণ গ্রামে ফিরে আসে এবং দেখে সেদিনই নৌকা সাজিয়ে গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিনা আহ্বানেই শশিভূষণ নদীতীরে উপস্থিত হয় এবং চকিতে একবার নববধূকে দেখতে পায়। গিরিবালা জানতেও পারেনা তার শশিদাদা এই বিদায় বেলায় নদীতীরে উপস্থিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদে শশিভূষণ নদীপথে কলকাতায় যাচ্ছিল। এবারও এক বিভ্রাট উপস্থিত হলো। এক পুলিশ সাহেব জেলেদের ওপর অত্যাচার করছিল। শশিভূষণ সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে আপমান করা হলো। তখন শশিভূষণ সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন'।

বলাই বাহুল্য পুলিশের থানায় শশিভূষণকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার শরীরে ও মনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হলো। নবম পরিচ্ছেদে দেখা গেল শশিভূষণের বাবা উকিল ব্যারিস্টারের সাহায্যে প্রথমে শশিকে খালাস করেন। তারপর মোকদ্দমা। মোকদ্দমায় 'শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিকিতে পারিল না।' তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। অতঃপর শশিভূষণ তার প্রিয় গ্রন্থগুলি ফেলে জেল খাটতে গেলো। তার পিতা আপিল করিতে উদ্যত হলে তাকে নিষেধ করলেন বললেন, 'জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর যদি সৎসঙ্গের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত বাহিরে অনেক বেশি।'

দশম বা শেষ পরিচ্ছেদে শশিভূষণ অন্যায় ও তার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অত্যাচারমূলক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছে, ভাই বাইরে কর্মরত থাকায় সেখানেই বাড়ী করে বাস করছে আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিষয়সম্পত্তির অধিকাংশই হরকুমার অত্মসাৎ করে নিয়েছে। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজে জীবনযাত্রার ছিন্নসূত্র আবার কোথা থেকে সূচনা করবেন তাই ভাবছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তার সামনে দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য এসে জিজ্ঞাসা করল 'আপনার নাম শশিভূষণবাবু'? শশিভূষণ পথচারীদের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াতে বাদানুবাদ না করে গাড়িতে উঠে পড়লো। ভাবলো এতে নিশ্চয় কোন ভ্রম হচ্ছে। পথে একজন ভিক্ষুক দৃশ্যগোচর হল যারা গুপিযন্ত্র-খোল সহযোগে গাইছিল 'এসো এসো ফিরে এসো-নাথ হে ফিরে এসো!' গানের কলি ক্রমশ ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু গানের কথা শশিভূষণের পরাণবীণায় নতুন রাগিণীর আলাপ শুনিয়ে গেল। একটু পরেই শশিভূষণ বুঝতে পারলো সে কোথায় এসেছে। মৃদ শব্দে সচকিত শশি দেখলো রুপোর থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন রেখে অদূরে অপেক্ষারত গিরিবালা। মাথা তুলতেই 'নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।' গিরিবালা ভগ্নশরীর ম্লানমুখ শশিভূষণের দিকে স্নিগ্ধ চোখে দেখলো এবং তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।' শশিভূষণ কোন ভাষা খুঁজে পেল না। অবরুদ্ধ অশ্রুবাষ্পে তার বাক্যপথ রুদ্ধ হয়ে গেল তখনও মুদির দোকানের সামনে ভিক্ষুকদল গেয়ে চেলেছে

'এসো এসো ফিরে এসো...
আমায় শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো....।'

'মেঘ ও রৌদ্র' শুধু আকারের দিক থেকেই নয় জীবনের নানা ব্যঞ্জনায় ছোটগল্পের চেয়ে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ বিপরীতধর্মী বিবিধ জটিল ঘটনার সাহায্যে ছোটগল্পের এক-লক্ষ গতিপথে জটিল বহুমাত্রিক আবর্ত তথা একাধিক শীর্ষবিন্দু রচনা করেছেন যা মূলত বড়গল্প বা উপন্যাসের আঙ্গিকেই প্রত্যাশিত তবে এক্ষেত্রে গল্পটির এই লক্ষণগুলিকে উপন্যাসের সম্ভাবনা বলা সংগত নয় বরং বড়গল্প বা নভেলেট বলা যেতে পারে। গল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও দশম পরিচ্ছেদে গল্পের মূল রসাবেদন সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের দুটি স্বতন্ত্র কাহিনিবৃত্ত এবং শশিভূষণের বাইরের বৃহত্তর জগতের কাহিনিতে একাধিক ঘটনাংশের সমাবেশ ছোটগল্পের নির্দিষ্ট পরিমিতিকে দ্বিধান্বিত করেছে। দুটি কাহিনিকে মেলাতে গিয়ে গল্পকারকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হয়েছে এবং স্বাভাবিক নিয়মে গল্প পরিণামমুখী হয়নি। এখানে শশিভূষণ-গিরিবালার মধুর যন্ত্রণাময় কাহিনিবৃত্তের পাশে দ্বিতীয় কাহিনিবৃত্তটি বাইরের ঘটনার অস্থির চাঞ্চল্য অতিরিক্ত বর্ণাঢ্য হয়েছে। শুধু তাই নয় শশিভূষণের আমলাতন্ত্রিক বিরোধে গিরিবালার কোন ভূমিকাই ছিল না। শশিভূষণের ক্রামগত পরাজয় তার কাছে অজ্ঞাত ছিল বলেই

প্রিয়জনের বেদনার অংশীদার হতে তাকে দেখা যায়নি। লেখক জন্মলগ্নে গিরিবালার কাহিনি লেখার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, চেয়েছিলেন পদ্মার বোটে বসে গিরিবালা নাম্নী মানবীর মেঘ ও রৌদ্রের কাহিনি শোনাবেন, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির লীলা রচনায় বাধা পড়েছিল আমলাবর্গের উপস্থিতির কারণে। ব্যঞ্জনাময় ও গূঢ়ার্থবাচক নামকরণের এই ছোটগল্পের রসাবেদন স্থানে স্থানে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বড়গল্প এবং বেদনাময় প্রেম মাধুর্যমণ্ডিত কাহিনিরূপে এ গল্প অসামান্য।

৭.৩.১০.৪ : ক্ষুধিত পাষাণ

১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি রবীন্দ্র ছোটগল্পের ধারায় একটি ভিন্নধর্মী গল্প। মনের একটি বিশেষ 'মুড', মানসিক বিকৃতির এক অপূর্ব গীতিময় প্রকাশ গল্পটিকে এই বিশেষ মাত্রা দান করেছে। এই গল্পটির পূর্বে রচিত 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত', 'নিশীথে' কিংবা পরবর্তীকালে রচিত 'মণিহারা' গল্পটির সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও 'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রসাহিত্যে একক, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ-নিভর গল্পগুলির মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ' সত্যিই তুলনাহীন।

গল্পটির উৎস প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমেদাবাদের বাসভবনটির উল্লেখ করছেন। এই বাসভবনটি একটি পূর্বতন নবাব প্রাসাদ। 'ছেলেবেলা'য় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেই বাসভবনটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— 'দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে, বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি.....আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের।'

মূল গল্পটি একটি রোমান্টিক স্বপ্নের মতো। এর পটভূমি চড়া পর্দার রোম্যান্স। এক রেল জংশনে ওয়েটিং রুমে মধ্যরাতে এক বিচিত্র যাত্রীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি। গল্পটির মূলে আছে সেই আড়াইশো বছরের পুরোনো প্রাসাদ, দ্বিতীয় শাহ্ মামুদ যেটি ভোগবিলাসের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। গল্পকথক এই প্রাসাদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। গল্পের শুরু এই মোহজাল বদ্ধ হওয়ার বর্ণনায়। লেখক বক্তা গল্পটিকে আগাগোড়া বানানো বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন আর তারই পরিণতিতে ওই দিব্যজ্ঞানী আত্মীয়ের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। তবে গল্পের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে ক্ষুধিত পাষাণের তৃষ্ণার্ত হাহাধ্বনি সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাসাদের অন্দরে যারা ত্রিরাত্রি বাস করেছে তারা কেউ এর গ্রাস এড়াতে পারেনি। ব্যতিক্রম মেহের আলী। সে এই পাষাণ রাক্ষসের মোহজাল ছিন্ন করে বাইরে আসতে পেরেছিল তবে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে করতে মেহের আলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'সব ঝুট হ্যায়'। মেহের আলির এই প্রলাপ গল্পটির আবহ রচনা করেছে। মেহের আলি বেরিয়ে আসলেও মাশুল কালেকটরের চাকুরী নিয়ে আসা ব্যক্তিটি এই প্রাসাদের মোহাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ তাকে ঐ প্রাসাদে রাত্রি যাপন করতে নিষেধ করেছিল। ভৃত্যরাও রাত্রে এখানে থাকতে রাজি হয়নি, তবু এই প্রাসাদে সে থেকেই যায় আর সাতদিনের মধ্যে এই মোহপুরী তাকে পেয়ে বসে। এই প্রাসাদের সিঁড়িতে হঠাৎ একদিন পায়ের শব্দ শোনা গেছে। যেন একসাথে অনেকে ঘাটের পথ বেয়ে নেমে আসছে। সকৌতুক কলহাস্যের রব শোনা গেল। সেই শুরু। আড়াইশো বছরের অতীত যেন পাষাণের রূপ ধরে মোহবিস্তার করেছে। আর সেই মোহ ছড়িয়ে গেছে গল্পকথকের মনে। অথচ সেই গল্পকথক

কে তার পরিচয় নেই। গল্পের পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা সবই ছায়াচ্ছন্ন। স্পষ্ট করে বোঝা যায় না, উপলব্ধি করা যায়। গল্পকথক করিম খাঁর কাছে এই পাষাণ রাক্ষসের থেকে উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করলে সে ইরাণী ক্রীতদাসীর কথা বলবার উপক্রম করতেই ট্রেন এসে গিয়েছিল। তা সেই ইরাণী ক্রীতদাসী কে তাও জানা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় তার ক্রন্দনধ্বনি, অশ্রুত-স্বর। সব মিলিয়ে এক অধরা ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশই এইগল্পশৈলীর মূলে। সেখানেই লেখকের জাদু, বর্ণনার কৌশল।

ক্ষুধিত পাষাণ একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। অর্থাৎ এই গল্পের বিষয় সামাজিক বা পারিবারিক কোন ঘটনা নয় মূলত ভৌতিক, যুক্তিবুদ্ধির অতীত ঘটনা ও অনুভূতি অতিপ্রাকৃত গল্পে রূপায়িত হয়। অতিপ্রাকৃত গল্পে প্রাকৃত জগতের অতীত কোনো অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত এক পরিবেশ সৃজন করা হয় এবং সেই পরিবেশকে প্রাকৃত পরিবেশের পাশে স্বতন্ত্রভাবে অভিস্থাপন করা হয় ও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে শঙ্কা শিহরিত পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। সুতরাং অতিপ্রাকৃত জগতে বোধ বুদ্ধি সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে না। সেখানে ছায়াঘেরা অনুভূতি আর অনুভবের জগৎ রূপায়িত হয়।

১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি রবীন্দ্র ছোটগল্পের ধারায় একটি ভিন্নধর্মী গল্প। 'ক্ষুধিত পাষাণ' একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। গল্পটির পরিমণ্ডলের স্বার্থে সৃষ্ট মেহের আলি চরিত্রটিও অসাধারণ সৃষ্টি। তাই 'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রসাহিত্যের একক, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ।

ক্ষুধিত পাষাণ অতিপ্রাকৃত গল্পরূপে এক সার্থক রসসৃষ্টি। ভাষা ও রচনাশৈলী সেই সার্থকতা সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। গল্পটির পরিমণ্ডলের স্বার্থে সৃষ্ট মেহের আলি চরিত্রটিও অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পটির গভীরে সত্য ও তাৎপর্য নিহিত আছে সংবেদনশীল হৃদয়ের জন্য। অতএব ক্ষুধিত পাষাণ এক অসাধারণ অতিপ্রাকৃত গল্প একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭.৩.১০.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'ছুটি' গল্পে ফটিকের ভাইয়ের নাম কি ছিল?

২. ফটিকের মামা বাড়ি কোথায় ছিল?

৩. 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের মূল চরিত্রটির নাম কি?

৪. 'মেঘ ও রৌদ্র' সমস্যামূলক গল্প কেন?

৫. 'ক্ষুধিত পাষাণ' কোন শ্রেণির গল্প?

৬. 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি কোন পত্রিকায়, কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল?

৭. 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৭.৩.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার —ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১১
সবুজপত্রের গল্প

বিন্যাসক্রম

৭.৩.১১.১ : ভূমিকা

৭.৩.১১.২ : স্ত্রীর পত্র

৭.৩.১১.৩ : হালদার গোষ্ঠী

৭.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.১১.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্র ছোটগল্পের বিবর্তনের ধারায় 'সাধনা-ভারতী' পর্বের পরে (প্রায় ৮বছর পরে) 'সবুজপত্র' পর্বের সূচনা হয়েছে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প স্পষ্টতই বাঁক নিয়েছে। প্রাক 'সবুজপত্র' পর্বের গল্পে রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় রসিক শিল্পীর মতো জীবনকে দেখেছেন, শিল্পীর তুলিতে সেই জীবনের খণ্ড দৃশ্য অঙ্কন করেছেন, কিন্তু সবুজপত্র পর্বে তিনি জীবনের সমালোচকও বটে। প্রাক্ সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প হল জীবনের রূপরচনা "impression of life" পক্ষান্তরে সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের ভাষ্যরচনা :"Story around an impression" এই পর্বে 'স্ত্রীরপত্র', 'বোষ্টমী', 'হালদার গোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে ভাষায় আঙ্গিকগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাগুক্ত গল্পগুলির মধ্যে 'স্ত্রীর পত্রে' এক অবরোধবাসিনীর মুক্তি অকাঙ্ক্ষা যথার্থ রূপ লাভ করেছে।

১৩২১ বঙ্গাব্দে 'স্ত্রীরপত্র' গল্পখানি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে নারীর ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের যে পথ মৃণাল দেখিয়েছে তা এক কথায় অভিনব। পত্নীত্ব নয় মনুষ্যেত্বেই নারীর পরমত্ব। যা রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চলিত ভাষায় গল্প।

৭.৩.১১.২ : স্ত্রীরপত্র

আমাদের এইপর্বের আলোচ্য প্রথম গল্পখানি 'স্ত্রীরপত্র'—একটি ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের গল্প যেটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে এক অবরোধবাসিনীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের যে পথ মৃণাল দেখিয়েছে তা এককথায় অভিনব। গল্পটির শিরোনাম থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে এটি পত্রাকার গল্প। গল্পটিতে একটি বিষয়ে মৃণাল যেন জোর দিয়েছে—'আমি তোমাদের মেজ বউ' আবার সাহস করে লেখা তার এই চিঠিখানিতে জানিয়েছে 'এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয়।' পত্নীত্ব নয় মানুষ্যত্বেই নারীর পরমত্ব। 'স্ত্রীর পত্র' তাই শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের আবিষ্কারে গিয়ে আর 'স্ত্রীর পত্র' থাকেনি। মনুষ্যত্বের নতুন ঠিকানা লাভের আশায় এক স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পত্র হয়ে উঠেছে।

'স্ত্রীর পত্র' মূলত একটি পত্র যেখানে একটি পরিবারের কীর্তি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মৃণাল তীর্থ করতে এসে স্বামীকে পত্র লিখেছে কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির সম্পন্ন পরিবারের মেজ বউ হয়ে মৃণাল এই প্রথম শ্রীক্ষেত্রে এসে স্বামীকে পত্র লেখার সুযোগ পেয়েছে। পরিবারের কেউ জানত না যে মৃণাল সকলের অগোচরে কবিতা লেখে। এখানে কবিতা ছিল তার মুক্তির উপায়। যথাসময়ে সে একটি মেয়ের জন্মও দিয়েছিল। জন্মেই মেয়েটি মারা যায়। ঠিক এই সময়ে বড়জায়ের অত্যাচারিতা অনাথা বোন বিন্দু দিদির কাছে এসে আশ্রয় নিতে চাইল। তখন মৃণাল তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। কিন্তু বাড়ীর সকলের বিষদৃষ্টিতে বিন্দুকে যখন এই বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হল ঠিক সেই সময় মৃণাল প্রতিবাদ করেছে। বিন্দুকে যখন কৌশলে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তখন মৃণালের বড় জা সহজেই বলতে পেরেছে—'ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক ছাগল হোক স্বামীতো বটে।' এখানে বঞ্চিত লাঞ্ছিত নারীর হয়ে মৃণালের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের সূত্রে তথাকথিক ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও মৃণালের বিদ্রোহিনী সত্তার আত্মপ্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে। মৃণাল দেখেছে কিভাবে বিন্দু সমস্ত অপমানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পাগল স্বামীর ঘর ছেড়ে বিন্দুকে ফিরে আসতে হয়েছিল মৃণালের শ্বশুরগৃহে। যদিও তার এই ফিরে আসা কেউই মেনে নিতে পারেনি। তার অত্যাচারের কথাকেও কেউ আমল দিতে চায়নি। মৃণাল তাকে ঘরে বন্দী করে চেষ্টা করেছিল। ভালবাসার একমাত্র পাত্রীকে তারই জন্য গঞ্জনা সহ্য করতে হবে বলে বিন্দু স্বামী গৃহে ফিরে এসেছে। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। অবশেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে সে মুক্তি পেচে চেয়েছে। মৃণাল অনুভব করেছে এই সংসার— এই সমাজ নারী হত্যার এক একটি অন্ধকূপ। নিজের বুদ্ধিশক্তির উপর না দাঁড়াতে পারলে নারীদের মুক্তি নেই। মৃণালের স্বামী তার সংসারে প্রভুত্ব এবং অফিসে গোলামী করে জীবনপাত করেছে। বিন্দু বা মৃণালের দেখবার সুযোগ তাদের নেই। তাই 'শ্রীচরণকমলেষু'র মধ্যে দিয়ে পত্রের যে সূচনা 'তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন' মৃণালের মধ্যে দিয়েই তার পরিসমাপ্তি। স্বামীর চরণকমলেই স্ত্রীর আশ্রয়। শেষে সেই চরণতলাশ্রয় ছিন্ন করে মৃণাল তার স্বাধীন মনুষ্যত্ব অর্জন করেছেন। মৃত্যুর পথে নয় জীবনের পথে মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছে মৃণাল। তাই স্ত্রীর পত্র হয়ে উঠেছে এক অবরোধবাসিনীর যথার্থ মুক্তি আকাঙ্ক্ষার কাহিনি যে কাহিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চলিত ভাষায় গল্প।

৭.৩.১১.৩ : হালদার গোষ্ঠী

এই পর্বের আমাদের তৃতীয় আলোচ্য গল্প হল 'হালদারগোষ্ঠী' যেটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখের সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে আমরা দেখেছি একটি জমিদার বংশ কতকগুলি অচল-অনড় মূল্যবোধ নিয়ে ব্যক্তি মানুষকে গ্রাস করতে চেয়েছে। গল্পটির নায়ক বনোয়ারীর এই লড়াই বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির লড়াই বা প্রকারান্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। গল্পটির বাইরের চেহারায় জমিদার-প্রজার সংঘাতের মতো সামাজিক সত্যের বাস্তবায়ন ঘটেছে। মধু কৈবর্তের সঙ্গে জমিদারের লড়াইয়ে বনোয়ারী কৈবর্ত প্রজার পক্ষ নিলে মধু কৈবর্ত জয়ী হয়েছে। কিন্তু জমিদারী রাখতে সত্যের অপলাপ ঘটানো হয়েছে। জমিদারই গোপনে টাকা দিয়ে মধুকে দেশান্তরী করে রটিয়ে দিয়েছেন মধুকে অমাবস্যার রাতে মা-কালীর সামনে বলি দেওয়া হয়েছে যেহেতু সে জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু এই গল্প গোঁসাইগঞ্জের হালদার গোষ্ঠীর গল্প হয়ে থাকেনি গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তিমানুষের কাহিনি এই গল্প। বনোয়ারীর মধুর পিছনে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল নায়েব নীলকণ্ঠের প্রতি বিরূপতা, মধুর ন্যায়

দুর্বল মানুষের প্রতি মমত্ব সর্বোপরি আপন বধূ কিরণকে একান্ত করে পাওয়ার স্বার্থে তার কাছে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদানের ইচ্ছা প্রভৃতি একাধিক কারণ। বনোয়ারী সে পথে বাধা পেয়েছে একাধিকবার। ইপ্সিত জয়ের লক্ষ্যে সে যতই পিছিয়ে পড়েছে ততই চরিত্র বাঁক নিয়েছে নতুন নতুন অভিমুখে।

কিরণ সম্পর্কে অসাধারণ সংবেদনশীল ছিল বনোয়ারী। বনোয়ারী ইচ্ছা করলে সংসারের গতানুগতিক চাকায় বাঁধা জীবনযাপন করতে সম্মত থাকলে সে প্রভূত সম্পত্তি পরিবার পরিজনসহ একটি মোটাসোটা গোলগাল বড় বউএর পদে আসীন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছন্দে সুখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতো। বনোয়ারীও স্ত্রীর পত্রের মৃণালের ন্যায় কবিতাপ্রেমিক নিসর্গ রসিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। সে-ও দুর্বলের প্রতি অবিচার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আত্মীয়স্বজন এমনকি স্ত্রী সহানুভূতি পায়নি। তাই যে সংসারে বিচার-বিবেচনা অনুভূতি, প্রেম এমনকি স্বপ্নও নেই যেখান থেকে কিরণলেখাও গেছে হারিয়ে সেখানে থেকে আর কী হবে এই প্রশ্ন বনোয়ারীর সমগ্র হৃদয় জগৎকে মন্থিত করেছে। এখানে কিরণ বনোয়ারীর স্ত্রী নয় মুখ্যত হয়ে উঠেছে হালদার গোষ্ঠীর বধূ। তাই বনোয়ারীর কোন সন্তানাদি না হলে এই নারী তা নিজেরই অক্ষমতা মনে করে বনোয়ারীর দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি করেনি। কিন্তু বেনায়ারী এই হীন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কিরণকে আপন মনের দোসর করে তুলতে চেয়েছে, তা ব্যক্তিসত্তাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। অথচ কিরণ বনোয়ারীর এই আচরণে সে হতবাক হয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ভাইপো হরিদাসকে নিয়ে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেছে কিরণ বনোয়ারীর কেউ নয়, সে সুবিখ্যাত গোঁসাইগঞ্জের হালদার বংশের বড় বউ। অতএব বনোয়ারীর নিঃসঙ্গতা দূরীভূত হয়নি। সুতরাং আদর্শনিষ্ঠ রুচিবান মানুষটি আশ্রয়চ্যুত হয়ে চিঠি লিখে আবাস ত্যাগ করেছে। তার এই নিঃসঙ্গতার মূল কারণ বহুলাংশে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। কিরণকে ঘিরে বনোয়ারী চরিত্রের ঘোরাফেরা এবং মনোভূমির পরিচয় এই গল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

৭.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'স্ত্রীর পত্র' কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

২. 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে লেখক কি বলতে চেয়েছেন?

৩. 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের নায়কের নাম কি?

৪. বনোয়ারীর নিজের বংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণ কি?

৫. 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে লেখকের জীবনদৃষ্টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৬. হালদার গোষ্ঠী গল্পে পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে লেখক কোন গূঢ়ার্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন আলোচনা করো।

৭.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার —ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১২
শেষ পর্যায়ের গল্প

বিন্যাসক্রম :

৭.৩.১২.১ : ভূমিকা

৭.৩.১২.২ : রবিবার

৭.৩.১২.৩ : শেষ কথা

৭.৩.১২.৪ : ল্যাবরেটরি

৭.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.১২.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্র ছোটগল্পের অন্য পর্যায়গুলি অতিক্রম করে অন্ত্যপর্বে উপস্থিত হলে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ এই সময় নারী পুরুষের ভেদরেখা স্বীকার করেননি। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে "Personality" গ্রন্থের "Woman" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love." এই "growth of....spiritual life" মূলত চিত্তশক্তির সম্প্রসারণ। এই চিত্তশক্তির সম্পদ শুধু পুরুষের নয়, নারীরও বটে। নারী পুরুষ মিলিয়ে যে সামগ্রিক মানুষ তারই ধর্ম 'মানুষের ধর্ম।' 'সবুজপত্র' পর্ব থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারীচরিত্রে এই চিত্তশক্তির প্রাখর্যই উত্তরোত্তর গুরুত্ব পেয়েছে এবং এই অন্ত্য পর্বের গল্পে নারীর প্রেমে জৈব প্রাণশক্তির পরিবর্তে মানবিক চিত্তশক্তিই জয়যুক্ত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র সাধনা এখানে পরস্পরের প্রতিকূল নয়, পরস্পরের 'পথের আলো'। এই বিশেষ দিকেরই সার্থক অভিব্যক্তি।

> *অন্ত্য পর্বের গল্পে নারীর প্রেমে জৈব প্রাণশক্তির পরিবর্তে মানবিক চিত্তশক্তির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প বিশেষ করে 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরিতে' পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র সাধনা 'পথের আলো' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। 'রবিবার' গল্পে অভীক ও বিভার পূর্ব ইতিহাস এবং শেষে রয়েছে বিভার কাছে প্রতীচ্য যাত্রী অভীকের লেখা পত্র।*

৭.৩.১২.২ : রবিবার

'রবিবার' গল্পটি আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'রবিবার' প্রকাশের প্রায় দশ বছর পূর্বে ১৩৩৬ সালের কার্তিকে প্রকাশিত 'চিত্রকার' গল্পে যেন 'রবিবার' এর নায়ক অভীককুমারের বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পের প্রথমে রয়েছে অভীক ও বিভার পূর্ব ইতিহাস এবং শেষ রয়েছে বিভার কাছে প্রতীচ্য যাত্রী অভীকের লেখা পত্র। মধ্যবর্তী অংশে মূল গল্পটি রবিবারের সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই

যায় 'রবিবার' কেন? রবিবার হল বিভার ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনার দিন। ব্রহ্মমন্দির থেকে ফিরে এসেই বিভার সঙ্গে অভীকের সাক্ষাৎ। ধর্ম যেমন অভীকের সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তেমনি নাস্তিক অভীক ও আস্তিক বিভার মধ্যে ঘটিয়েছে মর্মঘাতী বিচ্ছেদ। রবিবার গল্পনামের এখানেই তাৎপর্য।

অভীকের জীবনে দুটো 'উল্টো জাতের সখ' আছে, তার একটি হল কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া আর অপরটি হল ছবি আঁকা। তার এই দুটি সখের মধ্যে তর-তম ভেদটি সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান শুধু তার প্রয়োজনের পথে পাথেয় জুগিয়েছে। ত্যাজ্য পুত্র হবার পর অভীক বার্ণ কোম্পানীর কারখানায় মিস্ত্রির কাজ চালিয়েছে শেষে জাহাজের এঞ্জিনে কয়লা যোগানোর কাজ পর্যন্ত করেছে। তথাপি তার জীবনের পরম লক্ষ্য চিত্রশিল্পে প্রতিষ্ঠা অর্জন। অর্থাৎ বিজ্ঞান তার জীবনের বহির্মহলে সীমাবদ্ধ অন্তরঙ্গ চরিত্রধর্মে সে বিশুদ্ধ শিল্পী।

অভীকের আঁকা ছবির উপাসিকা সম্প্রদায়ের কোনদিনই অভাব হয়নি। অভীকের নির্দ্বিধ উক্তি 'মেয়েদের ভালোবাসায় যে সদটুকু আছে সেটাতে আমার ইন্সপিরেশন।' কিন্তু বিভা এই উপাসিকা মণ্ডলীর অর্ন্তগত নয়। অভীকের ছবি নিয়ে উল্লাস তার দৃষ্টিতে অশিক্ষিতের ন্যাকামি। অনেক পেয়েও শুধু বিভার অভ্যর্থনার অভাবে অভীকের তীব্র ক্ষোভ ছিল। সে কেবল ভাবতো সে য়ুরোপ যাবে আর সেখানে তার জয়ধ্বনি উঠলে বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

বিভার সৌন্দর্য অভীকের ভাষায় ইন্সক্রুটেব্‌ল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবির সঙ্গে তুলনীয়। মোনালিসা। দুর্জ্ঞেয় বলেই বিভার প্রতি তার অনিশেঃষে আকর্ষণ। অমিতের কাছে যেমন লাবণ্য ছিল 'বন্যা'। ঠিক তেমনই বিভা অভীকের ভাষায় 'বী, আমার মধুকরী।' এই 'বী, আমার মধুকরী' প্রেমিক হৃদয় মন্থিত শব্দত্রয়ে রবিবার গল্পের গভীরতর ভাবসংকেত হয়ে উঠেছে। মৌমাছির সংসারে রাণী মৌমাছির অধিনেত্রী, যাকে ঘিরেই পুরুষ মৌমাছিদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। অনুরূপভাবে অভীকের জীবনের বহির্বিশ্বে নানা নারীর আনাগোনা থাকলেও অন্তর্লোক তার জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবর্তী শক্তি হল বিভা। পুরষের সাধনার নেপথ্যে রূপকার রূপে নারীশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন, 'মধুকরী' শব্দটি তারই নিদর্শন।

বিভার কাছে কোন সুস্পষ্ট স্বীকৃতি না পাওয়ার অভীক কাঙাল হয়ে আছে। বিভার ঈর্ষা জাগিয়ে তোলার তাগিদে অভীক তার নব সহচরী শীলার স্তুতি করেছে। এমনকি শীলার জন্য ক্রাইসলার কিনবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মনীষার দেওয়া উপহার বহুমূল্য ঘড়িটি বেচার প্রস্তাব করেছে। ঈর্ষাজনিত বেদনার আঘাতে হৃদয় উন্মোচন করাই এই বানিয়ে তোলা গল্পের উদ্দেশ্য। তাই তার কথা—'তোমার কাছে তা কেবল দাম চাইতে আসিনি। যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলাম'।

অভীক বিভার ঈর্ষা উদ্রেকে ব্যর্থ হলেও স্বয়ং অভীকের গভীরে লুকানো কথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঈর্ষার পথেই। অমরবাবু চরিত্র নির্মাণের মূলে এই অভীকের গভীরে লুকানো কথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঈর্ষার পথেই। অমরবাবু চরিত্র নির্মাণের মূলে এই অভিপ্রায়ই ক্রিয়াশীল হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিভা তার পৈতৃক ট্রাস্ট ফাণ্ডের টাকা দু-দুবার অভীককে দিতে চেয়েছে। কিন্তু অমরবাবুর ক্ষেত্রে 'ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ' বিভার মনে নেই। আমরবাবু বিলাতযাত্রার পারানির বাড়ির প্রয়োজনে বিভা তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গহনা বিক্রয়ে উদ্যত হয়েছে। এখানেই অভীক ও অমরবাবু সর্ম্পকে বিভার মনোবভাবের বিস্তর পার্থক্য বোঝা যায়। এর ফলেই অভীকের প্রেমিক হৃদয়ে উছলে পড়েছে ঝর্ণা। দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা অভীক অমরবাবুর বিলাতযাত্রার ফাণ্ডে দান করেছে যার উদ্দেশ্য ছিল অমরবাবুর বিদেশযাত্রা ত্বরান্বিত করে বিভাকে অমরবাবুর সংস্পর্শ মুক্ত করা।

এই ঘটনায় অভীকের উপলব্ধি কঠিন প্রয়াসে নারীচিত্তের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্জন করেই পুরষের তপস্যার সার্থকতা। নিজেকে পূর্ণ প্রকাশের সাধনায় স্বনির্ভর হয়েই তার বিলাতযাত্রা কিন্তু যাবার আগে সবার অগোচরে চুরি করে নিয়ে গেছে সেই হারখানি যেটি তাদের দুজনের প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এক হয়ে মিশে আছে। মনীষা উপহৃত ঘড়ি বেচতে গিয়ে সে স্পর্দ্ধাভরে প্রামাণ করতে গিয়েছিল যে প্রেমের স্থায়ী মূল্যে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিভার হার বিক্রি করতে যাওয়া অভীকের পাঁজর ভাঙারই সামিল। রবিবার সকালে বিভার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে অভীকের প্রথম কথাই ছিল চুরির কথা যাকে চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘মধুময় ঘর হতে একখানি মধুময় অপবাদ’। বিভার হারের বদলে অভীক গহনার বাক্সের কাছে রেখে এসেছে তার আঁকা একতাড়া ছবি। তার বিশ্বে ‘হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলোর দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে।’ এই বিনিময়ের তাৎপর্য হল অভীক তার চিত্রঙ্কন প্রতিভা দিয়েই একদিন বিভার গলার হারখানি জয় করে নেবে।

চিঠির মধ্যে দিয়ে সমে এসে পৌঁছানো ‘রবিবার’ গল্পের কাল-ঐক্য দৃঢ়সংবদ্ধভাবে রূপায়িত হয়েছে। অভীকের এই চিঠির মধ্যে দিয়েই রবিবার গল্পের মূল বক্তব্য সম্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র ‘ডিটেক্‌টিভ’ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন ছোটগল্প চিঠি দিয়ে শেষ হয়নি। অভীকের জীবনে অন্য নারী নীহারিকা মণ্ডলী আর বিভা একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। অভীকের সমুদ্রযাত্রার ধ্রুবনক্ষত্র রূপকল্পটি মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই অনুভূত হয় বিভাই অভীকের তরঙ্গ-চঞ্চল জীবনের স্থির দীপ্তির পথপ্রদর্শিকা। ‘শেষের কবিতা’র অমিতের মতোই অভীকও প্রেমদর্শনে রবীন্দ্রবৃত্তে প্রত্যাবর্তন করেছে। বিভাকে অভীক বলেছিল ‘তপস্বীনি’—প্রেমই তার তপস্যা। নাস্তিক অভীক শেষ পর্যন্ত তপস্বিনীকে বলেছে ‘এই আমার মধুকরী জগতে সবচেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালবাসার কোন একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তাহলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্য’। ধর্ম একদিন তাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল কিন্তু ‘প্রেমের পূজাই যখন হবে ঈশ্বরের পূজা তখন ঈশ্বরের দুয়ার আর প্রেমের দুয়ার এক বাহ্যিক আচারধর্মে যে নাস্তিক, আত্মিক প্রেমধর্মে সে ভক্ত।

৭.৩.১২.৩ : শেষ কথা

‘শেষ কথা’ এই পর্বের একখানি অসাধারণ গল্প যেখানে নারীর জৈব শক্তির পরিবর্তে মানবিক চিত্রশক্তিই জয়যুক্ত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্রসাধনা এখানে পরস্পরের প্রতিকূল নয় ‘পথের আলো’। গল্পটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত হয়। গল্পটির দুটি স্বতন্ত্র পাঠ আছে যেগুলি খুঁটিয়ে মেলালে উভয়ের ভাষাশিল্পে ‘সূক্ষ্ম স্বরান্তর’ লক্ষ্য করা যায়।

গল্পটির নায়ক নবীনমাধব আর নায়িকা অচিরা। অত্যন্ত সামান্য চরিত্রের মধ্যে দিয়েই এই ভাবগর্ভ গল্পটি রূপায়িত হয়েছে। নবীনমাধবের ব্রত হল ‘ন্যাশনাল দুর্গের ভত্তি দৃঢ় করা। সে পাশ্চাত্যে শিক্ষাগ্রহণ করেছে। দীক্ষা নিয়েছে যন্ত্রিবিদ্যায় আর সেইসঙ্গে খনিবিদ্যা আর খনিজ বিদ্যা শিখেছে যা দিয়ে মাটি ফুঁড়ে দুহাত ভরে আনা যায় রত্নগর্ভা ধরণীর গুপ্তধন। ছত্রিশ বছরের এই ছেলেমানুষ পাশচাত্যে নারীসত্তা সম্পর্কে বিশেষ সংযম রক্ষা করেছে আর দেশে ফিরে মায়ের বিবাহের অনুনয় উপেক্ষা করে কর্মযোগী হয়েছে ছোটনাগপুরে জিয়লজিক্যাল সার্ভের কাজে। জঙ্গল মহলের এই পৃথিবী তাকে জিয়লজি চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে মায়াময় এবং আবিষ্ট করে

তুলেছে। গোধূলির সময়ঝুলিতে মাটি পাথরের নমুনা নিয়ে বাংলো ঘরে তার প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। এমনই এক অপরাহ্ন আর সন্ধ্যার মাঝখানেই হঠাৎ অচিরার সঙ্গে দেখা। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা'দুটি বুকের কাছে নিয়ে সে একমনে লিখছিল ডায়েরির খাতা। নবীনমাধবের একটা কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু মানুষের সাথে আলাপের প্রথম কথাটি খুঁজে পাচ্ছিল না। ক্রমে ঘটনাচক্রে সে খুঁজে পেল আলাপের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কথা। তার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে রহস্য উদ্রিক্ত হল— কার অপেক্ষায় বসে আছে মেয়েটি— ক্রমে খুঁজে পাওয়া গেল ভাবতোষের নাম ঠিকানা লেখা ছেঁড়া খাম। পরে সেই সূত্রধরেই আবিষ্কৃত হল অচিরার জীবনরে পূর্বকথা। ভবতোষ অচিরাকে ভালোবাসার ভান করেছিল। পরে তাদেরই আনুকূল্যে বিদেশ যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে ভারত সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির (কর্মচারী) মেয়েকে বিয়ে করে এবং অচিরাকে বোঝাতে চায় এও দেশের জন্য। কিন্তু এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। এরপর নবীন অচিরার বাড়ীতে গেছে তার দাদুর সাথে আলাপ হয়েছে। অধ্যাপক দাদু ডক্টর নবীনমাধবের আগমনে খুশিই হয়েছেন। এর পূর্বে ভাবতোষের কাণ্ডে অধ্যাপক ভীড়ে ঠাসা সামাজিক জীবন পরিত্যাগ করেছেন এবং নাতনীকে নিয়ে মানব সঙ্গহীন পরিবেশে জীবন নির্বাহ করছেন। সেখানেই নবীন মাধবের সঙ্গে অধ্যাপকের আলাপন। ক্রমে নবীন-মাধব-অচিরার দেখাশোনা, আলাপ চেনাশোনায় পর্যবাসিত হয়। পারস্পরিক মোহ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। আচিরা ও তার দাদুর চেতনার চিত্তধর্মের ঐশ্বর্য্যের সাথে পরিচিত হয়েছে নবীনমাধব। অচিরার মুখে শুনেছে দাদুর উক্তি 'মানুষের সত্য তার তপস্যার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে। তার অভিব্যক্তি বায়েলজির নয়' কিংবা দাদুর মানববোধ তার মুখে উঠে এসেছে 'পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।' অধ্যাপক একদিন নবীনকে জিজ্ঞাসা করেছেন তোমার কি বিবাহ হয়েছে? নবীন উত্তর দিয়েছে এখনও তো হয়নি। ক্রমে নবীন পাশ্চাত্যে আত্মসংযমী থাকতে পারলেও এক্ষেত্রে অচিরার প্রতি অসীম ভাবাবিষ্ট হয়েছে। তার উক্তি 'কোন প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর তলায় যে লুকানো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজিশাস্ত্রে তা পড়েনি। নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলায় অন্ধকারে তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে'। নদীতীরে চড়ুইভাতির দিনে অচিরা-নবীনমাধবের কথোপকথনের গল্পটি চূড়ান্ত মাত্র পেয়েছে। তখন নবীন মাধবের জিয়লজিক্যাল সার্ভের কাজ প্রায় শেষ। তাই সে ভালোবাসার কথাটা প্রকাশ না করে পারেনি। এখানে অচিরা 'এখনো' বিবাহ হয়নি শব্দটাকে নিয়ে নবীনকে বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করেছে এবং এখানেই শুনিয়েছে তার প্রধান বক্তব্য বা শেষ কথা। অচিরা বলেছে সে অনুভব করেছে বনের মধ্যে একটা রাক্ষস আর একটা অন্ধ প্রাণশক্তি আছে ক্রমেই সে তাকে গ্রাস করেছে। এক্ষেত্রে তার অভিমত দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্রশক্তিতে নিজের আদর্শকে আক্রমণ। এই পরাজয়ের বিষ আপনাকে আপনার কর্ম থেকে বিরত করেছে। নবীনমাধব ভালোবাসা এবং ভবতোষের কথা তুললে অচিরা বলেছে সেই আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা আর এই মোহ এক নয় এ অন্ধশক্তির আক্রমণ। এ নিস্ফল সাধনা তার মতে পুরুষের সম্পদ তার জ্ঞান যার মেয়েদের হৃদয়-মেয়েদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক। তাই তার ভবতোষকে ভালবাসা নয় এ তার জীবনের প্রথম ভালোবাসাকেই ভালোবাসা। অচিরা একেই বলেছে সতীত্ব। অবশেষে উভয়েই অরণ্যলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অধ্যাপকও পুনরায় শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন। নবীন ফিরে পেয়েছে তার বিজ্ঞান সাধনা অচিরা শেষ কথাটা বলেছে— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি কিন্তু পায়ে আছে একটুকরো শিকল, নড়তে চড়তে সেটা বাজে। এই অসাধারণ উক্তি আমাদের প্রাণকেও স্পর্শ করে। এখানে

'শেষকথা' গল্পের নায়ক নবীনমাধব আর নায়িকা অচিরা। এখানে নবীনমাধবের জীবনে অচিরার মুক্তিই বড় দান, অধ্যাপকের মতে যা তার কীর্তির পথকে প্রশস্ত করবে।

নবীনমাধবের জীবনে অচিরার মুক্তিই বড় দান অধ্যাপকের মতে যা তার কীর্তির পথকে প্রশস্ত করবে। ছিন্ন শিকল তার ওড়াতে ব্যাঘাত ঘটাবে না, ও ডাকেই আনন্দময় করে তুলবে।

নবীনমাধবের কীর্তিসাধনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠেছে তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে আরো শুকতারার। গল্পটি কাব্যসুরভিত গদ্যে রচিত এবং ছোটগল্পের শিল্পশালায় দীপ্তিতে ভাস্বর। শুধুমাত্র আঙ্গিক নয় অসাধারণ ভাববস্তু গল্পটিকে কালের সীমা উত্তরণের পথে পাথেয় জুগিয়েছে।

৭.৩.১২.৪ : ল্যাবরেটরি

আজকের এই পর্বের তৃতীয় আলোচ্য গল্প 'ল্যাবরেটরি' যেটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে বিজ্ঞানী নন্দকিশোর এবং সোহিনীর কথাই মূলত বলা হয়েছে। সোহিনী নন্দকিশোরের অনুব্রতা অর্থাৎ নন্দকিশোরের ব্রতই সোহিনীর ব্রত, একক্রিয়তাই তাদের দাম্পত্যের ভিত্তি। নন্দকিশোর ছিল বিজ্ঞানসাধক। তার জীবনব্যাপী সেই অনন্য সাধনারই প্রতীক ল্যাবরেটরী। সেই সাধনার কাছে কার নিজের প্রাণও তুচ্ছ। তাই দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ সে নিরন্তরভাবেই করে চলেছিল যার ফলশ্রুতি তার মৃত্যু। তার কথায় 'মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায়, কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্য বাঁচবার শখ মেটানোর জন্য এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি।' সেই দুর্লভ জিনিস নন্দকিশোর ল্যাবরেটরিতে পেয়েছিলেন। ল্যাবরেটরিতে সোহিনী প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি তাকে যশঃশরীরে মৃত্যুঞ্জয় করেছে। এজন্য এই ল্যাবরেটরিই সোহিনীর কাছে পূজার দ্রব্য এবং এই ল্যাবরেটরির টাকা দেবতার ভাণ্ডার।

পাঞ্জবের মেয়ে সোহিনীকে যে অবস্থা থেকে নন্দকিশোর এনেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়। সোহিনীর মধ্যে ঝকঝক করছিল ক্যারেকটারের তেজ। তাই তার আইমার কাছে থেকে সাত হাজার টাকায় কিনে এনে নন্দকিশোর নিজমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল এবং বলেছিল ওকে নন্দকিশোরী করতে হবে। সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়। শাস্ত্রমতে তাদের বিয়ে না হলেও সোহিনী কিন্তু পতির অনুব্রতা— এই নব অর্থেই সে পতিব্রতা। 'পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও,' নন্দকিশোরের এই উক্তিই সমগ্র গল্পের সারকথা।

এখানে আমরা দেখেছি সোহিনীর চরিত্রে চিত্তশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তির সহাবস্থানের নবরূপ। চিত্রধর্মে সোহিনী নন্দকিশোরের যথার্থ অনুব্রতা কিন্তু প্রাণধর্মে সে ছিল স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী। তাই সে বলে— ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের দ্রৌপদী কুন্তীদের তাই সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী। নন্দকিশোর সম্পর্কে তাই সোহিনীর উক্তি, 'যেখানে আমি ছিলেম ছোট সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি। যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন।' অর্থাৎ জীবনসত্তার স্বভাবজ ধর্মকে অতিক্রম করেই তাদের ব্রতের মিল সুসম্পন্ন হয়েছে। নিজের প্রাণধর্মের বহুচারীতাকে সোহিনী শেষ পর্যন্ত জয় করেছ। তার জীবনে নন্দকিশোররে মৃত্যুই এই জয় দান করেছে। তিনি যাবার পথে তার চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতে

> *'ল্যাবরেটরি' গল্পটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে বিজ্ঞানী নন্দকিশোর এবং সোহিনীর কথাই মূলত বলা হয়েছে নন্দকিশোর ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। তার জীবনব্যাপী সেই অনন্য সাধনারই প্রতীক ল্যাবরেটরী।*

জ্বলছে সেই হোমের আগুন'। নন্দকিশোর নিষ্কাম লোভে ল্যাবরেটরি গড়ার জন্যই রেলওয়ে কোম্পীনী থেকে টাকা চুরি করেছিলেন। আর সোহিনী ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যই নিজের নারীত্বকে অনাসক্তভাবে ব্যবহার করেছে।

গল্পটিকে রেবতী, নীলা, প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। রেবতী যখন প্রথম ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত হয়েছে তখন তাকে দেখে মনে হয়েছে সে বিজ্ঞান সাধনায় নিষ্কম্প সনিষ্ঠ। কিন্তু পরে তার মধ্যে নীলার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। রেবতীকে পরীক্ষা করে সোহিনী বুঝেছে হাতে হাতে ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না। এই কারণে নীলার সঙ্গে রেবতীর বিবাহের সংকল্প পরিত্যক্ত হয়েছে। স্থির হয়েছে ল্যাবরেটরি হবে জনগণের সম্পত্তি আর রেবতী হবে তার প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু সেই সাবধানমূলক প্রচেষ্ঠায় রেবতীকে নীলার মৃত্যুটান থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সোহিনী বলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ল্যাবরেটরিতে নীলার নেপথ্যাভিসারে রেবতী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে। রেবতীর জীবনে এ সময় দুটি ভিন্ন দিক থেকে দুটো প্রস্তাব এসেছিল। প্রথমটি ল্যাবরেটরির ট্রাস্ট প্রেসিডেণ্ট পদগ্রহণের, আর দ্বিতীয়টি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট পদের। প্রথম সাক্ষাতে যে বিজ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণ রূপে রেবতীর পায়ে প্রণাম করেছিল সোহিনী সেই রেবতী গল্পের অন্ত্যভাগে জাগানী সভার সভাপতির অভিভাষণ সম্পর্ক আলোচনা রত এবং তার আসন নীলার পদপ্রান্তে।

ল্যাবরেটরির ঋত্বিক নির্বাচনে সোহিনী ভুল করেছিল। কিন্তু সর্বনাশের আগেই তা সংশোধিত হয়েছে এবং সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে সোহিনী ল্যাবরেটরি রক্ষার্থে সক্ষম হয়েছে।

গল্পটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ঊনআশি অতিক্রম করেছে সেজন্য গল্পটির ভাষায় ও নির্মাণশিল্পে কোথাও কোথাও বার্ধ্যকের দৌর্বল্য ও অবসাদজনিত ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে সোহিনীর সঙ্গে নন্দকিশোরের প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী অংশে নন্দকিশোর সম্পর্কিত ক্রিয়াপদে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা গেছে। যেমন বল্‌লে ও বললেন, বল্‌ত ও বলতেন ইত্যাদি পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রেবতী পরদিন সকালে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর এসেছে সপ্তম পরিচ্ছেদে ২ দিন পরে। এটি সময় বিন্যাসের ত্রুটি। তাছাড়া উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের দৃঢ়তাবদ্ধ ভাব সর্বদা রক্ষিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সংলাপ প্রগল্‌ভতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে সংলাপের নেপথ্যে ভাষ্যের ক্ষেত্রে মনন প্রধান ও ব্যঙ্গ প্রধান ভাষার ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানে গল্পের গতি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। এইসব অল্পস্বল্প ব্যতিরেকে মানবমনের পরীক্ষাগার তথা প্রতীকরূপে ল্যাবরেটরি অসামান্য।

৭.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের তিনটি গল্পের নাম কি?

২. রবিবার গল্পের নায়কের নাম কি?

৩. 'শেষকথা' গল্পের মূল লক্ষ্য কি?

৪. 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি কত বঙ্গাব্দে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

৫. 'ল্যাবরেটরি' গল্পে একজন বিজ্ঞান সাধক আছেন, তার নাম কি?

৬. রবীন্দ্র ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. রবীন্দ্রনাথের হিতবাদী— পর্বের গল্পে জীবনের শিল্পিত রূপায়ণ কিভাবে হয়েছে তা 'দেনা-পাওনা' অথবা 'পোস্টমাস্টার' গল্প-অবলম্বনে আলোচনা করো।

৮. সবুজপত্র-পর্বের ছোটগল্পগুলি কেবল খণ্ডিত মানবজীবনের প্রতিভাস নয়, জীবন-ব্যাখ্যার রসভাষ্য— পঠিত গল্প অবলম্বনে আলোচনা করো।

৯. রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি আসলে মানবসত্তার বিচিত্র অনুষঙ্গ ও চিত্তশক্তির প্রাচুর্যের রূপায়ণ।—আলোচনা করো।

১০. ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করো।

১১. স্ত্রীরপত্র/হালদার গোষ্ঠী— তিনটি গল্পের যে-কোনো একটিকে অবলম্বন করে লেখকের জীবনদৃষ্টি ব্যাখ্যা করো।

১২. সাধনা-পর্বের গল্পগুলির (ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি) মধ্য থেকে যে-কোনো একটি গল্প বেছে নিয়ে তার শিল্পমূল্য বিচার করো।

১৩. 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহের ব্যবহার কিভাবে গল্পরসের আকর্ষণ বর্ধিত করেছে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৭.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার —ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

গোরা

একক ১৩

উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৩.১ : ভূমিকা

৭.৪.১৩.২ : উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

৭.৪.১৩.৩ : বিষয়বস্তুর মহনীয়তা

৭.৪.১৩.৪ : তত্ত্বগত ভিত্তি

৭.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৩.১ : ভূমিকা

সাধারণভাবে উপন্যাস হলো দ্বন্দ-সংঘর্ষ বিমথিত মানবজীবনের শিল্পিত গদ্যরূপ। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় উপন্যাসের মৌল জীবনধর্মকে বোধকরি সামগ্রিকভাবে ধরা যায় না। তাই উপন্যাসের সংজ্ঞা-আকার-প্রকৃতি জীবনাবেদন প্রভৃতি সাহিত্যকেন্দ্রিত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সমালোচকগণের মধ্যে সহমতের নিতান্ত অভাব। কিন্তু মহাকাব্য ও মহৎ উপন্যাসের স্বরূপধর্ম প্রসঙ্গে তাঁরা আশ্চর্যভাবেই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। আকার ও প্রকৃতিগতভাবে মহাকাব্য একদিক থেকে যেমন বিশাল পরিসরে বিধৃত কাব্য, অন্যদিকে তেমনি মহত্ব ও গুরত্ব অনন্য। মহাকাব্য তা বৃহৎ ও মহৎ কাব্য। উপন্যাসও যদি মহাকাব্যের পরিসর ও মহত্বের লক্ষণে বিধৃত হয় তবে তা অবশ্যই হয়ে ওঠে মহাকাব্যিক ও মহৎ উপন্যাস। স্বভাবতই মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপ বা শৈলীগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ঐ মৌল বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তাদের মধ্যকার মিলটুকু খুঁজে নিতে হয়।

উপন্যাস দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বিমথিত মানবজীবনের শিল্পিত গদ্যরূপ। মহাকাব্য যেমন বিশাল পরিসরে বিধৃত কাব্য, উপন্যাসেও মহাকাব্যের পরিসরে ও মহত্ত্বের লক্ষণে বিধৃত হয়। সাধারণ উপন্যাসে চরিত্রের সঙ্গে কোনও জাতির খণ্ডাংশ মাত্র অভিব্যক্ত হয়, শিল্পীর উপন্যাসকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে ধরা হয়, তার জন্ম সমগ্র-জাতির হৃদয় থেকে, জনমানস মন্থন করে।

মহাকাব্যে যেমন সমস্ত জাতির সমষ্টিগত জনমানসের সঙ্গে যোগ থাকে, মহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই। সেজন্য মহৎ উপন্যাসকে এপিক-উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। 'যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে—' সেই সাহিত্যসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যিক লক্ষণযুক্ত বলেছেন। সেদিক

থেকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবের এক ব্যাপক মহান প্রকাশ মহাকাব্য। যে উপন্যাসকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে ধরা হয়, তার জন্ম সমগ্র জাতির হৃদয় থেকে, জনমাস মন্থন করে।

সাধারণ উপন্যাসে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে চরিত্র হিসেবে কয়েকজন মানুষ উপস্থাপিত হয়, কখনও বা কোনও জাতির খণ্ডাংশমাত্র অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকাশ হয় শিল্পীর বিশেষ চিত্তের অনুরঞ্জনে। এদিক থেকে গীতিকবিতার সঙ্গে উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা মনে আসে। ব্যক্তি বা শিল্পীর হৃৎপদ্ম সম্ভব গীতিকবিতার সাথে সাধারণ উপন্যাসের মিল আছে কোথাও। 'সর্বরসসিদ্ধ' ঔপন্যাসিক তা কবিতার আবেগকে বিপুল চৌম্বকে আকর্ষণ করেই থাকেন।

৭.৪.১৩.২ : উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মহৎ উপন্যাস। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানস মাত্র নয়, তার আশ্রয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের সমগ্র বঙ্গমানস এই উপন্যাসে প্রতিফলিত। এই সময়ে জাতির ভাবনা, ধ্যান, তপস্যা, ধর্মীয় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা 'গোরা'য় রূপান্তরিত। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের জনমানস মন্থন করে 'গোরা'—সুধালক্ষ্মী আবির্ভূত। সে যুগের সমস্ত সমস্যা ও সংকট উপলব্ধি করলে একথা আরও স্পষ্ট হয়।

গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তার জন্মকাল। উপন্যাসের পটভূমি আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। কংগ্রেসের সূত্রপাত ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে—আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এটিই আনুষ্ঠানিক তারিখ। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০-৮৫ এই সময়কে রেখেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে।

উল্লিখিত কালপূর্বে বাংলাদেশের ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলন মূলত ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক। ব্রাহ্মধর্মের মৌল আদর্শ একেশ্বর উপাসনার জন্য রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে এই সভাই 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ও রূপ পায়। রামমোহন মূলত যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানবাদ দিয়ে নয়, হিন্দুশাস্ত্র থেকেই প্রমাণ দাখিল করে সহমরণ প্রথা প্রমুখ হিন্দুধর্মের জঞ্জাল সরাতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিলো 'হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট।' এই বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচারের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো দুরকম। একদিকে তাঁকে ঘিরে শহরের কিছু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন সমবেত হলেন। নতুন চিন্তার আলোয় রমামোহন যে শিক্ষা সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই মানুষের দৃষ্টিকে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করতে চাইছেন, কিছু সংখ্যক মানুষ এই বিষয়টি উপলব্ধি করলেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ হয়ে উঠলেন তাঁর শত্রু। 'ধর্মসভা' (১৮৩০)-র আশ্রয়ে থেকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিরোধী শক্তির প্রতিভূ। ১৮৩২-এ রমামোহনের বিদেশে মৃত্যু হলো। তার পর থেকেই 'ব্রাহ্মসভা'র পূর্বদীপ্তি কমে গিয়ে স্তিমিত হয়ে এলো। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ১৮৪৬-এ রাজনারায়ণ বসু ব্রহ্মসমাজে যোগ দিলে এই শুষ্কপ্রায় ব্রাহ্মসভাতে

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মহৎ উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতির ভাবনা, তপস্যা, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা উপন্যাসে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০-৮৫ এই সময়কে রেখেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে। 'গোরা' উপন্যাসে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতের রূপচিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'গোরা' যে প্রেক্ষাপটের ওপরে চিত্রিত এবং যে সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থাপিত তা যথার্থই মহাকাব্যোচিত। 'গোরা' উপন্যাসের স্থানগত পটভূমি কলকাতা শহর হলেও দেশকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে গোরা ত্রিবেণী-সংগমে দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবং চারঘোষপুরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

পুনঃপ্রভাব দেখা দিলো। এর আগেই অবশ্য ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপিত হয়েছিলো (৬/১০/ ১৮৩৯)। দ্বিতীয় অধিবেশনে এই সভার পরিবর্তিত নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ ও আরও উনিশ জন বন্ধুর সঙ্গে অক্ষয় দত্তও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ধর্মবিশ্বাস বেশিদিন একাত্ম থাকেনি। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার বেদের তথা দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্ম সমাজশাস্ত্রের অভ্রান্ততার বিশ্বাস বর্জন করলেন। দেবেন্দ্রনাথের মূল বিশ্বাস হৃদয়োপলব্ধির গহনে, তিনি বললেন হৃদয়বৃত্তির সত্যই ধর্ম। এরপর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশপ্রেমী, সুপণ্ডিত ও অসাধারণ বাগ্মী তরুণ কেশব সেন যোগ দিলেন ব্রাহ্মসমাজে। দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব সেনের বক্তৃতা বা সভা প্রসঙ্গ 'গোরা' উপন্যাসে বারে বারেই এসেছে অনুষঙ্গ হিসেবে। কেশব সেনের সময়ে ও তৎপরবর্তীকালেও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মতান্তর ও বিরোধ সক্রিয় ছিলো, দেশের বিদগ্ধজনকে তা অনিবার্যভাবে ভাবিয়েছে, প্রভাবিত করেছে। ১৮৬১-তে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ', ১৮৭৮ এ শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্মণসমাজ, পুনরাপি কেশব সেন স্থাপিত 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রবণতা ও সজীবতারও সাক্ষ্য বহন করে। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মসমাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের কাছেই জাতীয়তামূলক ও সমাজসংস্কারমূলক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলো। কেশববাবুর বক্তৃতা শোনায় গোরায় আগ্রহ— 'এদিকে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল' (পরিচ্ছেদ-৫)। অপরদিকে হিন্দুধর্মীয়দের গোঁড়ামি—'আবার এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এমনকি গোরা তাঁহার ঘরে গেলেও তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি দুই-তিন ঘর লইয়া তিনি নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই মহলের দ্বারের কাছে 'সাধনাশ্রম' নাম লিখিয়া কাষ্ঠফলক লটকাইয়া দিলেন' (পরিচ্ছেদ-৫)।

আবার স্বাদেশিক-চেতনায় উদ্দীপিত গোরাকে বড়দাদা মহিম 'পেট্রিয়ট জ্যাঠা', 'হরিশ মুখুজ্জে দি সেকেণ্ড' এসব সম্বোধনের দ্বারা ব্যঙ্গ ও তিরস্কার করেছেন। প্রচণ্ড ইংরেজ বিদ্বেষের দ্বারা গোরা 'রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।'

'গোরা উপন্যাসে ধর্মীয় সংঘর্ষ ও রেষারেষি এবং তার অনুবৃত্তি হিসেবে সামাজেক সংকটও বারবার দেখানো হয়েছে। ধর্মীয় পরিস্থিতিতে দুটি দিক উপস্থাপিত—হিন্দু ও ব্রাহ্ম। কৃষ্ণদয়াল এবং পরেশবাবুর দুই পরিবারের সংঘাতের মূলে সুচরিতা ও ললিতা থাকলেও মূলত হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের সংঘাতের রূপচিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'গোরা'র পটভূমিতে এই ধর্মীয় সংকট যেমন বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য, তেমনই সত্য তখনকার সদ্যজাগ্রত স্বদেশপ্রেম, নবোদ্ভূত স্বাজাত্যবোধের অনুপ্রেরণা। গোরা ও বিনয়ের সমবয়সী রবীন্দ্রনাথ এই সংঘাতের চিত্র নিজে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিই প্রকাশ হয়েছে 'গোরা'তে।

দেশ ও কালগতভাবে 'গোরা' যে প্রেক্ষাপটের ওপরে চিত্রিত এবং যে সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থাপিত, তা যথার্থই মহাকাব্যোচিত। চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসের রূপ-রং-পরিধি চিত্রকলার উৎকর্ষ সৃষ্টিতে অনেকখানি ভূমিকা নেয়, তেমনই ঔপন্যাসিকের আয়োজিত পটভূমিতে বিশিষ্টতার ওপরে উপন্যাসের তাৎপর্য-সৌন্দর্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে পটভূমি ব্যবহার করেছেন, তার একটা কালগত বিশিষ্টতা আছে। উপন্যাসে ব্যবহৃত সময় পুরো এক বছরও নয়। কিন্তু যে সমস্যাও আলোড়ন এখানে উপস্থিত, তার মধ্যে ঊনবিংশ শতকের একটি যুগ, তার শেষ চতুর্থাংশ সামগ্রিক ভাবনা চিন্তাসহ ধরা পড়েছে।

'গোরা'র স্থানগত পটভূমি প্রধানত কলকাতা শহর। কলকাতারই কোথাও কৃষ্ণদয়ালের গৃহ, কোথাও পরেশবাবুর, তারই কাছাকাছি বিনয় ও সুচরিতার বাড়ী। ব্রাহ্মসভা এবং হারাণবাবুর অবস্থিতি সবই কলকাতাকেন্দ্রিক। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে সমগ্র বাংলাদেশই 'গোরা'র পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে কলকাতায় এবং অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর জীবন পরিচালিত হয়েছে ঐখানে। কিন্তু তাই বলে গ্রামবাংলাও উপন্যাস থেকে বাদ যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, গোরার কর্মধারা, গ্রামবাংলাকে ও দেশকে জানবার জন্য গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে তার যাত্রার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রহণের স্নান উপলক্ষে স্টিমারে ত্রিবেণী যাত্রাকালে দরিদ্র দেশবাসীর হেনস্থাও গোরার ক্ষোভ ও মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিলো। দেশকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে গোরা ত্রিবেণী-সংগমে দেশবাসীর সঙ্গে মিলতে চেয়েছে, চরঘোষপুরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ও অঘটনে সমস্ত গ্রামবাংসার শোষণ ও অনাচারের চিত্র প্রতিফলিত।

৭.৪.১৩.৩ : বিষয়বস্তুর মহনীয়তা

বিষয়বস্তুর প্রসারও পরিধির দিক থেকে 'গোরা'র ভূমিকা সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় দূরপ্রসারী। এই বিশালতা ও বিস্তৃতি এসেছে উনিশ শতকের শেষ দিককার বাংলাদেশের আলোড়ন ও আন্দোলন নিয়ে, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ, স্থিতিশীলতা ও প্রগতিশীলতা, স্বাদেশিকতার প্রথম চেতনার উন্মেষ ইত্যাদির ভিত্তিতে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির পরস্পর সংঘাত যুগস্বরূপকে তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। আচার বাতিকগ্রস্থ কৃষ্ণদয়ালের সন্ন্যাসিকতার সঙ্গে কিম্বা তখনকার আত্মভাবত, আত্মতুষ্ট এ্যাভারেজ বাঙালীর আদলে গড়া মহিমের সঙ্গে সহজ বোধে, সরল ভালোবাসায় প্রসারিত-হৃদয় আনন্দময়ীর সংঘাতের চিত্র আছে এখানে। আনন্দময়ী স্বামীকে স্পষ্টতই বলেন—'হায় হায়, তুমি মনে কর তোমার মতো পৃথিবীময় গঙ্গাজল আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াইনে বলে আমার ধর্মজ্ঞান নেই।' (পরিচ্ছেদ-৬)। ভারতবর্ষের প্রশান্ত প্রজ্ঞাসত্তা, সংসারে থেকেও ঋষিতুল্য পরেশবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের, তথাকথিত ব্রাহ্ম সমাজের এবং গোরা ও বিনয়ের সংঘাত উল্লেখযোগ্য। পরিবারের ভেতরে তাঁর সত্যকে অন্তরে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ আর বরদাসুন্দরীর ব্রাহ্মিকতার বহিরাচরণের মধ্যে এই সংঘাত ছিলো অবশ্যম্ভাবী। আবার গোরার তর্ক যে তর্কযুদ্ধমাত্র নয়, 'তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ'— একথা পরেশবাবুর আগে এমন করে কেউ বুঝতে পারেনি। সত্যোপলব্ধির আত্মস্থতায় গোরা-বিনয়ের বিরুদ্ধতা, জাতিভেদের গোঁড়ামির মূল উৎস পরেশবাবুর কাছে কতো সহজ হয়ে ধরা পড়েছে—"তাঁদের বুদ্ধি কম বলে যে এইসব কথা বোঝেন না তা নয়, বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি বলেই তাঁরা বুঝতে চান না, কেবল বোঝাতেই চান"(পরিচ্ছেদ-২৩)। পানুবাবুর ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরেশবাবুর সংঘাতের বিষয়টিও অভিনিবেশযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানা পরিবর্তন, সংগঠন, মতানৈক্যের কথা সকলেরই জন্য হীন -কুরুচিপূর্ণ কাজও যখন ব্রাহ্মসমাজের নামে চালানো হয়, তখন পরেশবাবু সেখান থেকে সবিনয়ে নিজের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেন—"ললিতার বিবাহ আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যদি ত্যাগ করেন তাহাতে আপনাদের অন্যায় বিচার হইবে না। এক্ষণে

> *উনিশ শতকের শেষ দিককার ধর্মীয় ও সামাজিক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, স্বাদেশিকতার প্রথম চেতনার উন্মেষে 'গোরা' উপন্যাসের ভূমিকা দুর প্রসারী। ব্রাহ্মসমাজের মতানৈক্যের দ্বন্দ উপন্যাসে আছে। সাহেবদের সঙ্গে গোরার বিবাদ উন্মেষযুগের স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত। স্বদেশ প্রেমের স্পিরিটটুকু রবীন্দ্রনাথ গোরার চরিত্রে নিয়ে এসেছেন। আবার পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর ঔদার্য ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সংঘাত রেষারেষির প্রান্তে এক আদর্শ মিলনভূমি রচনা করেছেন স্রষ্টা।*

ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা রহিল তিনি আমাকে সমস্ত সমাজের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে স্থান দান করুন।" (পরিচ্ছেদ-৬৫)

সাহেবদের সঙ্গে গোরার বিবাদ ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার-প্রহসন সেই উন্মেষযুগের স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত। দেশে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজদের সঙ্গে ক্রমশ ভারতীয়দের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিলো। ইংরেজরা যেখানে অন্যায় করেও শাস্তি পায় না, ভারতবাসীর ক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থা, তার অন্যায় না করেও শাস্তি পায়। গোরার রচনাকাল (১৯০৭-১৯০৯) পরিপূর্ণ স্বদেশীযুগে। এ যুগের আবহাওয়া সূক্ষ্মভাবে যেন জড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার গোরার প্রেক্ষাপটকে। তবু 'গোরা'র অনৌচিত্য দোষ তো ঘটেইনি, বরং সমসাময়িক স্বদের্শ-উন্মাদনার 'ফিলেট্রশন' করে নিয়ে তার স্বদেশপ্রেমের 'স্পিরিট'টুকু গোরার চরিত্রে নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার জন্যই শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন থেকে মানবতাবাদী শাশ্বত ভারতাত্মা সন্ধানের মহৎ লক্ষ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনায় ও উপলব্ধিতে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে গোরা। বিষয়বস্তুর এমন বিশালতা ও ব্যাপকতা সমগ্র জাতির সত্তাসম্ভুত বললে অত্যুক্তি হয় না। তৎকালীন বাংলাদেশের সনাতন ও নব্য, রক্ষণশীল ও সংস্কারক রূপ এতে প্রতিভাত হয়েছে। আবার পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর ঔদার্য ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সংঘাত-রেষারেষির প্রান্তে এক আদর্শ মিলনভূমি রচনা করেছেন স্রষ্টা। এই মিলনভূমিতেই হিন্দু বিনয় ও ব্রাহ্মণের মেয়ে ললিতা পরস্পরকে গ্রহণ করেছে সকল বাধা অতিক্রম করে, এবং জন্মলব্ধ নিজস্ব ধর্মগত ত্যাগ না করেই।

৭.৪.১৩.৪ : তত্ত্বগত ভিত্তি

'গোরা'-উপন্যাসে একটা আইডিয়াগত বা তত্ত্বগত ভিত্তি আছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে উদার বিশ্বমানবতায়, আত্মগত উপলব্ধি থেকে বৃহত্তর সমষ্টিগত উপলব্ধির মধ্যে উত্তরণই 'গোরা'-র তাত্ত্বিক আদর্শ। তত্ত্বগত এই প্রেরণা এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবন থেকে উত্থিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে মিলেছে জাতিগত জীবনের মধ্যে। গোরা-চরিত্রে দেখানো হয়েছে সত্তাসংকটের মর্মগ্রাহী চিত্র। সংকটের পথ বেয়ে সংস্কারক গিয়ে পৌঁছেছে সর্বসংস্কারমুক্ত সর্বমানুষের মিলনক্ষেত্রে। গোরার চরিত্রে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে বৃহৎ মানবধর্মের উদারতার মধ্যে নবজন্ম লাভের প্রয়াস ও উত্তরণ আছে। আনন্দময়ী ঐক্যধর্মী ও সমন্বয়বাদী ভারতাত্মার প্রতিমূর্তি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তত্ত্ব হিসেবে সমষ্টিগত (এবং ব্যক্তিগত তো বটেই) হৃদয়ভিত্তিক সত্যধর্মকে এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দেবার সকল আয়োজন আছে।

> *'গোরা' উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে উদার বিশ্বমানবতায়, আত্মগত উপলব্ধি থেকে বৃহত্তম সমষ্টিগত উপলব্ধির মধ্যে উত্তরণই 'গোরা'-র তাত্ত্বিক আদর্শ। গোরার চরিত্রে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে বৃহৎ মানবধর্মের উদারতার মধ্যে নবজন্ম লাভের প্রয়াস ও উত্তরণ আছে।*

'গোরা' উপন্যাসের তত্ত্ব বা আদর্শমূলকতা সহজেই ধরা পড়ে। সার্থক জীবনচিত্রণের মাধ্যমে তার মহান বাণী ধরা পড়ে বলেই এই আবেদন সরস ও হৃদয়বেদ্য।

৭.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. উপন্যাস কাকে বলে?

২. উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য কি?

৩. মহাকাব্য কাকে বলে?

৪. উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ কোন সময়কে রেখেছেন?

৫. উপন্যাসে কোন কোন ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

৬. 'গোরা' উপন্যাসের রচনাকাল কত?

৭. 'গোরা' উপন্যাসের মূল তত্ত্ব কি?

৭.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।

৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ — কথাসাহিত্য।

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।

৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।

৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।

৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।

৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

একক ১৪

চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৪.১ : চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

৭.৪.১৪.২ : চরিত্র ও প্লটের পারস্পরিক সম্পর্ক

৭.৪.১৪.৩ : উপন্যাসের ভাষা

৭.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৪.১ : চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

আলোচ্য উপন্যাসে প্রায় সমস্ত চরিত্রেরই ব্যক্তিগত জীবন উপেক্ষিত হয়নি। কিন্তু চরিত্রগুলি আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নানা ধর্মীয়, সামাজিক তথা স্বদেশ সাধনার আদর্শ খুঁজতে গিয়ে। এই সন্ধান শেষ পর্যন্ত আত্মোপলব্ধির সমে পৌঁছেছে ঠিকই, তবে গোরার 'আপনাকে এই জানা'র অন্যতম কথা 'সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা'। গোরা-সুচরিতা-বিনয়-ললিতা-আনন্দময়ী বা পরেশবাবুর ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্মতা, নিগূঢ়তা ও অন্তঃশীলতার প্রতি লেখকের সমধিক দৃষ্টিপাত ঘটেনি। এঁদের মনস্তাত্ত্বিক জীবনালেখ্যও ততটা নেই। ব্যক্তিগত জীবনের প্রসার ও সীমা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, অধিকাংশ চরিত্রই তার রেখায়িত গণ্ডী অতিক্রম করেছে। বেশির ভাগ চরিত্রই আভ্যন্তর সত্তার প্রকাশের চেয়ে বেশি উদ্‌গ্রীব কোনো-না-কোন আদর্শসন্ধানে, ধর্ম ও ব্যবহারগত জীবনে এক একটি বিশেষ পথ ও চিন্তাসূত্র অনুসরণে। সুচরিতার মতো গৃহলালিতা সতেরো বছরের তরুণীও স্বদেশসাধনায় অনুপ্রাণিত করতে চায় ছোট ভাই সতীশকে, ''অনেক কাজ করবার আছে ভাই। আমাদের দুই ভাই-বোনের কাজ আমরা দুজনে মিলে করব। কী বলিস সতীশ? আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে বড়ো করে তুলতে হবে। জানিস? বুঝতে পেরেছিস?" (পরিচ্ছেদ-৬৬) এবং ''মানুষকেই সমাজের খাতিরে সংকুচিত হয়ে থাকতে হবে একথা কখনোই ঠিক নয়—সমাজকেই মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে" (পরিচ্ছেদ-৬০)। পরেশবাবুর এই উক্তির মর্ম সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে সে। যে সমাজে ছোটো অমিলকে মানে না, বড়ো মিলে সবাইকে মিলিয়ে দেয়, সুচরিতা মনে-প্রাণে সেই মানবিক সমাজকে চেয়েছে।

> *গোরা-সুচরিতা-বিনয়-ললিতা-আনন্দময়ী বা পরেশবাবু প্রতিটি চরিত্রই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নানা ধর্মীয়, সমাজিক তথা স্বদেশ সাধনার আদর্শ খুঁজতে গিয়ে। বেশিরভাগ চরিত্রই আভ্যন্তর সত্তার প্রকাশের চেয়ে বেশি উদ্‌গ্রীব কোনো-না কোন আদর্শ সন্ধানে, ধর্ম ও ব্যবহার গত জীবনে এক একটি বিশেষ পথ ও চিন্তাসূত্র অনুসরণে।*

৭.৪.১৪.২ : চরিত্র ও প্লটের পারস্পরিক সম্পর্ক

'গোরা' উপন্যাসের পটভূমি ও চরিত্রসৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক যদি বিচার করি, তাহলে তার অসাধারণত্ব চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহে' হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে বিরোধের কথা এনেছেন, 'দত্তা'রও সেই একই বিষয়। কিন্তু সে শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা বোঝাবার জন্য। তবে সেই ব্যাপক ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমি সত্ত্বেও উপন্যাস দুটিতে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের রূপ-রস-রঙ, তার সমস্যা এবং সর্বোপরি তার ব্যক্তিগত সমাধানই খুঁজেছেন, দেশ-কাল-সমাজগত সমাধান নয়। মহিম-সুরেশ-অচলা-বিজয়া-নরেন-বিলাস প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। 'পল্লীসমাজ'-এও একটা বড়ো সামাজিক পটভূমি আছে। সেই পটভূমি রচনা করেছে বেণী ঘোষাল-গোবিন্দ গাঙ্গুলি-ধর্মদাসের দল। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত সমস্যাকে আবৃত করে ব্যক্তিগত সমস্যাটিকে (এক্ষেত্রে বিধবার ভালোবাসার অধিকারের সমস্যা) বড়ো করে তোলা হয়েছে। রমার কাশীবাসে ব্যক্তিগত সমস্যার একটা দুঃখজনক সমাপ্তি আছে (তাকে সমাধান বলা যায় না), সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান নেই। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসে পরিণতিতে গোরার মহৎ আত্মোপলব্ধি বা বিশ্বাত্মবোধে উত্তরণ ঘটেছে—যার প্রতীকী প্রকাশ খ্রিস্টানী লছমিয়ার হাতে জলগ্রহণে, বিনয়ের সঙ্গে পুনরায় আগের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার আভাসে। ব্রাহ্মকন্যা সুচরিতা যেমন তার জীবনে নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে, তেমনই স্বীকৃত হয়েছে ভারতাত্মার চিরকালের সমন্বয়ধর্মী মর্মবাণী। গোরা সুচরিতার চিত্তকে প্রবল প্রেমে আকর্ষণ করেছে, আবার তার মন প্রাণকে ভারতবর্ষের অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছে। জন্ম পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকভাবে গোরার সমস্ত অতীত ও এতকালের একাগ্রলক্ষ্যবর্তী সনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বিলুপ হয়ে গিয়েছে। দিক্‌চিহ্নহীন অদ্ভুত শূন্যময় উপলব্ধিতে ক্ষণকালের জন্য গোরা নীরব হয়ে গেলেও সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েনি। বরং সে বুঝেছে তার চারদিকের সঙ্গে তার এতদিনের লড়াই ছিলো 'নিষ্কন্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে (আমার) ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য...।' আর যখন ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেলো, তখন ছাড়া পেয়ে 'হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে' এসে পড়লো সে। সংকীর্ণ সমাজবদ্ধহীন পরেশবাবুকে গুরুত্বে বরণ করে নিলো, সুচরিতাকে নিজের জীবনে অঙ্গীকার করে নেবার বাধা অন্তরে-বাহিরে অপসারিত হলো। ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের এমন সমতাৎপর্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র 'গৃহদাহ', 'দত্তা' বা 'পল্লীসমাজে' নেই। 'গোরা' সেই মহনীয়তায় অনন্যতম মাত্রা পেয়েছে।

> *'গোরা' উপন্যাসের পরিণতিতে গোরার মহৎ আত্মোপলব্ধি বা বিশ্বাত্মবোধে উত্তরণ ঘটেছে। গোরা সুচরিতার চিত্তকে প্রবল প্রেমে আকর্ষণ করেছে, আবার তার মন-প্রাণকে ভারতবর্ষের অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছে। ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের সমাধান ও 'গোরা' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।*

৭.৪.১৪.৩ : উপন্যাসের ভাষা

এপিক-উপন্যাসের বিশালতা ও গাম্ভীর্যের প্রকাশবাহন যে ভাষা, তার শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচয় 'গোরা'র বৃহৎ পরিসরে সর্বব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে আছে। মূলগতভাবে এই ভাষা গতিময়—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই

স্বতঃস্ফূর্ত গতি সাবলীলভাবে সঞ্চরণশীল। মূল কল্পনা ও জীবনদর্শনের সঙ্গে অনায়াস সম্পৃক্তির জন্য এই উপন্যাসের ভাষা এত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কখনো হঠাৎ জেগে ওঠা চরের মতো পিঠ উঁচিয়ে দেয়নি। ভারসাম্য ও সুষমা বজার রেখে তা সমস্ত শ্রেণির চরিত্রের কণ্ঠেও যথোপযুক্ত হয়েই দেখা গেছে। পরেশবাবু, হারাণবাবু, মহিম, হরিমোহিনী, বরদাসুন্দরী, ললিতা, চরঘোষপুরের নাপিত—এই বৈচিত্রময় চরিত্রমালার কয়েকটি সংলাপ বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কথ্যরীতিকে কতখানি শক্তিতে লেখক তাঁর অখণ্ড কল্পনার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রেখেছেন। এতে উপন্যাসের এপিক-মর্যাদাও যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আবার পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে :

'গোরা' উপন্যাসের ভাষা গতিময়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই গতি সাবলীলভাবে সঞ্চরণশীল। উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাষাবিন্যাসের কুশলতাগুণ, কথ্যরীতিকে লেখত তাঁর অখণ্ড কল্পনার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রেখেছেন। উপন্যাসের মূল কাঠামো সাধু গদ্যরীতির। যাইহোক উপন্যাসে স্থান ও কালগত পটভূমি, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সুষম মীমাংসা হয়েছে সরল-গতিশীল-সুঠাম ভাষা রীতির প্রয়োগে।

পরেশবাবু : ''মা নিজের বুদ্ধির উপরেই যদি আমি একমাত্র নির্ভর করতুম তা হলে আমার ইচ্ছা ও মতের বিরোধে কোনো কাজ হলে দুঃখ পেতুম। ...আমিও একদিন বিদ্রোহ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম, কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করিনি। সমাজের উপর আজকাল এই যে ক্রমাগত ঘাত প্রতিঘাত চলছে এতে বোঝা যাচ্ছে তাঁরই শক্তির কাজ চলছে। তিনি যে নানাদিক থেকে ভেঙ্গে গড়ে শোধন করে কোন্ জিনিসটাকে কীভাবে দাঁড় করিয়ে তুলবেন আমি তার কী জানি! ব্রাহ্ম সমাজই কি আর হিন্দুসমাজই কি, তিনি দেখছেন মানুষকে।" (পরিচ্ছেদ-৫৯)

হারণবাবু : ''তোমার গৌরমোহনবাবুকে বিনয়বাবু পাওনি। তুমি নিজেকে হিন্দু হিন্দু বলে গলা ফাটিয়ে ম'লেও গৌরবাবু যে তোমাকে গ্রহণ করবেন এমন আশাও করো না। শিষ্যকে নিয়ে গুরুগিরি করা সহজ কিন্তু তাই বলে তোমাকে ঘরে নিয়ে ঘরকন্না করবেন একথা স্বপ্নেও মনে কোনো না।" (পরিচ্ছেদ-৬২)

মহিম : ''শশীর বিবাহের প্রস্তাবটা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের বেহাই যতটুকু পরিমাণ মেয়ে ঘরে নেবেন সোনা তার চেয়ে বেশি না নিয়ে ছাড়বেন না, কারণ তিনি জানেন মানুষ নশ্বর পদার্থ, সোনা তার চেয়ে বেশিদিন টেঁকে। ওষুধের চেয়ে অনুপাতটার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। বেহাই বললে তাঁকে খাটো করা হয়, একেবারে বেহায়া।" (পরিচ্ছেদ-৬৩)

হরিমোহিনী : ''মা, সকল বিষয়েই তোমরা খৃষ্টানের মতো হলে চলবে কেন? গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ইস্কুলে পড়ায় এ তো বাপের বয়সে শুনিনি।" (পরিচ্ছেদ-৪৪)

বরদাসুন্দরী : ''অত বামনাই করতে চান (হরিমোহিনীর কথা) তো আমাদের ব্রাহ্ম বাড়িতে এলে কেন? আমাদের এখানে ও সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না। আমি কোনোমতেই এতে প্রশ্রয় দেব না।"(পরিচ্ছেদ-৩৮)

ললিতা : "(পানুবাবুকে) বিনয়বাবু আজ অনেকদিন পরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি। ততক্ষণ আপনি নিজের লেখা যদি পড়তে চান তাহলে— না ঐ যা, সে কাগজখানা দিদি দেখছি কুটি কুটি করে ফেলেছেন। পরের লেখা যদি সহ্য করতে পারেন তাহলে এইগুলি ('টেবিল হইতে সযত্নে রক্ষিত গোরার রচনাগুলি আনিয়া') দেখতে পারেন।" (পরিচ্ছেদ ৩৯)

নাপিত : "দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। ও বেটারা ভাববে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করে এনে দিয়েছি।... আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় তাহলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।" (পরিচ্ছেদ-২৬)

সংলাপের ভাষা কথ্যরীতির হলেও উপন্যাসের মূল কাঠামো সাধু গদ্যরীতির। সেই গদ্যরীতি তুলে ধরেছে গভীর-ব্যাপক প্রেক্ষাভূমিতে বৃহত্তম মানবনীতির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষকে। বিচিত্র চরিত্রপাত্র উপন্যাসের প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে মহিমান্বিত করেছে ভাষাবিন্যাসের কুশলতাগুণে। অথচ ভাষার সরলতা ও স্নিগ্ধতা তার গাম্ভীর্য রক্ষার পরিপন্থী হয়নি কোথাও। মহাকাব্যোচিত মহিমা রেখে অবলীলায় সংস্থান পেয়েছে আনন্দময়ী ও হরিমোহিনীর, সুচরিতা-বরদাসুন্দরীর কিম্বা গোরা ও দারোগা মাধব চাটুজ্জ্যের বাক্যবন্ধ। এই বিশষ্ট গদ্যভাষা 'গোরা' উপন্যাসের 'এপিক-স্পিরিট'কে রক্ষা করেছে, নিজেকেও সেই আবহে যথোচিতভাবে জড়িয়ে নিয়ে।

'গোরা'র কাহিনি সুদীর্ঘব্যাপ্ত নয়, ঘটনাপ্রবাহের বিপুলত্বও এখানে উল্লেখ্য নয়। তা সত্ত্বেও উপন্যাসরূপে 'গোরা'র মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। এই উপন্যাসে স্থান ও কালগত পটভূমি, বিষয়বস্তু বিস্তৃতি, তত্ত্বগত ভিত্তি, চরিত্র-সমূহের আদর্শসন্ধানী অন্তঃপ্রেরণা, উত্থাপিত সমস্যার সামগ্রিক সমাধান, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সুষম মীমাংসা হয়েছে সরল-গতিশীল-সুঠাম ভাষারীতির প্রয়োগে। আর এই সব কিছু মিলে 'গোরা'কে অসাধারণত্বগুণে মণ্ডিত করেছে—দিয়েছে এপিক-উপন্যাসের মহিমা।

৭.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. চরিত্রগুলির মানবিক সমাজকে চাওয়ার কারণ কি?

২. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের বিরোধের কথা আছে?

৩. উপন্যাসের মূল কাঠামো কোন ভাষারীতির?

৭.৪.১৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।

৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ — কথাসাহিত্য।

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।

৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।

৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।

৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।

৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

একক ১৫
গোরার জন্মবৃত্তান্ত

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৫.১ : গোরার জন্মবৃত্তান্ত—উপন্যাসে তার গুরুত্ব

৭.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৫.১ : গোরার জন্মবৃত্তান্ত-উপন্যাসে তার গুরুত্ব

'গোরা'-উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান। সিপাহী-বিদ্রোহের আলোড়নের মধ্যে প্রাণরক্ষা করার জন্য আসন্নপ্রসবা এক আইরিশ নারী নিঃসন্তান আনন্দময়ীর আশ্রয় নেন। একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে সেই বিদেশিনী মারা যান। তখন কৃষ্ণদয়াল ও তাঁর স্ত্রী সন্তানবুভুক্ষু আনন্দময়ী সন্তানপরিচয়ে গোরা তথা গৌরমোহনকে লালন করেন। এই তথ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির জানা ছিল না। গোরা নিজেও একথা জানে না। কিন্তু পাঠককে উপন্যাসের প্রথম পর্বেই সত্যটি বলে দেওয়া হয়েছে।

'গোরা' উপন্যাসের মর্মবাণী ভারতীয় মানবতার (Humanisitic Indianism) আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। গোরার জন্মরহস্য-বিষয়টি সেই তত্ত্বপ্রকাশে যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের কথা বললে নিশ্চয়ই তা কোনওপ্রকার সাম্প্রদায়িকতায় অথবা রেখাচিত্রনির্দিষ্ট ভূখণ্ডসীমায় খণ্ডিত হয়ে থাকতে পারেনা। ভারতীয় মানবতা সেখানে বৈশ্বিক সর্বমানবতায় উন্নীত ও প্রসারিতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গোরার জন্মবৃত্তান্ত থেকে যে সমস্যার উদ্ভব-সম্ভাবনা, তাকে উপন্যাসে সরাসরি উপস্থিতি করে সেই সমস্যা-সমাধানের বীজমন্ত্রটিও উপন্যাসের কোষে সংস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যাকে বলা যেতে পারে বিশ্বমানবতাবাদ।

গোরাকে কুড়িয়ে না পেলে কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৌত্রী আনন্দময়ী তাঁর আচার-বিচার- সংস্কার চিরতরে বিসর্জন করতে পারতেন না। আনন্দময়ী অবলীলায় সুচরিতাকে মাতৃস্নেহের মধ্যে টেনে নিতে পেরেছেন, ব্রাহ্ম ধর্মীয়া ললিতাকে বিবাহ করে বিনয়কে মুছে দিতে বলেছেন তার অসম্মানের কালিমা, খ্রিস্টানী লছমিয়াকে অন্তঃপুরের কাজে স্বচ্ছন্দে সামিল করেছেন অথবা সতীশের পোষা কুকুরটিকে কোলে তুলতেও তাঁর বাধেনি। এমন অবারিত উদারতা ও মানসঋদ্ধি আনন্দময়ী পেয়েছেন গোরাকে প্রাপ্তিসূত্রে— ''মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য— আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে মরে, তা যে কত মিথ্যে— সে কথা ভগবান গোরাকে যেদিন দিয়েছেন সেই দিনই বুঝিয়ে দিয়েছেন।''

কাহিনির শেষ পর্বে কৃষ্ণদয়াল এখুনি মারা যাবেন এই আশঙ্কায় গোরাকে তাঁর পারলৌকিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার জন্মরহস্যের কথা বলে দিলেন। আকস্মিক বজ্রপাতের মতো এই জানার বেদনা গোরাকে প্রচণ্ড শূন্যতাবোধের ট্রাজিক অভিভবে ক্লিষ্ট করল। কিন্তু সেই আঘাত তার স্বকৃত বন্ধনদশা থেকে বেরিয়ে আসবার পথও তাকে দেখিয়ে দিল। মানবতার মুক্তিমন্ত্রদীক্ষাদাতা পরেশবাবুর শিষ্যত্ব নিয়ে সংস্কারমুক্ত আনন্দময়ীর আশ্রয়ে ফিরে গোরা পরম আশ্বাসে উচ্চারণ করল তাঁর একান্ত আত্মগত উপলব্ধি, যা কিনা একাধারে বিরাট তত্ত্ব হয়েও লেখকেরেই আত্মিক নির্যাসরূপে প্রকাশ পেল সহজতম শব্দপুঞ্জে—''মা, তুমিই আমার মা, ... তুমিই আমার ভারতবর্ষ''।

'গোরা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান। কৃষ্ণদয়াল ও তার স্ত্রী আনন্দময়ী সন্তান পরিচয়ে গোরাকে লালন করেন। উপন্যাসটিতে গোরার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবতাবাদের কথা শোনানো হয়েছে। মানবতার মুক্তিমন্ত্র দীক্ষাদাতা পরেশবাবুর শিষ্যত্ব নিয়ে সংস্কারমুক্ত আনন্দময়ীর আশ্রয়ে ফিরে গোরা পরম আশ্বাসে উচ্চারণ করলেন—"মা, তুমিই আমার মা,...তুমিই আমার ভারতবর্ষ।''

সুচরিতাকে ভাব ও ভাবনার দিক থেকে একান্ত সহমর্মী জেনেও গোরার সঙ্গে বিধর্মী সুচরিতার মিলনের বাধা গোরা অতিক্রম করতে পারেনি। সেই বাধা অপসৃত হয়েছে নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার পর। এই দিন তেকে অবশ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে রহস্য-মোচন-পর্বের অবতারণা আরোপিত তথা দুর্বল বলে মনে হতে পারে। তবে এই যুক্তি যে অকাট্য নয়, তার প্রমাণ রয়েছে বিনয়-ললিতার বিবাহ-মিলনে। এদের দুজনের মধ্যে কেউই হিন্দু বা ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ না করেও সামাজিক বাধার অসারতাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গোরার মহনীয় বোধ সুচরিতার সহযোগে যে দৃঢ় ও বলীয়ান দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন জীবনপথে অগ্রসর হবে, তারই সঙ্কেত যেন পাই উপন্যাস-অন্তে 'নবজন্মলব্ধ' গোরার মধ্য দিয়ে।

৭.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. গোরা কার সন্তান ছিলেন?

২. কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী নাম কি ছিল?

৩. গোরার জন্মবৃত্তান্ত উপন্যাসে কতটা শৈল্পিক তা বিচার করো।

৭.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।

৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ — কথাসাহিত্য।

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।

৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।

৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।

৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।

৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

একক ১৬
বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৬.১ : বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

৭.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৬.১ : বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

'গোরা' উপন্যাসে গৃহীতকালের ব্যাপ্তি সুবিস্তৃত নয়। এক বছরের কম সময়সীমার মধ্যে উপন্যাসের ঘটনাবলী উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বহু ও বিচিত্র চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। প্রধান চরিত্র, অপ্রধান চরিত্র—সকলেই আপন-আপন দায়িত্ব পালন করে গেছে। তেমনই এ উপন্যাসে আছে মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনিরও সংস্থান। গোরার উত্তরণ যদি মূল কাহিনিধারা হয়, তবে বিনয়-ললিতার কাহিনি বা হরিমোহিনীর কাহিনিকে উপ ও শাখা কাহিনি বলা যেতে পারে। বিনয়-ললিতাকে নিয়ে যে উপকাহিনি, তার সার্থকতা সেখানেই, যেখানে তার দ্বারা মুখ্য প্রতিপাদ্য বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হবে। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

সাধারণত নদী-উপনদীর সঙ্গে তুলনা করে আমরা কাহিনি-উপকাহিনি বিষয়টির উল্লেখ করে থাকি। উপনদী যেমন তার জলধারা দিয়ে নদীকে পরিপুষ্ঠ করে, তেমনই উপকাহিনির প্রভাব মূল কাহিনির গতি ও তাৎপর্যকে বেগবান ও সমৃদ্ধ করে থাকে। স্বকীয়তাপূর্ণ হয়েও তাই সার্থক উপকাহিনি স্বতন্ত্র নয়, অন্তত তেমন হলে উপকাহিনি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

গোরার আশৈশব বন্ধু বিনয় যৌবনকাল পর্যন্ত ছিল অভিন্নহৃদয়। কিন্তু পরেশবাবুর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর অনাত্মীয় নারীর অসংকোচ সংস্পর্শ লাভ করে বিনয়ের আত্মার অনভিজ্ঞ দিকটি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল—"এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই।... বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ময় যবনিকার মতো পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে

> *'গোরা' উপন্যাসে বহু ও বিচিত্র চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। গোরার উত্তরণ যদি মূল কাহিনিধারা হয়, তবে বিনয় ললিতার কাহিনি বা হরিমোহিনীর কাহিনিকে শাখাকাহিনি বলা যেতে পারে। সুচরিতা নয়, লালিতাই বিনয়ের মনে যথার্থ অনুরাগের উন্মেষ ঘটিয়েছে। প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোরা যখন কারান্তরালে, তখনই লেখক অন্যান্য চরিত্রগুলিকে বিকশিত করবার সুযোগ নিয়েছেন।*

একেবারে আড়াল করিয়া দিল।" (প্রথম পরিচ্ছেদ) এর ফলে বিনয়ের ওপর থেকে গোরার ব্যাক্তিত্বের প্রবল চাপ সরে গিয়ে সেখানে স্বাভাবিক মুক্তির হাওয়া এসে পৌঁছাল। বিনয় প্রথম দেখেছিল সুচরিতাকে। এই নিয়ে একটি সাময়িক বিভ্রম সৃষ্টি হলেও পাঠক ক্রমেই বুঝে নিতে পারেন যে, সুচরিতা নয়, ললিতাই বিনয়ের মনে যথার্থ অনুরাগের উন্মেষ ঘটিয়েছে। ললিতার আপাত-বিরোধী মনোভাবকে আশ্রয় করে এই অল্পস্বাদ অনুরাগ গভীর ও পরিণামী প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিনয় ও ললিতার প্রেমানুভবের আড়ালটুকু সরে গিয়েছে এক আকস্মিক পরিস্থিতিতে—স্টীমারযাত্রার ঘটনায়। গোরার কারাদণ্ড বিনয়কে মর্মাহত ও ললিতাকে অপমানক্লিষ্ট করে একটি অনুভববিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন ত্যাগ করে তারা কলকাতায় চলে এসেছে। এই সহযাত্রাপথে বিনয় ললিতার নির্ভরতার স্থানটি লাভ করে নিজের পুরুষোচিত উপলব্ধির কেন্দ্রে প্রেমের গৌরব উপভোগ করেছে—"তাহার প্রতি ললিতার এই নির্ভর-কল্পনা যেন একটি স্পর্শের মতো তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাহিল। ... ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল।"(পরিচ্ছেদ-৩০)

লালিতা তার অকুণ্ঠিত তেজ ও সততা নিয়ে বিনয়ের সঙ্গী হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গোরার ছায়ামাত্র ধরে নিয়ে যে-বিনয়কে এতদিন পর্যন্ত সে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত, তারই বিচক্ষণতা, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও পরিশীলিত সৌজন্য তাকে নির্দ্বিধায় সুযোগ্য প্রেমিক বলে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করেছে।"... বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আব্রু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাঝমাঝে বিনয়ের সুকুমারশীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল। ... একটি অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।" (পরিচ্ছেদ-৩০)

প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গোরা যখন কারান্তরালে, তখনই লেখক অন্যান্য চরিত্রগুলিকে বিকশিত করবার সুযোগ নিয়েছেন। বিনয় ও ললিতার একত্রে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্রিয়ার সমাজ এতই উত্তাল হয়ে উঠেছিল—যার সমাধান হলো এদের বিবাহের মধ্যে। ললিতার কুৎসা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কিছু লোক তাদের নীচতাকেই প্রকাশ্যে এনে দিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ললিতার প্রজ্ঞাবান পিতা পরেশবাবু স্বেচ্ছায় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিলেন ব্রাহ্ম সমাজের কমিটির কাছে পত্র লিখে—"ললিতার বিবাহ আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যদি ত্যাগ করেন তাহাতে আপনাদের অন্যায় বিচার হইবে না। এক্ষণে ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা রহিল তিনি আমাকে সমস্ত সমাজের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে স্থান দান করুন।"(পরিচ্ছেদ-৬৫)

বিনয় ও ললিতার উপকাহিনির দ্বারা এই উপন্যাসে লেখকের মূল বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান সূত্রগুলি হলো :

১. বিনয় ব্রাহ্মণসন্তান, গোরারও একই পরিচয়। বিনয় এবং ব্রাহ্ম কন্যা ললিতা মানসিক সাধর্ম্যের কারণে বিবাহবন্ধনে মিলিত হয়েছে। সামাজিক অনুশাসন না মানলে ক্ষতি নেই, যদি ব্যক্তি সমাজের চেয়ে মহনীয় হতে পারে। এই দৃষ্টান্ত গোরাকে আপাতভাবে যতটা না বিরূপ করেছে, তার চেয়ে বেশি বিব্রত এবং উৎসুক করেছে: "বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের দিনে বিনয়ের হৃদয় গোরার হৃদয়ের" পরে একটি অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। ...সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়,

তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বার তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ-৬৯)

২. সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি থেকে গোরার যে মহৎ চেতনায় উত্তরণ ঘটেছে তার একটি সূত্র গোরার জন্মবৃত্তান্ত। কিন্তু একথা মানলে 'গোরা'র আবেদন সীমিত হয়ে পড়ে। ললিতা-বিনয়ের বিবাহ থেকে প্রমাণ হয় মানসমুক্তির জন্য কোনও ইতিহাস, দৈব বা জন্মরহস্য না থাকলেও চলে। স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আবেগ এবং মানবকল্যাণস্পৃহা থেকেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায়।

৩. ললিতার বিবাহসঙ্কট থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি পরেশবাবুর ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে চোখ খুলে দিয়েছে। একদিন যে মুক্তিপ্রয়াসে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, আজ সেই মুক্তির তপস্যাই তাঁকে সর্বধর্মসম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতার বাইরে নিজেকে মেলে ধরবার স্থান করে দিয়েছে।

৪. গোরার ভাবধর্মী জীবনদর্শনের পাশাপাশি বিনয়ের জীবনধর্মী রূপায়ণে উপন্যাসের বয়নশিল্প পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

৭.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ললিতা কে?

২. বিনয় কে?

৩. 'গোরা' উপন্যাসের অসাধারণত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. 'গোরা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'গোরা'র বিবর্তনরেখা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

৫. 'গোরা'র জন্মবৃত্তান্ত উপন্যাসের দুর্বলতা কিনা সে বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও।

৬. 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের 'ভারতচিন্তার দলিল'—আলোচনা করো।

৭. ললিতা-বিনয় উপকাহিনির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৮. 'গোরা'র প্লট ও থীম-এর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় কি? —আলোচনা করো।

৯. 'গোরা' উপন্যাসের মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় গৌণ চরিত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

১০. আনন্দময়ী অথবা পরেশবাবুর চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

১১. 'মা, তুমিই আমার মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ'। —এই উক্তির আলোকে গোরার সংস্কারমুক্তির পরিচয় দাও।

৭.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।

৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য।

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।

৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।

৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।

৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।

৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ.

দ্বিতীয় সেমেস্টার

B-CORE-207

উপন্যাস

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১.	বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২.	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রী হরেন ভৌমিক — প্রাক্তন অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই ২০২২

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) **Manas Kumar Sanyal**, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পাঠ্যক্রম

পত্র - B-CORE- 207

শিরোনাম : উপন্যাস

পর্যায় গ্রন্থ : ১ গণদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. উপন্যাসের পটভূমি, স্থান পটভূমি, কাল পটভূমি, কাহিনি

একক ২. উপন্যাসের বর্ণিত গ্রামের কথা, গ্রাম ভাবনার ভিন্নতর উপস্থাপন, নামকরণ

একক ৩. চরিত্রায়ণ, পুরুষ চরিত্র, নারী চরিত্র

একক ৪. ভাষা-বয়ন, লোক-উপাদান, প্রবাদ প্রবচন

পর্যায় গ্রন্থ : ২ পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) : উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা

একক ৬. নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি

একক ৭. কুমুদ – মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

একক ৮. কুসুম চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. লেখক পরিচয়

একক ১০. বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

একক ১১. 'আরণ্যক' এর গোত্রবিচার

একক ১২. কথক সত্যচরণের ভূমিকা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ ঢোঁড়াইচরিতমানস – সতীনাথ ভাদুড়ী (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩.উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি

একক ১৪. নামকরণ

একক ১৫. উপন্যাসের শ্রেণীবিচার

একক ১৬. চরিত্র বিচার

সূচিপত্র

B-CORE- 207

B-CORE-207	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	উপন্যাসের পটভূমি, স্থান পটভূমি, কাল পটভূমি, কাহিনি	ড. তুষার পটুয়া	**১-৬**
	২.	উপন্যাসের বর্ণিত গ্রামের কথা, গ্রাম ভাবনার ভিন্নতর উপস্থাপন, নামকরণ	ড. তুষার পটুয়া	**৬-৭**
	৩.	চরিত্রায়ণ, পুরুষ চরিত্র, নারী চরিত্র	ড. তুষার পটুয়া	**৭-১০**
	৪.	ভাষা-বয়ন, লোক-উপাদান, প্রবাদ প্রবচন	ড. তুষার পটুয়া	**১০-৩০**
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) : উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	**৩১-৩৪**
	৬.	নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	**৩৪-৩৫**
	৭.	কুমুদ – মতি উপকাহিনির গুরুত্ব	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	**৩৫-৩৮**
	৮.	কুসুম চরিত্র	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	**৩৮-৫২**
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯	লেখক পরিচয়	শ্রী হরেন ভৌমিক	**৫৩-৫৮**
	১০	বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক	শ্রী হরেন ভৌমিক	**৫৮-৬০**
	১১	'আরণ্যক' এর গোত্রবিচার	শ্রী হরেন ভৌমিক	**৬০-৬৪**
	১২	কথক সত্যচরণের ভূমিকা	শ্রী হরেন ভৌমিক	**৬৪-৯৫**
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩	উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি	অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	**৯৬-১০১**
	১৪.	নামকরণ	অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	**১০১-১০৩**
	১৫.	উপন্যাসের শ্রেণীবিচার	অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	**১০৩-১০৬**
	১৬.	চরিত্র বিচার	অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	**১০৬-১২৫**

Paper –B-Core-207

গণদেবতা- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

207. Module-1, Unit-1

বিন্যাস ক্রম :

207.1.1.1 ভূমিকা

207.1.1.2 উপন্যাসের পটভূমি

207.1.1.3 স্থান পটভূমি

207.1.1.4 কাল পটভূমি

207.1.1.5 কাহিনি

207.1.1.6 আদর্শ প্রশ্নমালা

207.1.1.7 সহায়ক গ্রন্থ

207.1.1.1 ভূমিকা

রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যের ধারায় একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনাদৃত অবজ্ঞাত সমাজ ও মানবজীবনের প্রতি বিচিত্রভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করেন তারাশঙ্কর। মানুষের মধ্যে সচেতনতার উদ্ভব থেকেই শুরু হয় গণজাগরণ গণঅভ্যুত্থান। অভ্যুত্থিত গণমানসে তখন সাংস্কৃতিক বদল আসে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। শুরু হয় পুরনো ব্যবস্থাতন্ত্রের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থাতন্ত্রের সংঘাত। তবে সফলতা নির্ভর করে মানবসমাজের সামগ্রিক সচেতনতার বিকাশ ও সঠিক পথে পরিচালনার মধ্যে দিয়েই। 'Voice of the people is the voice of the God' এমন একটি কথা প্রায়শই শোনা যায়। বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ হওয়ার সুবাদে রাঢ়ের বিভিন্ন ব্রাত্য ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাদের কথা বলবার আগ্রহ নিয়েই সাহিত্যে তিনি নতুন কথা শোনাতে চাইলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প(পোনাঘাট পেরিয়ে) ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি'র গল্প (জোহান-এর বিহা) পাঠে তাঁর অভিজ্ঞতা, 'ইচ্ছে হল এমনই গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা —তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।' বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি লিখতে শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে এই ধারায় রচিত হয় 'চৈতালী-ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'রাইকমল' (১৯৩৪), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'কবি' (১৯৪১), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি।

তারাশঙ্কর সম্পর্কে কয়েকটি অতিপরিচিত কথার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া খুব জরুরি। তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ়বাংলার কথাকার —বীরভূমের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমগ্র-কথা অর্থাৎ মাটি, মানুষ ও তৎসংলগ্ন ভাষা, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ-প্রবচন, উৎসব অনুষ্ঠান, ব্রতকথা প্রভৃতি সমস্ত রূপের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর রচনায় বিধৃত হয়েছে। ব্যক্তিসত্তার অভিরুচির গঠনে যে পরিমণ্ডল তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই পরিবেশের কথা ও তার সংকটের প্রকৃত চিত্রের উজ্জ্বল ঝলক বারবার ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। সেই সাংস্কৃতিক আবহকে তিনি তাঁর রচনায় স্থান করে দিতে সংকোচবোধ করেননি। বলিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা বেশিরভাগ উপস্থাপন করেছেন সমকালীন কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ সাহিত্যিকদের পথ থেকে সরে গিয়েই। তারাশঙ্করের সাহিত্যের অভিমুখ ছিল পশ্চিমী চিন্তা-চেতনাবিমুখ, স্বদেশ ও প্রথাগত দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ আনুগত্য এবং মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। এই সমস্ত কথার মিশ্রণ আছে ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে। পল্লীজীবন সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতার সংমিশ্রিতরূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। নগরজীবনেকেন্দ্রিক কথার সম্ভারকে পাশ কাটিয়ে তিনি মাটিঘেঁষা জীবনের দিকটি আমাদের সম্মুখে মেলে ধরলেন। তার ফলে আমরা তারাশঙ্করে কলমে পেয়ে গেলাম বিশ শতকের গ্রামীণ সমাজের সামগ্রিক চিত্রপট ও চিত্তপটটি। শুধু ব্যক্তি মানুষ নয়; গোষ্ঠীবদ্ধ বা গোষ্ঠীজীবনকেন্দ্রিক কথকতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে থাকলো এই ‘গণদেবতা’ উপন্যাস।

207.1.1.2 উপন্যাসের পটভূমি

উপন্যাসের কাহিনি যে স্থানে বা কালে সংঘটিত হয় অর্থাৎ উপন্যাসের স্থান ও কালের আধারকে পটভূমি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসের কাহিনি পরিবর্ধিত হয় কোনো স্থান ও কালের গন্ডীর মধ্যেই। স্থান ও কালের পরিধি ছাড়া তার গুরুত্ব থাকে না। এই দুটি বিষয় তাই এই আলোচনায় খুব জরুরি একটি বিষয় হয়ে ওঠে।

207.1.1.3 স্থান পটভূমি

যে ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডের পটভূমিতে গণদেবতা উপন্যাসটি রচিত হয়েছে তা এই বঙ্গের অতিপ্রাচীন বীরভূমের অন্তর্গত রাঢ়ভূমি। সাধারণভাবে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা অধিকাংশই শ্রমজীবী মানুষ —আবার তাদের একটা বড়ো অংশ ভূমিহীন চাষী। উপন্যাসে স্থানিক বিবরণে আছে —‘দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় মাইল —প্রস্থে ছয় মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানি গ্রামের অবস্থিতি...।’ পাশাপাশি উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপট —‘সেই তেরোশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে; আজ তেরোশো ঊনত্রিশ সাল —আজও বাজারের আগুন নিবিল না।’ যে কয়লার মণ ছিল তিন আনা চোদ্দ পয়সা, সেই কয়লার দাম দাঁড়ায় চোদ্দ আনা। সেই সময়ের গ্রামের রূপটি কেমন ছিল তা আমরা দেখতে পাই।

207.1.1.4 কাল পটভূমি

কালের দিক থেকে ‘গণদেবতা’ ও ‘পঞ্চগ্রাম’ ও ‘দ্বারমণ্ডল’ ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সমাজে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটি স্বচ্ছ চিত্র এখানে চিত্রিত হয়েছে। আর্থসামাজিক ভাবে বিপর্যস্ত একটি পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীহরি পাল তাই সমাজে প্রধান হয়ে ওঠে। গ্রামসমাজ ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে এবং সেই পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে এইভাবে —‘অর্থবলে এবং দৈহিক শক্তিতে ছিরু যথেচ্ছাচার করিতেছে। শুধু ছিরু কেন —গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না, সামাজিক আচার-ব্যবহার সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষ মরিলে সহজে মড়া বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে —একই পঙ্ক্তিতে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখা দিয়াছে...।’উপন্যাসে তারিণীচরণের কথা বলা হয়েছে —সে একজন সর্বশান্ত চাষী, তার পেশান্তর ঘটে যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে। শ্রমিকে পরিণত হয়ে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যতীনের মজলিসে জগন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সম্ভবনা সম্পর্কে আলোচনা চলছে। বাংলা প্রদেশের আইনসভায় প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। জমিদার সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯০৮ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হবে তার ডেলিগেট হতে চায়...। অর্থাৎ কালের দিক থেকে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ এখানে আছে এবং সেই কাল হল যুদ্ধোত্তর পল্লীসমাজ।

207.1.1.5 কাহিনি

আলোচনার শুরুতেই উপন্যাসের কাহিনি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উপন্যাসের শুরুতে অনিরুদ্ধ কর্মকার ও গিরিশ সূত্রধরকে কেন্দ্র করে গ্রামে একটি আলোড়ন পড়ে যায়। তারা দুজনেই গ্রামের পাট চুকিয়ে নদীর ওপারে বাজারে-শহরটায় একটি দোকান খুলে বসেছে। গ্রামসমাজ ত্যাগ এবং পেশান্তরের ইঙ্গিত দিয়ে যে উপন্যাসের সূত্রপাত সেই উপন্যাসে আরও কী অপেক্ষা করে আছে তা দেখা প্রয়োজন।

অনিরুদ্ধ ও গিরিশকে কেন্দ্র করে চণ্ডীমণ্ডপের নাটমন্দিরে বা আটচলায় শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছিয়ে মজলিস বসে। তাদের ডেকে পাঠানো হয় ‘পঞ্চায়েৎ-মজলিসে’। তারা দু’জনেই না এসে পারে না; কারণ গ্রাম্য সংবিধান তাদের যে-কোন অপকর্ম থেকে রক্ষা করার জন্যেই নির্মিত হয়। এখানে যারা উপস্থিত হয়েছে তারা শুধু গ্রামের মানুষ নয়; তারা সেই সঙ্গে একটি বিশেষ ব্যবস্থাতন্ত্রের ও গ্রামসমাজের মানুষও। শুধু তারা দু’জনেই নয়, গ্রামের পাতুও ‘আঙোটজুতি’ যোগাতে চায় না। শ্রীহরি পালের বাড়বাড়ন্ত কীভাবে তার কথা শুরুতে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। সুদের কারবার করে নিজের ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি করে। গ্রামে মাটির বাড়িতে আগুন দিয়ে তাদের সে অবলীলাক্রমে পাশেই দাঁড়ায়। তার দয়ায় দাক্ষিণ্যে দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম্যরুচিতে পরিপালিত মানুষগুলি অভিভূত হয়ে যায়। গ্রামের পাঠশালার আসবাবের জন্য পঞ্চাশ টাকা দান করে। সুতরাং তার চরিত্রটি রহস্যাবৃত থেকে যায় গ্রামের মানুষের কাছে।

গ্রাম একটি নির্দিষ্ট বাঁধনে আবৃত। কবে ট্যাক্স দিতে হবে, এমনকি নবান্নের দিন নির্ধারণ প্রভৃতি সমস্ত কিছু গ্রাম্যবিধান অনুযায়ী হতে হয়। তারাশঙ্কর যে সময়ের কথা বলছেন, তখন মানুষ গ্রাম ত্যাগ করে শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে উদ্যত। গ্রাম ও গ্রাম্যবিধান মানুষকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। তাই জগন ডাক্তার ছিরু পালের সম্পর্কে মত ব্যক্ত করে —'ওই ছিরু পাল—চুরি করবে—ব্যভিচার করবে আর ঘরে বসে জপতপ করবে — ঘটা করে কালীপুজো, অন্নপূর্ণা পুজো করবে, ওরকম ধর্মের মাথায় মারি আমি পাঁচ ঝাড়ু।' যে মজলিসে ছিরু পাল টাকার জোরে মাতব্বর—সেখানে যেতে মানুষ বিরক্ত হয়।

দেবু পণ্ডিত গ্রামের একজন প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। গ্রামের হিতসাধনে সে জগন ডাক্তারের আস্ফালন সহ্য করেও তার সঙ্গ দেয়। তারা দুজনে ক্রমশ চেষ্টা করে গ্রামের মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে। এমনকি তারা গিরিশ ছুতোর ও অনিরুদ্ধ কর্মকারের পুজো ফিরিয়ে দিতে পিছুপা হয় না। অনিরুদ্ধ কামার তার প্রতিবাদ করে —'কে ? কে ? কার ঘাড়ে দশটা মাথা ? কোন নবাব-বাদশা আমার পুজো বন্ধ করেছে শুনি ?' অবশেষে সকলের প্রতি অনিরুদ্ধের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, 'বড়লোকের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, বিম্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, আমি কোন শালাকে মানি না, গ্রাহ্য করি না। দেখি —কোন শালা আমার কি করতে পারে !' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জগনের প্রস্তাব, ('ধ'রে এনে বেটাচ্ছেলে কামারকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগাও ঘা-কতক।' জগনকে নৈতিক সমর্থন করলেও এই ধরনের অমানবিক আঘাত মনুষ্যোচিত নয়। অন্যায় অত্যাচার মানুষকে মহান করে না; মানবিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে দেবু। দেবু পাঠ্যাবস্থা থেকে মহাপুরুষদের ভাবনার সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুক্তি মিলিয়ে একটি আদর্শ স্থাপন করতে চায়। বারংবার তার মন নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে ভাববার চেষ্টা করে। গ্রামকে সে প্রকৃত অর্থে ভালোবেসে আদর করে আপন করে নিতে চায়।

গ্রামের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই সমাজের বন্ধনকে অস্বীকার করতে শুরু করে একসময়। মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ শহরে পড়াশুনা করে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপকে উপেক্ষা করে; আবার অনিরুদ্ধ কামার ও গিরিশ ছুতারের মতো মানুষেরাও গ্রামের এই নিয়মকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। বরং বিশ্বনাথের পরামর্শ 'চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো হয়েছে, ও মরবে এইবার। ... এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে পারো ?' একদিকে দেবু নিজের সংস্কারকে ধরে রাখতে চায় অন্যদিকে বন্ধু বিশ্বনাথ আধুনিক পরিমণ্ডলে পরিবর্ধিত একটি মন সমস্ত কিছু সংস্কার ত্যাগ করতে চায়।

একসময় পৌষ-সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে অনিরুদ্ধের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় —'চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। ওখানে আর যাচ্ছি না। আমার পৌষ-আগলানো আমার নিজের বাড়ির দরজায় হবে।' এই অনিরুদ্ধের মতো মানুষেরা কীভাবে ধীরে ধীরে শ্রীহরির খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে যায়; তার চিত্র দেখানো হয়। স্ত্রী পদ্মর অসুস্থতার মধ্যে কামারশালা বন্ধ হয়ে যায়। তার উপর সরকারের সেটে্লমেন্ট এসে পড়ায় শুধু অনিরুদ্ধই নয়; গ্রামের সমস্ত লোকেরই এইভাবে 'লাঞ্ছনা-দুর্বিপাকের' আর শেষ থাকে না। শ্রীহরির পদবি পরিবর্তন করে ঘোষ হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ চণ্ডীমণ্ডপ নতুন সাজে সেজে ওঠে। কিন্তু গ্রামে বড়ো বিপদ ঘনিয়ে এলো —কেউ যেন গ্রামের ঝুঁটি ধরে টান মেরে একটা বৃহৎ ধাক্কা দিয়ে গেল। দেবু পণ্ডিতকে সেটে্লমেন্টের হাকিম পরোয়ানা দেওয়ার পর থানা থেকে লোক এসে ধরে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাম তোলপাড় হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরের মেয়েরা পণ্ডিতের স্ত্রী বিলুর খবর নিয়ে গেছে। ছিরু সকাল সকাল গিয়েছে হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে। কেউ নিয়ে এসেছে মর্তমান কলা, থোড়, মোচা, মটরশুঁটি, কপি তো কেউ এনেছে কাঁচা দুধ, খেজুর গুড় প্রভৃতি। পাড়ার কুমারী মেয়েরা ঘড়া চেয়ে নিয়ে জল এনে দিতে চায়। গ্রামের সকলের এই 'অকপট আত্মীয়তা' বিলুর বড্ড ভালো লাগে।

দুঃখের মধ্যেও এইটুকু তার মনকে ভরিয়ে তোলে। গ্রামের সমাজ এর থেকে আর কী বেশি করতে পারে! অবশেষে দেবুর এক বছর তিন মাস— অর্থাৎ পনেরো মাসের মেয়াদে জেল হয়ে যায়।

দীর্ঘ পনেরো মাস পরে দেবু পণ্ডিত চৈত্র মাসের শীর্ণ ময়ূরাক্ষীর তীরে শিবকালীপুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। এই কয়েকদিনে গ্রামের চেহারা বদলে গিয়েছে —নতুন করে প্রজা সমিতি হয়েছে, কংগ্রেস কমিটিও হয়েছে, যার প্রেসিডেন্ট জগন ও হরেন হল সেক্রেটারী। ছিরু হয়ে উঠেছে গ্রামের গোমস্তা। গ্রামের সাধারণ চাষীদের খাজনার নালিশের ভিত্তিতে জমি নীলামে তুলে ভূমিহীন করে দেয়। গ্রামের রূপ বদলে যায় দেবুর জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর অর্থাৎ ঠিক বছরখানেকের মধ্যে গ্রামের চরিত্রও বদলে যায় চরিত্রবৎ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রূপ পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় ও প্রবণতা। গ্রামের এই অরাজক পরিস্থিতির কথা দেবুকে বলে শ্রীহরি। গ্রামের লোকেরা 'খাজনা আর ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স'-এর টাকা পর্যন্ত সংস্থান করতে পারছে না। তাই বিকল্প নানান কৌশল অবলম্বন করে তা ফাঁকি দিতে চায়। ধার শোধ করতে গিয়ে গোটা মাঠের ধান শ্রীহরির বাড়ীতেই গিয়ে উঠে। অভাবের তাড়নায় দেবু পণ্ডিত চা খাওয়ার চিরকালের অভ্যাস ত্যাগ করে বসে। এই দেবুর স্কুলের কাজটি চলে গেছে তাই আজ সে শন পাক দিয়ে দড়ি তৈরি করার কাযে মন দেয় অবসর যাপনের চেষ্টায়— যাকে বলা হয়েছে 'পল্লীগ্রামে নিষ্কর্মার কর্ম-বুড়োর কাজ।'

অকালে চৈত্র মাসের ঝড়জলে গ্রামের বাঁধাধরা জীবনে একটি প্রবল ধাক্কা উপস্থিত হল। সমস্ত কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল চোখের সম্মুখে। ইতিমধ্যে গ্রামের হরিজনেরা চণ্ডীমণ্ডপে কাজের পরিবর্তে মজুরি চাইতে শুরু করলে শ্রীহরিও গাছের পাতা কাটতে নিষেধ করে দেয়। যে কাজটি তারা দীর্ঘদিন করে আসে হঠাৎ তার নিষেধাজ্ঞা শুনে গ্রামের মানুষ শুরুতে হতচকিত হলেও পরে তারা ঠিক বুঝতে পারে এর প্রকৃত রহস্য। দেবুর সাহসের উপর ভর করে হরিজনেরা শ্রীহরির মুখের সামনে তাকে অমান্য করে উঠে চলে যায় চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। এই ধরনের আচরণ শীহরি কল্পনাও করেনি—'এই ছোটলোকের দল—বর্ষায় আমি ধান দিই তবে খায় —আজ আমাকে অমান্য কর উঠে গেল ! ... কথা বলিতে বলিতে শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। —নেমকহারামের গ্রাম। এক এক মনে হয় —এ গাঁয়ের সর্বনাশ করে দিই!'

গ্রামের মানুষের কাছে যে-কোন উৎসব মানেই সকলে একসঙ্গে মেতে ওঠে। অশোক ষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যখন সকলে মেতে ওঠে তখন অনিরুদ্ধ নিজের পুরনো কামারশালা মেরামত করতে লেগে পড়ে। কিছু টাকা পেয়ে সে মহা উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করে। চাকর রেখেছে দুর্গার ভাই পাতুকে। এর মধ্যেই শ্রীহরি নবনিযুক্ত কালু সেখকে হুকুম দিয়ে বাউড়ী-মুচিদের গরু সব ধরে নিয়ে যায়। তার অপমানের প্রতিশোধ সে এইভাবে নেয়। জমিদার সরকারের বাঁধে কিংবা পতিত জমিতে বাউড়ী-বায়েনদের সব গরু অনধিকার প্রবেশ করলেই কঙ্কনার খোয়ারে চালান দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ধারার শাসন পদ্ধতি শ্রীহরির কাছে নতুন নয়; তাতেও যদি মানুষ না বোঝে তাহলে আরও আছে। দেবু খোকার বালা দুইগাছি দিয়ে সেই বন্দী গরুগুলিকে খালাস করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে।

এরপর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে দেবু ও যতীনের জীবনে। সন্ধ্যার সময় ভূপাল থানাদার, জমাদারবাবু ও একজন হিন্দুস্থানী সিপাহিকে শ্রীহরির বাড়িতে যেতে দেখে দুর্গা। গোপন পথে কান পেতে সে শুনতে পায় গোপন পরামর্শের কথা। এই ঘটনার পর দুর্গা সমস্ত পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয়। শ্রীহরির কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা বুঝতে ঘণ্টাদুয়েক লেগেছিল। পরদিন সকালে দেবু, জগন, হরেন ও অনিরুদ্ধের গাছ কাটলে কালু সেখ ও লেঠেলদেরকে কাজে লাগায়। লেঠেলদের সঙ্গে ধাক্কা ধাক্কিতে দেবু ও কালীপুরের চৌধুরী মশায়ের মাথা ফেটে যায়। এই ঘটনায় সমস্ত

গ্রাম এক মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল। আরও হাঙ্গামা বেঁধে যায় যখন শ্রীহরির বাগানের গাছগুলি কেউ কেটে দিয়ে যায় তখন। গাছগুলি শ্রীহরি খুব যত্ন করে লাগিয়েছিল তাই তার ক্ষোভ ছিল বেশি। সেই ক্ষোভের বশে দেবুকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে চায় চুরির দায়ে। অনিরুদ্ধ এই দৃশ্য দেখে দারোগার সম্মুখে আবেগের প্রাবল্যে দৃপ্তভঙ্গীতে সত্য কথা স্বীকার করে নেয়। নিজের সমস্ত দোষ কবুল করে।

চৈত্র-সংক্রান্তি নীল ষষ্ঠী এই নিয়ে গ্রামে যখন বিশেষ উন্মাদনা তখন শ্রীহরির নজরে পড়ে পদ্ম। অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতিতে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। অনিরুদ্ধ দেবুকে মিথ্যা দণ্ড থেকে বাঁচাতে গিয়ে সত্য স্বীকারোক্তি করেছে, তাই তার দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেছে। পয়লা বৈশাখ গ্রামে সর্বনাশী মহামারী প্রবেশ করে গ্রামের অনেকের সঙ্গে খোকা ও বিলুর প্রাণ কেড়ে নেয়। দেবু স্তব্ধ হয়ে যায় এই ঘটনায়। ন্যারত্নের গল্পের শেষ অংশটুকু এবার তিনি দেবুকে শুনিয়ে গেলেন। এ যেন একটি উপাখ্যানের শেষ। অনিরুদ্ধ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশান্তরে গিয়েছে। যতীনের যা অনুমান ছিল তাই সত্য হল—এখান থেকে চলে যাবার আদেশ এসে গেছে। এইভাবেই পল্লীর সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে শিথিল হয়েছে চিরকালের প্রথা আইন কানুন। নতুন কাল আসে নতুন ভাবে জগৎ ও জীবনকে গড়ে তোলে। এই পদ্ধতিতেই জীবনপ্রবাহ ছুটে চলে কালের থেকে কালান্তরের গর্ভে।

207.1.1.6 আদর্শ প্রশ্নমালা

ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসে বর্ণিত কালপটের চিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসে কাহিনি বয়নের মধ্যে কোনো শিথিলতা আছে কিনা সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করুন।

গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে তার স্থান কোথায় সে কথা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

207.1.1.7 সহায়ক গ্রন্থ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার সাহিত্য জীবন	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
২। হরপ্রসাদ মিত্র	তারাশঙ্কর	শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন
৩। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	দে’জ
৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর অন্বেষা	অক্ষর
৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬। সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক	তারাশঙ্কর: জীবন ও সাহিত্য	প্রতিভাস

Paper –B-Core-207

গণদেবতা- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

207. Module-1, Unit-2

বিন্যাস ক্রম :

207.1.2.1 ভূমিকা
207.1.2.2 উপন্যাসের বর্ণিত গ্রামের কথা
207.1.2.3 গ্রামভাবনার ভিন্নতর উপস্থাপন
207.1.2.4 নামকরণ
207.1.2.5 আদর্শ প্রশ্নমালা
207.1.2.6 সহায়ক গ্রন্থ

207.1.2.1 ভূমিকা

মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে একদিকে, জমিদারী প্রথা ভেঙে পড়ছে, গ্রাম সমাজের বাঁধন খুলে যাচ্ছে এমন একটি সময়ে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের আবির্ভাব। গ্রামীণ সংস্কৃতি পরিস্ফুটনের মধ্যেই তাঁর সার্থকতা। বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মহাভারতের সমস্ত রসদ। গ্রামীণ সংস্কৃতির সহজ সরল রূপের আড়ালে ছিল তাদের বিশ্বাস ভাবনা ও এক রকমের ভাবপ্রবণতা। তারাশঙ্কর এই গ্রামের মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন মহাকথার সম্ভার। তাই সাহিত্য সাধনার উপান্তে এসে তিনি বলেছিলেন শতবর্ষের ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে যদি কখনো মহাভারতের মত মহাকাব্য লেখা হয়, তাহলে তিনিই সেই মহাকাব্যের একটি অংশ অর্থাৎ 'বঙ্গপর্ব' রচনা করবেন ,'এই মহাকাব্যের একটি অংশ লেখার ইচ্ছা আমার হয়।...মাসের পর মাস আমি ঘরের মধ্যে বসেই থাকব কলম হাতে নিয়ে ; নিত্যই একখানা নতুন কাগজ টেনে নিয়ে যত চমৎকার করে আমার সাধ্য আমি লিখব —নবভারত, বঙ্গপর্ব-রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।' অর্থাৎ গ্রামকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের একটি বিশেষ ভাবনা ছিল—এ কথা বলাই বাহুল্য।

207.1.2.2 উপন্যাসের বর্ণিত গ্রামের কথা

আমরা সকলেই জানি জন্মলগ্ন থেকেই তারাশঙ্কর মা ও পিসিমার কাছে মানুষ হয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন মানুষকে কীভাবে চিনে নিতে হয় ; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। আর পিসিমার কাছ থেকে শিখেছেন দেশকে মাটিকে ভুমিকে কীভাবে চিনে নিতে হয়! তিনি প্রায়শই বলতেন— বিষয় বাপের নয় বিষয় দাপের। এই দুই প্রদর্শনের প্রেক্ষাপটে তাঁর গ্রামদর্শন হয়ে উঠেছে অধিক মূল্যবান।

'গণদেবতা' উপন্যাসে ময়ূরাক্ষী নদীর তীর বরাবর দীর্ঘ চয় মাইল বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের কথা উল্লিখিত হয়েছে। শুধু গ্রামের নাম নয়; সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের কথা, তাদের বিশ্বাস, তাদের ভাবনা, তাদের সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার, নিয়ম-কানুন, ভাষা প্রভৃতি সমস্ত কথা উঠে এসেছে। হাড়ি,-বাউড়ী-ডোম-বায়েন-নাপিত-কুম্ভকার-কর্মকার-সদ্‌গোপ-পাল-ঘোষ প্রভৃতি নানান সম্প্রদায়ের মানুষের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। গ্রামের মানুষের মনে নিয়মের বাইরে যাওয়া নিষেধ। তাই তারা একটু বেচাল হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শুরুতেই গিরিশ ছুতার ও অনিরুদ্ধ কর্মকারের শহরে চলে যাওয়া গ্রামের সাধারণ মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করে না। সকলের গোষ্ঠীবদ্ধ আলোচনা বা মজলিসের সিদ্ধান্তই গ্রামের মানুষের পথরেখা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই গিরিশ, অনিরুদ্ধ যখন কক্ষচ্যুত হয়ে কর্মান্তরে শহরে যাতায়াত করে তখন গ্রামের মানুষেরা তা মেনে নিতে পারে না। পূজাপার্বণ নানান অনুষ্ঠান থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। চণ্ডীমণ্ডপে ওঠার অধিকার খর্ব হয়ে যায়। নবান্ন, ইতুলক্ষ্মী, পৌষ-সংক্রান্তি, পৌষ-আগলানো প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি কীভাবে গ্রামকে প্রণাবন্ত রাখে তা এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রমাণিত। ঘেঁটুর গানে কীভাবে সেই সময়ের ঘটনাকে স্থান করে দেওয়া হয়।

ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা তৈরি হয় তার বিস্তৃতি বর্ণনা এখানে আছে। এছাড়াও মহামারী, আগুন সেটেলমেন্টের আগমন, ট্যাক্সের কথা— সব মিলিয়ে গ্রামের মানুষের আনন্দ দুঃখ বেদনা প্রভৃতির কথা উপস্থাপিত হয়েছে। অসহায় নিঃসম্বল মানুষের মনে কীভাবে জন্ম নেয় নানা বিশ্বাস ও সংস্কার তার কথাও এখানে উহ্য থাকেনি। সুতরাং গ্রামের সমগ্ররূপ চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বয়ানে। এই গ্রাম অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে অনেকটাই পৃথক।

207.1.2.3 গ্রামভাবনার ভিন্নতর উপস্থাপন

'অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। বিশেষ এদেশের পল্লীগ্রাম। সমাজ গঠনের আদিকাল হইতে ঠিক একই স্থানে অনন্ত-পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া আছে।' তারাশঙ্কর যে গ্রামসমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন তা ভিন্নতর মাত্রা যুক্ত করে। বাংলা সাহিত্যে যে গ্রাম উঠে এসেছে তারাশঙ্কর সেখান থেকে সরে গিয়ে গ্রামের রাস্তা ও সেই সঙ্গে রাস্তায় চলাচলকারী মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে আছে, 'মন্থরগতি—উত্তেজনাহীন পল্লীজীবন। ইহারই মধ্যে রাস্তায়

মানুষ চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে... গ্রামগুলো, গরুরগাড়ি চড়ে বলেই এমন পিয়ে আছে, জীবনটাই হয়ে গেছে ‘ঢিমে তেতালা... ঢিমা ঝিলা চালে কোনমতে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে —ওই চাকার ক্যোঁ-ক্যোঁ শব্দের মত কাতরাইতে কাতরাইতে।’

এই উপন্যাসে আঠারো অধ্যায় পর্যন্ত গ্রামের একটি দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। আর উনিশ নং অধ্যায়ে দেবু জেল থেকে পনেরো মাস পরে গ্রামে ফিরে তার নতুন রূপ পর্যবেক্ষণ করে। সেখানে ধরা পড়ে গ্রামের ফসলের চিত্র, বাউড়ী-পাড়া, বায়েন-পাড়া, হরিশ-খুড়ার ঘর, ভবেশ দাদার বাড়ি, শ্রীহরির ঘর, তারিণীর ভাঙা ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, ঘোষালদের বাড়ি, প্রভৃতি সমস্ত কিছু নতুনরূপে দেখে দেবু আজ অভিভূত। গ্রামকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে সে আনন্দিত বোধ করে —‘দেবুর জীবনে এই দিনটি অভূতপূর্ব। এই দুঃখ দারিদ্র্যে জীর্ণ নীচতায় দীনতায় ভরা গ্রামখানির কোন্ অস্থিপঞ্জরের আবরণের অন্তরালে লুকানো ছিল এত মধুর, এতো উদার স্নেহ মমতা...।’ দেবু ও যতীনের উপস্থিতিতে গ্রামের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। আবার তাদের অনুপস্থিতিতেও তা আবার বদলে গিয়েছে। গ্রামের কথা শহরের প্রতিতুলনায় উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামের প্রকৃত দুর্দশার চিত্র যতীনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে উপন্যাসে। সব মিলিয়ে একটি বিচিত্র চিত্র সম্বলিত নতুন গ্রামগঠন ও গ্রামসমাজের ভাঙন দেখানো হয়েছে এখানে।

207.1.2.4 নামকরণ

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তারাশঙ্কর জানিয়েছেন,“‘গণদেবতা’ বইখানি ‘ভারতবর্ষে’ ধারাবাহিক বাহির হইতেছে। এটি তাহার অংশবিশেষ; —‘চণ্ডীমণ্ডপ’ নামাঙ্কিত অংশ। দ্বিতীয় অংশ ‘পঞ্চগ্রাম’ নামে বাহির হইতেছে। ‘ভারতবর্ষে’ যাঁহারা ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, ‘ভারতবর্ষে’ প্রকাশিত ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ ও বর্তমান বইখানি প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। গোড়ায় আশি পৃষ্ঠা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পর —একাশি পৃষ্ঠা হইতে অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ নূতন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিতে বসিয়া সমস্তই পাল্টাইয়া গেল। প্রায় প্রতিটি ছত্র নূতন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।” সুতরাং গন্থটির নাম চণ্ডীমণ্ডপ রাখবেন ভেবেছিলেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত নাম রাখেন ‘গণদেবতা’। জনগণই এখানে সমস্ত কিছুর জন্য দায় স্বীকার করে নেয়। চণ্ডীমণ্ডপ শুরুতে গুরুত্ব পেলেও পরে তা আর গুরুত্বপুর্ণ থাকছে না। তার বদল হয়ে যাচ্ছে তার রূপ ও চরিত্র বদলে গেছে উপন্যাসের শেষে। সুতরাং নামকরণের দিক থেকে ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ টিকছে না, তাই লেখক পরে বদলের কথা ভেবে থাকতে পারেন বলে আমাদের মনে হয়।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গণ’ শব্দটির অর্থ করেছেন —‘যাহার মিলিতভাবে এক কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, সমবায়, সঙ্ঘ,... গণপতি, গণেশ, মহাদেব।’ আর ‘গণদেবতা’ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে —‘গণভূতা বা সঙ্ঘভূতা দেবতা; আদিত্যাদি দেবগণের সমষ্টিভূত দেবগণবিশেষ। ...আদিত্য, বিশ্বদেব, বসু, তুষিত, আভাস্বর, অনিল, মহারাজিক, সাধ্য, রুদ্র, সর্ব্বসুদ্ধ, গণদেবতাগণ।’ তারাশঙ্কর পৌরাণিক কোন দেবতাকে উপস্থাপন করতে চাননি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন ব্যষ্টিজীবন কীভাবে গোষ্ঠীজীবনে পরিণত হয়ে ওঠে তার প্রকরণ কৌশলটি। চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রিত গ্রাম্যজীবনের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো বয়ে যাওয়া গ্রাম্য রাজনীতি তিনি বিস্তৃতপটে অঙ্কন করেছেন।

কোন একজন ব্যক্তি এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্ররূপে দেখানো হয়নি; বরং একটি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সামগ্রিক ছিত্র মুখ্য হয়ে উঠেছে ক্রমশ। ব্যক্তিজীবনের নানা রঙের সুতোয় বুনে দেওয়া হয়েছে গোষ্ঠীজীবনের সেই রঙিন মালা।

এই উপন্যাসে চন্ডীমণ্ডপ শুধুই একটি প্রতিষ্ঠান নয়; চরিত্রও হয়ে ওঠে এইভাবে — চণ্ডীমণ্ডপের এক প্রান্তে ষষ্ঠীতলার বুড়া বকুল গাছটার গাঢ় সবুজ পাতাগুলার উপর ইহারই মধ্যে একটা ধূলার প্রলেপ পড়িয়া গিয়াছে। দেবু অন্যমনস্কভাবে আবার চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপটারও সর্বাঙ্গে ধূলার আস্তরণ। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে এইখানেই আসিয়া দাঁড়ায়। এই স্থানটির সঙ্গে তাহার একটি নিবিড় যোগাযোগ আছে যেন।' এইভাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে চন্ডীমণ্ডপ নামক স্থানপটটি আত্মিক বন্ধনে বাঁধা হয়ে থাকে। তাদের সুখে দুঃখে এই চণ্ডীমণ্ডপ একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি নানান উৎসব অনুষ্ঠনকে কেন্দ্র করে এই স্থানটিতে গ্রামের আপামর জনসাধারণ সমবেত হয়। প্রবীণ রাঙাদিদির মতো 'সন্তানহীনা সর্ব-স্বজনহীনা' মানুষেরাও চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকে। প্রতিদিন স্নানের পরে চণ্ডীমণ্ডপে এসে ঝাঁটা বুলিয়ে যায়। এইটি অবশ্য তার নিত্য কর্মের মধ্যেই পড়ে। তার স্মৃতিতে উঠে আসে চণ্ডীমণ্ডপের বিগত দিনের কথা —'কত গান শুনেছি এখানে ভাই নাতি—নীলকণ্ঠ, নটবর, যোগীন্দ্র; মতিরায়ও একবার এসেছিল। বড় যাত্রার দল কেত্তন, পাঁচালী কত হত ভাই! তোরা আর কী দেখলি বল? সে রামও নাই —সে অযুধ্যেও নাই। চন্ডীমণ্ডপ নিকুবার জন্যে তখন মাইনে করা লোক ছিল, দিনরাত তক্-তক্-ঝক্-ঝক্ করত। সিঁদুর পড়লে তোলা যেত। ' তার জীবনের যত সুখস্মৃতি সমস্তটাই এই চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করেই। তাহলে চণ্ডীমণ্ডপ মানুষের আশ্রয়স্থল উৎসব অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু ও তাদের নিত্যকর্মের উপায়ও।

এই চণ্ডীমণ্ডপের স্বত্বাধিকার কার এই সম্পর্কে একটি সমস্যার কথা চিত্রিত হয়েছে। জমিদার দেবোত্তরের সেবাইত বলে তিনিই এর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। জমিদার পর্যন্ত শ্রহরির হাতে গোমস্তাগিরি ছেড়ে দেওয়ায় সেই পরোক্ষভাবে এই চণ্ডীমণ্ডপের মালিক হয়ে উঠেছে। যতীনের কথায় গ্রামের যে সমস্ত মানুষ ওখানে যায় তাদের সকলকেই এই শ্রীহরি সাবধান করে শাসন করে। দুর্বল নিরীহ বলে তাদের ভয় দেখাতেও ছাড়ে না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। দেবু জেলে থাকার সময়ে বিলুর পত্রের দ্বারা গ্রামের সকলের কথা সে শুনতে পেতো। সেখান থেকে তার অনুভব —'গ্রামের মানুষগুলির প্রতিটি জনই যেন দেবতা। তাহার মনে পড়িল একটি প্রবাদ—গাঁয়ে মায়ে সমান কথা। হ্যাঁ—মা ! এই পল্লীই তাহার মা ! সে নত হইয়া পথের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।' শ্রীহরি যখন চণ্ডীমণ্ডপের মালিক তখন সে আর এটা রক্ষা করতে চায় না। বর্ষায় এবার সেটা পড়ে যাবে। গ্রামের লোক ছাওয়াই নি, তাই শ্রীহরিও সেটা ভেঙে তার উপর পাকা নাটমন্দির তুলতে চায়। ফলে চণ্ডীমণ্ডপ শেষে তার মাহাত্ম ঐশ্বর্য ধরে রাখতে পারে না। জনগণই শেষ কথা বলে; তাই তারাই প্রধান হয়ে ওঠে ।

207.1.2.5 আদর্শ প্রশ্নমালা

ক) তারাশঙ্করের গণদেবতা উপন্যাসে ময়ুরাক্ষী তীরবর্তী গ্রামগুলির কথা কীভাবে বর্ণিত হয়েছে ?

খ) গ্রামজীবনের সমগ্ররূপকে তারাশঙ্কর উপন্যাসের মধ্যে রূপদান করতে চেয়েছেন কীভাবে সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

গ) 'গণদেবতা' উপন্যাসের নামকরণ কতখানি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন সে সম্পর্কে আপনার যুক্তির সমর্থনে মতামত দিন।

207.1.2.6 সহায়ক গ্রন্থ

অলোক রায়	কালান্তরের কথাকার তারাশঙ্কর	অক্ষর
অলোক রায়	বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	অক্ষর
অলোক রায়(সম্পা:)	সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য	সাহিত্যলোক
অশ্রুকুমার সিকদার	আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস	অরুণা
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলার লোকসাহিত্য(১ম খণ্ড)	এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	উপন্যাসে জীবন ও শিল্প	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

Paper –B-Core-207

গণদেবতা- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

207. Module-1, Unit-3

বিন্যাস ক্রম :

207.1.3.1 ভূমিকা
207.1.3.2 চরিত্রায়ণ
207.1.3.3 পুরুষ চরিত্র
207.1.3.4 নারী চরিত্র
207.1.3.5 আদর্শ প্রশ্নমালা
207.1.3.6 সহায়ক গ্রন্থ

207.1.3.1 ভূমিকা

উপন্যাসে ও গল্পে এমনকি সাহিত্যের যে-কোন ক্ষেত্রেই চরিত্রের কথা বলার সময়ে সর্বত্রই চরিত্রের হয়ে ওঠার প্রকরণের কথা আমরা ভেবে থাকি। তাই চরিত্রের আলোচনা না বলে তার হয়ে ওঠার কথার মধ্যেই আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। চরিত্র তো কয়েকটি প্রতীক, নাম ও সংকেত; কিন্তু চরিত্রায়ণ হল —চরিত্র উপস্থাপনায় লেখকের অভিমুখ। সেই অভিমুখের ইশারাগুলি আমাদের অনুধাবন করতে হয়। বুঝতে হয় কীভাবে সেই চরিত্রটি হয়ে উঠলো ! জন্মসূত্রে ডোম, বাগদি, মুচি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষদের সরাসরি উপন্যাসে তুলে এনে তারাশঙ্কর দেখাতে চাইছেন দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চিত মানুষের মনের অবহেলার ইশারাগুলি, এমনকি বিত্তগত দিক থেকেও সেকথা উহ্য থাকেনি।

তারাশঙ্করের গণদেবতা উপন্যাসে চরিত্রায়ণের যে প্যাটার্নটি আমরা দেখতা পাই তা প্রধানত উচ্চবর্ণ শাসিত গ্রাম্যসমাজ ও নব্যবিত্ত বা সদ্য গজিয়ে ওঠা উচ্চবিত্ত আধুনিক সম্প্রদায়। ফলে অনিরুদ্ধ, গিরিশ, দুর্গা, পদ্ম এমনকি দেবু পণ্ডিতের মতো মানুষের সেই কেন্দ্রে সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। খেটে খাওয়া মানুষের বর্ণগত পরিচিত

সেখানে বিশেষ প্রাধান্য না দিয়ে তারাশঙ্কর তাদের গড়ে তুলেছেন একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে বিশেষ পরিস্থিতির সংরূপে মিশ্রিত এক বিশেষ আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণে নির্মিত চরিত্র। শ্রীহরি পালের ঘোষ হয়ে ওঠার মধ্যে কিছুটা বর্ণ আভিজাত্যবোধ কাজ করলেও অন্যান্য চরিত্রগুলি তাদের জীবন-জীবিকার নৈতিক সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছে প্রতিনিয়ত।

কৌমসংস্কৃতির রক্ষণশীল মানুষেরা সমসত্ত্ব জীবনরক্ষায় বা গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত জীবনযাপনেই অধিক প্রযত্নশীল হয়ে ওঠে। তাই তো 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' -র করালী, 'গণদেবতা'-র অনিরুদ্ধ কামার ও গিরিশ ছুতোরের পেশান্তর, তাদের বিপরীত মেরুতে থাকা চরিত্রেরা অনুমোদন করে না । উদাহরণস্বরূপ 'গণদেবতা' উপন্যাসের অনিরুদ্ধ কামারের কথা বলা যাক। সেখানে সে চিৎকার করে বলতে পারে, 'বড়লোকের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, বিম্বেনের[য.] মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, আমি কোন শালাকে মানি না, দেখি —কোন শালা আমার কি করতে পারে।' গোষ্ঠীর অন্ধকারময় আবর্তে তাদের ধরে রাখার নানা কৌশল ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাদের বাইরে যাওয়ার প্রবণতাকে বন্ধ করতে পারে না সেই গোষ্ঠীপ্রধানরা। কারণ যুগপরিবর্তনের বাতাস তাদের গায়ে লেগেছে। বস্তুত জীবন সম্পর্কে এই রিয়ালিটি -এর কথা করালী, অনিরুদ্ধ, গিরিশ প্রভৃতি প্রধান চরিত্র এবং অসংখ্য অপ্রধান চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে সামনে চলে আসে।

207.1.3.3 পুরুষ চরিত্র

'গণদেবতা' উপন্যাসে মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের সঙ্গে তাঁর পৌত্র বিশ্বনাথের যে মনোমালিন্য, তার মূল কারণ হল এই দুই কালের দ্বন্দ্ব বা বলা যায় দুই আদর্শের সংঘাত। যে কারণে শশিশেখরকে (বিশ্বনাথের পিতা) তাঁর পিতৃদেব ন্যায়রত্ন ত্যাজ্যপুত্র করেন, ঠিক একই কারণে পৌত্রের সঙ্গেও সংঘাত বাধে তাঁর। পুত্র শশিশেখরের পুরনো নানা ধরনের কুসংস্কার বর্জনের চেষ্টাকে ন্যায়রত্ন মানতে পারেননি। পরে শশিশেখরের পুত্র বিশ্বনাথও সমমনোভাবাপন্ন ও নাস্তিক হয়ে ন্যায়রত্নের মতাদর্শের বিরোধিতা করে। সে 'সন্ধ্যাহ্নিক' করে না, বরং তার পরামর্শ 'এ যুগে চণ্ডীমণ্ডপ চলবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে পারো ?' নবযুগের বেপরোয়া মনোভাব বিশ্বনাথের প্রতিটি পদধ্বনিতে স্পষ্ট হয়েছে। দেবু পণ্ডিত তার সমস্তটা গ্রহণ করতে না পারলেও কালের নিয়ম বলে কিছুটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া বিষয়টি প্রাচীনকালের প্রতিনিধি চরিত্র দ্বরকা চৌধুরীর কথায় আরও সামনে চলে আসে, 'এখনকার কাল নতুন বটে বাবা। সেকালের কিছু আর রইল না । কিন্তু আমরা জনকয়েক যে সেকালের মানুষ অকালের মতন পড়ে রয়েছি একালে , বিপদ যে এইখানে।' যতীনের কাছে সেকালের কথা স্মরণ করতে গিয়ে দ্বরকা চৌধুরী নস্টালজিক হয়ে ওঠে। প্রবীনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব চিরকালের, তারাশঙ্কর এই বিষয়টিকে তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসে বিভিন্ন দিক থেকে দেখাতে চেয়েছেন ।এই উপন্যাসে ন্যা য়রত্ন ও বিশ্বনাথ চরিত্রের উপস্থাপনে দুই কালের দুই বিপরীত ভাবাদর্শের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ন্যায়রত্ন চরিত্রটিকে তারাশঙ্কর অঙ্কন করেছেন প্রাচীন সনাতন আদর্শের প্রতীকরূপে, 'সে আমলের শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন ছিলেন আর এক মানুষ। প্রাচীনকাল এবং সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মহাকালের তপোবনরক্ষী শূলহস্ত নন্দীর মত ভ্রূভঙ্গি করিয়া তর্জনী উদ্যত করিয়া সদাজাগ্রত ছিলেন। সেই হিসাবে

তিনি ম্লেচ্ছভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন।'এই ন্যায়রত্ন পুরনো কালকে ত্যাগ করে নতুনকালের ধর্মকে কোনো বিনিময় মূল্যে স্বীকার করতে পারেননি। সনাতন ধর্মকে আঁকড়ে থাকার কারণে পুত্রহারা হয়েছেন ; তবুও নিরাসক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ন্যায়রত্নের সঙ্গে পৌত্র বিশ্বনাথের আদর্শগত পথভিন্নতার কারণে সংঘাত ঘনিয়ে আসে। দেবু চরিত্রের সম্পর্কে কথকের উপলব্ধি এক্ষেত্রে মূল্যবান 'সে প্রাণপণে আপন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহাকে সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাই নবান্নের দিনে অনিরুদ্ধকে এই চণ্ডীমণ্ডপে পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে সামাজিক শাস্তি দিবার জন্য জগনের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' এখানে লুকিয়ে থাকে দু'টি কালের মধ্যে সমদূরত্ব এবং দু'টি মানুষ সেই দুইটি কালের প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে পাই, 'জগন ডাক্তার হইলেও প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে না। রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেক্শন দিয়াও সে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে।' একই সঙ্গে তার কাছে থাকে বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র ব্যাখ্যান ও পরামর্শ। চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে এই সুস্পষ্ট মেরুকরণের অন্তর্বর্তী পরিসরে যুক্ত থাকে অসংখ্য দেহাতি মানুষগুলি। এর ফলে তৈরি হয়ে যায় দুই মেরুতে থাকা দুই ধরনের চরিত্রের মধ্যে বিভেদ।

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ ছুতোর

তাদের সম্পর্কে বলা হয় —'বেশভূষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন এবং ফিটফাট —তাহার মধ্যে শহুরে ফ্যাশনের ছাপ সুস্পষ্ট; দুজনেই সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল —মজলিসের অনতিদূরে ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।' প্রযত্নশীল স্থবির এই সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে জমে থাকা নিয়মকে[তারাশঙ্করের ভাষায় 'সমাজ-শৃঙ্খলা'] তারা আর মানতে চায় না। তাই তাদের এই স্বাধীন ভাবনা।

অনিরুদ্ধ এখন সেই অনিরুদ্ধ নেই —সে এখন মাতাল, দুর্গার ঘরে রাত্রিযাপন করে এবং সেই সঙ্গে তার অন্ন গ্রহণও করে। তার মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায় ভিটে মাটির প্রতি বিশেষ টানের কথা। কেশব কামারের ছেলে, হিতু কামারের নাতি হয়ে সে কুলি হতে চায় না। দুর্গার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক থাকলেও পদ্মকে কখনও অসম্মান করেনি। ঋণ করে নতুন কর্মসূত্র খুঁজে পেলেও তা স্থায়ী হয়নি। ময়ুরাক্ষীর তীরে শ্রীহরির বাগানবাড়ির আমগাছ কেটে জেলে যায় সে। এই পর্বে তার নৈতিকতার চরমতম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যায়। দেবুর উপর তার কুকর্মের দায় পড়ছে দেখে সমস্ত কথা স্বীকার করে নিয়ে জেলে যায় সে। উপনাসের শেষে তার হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে যাওয়া একটি প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের মনে।

দেবু

দেবু গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তবে তার বিদ্যা বুদ্ধির উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বাবার অকাল প্রয়াণে দেবুর দেবু চাষবাস ত্যাগ করে সংসারের তাগিদে গ্রাম্য পাঠাশালায় পড়ানোর দায়িত্বটিকে প্রধান করে নিয়েছে। এইভাবে সে গ্রামের মানুষের কাছে পণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যেই ঊর্ধ্বলোকে উঠতে চায় না; নীচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে আকাশলোকে চলুক—এই আকাঙ্ক্ষা। ছিরু পালের অর্থসম্পদ এবং বর্বর পশুত্বকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। জগনের নকল দেশপ্রীতি আভিজাত্যের আস্ফালন তাহার নিকট যেমন হাস্যকর তেমনি অসহ্য। বংশানুক্রমিক দাবিতে হরিশ

মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব দাবিকে সে স্বীকার করতে চায় না। ভবেশ ও মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভানে কথা কয়,--তাহাও সে সহ্য করতে পারে না।’

ব্যক্তিগত জীবনে তার বাবাকে চরম আর্থিক লাঞ্ছনার মধ্যে পড়তে হয়। সেই কারণে সে জমিদার আর মহাজনদের সর্বদা ঘৃণা করতো। এমনকি পাশাপাশি তার স্কুলের হেডপণ্ডিতকেও মনে মনে ভীষণ ঘৃণা করতো। তার কারণ ছিল—এই পণ্ডিত নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ছিরু মতো ‘পশু-স্বভাব-সম্পন্ন’ মানুষকে তোষামোদ করে এবং সেই কারণে এই বিষয়টি তাকে বিস্মিত করে। গ্রামটির ইতিহাস ভূগোল ও তার অভাব অভিযোগ ত্রুটি-বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ ধারণা আছে। সে পাঠশালায় পড়াতে পড়াতে চণ্ডীমণ্ডপটির কথা ভাবে —‘এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্বণ, আনন্দ-অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। ...আজকাল আর মানুষ প্রণামও করে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয় দেবতাকে—ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে।’ গ্রামকে উপেক্ষা করার অর্থ চণ্ডীমণ্ডপকে অস্বীকার করা। তাই দেবুর মতো মানুষের কাছে চণ্ডীমণ্ডপের গুরুত্ব হারিয়ে গেলে কষ্ট হয় দুঃখ হয়। সে প্রাণপণে পুরনো রীতি ও সংস্কারকে সযত্নে রক্ষা করতে ভীষণ তৎপর। সেই কারণে নবান্নের দিন অনিরুদ্ধের পুজোর উপকরণ ফিরিয়ে দিতে দু’বার ভাবেনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে হতাশার শিকার হয়, এই কর্মে সে গ্রামের কোনো মানুষের কাছে সহযোগিতা পায় নি। যেটুকু সাহায্য পাবার তা পেয়েছে যতীন, দুর্গা ও অনিরুদ্ধের কাছ থেকে। তাছাড়া তার জেলে থাকার সময়ে সে অনুভব করেছে গ্রামের প্রকৃত আপনদের। পরিবারের মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষ যেভাবে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সে অভিভূত। তার জীবনটা যেন ন্যায়রত্নের মতো মানুষের কথনে উপস্থাপিত একটি উপাখ্যানের মত। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের মানূষের কাছে সে শেষপর্যন্ত দেবতা হয়ে ওঠে। সকলের আপনার ধন আপনার জন হয়ে বড়ো মনের মানুষ হয়ে উঠেছে।

ছিরু পাল

ছিরু পাল এই উপন্যাসের মাতব্বর, জোতদার গোমস্তা। তার থেকে উপকার পায় না এমন লোক গ্রামে খুব একটা কেউ নেই, তা বলাই বাহুল্য। তার মতো ধূর্ত চরিত্রহীন লম্পট মানুষ আর দ্বিতীয় দেখা যায় নি। তারাশঙ্কর এই চরিত্রটিকে সকলের কাছে যমদূতের মত করে এঁকেছেন। তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে— ‘আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল।’ জন্মসূত্রে না হলেও বিত্তগত দিক থেকে সে যে ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতাবলে সমাজে মান্যতা আদায় করে নিতে চায়। তার চেহারার বর্ণনায় থাকে, ‘লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁইয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না।’ আর ঠিক সেই কারণেই তার মানুষের উপর ছিরুর ক্ষোভ বিদ্যমান। সেই কারণেই সে বেশি করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সদা তৎপর ও আগ্রহী। তার চেহারার বর্ণনায় লেখক যুক্ত করেন রাঢ়জীবনকেন্দ্রিক শুষ্কতার রুক্ষতার প্রত্নপ্রতিমা — ‘শ্রীহরির বিশাল দেহ —কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই। বাঁশের মতো মোটা হাত—পায়ের হাড় —তাহাতে জড়ানো কঠিন মাংশপেশি। প্রকাণ্ড চওড়া দুখানা হাতের পাঞ্জা, প্রকাণ্ড বড় মাথা, বড় বড় উগ্র চোখ, থ্যাবড়া নাক, আকর্ণ বিস্তার মুখগহ্বর, তাহার উপর একমাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।’ তার দন্তহীন মুখের চিৎকারকে বলা হয়েছে, ‘মনে হয় একটা পশু গর্জন করিতেছে।’

বস্তুতপক্ষে তার জীবনের দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে যায়—কর্মজীবন ও ধর্মজীবন। ছিরু পালের ভিন্নতর রূপ পরিদর্শন করা যায়—যখন অনিরুদ্ধ কর্মকারের পুজো ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন সে নির্বাক থাকে। সে যখন ধর্মকর্ম করে তখন নিতান্তই অন্য মানুষ; কিন্তু কর্মজীবনে সে সেই ধারার মানুষ নয়। এই ছিরু জমিদারের গোমস্তা দাশ মশায়ের কথা শুনে উদগ্র কামনার নগ্নরূপ প্রকাশ্যে চলে আসে —'শ্রীহরির উগ্র চোখ দুইটি সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলিয়া উঠিল। ওই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী বধূটির[পদ্ম] প্রতি তাহার অন্তরের নগ্ন কামনার একটি প্রগাঢ় আসক্তি আছে...তাহার মনোমধ্যে ঝলমল করিয়া উঠে।' ছিরুর চরিত্রের এই দুইরূপ তাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন উপমায় উপমিত করে লেখক এই চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেন। কখনো সে ধূর্ততার প্রতীক হয়ে আসে তো কখনো হিংস্রতার প্রতীক I যেমন—দাশজীর সঙ্গে কথোপকথনে, 'অজগরের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহরি বলিল...।'

শ্রীহরির জীবনে সবথেকে বড়ো ও তীব্র বাসনা তার পিতৃপ্রদত্ত পদবি 'পাল' ছেড়ে 'ঘোষ' হয়ে ওঠা। পাল উপাধিটা শ্রীহরির জন্যে অসম্মানজনক, কারণ —'যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, তাহাদের অর্থাৎ চাষীদের ঐ উপাধি।' জমিদারকে কিছু অর্থ ও উপহারের বিনিময়ে সে এই কাজটি চুপিসারে সেরে ফেলতে চায়। গ্রাম্যসমাজে এই পদবি পরিবর্তনের সহজ উপায়টি সে বেছে নেয় —'চণ্ডীমণ্ডপটা আমিও বাঁধিয়ে পাকা করে দেব, দাশজী। আর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা কুয়ো।' ছিরু পাল এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে ওঠে। তাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সব কিছু আবর্তিত হয়। চণ্ডীমণ্ডপে একটি শতরঞ্জি পেতে তাকিয়া নিয়ে পাঁচজনকে নিয়ে বসে। সে গ্রামের মাতব্বর তার কথামত গাছের পাতা নড়ে। চণ্ডীমণ্ডপে দুবেলা চায়ের ব্যবস্থা করে সে মধ্যমণি হয়ে বসে গ্রামের সমস্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করে। বিশেষ করে দেবু জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শ্রীহরির এই নতুন রূপ দেখতে পায়। শুধু অন্তরের পরিবর্তনই নয়; বাইরেও একটি পরিবর্তন স্পষ্টরূপে বোঝা যায় —'শ্রীহরি এখন সম্ভ্রান্ত লোক। লম্বা-চওড়া পেশী-সবল সে জোয়ান চাষী নগ্নদেহে কোদাল হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, দুর্দান্ত বিক্রমে দৈহিক শক্তির আস্ফালন করিয়া ফিরিত, সামান্য কথায় শক্তিপ্রয়োগ করিত, জোর করিয়া পরের সীমানা খানিকটা আত্মসাৎ করিয়া লইত, কর্কশ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত —সে-ই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, তাহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই, সেই ছিরু পালের সঙ্গে এই শীহরির কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীহরি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ! তাহার পায়ে ভালো চটি, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর; গম্ভীর সংযত মূর্তি, সে এখন গ্রামের গোমস্তা —মহাজন। বলিতে গেলে সে এখন গ্রামের অধিপতি।' ধীরে ধীরে এই হয়ে ওঠা উপন্যাসের পরতে পরতে দেখানো হয়েছে।

যতীন

১৯২৪ সালে বিশেষ ক্ষমতাবলে ইংরেজ সরকারের প্রণয়ন করা আইনে এই যতীন নজরবন্দী একজন মানুষ। এই আইনের বলে নানা গণ্ডীবন্ধনে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট একটি থানার অন্তর্গত কোন পল্লীতে তাকে আটক করে রাখা হয়। বাংলাদেশের এই আটক আইনের বন্দী যতীন। তার বয়স সতেরো আঠারো বছরের বেশি নয়। 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, রুক্ষ বড় বড় চুল, ছিপছিপে লম্বা, সর্বাঙ্গে একটি কমনীয় লাবণ্য; চোখ দুটি ঝকঝকে, চশমার আবরণের মধ্যে সে দুটিকে আরও আশ্চর্য দেখায়।' অনিরুদ্ধের বাড়িতে সে ভাড়া থাকে ও পদ্মকে সে মামণি বলেই সম্বোধন করে। গ্রামবাংলার একটি বিশেষ ক্ষমতা যে, সে সকলকে খুব সহজেই আপন করে নিতে পারে। যেন যতীন এখন সকলের ভীষণ প্রিয় পাত্র। দেবু জেল থেকে ফিরেই তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে যে যতীন

গ্রামের সকলেই মধ্যমণি। যতীনের রাজনৈতিক জীবনের বড়ো একটি প্রাপ্তি এই গ্রামে নজরবন্দী হয়ে আসা। পদ্মের মত মামণি পাওয়া, দেবুর মত হিতাকাঙ্ক্ষী পাওয়া, ছিরু পালের মত খল চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া —সব মিলিয়ে তার জীবনের এই পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

207.1.3.4 নারী চরিত্র

তারাশঙ্করের উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবনে নারীচরিত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তারাই কৌমজীবনের মূল শক্তি। সমাজবন্ধনের প্রথম কাজটি মেয়েদের দ্বারাই হয়ে থাকে। যে কোনো কৌমজীবনের মূল ধারক ও বাহক শক্তি তার নারীচরিত্রগুলি।

দুর্গা

দুর্গা এই উপন্যাসে একটি লাস্যময়ী চরিত্র। সে দেখতে সুশ্রী ও গঠনও সুন্দর। তবে তার সৌন্দর্যের এই আকস্মিকতার সঙ্গে তার মায়ের স্বভাব প্রত্যক্ষভাবে দায়ি। নিশীথ রাত্রে সে কঙ্কনার জমিদারের প্রমোদভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে সে জানে। নিজের কলঙ্ক সে কখনও কারুর কাছে গোপন করে না। তাতে সে স্বজাতীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকার বোধ করে। শাশুড়ীর যোগসাজশে নিজের মানসম্ভ্রম খুইয়ে মায়ের কাছে আশ্রয় চাইতে এসে একটি উজ্জ্বল আলোকিত পথের সন্ধান পায় সে। সেই পথেই ছিরু পালের মতো আর সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার।

সে প্রতিবাদী, তাই সকলের কাছে সে স্পষ্টবক্তা। দুর্গা তার দাদার সম্মুখে প্রতিবাদ করে, 'ভাত দেবার ভাতার লয়, কিলো মারার গোঁসাই। দাদা সাজছে দা-দা ! মারবি ক্যানে তু ! আমার যা খুশি আমি তাই করব। হাজার নোক আসবে আমার ঘরে, তোর কি ? তোর আমি ভাত খাই ?' ঘর পুড়ে গেলে জগন ডাক্তারের কাছে সে তালগাছ কিনতে চায় এবং টিপছাপের বিষয়ে বলে, 'গতর থাকতে ভিখ মাঙব ক্যানে ?' দুর্গা মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায়। দেবু ঘোষের স্ত্রীর পাশে যেমন দাঁড়ায় তেমনি দেবু পণ্ডিত ও যতীনকে সাবধান করতে পিছুপা হয় না।

'গণদেবতা' উপন্যাসের দুর্গা, 'কবি' উপন্যাসের বসন,'পঞ্চপুত্তলী' -র পঙ্কজিনীর কথা। তারা যখন প্রকৃতপক্ষে দেহোপজীবিনী হয়েও তাদের নিজস্ব আত্মগোষ্ঠী রক্ষায় এগিয়ে আসার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তখন চরিত্রায়ণে তৈরি হয় স্বতন্ত্র একটি প্যাটার্ন।এই স্বৈরিণী নারীচরিত্র গুলির মনের গভীরে কাজ করে গোষ্ঠীজীবনরক্ষার নিজস্ব তাগিদ। গোষ্ঠীর সুনিয়ন্ত্রিত বহমান সংস্কৃতিকে তারাও বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এখানে আছে, দুর্গা সেখানে দেবুর স্ত্রীর কাছে নবান্নের দিন ব্রতকথা শুনতে আসে, 'কথা শুনতে এসেছি দিদির কাছে। এমন কথা কেউ বলতে পারে না বাপু। হাজার হোক পণ্ডিত -গিন্নী তো ?' স্বৈরিণী দুর্গার সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুতপা ভট্টাচার্য বলেন, "এইখানেই প্রকাশ পায় তারাশঙ্করের জীবনকে দেখার বৈশিষ্ট্য । ডোম বলে স্বৈরিণী বলে তিনি দুর্গাকে নিচু চোখে দেখতে

পারেননি।...দুর্গাকে দুর্গা রেখেই তাই তারাশঙ্কর তাকে মহিমা দিতে পারেন, শরৎচন্দ্র যেমন রাজলক্ষ্মীকে আদর্শায়িত করে আঁকেন, তার কোনো প্রয়োজন দেখেন না তারাশঙ্কর। মোহিতলালের ভাষায় 'জীবন সম্বন্ধে কোনো থিয়োরী বা মতবাদ, কোনো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধমক বা চমক তাহাতে নাই'। জীবনের বিচিত্র রূপের কুতূহলী তিনি, সে রূপ তিনি খুঁজে পান।

পদ্ম

অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম। তার সম্পর্কে বলা হয়, 'দীর্ঘাঙ্গী পরিপূর্ণা-যৌবনা কালো মেয়েটি। টিকালো নাক, টানা-টানা ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ। পদ্মের রূপ না থাক,শ্রী আছে। পদ্মের দেহে অদ্ভুত শক্তি, পরিশ্রম করে সে উদয়াস্ত। তেমনি তীক্ষ্ণ তাহার সাংসারিক বুদ্ধি।' অনিরুদ্ধের কাছ থেকে নানাভাবে নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলেও কোনদিন সে তাকে ছেড়ে চলে যায়নি। যতীনের সঙ্গে মা ছেলের সম্পর্ক যেন তার সন্তানের অভাব পূরণের একটি উপায়। শারীরিকভাবে সে অসুস্থ হলেও তার অক্ষমতা কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। অক্ষমতার মধ্যে শুধু বলা হয়েছে সে 'বন্ধ্যা, ছেলে-পুলে নাই।' সে সমস্ত দিন গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে আর স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে । ছিরু পালের মতো লোভী পুরুষের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে জানে সে। বগি দা দেখিয়ে সে ছুরু পালের মতো শয়তানকে শিক্ষা দিতে পারে। অপরদিকে ছিরু পালের স্ত্রীর অনুরোধে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ছিরু পালের সাতটি ছেলের মধ্যে অবশিষ্ট দু'টি রুগ্নপ্রায়। তাদের মা এসে পদ্মের কাছে অনুরোধ করে তার সন্তানের উদ্দেশ্যে যেন গালিগালাজ না করে। পদ্ম সেকথা রক্ষা করে। এই চরিত্রের একদিকে যেমন সামাজিক ও সাংসারিক নানারূপের কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি তার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার দিকটিকেও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্গার পরে পদ্মকেই লেখক বাস্তবসম্মতরূপে অঙ্কন করেছেন।

এখানে একাধিক পর্বের উল্লেখ আছে যেমন — নবান্ন, ইতুলক্ষ্মী ইত্যাদি। ইতুলক্ষ্মীর সময়ে মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করে চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করে ঘরে লক্ষ্মী পাতে না। লক্ষ্মীপুজোর শেষে মেয়েরা দেবুর বাড়িতে পণ্ডিতের স্ত্রীর কাছে ব্রতকথা শুনতে আসে। চাষীকেন্দ্রিক গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে মেয়েদের এই অন্তর্ভুক্তি উপন্যাসে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

207.1.3.5 আদর্শ প্রশ্নমালা

ক) তারাশঙ্করের গণদেবতা উপন্যাসে চরিত্রায়ণের বিশেষ অভিমুখ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন
খ) নারীচরিত্র উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে কী বার্তা দিতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করুন।

গ) গণদেবতা উপন্যাসে কোনো একক চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠেনি বরং একটি সংঘবদ্ধ সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে অনেক চরিত্র ভিড় করে আছে। প্রধান অপ্রধান চরিত্র উপস্থাপনের আঙ্গিকটি বর্ণনা করুন।

207.1.3.6 সহায়ক গ্রন্থ

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা	পুস্তক বিপণি
গৌরমোহন রায়	তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা	সাহিত্যশ্রী
চিন্ময়ী ভট্টাচার্য	কথাসাহিত্যে গ্রাম-বাংলা	দে'জ
জগদীশ ভট্টাচার্য	আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী	ভারবি
জগদীশ ভট্টাচার্য	ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর	ভারবি
ড. নিতাই বসু	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	দে'জ
ড. নিতাই বসু	নানা আলোকে তারাশঙ্কর	টিচার্স বুক এজেন্সি

Paper –B-Core-207

গণদেবতা- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

207. Module-1, Unit-4

বিন্যাস ক্রম :

207.1.4.1 ভূমিকা
207.1.4.2 ভাষা-বয়ন
207.1.4.3 লোক-উপাদান
207.1.4.4 প্রবাদ প্রবচন
207.1.4.5 আদর্শ প্রশ্নমালা
207.1.4.6 সহায়ক গ্রন্থ

207.1.4.1 ভূমিকা

গ্রাম তারাশঙ্করের উপন্যাসে শুধু একটি স্থানপট হিসেবেই আসেনি; গ্রামকে তিনি ক্ষুদ্র পরিসর থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন। ব্রতকথা, ছড়া, বিভিন্ন লোকগান, মিথ কল্পনা ও পুরুষানুক্রমে চলে আসা নানান বিশ্বাস প্রভৃতি লোক-উপাদান শুধু গ্রামের কথা প্রসঙ্গেই এসেছে তা নয়; তার উপর ভর করে বৈচিত্রপূর্ণ গ্রাম্য জনজীবনের প্রকৃত বাস্তবতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে লোক -উপাদানগুলি তখন আর তাদের থেকে বিবিক্ত বলে মনে হয় না, বরং উপন্যাসের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই মনে হয়। লোকজীবনসম্পৃক্ত যে কাঠামো সেই সময় আমাদের সামনে ছিল, তারাশঙ্কর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই পৌরাণিক ছাঁচ অবলম্বন করে সমগ্র গ্রামীণ লোকসমাজ ও তার পরিমণ্ডলকে নতুনরূপে তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

207.1.4.2 ভাষা-বয়ন

একজন সাহিত্যিকের শিল্পিমনের ঠিকানা অনেকাংশে লুকিয়ে থাকে তাঁর ভাষা সচেনতার মধ্যে। লেখক তারাশঙ্কর মূলত তাঁর রচনায় সহজ সরল ও সাবলীল ভাষাপ্রয়োগেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন বেশি। গ্রামের মানুষ গ্রাম্য সহজ সরল বাংলায় কথা বলবে এটাই স্বাভাবিকভাবে তিনি মনে করতেন। 'সরলতা এবং স্পষ্টতা' যা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রধান চর্চার দিক। ভাষার এই সূক্ষ্ম প্রয়োগে গ্রাম -সমাজের প্রকৃত বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। সেই কারণেই তারাশঙ্কর বলেন —"এই কারণেই আমার পাত্র -পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে। ...নইলে অনুকরণ করে একটা ভাষা তৈরি করা খুব কঠিন নয়; বেঁকিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার যে আধুনিক ঢংটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে, সেটা রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষার অক্ষম অনুকরণ। ...আমি আমার দেশের মানুষকে যতদূর জানি এবং আমি নিজেও সেই মানুষদের একজন বলে বেশ একটু খুঁতখুঁতে -চিত্ত। সেই কারণেই বর্ণসাংকর্যকে পছন্দ করি না।"

তারাশঙ্কর বাংলাদেশের গ্রামীণসমাজ ও তার সাস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভাষার এই সূক্ষ্ম প্রয়োগে গ্রাম -সমাজের প্রকৃত বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। এখানে এক উপভাষা ব্যবহার করে তার অর্থ বুঝিয়ে দেন এইভাবে —'রূপেন' অর্থাৎ উপেন, 'নামুনে' অর্থাৎ কলেরা, প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত। গ্রামের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙাকালীর বেদী, এই ভাঙাকালী নামের পিছনের দিকটি উহ্য থাকেনি—'কালী-ঘর যতবার তৈয়ারী হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙাকালী।' পাতুর মুখে উঠে এসেছে আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির প্রকৃতরূপ— 'গোটা গ্রামের লোকের 'আঙোটজুতি' আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়, অথচ আমি কিছুই পাই না। তা কর্মকার যখন রব তুললে, তখন আমিও বলেছিলাম যে, আমি আর 'আঙোটজুতি' যোগাতে লারবো [অর্থাৎ পারবো না]।' বৈরাগীদের 'নেলো' অর্থাৎ নলিন প্রভৃতি।

207.1.4.3 লোক-উপাদান

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বঙ্গের গ্রামসমাজ ও তার বাস্তবতাকে অভিব্যক্ত করেছেন সম্পূর্ণরূপে। লোক-সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্যের সম্পৃক্তকরণেও তাঁর সেই দক্ষতার পরিচয় পাই। এই উপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, ছড়া, বিভিন্ন লোকগান, ব্রতকথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিচিত্র লোক -উপাদানগুলি সাধারণত মিশে থাকে কোনো গোষ্ঠীমানুষের আচার -আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি অন্দরমহলের রুচির সঙ্গে। এমনকি লেখক নিজেও সেই লোক-ঐতিহ্যের আবহে ছিলেন নিমগ্ন। এখানে নবান্ন দিয়ে শুরু হয়, মাঝখানে 'ইতুলক্ষ্মী'র নিয়ম থাকলেও সেখানে পার্বণের সমারোহ নেই। ঘরে ঘরে মেতে ওঠার সুযোগ নেই। সেই ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয় —'পৌষ-পার্বণ'। 'পৌষ-পার্বণে ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা-পরব। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিঁড়া, মুড়কী, মুড়ীর নাড়ু, কলাই ভাজা ইত্যাদিতে পুজা হইয়াছিল। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘরের মধে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধান-কড়ি সাজাইয়া সিংহাসনের দুইপাশে দুইটি কাঠের পেঁচা রাখিয়া লক্ষ্মীপুজা হইবে...।'

সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে 'মনসার ভাসান' হয়; যদিও স্থানীয়দের কথায় 'বেহুলার দল' বলা হয়ে থাকে। এই মনসার ভাসানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ছিরু পালের বড়ীতে নবান্ন উপলক্ষ্যে যে বিশেষ সমারোহের আয়োজন হয় সেখান থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর প্রথম প্রয়াস। এই কর্মে অবশ্য জগন ডাক্তার ও দেবু পণ্ডিত বেশ তৎপর। গ্রামকে তারা এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়। এইধরনের 'সত্যকারের সার্বজনীন উৎসবকে' সামনে রেখে তারাশঙ্কর একটি প্রতিবাদের বিকল্প পথ গড়ে তোলেন। লোক-উপাদান শুধুই একটি উপাদান বা উপকরণ নয়; বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে নিমেষে। সাবেককালের প্রচলিত চিন্তাচেতনার উপর ভর করে তাই তারাশঙ্করের উপন্যাস হয়ে ওঠে একটি নবজাগরণের প্রতিমান।

পদ্মের বারবার মূর্ছা যাওয়া রোগকে গ্রামের মানুষ অবলীলাক্রমে 'দেবরোগ' মনে করে তার ব্যাখ্যা করে এইভাবে—'বাবা বুড়োশিব ভাঙাকালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে পার পায় নাই। নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আসিয়া সে বস্তু তুলিয়া লওয়ার অপরাধ তো সামান্য নয় ! অনুরুদ্ধের পাপে তার স্ত্রীর এই রোগ হইয়াছে।' লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে লোকবিশ্বাসের দিকটি তখন আমাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে। 'শাপ-শাপান্ত' যাকে অন্যত্র তারাশঙ্কর নাম দিয়েছেন 'কলহ-সংস্কৃতি' তার কথা এখানে ব্যক্ত হয়ে পড়ে পদ্মের মুখের কথায়। অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম ছিরু পালকে অভিশাপ দেয় — 'কানা হবেন—কানা হবেন—অন্ধ হবেন; হাতে কুষ্ঠ হবে —সর্বস্ব যাবে—ভিক্ষে করে খাবে... '

প্রাচীন রীতিনীতি ধ্যানধারণা ভাবনা ও সংস্কারকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিয়েই এগিয়ে গিয়েছেন। এখানেই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ও সাফল্য। জগন ডাক্তার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও এমনকি ডাক্তার হয়েও 'প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারেন না। রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেকশন দিয়াও সে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে...।' তারাশঙ্কর এইভাবে লোকবিশ্বাসের নবতর সংযোজন করে দিয়ে যান তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে।

207.1.4.4 ঘেঁটুগান

চৈত্র মাসের ঘেঁটুর গানকে কেন্দ্র করে আবার মানুষের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই ঘেঁটুগানের আসরে গ্রামের সিকিভাগ পুরুষেরা আর আসে না। সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পেটের দায়ে গ্রামের সীমা অতিক্রম করে ভিনগাঁয়ে গিয়ে চাকরি করে। সেই চাকরি করতে গিয়ে তাদের ফিরতে একপ্রহর রাত হয়ে যায়, তাই তারা আর এই ধরনের আসরে উপস্থিত হতে পারে না। সতীশের এই ঘেঁটুগানের বিষয় তাই পরিবর্তন হয়ে যায়। স্থানীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান বাঁধা হয়—

'হায় এ জল কোথা ছিল।
জলে জলে বাংলা মুলুক ভে-সে গেল।'

বহুদিন আগে যখন রেললাইন বসানোর কাজ চলছিল তখন যে গান বাঁধা হয়েছিল তা হল—

'সাহেব রাস্তা বাঁধালে;
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে।'

অজন্মার বছরের ঘটনা গানে ধরা পড়েছিল—

‘ঈশাণ কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো।
এক ছিলম তামুক দাও গো সঙ্গে আছে হুঁকো।।’

বর্তমানকে কীভাবে ঘেঁটুগানের মধ্যে ধরা হয় তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল—

‘দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা,
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোর করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে ‘না’।।
থাকিলে পিছনে পড়ে সোনার বরণ নারী,
ননীর পুতলী শিশু ধূলায় গড়াগড়ি।
তবু ঘোষের মন টলে না।।’

তারপর গাজনের কথা এসেছে, অশোক ষষ্ঠীর কথা বলেছেন এইভাবে —‘‘‘এই ষষ্ঠী যাহারা করে, তাহাদের সংসারে নাকি কখনওশোক প্রবেশ করে না।’ ‘‘হারালে পায়, মলে জীয়োয়।’’ অর্থাৎ কোনও কিছু হারাইয়াও হারায় না, হারাইলে ফিরিয়া পায় —মরিলেও মরে না, পুনরায় জীবিত হয়, অশোক ষষ্ঠীর কল্যাণে...।’’’ আষাঢ় মাসের ‘আমুতির লড়াই’-এর কথাও এখানে বাদ পড়েনি। এককথায় উপন্যাসের কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত উৎসবগুলিকে একে একে তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন। সময় যেন ভঙ্গিতে এগিয়ে চলে সংস্কৃতিও তেমনি একই পথে এগিয়ে চলে। চলমানতার এই প্রবাহে লোক উৎসবগুলি চিরন্তন মূল্য পেয়ে যায় লেখকের লেখনীর গুণে।

207.1.4.5 আদর্শ প্রশ্নমালা

ক) তারাশঙ্করের গণদেবতা উপন্যাসে বিভিন্ন লোক-উৎসবের মধ্যে দিয়ে গ্রামসমাজের যে বিশেষ রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তা আলোচনা করুন।
খ) গণদেবতা উপন্যাসে ভাষাবয়নের দিকটির প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করুন।

207.1.4.6 সহায়ক গ্রন্থ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার সাহিত্য জীবন	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	কল্লোল যুগ	এম. সি.সরকার
৩। অলোক রায়	কালান্তরের কথাকার তারাশঙ্কর	অক্ষর
৪। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	উপন্যাসে জীবন ও শিল্প	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৫। ক্ষেত্র গুপ্ত	তারাশঙ্কর অনুসন্ধান ৯৮	পুস্তক বিপণি

৬। গৌরমোহন রায়	তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা	সাহিত্যশ্রী
৭। জগদীশ ভট্টাচার্য	ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর	ভারবি

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক ৫

পুতুলনাচের ইতিকথা

বিন্যাসক্রম

৮.২.৫.০ : প্রাক্ কথা

৮.২.৫.১ : পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) : উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা

৮.২.৫.২ : সূচনার ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব

৮.২.৫.৩ : আধুনিকতা : গ্রাম শহরের দ্বন্দ্ব

৮.২.৫.৪ : পুতুলনাচের ইতিকথার গদ্যভঙ্গী বিশ্লেষণ

৮.২.৫.৫ : মানিকের উপন্যাস : দাম্পত্য জীবনের অনুপস্থিতি

৮.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৫.০ : প্রাক্ কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযাত্রীদের অনেকেই ছোটগল্প রচনায় যতটা দক্ষতা দেখিয়েছেন উপন্যাসে ততটা নয়। কিন্তু আবির্ভাব লগ্নেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই সব্যসাচীর ভূমিকা। তবে সূচনা পর্বে গল্পের তুলনায় উপন্যাসই বোধ হয় কিছুটা এগিয়ে থাকে। ১৯৩৫-৩৬ এর মধ্যে গল্পে বলতে কেবল 'অতসীমামী, অথচ উপন্যাস রচিত হল পাঁচটি 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'জীবনের জটিলতা'। এদের মধ্যে অন্তত তিনটি (দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা) বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে অসুস্থ শরীরে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে তিনি জানিয়েও ছিলেন যে, প্রথমদিকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রভৃতি কয়েকখানা উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তাঁর সর্বশক্তি ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং লেখকের এই উক্তিতে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র মতো অন্যায়ের গুরুত্ব বোঝা যায়। এই পর্বের উপন্যাস রচনায় লেখক নিজেকে প্রায় নিঃশেষিত করেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প-উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে গল্প বলতে শুধুমাত্র 'অতসীমামী'। সেই সময়েই রচিত হয় 'জননী', দিবারাত্রির কাব্য' 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'র মতো উপন্যাস। রজনীকান্ত দাস 'পরিচয়' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যা.রে গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করার সময় বলেছেন—প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫) হলেও দিবারাত্রির কাব্য-ই তাঁর প্রথম রচনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণের পরই রজনীকান্ত দাস 'পরিচয়' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৬৩) বহু পরিশ্রমে তাঁর যে গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে, প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস জননী (১৯৩৫) হলেও দিবারাত্রির কাব্য-ই তাঁর প্রথম রচনা। মানিকের নিজের ভাষায়, 'সেটা আমার একুশ বছর বয়সের রচনা'। তবে আমাদের আলোচ্য যেহেতু কেবল 'পুতুল নাচের ইতিকথা' তাই 'দিবারাত্রি কাব্য' বা 'জননী'-কে আলোচনায় বাদ দিতে হবে। তবে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)-কে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ এটি পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬)-র সঙ্গে একই বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে একই বৎসরে মানিকের এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস পেয়ে গেল। ত্রিশের দশকের শেষার্ধ থেকে বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যেন মোড় নেবার পালা। আর এরই চূড়ান্ত নিদর্শন আলোচ্য দুটি উপন্যাস।

আপাতদৃষ্টিতে 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র মধ্যে বিষয়গত বা আঙ্গিকগত কোনো মিলই নেই। প্রথমটিতে আঞ্চলিকতার নতুন মস্কো নির্ধারিত হয়েছে, চরিত্রচিত্রনে মানব-চরিত্রের জটিলতা এসেছে, নিম্ন বর্গের মানুষের জীবনকাহিনি সেখানে সম্পূর্ণ আধুনিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিত্রিত। তাছাড়া উপন্যাসটিতে সমাজ, বাস্তবতারও একটি যথাযথ দিক প্রতিফলিত। ব্যক্তির আদর্শবোধ ও আত্মবিশ্লেষণের সূচনা এখান থেকেই। আবার এখানেই 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মিল। সেখানে বাইরের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের সংঘাত যতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাতে।

৮.২.৫.১ : পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬)—উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা

'পুতুল নাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬) মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ আধুনিকতা এসে গেল। পরিবার বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির অন্তর্বিরোধ, আত্মবিশ্লেষণই এখন থেকে উপন্যাসের বিষয়। তাছাড়া ত্রিশের দশকের শেষ থেকেই প্রায় অবলুপ্ত সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ কাঠামোর সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসিকতার দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে এসে পড়ে। এ দ্বন্দ্ব পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গে নূতন জীবনজিজ্ঞাসার। মানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই প্রথম এই সংঘাতটি ধরা পড়ে। এই অন্তর্দৃষ্টির জন্যই তিনি সমসাময়িকদের থেকে আলাদা। তাই যখন তিনি বলেন, "জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)"—তখন তা কেবল অহমিকা বলে মনে হয় না, এ এক প্রবল আত্মপ্রত্যয়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র শশী তার সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। আত্মদ্বন্দ্ব এবং আত্মানুসন্ধানই চরিত্রটিকে আধুনিক নায়ক করেছে।

> *'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায়। ত্রিশের দশকের শেষে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ কাঠামোর সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও প্রকাশ্যে এসে গেল। এ দ্বন্দ্ব পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গে নূতন জীবনজিজ্ঞাসার।*

৮.২.৫.২ : সূচনার ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব

উপন্যাসের সূচনা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাও উপন্যাসটি ভেঙে দেয়। বলা হয়ে থাকে যে, নাটক অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ শিল্প আর উপন্যাস হচ্ছে সবচেয়ে শিথিল অসংবদ্ধ কাঠামোর রচনা। পুতুল নাচের ইতিকথা-য় কিন্তু গোড়াতেই সংযত নাটকীয় চমক, ''খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া পুড়িয়া গেল''। এ যেন নাটকের একটি আকস্মিক দৃশ্য, কোনো বিস্তৃত ন্যারেটিভ-এর প্রয়োজন এখানে দেখা দেয়নি। চোখের সামনেই যেন হঠাৎ ঘটনাটি ঘটে গেল, এবং পাঠক নিজেই মনশ্চক্ষে এটিকে দেখতে থাকুক। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন বলেই মানিকের গদ্যভঙ্গি আবেগবর্জিত, তির্যক। একটি অপ্রয়োজনীয় শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না, দীর্ঘ বাক্যবন্ধ তাঁর রচনায় নেই। খালের ধারে হারুর মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কিত করার পরই খালে শশীর নৌকা দেখা যায়, আর এই নৌকো থেকেই শশী মৃতদেহটি দেখতে পায়। মাঝি গোবরধনের সহায়তায় মৃতদেহটিকে নৌকোয় তুলে গাওদিয়ার ঘাটে নিয়ে যাবার পর থেকেই মূল কাহিনি শুরু হয়ে যায়। পরতে পরতে কাহিনির ভাঁজ খুলতে থাকে, নতুন নতুন ঘটনা এবং চরিত্র তাতে প্রবেশ করে আর সবগুলির সঙ্গে একমাত্র শশীই জুড়ে থাকে। উপন্যাসের সূচনায় মৃতদেহ নিয়ে যে শশী নৌকোয় গ্রামে ঢোকে, সমাপ্তিতে কিন্তু সেই শশীকে আর পাওয়া যাবে না। জীবনের নানা জটিলতা, নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা, নিজের দোলাচল মানসিকতা, শশীর কল্পনাপ্রবণ, আবেগবিলাসী মনটিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। বন্ধু কুমুদের সহচর্যে একদা যে রোমান্টিক মনটি তার গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে তা যেন শশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। পিতা গোপাল দাসের ন্যস্ত পারিবারিক দায়িত্ব পালনই এখন তার কাছে বড়। তালবনের ধারে মাটির টিলাটির ওপর সূর্যাস্ত দেখবার সাধ শশীর অনেক দিনের। এখানে দাঁড়ালে তার মন যেন প্রশান্তিতে ভরে যায়। সে যেন অনন্তের আস্বাদ লাভ করে। কিন্তু যতই গ্রাম্যজীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা বাড়ে ততই তাকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এখন অনন্তের, অসীম আনন্দের আস্বাদ লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ''তালবনে শশী আর কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।'' এই ভাবে এই উপন্যাস শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের কাহিনিতে পরিণত হয়ে যায়। মানিকের প্রায় সব উপন্যাসেই তাই হয়, তাই হওয়ার কথা। কারণ, প্রচলিত পথের অনুসরণ মানিকের চিন্তার বাইরে। ডি. এইচ, লরেন্স তো এই সত্যটির কথা আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ''All rules of construction hold good only for novels that are copies of other novels.''

> *নাটক অতত্ন্য দৃঢ় সংবদ্ধ শিল্প আর উপন্যাস হচ্ছে সবচেয়ে শিথিল অসংবদ্ধ কাঠামোর রচনা। উপন্যাসের গোড়াতেই সংযত নাটকীয় চমক আছে। সেইসঙ্গে মানিকের গদ্যভঙ্গি আবেগবর্জিত ও তির্যক। একটি অপ্রয়োজনীয় শব্দও তিনি ব্যবহার করেননি, দীর্ঘ বাক্যবন্ধ রচনায়।*

৮.২.৫.৩ : আধুনিকতা : গ্রাম শহরের দ্বন্দ্ব

শশীকে বাংলা উপন্যাসের প্রথম আধুনিক নায়ক বলা হয়েছে। মধ্যবিত্তের অন্তর্বিরোধ এবং অন্তঃসারশূন্যতার' (যুগান্তর চক্রবর্তী) প্রতীক হিসেবেও তাকে চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল ''শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ'' আবার হোসেন মিয়ার আদলে শশীকে সমগ্র গাওদিয়া গ্রামের নিয়তি বললেও বোধ হয় ভুল হয় না। কারণ কাহিনির কেন্দ্রস্থল থেকে পিতা

গোপাল সহ গ্রামের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেকেরই পরিণতির জন্য সে দায়ী। আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ হল নাগরিকতা। কিন্তু শশী চরিত্র সম্পূর্ণ নাগরিক লক্ষণাক্রান্ত নয়। ডাক্তারি পড়ার সময় বিশেষ করে কুমুদের সাহচর্যে নিজেকে শহুরে ইনটেলেকচুয়ালের পর্যায়ভুক্ত করার বাসনা তার হয়েছিল বটে কিন্তু সেই মনোভাব স্থায়ী হয়নি। শশীর নিজেরই জানা ছিল, ''হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু ছাপ, দাগ নয়।" শশীকে এই গ্রামজীবনের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে চরিত্রটির যথাযথ মুল্যায়ন সম্ভব বলে মনে হয় না। শশীকে বুঝতে বরং লেখকের সাহায্য নেওয়া ভালো। তিনি সূচনাতেই জানিয়ে দেন, 'শশীর চরিত্রে দুই সুস্পষ্ট ভাগ আছে।' আগেই বলা হয়েছে, এই দুটি ভাগের একটিকে তৈরি করেছিল তার পিতা গোপাল দাস, অপরটি কলকাতার কলেজের বন্ধু কুমুদ। খুব সহজভাবেই জানানো হয় যে, শশীর সাংসারিক বুদ্ধি, হিসেবী মানসিকতা এবং গ্রামের প্রতি টানের মূলে রয়েছে পিতা, আর গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা, নাগরিক রোমাণ্টিকতা বন্ধু কুমুদের কাছ থেকে তার পাওয়া। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই ধারার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই শশী চরিত্রটি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানো এক জিনিস, আর সম্পূর্ণ গ্রামীণ মানসিকতা অন্য জিনিস। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে শশীর নিজেরই স্বীকারোক্তি রয়েছে। তবে অনেক সময়ই গ্রাম্যজীবন অসহ্যবোধ হওয়ায় সে বাইরে চলে যেতে চেয়েছে, চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ বা জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক সাফল্যের জন্যও তাকে বাইরে যাবার কথা ভাবতে হয়েছে। পথের পাঁচালী-র অপুকেও তো একই কারণে নিশ্চিন্তিপুর ছাড়তে হয়েছিল। তাই এই জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে সবক্ষেত্রেই কেবল বিতৃষ্ণা নেই আর্থিক বা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যাপারটিও রয়েছে।

> *সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল 'শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্খার প্রতিভূ।'' তাহলেও শশী চরিত্র সম্পূর্ণ নাগরিত লক্ষণাক্রান্ত নয়। শশীর সাংসারিক বুদ্ধি, হিসেবী মানসিকতা এবং গ্রামের প্রতি টানের মূলে রয়েছে পিতা, আর গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা নাগরিত রোমান্টিকতা বন্ধু কুমুদের কাছ থেকে তার পাওয়া। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই ধারার দ্বন্দের মধ্য দিয়ে শশী চরিত্রটি অগ্রসর হয়েছে। জগৎ ও জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গাওদিয়াতেই স্থায়ী নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের জন্য শশীর সংকল্প তাই এক ধরণের প্রায়শ্চিত্তত ও বটে। তাই শশীও পুরোনো সব অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।*

তাই কেবল গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে শশী চরিত্রকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। আমরা শশীকে ভিন্নদৃষ্টিতে বিচারের পক্ষপাতী। তার গড়ে ওঠার ধারাবাহিকতার দিকে তাকাতে হবে। শশী-সম্পর্কিত আলোচনায় কোথাও চোখে পড়ে নি যে, উপন্যাসে তার বাল্য ও কৈশোরের বর্ণনা নেই। নেই তার মায়ের কোনো উল্লেখ। বোঝাই যায় যে, শশী বাল্যেই মাতৃহীন। নিরাসক্ত মানিক এ নিয়ে অকারণ আবেগ সৃষ্টি করতে চান নি। শশীর শৈশবের কোনো মধুর স্মৃতির উল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। বরং পিতা গোপালের কঠোর শাসনে তা ছিল ভীতির পর্ব। 'শৈশব ও কৈশোরের এই যমটিকে ভয় করা তাহার সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।' গোপাল সম্পর্কে শশীর এই মনোভাবে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাতৃহীন বালকের মাঝরাতে ঘুমভেঙে যেতে, প্রবল একাকিত্বের জন্য কেবল ভয় করত। এই ভয় তার অবচেতন মনে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিল। তাই বড় হয়েও তালবনের মাটির টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার পূর্ব মুহূর্তে শশী কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে, 'ছেলেবেলা মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক একদিন তাহার যেমন ভয় করিত', তেমনি ভয়, 'শৈশবের এই ভয়, এই একাকিত্ব বোধ শশীকে আজন্ম তাড়িত করেছে। পিতা গোপালের প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণার কারণ ও এই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি। তার নিজের এবং অন্যান্যদের সঙ্গে গোপালের ব্যবহার ধীরে ধীরে এই বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল এর সঙ্গে কুমুদ প্রভাবিত নাগরিক মানসিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। লেখক এই সত্যটিই স্পষ্ট করেছেন আলোচ্য

বাক্যে, 'ছেলের মনেও শ্রদ্ধা বজায় রাখিতে হইলে নিজের জীবনকে যে বাপের পর্যন্ত শ্রদ্ধার উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হয় এ শিক্ষা গোপালের ছিল না।' এইভাবেই সাবালক শশীর পিতার প্রতিটি অনুরোধের বিরোধিতা বা তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ একটা বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়ে যায়। বিশেষ করে শশীর মাতৃহীন সত্তার নিঃসঙ্গতার বেদনাটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি তার একটি কথা মনে রাখলে শশী চরিত্রটির বিশ্লেষণ সহজ হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়েছিলেন, কর্মসূত্রে পিতার ঘনঘন স্থান পরিবর্তন, মাতৃহীন ছন্নছাড়া সংসার, অনেক ভাইবোনের মধ্যে একাকিত্ব শশী চরিত্রে বীজ বপন করছিল।

এইজন্যই শশী সাধারণ চরিত্র থেকে আলাদা। আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতের মৃত্যুতে তাই তার শোক হয় না। বরং তার মধ্যে দিয়ে সে যেন জীবনের একটি নতুন মানে খুঁজে পায়। "জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়।" যেহেতু তার ক্ষেত্রেও মৃত্যু অনিবার্য তাই সীমিত আয়ুর মধ্যে জীবনকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার কথা সে চিন্তা করে। তার ওপর হারুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া তাই অন্যদের থেকে আলাদা। এই কারণেই তার দেখা প্রত্যেকটি চরিত্রকেই সে আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করে। প্রথম পর্বে পিতা গোপাল এবং কলকাতা-পর্বে, বন্ধু কুমুদ এই দুটি চরিত্রকে বিশ্লেষণের অবকাশ সে পায় নি। প্রথমজনের ক্ষেত্রে তার সাহস ও সুযোগ ছিল না, দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে ছিল না ইচ্ছে। যখন তার অনুকরণ করার বয়স তখন কুমুদের তার জীবনে আর্বিভাব। 'এই একটি মাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একেবারে বদলাইয়া গেল।' লক্ষণীয় এই দুই মোহগ্রস্ততাই স্থায়ী হয়নি। গোপালের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সে বিদ্রোহী। আবার যাত্রার দলের কুমুদকে দেখে তার মনে হয় যে, তার এই 'অধঃপতন তাহাকে যেন শশীর চেয়েও নীচে নামাইয়া দিয়াছে।" মোহমুক্ত শশী এরপর থেকে কুমুদের অনেক আচরণের সমালোচক, তার মতিকে বিবাহ করবার সিদ্ধান্তের বিরোধী। এই শশীই যথার্থ একক চরিত্র। আপনাকে তার জানা আর কখনোই ফুরোয় না। আর এই ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণই শশীকে ঘর বাঁধতে দেয় না, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও সে পারে না। বন্ধু কুমুদ শশীর এই দোলাচল মনোভাব দেখেই বোধ হয় তাকে সতর্ক করেছিল, "শান্ত হিসেবী সাধারণ সংসারী মানুষ তুই। সাধারণ মানুষের জীবন যেমন হয় তোরও তেমনি হওয়া দরকার। অন্যরকম করে বাঁচতে গেলে তুই সুখী হতে পারবি না।"

এই 'অন্যরকম করে বাঁচতে চাওয়াটাই' শশীকে আলাদা করে রাখে, এও যেন এক ধরনের 'বিপন্ন বিস্ময়', অর্থ, কীর্তি বা সচ্ছলতা সত্ত্বেও যার প্রভাব এড়ানোর উপায় নেই। কুমুদও জানত যে, মতি তার উপযুক্ত সঙ্গিনী নয়, কিন্তু এই প্রবল আত্মবিশ্বাসও তার আছে, 'সঙ্গিনী আমার সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকেই।' এই ক্ষমতা যে তার ছিল তার প্রমাণ কুমুদের হাতে মতির আমূল পরিবর্তন। কিন্তু শশী অন্যকে যেমন পালটাতে পারে না, তেমনি পালটাতে পারে না নিজেকে। আর যদিও বা কখনও সেই চেষ্টা করে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। কুসুমের কাছে সে যখন নিজেকে তুলে ধরে তখন কুসুমের সব উন্মাদনা চলে গেছে। যে কুসুম শশীর সামান্য ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে চলে আসত অবহেলায় ঔদাসীন্যে সে কুসুমের মন এখন অসার। চমৎকার উপমা দিয়েছে কুসুম, "লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? ... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।" এসব ক্ষেত্রে শশী কেবল অন্যদেরই নয়, যেন নিজেরও নিয়তি। ক্রমশ তার এই তিক্ত উপলব্ধি হয় যে, 'কুসুমের মতো গোপালের মনটাও শশীই ভাঙিয়া দিয়াছে।' কুসুমের বাপের বাড়ি চলে যাওয়া বা গোপালের কাশীবাস এই দুইয়ের দায়িত্বই যেন শেষে শশীর ওপর এসে যায়। 'জীবন সম্পর্কে সে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মতো চেতনাহীন।' তাই

চারমাসের ঘটনাপ্রবাহে, নিজের ভালোমন্দের তার আর কিছু আসে যায় না। জগৎ ও জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গাওদিয়াতেই স্থায়ী নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের জন্য শশীর সংকল্প তাই এক ধরণের প্রায়শ্চিত্তও বটে। তাই শশী পুরোনো সব অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। সে হাসপাতালের দায়িত্ব নেয়, রুগি দেখে, জমির মামলা করতে বাজিতপুরে যায়। তালবনের মাটির টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার সাধ সে চিরতরে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ 'নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবন বহিতে পারে?'

৮.২.৫.৪ : পুতুলনাচের ইতিকথার গদ্যভঙ্গী বিশ্লেষণ

যুগান্তর চক্রবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য উক্তির কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর মতে ''মানিক বাবুর প্রসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা চূড়ান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অপর দিক''। এখানে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিকতা-কে মেলানোর তেমন সুযোগ হয়তো নেই। কিন্তু মানিক সম্পর্কিত আলোচনায় ভবিষ্যতে এই মেলানোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তবে পুতুলনাচের ইতিকথা-র রচনা ভঙ্গিকে এই নৈব্যক্তিকতা কতটা প্রভাবিত করেছে তা একবার দেখা যেতে পারে। বস্তুত সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই নিরাসক্ত গদ্যব্যবহারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও প্রায় অদ্বিতীয়। একাধিক বাক্য দূরের কথা, একটি অতিরিক্ত শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকেই অতিরিক্ত শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকেই একটি বা দু টি পঙ্‌ক্তিতে কয়েক পাতার ব্যক্তব্য উপস্থাপিত করার উদাহরণ অজস্র পাওয়া যেতে থাকে। যেমন, ''ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না,'' ''সকলেই তাহার সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে দারিদ্র্য''—এই জাতীয় ব্যঞ্জনাগর্ভ পংক্তি সাধারণ মানের লেখকের কলম দিয়ে বেরোয় না। জেলেপাড়ার ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি—সব কিছুই এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঞ্চনার শিকার এই মানুষগুলির অসহায় অবস্থা বর্ণনার জন্যই একটি পঙ্‌ক্তিই যথেষ্ট মনে হয় তাঁর, 'মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।'

> *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বাংলাসাহিত্যেই নিরাসক্ত গদ্যব্যবহারে অদ্বিতীয় শিল্পী। একাধিক বাক্য দূরের কথা, একটি অতিরিক্ত শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' অথবা "মাটির টিলাটির ওপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।" খুব বড়ো মাপের শিল্পী ছাড়া এ জাতীয় রচনা প্রায় অসম্ভব।*

তবে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় এই গদ্যভঙ্গি চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছোয়। সূচনার গদ্য তো চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এভাবে যে কোনো মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করা যায় তা পাঠকের আগে জানা ছিল না। ''খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারুঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।'' এর পরেই পংক্তিগুলিতেও ''মৃত্যু'' শব্দটির উল্লেখ নেই। তথাপি পাঠক হারুর পরিণামটি বুঝে যায়। মরা শালিকের বাচ্চা মুখে দিয়ে জায়গাটা পার হবার সময় একটা শেয়াল কেবল ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়, 'ওরা টের পায়, কেমন করিয়া টের পায় কে জানে।' কে কেমন করে টের পায় তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব লেখকের নয়। বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। ''পরাণের বৌ বললে আমার গোসা হয় ছোটবাবু,'' এই একটি বাক্যই শশীর প্রতি কুসুমের মনোভাব বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তত শশীর কাছে পরস্ত্রী হিসেবে পরিচিতি হতে সে রাজি নয়। তার নারীসত্তাটিই যেন শরীর কাছে গুরুত্বপায়। কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে আসার পর শশীর মনের অবস্থা বোঝানোর ভাষা এইরকম, ''জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতে ছিল,

সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।” নিজের বিবাহ নয়, বন্ধুর বিবাহ। কারণ, বন্ধুর বিবাহে ভবিষ্যৎ দায়িত্বের ভার থাকে না। শশী আজীবন নিজের ভারই বহন করে চলেছে।

মানিকের যে গদ্যভঙ্গির মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত dry efficiency লক্ষ করেছিলেন এগুলিই তার উদাহরণ। এতে কোনো স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্যের ছাপ নেই। এ যেন নির্মোহ এবং সম্পূর্ণ হৃদয়াবেগ বর্জিত। কিন্তু মাঝে মাঝে অপরূপ রোমান্সের আভাস পাওয়া যায়। কুমুদের যাত্রা দেখার জন্য মতি হাজির। সন্ধ্যার সময় আসরে বাজনা সুরু হলে তার অস্থিরতা বাড়ে আর কি চমৎকার ভাবেই না লেখক জানিয়ে দেন, ‘‘অমন করিয়া বাজনা বাজিতে থাকিলে ঘরেও টেকা অসম্ভব।” এতো চিরন্তন বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা। বাঁশী কেবল বনমাঝেই তো বাজেনা, রাধার মনের মধ্যেও তো বাজে। তখন তো রাধার যমুনার তীরের জন্যই মন ছটফট করবে। কৈশোর থেকে সুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত মানিকের লেখা কবিতায় দুটি খাতা ভর্তি ছিল। দিবারাত্রির কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল তাঁরই রচিত কবিতা দিয়ে। তাই তাঁর রচনায় সর্বদা আবেগবর্জিত শুষ্কতা থাকা সম্ভব নয়, কবিসত্তা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেবেই। ‘আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?’ অথবা, ‘‘মাটির টিলাটির ওপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।” ‘‘খুব বড়ো মাপের কবি ছাড়া এ জাতীয় পঙ্ক্তি রচনা করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

৮.২.৫.৫ : মানিকের উপন্যাস : দাম্পত্য জীবনের অনুপস্থিতি

অন্য উপন্যাসগুলিতে তাকানোর আগে একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি বা পুতুলনাচের ইতিকথা— কোনোটিতেই সুখী দাম্পত্যজীবনের চিত্র নেই। বস্তুত এরকম ধারাবাহিক অসুখী, হৃদয়ের যোগাযোগবিহীন বিবাহিত জীবনের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যাবে। ‘দিবারাত্রির কাব্যে’ সুপ্রিয়া—অলোক, মালতী—অনাথ, মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দম্পতি। সুপ্রিয়া বিবাহের পরও হেরম্বের প্রতি আসক্ত থেকেই যায়। হেরম্ব তাকে ভুলিয়ে ছোট দারোগার বউ করে দিয়েছিল, কিন্তু মনে প্রাণে সে কোনোদিন এ বিবাহ মেনে নিতে পারে নি। তাই পাঁচবছর বাদে হেরম্বকে দেখেও তার পুরোনো আকর্ষণই জেগে ওঠে। অথচ যার জন্য তার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয় সেই হেরম্বকে এখন লাভ করার প্রশ্নও আসে না। গৃহশিক্ষক অনাথের সঙ্গে ষোল বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল মালতী। বৈষ্ণব মতে দুজনের বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্যজীবনের নমুনা এই যে, দুজনের মধ্যে কেবল মানসিক ব্যবধান তৈরি হয়নি, অনাথ শেষ পর্যন্ত মালতীকে না জানিয়েই গৃহত্যাগ করেছে। বস্তুত, আনন্দ যে হেরম্বের সঙ্গে ঘর বাঁধতে ভয় পায় তার অন্যতম কারণ পিতামাতার তিক্ত সম্পর্কের অভিজ্ঞতা। হেরম্বকে সে স্পষ্টই এই মনোভাবের কথা জানিয়েছিল, ‘ভাবছি, আমারও যদি একদিন মার মতো দশা হয়।’ আর গোটা উপন্যাসের যে কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই হেরম্বের বৌ শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

> *‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বা ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’—কোনোটিতেই সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র নেই। উপন্যাসে প্রেমহীনতার কাহিনি এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শনটি তুলে ধরেছেন। আপাত সুখী এবং তৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের অন্তরালে রয়ে গেছে একটা চাপা অসুখ। পবিত্র দাম্পত্য জীবনের ধারণাটি যেন একটি মিথ মাত্র। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্কও লোপ পেতে বসেছে।*

‘পদ্মানদীর মাঝি’-তে কুবের-মালার দাম্পত্যজীবনে কপিলা এসে যেন ঝড় বইয়ে দিয়েছে। বস্তুত পঙ্গু নিরীহ মালার তুলনায় কপিলার বা মোহময়ী আকর্ষণ যে কুবেরকে বিচলিত করবে তা স্বাভাবিক। সন্তানদের নিয়ে

কুবেরের সংসারজীবন সুখদুঃখ মিশ্রিত মন্থর গতিতে চলছিল। কিন্তু কপিলার আগমনে এই দরিদ্র জেলেটিরও বিবাহিত জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ফেলে কপিলাকে নিয়ে সে ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমায়, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় নন্দ আর বিন্দুর দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়েছে, কুসুম-মতির জীবন স্বাভাবিক পথ ধরে এগোয় নি। আর ছোটবাবু শশীর নেপথ্য উপস্থিতি কুসুম-পরাণের স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপনের মধ্যিখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুসুমের গ্রাম ত্যাগে বাইরের বাধা অপসারিত হলেও মনের বাধা চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। প্রথম যৌবনে রচিত উপন্যাসগুলিতে বিবাহিত নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে প্রেমহীনতার এই প্রাধান্য বিস্ময়কর। এমন কি, প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত 'জীবনের মধ্যে কবি বিমল এসে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। শেষে দ্বন্দ্ব মেটাতে শান্তাকে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। কুবের-মালা ব্যতীত এই দম্পতিরা সবাই নিঃসন্তান অথবা এদের একটা সন্তান হয়ে মরে গেছে। হৃদয়ের বন্ধন ছিলই না, সন্তানের বন্ধনও এদের মধ্যে নেই। বারে বারে এই সম্পর্কহীনতা বা প্রেমহীনতার কাহিনি উপন্যাসে এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শনটিকে তুলে ধরেন। আপাতসুখী এবং তৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের অন্তরালে রয়ে গেছে একটা চাপা অসুখ। পবিত্র দাম্পত্যজীবনের ধারনাটি যেন একটি মিথ মাত্র। সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া প্রেমের স্থায়িত্ব সম্পর্কেই তো হেরম্ব প্রশ্ন তুলেছিল। আনন্দকে সে বলেছে, " একমাসের বেশি প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ একমাসের বেশি হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে।" একথা তার মতে সমগ্র মানবজীবনের ক্ষেত্রেই সত্য, দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে তো বটেই। পাশাপাশি প্রতিটি মানুষ, মানুষের প্রতিটি সম্পর্ককে ক্রমাগত বিশ্লেষণের যে প্রবণতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল তার ফলেই তিনি যেন অবচেতন মনের গভীরে সন্ধানী আলো ফেলে গেছেন। সেখানে প্রত্যাশিত মাধুর্যের কোনো সাক্ষাৎ তিনি পান নি, পেয়েছেনে তীব্র প্রাণঘাতী হলাহলের সন্ধান।

৮.২.৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের নাম কি?

২। একই সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, উপন্যাস দুটির নাম কি?

৩। আধুনিকতার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪। মধ্যবিত্ত মানসিকতা কি?

৫। নাটক কি?

৬। উপন্যাস কাকে বলে?

৭। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে কোন গ্রামের ছবি লক্ষ্য করা যায়?

৮। গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্বের দুটি লক্ষণ প্রকাশ করো।

৯। গদ্যভঙ্গীর দুটি বৈশিষ্ট্য বলো।

১০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসের নাম করো, যেখানে দাম্পত্যজীবনের অনুপস্থিতি আছে।

১১। কুসুম ও কপিলা কোন উপন্যাসের চরিত্র?

১২। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে গ্রাম্য চিকিৎসার সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার যে সংঘাত ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো।

১৩। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের গদ্য ভাষা শৈলী সম্পর্কে আলোচনা করো।

একক ৬

নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি

বিন্যাসক্রম

৮.২.৬.১ : নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি

৮.২.৬.২ : পিতা গোপাল : নায়ক চরিত্র গঠনে প্রভাব

৮.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৬.১ : নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি

উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই শশীর দ্বন্দ্বের কারণটি লেখক স্পষ্ট করেন, ‘‘শশীর চরিত্রে দুই সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট।’’ কল্পনা, ভাবাবেগ বা রসবোধ সে পেয়েছিল কলকাতার মেডিকেল কলেজের বন্ধু কুমুদের কাছ থেকে। কুমুদ তার গ্রামীণ মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছিল পিতা গোপাল দাসের কাছ থেকে। গ্রামের মাটি, মানুষ জীবনযাত্রা, তাদের নানা সংস্কার ও বিশ্বাস সব কিছুই যেন লুকিয়ে ছিল তার রক্তের গভীরে। সেখানে মাঝে মাঝে সে সংকীর্ণ হিসেবী হয়ে ওঠে। যে রোগী মারা গেছে তার বাড়িতে গিয়েও ভিজিটের জন্য কড়া তাগাদা লাগায়। কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জীবনে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটেনি। যুগান্তর চক্রবর্তী ঠিকই ধরিয়ে দেন, ‘‘বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই দ্বৈতরূপ, তার দ্বন্দ্বময় দুই মুখ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুতুলনাচের ইতিকথা-য় একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন—‘শশী কুমুদের চরিত্রে এই উভয় রূপের মৌল লক্ষণগুলি ওতপ্রোত মিশে যায়।’ (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) তারও আগে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ‘তিরিশের বাংলাদেশের গ্রাম-শহরের সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে শশী সর্বদা স্মরণীয় চরিত্র।’

‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে শশী সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। গ্রামের মাটি, মানুষ, জীবনযাত্রা, তাদের নানা সংস্কার ও বিশ্বাস সব কিছুই যেন লুকিয়ে ছিল তার রক্তের গভীরে। শশীর আত্মদ্বন্দ্ব এবং আত্মানুসন্ধানই চরিত্রটিকে নায়ক করেছে। নাগরিক ও গ্রামীণ মানসিকতার দ্বন্দ্ব কি ভাবে শশীর মতো এক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

আমাদের চিন্তাভাবনাও আপাতত এই পথ ধরেই চলে। শশীকে ‘কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পীড়িত নায়ক’ বলেই আমাদেরও বোধ হয়। কিন্তু ‘পুতুল’ শব্দটি আমাদের একটু আলাদা ভাবে ভাবায়। কুসুমের বাবা অনন্ত শশীকে একজায়গায় বলেছিল, ‘‘সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।’’ এ সেই অদৃশ্য

ভাগ্যদেবতার লীলা যার সম্পর্কে কিং লীয়র আর্তনাদ করেছিলেন, They kill us for their sports পাঠক হিসেবে আমরাও এই ভাবেই উপন্যাসের নামটিকে দেখতে ভালোবাসি। কিন্তু পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপির খসড়ার একজায়গায় স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই তত্ত্ব নস্যাৎ করে দিয়েছেন, 'সত্যই তো আর পুতুল নয় মানুষ। অদৃশ্য শক্তি বা অন্য অন্য মানুষের আঙ্গুলে বাঁধা সুতোর টানে সত্যই তো মানুষ অচেতন পুতুলের মত নাচে না।... নইলে শশীর কি দরকার ছিল বাপের ফেলে যাওয়া সংসারের দায়, হাসপাতালের দায়, গাঁয়ের চাষাভূষো মানুষগুলির চিকিৎসার দায় থেকে আরও অনেক রকম দায় ঘাড়ে নেবার—তার নিজের স্বপ্ন আর কল্পনাকে যা সার্থক করে না। পুতুলের কি দায়িত্বজ্ঞান থাকে?

''**পুতুল শব্দের তাৎপর্য**'' যদি বলা যায় যে, এই 'পুতুল'টি হল মানুষের অবচেতন মন, তারই অজ্ঞাতসারে এই মন মানুষের সমস্ত সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে তাহলে সেই যুক্তিটিকেও বোধহয় অগ্রাহ্য করা যাবে না। দ্বিতীয় অর্থাৎ ১৯৪৭-এ প্রকাশিত বুকম্যান সংস্করণে প্রকাশকের পক্ষ থেকে পশ্চাদ্‌প্রচ্ছদে বক্তব্য রাখা হয়েছিল, 'পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোন অদৃশ্য হাতের সুতোর টানাপোড়েনে মানুষ নাচে।' এই বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন লেখক। ''আত্মসমালোচনা'' শীর্ষক একটি রচনায় (এক্ষণ, ১৩৪৮ শারদ সংখ্যায় লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত) তাঁর নিজস্ব ভাষ্যটি আবার পাওয়া গেল। যেহেতু উপন্যাসের নাম 'পুতুলনাচের ইতিকথা' 'তবে আর কথা কি, মানিকবাবু মানুষকে পুতুল বানিয়েছেন, ভাগ্যের দাস বানিয়েছেন।' কিন্তু তাঁর মতে ব্যাপারটি একেবারেই উল্টো। 'আমি ভাবছি হায়। যদি বইটার একটা ভূমিকা দিয়ে লিখে দিতাম মানুষকে কিভাবে পুতুল করা হয়েছে এটা তারই উপন্যাস—আমার বইখানার পিছনে হয়তো প্রকাশক আমাকে ভাগ্যবাদী ঘোষণা করতেন না।' মানুষকে কিভাবে পুতুল করা হয়েছে—এই উপন্যাসের সেটাই মূল বক্তব্য— তা মেনে নিলে নামকরণটি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। ত্রিশের দশকের গ্রামীণ বক্তব্য তা মেনে নিলে নামকরণটি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। ত্রিশের দশকের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো, নাগরিক ও গ্রামীণ মানসিকতার দ্বন্দ্ব কিভাবে শশীর মতো এক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিভাবে তা পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—তাই তখন উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। শশীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের কাহিনি বলে মেনে নিতে হয়।

৮.২.৬.২ : পিতা গোপাল : নায়ক চরিত্র গঠনে প্রভাব

শশীর চরিত্র গঠনে যাদের প্রভাব রয়েছে তাদের দিকে একে একে তাকানো যেতে পারে। প্রথমেই পিতা গোপাল দাসের কথা। কলকাতায় পড়তে যাবার আগে পর্যন্ত এই চরিত্রটিই শশীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দালালি এবং মহাজনিই তার মূল ব্যবসা। চড়া সুদে সে টাকা ধার দেয় আর সম্পত্তির কেনাবেচা করে। বেশি টাকা নিয়ে অতিবৃদ্ধের বৌ যোগাড় করে দেবার মত চরম অন্যায় কাজও সে করেছে। এরকম তিনজনের মধ্যে যামিনী কবিরাজের বৌ সেনদিদি এখনো জীবিত। নিঃসন্তান সেনদিদির গভীর স্নেহ শশীর প্রতি, আবার গোপালের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে গাঁয়ে নানা ফিসফিস শোনা গেছে। শশী এই অপবাদ বিশ্বাস না করলেও অতিবৃদ্ধ যামিনী কবিরাজ স্বাভাবিক কারণেই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান। কলকাতার বড়বাজারের বিখ্যাত পাট ব্যবসায়ী নন্দলালের সঙ্গে মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিবাহ দেওয়ার ঘটনার মধ্যেও গোপালের শঠতা ও হীন চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। বছর সাতেক আগে বাজার থেকে পাট সংগ্রহ করার জন্য নন্দলাল একবার গাওদিয়ায় এসেছিল। গোপাল তাকে

আদর করে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে আশ্রয় দেয়, ঘরের লোকের মতো আদরযত্ন করে, তারপর দিন তিনেক বাদে তার লোকজন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে নন্দলালের সঙ্গে বিন্দুবাসিনীর বিবাহ দিয়ে দেয়। বোঝাই যায় যে, নন্দলালকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছিল। সে কোনোদিনই এই অসম্মানের কথা ভোলেনি। বিন্দুকে সে কলকাতায় নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু কোনোদিনই স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, তাকে সে রক্ষিতার মতো রেখেছিল। নিজের মেয়ের জীবন এইভাবে নষ্ট করবার দায়িত্ব পিতা গোপালের উপরেই এসে পড়ে।

শশীর চরিত্র গঠনে, পিতা গোপাল দাসের প্রভাব আছে। দালালি ও মহাজন রীতি গোপাল দাসের মূল ব্যবসা। জাগতিক সাফল্য গোপালের আয়ত্ত থাকলেও পুত্র শশীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-পুত্রের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ফলে গোপাল-শশীর মনান্তর লেগেই থাকে। গোপাল চরিত্রের স্থূল প্রকৃতি, সঞ্চয়ী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল ত্রিশের দশকের গ্রামবাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে। শেষ পর্যন্ত 'কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়'। গোপালের গৃহস্থ সত্তাই শশীর ঘর-ছাড়া রোমান্টিক সত্তাকে আড়াল করে ফেলে।

যাকে জাগতিক সাফল্য বলে তার সবটাই গোপালের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু একমাত্র পুত্র শশীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শশীর চরিত্রে পিতার অবশ্যই কিছুটা প্রভাব ছিল। গোপালের সাংসারিক বুদ্ধি বা হিসেবী মনোভাব শশীর মধ্যেও মাঝে মাঝে মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু গোপাল পুত্রকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। এটাই চরিত্রটির ট্র্যাজেডি। শশীকে বশে রাখার জন্য গোপাল কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেনি। তোষামোদ, মিনতি, অভিমান, চোখরাঙানো সব কটি অস্ত্রই তাকে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। এমন কি, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আড়াল থেকে শশীর সঙ্গে শত্রুতাও করেছে। সেনদিদির চিকিৎসার সময় গোপালের উস্কানিতেই যামিনী কবিরাজ শশীর সঙ্গে ঝগড়া করে তার বাড়িতে আসা বন্ধ করতে চেয়েছিল। গোপালের অপরাধী মন বোধ হয় সেনদিদির কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নিজের কাছে আনতে চায়। শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-পুত্রের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শশী কলকাতার মেডিকেল কলেজ পাশ করা ডাক্তার আর ''গোপাল এ বি সি ডি-ও চেনে না।'' গোপালের জন্য শশীকেও কম অপমানিত হতে হয়নি। কুসুম তাকে স্পষ্টই শুনিয়ে দেয়, 'আমার বাবা ঢের রোজগার করে। তাই বলে আমরা কি আপনার তুল্যি? লোকের গলায় ছুরি দেওয়া পয়সায় আমরা বড়লোক হইনি।' আর শশীরও এই সত্যটি জানা যে, 'লোকের গলায় ছুরি দিয়েই গোপাল যে পয়সা করিয়াছে একথারও প্রতিবাদ চলিবে না।'

আবার শশীর পক্ষে গোপালকে সম্পূর্ণ এড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়। মননের মিল না থাকলে কি হয় অসৎভাবে উপার্জিত তার বিপুল অর্থের সেই তো উত্তরাধিকারী। উচ্চশিক্ষিত ছেলের জন্য গোপালের গর্ব, আবার দুস্তর মানসিক ব্যবধানের জন্য তার মনে একধরনের সঙ্কোচ, বলা যেতে পারে এক ধরণের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল। শশীকে সে তার পথের পথিক করতে চায়। অথচ তার এই সত্যটিও জানা হয়ে গেছে যে, শশীকে তার ছাঁচে ঢালা সম্ভব হবে না। মেজ মেয়ে বিন্দুকে চক্রান্ত করে নন্দলালের সঙ্গে বিয়ে দেবার পরই যেন গোপালের দায়িত্ব শেষ, মেয়ের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব তার নয়। কিন্তু শশীর কলকাতায় গিয়ে চোখে পড়েছিল যে, বিন্দুকে নন্দ প্রায় রক্ষিতা করে রেখেছে, সেখানে বিন্দুর নারীত্ব পদে পদে অপমানিত হয়ে চলেছে। তাই বিন্দুকে সে কলকাতা থেকে গাওদিয়ার নিয়ে এসেছিল। কিন্তু গোপালের তাতে প্রবল আপত্তি। স্ত্রীকে মানুষ নিজের খুশিমতো অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারের নিয়ম। মারধোর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই।' তাই তার মতে গয়নাগাটি জিনিষপত্র ছাড়া বিন্দুকে নিয়ে আসাটা অত্যন্ত কাঁচা কাজ হয়েছে।

তাই গোপাল-শশীর মনান্তর লেগেই থাকে। এর অনিবার্য ফল পিতা-পুত্রে কথা বন্ধ। আর গোপাল এতেই আঘাত পায় সবচেয়ে বেশি। তার পিতৃসত্তা কাতর হয়ে পড়ে। নিজেই উদ্যোগী হয়ে গোপাল পুত্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে যায়। এই সমস্ত জায়গাতেই গোপালকে শশীর তুলনায় সজীব মানুষ বলে মনে হয়। শশী কখন গ্রাম ছেড়ে শহরে ডাক্তারি করতে চলে যায় এই আশঙ্কায় গোপাল সব সময় কাতর। যে গাওদিয়ায় অত্যন্ত দরিদ্র ঘরে তার জন্ম সেখানেই তার এখন দালানকোঠা, বিস্তর জমি-জায়গা এবং অনেক টাকা। ''ঘরে-বাইরে এখানে তাহার আদর্শ বাঙালী জীবনের বিস্তার। এইখানে মরিতে হইবে তাহাকে। শশী এখানে থাকিবে না, অনুসরণ করিবে না তার পদাঙ্ক?'' এমন কি শশীকে সে মাঝে মাঝে শহর সম্বন্ধে সতর্কও করে দেয়, 'শহরে ঢের বড় বড় ডাক্তার আছে—তুমি সেখানে পাত্তাও পাবে না শশী।' আবার ছেলের মন ঘোরানোর জন্য তার সেন্টিমেন্টেও সে আঘাত করে, 'গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই, অচিকিৎসায় মরে গাঁয়ের লোক, সেটাও তো দেখতে হবে? বড় তুই স্বার্থপর শশী।' একদিক দিয়ে বিচার করলে গোপালের এই শশী-মূল্যায়নে সত্যতা আছে। শশীর সমস্ত চিন্তাভাবনা নিজেকে ঘিরেই, সে আত্মকেন্দ্রিক। গোপাল শশীর কাছ থেকে শেষ আঘাত পায় হাসপাতালের ব্যাপারে। তার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শশী তাকে হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটিতে নেয় না। পরিষ্কার কথা, আর্থিক ব্যাপারে পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করে না। ছেলের মনে শ্রদ্ধা জাগাতে গেলে বাবাকেও যে শ্রদ্ধার উপযুক্ত হতে হয় গোপাল এটা ভাবেনি। একদা যামিনী কবিরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোপাল শশীকে সেনদিদির চিকিৎসা করতে দেয়নি। আবার সেনদিদির শেষ অবস্থায় সে পুত্র শশীকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছিল। শশী চিকিৎসা শুরু করেও সেনদিদিকে বাঁচাতে পারেনি। তবে সমস্ত উপন্যাস জুড়েই গোপাল চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকে। তার স্থূল প্রকৃতি, সঞ্চয়ী মানসিকতা বা কুটিলতা সবকিছুই গড়ে উঠেছিল ত্রিশের দশকের গ্রামবাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে গোপাল দালালি ও মহাজনি করে সচ্ছল হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে চরিত্রটির মার্জিত আবরণ নেই। স্ত্রীর অকালবিয়োগ হয়তো তাকে প্রবৃত্তির শিকার করেছিল। সেনদিদির গর্ভে তার সন্তানের জন্ম এক নিদর্শন। কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহ করে সে সন্তানদের বিমাতার হাতে সমর্পণ করেনি। সেনদিদির মৃত্যুর জন্য পুত্র শশীকেই মনে মনে দায়ী করার মধ্যে গোপালের তীব্র আসক্তিটি স্পষ্ট হয়। আর এখানেই আঘাত পায় সে সবচেয়ে বেশি।

এরপর থেকেই গোপালের মন চিরকালের মতো ভেঙে যায়, তার সংসার-বৈরাগ্য আসে। তার মতো লোক যখন কোনো মামলার তদ্বির করে হেরে যায় তখন বোঝাই যায় যে, চরিত্রটিও সত্যিই যেন হেরে গেছে। তবে একজায়গায় বোধ হয় গোপাল শেষ পর্যন্ত জিতেও যায়। সাত-আট দিন কাশীর আশ্রমে কাটিয়ে আসার নাম করে সে আর ফিরে আসে না। সংসারীগৃহস্থ মানুষ সারাজীবন ধরে সঞ্চয় করে উত্তরাধিকারীর হাতে তা তুলে দিয়ে যাবার জন্য। 'এসব তুচ্ছ করিয়া শশী যদি চলিয়া যায়, সমস্ত জীবনটাই গোপালের ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?' তাই গোপাল নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করে। শশীকে আটকানোর উপায় সে বের করে ফেলে। নিজে গাওদিয়ায় একেবারে না ফিরে এলে তো শশী গ্রামে থেকে যেতে বাধ্য। ঘটনাও ঠিক তাই ঘটে। ''কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়''। গোপালের গৃহস্থ-সত্তাই শশীর ঘর-ছাড়া রোমান্টিক সত্তাকে আড়াল করে ফেলে।

৮.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। উপন্যাসে শশীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ?

২। শশী চরিত্র গঠনে পিতা গোপাল দাসের প্রভাবের বর্ণনা দাও?

৩। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির শিরোনামের সার্থকতা বিচার করো।

৪। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক শশীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতিতে আধুনিকতার লক্ষণ কিভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, ব্যাখ্যা করো।

একক ৭
কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

বিন্যাসক্রম

৮.২.৭.১ : কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

৮.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৭.১ : কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

উপন্যাসে কুমুদ-মতি উপাখ্যানটি আলাদা মনোযোগের দাবী রাখে। বস্তুত তেরোটি অধ্যায়ের উপন্যাসে সম্পূর্ণ দুই অধ্যায় জুড়ে কেবল কুমুদ-মতির কাহিনি। এই দুটি অধ্যায়ে মূল উপন্যাসের কোনো চরিত্র বা ঘটনার উল্লেখ নেই। এ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারা, যাকে কেবল উপকাহিনি বললেও ঠিক বলা হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলকাতার কলেজে শশীর একমাত্র বন্ধু হিসেবে উপন্যাসে কুমুদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ। শশীকে নাগরিক করে তোলার মূলে রয়েছে তার এই বন্ধুটি। কুমুদ কবিতা লেখে, তার বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাব। কলেজে না গিয়ে হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে সে ইংরেজি বাংলা নভেল পড়ত, আর ধর্ম সমাজ প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলত। ত্রিশের দশকের কলকাতায় এই ধরণের বোহেমিয়ান এবং রোমান্টিক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকের সাক্ষৎ পাওয়া যেত। কল্লোল-কালিকলম-এর আড্ডায় এদের দু-চারজনকে দেখা গেছে। স্বভাবতই গ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ শশীর কাছে কুমুদ যেন এক অজানা জগতের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল। পিতা গোপাল দাসের চেনানো জগৎ ও জীবন থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কুমুদের প্রভাবের জন্যই ডাক্তারি পাশ করে আসার পর গ্রাম সম্পর্কে শশীর মনে প্রবল বিতৃষ্ণা জাগে "জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতে ছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।"

> *'পুতুলনাচের ইতিকথা'র তেরোটি অধ্যায়ের সম্পূর্ণ দুই অধ্যায় জুড়ে কুমুদ-মতির কাহিনি। শশীকে নাগরিক করে তোলার মূলে রয়েছে তারা এই বন্ধুটি। ত্রিশের দশকে কলকাতায় এই ধরনের বোহেমিয়ান এবং রোমান্টিক কল্পনাপ্রবল তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে কুমুদ অন্যতম। মতির মতো গ্রাম্য সরল মেয়ের সাহচর্য তাকে এমন কি ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখায়। তাই মতিকে ঘিরে কুমুদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের স্বাভাবিক সূচনা। যে ভালোবাসার জোরে কুমুদ মতিকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে, শশীর জীবনে সেই জোরের একান্ত অভাব। কুমুদের বিপরীতে শশীর অবস্থানটুকু দেখানোর জন্যই কুমুদ মতির দাম্পত্য জীবনের এত বিস্তৃত বর্ণনা।*

কলকাতা ছেড়ে গাওদিয়াতে দীর্ঘকাল বাদে আবার কুমুদের দেখা পাওয়া যায়। তবে তখন সে আর কলকাতার কলেজের সেই ঝকঝকে আধুনিক মানসিকতার ছাত্র নেই। তার প্রতিবাদী নাগরিক সত্তাটি তখন অদৃশ্য। এই কুমুদ বিনোদিনী অপেরা পাটিতে যাত্রা করে বেড়ায়। একদা শশীর আদর্শ চরিত্রের এই অধঃপতন তাকেও বিস্মিত করে। আবার শশীর বাড়িতে এই ভবঘুরে চরিত্রটি প্রথম পারিবারিক জীবনের আস্বাদ পায়। মতির মতো

গ্রাম্য সরল মেয়ের সাহচর্য তাকে এমন কি ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখায়। তাই মতিকে ঘিরে কুমুদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের স্বাভাবিক সূচনা। আর এইভাবেই সে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় কাহিনিতে ঢুকে পড়ে। কুমুদের ব্যক্তিজীবনের মধ্যেই যেন তার এই পরিবর্তনের বীজটি নিহিত ছিল। তার যেটুকু পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া গেছে তাতে পিতামাতার কোনো উল্লেখ নেই। মনে হয় ধনী ব্যবসায়ী কাকার কাছেই সে মানুষ। তার খামখেয়ালি উদ্ধতস্বভাবের জন্যই বোধ হয় কাকা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, একই কারণে ধরাবাঁধা চাকরিও তার পোষায়নি। সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে সে যাত্রায় ঢুকেছে। যাত্রায় রাজপুত্র সাজার মধ্য দিয়েই বোধ হয় কুমুদের অবাস্তব কল্পনাবিলাসের চরিচার্থতা। তার অভিনয় দেখা মতির যে মনে হয়েছিল, 'কুমুদ মাটির পৃথিবীর কেহ নয়' তার মধ্যে ভুল ছিল না। সংসারী মানুষের ভূমিকাতেই কুমুদ অসার্থক। গাওদিয়ার আকস্মিক আগমন থেকে মতিকে বিবাহ করা পর্যন্ত উপন্যাসে কুমুদের উপস্থিতি মেনে নিতে আপত্তি থাকে না। বিশেষ করে শশীকে নিয়ে কুসুম-মতির সূক্ষ্ম টানাপোড়েনের এত অবসান ঘটেছে। কিন্তু উপন্যাসে কুমুদমতির দাম্পত্য জীবনের সম্পূর্ণ দুটি অধ্যায় সংযোজনের কারণটি সাধারণ ভাবে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয় না।

তবে যে কুমুদ আপাদমস্তক গ্রাম্য শশীর মনে শহরের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিল, যে শশীকে শেলীর দুর্বোধ্য কবিতা বুঝিয়েছিল, যার প্রভাব শশী কখনো পুরোপুরি এড়াতে পারে নি, সে যে শেষ পর্যন্ত নিজের সংসার করার ক্ষেত্রে বোহেমিয়ানিজ্‌ম বজায় রেখেছিল তা দেখানোর প্রয়োজন বোধ হয় ছিল। তাছাড়া অন্য চরিত্রের মন জয় করার যে ক্ষমতা কুমুদের চিরকালীন আয়ত্ত মতির পরিবর্তন ঘটার মধ্য দিয়ে যেন তার পূর্ণ সার্থকতা। স্বয়ং শশী অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বালিকার এই পরিবর্তনে বিস্মিত বোধ করেছিল। এই ভালোবাসার ক্ষমতার কাছেই যেন শশীর হার। আসলে দুটি অধ্যায় জুড়ে কুমুদ-মতির সুখী অথচ বেহিসেবী দাম্পত্য-জীবনের বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা মনে হয় এখানেই। কুমুদ চরিত্রের ভালোমন্দ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শশী পরিচিত ছিল। কখনো তার প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে আবার কখনো কুমুদের প্রতি শশীর অবজ্ঞাও এসেছে। 'কিন্তু মতির সুখে আনন্দে উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, মতির পুলকমন্থর গতিশ্রী দেখিয়া মাঝখানে কুমুদের সম্পর্কে যতটুকু অবজ্ঞা মনে আসিয়াছিল সব যেন আজ মুছিয়া যায়। কুমুদের জীবনের যা মূলমন্ত্র তার সন্ধান শশী কখনো পায় নাই।' এতদিনে শশী যেন সেই মূলমন্ত্রের সন্ধান পায়। যে ভালোবাসার জোরে কুমুদ মতিকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে শশীর জীবনে সেই জোরের একান্ত অভাব। তাই নিজের সম্পর্কেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সে পারে না। কুমুদের বিপরীতে শশীর এই অবস্থানটুকু দেখানোর জন্যই কুমুদ-মতির দাম্পত্যজীবনের এত বিস্তৃত বর্ণনা। প্রয়োজন মেটার পরেই কাহিনি থেকে তাদের স্থায়ী অন্তর্ধান। তাদের পরবর্তী জীবনকাহিনি উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলেই 'ওদের কথা এইখানেই শেষ হইল।'

৮.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। উপকাহিনি কাকে বলে?

২। উপন্যাসে কুমুদ মতির কাহিনি যোগ করার যুক্তিকতা কোথায়?

৩। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব নির্দেশ করো।

একক ৮

কুসুম চরিত্র

বিন্যাসক্রম

৮.২.৮.১ : কুসুম চরিত্র

৮.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৮.১ : কুসুম চরিত্র

'পদ্মানদীর মাঝি'-র কপিলা এবং কুসুমের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করেছি। দুটি চরিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্যের কথাও সেখানে বলা হয়েছে। দুজনেরই বর্হিজীবন এবং অন্তর্জীবন পৃথক সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়। দুই বিবাহিত রমণী নিজেদের সংসার বা স্বামীর সাহচর্যে থেকেও ঘরের বাইরে পা বাড়াতে চায়। কপিলা শেষ পর্যন্ত সব কিছু ছেড়ে কুবেরের সঙ্গে নৌকোয় ওঠে, এ ব্যাপারে কুবেরের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল। কিন্তু শশী কখনোই কুসুম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, নিজের মনের কাছেও সে পরিষ্কার ছিল না। শশীর সঙ্গে কুসুমের পরিচয় তার বন্ধু পরাণের সঙ্গে তার বিবাহের পর থেকে। পারিবারিক চিকিৎসা উপলক্ষে তাদের বাড়িতে তার যাতায়াত। কিন্তু কখন যেন কুসুমের মনের কাছাকাছি সে চলে আসে। প্রণয়পর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে অভিমান। শশী তাকে 'পরাণের বৌ' বলে ডাকলে কুসুমের অভিমান হয়। অসুস্থ মতির শরীর ডাক্তার হিসেবে পরীক্ষা করার সময়ও কুসুমের কথায় খোঁচা থাকে। ছোটবাবুর প্রতি মতির দুর্বলতা দেখা দিলে কুমুদের কণ্ঠে তীব্র তিরস্কার শোনা যায়,' ''পেটে ভাত জোটে না। গয়লার মুখ্যু মেয়ে তুই-ছোটবাবুর তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কি।" একথা বলবার সময় কুসুম বোধ হয় ভুলে যায় যে, সে-ও ওই বাড়িরই বৌ। ছোটবাবুর দিকে একই কারণে তারও হাত বাড়ানোয় বাধা আছে। তবে একথাও ঠিক যে, কুসুম তুলনায় ধনী পরিবারের সন্তান। তার স্বামী-শ্বশুরের প্রায় সর্বস্ব তার বাবার কাছে প্রায় সাত বছর ধরে বাঁধা আছে। তাই কুসুমকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তাকে সমীহ করে চলে। এই সামাজিক ও আর্থিক পার্থক্যই কুসুমের ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক হয়েছে। গাওদিয়ার গ্রামীণ সমাজ বা অনুশাসন তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাছাড়া স্বামী পরাণের সমস্ত ব্যাপারে শশী নির্ভরতাও বোধ হয় কুসুমের কাছে শশীর গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

> *'পদ্মানদীর মাঝি'-র কপিলা এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কুসুম দুই বিবাহিত রমনী স্বামীর সাহচর্যে থেকেও ঘরের বাইরে পা বাড়াতে চায়। শশীর সঙ্গে কুসুমের পরিচয় তার বন্ধু পরাণের সঙ্গে তার বিবাহের পর থেকে। কুসুম ধনী পরিবারের সন্তান, তাই সামাজিক ও আর্থিক পার্থক্যই কুসুমের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়েছে। মানিকের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে প্রায়ই মনের কথা বলতে শোনা যায়। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই কুসুমের নানা রঙের বিচ্ছুরণ। তার ঘনঘন আচরণের পরিবর্তন, মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠা-সবই তো মনের খেলা। শরীর শুধু উপলক্ষ মাত্র।*

শশী-কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে কুসুম শশীর কাছ থেকে সাড়া পাবার জন্য আকুল প্রতীক্ষায় থাকে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট ইঙ্গিতও সে দেয়, ''আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?'' বাপের বাড়ি যাওয়া ঠেকানোর জন্য ইচ্ছে করে তালপুকুরের ধারে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙে এবং কোমরে চোট লাগায়। শশীর কাছে এই ছলনা ধরা পড়ে গেলে সে বলেই ফেলে যে,''সইতে পারি না ছোটবাবু।'' শশীর অদর্শন বেশিদিন সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে শশী তাকে উপদেশ দিয়ে সচেতন করতে চায় তখনই কুসুম যেন নিজেকে ফের গুটিয়ে নেয়। এই গুটিয়েপড়া কুসুম তখন যেন দুর্বোধ্য চরিত্র হয়ে পড়ে। সেই দুর্বোধ্যতার আবরণ ভেদ করা শশীর পক্ষেও তখন সম্ভব হয় না। নারী চরিত্রগুলিকে মানিকের উপন্যাসে প্রায়ই মনের কথা বলতে শোনা যায়। তাদের অবচেতন মনই যে তাদের মাঝে মাঝে পরিচালিত করে তা স্বীকার করতেও তাদের দ্বিধা নেই। হেরম্বকে আনন্দ বলেছিল, ''মন বুঝি খালি আপনারই খারাপ হতে জানে? সংসারে আর কারো বুঝি মন নেই?'' কুবের তো একসময় হতাশ হয়েই ভেবেছে ''না, কপিলার মনের হদিস পাইবার ভরসা তাহার আর নাই। কখন কী বলিবে, কখন কী করিবে, কিছুই অনুমান করিতে পারা যায় না।'' ''তোমার মন নাই কুসুম'-শশীর এই স্বগতোক্তিটি বিখ্যাত হয়ে আছে, কিন্তু এটিকে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ সমগ্র উপন্যাসটি জুড়েই তো কুসুমের মনের নানা রঙের বিচ্ছুরণ। তার ঘনঘন আচরণের পরিবর্তন, মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠা-সবই তো মনের খেলা। শরীর উপলক্ষ মাত্র। শশীর কাছে দাঁড়ালে কুসুমের মন চরম বিচলিত হয়ে উঠত। যেদিন সেই মনই নষ্ট হয়ে গেল সেদিন থেকেই যেন কুসুম স্বাভাবিক। তখন সে আর শশীর প্রেমিকা নেই, সে হয়ে ওঠে পরাণের বৌ, ''বাকী জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আর কোন আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম। এতদিনে বুঝতে পেরেছি সেটি।'' নিখুঁত শিল্পসম্মত মানবিক পরিণতি।

''শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ''—এ কথায় সত্যতা আর একবার বোঝা যায় যাদব পণ্ডিতের কাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে। এই কাহিনিটিকে মানুষের দৃঢ় ও জটিল মনস্তত্ত্বের অসাধারণ প্রকাশ বলে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত। মানুষের অবচেতন মন তাকে নিয়ে কিরকম খেলা করে, তাকে শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যাদবের পরিণতি তারই উদাহরণ। বিদ্যা যাদবের বেশি ছিল না। কিন্তু ধার্মিক এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবেই গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠা। এই শক্তির কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন আগে দেখা যায় নি, তবে অনেকেই বিশ্বাস করে যে, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। যাদব নিজে স্পষ্টভাবে তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা স্বীকারও করেন না। আবার তাঁকে নিয়ে গ্রামের লোকের উচ্ছাসের কোনো প্রতিবাদও করেন না। এতে তাঁর প্রতি গ্রামবাসীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আরও বাড়ে। বোঝাই যায় যে, এটা যাদবের এক ধরনের মোহ, এই মোহটুকুই তাঁর গৌরব। আর যে কোনো মূল্যে এই গৌরবটুকু তিনি টিকিয়ে রাখতে চান।

যাদব নিজে এমন একটা ভাণ করেন যে, জীবন মরণ তার কাছে যেন তুচ্ছ। অথচ, শশীর মোহমুক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মৃত্যুভয় ধরা পড়ে যায়। সাপের কামড় এড়ানোর জন্য তিনি লাঠির শব্দ করে পথ চলেন। যাদব নিজেকে সূর্যবিজ্ঞানে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, শশীর চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁর কাছে পরিত্যজ্য। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই

শশীর প্রতি প্রবল স্নেহ ও মমতা। বিশেষ করে যাদবের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল শশীর কাছ থেকে তার অলৌকিক শক্তির স্বীকৃতি আদায় করা। এই গৃহী সাধক লোকের ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র সিদ্ধপুরুষ বলে তাঁর চারদিকে নাম রটে গেছে, কিন্তু শশীর আস্থা তিনি লাভ করেন নি। আসলে শশী কোনো কিছুকে যাচাই না করে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাই যাদবের অনেক আচরণের মধ্যকার ফাঁকটি সে যেন ধরে ফেলে। যাদবের জনমত সম্পর্কে আপাত নিরাসক্তি শশীর কাছে লোকের মনে শ্রদ্ধা ও ভয় জাগানোর কৌশল বলে মনে হয়। শশীর মনোভাব যাদবেরও জানা। তাই বোধ তার বিশ্বাস অর্জনের জন্যই তিনি রথের দিন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবার কথা ঘোষণা করে দেন। এটি লোকমুখে পল্লবিত হতে হতে দাঁড়িয়ে যায় আগামী রথের দিন। এই কথা ছড়াতে ছড়াতে যেন প্রকৃতই গণ হিস্টিরিয়া তৈরি হয়। যাদবের আর তখন ফেরার উপায় থাকে না। কেবল চিকিৎসক শশীর চোখেই ধরা পড়ে যে, যাদব পণ্ডিত এবং পাগলদিদি নির্দিষ্ট দিনেই দেহত্যাগ করবেন বটে কিন্তু তাদের শরীরে আফিঙের বিষক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। এই ঘটনার বিশ্লেষণেও মানিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। মানব-মনস্তত্ত্বের জটিলতাই তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়। তাঁর শিল্পীসত্তা এক্ষেত্রেও নিজের পথ ধরেই চলে। শশীকে দিয়ে যাদবের মৃত্যুর আসল কারণটি গ্রামের মানুষকে জানিয়ে দিয়ে সস্তা হাততালি পাবার প্রলোভন তিনি অনায়াসে ত্যাগ করেন। তাঁর জানা আছে যে, জীবন কখনো সোজা পথ ধরে চলে না। তাই তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ‘‘সত্যি মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ।” সাধারণ মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। যা ঘটবার নয়, যা চোখে দেখা যায় না তাই দেখবার জন্য তারা উদগ্রীব। ‘বিসর্জন’ নাটকের রঘুপতি এই গণ-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জয়সিংহকে আক্ষেপ করে বলেছিল যে, এরা, ‘‘চোখে চাহে দেখিবারে চোখে যাহা দেখিবার নয়।” গাওদিয়ার লোকেরা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে, যাদব রথের দিনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন। স্বেচ্ছামৃত্যু যে বরণ করা যায় না, এই সত্যটি মানতে তারা রাজি নয়। তাই যাদব আফিঙ খেয়ে নিজের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

৮.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কুসুম চরিত্রের মানবিক পরিণতি কোথায়?

২। কুসুমের স্বামীর নাম কি?

৩। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ অনুসরণে কুসুম চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

৪। ‘সুখী দাম্পত্যজীবনের অনুপস্থিতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য’—এই বিশিষ্টতা ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসকে কতখানি অনন্যতা দান করেছে তা উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৮.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

পর্যায় গ্রন্থ-২ এর প্রতিটি এককে (১-৪) নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কথা—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস—অশ্রুকুমার সিকদার।

৪। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপধ্যায়—যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত

৫। কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

আরণ্যক

একক ৯

আরণ্যক লেখক পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৮.৩.৯.১ : আরণ্যক লেখক পরিচয়

৮.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.৯.১ : আরণ্যক লেখক পরিচয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৩ সালে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার অক্ষয়কুমার ঘোষের বাড়ির একান্ত সচিব ও গৃহশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরের বছর তিনি অক্ষয়বাবুর ভাগলপুরে স্থিত পাথুরিয়াঘাটার জমিদারি এস্টেটে সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। এই জমিদারিতে বিভূতিভূষণ ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। পাথুরিয়া এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে ইসলামপুর এবং আজমাবাদের আরণ্যক পরিবেশে চার বছর থাকার সময় বিভূতিভূষণ ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বিস্তীর্ণ আরণ্যক অঞ্চলের প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবং সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাই তাঁকে 'আরণ্যক' রচনার পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর লেখা দিনলিপিতে আছে---''এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো অন্ধকার— এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়িপথটা ভিটেটোলার বাগানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐ রকম সুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে ঘোরা, এ দেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই virile active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এই সব"। 'আরণ্যক' উপন্যাসের পটভূমি যে বাস্তব, তা তিনি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন—''আরণ্যকের পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এইরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বনপাহাড় তো বিখ্যাত"।

বিভূতিভূষণ চারবছর ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বিস্তীর্ণ আরণ্যক অঞ্চলের প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবং সাধারণ নারীপুরুষদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাই 'আরণ্যক' রচনার পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত করেন। উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণের নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যময় জীবন ও প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষদের স্মৃতি সত্যচরণকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এমনকি জীবন ও জগৎ বিভূতিভূষণের রচনাত্মার আত্মকৌশল যা তাঁর সামগ্রিক সত্ত্বাকে বিকশিত করেছে।

ভাগলপুরে অবস্থানের সময় অরণ্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে চিত্রায়িত করেছেন। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে উপন্যাসের বহু ঘটনার সমাবেশ ও উৎস লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'আরণ্যক'-এর একটি গ্রাম্যমেলার চিত্র। উপন্যাসে বর্ণিত মেলার ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতো, দেহাতী মেয়েদের কান্না বা সত্য চরণের মেলায় একটি লোকের বিনম্র মুখশ্রীতে মুগ্ধচিত্ততা বা মুক্ত প্রান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া। সাহিত্য ও ভ্রমণকাহিনীর অনুরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে লেখকের বিশেষ কৌতূহল ও চর্চা ছিল। প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভূতিভূষণের আগ্রহ ও অনুশীলন উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের চিন্তাভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ "অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র-প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানির মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিতাম।....এই বালুপ্রান্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদদের চোখে পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না। যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, যে কোনো মিউজয়মে গেলে দেখা যায়"। এই দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভাবনার উৎস বিধৃত হয়েছে 'স্মৃতির রেখায়'—প্রাচীন যুগের অধুনাতমলুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকতেন। তাদের মাথায় উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্তনশীল মেঘস্তূপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব প্রাচীন আদিম যুগের লতাপাতা, জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত।"

বিভূতিভূষণের অপর একটি ডায়েরি-জাতীয় রচনা 'উৎকর্ণ'-এর মধ্যে অরণ্যের সৌন্দর্য যে কীভাবে তাঁর মননশীল অনুভূতি রোমাণ্টিকতায় উদ্বেলিত হয়েছিল তার পরিচয় পাই এইভাবে —"১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্যের ঘোর, এখনও আমার সে ঘোর কাটে নি, বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েছে"। অরণ্যবাসের সময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রির সৌন্দর্য উপভোগের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁর স্মৃতিচারণজাতীয় রচনা 'তৃণাঙ্কুর'-এ দৃষ্ট হয়" আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপার্থিব, Weired beauty....সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ গাছ... স্বপ্নে যেন দেখি" ইত্যাদি। আলোচ্য উপন্যাসে এইভাবে রূপান্তরিত হয়েছে : "নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথ রাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্তভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথের জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা, পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না।"

আবার, উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণের নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য পাই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী 'স্মৃতির রেখা'র দিনলিপিতে—" অভিজ্ঞতায় একটা বুঝলাম, আজ স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যতদিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হতে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫

সালেও) সভ্যজগতের প্রান্ত ভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে বলে কষ্ট হচ্ছে।" অনুরূপভাবে 'আরণ্যক'—এর নায়ক সত্যচরণের অরণ্য বাসকালে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা এইরকম—"প্রথম দিন দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ জীবন আমার জন্য নয়।" সেই সত্যচরণই পর এই অরণ্যময় জীবন ও প্রকৃতি এবং সেখানকার অতি সাধারণ মানুষদের স্মৃতি তাকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে চিত্রায়িত চরিত্রগুলি অর্থাৎ রামচন্দ্র আমীন, রাসবিহারী সিং, গোষ্ঠবাবু মুহুরী, ছটু সিং, জয়পাল কুমার, আসরফি টিণ্ডেল, পণ্ডিত মটুকনাথ, রাখাল ডাক্তারের স্ত্রী—লেখকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই অঙ্কিত। "স্মৃতির রেখা'য় উক্ত নামেই চরিত্রগুলির বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি। দিনলিপিতে মটুকনাথের উল্লেখ আছে এইভাবে—"রাখালবাবু মারা গিয়েছেন শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তার বাড়ী তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম।....এর ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা বাড়ীর কাছে এলে, একটা ফর্সা মতো ছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কেউ নেই। সেখানে দেখি, মটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই মটুকনাথ—যে তৌজির দিন কাছারি গিয়ে কানের পোকা বার করবার যোগাড় করেছিল।" আর ১৯২৮ সালের ৭ই জানুয়ারীর দিনলিপিতে দেখি—"বাঁধ ছাড়িয়েই এক দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিং-এর টোলার অশ্বত্থ গাছটার কাছ পর্যন্ত।" এছাড়াও পাই, "ঈশ্বর ঝা পূজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম," বা রামচন্দ্র সিং আমিনকে আমার বড় ভাল লাগে। এরা জঙ্গলের ধারে থাকে,"—"ছটুসিং এর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল" ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে ডায়েরি জাতীয় রচনা 'উৎকর্ণ'-এ লেখক তাঁর গ্রামে প্রকৃতির যে নিবিড় সান্নিধ্য এবং তার রূপ-রস -গন্ধের স্পর্শ অনুভব করেছিলেন, 'আরণ্যক'-এ সেটিও আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে—"আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বলে, কেঁয়োঝাঁকা ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলাম। কি নীরব শান্তি, কি পাখীর কাকলী, কি বনফুলের সুবাস।" লেখক একটি বর্ণনা দিচ্ছেন সুন্দরভাবে—"আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে 'আরণ্যক'—এর একটা অধ্যায় লিখচি। লেখবার জন্যেই এই জায়গাটাতে এসেছি। ভারী সুন্দর বন-কুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশী। আমার মাথার উপরে থোকা থোকা ফুলে ভরা ডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখচি, জলার পাখীর দল কি অবাধ কুজন শুরু করেছে, গন্ধটা আরও ঘন হয়েছে। ওপরে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের শীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে।"

জীবন ও জগৎ বিভূতিভূষণের রচনাত্মার আত্মকৌশল যা তাঁর সামগ্রিক সত্ত্বাকে বিকশিত করেছে। "বিভূতিভূষণের অনন্ত-ভাবনার একদিকে যেমন দিগন্তহারা দেশ, অপরদিকে তেমনি উধাও কাল। দিশাহারা দেশের চেয়ে কালের চেতনাকেই বিভূতিভূষণ অতিরিক্ত কৌতূহলাক্রান্ত।" জীবনের মধ্য দিয়ে জাগতিক চেতনা তিনি উপন্যাসের মধ্যে যত্রতত্র উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আরণ্যক'-এর পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে—"এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যে দেখিয়াছি। এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজুপাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়

পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবাই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত-তাঁরই আর্শীবাদ আজিকার এই নবনীল নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনাননগ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে-বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই— এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন...।”

প্রকৃতপক্ষে, ‘আরণ্যক’-এ বিভূতিভূষণের ব্যক্তি ও শিল্পীসত্তা—এই দ্বৈতমিলন সংঘটিত হয়েছে। আজমাবাদ-ইসলামপুরে অরণ্যবাসকালীন ব্যক্তিগত কাহিনী তিনি উপন্যাসে আত্মস্মৃতিমূলক আঙ্গিকে বিধৃত করেছেন। ফলস্বরূপ ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে রূপকল্পনার নিবিড় সঙ্গতিতে পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

৮.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আরণ্যক উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২। বিভূতিভূষণ কোথাকার প্রকৃতির রূপকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন?

৩। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

একক ১০

বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

বিন্যাসক্রম

৮.৩.১০.১ : বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

৮.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১০.১ : বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ ‘‘বিভূতিভূষণ আর সমস্ত সার্থক-কর্ম দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকের মত এই দুইটি প্রধান বিষয় বা বস্তু নিয়েই তাঁর যা কিছু বলবার বলে গিয়েছেন। সে দুইটি বিষয় হচ্ছে—(১) প্রকৃতি, আর (২) মানুষ। Nature and Man : মানুষের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা, যা পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যেই সীমিত, তা এই দুইটির বাইরে আর কোথাও ঠাঁই পায় না। প্রকৃতি আর মানুষের পিছনে, তার আধার বা পটভূমিকারূপে অবস্থিত একটা Ultimate Reality বা পরম বা চরম সত্তার সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনের গভীরে একটা আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ আছে। আবার সেই আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ অনেকের মনে বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে বিজড়িত, বিশ্বজগৎকে অতিক্রম ক'রে আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে অন্তর্নিহিত থেকে বিদ্যমান আর কার্যকর এক ঐশীশক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থার রূপ গ্রহণ করে থাকে। ... বিভূতিভূষণের চিত্ত আর অনুভূতি বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে, ভূমিশ্রীর সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। শিশুকাল থেকেই তিনি বাঙলার পল্লীশ্রীর মধ্যে এমনভবে মানুষ হয়েছিলেন। যে, সত্যই তিনি নিজের সত্তাকে নিজের আত্মাকে বনের মধ্যে গাছপালা নদনদী পাহাড় পর্বত ঝরণাটিলার মধ্যে যেন ঢেলে দিয়েছিলেন।” দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর অপূর্ব বই ‘রামায়ণী কথা'য় রামায়ণ অবলম্বন করে সীতার সম্বন্ধে যে লিখেছিলেন ‘‘বন-দর্শন বিস্মিতা প্রকৃতি-প্রিয়া সীতা হরিৎছদ্দ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন।’ আমরা ‘দিব্যোন্মাদ’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, তার অর্থ আর দ্যোতনা বুঝি, কিন্তু ‘বনোন্মাদ’, এই শব্দটিকে ‘দিব্যোন্মাদ’ শব্দের সঙ্গে এই পর্যায়ের-ই বলতে হয়, অরণ্যানীর সৌন্দর্যে, বনস্পতি-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-পত্র-পুষ্পের মধ্যে যে রসানুভবের উৎস আছে, সাধারণ জীবনের মধ্যেই তার উপলব্ধি আর সেইজন্য অপার্থিব আনন্দের এক পূর্ণ অনুভূতি, আর সেই অনুভূতির মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে

> *‘আরণ্যক’-এর প্রকৃতি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগত থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের দুটি প্রধান বিষয় প্রকৃতি আর মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রাম বাঙলার প্রকৃতির বাস্তব অনুপুঙ্খকে রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, কল্পনা ও নিগূঢ় আত্মিক অনুভূতিতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটিই বিভূতিভূষণের অভিপ্রেত। বাংলা কথাসহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে বিভূতিভূষণই রবীন্দ্র-প্রভাবিত হন সর্বাধিক পরিমাণে। প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধনের ছবি বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ইংরেজী রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মধ্যেও প্রভাবিত। যাইহোক আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণরূপে বিরাজিত।*

অবস্থিত পরমসত্তার আভাস—এ সমস্ত যেন 'বনোন্মাদ' শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে। বিভূতিভূষণকে এই ভাবের বনজঙ্গল, গাছপালা, তরুলতা, ফুলফল, জলপাহাড় নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকা, একপ্রকারের দিব্যোন্মাদে ভরপুর আত্মভোলা মানুষ ছাড়া আর কিছু আমার মনে হয় না। মানুষের প্রতি তাঁর দরদ অসীম, কিন্তু সেই মানুষকে তিনি তার প্রকৃতির আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত নন,"... এবং ...." অবশ্য স্থূলভাবে দেখলেও, আমরা বলবো বিভূতিভূষণের , সাহিত্যিক প্রতিভার মুখ্যকথা হচ্ছে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর একটা পূর্ণ আর সমগ্র অনুভূতি। ভাল-মন্দ সুন্দর অসুন্দর আলো—অন্ধকার রমণীয়তা ভীষণতা সব কিছু নিয়ে আমাদের মহীয়সী মহা সুবিস্তীর্ণ পৃথিবী, বিশ্বন্ধরা ধরিত্রী, আর ধরিত্রীর কোলে সকলের উৎপত্তিস্থল মাতা ভূমির কোলে যে গাছপালা, বন-অরণ্য নদ-নদী পাহাড়-পর্বত খদ্-টিলা পশু পক্ষী আর বনবাসী মানুষ রয়েছে, সে সমস্তের সম্বন্ধে তাঁর মনে কে সদা-জাগ্রত অনুভূতি আর আনন্দ, সে সমস্তের প্রতি তাঁর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর সহানুভূতিপূর্ণ অবলোকন"।

'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগত থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখকের বিবৃতি আছে...''এত নির্জ্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্য্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাট ও দীর্ঘঘাসের বনশীর্ষে সিঁদুরের রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি-ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহা সমস্যা।"গ্রাম বাঙলার প্রকৃতির বাস্তব অনুপুঙ্খকে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, কল্পনা ও নিগূঢ় আত্মিক অনুভূতিতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেটিই বিভূতিভূষণের অভিপ্রেত।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল 'স্মৃতির রেখা'র দিনলিপিতে ভাগলপুরে থাকার সময় অরণ্যজগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিনগুলিতে বিভূতিভূষণ নিসর্গচেতনার মূল বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে দেখেছেন, ''জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময় নক্ষত্র, সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না রাত্রি। অস্তসূর্য্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য—এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অব্যক্ত আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান পৌঁছায় না।" অন্যত্র বিভূতিভূষণ যখন প্রকৃতির রূপবর্ণনা করেন, তখন তা হয়ে ওঠে অসীমের ধ্যান—''ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব নীলরং দেখাচ্ছে। ডানদিকে লাল রং-য়ের অস্ত-আকাশ-উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্তমেঘ নীল পাহাড়, ঢালু দুর্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরাফুলের ঝোপ, পড় পাকুড় গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে-বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, সিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।"

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগসান্নিধ্য বাংলাসাহিত্যে সাফল্য ও ব্যাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ অনন্য হলেও বিহারীলালই পথ প্রদর্শক। বিহারীলাল প্রদর্শিত পথেই রবীন্দ্রনাথ যেমন, তেমনি রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠী এই ধারা অনুসরণ করেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে বিভূতিভূষণই রবীন্দ্র-প্রভাবিত হন সর্বাধিক পরিমাণে। ''বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুলতার ও রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, সে সন্ধান বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতিবোধের অন্যতম উৎস-সন্ধান। 'আরণ্যক' গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রকৃতির

বিশালতা ও রহস্যময়তার চিত্রকল্প আমরা লক্ষ্য করি-“ যে কথাটা বার বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কোনবারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্ ছম্ করানো সৌন্দর্যের দিকটা....। জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্ত-ব্যাপী দীর্ঘ ঘন ঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ বিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত-নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।”

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যেমন আমরা লক্ষ্য করি, ইংরেজী রোমাণ্টিক কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মধ্যেও ঐ একই সরের স্পর্শ পাই। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কল্পনায় মানুষের বসতির পাশে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে তা যেমনই মধুর, তেমনি বিষাদঘন। 'Lucy Gray' কবিতাংশে আছে—

"The Sweetest that ever grew
Beside a human door."

আবার প্রকৃতির মধ্যেও তিনি এই গান শুনেছেন,

" I have learned
To look on nature, not as in the hour
of thoughtless youth, but hearing often times
The still, and music of humanity."

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি এক পরম বিস্ময়ের, অপরদিকে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের দৃষ্টিতে প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠেছে নীতিবাদী শিক্ষক। নৈসর্গিক চেতনাবাদীরমত বিভূতিভূষণ অরণ্যপ্রান্তর ও গাছপালার বিশদ বিবরণ বর্ণনা করেছেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থে তা সত্যই দুর্লভ। তিনি তাঁর দিনলিপিতে (তৃণাঙ্কুর) লিখেছেন—“এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে।” ইংরেজী সাহিত্যে হাডসনও বলেছেন যে, আকাশ, মাটি, নক্ষত্র, পশুপক্ষী কোনো কিছুই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। ‘আরণ্যক’-এ সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ যে নিসর্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন, হাডসনও Green Mansions-এ অরণ্য প্রকৃতির চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণ ও হাডসন সমগোত্রীয়। ‘আরণ্যক’-এ প্রকৃতির রুক্ষ রূপ কোথাও কোথাও দেখা গেলেও সাধারণভাবে সেই প্রকৃতি কোমল মধুরে পরিণত হয়েছে। “বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যেমন সোঁদালিফুল, শিমুল, ডাঁসা খেজুর, সোনাডাঙা মাঠ, বৌ কথা কও, পাপিয়া— জীবনানন্দের কবিতায় তেমনি হিজলের ছায়া, বটের লাল ফল, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, বুনোহাঁস প্রভৃতির ভিড়। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন, চিত্রময়তাই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির এই চিত্ররূপময়তার ব্যাপারে বিভূতিভূষণের সঙ্গে জীবনানন্দের মিল আছে এবং এই মিল চিত্রের রূপের শুধু নয় সংগীতেরও মহলে”। ‘উৎকর্ণ’-এর একটি অংশে আছে-এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি হৃদয়হীন নয়, তা মানুষকে ভালবাসে, দয়া করে, দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। প্রকৃতির হৃদয়ে সাড়া জাগানোর একমাত্র উপায় প্রকৃতির সেবা। এই সেবা প্রকৃতিকে উপভোগ করার মধ্যে। ‘আরণ্যক’ এর অষ্টম

পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিভূতিভূষণ একটি রসগ্রাহী মন্তব্য করেছেন—''অনেকদিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। ...অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নতুন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।"

'আরণ্যক'-এ নিসর্গচেতনা সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন—''...ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন আরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতি ঋতুতে, দিবারাত্রির প্রহরে প্রহরে, জ্যোৎস্না-অন্ধকারের বিভিন্ন পটভূমিকায়, পরিবর্তনশীল রূপ ও সূক্ষ্ম আবেদন আশ্চর্যরূপ বস্তু নিষ্ঠা ও কাব্যব্যঞ্জনার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহার সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর, অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে। প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল লেখক কত নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জনহীন, বিশাল, আরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্নারাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্নভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে—ইহা কখনও পুরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে। তেমনি নিঃস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে যাহাকে বলে Cosmic imagination তাহাকেই—স্ফুরিত করিয়াছে, কল্পনাকে সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ-শিহরণ, ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আবার আদিম, আরণ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ একদিকে বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা ট্যাঁড়বারোদেবের কল্পনাকে রূপ দিয়াছে, অন্যদিকে কেবলমাত্র শিক্ষিত মনের পক্ষেই যাহার ধারণা করা সম্ভব সেই যুগ যুগান্ত-প্রসারিত ঐতিহাসিক কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যানতন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।"

উপসংহারে বলা যায় উপন্যাসে আরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনও একাকার হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। ''আরণ্যক"—এর প্রকৃতি আর মানুষ অরণ্যসত্তারই নিগূঢ় রসে-ফোটা একই বৃন্তের দুটি ফুল। কেউ কারও উদাহরণ নয়, রূপক নয়। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট। তবে বিরোধী হয়ত নয়। সত্তার যে নিগূঢ় রসে 'ডামাবাণু' জীবন্ত হয়ে মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরে ফেলে, সেই রসেই রাসবিহারী সিং, নন্দলাল গাঙ্গোতা প্রজাদের সর্বনাশ করে। যে প্রাণরসে বসন্তে মাঠে মাঠে দুধলিফুল ফোটে, সেই রসেই ভানুমতী ফোটে, ধাতুরিয়াও ঝড়ে পড়ে। হিংস্রতায়—অতিপ্রাকৃতে, মমতায়—উদাসীনতায় আদিম প্রকৃতি আর মানুষ যেমন জীবন্ত তেমনি রহস্যময়। আর এই দুইকে নিয়ে অরণ্যসত্তার পূর্ণ পরিচয়—তার প্রাণস্পন্দনের স্পর্শ। তর্কের খাতিরে অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায়, মানুষ তো অরণ্যসত্তার আদিমতা বা সরলতার উদাহরণ হতে পারে। উত্তরে বলা চলে, উদাহরণ হলেও সে উদাহরণ জীবন্ত এবং মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। কোথাও আরোপিত নয়, সেইজন্য 'আরণ্যক'—এর অধিকাংশ চরিত্রই ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। তবে তারা সভ্যতা, নাগরিকতা থেকে বহুদূরে আদিম অরণ্যের অধিবাসী বলে তাদের জীবনে চেতনার সংঘর্ষ ও অস্তিত্বের আর্তনাদ নেই।"

৮.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'আরণ্যক' উপন্যাস অবলম্বনে বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনার পরিচয় দাও।

২। 'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্রসৃজনে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৩। 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতি ও মানবজীবন কীভাবে অভিন্নতা লাভ করেছে তা উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

একক ১১

'আরণ্যক'-এর গোত্রবিচার

বিন্যাসক্রম

৮.৩.১১.১ : 'আরণ্যক'-এর গোত্রবিচার

৮.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১১.১ : 'আরণ্যক'-এর গোত্রবিচার

'আরণ্যক'-এর ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন, ''ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে-উপন্যাস''। লেখকের যে-অভিপ্রায় উপন্যাসের মধ্যে লক্ষিত হয়, ভ্রমণ-কাহিনী বা ডায়েরীতে তা অনুপস্থিত। দিনলিপি বা ডায়েরীতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করা হয়। গ্রন্থটি কিছুটা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর মত, 'প্রস্তাবনা' অংশের পর প্রথম পরিচ্ছেদে উত্তম পুরুষ 'আমি'—রূপে যে ব্যক্তি কাহিনী-কথকের ভূমিকা নিয়েছে, সেই সত্যচরণ লেখকের একটি কাল্পনিক চরিত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর কথকের মত লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিরূপের প্রতিফলন নয়। প্রসঙ্গত, বিভূতিভূষণ নিজেই তাঁর জবানীতে বলেছেন—''মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিতপক্ক, জম্বু ফলের গন্ধে গোদাবরী তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 'আরণ্যক' সেই কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে-উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য''। অপর একটি অংশে তিনি লিখেছেন—''তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশীনদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত''। লেখকের উক্তি থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যেতে পারে যে, 'আরণ্যক' ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নয়। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাল্পনিক কাহিনী হলেও পটভূমিগত বাস্তবতা সম্পর্কেও লেখক পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। সাধারণভাবে কোন উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, সংলাপ, পরিবেশ যতই লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হোক না কেন, তাদের সঙ্গে লেখকের একটা প্রচ্ছদ দূরত্ব ও ব্যবধান থাকে। এ বিষয়ে লেখকও পাঠকসমাজ সচেতন থাকেন সমভাবে, অথচ বিভূতিভূষণ এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে রচনার উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার সম্পর্কও তিনি বিস্মৃত হননি। ফলে পাঠকদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানবচরিত্রকে প্রকাশ করেছেন নিঃসঙ্কোচে।

> *'আরণ্যক'-এর ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন—"ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে উপন্যাস।'' একথা ঠিক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী কোনটির মতই 'আরণ্যক' বিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত নয়, উপন্যাসের মতই তা সম্পূর্ণ। উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির কথায় যেমন আদি মধ্য অন্ত নাই, মানুষের কথারও তেমন এখানে আদি মধ্য অন্ত নাই। প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া যে জগৎ, তাহার একটা পরিপূর্ণতা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের এই পরিপূর্ণতা উপন্যাসের এক বিশেষ লক্ষণ।*

'আরণ্যক'-এর গোত্রবিচার করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ''বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য'' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—''এই শ্রেণি নির্দেশ ভ্রমণবৃত্তান্তের বা ডায়েরীর শ্রেণি থেকে গ্রন্থটিকে পৃথক করার জন্য হলেও তা সাধারণ ও শিথিল নির্দেশ। ফুলকিয়া, লবটুলিয়া বইহার, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্ট ভ্রমণের বৃত্তান্ত ও দিনলিপিকারের গহন অনুভূতি বইটিতে থাকায় বিভূতিভূষণ গ্রন্থটির শ্রেণি নিয়ে যে বিতর্কের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তাকেই এড়ানোর জন্য বলেছেন, যেহেতু বানান গল্প বা কল্পনালোকের বিবরণই হচ্ছে উপন্যাস—'আরণ্যক' তাই উপন্যাস, অন্য কিছু নয়। একথা ঠিক, ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী কোনটির মতই 'আরণ্যক' বিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত নয়, উপন্যাসের মতই তা সম্পূর্ণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত বা দিনলিপি কোনটির আঙ্গিকেই গ্রন্থটি লিখিত নয়। তবু বানান গল্প বা কল্পনালোকের বিবরণ মাত্রেই উপন্যাস নয়। উপন্যাসের বহিরঙ্গের সম্পূর্ণতা অর্থাৎ ঘটনার অখণ্ডতা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবই এতে আছে, কিন্তু উপন্যাসে জীবনের জটিলতার ও মহত্ত্বের যে ব্যাপক ও গভীর ধারণা থাকে তা 'আরণ্যক'-এ কোথায়? জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব মানেই মানুষের জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব। কিন্তু 'আরণ্যক'-এ রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, ভানুমতী, কুন্তা এমন কি এদের গ্রথিত করেছে যে সত্যচরণ এরা কেউই প্রধান নয়, অরণ্যই প্রধান—অমূর্ত অরণ্যসত্তার পরিচয় এইসব মূর্ত মানুষের স্পর্শে বোঝা যায়''।

''আরণ্যক''-এর কাহিনীতে উপন্যাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জটিলতা নেই, নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহিঃশক্তির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কোনো সংকটের ক্রম-উন্মোচনে নাটকীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়নি, এমনকি কাহিনীর বা চরিত্রের উত্থানপতন ও ক্রমবিকাশও আমরা দেখি না। প্রকৃতপক্ষে 'আরণ্যক' লেখকের স্মৃতিচিত্র, বিভিন্ন ঋতুতে অরণ্যপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ, জ্যোৎস্নাময় নিশীথে তার অপার্থিব সৌন্দর্য, তৃণপ্রান্তর অথবা যেমন প্রকৃতির রূপ হয়ে ওঠে শান্ত ও স্নিগ্ধ, তেমনি তার ভয়াল রূপও দুর্লভ নয়। রাজু পাঁড়ে, ধাতুরিয়া, মহাজন ধাওতাল সাহু, মটুকনাথ, যুগলপ্রসাদ, বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, কুন্তা, মঞ্চী, রাজা দোবরু পান্না এবং ভানুমতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রকৃতি ও মানুষের দৃশ্যমালিকায় গঠিত হয়েছে 'আরণ্যক'-এর অবয়ব। কথক সত্যচরণের স্মৃতিচারণার দৃশ্যগুলি অসংলগ্ন না হয়ে স্রষ্টার ভাবদৃষ্টির সমগ্রতায় পরিপূর্ণ। এই কারণেই 'আরণ্যক' উপন্যাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

ইতিহাসকে উপন্যাস রূপে লেখক কল্পনা করেছেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর 'স্মৃতির রেখায়' বিভূতিভূষণ লিখেছেন—''এই যুগ যুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্ মহাঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস। অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলাণ্টিক জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগ-শিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হোল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে ওর কথাও।'' এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রেক্ষিতেই বলা যায় ''আরণ্যক'' কাব্যিক-উপন্যাস। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন—''আরণ্যক শাস্ত্র বলতে আমরা বুঝি উপনিষদকে, এবং উপনিষদ শব্দের অর্থ রহস্যময়। বিভূতিভূষণ আমাদের জন্য এক নতুন উপনিষদ রচনা করে গেছেন। যে অধ্যাত্ম বা ভাবদৃষ্টি 'আরণ্যকের' সমস্ত বর্ণনা, দৃশ্য ও চরিত্র-চিত্রণকে সমগ্রতার ঐক্যসূত্রে বেঁধে রচনাটিকে উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে, সত্যচরণের এই উক্তিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঃ ''আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন তিনি যে শুধু প্রধান বিচারক, ন্যায় ও দন্তমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি

দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্তমেয় স্তুপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত, তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা —তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জেনর প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকাও সৃষ্টি করেন।”

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মদৃষ্টির আলোকেই অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষেরা বিশ্বপ্রাণের ছন্দোময় সৌন্দর্যের ঐক্যসূত্র একীভূত হয়। প্রকৃতির বিশাল-গম্ভীরতা যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ রূপ, তাদের মতোই এই দরিদ্র, ক্ষুদ্র মানুষগুলিও দেবতার সীমাহীন প্রেম ও আর্শীবাদের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ হিসাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়—“কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন্য কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, দরিদ্র-গৌড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আর্শীবাদ আজিকার এই নবনীল-নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, মুক্ত জীবনানন্দ তারই বাণী, অন্তরে অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোল।সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন অনন্ত তাঁর প্রেম ও আর্শীবাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।” ‘আরণ্যক’—এর সমগ্র বর্ণনায়, নায়ক চরিত্র সত্যচরণের চিন্তা ও কল্পনার প্রকাশে গীতিকবিতার সুর, ছন্দ ও সুষমাকে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। এই দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীই ‘আরণ্যক’-কে উপন্যাসের বিশিষ্ট রূপের সমগ্রতা দান করেছে। এই বিশিষ্ট রূপের উপন্যাসকে আমরা কাব্যিক-উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করি, ‘আরণ্যক’ সেই গোত্রেরই কাব্যিক উপন্যাস।

অতএব ‘আরণ্যক’ দিনলিপি বা ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনীর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যে উদ্দেশ্য উপন্যাসের মধ্যে অধিক পরিমাণেই থাকে। বিভূতিভূষণ দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু এই দেশভ্রমণের ফলে কেবল একটি দেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাড়া তাঁর মনের ও চরিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। দিনলিপি সেই গোত্রেরই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরিবেশন করা ছাড়া এর আর কোন তাৎপর্য নেই। অপরদিকে উপন্যাসে চরিত্রগুলি বিভিন্ন ঘটনার দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়। উপন্যাসের শুরুতে চরিত্রগুলি যে অবস্থায় থাকে, পরিণতিতে তাঁদের বিপরীতধর্মিতা দেখা যায়। আলোচ্য উপন্যাসে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হোল সত্যচরণ চরিত্র। শহর কলকাতা থেকে সত্যচরণ যে যাত্রা শুরু করেছিল ভাগলপুরে—কলকাতায় প্রত্যাগমনের সময় কিন্তু তার জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। ‘আরণ্যক’-রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ আছে—“কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বাংলাদেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।” আবার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখি—“এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম...ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে

উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেঙ্গাৎ গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।” অধ্যাপিকা চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—“এইভাবে সত্যচরণের মন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে, লেখকের বর্ণনাগুণে পরিবর্তনের পর্যায়গুলি স্পষ্ট। এজন্যই ‘আরণ্যক’ উপন্যাস। উপন্যাসের একটি মহৎ গুণ হোল, এটি অন্য নানা শ্রেণির রচনাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারে। যে গুণটি কাব্য, প্রবন্ধ বা নাটকে ততটা পাওয়া যায় না। সেজন্য দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনীর আকৃতি গ্রহণ করলেও ‘আরণ্যক’ দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনী থেকে পৃথক এবং উপন্যাস শ্রেণির। সত্যচরণ ভ্রমণকারী না হয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয়চরিত্র ও সত্যদ্রষ্টা হয়ে উঠেছে।”

‘আরণ্যক’ প্রসঙ্গে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অভিমত হোল—“ একখানি সার্থক উপন্যাসের কাহিনীর তিনটি বিশেষ গুণ—ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা। যে কাহিনীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র ব্যাপার স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, সে কাহিনী উপন্যাসের বস্তু হইতে পারে না। যেখানে বিষয়ের অল্পতা সেখানে উপন্যাসের বিস্তার নাই। দ্বিতীয়ত, যে কাহিনী জীবনের অন্তরালে প্রবেশ করে নাই সে কাহিনীকে সার্থক উপন্যাস বলে না। তৃতীয়ত, সার্থক উপন্যাসের কাহিনী এক অখণ্ড বস্তু, ইহাতে মানুষের ভাব, চিন্তা ও কর্মের বিচিত্রমুখিতা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুষম জগৎ পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। ইহার ছোট বড় ঘটনা ও চরিত্র, ইহার বিভিন্ন পরিবেশ, ক্রমশ মনুষ্যজীবনের একটি মহান সত্যকে উদঘাটিত করে। যে কাহিনীতে এই অখণ্ডতা নাই, সেই কাহিনীতে পরিণতিও নাই, অর্থাৎ সে কাহিনী অপরিণত। বস্তুত, কাহিনীর অখণ্ডতা মূলত উপন্যাসিকের দৃষ্টির অখণ্ডতা। কাহিনীর গতি ও পরিণতি উভয়ই এক অখণ্ড দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু ‘আরণ্যক’-এর কাহিনী কোথায়? ইহার নায়ক কে? ইহা কাহার ভাগ্যের কথা? ‘আরণ্যক’ বিশেষ একজনের কথা নয়—অনেকের কথা। সেই অনেক মানুষ লইয়াই এই উপন্যাসের ‘অদ্ভুত জীবনযাত্রার স্রোত।’ সেই স্রোতই এই উপন্যাসের কথাবস্তু। এই বিশিষ্ট কথাবস্তুর ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা War and Peace উপন্যাসের ঐ লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে গেলে গোল বাধিবে। অরণ্য ও অরণ্যের পরিবেশে লালিত জীবনের কথা War and Peace-এর সে-কাহিনী আশ্রয়ে বলা যাইবে না।War and Peace -এর জীবনধারা এক প্রবল ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই স্রোত আবার কখন আবর্ত বা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বা তাহা স্ফীত হইয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিতেছে, ইহার গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত-কখনও সরল, কখনও বক্র এবং ইহার মধ্যেই ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্য নির্দিষ্ট হইতেছে। এই স্রোত ‘ আরণ্যক’-এর স্রোত নয়। কিন্তু ‘আরণ্যকে’ কোন জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছে না কে বলিবে। এই স্রোতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বলিয়াছেন, যে ইহা ‘আপন মনে উপল বিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়ে ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে।” ‘আরণ্যক’ প্রমাণ করিল যে এই উপন্যাসও উপন্যাসের কথাবস্তু হইতে পারে। ... উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির কথার যেমন আদি মধ্য অন্ত নাই, মানুষের কথারও তেমন এখানে আদি মধ্য অন্ত নাই। অরণ্যের একটি গাছের যেমন কোন আলাদা ও পূর্ণ ইতিহাস নাই, কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া যে জগৎ, তাহার একটা পরিপূর্ণতা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের এই পরিপূর্ণতা উপন্যাসের এক বিশেষ লক্ষণ। ‘আরণ্যক’-এ এই বিষয়ের পরিপূর্ণতা লিরিক-সুলভ ভাবের পরিপূর্ণতার বড় কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে। ইহাতে ‘আরণ্যক’-এর উপন্যাসত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাকে এক লিরিক-ধর্মী উপন্যাসে পরিণত করিয়াছে।”

৮.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ডায়েরী কাকে বলে?

২। ভ্রমণ কাহিনী কাকে বলে?

৩। 'ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস'—বিভূতিভূষণের এই মন্তব্য 'আরণ্যক' উপন্যাস সম্পর্কে কতখানি সথ্য তা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

একক ১২

কথক সত্যচরণের ভূমিকা

বিন্যাসক্রম

৮.৩.১২.১ : কথক সত্যচরণের ভূমিকা

৮.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৩.১২.১ : কথক সত্যচরণের ভূমিকা

'আরণ্যক'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ নিজেই এই উপন্যাসের কথক। তার স্বগতোক্তিতে ও ভাবদৃষ্টির আলোকে অরণ্যের রূপ প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে পরিচিত কিছু নরনারীর খণ্ডকাহিনী দৃশ্যায়িত। প্রধানত সত্যচরণ এই কাহিনীর সূত্রধার তথা ভাষ্যকাররূপে অঙ্কিত এক বিশিষ্ট কাল্পনিক চরিত্র। সত্যচরণকে বহু সমালোচক বিভূতিভূষণেরই প্রতিচ্ছায়া বলে মনে করেন। লক্ষ্য করা যাবে—প্রকৃতি চেতনা, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকল্পনা এবং একান্ত নির্জনপ্রিয়তা ছিল বিভূতিভূষণের চরিত্রলক্ষণ। অনুরূপ ভাব ও বিশিষ্টতা সত্যচরণের মধ্যেও উপস্থিত।

'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যাচরণ এই উপন্যাসের কথক। তার মধ্য দিয়ে অরণ্যের প্রকৃতি এবং পরিচিত কিছু নরনারীর খণ্ড কাহিনী দশ্যায়িত। সত্যচরণের গভীর প্রকৃতি প্রেম, কবি সুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা এবং বিশ্বতাত্ত্বিক চেতনাকে উদ্ভাসিত হতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটি বিভূতিভূষণের আত্মরূপ। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে এসে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই সত্যচরণ ভালবেসে ফেলেছে। উপন্যাসে কেবলমাত্র ভাষ্যকার রূপে চিত্রিত হলেও কাহিনীর ভাববস্তু, তার বিশষ রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সত্যচরণের চরিত্র-পরিকল্পনার নিজস্ব সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য।

চারিত্রিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যে বিভূতিভূষণের সঙ্গে কাহিনীর নায়ক সত্যচরণের হুবহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভাগলপুরে থাকার সময়ে দেশের জন্য বিভূতিভূষণের মন উৎকণ্ঠায় বিচলিত হোত। 'স্মৃতির রেখা'য় আছে—"কেবলই মনে পড়ে আমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোৎস্না আজ উঠেছে—চাঁপা পুকুরের পুকুরঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইছামতীর ধারে, চাটগাঁয়ের মণিদের বাড়ী পুরনো স্মৃতির সব জায়গাগুলোতে। কুঠির মাঠের কথা হঠাৎ মনে পড়ে-দেশের জন্য মন কেমন করে"। এই উপলব্ধি সত্যচরণের মধ্যেও কাজ করেছে। 'আরণ্যক'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে—"সেইদিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলে আমার মন হু হু করিয়া উঠিত বাংলাদেশের জন্য।"

জমিদারি সংক্রান্ত কাজের ভার নিয়ে সত্যচরণ আসে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। সে এই আরণ্যক পরিবেশের ভয়ংকর নির্জনতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এহেন চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার সংকল্প করে। কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যচরণ এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সে মনে করে যে এখানকার যা প্রকৃতির রূপ, এমনটি সে কোথাও দেখেনি। এরপর থেকেই আমরা এক একটি প্রাকৃতিক রূপের দৃশ্যে সত্যচরণের গভীর প্রকৃতি

প্রেম, কবিসুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনা এবং বিশ্বতাত্ত্বিক চেতনাকে উদ্ভাসিত হতে দেখি। নিসর্গচেতনা ও কবিদৃষ্টি সত্যচরণের সত্তার গভীরে নিহিত ছিল বলেই অরণ্যের সান্নিধ্যে হঠাৎই তার মধ্যে স্ফুরিত হতে পারত না। নাগরিক জীবনের পরিবেশে লালিত সত্যচরণের মধ্যে প্রকৃতিচেতনা কীভাবে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, বিভূতিভূষণ সে সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করান নি। উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের নিয়ম পদ্ধতি এবং সেই সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা প্রকৃতির পটভূমিতে সত্যচরণের চরিত্রকে ঠিক বিচার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটি বিভূতিভূষণেরই আত্মরূপ, তাঁর প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতির রূপধ্যান, রোমান্টিক কবির অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তার রূপের আরতি ইত্যাদির প্রতিরূপ। ভ্রমণ-কাহিনী বা ডায়েরীর মত আত্মস্মৃতিচারণামূলক রচনা হলেও বিভূতিভুষণ একে উপন্যাস হিসেবেই পরিকল্পনা করেছেন—"ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস"। এই কারণেই তিনি এই কাল্পনিক চরিত্রটিকে (সত্যচরণ) দিয়ে কাহিনীর কথক রূপে উপস্থাপিত করেছেন, অথচ প্রথাগত উপন্যাসের নায়ক চরিত্র রূপাঙ্কনে তাঁর অভিপ্রায় ছিল না বললেই চলে।

কতকাংশে সাদৃশ্য থাকলেও সত্যচরণ আদৌ বিভূতিভূষণ নন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে আস্বাদন করেন গ্রামে যেমন, শহরেও বটে। শহরের সভা সমাবেশের বাস্তবতার মধ্যেও তাঁর গ্রামের কথা মনে হয় 'উৎকর্ণ' এর এই অংশটিতে—"আবার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে আর একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য।" কিন্তু কলকাতার মানুষ সত্যচরণ প্রথমে নির্জনতার মধ্যে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে। 'আরণ্যক'—এর প্রথম পরিচ্ছেদেই তার উল্লেখ আছে—"মন হু হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্য-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরীর খাতিরে। মানুষ এখানে থাকে?"

সত্যচরণ চরিত্রের প্রধান গুণ যে, সে আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত প্রকৃতি এবং মানবজীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।" লবটুলিয়া—বইহারের বনভূমির সৌন্দর্যকে সে যেমন উপলব্ধি করেছে, তেমনি মানুষের সারল্যও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। বিভূতিভূষণ গ্রামজীবনের প্রকৃতিকে যেমন তন্ময় চিত্তে দেখেছেন, বনাঞ্চলের বিশালতায় তিনি যেন আরও আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে শুধু বনের সৌন্দর্যমুগ্ধতা নিয়ে লেখা কিছু পরিচ্ছেদ আছে। যেখানে প্রকৃতি ও সত্যচরণের উপলব্ধিই শুধু স্থান পেয়েছে—অন্যান্য চরিত্র সেখানে অনুপস্থিত। এ পরিচ্ছেদগুলি আরোপিত মনে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু লেখক আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে এই চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতিকে লেখক পরিবেশ হিসেবে দেখেন না, প্রকৃতি তার মনের মত সঙ্গী। সত্যচরণ যখন একা প্রকৃতির কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে—তখন পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, বনের সতেজ শ্যামলিমা নিয়ে প্রকৃতির শরীরী উপস্থিতিকে আমরাও অনুভব করতে পারছি। এর পরেই সত্যচরণ আবার উপস্থিত হয়েছে তার বাস্তব সঙ্গীদের কাছে। প্রকৃতির মতই সরল উদার এইসকল মানুষ। তাদের সুখ, আনন্দ, উৎসব, দারিদ্র্য-সবকিছু নিয়েই তারা সত্যচরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের দুঃখ আনন্দের ভাগও নিতে হয়েছে তাকে। কলেরা রোগগ্রস্ত বালিকার মৃত্যু, মঞ্চীর নিরুদ্দেশ, কুন্তার ভাগ্যপরিবর্তন প্রভৃতির জন্য সত্যচরণ দুঃখিত হয়েছে, তেমনি আবার ছট্‌পরব বা পুণ্যাহ উৎসব উপলক্ষে অথবা সাঁওতালদের ঝুলন-পরবেও সে ম্যানেজারবাবুর খোলস পরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে নি। সত্যচরণের কাজ লবটুলিয়া জঙ্গলে মানুষের বসতি স্থাপন করা। একদিকে সে জঙ্গলকে ভালবাসছে —যুগলপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নানা ধরনের গাছ এনে সরস্বতী কুণ্ডী ও তার পার্শ্বস্থ বনভূমিকে আরও সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলছে—আর একদিকে তাকেই জঙ্গলের এক একটা অংশ গৃহসন্ধানী মানুষদের কাছে বিলি করতে হচ্ছে। ঘাসে ছাওয়া নীচু খুপড়ি ও লাল ধ্বজায় লবটুলিয়া বইহারের বনভূমি পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে এসে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই সত্যচরণ ভালবেসে ফেলেছে। মানুষের মৃত্যুতেও সে দুঃখী, আবার

প্রকৃতির মৃত্যু ও সে সহ্য করতে পারে না।" 'আরণ্যক'—এর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সত্যচরণের স্বগতোক্তি—"ঘন ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয় সাত বৎসরের মধ্যে।" নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর তার হাতে কি হল—একথা ভেবে অনুতপ্ত—"হে অরণ্যানির দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়"—লবটুলিয়া ত্যাগ করে শহরে ফেরার প্রাক্কালে এ কথা সত্যচরণ উপলব্ধি করেছে।

মোটের উপর সত্যচরণ উপন্যাসোচিত—পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের রূপে অঙ্কিত না হলেও নিসর্গচেতনা, প্রকৃতি প্রীতি, কল্পনা ইত্যাদি পাঠকমনে বাস্তব, সজীব ও হৃদয়গ্রাহী বলেই অনুভূত হয়। বিভূতিভূষণ সত্যচরণের মাধ্যমে অরণ্যপ্রকৃতি সংলগ্ন অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণির কয়েকজন নরনারীর জীবনের রেখাঙ্কনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এক শীতের রাতে ভাত খাওয়ার লোভে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে লবটুলিয়ার কাছারি বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় দরিদ্র সাধারণ মানুষ, এদের দারিদ্র্য, সারল্য জীবনযাত্রা সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছে। কুসীদজীবী মহাজন হওয়া সত্ত্বেও ধাওতাল সাহুর বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করার ক্ষমতা সত্যচরণ লক্ষ্য করেছে। দেবী সিং রাজপুত্রের বিধবা স্ত্রী কুন্তাবাঈজীর কন্যা হওয়ায় সমাজচ্যুত এবং সকলের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পাত্রী হয়েছে—দারিদ্রে তার এবং ছেলেমেয়েদের অনশনক্লিষ্ট করে তুলেছিল। মহাজন রাসবিহারী সিং-এর প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করে তার রক্ষিতা হয়ে স্বধর্ম বিসর্জন দেয়নি—কুন্তা সর্ম্পকে সত্যচরণের এই চিন্তা মানবিক দৃষ্টির ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল। তার প্রতি ঐকান্তিক সমবেদনার জন্যই সত্যচরণ তাকে বিনা সেলামীতে দশ বিঘা জমির বন্দোবস্ত করে দেয়। এই মানবিকতার জন্যই সত্যচরণ দরিদ্র গাঙ্গোতা গিরিধারীলাল সম্পর্কে মমতার কারুণ্যে বলে—অনেক ধরণের মানুষ সে দেখেছে কিন্তু গিরিধারীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখেনি। অনাথ বালক ধাতুরিয়ার নৃত্যশিল্পে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সত্যচরণের অন্তরকে মর্মস্পর্শী করেছিল, কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর সত্যচরণের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে, সেই বন্য-অঞ্চলে সে যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে এসেছিল তাদের মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সাঁওতালরাজ দোবরু পান্নার নাতির মেয়ে ভানুমতির সরল ও উষ্ণ ব্যবহার অথবা গাঙ্গোতা বৃদ্ধ নকছেদীর দ্বিতীয় স্ত্রী তরুণী মঞ্চীর প্রাণোচ্ছলতা সত্যচরণের কাছে দুর্লভ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় বলে মনে হয়।

উপন্যাসে কেবলমাত্র ভাষ্যকার রূপে চিত্রিত হলেও কাহিনীর ভাববস্তু, তার বিশেষ রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সত্যচরণের চরিত্র—পরিকল্পনার নিজস্ব সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য।

৮.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কথক সত্যচরণের ভূমিকা কি?

২। ভানুমতী কে?

৩। 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণ চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার করো।

৪। 'আরণ্যক' উপন্যাস ভানুমতী ও দোবরু পান্না চরিত্রসৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৫। 'আরণ্যক' উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রসৃজনে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৮.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

পর্যায় গ্রন্থ-৩ এর প্রতিটি এককে (১-৪) নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

২। ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী—দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য

৩। চিত্তরঞ্জন ঘোষ—বিভূতিভূষণ

৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য

৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

৬। ডঃ চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়—উপন্যাসে আঙ্গিক : বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর

পর্যায় গ্রন্থ- ৪

ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী

একক-১৩

উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি

বিন্যাসক্রম

২০৭.৪.১৩.১ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- উপন্যাসের কাহিনী বা বৃত্ত

২০৭.৪.১৩.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

২০৭.৪.১৩.১ : 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- উপন্যাসের কাহিনী বা বৃত্ত

সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা কথাসাহিত্যে একজন বিশিষ্ট ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর সৃষ্ট 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'অচিন রাগিনী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে সেই ব্যতিক্রমণীয়তার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলার বাইরে বিহারে জনজাতিদের লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে উপন্যাস রচনায় প্রেরিত করেছে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ঢোঁড়াইয়ের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত। তবে উপন্যাসের কাহিনী ঢোঁড়াইকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত হলেও, ক্রমশ তা সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকথা, লোকজীবনের সমাজ পরিবেশ এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রকাশ করেছে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি দুটি চরণ বা পর্বে বিভক্ত। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৫ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ থেকে উপন্যাসটির প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আর ১৩৫৭ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ থেকে 'দেশ' পত্রিকায় দ্বিতীয় চরণটির প্রকাশ হয়। ১৩৫৬ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স ৪টি খণ্ড নিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। খণ্ডগুলি হল যথাক্রমে আদিকান্ড, বাল্যকাণ্ড, পঞ্চায়েতকাণ্ড এবং রামিয়াকাণ্ড। এই কাণ্ডগুলির অন্দরে একাধিক অধ্যায়েরও লেখক নামকরণ করেছেন।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে জিরানিয়ার বিবরণ দিয়ে। যে জিরানিয়া বিরাটবপু রায়সাহেব কালীবাড়ি কমিটির বার্ষিক রির্পোটে 'এটা একটা গণ্ডগ্রাম' বলে উল্লেখ করলে ছেলের দল প্রবল বিরোধিতা করেছিল। জিরানিয়া ও তাৎমাটুলির মধ্যে কোনো গ্রাম না থাকায় তাৎমারা তাৎমাটুলিকে শহরতলি ভাবত। এমন শহরতলি যেখানে পরিস্কার কাপড় পরা কোনো মানুষ গেলে কুকুর চিৎকার করে

ওঠে। তাৎমা পুরুষেরা স্নান কম করে, এমনকি মেয়েরা বছরে একবার ছট পরবের দিন স্নান করে। তাৎমারা জাতে তাঁতি হলেও তারা সে কাজ করে না। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রাম থেকে তারা পেটের জ্বালায় তাৎমাটুলিতে এসে কুঁয়ো কাটার কাজ করে। তাদের অতীত ঐশ্বর্য তারা ক্রমশ ভুলে যায়। অন্যদিকে রয়েছে ধাঙরটুলি। ধাঙররা জাতে ওরাঁও। এরা একে ওপরকে ব্যঙ্গ করে। ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে ‘নোঙরা জানোয়ার’ আর তাৎমারা ধাঙড়দের বলে ‘বুড়বক কিরিস্তান’।

বাল্যকান্ডের প্রথম পর্বেই রয়েছে ঢোঁড়াইয়ের জন্মবৃত্তান্ত। ঢোঁড়াইয়ের জন্মের পাঁচদিনের দিন টৌনে (টাউনে) তামাসা ছিল। আর একদিন আগে ঢোঁড়াই জন্মালে ঢোঁড়াইয়ের মা বুধনী তামাসা দেখতে যেতে পারত, যা নিয়ে বুধনির অনেক আফসোস। তবে ঢোঁড়াইয়ের বাবার কাছে সে রোমহর্ষক কাহিনীর সবটা সে শোনে। ঢোঁড়াই জন্মের সময় তার মাজাঘষা রং এবং মোটাসোটা চেহারা ছিল। তাই ছোট ছেলেকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন। তাই ছেলেকে কোলে নিয়ে সে বলে –

> “বুঝলি বুধনি এ ছোঁড়া বড় হয়ে আমার বংশের নাম রাখবে। একে লেখাপড়া শেখাব চিমনী রাজবংশের বুড়হা গুরুজীর কাছে। রামায়ণ পড়তে শিখবে, পাড়ার দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে; ধাঙরটুলি, মরগামা, কতদূর দূর থেকে লোক আসবে ওর কাছে খাজনার রসিদ পড়াতে।”

এই স্বপ্ন সফল হওয়া দেখে যাওয়া হয়নি ঢোঁড়াই-এর বাবার। তার কিছুদিন পর আশ্বিনের আগে পেয়ারা খাওয়ায় কদিন জ্বরে ভুগে ঢোঁড়াইয়ের বাবা মারা যায়। বুধনি দেড়বছর ধরে বৈধব্য কাটিয়ে ঢোঁড়াইকে বোকা বাওয়ার থানে বসিয়ে রেখে বাবুলালকে বিয়ে করে। ঢোঁড়াইকে ছেড়ে গেলেও বুধনির তার প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা একটুও কমেনি। তাই ঢোঁড়াই অসুস্থ হলে নিজে রেবুণগুণীর কাছে গিয়ে ঢোঁড়াইকে সুস্থ করে এনেছে।

উপন্যাসটিতে সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সতীনাথ ভাদুড়ী তুলে ধরেছেন। যার কাহিনীধারা শুরু হয় ‘গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা’ অধ্যায় থেকে। রাবিয়ার বাড়ির নিচু চালের ছাচতলা থেকে একটা বিলিতি কুমড়োর ওপর গানহী বাওয়া মূর্তি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। এই গানহী বাওয়াই পরবর্তীকালে গান্ধীজি হয়ে উপন্যাসের কাহিনীক্রমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে জার্মান যুদ্ধ, বিদেশী শাসন ব্যবস্থা, কংগ্রেসী কার্যকলাপ সবটাই তুলে ধরা হয়েছে।

‘পঞ্চায়েত কান্ড’-তে তাৎমাটুলিতে যে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে চারজন নায়েব ও একজন মাহাতো এই পাঁচজন নিয়ে পঞ্চায়েতি, যা তাৎমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তা। তাৎমাদের এই পঞ্চায়েতিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢোঁড়াই কোশী-শিলিগুড়ি রোডের কাজে বহাল হয়। ঢোঁড়াইয়ের এই কাজে আশাকে ধাঙরটুলি স্বাগত জানালেও তাৎমারা ভালো চোখে দেখেনি। গ্রামের সকলে মিলে বাওয়ার বাসস্থান পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরে পুলিশ এসে এর বিচার করলে ঢোঁড়াইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে সে পৈতে নেওয়ার জন্য সোনবর্গা থেকে পুরোহিত আনলে কেউ আপত্তি করেনি। সেই থেকে ঢোঁড়াই ভকত হয় ঢোঁড়াই দাস।

‘রামিয়া কাণ্ড’-তে তাৎমারা অগ্রহায়ণ মাসের দিকে পশ্চিমে যায় ধান কাটতে। যেখানে রামিয়া ও তার মা আসে, এবং তাদের বন্ধুত্ব হয়। এবং রামিয়ার মা ও ফুলঝরিয়ার মায়ের মধ্যে অনুকূল সম্পর্ক হয়। ধান

কাটার খেতে রামিয়ার মা কলেরায় মারা গেলে রামিয়াকে ফুলঝরিয়ার মা তাৎমাটুলিতে সঙ্গে আনেন। এই অধ্যায়ে আমাদের সামনে তাৎমা নারীদের অনৈতিক কর্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যা তাৎমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়রূপে চিহ্নিত। এছাড়া লেখক বিরজু, রতিয়া ছড়িদার, রামনেওয়ার সিংয়ের মাধ্যমে তাদের স্খলিত রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

এরপর আমরা দেখতে পাই ঢোঁড়াই ও রামিয়ার বিবাহ হয়। সেই বিবাহের অনুষ্ঠানের এক আচারে মিসিরজীর চাল গোনার ওপর তাদের দাম্পত্য জীবনের ভাগ্য নির্ভর করছে। তাই ঢোঁড়াইয়ের মুখে উপন্যাসে শোনা যায়-'চাল সংখ্যায় বিজোড় হলেই এ বিয়ে সুখের হবে না। তবে সকলেই জানে যে বিজোড় সংখ্যার চাল কখনও মিসিরজীর হাতে ওঠে না।' বিবাহ সভায় বসে থাকা মহতো রামিয়া সম্পর্কে বলেছে-

"সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী
হোইহি সন্তত পিয়হি কুমারী।"

অর্থাৎ সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের। এ মেয়ে চিরকাল পুরুষের পিয়ারী থাকবে। রামিয়া ও সামুয়ের কথা বলা ঢোঁড়াইয়ের পচ্ছন্দ হয় না। সেই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সে রামিয়াকে মারধর করে। পঞ্চায়তের তেরহা-তিরসার দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

'সাগিয়া কান্ডে' বিসকান্ধার সাগিয়া, মোসম্মত ও গিরিধারী মণ্ডলের আবর্তে ঢোঁড়াইয়ের প্রবেশ ঘটে। সে মোসম্মতের তামাক চাষের জমিতে সামান্য বেতনভুক জন হিসাবে বহাল হয়। কিন্তু গিরিধারী তাকে ঠকিয়ে সব আত্মসাৎ করতে চায়। অন্যদিকে গ্রামের জমিদার বাবুসায়েব অনেক জমির মালিক হলেও সে মাটির খিদে মেটানোর জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি জুলুম করে। যা আমরা বিল্টার গানের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি-

"আজকাল মুন্সীজির কুঠুরিতে জজ সাহেবের কাছারি;
নড়বে নাকো বচ্চন সিং মুন্সিজীর পা ছাড়ি;
কোথায় গেল কুর্সি এখন, কোঠায় গেল সেসরী ?...........ওরে বিদেশী !"

এরই কিছুদিন পর ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের কথা এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে ঢোঁড়াই ও অন্যান্যরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে অনেক প্রশংসা পায়। এই ভূমিকম্পের রিলিফ সাধারণ দরিদ্র মানুষ পায় না। তা লুঠ করে লাডলী বাবুর মাধ্যমে বচ্চন সাহেবের মতো বড়লোকরা। যা নিয়ে ঢোঁড়াই খেদ প্রকাশ করে।

উপন্যাসের শেষের দিকে কংগ্রেসী দলের কার্যকলাপ ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে 'বলন্টিয়ার'-রা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। ঢোঁড়াইও তাদের একজন হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই দলের কেউ আসামী, কেউবা খুনি তারা নিজেদের স্বার্থে দলে এসে সাধারণ মানুষদের প্রতি জুলুম করে। এই দল ভাঙ্গার পর সে 'আজাদ দস্তা'-য় প্রবেশ করে। সেখানে তারা সকলে ছদ্মনামে চলে। যেমন- ভোপতলাল- গান্ধী, বিশুন শুক্লা-জওয়াহর প্রভৃতি। যারা পরবর্তীতে ক্রান্তিদল তৈরি করে।

এভাবে সমগ্র উপন্যাসের কাহিনী রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ঢোঁড়াই এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকামী দলগুলি কর্মকাণ্ড বড় বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তারাই আবার মানুষকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করছে। তারাই আবার মানুষ খুন করছে। গান্ধীজির মতকে নিয়ে অনেক বিরুদ্ধাচারণ ও বিপরীত কার্যকলাপ ব্যক্ত হয়েছে। যার ফলে কেউ অর্থলুঠ করে পালিয়েছে, কেউ জেলে গেছে। ঢোঁড়াইও শেষে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে।

উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ অবধি ঘটনাক্রম পরাধীন ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খলাময় পরিবেশকে তুলে ধরেছে। যা ঢোঁড়াইয়ের জীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বিস্তৃত। অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণে সেই পটচ্ছবি ব্যক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসে তাৎমা, ধাঙর ও বিসকান্ধার বাবুসম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন, রীতিনীতি, বিশ্বাসবোধ, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক অভিঘাতের নানা কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসটি অসাধারণত্ব লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে বারিদবরণ চক্রবর্তী লিখেছেন- "সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় সতীনাথের মন-বুদ্ধি সৃষ্টিশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। (বাংলা কথাসাহিত্য বিহারের লোকজীবন- পৃ. ৩১৯)

২০৭.৪.১৩.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

১. ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্প ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসের কাহিনীর ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা আলোচনা করো।

২. ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসের পটভূমিকা আলোচনা করো।

একক ১৪
নামকরণ

বিন্যাসক্রম

২০৭.৪.১৪.১ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- উপন্যাসের নামকরণ

২০৭.১৪.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

২০৭.৪.১৪.১ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- উপন্যাসের নামকরণ

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামের মধ্যে দিয়ে একপলকে একটু দেখার মতো সমগ্র রচনার বিষয়বস্তু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। আর সুন্দর বা যথাযথ নামকরণে লেখককে সর্বদাই অনেক পরিকল্পনা করতে হয়। কারণ নামকরণ যথাযথ না হলে তার সৃষ্ট কীর্তি পাঠক মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, অথবা পাঠকের কাছে বিষয়ের যথাযোগ্য উপস্থাপনা সম্ভব হতে পারে না। পাঠকের সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয় নামকরণের উপর; নামকরণ দেখে পাঠক অনেক সময়ে কোনো রচনাপাঠে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তাই সঠিক নামকরণে যেমন লেখক নন্দিত হোন, তেমনিই ভুল নামকরণে সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হয়। নামকরণ নানা রকমের হয় যেমন- চরিত্র কেন্দ্রিক, বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ও প্রতীকধর্মী ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের নামকরণে কতটা মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি ঢোঁড়াইয়ের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত। এই উপন্যাসে একাধিক স্থানে তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' এর কথা এসেছে। তুলসী দাস তাঁর কাব্যে যেমন রামের জীবনবৃত্তান্তকে তুলে ধরেছেন, ঠিক সেইভাবে সতীনাথ ভাদুড়ী এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঢোঁড়াইকে নিয়ে উপন্যাসের সার্বিক বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ঘটনাবলীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেই দিক দিয়ে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ করা হয়েছে বলা যেতে পারে।

আমরা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখব কীভাবে নামকরণটি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াইয়ের জন্মের পূর্বের পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে কাহিনী

শুরু হলেও ঢোঁড়াইয়ের জন্মের পর কাহিনীধারা তাকে ঘিরে অগ্রসর হয়েছে বলা যায়। এ প্রসঙ্গে সতীনাথ নিজেই বলেছেন-

> "তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। সে একবছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। এখনকার গ্রামাঞ্চলেও নামটা খুব চলে। তবে হিন্দীতে বানান হল ঢোঢ়াই। উচ্চারণ ঢোঢ়াহাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরণে করে নিয়েছে।... আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমন করে বদলানো যাতে যে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।" (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের রাজনৈতিক উপন্যাস- পৃ. ১৫০-১৫১)

উপন্যাসের প্রাণবিন্দু ঢোঁড়াই তার বাল্যকাল, যৌবন, পরিণত বয়স জীবনে সবটাই দেখানো হয়েছে। তবে কালকেন্দ্রিক আলোচনার মাধ্যমে তা লেখক স্পষ্ট করেছেন।

সমগ্র উপন্যাসে ঢোঁড়াইয়ের জীবনবৃত্তান্তকে বিশ্লেষণ করলে দেখব তার জীবনের তিনটি পর্যায়ে বিভাজন করেছেন। বাল্যকাল থেকে বিবাহিত জীবন, সাগিয়া কান্ডে সাগিয়া ও মোসম্মতের সাথে অতিবাহিত জীবন এবং পরিশেষে দেশীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তার যোগদান। হয়তো উপন্যাসের কাহিনীকে সতীনাথ ভাদুড়ী আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তা সম্ভব হয়নি। তবে ঢোঁড়াইয়ের জীবনের দোলাচলতা আমাদের ভাবায়। তার জীবন কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জন্মের পর পিতামাতার সান্নিধ্য না পাওয়া, রামিয়ার সাথে সুখের সংসার না করতে পারা, তাৎমাটুলিতে স্থায়ী বাস না করতে পেরে বনবাসী হয়ে বিসকান্ধায় প্রবেশ তার জীবনের চলার গতিকে অস্থির করেছে। সেখানেও গিধর মণ্ডল, বাবুসাহেব ও অন্যান্যদের চক্রান্তে সে রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করে। আবার আজাদ দল, ক্রান্তিদলের অরাজনৈতিক কর্মকান্ডে বিতৃষ্ণ হয়ে তাৎমাটুলিতে ফিরে হতাশ হয়- সবই ভাগ্যের পরিহাস। ফলে সে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। উপন্যাসের শেষপ্রান্তে অতীত জীবনের ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থন করেছে। কারণ জাতিস্মর জানতে পেরেছে যে এক যুগ আগের সেই স্মৃতিটূকুই আসল। বাকি সব সেই শাঁসটুকুর উপরের খোসা। অতীতের স্মৃতিই যেন তার ভবিষ্যত জীবনের বেঁচে থাকার রসদ। যেহেতু উপন্যাসের সার্বিক ঘটনাবলী তাকে জড়িয়ে বর্ণিত হয়েছে এবং তার জীবনের অন্তিম পরিণতিতে (জেলে আত্মসমর্পণ করা) উপন্যাসের কাহিনী পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ঢোঁড়াইয়ের সম্পূর্ণ জীবনকে অবলম্বন করেই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', তাই বলা যায় এই উপন্যাসের নামকরণ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সার্থক।

২০৭.৪.১৪.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

---

১. ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

একক ১৫
উপন্যাসের শ্রেণীবিচার

বিন্যাসক্রম

২০৭.৪.১৫.১ ঢোঁড়াই চরিত মানস: শ্রেণীবিচার

২০৭.১৫.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

২০৭.৪.১৫.১: ঢোঁড়াই চরিত মানস: শ্রেণীবিচার

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে ভাবনাটি আমাদের মধ্যে আসে তা হল উপন্যাস সাধারণত কোন কোন শ্রেণীর হয়ে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে উপন্যাস সাধারণত পারিবারিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি শ্রেণীর হতে পারে। তবে কোন উপন্যাসকে কোন শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হবে তা নির্ভর করে তার কাহিনীধারার উপর। একটি উপন্যাসের কাহিনীর জাল বিস্তারে ঔপন্যাসিক কোন ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে এ কথা বলতে হয় যে অতীত ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে রচিত উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে (রাজসিংহ)। সমাজ ও পরিবারকে নিয়ে রচিত উপন্যাসকে সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস বলে (কৃষ্ণকান্তের উইল)। মনস্তত্ত্বের বিষয় নিয়ে রচিত উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস (চোখের বালি) বলে। আর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনৈতিক উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে অলোক রায় লিখেছেন-

"সমসাময়িক জগতের উদভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতি ও সুকুমার আদর্শবাদ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। সেইজন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা, কংগ্রেস ও কমিউনিজম মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, স্বাধীনতা লাভের পর বৈষম্য বর্জিত নতুন সমাজ গড়ার একাগ্র প্রচেষ্টা, দেশপ্রেমিকের আত্মোৎস্বর্গের প্রেরণা নিয়ে আধুনিক যুগের বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে।" (সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৯৫)

উপরোক্ত উক্তিটিতে যে সকল বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে তা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের আলোচ্য 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি উপরোক্ত সামগ্রিক ঘটনাবলীর সমাবেশ লক্ষণীয়। তাই এই দিক থেকে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক উপন্যাসের যেসকল বৈশিষ্ট্য গুলি আছে তার ভিত্তিতে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'কে বিশ্লেষণ করে দেখব যে, রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে তা কতটা সার্থক। বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপন্যাসের কাহিনী ধারাকে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী হবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি।
- রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা চরিত্রগুলি প্রভাবিত হবে।
- একটি বা একাধিক রাজনৈতিক আদর্শ অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।
- রাজনৈতিক সমস্যা উপন্যাস উপন্যাস প্রকঠিত হবে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের কাহিনী দুটি চরণে বিভক্ত। দ্বিতীয় চরণ থেকে মূলত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই উপন্যাসের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে প্রথম চরণে দেখা যায় ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের টুকরো টুকরো ঘটনা। এই সময়ে 'গানহীবাওয়া'র আবির্ভাব ঘটলেও তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপন্যাসে ঘটেনি। যা দ্বিতীয় চরণে গান্ধীজীর ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ ঘটেছে। কংগ্রেসের পূর্বের কথা এই উপন্যাসে বিশেষভাবে না থাকলেও, মহাত্মাজীর আগমনে সারা ভারতে যে কংগ্রেস দলের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কথা স্পষ্টভাবে রয়েছে। ১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি বিহারের ভূমিকম্পের সময়ে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেস দলের ভূমিকার কথা এই উপন্যাসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

"কলির রঘুনাথ মহাত্মাজীর। তাঁর চেলাদের বলে কংগ্রেসী। বিলেত থেকে এসেছিল লাল টকটকে সাহেবের দল ভূমিকম্পের লোকসান দেখবার জন্য।... কংগ্রিস থেকে সাহায্য করবে লোকেদের, বিশেষ করে গরিবদের।" (সাগিয়ার যাত্রা)

আর এখান থেকেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঢোঁড়াই দেশীয় রাজনীতির সাথে ক্রমশ জড়িয়ে যেতে থাকে। যদিও রাজনৈতিক দলে তার স্বেচ্ছায় প্রবেশ ঘটেছে। আজাদ দল, ক্রান্তি দল প্রভৃতি দলের সান্নিধ্যে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ঢোঁড়াই আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু এইসব দলগুলির অন্দরের কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা তার একটুও ভালো লাগেনি। আবার যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে তারা বেশিরভাগ কেউ খুনি, ডাকাত, কেউবা অত্যাচারী শোষক ভূস্বামী, সুবিধাবাদী শিক্ষিত শ্রেণী। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নামও এই উপন্যাসে পাওয়া যায়, যারা আমাদের কাছে আদর্শ পুরুষ হিসেবে পরিচিত। যেমন জওয়াহর, প্যাটেল, আজাদ, সর্দার প্রমুখ।

বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, হত্যালীলা, জুলুমবাজ, লুটপাট সবই এই উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় ক্রান্তি দলের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক সমস্যাগুলি কিভাবে পারিপার্শ্বিক মানুষের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে তাও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। আসলে চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যেকার মতভেদ ও

কর্মপন্থা সবটাই এই উপন্যাসে রয়েছে। এছাড়াও সোশালিস্ট দল (সুশীলা), কমিউনিস্ট দল (কামিনী), স্বাধীন দল ও ন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড এই সব কিছুর উল্লেখ এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের রাজনৈতিক আদর্শের কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এই উপন্যাসের মূল আদর্শ গান্ধীবাদী কংগ্রেসি চিন্তাভাবনা প্রকাশ। জাতির স্বাধীনতা আনয়নে মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনের আদর্শ ঢোঁড়াইয়ের ভালো লেগেছিল। তাই গান্ধীজিকে দেখতে সে বিসকান্দা থেকে জিরানিয়ায় এসেছিল- যে জন্মভূমি থেকে অভিমানী হয়ে একদা বেরিয়ে পড়েছিল। সেখানে আবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। গান্ধীর আদর্শ ঢোঁড়াই মেনে চলেছে আজীবন –

"ঢোঁড়াই তিনটি কথা বোঝে। মহাত্মাজী চান সকলে সত্যি কথা বলুক, সকলে 'বৈষ্ণব' হয়ে থাক; আর দারোগার সঙ্গে লড়ায়ের সময় বলেন্টিয়রজী কিছুতেই চটবে না। এই তিনটি কথা।" (সতিয়াগিরার উৎসব)

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের আদর্শ ঢোঁড়াইয়ের আদর্শ, গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শ ঢোঁড়াইয়ের জীবনাদর্শ। তাই শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই অহিংসার পথ বেছে নিয়ে সেবার মধ্যে নিজেকে মগ্ন রেখেছে। গান্ধীর রামায়ণের প্রতি ভরসা পর্যন্ত ন্যস্ত ছিল।

আজাদ দস্তায় যখনই ঢোঁড়াই প্রবেশ করেছে তখন থেকে তার জীবন বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা ক্রমশ প্রভাবিত হয়েছে। শুধু ঢোঁড়াই নয়, লাডলিবাবু, বাবুসাহেব, গিধর মন্ডল, সাগিয়া, গঞ্জের বাজারের নোঙ্গরীলাল, ভোপতলাল, বাচিতর সিং, এন্টনি সবাই রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে গিয়েছিল, তারা কেউ দলের অন্দরে থেকে কেউবা দলের বাইরে থেকে দেশের স্বাধীনতায় আত্মোৎসর্গ করেছিল এবং পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। যেমন কেউ জেলে যায়, কেউ হত্যা হয়, কেউবা লুটপাট করে নেপালে চলে যায়। সেই সময় তার ভারতীয় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণকারীদের কিছু অংশের বাস্তবসম্মত চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। আমাদের ঢোঁড়াইও উপন্যাসের শেষে চলে যায় জেলে সাগিয়ার কাছে। যাকে ক্রান্তি দল সমালোচনা করে বলবে-

"কাংগ্রিসের বড় নেতাদের সরকার ছাড়ছে বলে সুযোগ বুঝে সলন্ডার করেছে কায়েরটা।" (স্বর্ণসীতা)

উপন্যাসের শেষে রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে গিয়ে জেলের উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছে ঢোঁড়াই। কারণ রাজনৈতিক কর্মাবলী ছাড়া আর কিছু তার কাছে অবশিষ্ট থাকে না।

এভাবে উপন্যাসটির প্রথম চরণটিতে তেমনভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ না থাকলেও, দ্বিতীয় চরণ থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক গতিধারা সমগ্র উপন্যাসব্যাপী দেখানো হয়েছে। যা থেকে সেকালের স্বাধীন সংগ্রামীদের জীবনকাহিনী, আত্মদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাই সবদিক থেকে বিচার করে এই উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

২০৭.৪.১৫.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

১. ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে কতটা সার্থক, তা যুক্তিসহ আলোচনা করো।

একক ১৬
চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম

২০৭.৪.১৬.১ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর চরিত্র বিশ্লেষণ

২০৭.১৬.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

২০৭.১৬.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৭.৪.১৬.১: 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর চরিত্র বিশ্লেষণ

উপন্যাসের কাহিনী সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে হলে লেখককে সর্বদা বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। কারণ চরিত্রহীন কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া লেখকের পক্ষে সহজ নয়। আমাদের পাঠ্য সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটিতে যে বিস্তৃত কাহিনীধারা বর্ণিত হয়েছে, তাতে মূল চরিত্র হিসেবে একাধিক চরিত্রের উপস্থাপনা ঘটেছে। এদের মধ্যে যার নামে উপন্যাসটির নামকরণ হয়েছে সে হল ঢোঁড়াই। যাকে কেন্দ্র করে কাহিনী শুরু থেকে পরিণতির পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য লিখেছেন-

> "আসলে যে ঢোঁড়াই তার জানা চরিত্র তাকে তিনি নিজের মতো করে পাল্টে নিয়েছেন, তাৎমাটুলির সীমিত পরিবেশের বাইরে নিয়ে এসে তাকে উত্তর ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধি করে তুলেছেন, স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন রাজনীতির সাহায্য তাঁকে নিতেই হয়েছে, নইলে সময়টিকে ঠিক মতো করা যেত না।" (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস, পৃ. ১৫০)

সতীনাথ নিজেও জানিয়েছেন তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামে একজন লোক সত্যিই ছিল। যাকে লেখক উপন্যাসে নিজের মতো করে তৈরী করেছেন। জন্ম থেকেই ঢোঁড়াই একরোখা ও জেদি ধরনের। মা বুধনী পিতার মৃত্যুর পর বাবুলালকে বিয়ে করলে ঢোঁড়াই তা মানতে পারেনি। মায়ের দেওয়া খাবার ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আবার

তার জেদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'বস্ত্রলাভের উপাখ্যান' অধ্যায়ে। সহজেই 'মিলিট্রী' বাড়ির মোহন্তজীর সাথে ভাব করিয়ে নিয়ে তার থেকে বস্ত্র আদায় করে নেয়। কিন্তু বাওয়া তাকে নতুন বস্ত্র পরতে দিতে না চাইলে ঢোঁড়াই তার জেদ বজায় রেখেছে। ঢোঁড়াই বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিতে প্রখর। তার ভিক্ষা প্রণালী দেখে বাওয়া নিজেই প্রশংসা করেছিল।

ঢোঁড়াই চরিত্রটিকে লেখক বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাহিনিতে সংযোজন করেছেন। তাই তো ঢোঁড়াই বাওয়ার মতো 'ভকত' হতে চায় না। সে ধাঙড়দের সাথে মিলে পাক্কীর কাজে অংশগ্রহণ করে। ঢোঁড়াই ছোট থেকেই প্রতিবাদী, যা তার কথায় প্রকাশ পেয়েছ - "তারা কি আমায় খেতে দেয় ? জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন ? আর জিজ্ঞাসা করলে জানাই আছে যে, তারা মাটি কাটার কাজ করতে দেবে না।"

এছাড়া মাহাত বা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে সকল তাৎমাদের পৈতে নিতে উৎসাহ জুগিয়েছে। ঢোঁড়াইকে লেখক আদর্শ প্রেমিক-পতি হিসাবেও তুলে ধরেছেন। রামিয়াকে প্রথম দেখেই তার মধ্যে প্রেমিক সত্তার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। সে সামুয়ের মতো লম্পট নয়। রামিয়াকে বিয়ে করে তার সাথে সুখেই সংসার করার সংকল্প নিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তার সেই স্বপ্নপূরণ হয় নি। অন্যদিকে সাগিয়ার প্রতি তার প্রেম নির্ভেজাল। সাগিয়া ও তার মা মোসম্মতকে সর্বদাই সম্মান ও সম্ভ্রম করে চলেছে। ঢোঁড়াই যখনই যেখানে থেকেছে তখন সেই পরিবেশে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের সাথে তার সম্পর্ক মধুর ছিল। তাদের সাহায্য করেছে আপ্রাণ। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য কুয়ো খনন, ঘরবাড়ি সারিয়ে দিতে তার একান্ত চেষ্টা কংগ্রেসী নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সমকালীন রাজনৈতিক অভিঘাত ঢোঁড়াইকেও ছুঁয়ে গেছে। কংগ্রেস দল, আজাদ দল, ক্রান্তিদলে সে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের অন্দরে কোন্দল তার মনকে ক্রমশ বিষিয়ে তুলত। ক্রান্তিদলের ঢোঁড়াই 'রামায়ণজী' নামে খ্যাত ছিল। রামায়ণের প্রতি তার অমোঘ টান ছোটবেলা থেকেই। তার দলের 'গান্ধি' (ভোপতলাল) তার জন্য জামালপুর থেকে রামায়ণ এনে দিয়েছিল। তার দলে সদ্য আগত এন্টনিকে দেখে তার রামিয়াকে মনে পড়ে যায়। তার অতীত জীবনের ভাবনা ক্রমশ তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এন্টনিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে এসে রামিয়ার মৃত্যুকাহিনী তাকে হতাশার রাজ্যে নিয়ে যায়। জীবনের সব কর্মকাণ্ডকে পিছনে ফেলে ঢোঁড়াই এগিয়ে চলে-

> "সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে এই পথটা তবু পা রাখবার একটু শক্ত জমি। সিধে চলে গিয়েছে, কাছারি, জেলখানা, আরও কতদূরে। আর বেশি দূরে সে যেতে চায় না। জেলে সাগিয়া আছে। চিনিও মিষ্টি, গুড়ও মিষ্টি। তবু লোকে চিনি চায়। আর চিনি না পেলে ? সব পুঁজি খোয়ানোর পর তার মনে পড়েছে বহুদিন আগের জমানো বাতায় গোঁজা পয়সার কথা।"

সব হারিয়ে ঢোঁড়াই তাৎমাটুলি থেকে সাগিয়ার কাছে গিয়েছিল। আর উপন্যাসের শেষে সর্বস্বান্ত ঢোঁড়াই জেলে সাগিয়ার কাছেই ফিরে গেছে। এ প্রসঙ্গে ক্রান্তিদল, জনগণ একাধিক সমালোচনা করলেও বুড়ো এতোয়ারীর কথায় বলতে হয়-

"ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরলে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়।"

ব্যক্তিজীবনে নির্বুদ্ধিতার কারণে ঢোঁড়াইকে অনেক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। তার হঠকারিতায় করা কাজ তার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাই দোষগুণে ভরা ঢোঁড়াই চরিত্রটি লেখকের অসামান্য সৃষ্টি।

উপন্যাসের প্রয়োজনে একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বোকা বাওয়া চরিত্রটি তাদের অন্যতম। তাৎমাটুলির বড়রাস্তার ধারে অশ্বত্থ গাছের নিচে গোঁসাই থানে বোকা বাওয়ার অবস্থান। বোকা বাওয়া বোবা সন্ন্যাসী। তার আগে বা পরে কেউ তাৎমাদের মধ্যে সন্ন্যাসী হয়নি। ছোটবেলায় বোকা তার মায়ের সাথে ভিক্ষা করত। সে বড় হয়ে সন্ন্যাসী হয়। তবে তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে-"টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।" বোকা বাওয়ার কাছে যখন বুধনী ঢোঁড়াইকে রেখে চলে যায়, তখন থেকেই সে নিজ সন্তানের মত করে ঢোঁড়াইকে মানুষ করেছে। বোকা চায় তার পরবর্তীতে গোঁসাই স্থানের অধিকার সে নিক। কিন্তু ঢোঁড়াই সে পথে হাঁটেনি। তবু তার প্রতি বোকার স্নেহ একটুও কমেনি। নিজের পায়ে গুলি লাগার ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাওয়া টাকা সে ঢোঁড়াইকে দেয়। সেই টাকায় ঢোঁড়াইয়ের বিয়ে দেয়, অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে গরুর গাড়ি কিনে দেয়। আসলে বোকা বাওয়ার মত মানুষেরা সরলই হয়। তাইতো গ্রামের মানুষেরা তার মাথা গোঁজার ঠাইটুকু পুড়িয়ে দিলেও সে কিছুই বলেনি। আবার ঢোঁড়াইয়ের বিয়ের পর সে তার শেষ জীবন তাৎমাটুলি ছেড়ে অযোধ্যাজীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

বাবুলাল চাপরাসী, ধনুয়া মাহাতো, নায়েব প্রমুখ চরিত্ররা এই উপন্যাসে তাৎমাটুলির আভ্যন্তরিক অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। বাবুলাল সর্বদাই তার ক্ষতি করতে চেয়েছে। ফলে তার খল রূপটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসে ঢোঁড়াইের বিপরীত হিসাবে সামুয়েরকে দেখানো হয়েছে। সে লম্পট, নারীলোলুপ। মদ্যপান, জুয়াখেলা, সায়েব বাড়ির সুন্দরী নারী আয়ার সঙ্গে আসক্তি সর্বজনবিদিত। এন্টনির মাকে বিয়ে করলেও সে তাকে ফেলে চলে যায়। উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে তার বিরূপ চরিত্র প্রকাশ পায়। এছাড়া গিধর মণ্ডল, বাবুসাহেব সবাই উপন্যাসে খল চরিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজনৈতিক কার্যাবলীর প্রসঙ্গে উপন্যাসে লাডলীবাবু, বিজন উকিল, ভোপতলাল, আরও অনেকে এসেছে। উপন্যাসে এন্টনির স্কুল পলায়ণ করে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আকর্ষণবশত রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দৃশ্যটি প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসের মধ্যে যে সকল নারী চরিত্রের উপস্থাপন ঘটেছে তাদের মধ্যে বুধনী, ঢোঁড়াইয়ের মা অন্যতম। বুধনী চরিত্রটিকে স্নেহমায়া দিয়ে গড়া হলেও ব্যক্তিজীবনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সেও স্বার্থপর হয়ে ঢোঁড়াইকে ছেড়ে বাবুলালকে বিয়ে করেছে। আসলে এটাই তাৎমাটুলির রীতি। মেয়েরা বেশিদিন বিধবা অবস্থায় থাকে না। কিন্তু লেখক রামিয়া, সাগিয়াকে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়েছেন। রামিয়া পশ্চিমী দুরন্ত মেয়ে, আর সাগিয়া শান্ত স্বভাবের। তবে দুজনেই ঢোঁড়াইকে ভালোবাসত। অন্যদিকে ফুলঝরিয়ার চরিত্রের মাধ্যমে লেখকের সহৃদয়তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সে জন্মের সময় স্থানদোষের কারণে পঙ্গু হয়ে যায়। জীবনে সে অবহেলা ছাড়া কিছুই পায়নি। ঢোঁড়াইকে সে ভালবাসতো তবে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। উপন্যাসের শেষে তার করুণ আর্তি আমাদের মনকে ব্যথাতুর করে তোলে-

“ওটা কি ! বন্দুক। একটা ভুড়োশিয়াল মেরে দিয়ো তো আমাকে বন্দুক দিয়ে।”

যা দিয়ে সে তার খোঁড়া পা ভালো করবে। প্রতিটি নারী চরিত্রটিকে ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের নারীর অবস্থানের বাস্তবসম্মত রূপটি প্রকাশ করেছেন লেখক।

২০৭.৪.১৬.২ সম্ভাব্য প্রশ্ন

১. ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসের চরিত্র পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিকের মৌলিকতা আলোচনা করো।

২০৭.৪.১৬.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সতীনাথ স্মরণে সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, নভেম্বর, ১৯৭২, ভারতী ভবন,পাটনা ১।

২. সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্য, ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, অমর্ত প্রকাশ, ৩২ বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলি- ৩৪।

৩. সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, গোপাল হালদার, জানুয়ারি ১৯৭৮, অয়ন, কলিকাতা ৯।

৪. সতীনাথ বিচিত্রা, প্রকাশভবন, প্রথম সংস্করণ- কার্তিক ১৩৭২।

৫. উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস, নারায়ণ চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, মে ১৯৮০, কলকাতা-৯।

৬. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমার্জিত সংস্করণ- ১৩৭২, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২।

৭. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুন ১৯৮০।

পত্রিকা:

১. ঢোঁড়াই চরিত মানস : একটি পুনর্মূল্যায়ন, গুণময় মান্না, জলার্ক, কার্তিক ১৩৮৭ - আষাঢ় ১৩৮৮।

২. তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীক্ষণ, শারদ সংখ্যা- ১৯৭০।

৩. সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেনু, অলোক রায়, দিগঙ্গন, অক্টোবর- ১৯৮২।

৪. প্রবাসী সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী, শঙ্কর ঘোষ, অনুভূতি, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, দ্বিতীয় বর্ষ- দ্বিতীয় সংখ্যা।

৫. সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ চৌধুরীচতুষ্কোণ ,, শারদীয়া সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন- ১৩৮৪।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ.

দ্বিতীয় সেমেস্টার

B-CORE-208

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা নাটক

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সভাপতি

২. অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৩. অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৪. অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৫. ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৬. ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৭. অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই ২০২২

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)**Manas Kumar Sanyal**,Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পত্র - **B-CORE –** 208

শিরোনাম : উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা নাটক

পর্যায় গ্রন্থ : ১ জনা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. জনা নাটকের কাহিনি

একক ২. ট্রাজেডি নাটক হিসাবে জনা

একক ৩. নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

একক ৪. জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ২ নূরজাহান : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. নূরজাহান নাটকের চরিত্র বিচার

একক ৬. ট্রাজেডি নাটক হিসাবে নূরজাহান

একক ৭. ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'নূরজাহান' নাটকের সার্থকতা

একক ৮.'নূরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের তাৎপর্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ নবান্ন – বিজন ভট্টাচার্য (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. নবান্ন নাটক রচনার প্রেক্ষাপট ও কাহিনি বিন্যাস

একক ১০. নবান্ন নাটকের নামকরণ ও গানের ব্যবহার

একক ১১. নবান্ন নাটক ও গণনাট্য, নবান্ন নাটকের সংলাপ

একক ১২. নবান্ন নাটকের চরিত্র বিচার

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ টিনের তলোয়ার – উৎপল দত্ত (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. নাট্য কাহিনি

একক ১৪. নাটকের নামকরণ

একক ১৫. সংলাপ

একক ১৬. চরিত্র বিচার

সূচিপত্র

B-CORE- 208

B-CORE-208	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	জনা নাটকের কাহিনি	ড. প্রবীর প্রামাণিক	১-৬
	২.	ট্রাজেডি নাটক হিসাবে জনা	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৬-৭
	৩.	নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৭-১০
	৪.	জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র	ড. প্রবীর প্রামাণিক	১০-৩০
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	নূরজাহান নাটকের চরিত্র বিচার	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৩১-৩৪
	৬.	ট্রাজেডি নাটক হিসাবে নূরজাহান	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৩৪-৩৫
	৭.	ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'নূরজাহান' নাটকের সার্থকতা	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৩৫-৩৮
	৮.	'নূরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের তাৎপর্য	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৩৮-৫২
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯	নবান্ন নাটক রচনার প্রেক্ষাপট ও কাহিনি বিন্যাস	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৫৩-৫৮
	১০	নবান্ন নাটকের নামকরণ ও গানের ব্যবহার	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৫৮-৬০
	১১	নবান্ন নাটক ও গণনাট্য, নবান্ন নাটকের সংলাপ	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৬০-৬৪
	১২	নবান্ন নাটকের চরিত্র বিচার	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৬৪-৯৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩	নাট্য কাহিনি	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৯৬-১০১
	১৪.	নাটকের নামকরণ	ড. প্রবীর প্রামাণিক	১০১-১০৩
	১৫.	সংলাপ	ড. প্রবীর প্রামাণিক	১০৩-১০৬
	১৬.	চরিত্র বিচার	ড. প্রবীর প্রামাণিক	১০৬-১২৫

প্রথম পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ১

জনা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ

একক - ১

‘জনা’ নাটকের কাহিনী

বিন্যাসক্রম :

১.১.১.১ : ভূমিকা

১.১.১.২ : ‘জনা’ নাটকের কাহিনী

১.১.১.৩ : নাটকীয় বিরোধ

১.১.১.৪ : নামকরণ

১.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.১.১ : ভূমিকা

বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে বাংলা নাট্য আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ শুধুমাত্র নাট্যকার বা অভিনেতা হিসেবে আমাদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, তাই নয় তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটক লেখা এবং অভিনয় জগতে প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিকে ছিলেন নাটক রচয়িতা, অপরদিকে অভিনেতা, নাট্যশালার পরিচালক, নাট্যকর্মীদের শিক্ষক। এই বিবিধ কারণের জন্য সমকালীন সময়ে গিরিশচন্দ্র প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমকালে এবং পরবর্তীকালে যে পরিমাণ প্রশংসা লাভ করেছিলেন, তা খুব কম নাট্যকারেরাই অর্জন করেছেন। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁকে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু বলা প্রয়োজন, যে গ্যারিক শুধুমাত্র অভিনেতা ছিলেন, আর দু-একটি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক এবং নাট্যকর্মীদের শিক্ষক ছিলেন। আবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে মহান কবি বলেও উল্লেখ করেছেন। আবার আধুনিক যুগের নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত মনে করেন,

> “গিরিশচন্দ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তো বটেই, তাঁর যেকোনো রচনা বিশ্বনাট্যসাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য।” আবার তাঁর নাটকে আকৃষ্ট হয়ে আবেগের বশে তাঁকে শেক্সপীয়রের পাশেও বসাতে চেয়েছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষায় ছন্দ এবং অলঙ্কারের প্রবর্তক ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কুমুদবন্ধু সেন বলেছেন—“আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন জগতের সকল জাতি তাঁহার গ্রন্থাবলী ভক্তি সমাদরের সহিত পাঠ করিবে।”

নাট্যজগতে আবির্ভাব ঘটে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে। তিনি ছিলেন একজন সুঅভিনেতা ও মঞ্চ পরিচালক। অভিনয় করার মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র সহ ঐ সময়ের একাধিক নাট্যকারের রচিত নাটক অভিনয় শেষ করেন। তারপরই বাংলা নাট্যসাহিত্যে একদিকে যেমন নতুন নাটকের অভাব ঘটল, তেমনি অপরদিকে, বাংলা নাটকের দর্শকদের একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রয়োজন পড়ল নতুন বাংলা মৌলিক নাটকের। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যশালার প্রয়োজনে বাংলা নাটক লিখতে শুরু করলেন।

সমকালীন নাট্যশালা, নাটক, অভিনেতা-অভিনেত্রী দর্শক প্রভৃতি সম্পর্কে সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞতা যার ছিল তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যশালা ও সাধারণ দর্শকের মনের মতো করে নাটক লেখার অভিজ্ঞতা একমাত্র গিরিশচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সাফল্যে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে প্রায় ১০০টির মতো নাটক উপহার দিয়েছেন। যদিও সব নাটক মঞ্চসাফল্য এবং দর্শক অভিমনে স্থান লাভ করতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সুদীর্ঘকাল অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার হিসেবে যে অবদান রেখেছেন তা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুদীর্ঘকাল নাট্যসাহিত্যে অবস্থান করার ফলে ব্যক্তিগত ও অপরের ভাবনাচিন্তা আশ্রিত হয়ে তাঁর নাটক লেখায় পটপরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রামকৃষ্ণদেবের ভাবনাচিন্তা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কখনো বা সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করে বৈরাগ্যের পথকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর এই ভাবনা চিন্তার পরিবর্তন তাঁর নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টাতে বাংলা নাটক সর্বপ্রথম উন্নীত হয়। নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষিণ দেওয়ার জন্য তিনি স্কুল স্থাপন করেন। বাংলার একাধিক নাট্যশালার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে শুরু করে ক্ল্যাসিক, মিনার্ভা, স্টার প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তাঁরই হাতের তৈরি করা একাধিক পরিচালক এবং অভিনেতা জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, যেমন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নটী বিনোদিনী প্রমুখেরা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ৩৫ বছর ধরে অভিনয় ও নাটক রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটক, পঞ্চ রং, গীতিনাটক, সামাজিক নাটক, ভক্তিরসাশ্রিত নাটক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) গীতিনাট্য : আনন্দ রহো (১৮৭৭), আগমনী (১৮৭৭), অকালবোধন (১৮৭৭), দোললীলা (১৮৭৮), মোহিনী প্রতিমা (১৮৮১) প্রভৃতি। অঞ্জলি গিরিশচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা।

(খ) পৌরাণিক নাটক : গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটকের জন্যই সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য এই ধরনের নাটকে সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে। যেমন - ১৮৮১ সালে প্রকাশিত — 'শিবের বিবাহ', 'রাসলীলা', 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যু বধ', ১৮৮২ সালে - 'সীতার বিবাহ', 'ব্রজ বিবাহ', 'সীতা হরণ', ১৮৮৩ সালে - 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত', 'নলদময়ন্তী', ১৮৮৪ সালে 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'কমলে কামিনী', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'বৃষকেতু', ১৮৮৫ সালে - 'প্রভাসযজ্ঞ', ১৮৯০ - 'মহাপূজা', ১৮৯৩ সালে - 'জনা', ১৯০০ সালে - 'মণিহরণ', 'পাণ্ডব গৌরব', 'নন্দদুলাল', ১৯০৫ সালে - 'হরগৌরী'।

(গ) জীবন চরিত্রমূলক নাটক : 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'বুদ্ধদেব চরিত্র' (১৮৮৫), 'নিমাই সন্ন্যাস' (১৮৮৮), ইত্যাদি। এগুলি জীবনচরিতমূলক হলেও মূলত ভক্তিরসাশ্রিত। তরল ভক্তিরস ও মধ্যযুগীয় দেববাদে সুগভীর বিশ্বাস এই নাটকগুলিতে ধরা পড়েছে।

(ঘ) সামাজিক নাটক : 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৭), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শাস্তি' (১৯০৭), ইত্যাদি।

(ঙ) ঐতিহাসিক নাটক : 'মীরকাসিম' (১৯০৪), 'অশোক' (১৯০৪), 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), ইত্যাদি।

(চ) প্রহসন : 'সপ্তমীতে বিসর্জন' (১৮৮৫), 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬), 'বড়দিনের বকশিস' (১৮৮৭), 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' ইত্যাদি।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রকৃত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে। তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য হৃদয়-প্রধান ভাবের আশ্রিত ভক্তিরসকে গ্রহণ করেছিলেন পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিরসকে অবলম্বন করে পৌরাণিক নাটকে এক গণজোয়ার আনলেন। আর এই জোয়ারেই সমৃদ্ধশালী হয়েছে বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা পৌরাণিক নাটক। এই সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজেই তাঁর লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেছেন —

> "জাতীয়বৃত্তি পরিচালিত ব্যাতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম, দেশ হিতৈষণা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তা হতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধর্মপ্রাণ যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাহারা কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয় তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে। হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিত হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভাষণ তরবারী ধার উচ্ছেদ হয় নাই।"

(গিরিশচন্দ্র রচিত পৌরাণিক নাটক প্রবন্ধ, রঙ্গালয় পত্রিকা ৩০ চৈত্র, ১৩০৭)

তবে পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেই গিরিশচন্দ্র বেশি সফল। তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' (১৮৯৩) নাটকটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি নাটক। জনাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। তার স্বামী নীলধ্বজ এবং পুত্র প্রবীর। প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া আটকালে অর্জুনের সঙ্গে প্রবীরের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে প্রবীর নিহত হয়। অন্যদিকে প্রবীরের মাতা জনা প্রবীরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করলে কৃষ্ণ তা ব্যর্থ করে দেয়। শেষপর্যন্ত জনা দুঃখদীর্ণ হয়ে গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেয়। নাটকটি পৌরাণিক হলেও ভক্তিরসের আধিক্যে নাটকের সংঘাত অনেকটাই তরলীকৃত হয়ে পড়েছে। এ নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য চরিত্র হল বিদূষক। তার মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণভক্তির সুরটিকে তুলে ধরেছেন গিরিশচন্দ্র।

১.১.১.২ : 'জনা' নাটকের কাহিনী

প্রবীর কাহিনী, জনা কাহিনী এবং কৃষ্ণ কাহিনী — এই তিনটি কাহিনী 'জনা' নাটকের কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নাটকের নামকরণ থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জনা কাহিনী এই নাটকের প্রধান কাহিনী। কিন্তু এই নাটকে জনা চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনা আদৌ আবর্তিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই এই নাটকের কাহিনী বর্ধিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমাময় রূপের ঐশ্বর্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাহিনীর উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খল হলেও পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তিনি ভক্তির পথে পা বাড়িয়েছিলেন এবং সত্যিকারের হরিভক্তি পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর নিজের কথাতেই স্পষ্ট—"একবার হরিনাম বলার, গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সকলে আশীর্বাদ করুন যেন হরিনামের গুণ আমাতে ফলবতী হয়।"

কৃষ্ণভক্তিতে আত্মহারা গিরিশচন্দ্র ‘জনা’ নাটকে সেই কৃষ্ণভক্তির কথাই বলেছেন। ফলে জনা ও প্রবীরের কাহিনী কৃষ্ণ কাহিনীর কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। আসলে জনা ও প্রবীর কাহিনী কৃষ্ণ কাহিনীর পরিপূরক হয়েছে এই নাটকে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রবীরের কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন, তা শুধুমাত্র কৃষ্ণের অলৌকিক কাহিনীকে রূপদানের জন্য। প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া বন্দী করলে পাণ্ডবদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে এবং সেই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। শিবের বলে বলীয়ান প্রবীরের বিনাশ সাধনের জন্য হস্তিনানগর ত্যাগ করে পাণ্ডব শিবিরে কৃষ্ণের আবির্ভাব দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে এবং কৈলাসে মহাদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভয়দানের মধ্যে দিয়ে প্রথম অঙ্কের কাহিনী শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রবীর নিধনের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ প্রবীরের হৃদয়ে কামপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার জন্য কাম ও রতিকে প্রবীরের কাছে পাঠিয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে প্রবীরের কাহিনী ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রবীর রমণী মোহে পতিত হয়ে হারিয়েছে দুর্লভ অস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রবীরকে বধ করার যে পরিকল্পনা তাও সফলতার দিকে এগোতে থাকে। ব্যভিচারী কার্যকলাপের আত্মগ্লানিতে মর্মবিদ্ধ প্রবীর নিজের মৃত্যু কামনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যুকেই সে বরণ করে নেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রথম অঙ্ক থেকে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত প্রবীর কাহিনীকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। পাণ্ডব শত্রু প্রবীরকে হত্যা করাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লক্ষ। নাটকের কাহিনীও সেই দিকেই অগ্রসর হয়েছে। প্রবীরের মৃত্যু সেই উদ্দেশ্যকেই সফলতা দিয়েছে।

আবার চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পেয়েছে। প্রবীরের মৃত্যু পাণ্ডবদের স্বস্তি দিতে পারেনি। কারণ জনা, অবশ্য প্রবীরকে বিনাশ করবার জন্য কৃষ্ণকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে, জনাকে তেজহীন করতে ততটা করতে হয়নি। চতুর্থ অঙ্ক থেকে জনাকে কেন্দ্র করে কাহিনী নতুন করে শুরু হলেও আসলে প্রাধান্য পেয়েছে কৃষ্ণকাহিনী। জনা কাহিনীর যা কিছু আকর্ষণ তা চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ইতি টেনে দিয়ে নাট্যকার কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই মাহিষ্মতীপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে বিদূষকের কৃষ্ণদর্শন ও জনার অলৌকিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাহিষ্মতীপুরের শান্তিস্থাপন প্রাধান্য পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আসলে সেই কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে।

সুতরাং চতুর্থ অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত কৃষ্ণের অলৌকিক মায়া, মাহিষ্মতীপুরে আগমন ও দর্শনদানের মাধ্যমে কৃষ্ণকাহিনী রূপলাভ করেছে। আর জনা কাহিনীটি যেন কক্ষচ্যুত নক্ষত্র — যে কিনা নিঃসঙ্গিনী, একাকিনী।

তবে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হলেও নাট্যকার ও নাটকের কাহিনী ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ প্রবীর বা জনা কাহিনীর কোনোটিকেই গিরিশচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেননি। প্রথম অঙ্ক থেকে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত প্রবীর কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। আবার জনা প্রবীর কাহিনীর অন্তরালেই থেকে গেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে জনাকে কেন্দ্র করে কোনো কাহিনী রচিত হয়নি; হয়েছে জনার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার বর্ণনা। তাই প্রবীর ও জনাকে অবলম্বন করে কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাট্যকার কাহিনী ঐক্যের প্রতি অবহেলা করেছেন। গিরিশচন্দ্র প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী কাহিনী ঐক্য রচনা করেছেন, কার্যকারণ সূত্রের অনিবার্যতা বা অপরিহার্যতার নীতি নিয়ম অনুসারে নয়।

১.১.১.৩ ঃ নাটকীয় বিরোধ

এই নাটকের প্রধান বিরোধ প্রবীরের সঙ্গে পাণ্ডবদের। এই বিরোধের কথা প্রথম অঙ্কেই পরিলক্ষিত। জনার সঙ্গে কিন্তু পাণ্ডবদের সরাসরি কোনো বিরোধ ছিল না, জনা নিজেই প্রবীরের বিরোধকে নিজের মনে করে নেয়। আবার অপরপক্ষে কৃষ্ণ জানত যে জগতে একমাত্র অজেয় প্রবীর, তাই প্রবীর নিধনেই কৃষ্ণ সক্রিয় হয়েছিল। এই দিক থেকেও জনা কোনো প্রত্যক্ষ বিরোধের কেন্দ্রে আসে না। প্রত্যক্ষ বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে প্রবীরই। এই প্রত্যক্ষ বিরোধকেও যথাযথ রূপ দিতে ব্যর্থ গিরিশচন্দ্র। কারণ প্রবীর শেষপর্যন্ত পাণ্ডব বিরোধিতা ত্যাগ করে নিজের ব্যভিচারী জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই জীবন ত্যাগ করেছে। আবার কৃষ্ণের সঙ্গে প্রবীরের বিরোধেরও অবসান ঘটে অলৌকিক উপায়ে। আর জনার বিরোধ তো কোথাও-ই বাস্তব রূপ পায়নি। পুত্র শোকাতুরা নারীর হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন ও জ্বালাময়ী ভাষণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছে। আসলে মহাদেবের আশ্বাসদানই এই নাটকের বিরোধকে ইতিপূর্বেই অবসিত করেছে। পরবর্তীতে প্রবীর বিরোধের ঘটনা নেহাতই গতানুগতিক। এই অর্থে এ নাটকে আপাতদৃষ্টিতে যা বিরোধ বলে মনে হয় তা কিন্তু যথার্থ বিরোধ নয়, মুক্তিরই অপরদিক।

'জনা' নাটকের কাহিনীটি ট্র্যাজিক নয়। নাট্যকার প্রবীরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোনো বীরত্বের মহিমা বা মৃত্যুর গরিমাকে প্রকাশ করেননি। বরং প্রবীরের মৃত্যু সুপরিকল্পিত। প্রবীর মহাদেবের কিঙ্কর। স্বর্গচ্যুত এই কিঙ্করের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের জন্যই প্রবীর কাহিনী সৃষ্টি। সুতরাং প্রবীরের মৃত্যুর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের বেদনা জেগে ওঠে না। অন্যদিকে জনাও গঙ্গাজলে আত্মনিমগ্ন হয়ে জাগতিক দুঃখ ও পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চয়েছে। সুতরাং প্রবীরের জীবনও ট্র্যাজিক নয়। জনার জীবনও নয়। অমরাবতীতে প্রত্যাবর্তনের লোভেই যেন জীবন ত্যাগের আকৃতি ও আর্তি ফুটে উঠেছে।

নাট্য কাহিনী রচনাতে অনেক অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। প্রবীর হত্যার ঘটনা থেকে শুরু করে জনার তেজ হরণ এবং জনার তেজকে অলৌকিক তেজে রূপ দেওয়া, গঙ্গারক্ষীদের অলৌকিক কার্যকলাপ, তাদের অশরীরী অবস্থিতি, বিদূষকের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক। এত অলৌকিক কাহিনীর উপস্থাপনায় আসল কাহিনীটিই গুরুত্ব হারিয়েছে। অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করে তোলা হল একটা আর্ট। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেই আর্টের অধিকারী নন। ফলে অতি প্রাকৃতের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সৃষ্টির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে শুরু হয়নি, শেষও হয়নি। ধর্মের জয় দেখানোই এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। মাহিষ্মতীপুরে পাপ সেইদিনই প্রবেশ করেছে যেদিন কৃষ্ণ বিরোধিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপই প্রধান লক্ষ, জনার গঙ্গালাভের মধ্যেই শাপ, তাপ ও পাপের হাত থেকে মুক্তি। ফলে এখানে আক্ষরিক অর্থে কোনো ট্র্যাজেডি নেই। বিয়োগান্ত হলেও এর পরিণতি হয়েছে 'মধুরেণ সমাপয়েত'।

১.১.১.৪ : নামকরণ

সাহিত্যে নামকরণের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই নামকরণ কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ রেখে করা হয়। বিষয়বস্তু, প্রধান-প্রধান চরিত্র, প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়। আবার ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণের রীতিও সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। 'জনা' নাটকের ক্ষেত্রে এই নামকরণ করা হয়েছে চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই নাটকটিতে জৈমিনী মহাভারত, কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুসরণ লক্ষ করা যায়। এই নাটকের

অবয়ব নির্মাণে জৈমিনী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'গঙ্গাশাপ' বৃত্তান্তে জনার নাটকীয় ক্রিয়াকলাপকেই নাট্যকার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পার্থক্য আছে। জৈমিনী মহাভারতে 'জনা' চরিত্রটি জ্বালা নামে অভিহিত হয়েছে। জৈমিনী ও কাশিদাসী মহাভারতে কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্রগুলির আচরণে পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও গিরিশচন্দ্র জনা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং প্রতিহিংসার রূপটি সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন।

'জনা নাটকের নায়িকা ও প্রধান চরিত্র জনাই। তিনি রাজমহিষী এবং বীর পুত্রের জননী। তার নির্ভিক মানসিকতার পরিচয় কাশিরাম দাস যেমন দিয়েছেন তেমনি মধুসূদনও তাঁর 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রেও দিয়েছেন। আবার শেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটকের রানী মার্গারেট চরিত্রের প্রভাবও জনার মধ্যে লক্ষ করা যায়। বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিমূর্তি হল জনা। প্রবীর যখন পিতার কাপুরুষতার জন্য কর্তব্য পালনে বিমুখ তখন মাতা জনাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে কর্তব্য পালনের জন্য। পতিভক্তি ও কর্তব্যবোধের মধ্যে জনার কাছে কর্তব্যবোধই জয়ী হয়েছে। আবার অলৌকিক শক্তির নির্ভরতাও জনা চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে গঙ্গাভক্তি। পুত্রের প্রতি তার একটি উক্তিতেই তা প্রমাণিত—

"কারে ভয় / জাহ্নবী সহায় / স্মরিয়ে জাহ্নবী পদ

প্রবেশ সমরে / পাণ্ডব সহায় যদি বুঝে

জুরন্দর / তবু জয় হইবে সমর।"

জনা যে তেজস্বিনী নারী তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বামী নীলধ্বজকে বলা একটি কথাতে—

"ধন্য ধন্য মহারাজ / দাসত্বে আনন্দ তব

রাখিলে ক্ষত্রিয় কীর্তি অতুল জগতে / পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাস।"

এইভাবেই জনা বার বার তার নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে নাটকের মধ্যে।

বীর পুত্র প্রবীরের মৃত্যুর পর জনা মর্মান্তিক শোকে প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। এই ঘটনার সঙ্গে শেক্সপীয়রের রানী মার্গারেটের সাদৃশ্য অনেকখানি লক্ষ করা যায়। রানী মার্গারেটও পতি-পুত্র শোকে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিল। নাটকটিতে জনা ও প্রবীরকে কেন্দ্র করে নাটকীয় জীবন দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। নাটকে পুত্র ও মাতার ব্যক্তিত্বই সর্বত্র প্রকাশিত। অন্যদিকে জনা চরিত্রের সুতীব্র পাণ্ডব বিদ্বেষ, স্বামী ও অন্যান্য কৃষ্ণভক্তদের ক্ষেত্রে বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবও প্রকটিত। প্রতিহিংসার অগ্নিকন্যা চরিত্রটিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে লৌকিক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জনা পৌরাণিক নাটক। আর পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেনা। দুঃখ-আঘাত-সংঘাত এ সবই মধ্যেকার ঘটনা। পরিণতিতে শান্তি ও মুক্তি। আর সেই পথ রেখেই নাটকের শেষে যুক্ত হয়েছে ক্রোড় অঙ্ক। এই ক্রোড় অঙ্কে জনা স্বর্গে গমন করে হর-পার্বতীকে দর্শন করেছে। সেখানে জনাকে দেখা যায়—

"নহে আর পুত্র শোকে উন্মাদিনী / প্রবঞ্চ বুঝিয়ে

ভূতা, মন কর স্থির।"

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায় যে প্রথাগত ভঙ্গিমাতেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'জনা' নাটকের নামকরণ করেছেন। পৌরাণিক নাটকে প্রধানত মূলরস হিসেবে ভক্তিরসকেই বেছে নেওয়া হয় এবং

তারই মাহাত্ম্যকীর্তন করা হয়। 'জনা'তেও তাই-ই ঘটেছে। জনা চরিত্রের বহুমুখীতার পরিচয় তুলে ধরে নাট্যকার শেষপর্যন্ত জনার মধ্যে দিয়ে দেবমাহাত্ম্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই দিক থেকে নামকরণ যথাযথ হয়েছে।

১.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জনা' নাটকের গঠন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। পৌরাণিক নাটকরূপে 'জনা' কতদূর সার্থক–তা' দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৩। 'জনা' নাটকের নামকরণ কতদূর সার্থক–তা' দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। 'জনা' নাটকের নাটকীয় বিরোধ সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

————————

একক - ২

ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'জনা'

বিন্যাসক্রম :

১.১.২.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'জনা'

১.১.২.২ : 'জনা' নাটক : নব্য পুরাণ

১.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.২.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'জনা'

পৌরাণিক নাটকের মূল সুর ছিল ধর্মচিন্তা, ভক্তিরস, দেবমাহাত্ম্য প্রভৃতি ফলে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির পরিণতি ও আঙ্গিক সবক্ষেত্রে পৌরাণিক নাটকে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। আবার সংস্কৃত নাটকের রীতি ছিল মিলনাত্মক, তা কখনো বিয়োগান্তক ছিল না। কাজেই বাংলা নাটকেও অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের মিলনান্তক পরিণতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'জনা' নাটকটিতেও জনার ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ট্র্যাজেডির ভাবকে এ নাটকে রক্ষা করতে পারেননি।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—ট্র্যাজেডির বিষয় হবে গুরুগম্ভীর। নায়ক বা নায়িকার চরিত্রের কোনো ভুল (Error) থেকেই ঘটবে তার পতন। সেই পতন দেখে দর্শক মনে একই সঙ্গে করুণা ও ভীতির (Pity and Fear) উদ্রেক ঘটবে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে দায়ী থাকে নিয়তি, আর শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে নিয়তির সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্রের দুর্বলতাও ট্র্যাজেডির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুর্বলতাকে বলা হয়েছে অহংকার ও ত্রুটি। চরিত্রের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

এবার আমরা 'জনা' নাটকটির দিকে আলোকপাত করব। নাটকটিতে নায়িকার প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই 'জনা'কে 'She tragedy' বললেও সঙ্গত হয়। জনা ক্ষাত্র বংশীয় নারী। তিনি পুত্রকে বীরধর্ম পালনে উৎসাহিত করেছেন। আর তা করতে গিয়ে পুত্রের যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি অশ্রু বিসর্জন করবেন না। পুত্রবধূকে তিনি বলেছেন জয়-পরাজয় যুদ্ধের নিয়ম। অতএব তার কর্তব্য হল স্বামীকে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া। এইভাবে জনা চরিত্রটির মধ্যে যথার্থ ব্যাক্তিত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। জনার মধ্যে একটি অর্ন্তদ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে গঙ্গার প্রতি তার ছিল অচলাভক্তি, অন্যদিকে শিব ও পার্বতীর প্রতি তার মন যথেষ্ট ভক্তিনির্ভর ছিল না। এই দ্বন্দ্বই জনাকে সক্রিয় করে রেখেছে। সকলে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরবশ হলেও জনা কিন্তু ছিল কৃষ্ণবিমুখ। জনার আদেশেই প্রবীর অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটিকে আটকে রাখে এবং অনিবার্য যুদ্ধে প্রবীর প্রবল বীরত্ব প্রদর্শন করে। জনা সর্বদাই প্রবীরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছে। সে বলেছে —"রণে যেতে পুত্রে আমি কভু না বারিবঙ্গ"

এহেন জনার জীবনে চরম আঘাত নেমে আসে প্রবীরের মৃত্যুতে। সে হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ। প্রতিশোধ নিতে চাইলে সে তার স্বামী নীলধবজকে সঙ্গে পায় না। কারণ নীলধবজ কৃষ্ণভক্ত। অর্থাৎ দেখা যায় জনার দ্বন্দ্ব শুধু হৃদয়েরই নয়, বাইরের জগতের সঙ্গেও তাকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ জনা চরিত্রটি পরিকল্পনায় মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা', 'প্রমীলা', শেক্সপীয়রের

'রিচার্ড দ্য থার্ড, প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং জনাকে যে একটি ট্র্যাজিক নায়িকা হিসেবে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা নাট্যকারের ছিল তা গোপন থাকেনি।

জনা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে চরিত্রটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জনা বীর রমণী, বীর পুত্রের জননী এবং ভক্তিমতী, পতিভক্তি, বাৎসল্য ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা এই তিনটির ত্রিবেণী সঙ্গমে চরিত্রটি যথার্থই নাটকীয়তা লাভ করেছে। এতদসত্ত্বেও চরিত্রটি ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি। জনা শেষপর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে আত্মসমর্পণ করে নিজের সমস্ত দুঃখকে ভুলতে চেয়েছে। এখানেই জনার জীবনের ট্র্যাজেডি। আপন কর্ম প্রেরণা ও নৈতিক শক্তিতে অচল থেকে তিনি যে সংগ্রাম করেছেন তাকে নাট্যতত্ত্বের ভাষায় 'Spectacle of doing something horriable' বললে ভুল হয় না। অন্যদিকে প্রবীরের মৃত্যুর তীব্র বেদনা আমাদের মনে 'Sufferings of something terriable' বলা যেতে পারে। এদিক থেকে বলা যায় জনা চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। গঙ্গাবক্ষে জনার আত্মবিসর্জন দর্শকের মনে 'Pity' ও 'Fear' জাগিয়ে তোলে।

তবে শেষপর্যন্ত দেখা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ পৌরাণিক নাটকের নিয়মকে মানতে গিয়ে জনা চরিত্রটির ট্র্যাজিক ভাবকে অঙ্কুরে বিনাশ করেছেন। নাটকের শেষে একটি 'ক্রোড় অঙ্ক' যুক্ত করা হয়েছে। এখানে পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত জনা চরিত্রটি স্বভাবধর্মে বিচ্যুত হয়েছে। এখানে জনাকে দেখা গেছে —

"নহে আর পুত্র শোকে উন্মাদিনী

প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ মন কর স্থির।"

ট্র্যাজেডির সমস্ত উপাদানগুলি সুচারুরূপে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ভক্তিরসের পরিপূর্ণতার জন্য জনার রূপান্তর ঘটিয়েছেন নাট্যকার এবং শেষে জনা চরিত্রের শাস্ত্রসম্মত রূপান্তর ঘটিয়েছেন। আর এখানেই 'জনা' নাটকের জনা চরিত্রটি ট্র্যাজেডির সমস্ত সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়ে শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি।

১.১.২.২ : 'জনা' নাটক : নব্য পুরাণ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের প্রারম্ভকাল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যকাররা নাটক লিখতে শুরু করেন। বাংলা নাটক প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটক থেকে বিষয় গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য নাটকের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে পাশ্চাত্য নাটকের জীবনবোধ, আদর্শ, গঠনরীতি এবং নব্যচিন্তার প্রভাব বাংলা নাটকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সেই পথকে অনুসরণ না করে থাকেননি। তাঁর নাটকেও পাশ্চাত্য প্রভাব সুদৃশ্য ও সুস্পষ্ট। তবে তা করতে গিয়ে সবক্ষেত্রেই যে তিনি সফল হয়েছেন এমন কথাও বলা যায় না।

উনিশ শতকীয় নাট্যধারার মধ্যে বহুল জনপ্রিয় ছিল পৌরাণিক নাটকের ধারা, যেগুলি বাঙালীকে সারা বিশ্বের মানুষের চাইতে স্বতন্ত্র করেছে। সেই ভক্তিভাব, ধর্মবিশ্বাস, আবেগময়তা প্রভৃতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে পৌরাণিক নাটকে। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

পৌরাণিক নাটকের প্রধান বিষয় পুরাণ কথিত কথা। এছাড়া দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, অলৌকিক, অপ্রাকৃত ঘটনা পৌরাণিক নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই ধরনের নাটকের মূলরস হল ভক্তিরস এবং নাটকের শেষে দেবতার জয় দেখান হয়। 'জনা' নাটকেও এই শর্তগুলি পালন করা হয়েছে। তবুও 'জনা'র কাহিনী ও উপস্থাপনা অনেকক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য অনুসারী। এই নাটকে তাই পুরাণ কাহিনীর পাশাপাশি নব্য ভাবনাচিন্তার ছাপ লক্ষ করা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'জনা' নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে জৈমিনী মহাভারত, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছেন। চরিত্র, কাহিনী বিন্যাসের ধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট শিল্পসার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া মধুসূদনের জনা পত্রিকাটিও গিরিশচন্দ্রের স্মরণে ছিল। তবে গিরিশচন্দ্র নাটকটি লিখতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিষয় সংগ্রহ করলেও নিজস্বতার পরিচয় তিনি রেখেছেন। তাই বহু জায়গায় মূল পুরাণের চেয়ে অধিকতর মানবমুখী হয়ে উঠেছে।

পৌরাণিক নাটকে প্রধানত মিশ্র রসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জনা'তেও মিশ্ররীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যদিও এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসের মাধুর্যকে তুলে ধরতেই প্রয়াসী হয়েছেন তা সত্ত্বেও এখানে নারী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই কারণে জনা চরিত্র হয়ে উঠেছে অনেক মানবিক।

কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেও গিরিশচন্দ্র কাশীরাম দাসের চেয়ে কতগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন নীলধবজের কৃষ্ণভক্তি। কাশীদাসী মহাভারতে নীলধবজ ভক্তিপ্রবণ হয়ে নয়, ভয়বশতই কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কাশীরাম দাসের নীলধবজ সম্মুখে পুত্রকে নির্মমভাবে নিহত হতে দেখে ও নিজের প্রাণরক্ষার্থে ক্ষত্রিয়রূপ সমস্ত গুণগুলিকে তুচ্ছ করে। গিরিশচন্দ্র নীলধ্বজকে যথার্থ কৃষ্ণভক্ত রূপে দেখিয়েছেন। উনিশ শতকীয় নব্যদৃষ্টিকোণ থেকেই গিরিশচন্দ্র মহাভারতের কাহিনীকে দেখেছিলেন।

আবার জনা চরিত্রের ক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র পরিবর্তন আনেন। জনা চরিত্রের উপর শেক্সপীয়রীয় নারী চরিত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে চরিত্রটি বাঙালী নারীর মতো স্বভাবকোমল হয়ে ওঠেনি বরং তেজদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কাশীরাম দাসের জনা ছিল অনেক ভীরু। সেই ভীরুতা গিরিশচন্দ্রের জনায় স্থানতো পায়-ই-নি বরং পুত্রঘাতীর কাছে আত্মসমর্পণকারী স্বামীর প্রতি দুর্মর ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রবীর চরিত্রের ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী গিরিশচন্দ্র। 'A mid Summer night's dream' নাটক থেকে প্রবীরের চরিত্র অঙ্কনে তিনি সাহায্য নিয়েছেন। এছাড়া জনা নাটকে মায়াকাননের মায়া কুমারীদের অঙ্কন কার্যটিও শেক্সপীয়রীয় রীতিরই অনুসরণ।

কাজেই বলা যায় যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জনা নাটক রচনার ক্ষেত্রে সমকালীন ভাব ও ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। একথা ঠিক যে পৌরাণিক নাটক রচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তা সত্ত্বেও জনা নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র নব্য পুরাণের এক বিশেষ চেতনাকে স্থান দিয়েছেন, যার ফলে নাটকটি সমকালীন দর্শক পাঠক এমনকি এ কালের নাট্যপ্রিয় মানুষের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয় একটি নাটক।

১.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জনা' নাটকটিতে কী সার্থক ট্র্যাজেডি বলা যায়?—নাটকের পরিণতি আলোচনা করে তোমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করো।

২। 'জনা' নাটকের সংগীতগুলির গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩। 'জনা' নাটকের সংলাপ সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।

——————

একক - ৩

‘জনা’ নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

বিন্যাসক্রম :

১.১.৩.১ : ‘জনা’ নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

১.১.৩.২ : ‘জনা’ ভক্তিরস

১.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.৩.১ : ‘জনা’ নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

ক্রোড় অঙ্ক হল একটি বিশেষ নাট্যআঙ্গিক যা সাধারণত পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। পৌরাণিক নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নাট্যপরিণতিতে এসে একেবারে বিধ্বস্ত (সাধারণত দৈব শক্তির ক্রীড়নক হয়ে পড়ে) ও ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের শর্তানুসারে পৌরাণিক নাটক হয় মিলনান্তক; বিয়োগান্তক নয়। এই শর্ত পালনের জন্য ট্র্যাজিক চরিত্রগুলিকে শেষপর্যন্ত শেষ দৃশ্যে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে দেখা যায় তাদের কোনো দুঃখ শোক নেই, তারা দেবতার পাদপদ্মে নিবেদিত প্রাণ। পৌরাণিক নাটকের এই শেষ দৃশ্যকে বলা হয় ক্রোড় অঙ্ক। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির পরিণতিতে ক্রোড় অঙ্ককে নানা নামে অভিহিত করেছেন। ‘দোললীলা’ নাট্যগীতির ক্ষেত্রে যার নাম ‘পটপরিবর্তন’, ‘সীতাহরণ’ এর ক্ষেত্রে তাই ‘অন্তরীক্ষ’। আবার ‘পাণ্ডব গৌরব’ এ ক্রোড় অঙ্কের নাম ‘পটপরিবর্তন’। ‘জনা’-তে ক্রোড় অঙ্কটি ক্রোড় অঙ্ক নামেই অভিহিত হয়েছে।

তবে এই ক্রোড় অঙ্কের অবতারণার ফলে জনা চরিত্রটি ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি। জনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত লড়াই করেছে। তারপর যখন সে বুঝতে পেরেছে যে প্রতিশোধ গ্রহণে সে ব্যর্থ হবে তখন গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়াকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের দাবি মেটাতে গিয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এরপর একটি ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত করলেন। আসলে উনিশ শতকে কৃষ্ণচর্চার এক নতুন ঢেউ উঠেছিল সেই কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের জন্যই এই ক্রোড় অঙ্কের অবতারণা।

‘জনা’ নাটকের শেষে ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত করার ফলে একদিকে যেমন পৌরাণিক নাটকের শর্ত রক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে দর্শকদের মিলনান্তক নাট্য পরিণতি দর্শনের ক্ষুধা মিটেছে। বাংলা পেশাদার মঞ্চে ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত এবং বর্জিত ‘জনা’ নাটকের দুই ধরনের প্রয়োজনাই নাট্যদর্শকরা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। একদল দর্শক ক্রোড় অঙ্কে জনা-প্রবীর-মদনমঞ্জরীকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে খুব খুশি হত। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ড. দর্শন চৌধুরী বলেছেন —

> “দর্শককে তিনি সচেতনভাবেই ঠকিয়েছেন। ট্র্যাজেডিকে মিলনান্তক করা তো হাস্যকর, গিরিশ সেটি ভালভাবেই জানতেন। এইভাবে গিরিশের বিয়োগান্তক পরিণতি ক্রোড় অঙ্কের মেলতায় প্রশান্তি লাভ করেছে। দর্শক পরিতৃপ্ত হয়েছে।”

অন্যদিকে বিদেশি ট্র্যাজেডি নাটক দেখা একদল দর্শককে খুশি করতে নাট্যচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি

ক্রোড় অঙ্কটি বাদ দিয়ে অভিনয় করতেন। নাট্যমন্দিরে শেষ দৃশ্যের যবনিকা নেমে আসত গঙ্গার এই সর্বশেষ উক্তিতে—“অর্জুন শোণিতে কর শীতল আমায়।”

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে তখন তীব্র বিষাদের ছায়া। ক্যাথারসিসের প্রবাহ। আধুনিক দর্শকরা এতে সন্তুষ্ট হত। তাই দেখা যাচ্ছে যে পৌরাণিক নাটকের শর্তটি পালনের জন্য ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও নাট্যমঞ্চায়নের বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই ক্রোড় অঙ্কটি দেখানো বাধ্যতামূলক ছিল না।

১.১.৩.২ : ‘জনা’ নাটকে ভক্তিরস

বাঙালী ভক্তিপ্রবণ জাতি। এই ভক্তির ফল্গুস্রোত বাঙালীর অন্তরে আবহমানকাল থেকেই প্রবাহিত। ভক্তি যেমন বাঙালীর জীবনের একটি অঙ্গ তেমনি এই ভক্তিকে বাঙালী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে আস্বাদন করতে চায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যও সেই ভক্তিরসকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটকে সেই ভক্তিরসকে পরিবেশন করে বাঙালীর মনে একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে দিয়েছে। আমরা তাঁর ‘জনা’ নাটকটিতে সেই ভক্তিরসের প্রসঙ্গটি আলোচনা করবো। আমরা এখানে বিভিন্ন চরিত্রের কিছু সংলাপের নিরিখে ‘জনা’ নাটকের ভক্তিরসের বিষয়টি আলোচনা করব—জনার গঙ্গাভক্তি ঞ্জ জামাতা অগ্নির কাছে বর প্রার্থনা—

“যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যাজি প্রাণবায়ু ;
ভাগীরথী পদে মতি রহে চিরদিন ;”

নীলধ্বজের কৃষ্ণভক্তি ঞ্জ

“রানী, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ দরশন পাব পাণ্ডব কৃপায় ;
নরদেহ পবিত্র হইবে।”

প্রবীরের মাতৃভক্তি ঞ্জ

“ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি, —
মার নাম কবচ আমার।”

মদনমঞ্জরীর পতিভক্তি ঞ্জ

“প্রাণপতিঙ্গ কাঁদে সতী,
সোহাগে কর হে সাথী;
যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মমঙ্গ”

আবার জনা মদনমঞ্জরীকে পতিভক্তি শিক্ষা দেয় —

“আরে হীনমতি,
পতি-ভক্তি এই কি তোমারঙ্গ

কে বা সে অর্জুন? — কে বা নারায়ণ?

পতিভক্তি এই কি তোমার?”

স্বাহার পতিভক্তি ঃ স্বামী অগ্নির প্রতি সংলাপ

“হই যেন পতি সোহাগিনী,

পতির সেবায় অলস না হই কভু।

ভুল না গো কন্যা তব জননী বিহীনা।”

জনা নাটকে ভক্তির নানা রূপের পরিচয় উপরোক্ত সংলাপগুলিতে স্পষ্ট। কাজেই নাটকটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ‘ভক্তিরত্নাকর’ বলা যুক্তিযুক্ত।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যেসব নাটক রচিত হয়েছে এবং শৌখিন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে তাতে পরিপূর্ণ ভক্তিরস কোথাও ছিল না। গিরিশচন্দ্র পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার, নট ও নাট্যপরিচালক রূপে বুঝেছিলেন যে, কৃষ্ণযাত্রার রসে পুষ্ট বাঙালী দর্শকরা নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তিকে আস্বাদন করতে চায়। সেই কারণেই গিরিশচন্দ্র তাঁর বৃষকেতু, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, রূপসনাতন, বিল্লমঙ্গল ঠাকুর এবং জনা নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্লাবন এনে দিলেন।

‘জনা’ নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির দিক থেকে বিদূষক চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদূষকের কৃষ্ণভক্তি হল সখ্যভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদূষক বলেছেন— “যে হয় তোমার অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত।” প্রকৃতপক্ষে রাধার কৃষ্ণভক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে দুঃখ বরণের চিত্র আছে। ‘জনা’ নাটকে বিদূষক যেন সেই অহৈতুকী মঞ্জরীভাবের ভক্তিরসের কথাই বলেছে। কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে হলে দুঃখ, কষ্ট, বেদনার মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। নীলধবজের নিঃসঙ্গ ভক্তি সাধনায় পারিবারিক দুঃখের ছাপ পড়েছে। আবার জনাও বহুদুঃখের মধ্যে দিয়ে ক্রোড় অঙ্কে এসে পৌঁছেছে। বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণবিশ্বাসই মূল শক্তি, জনা নাটকে বিদূষকের চরিত্রে সেই বৈষ্ণবীয় ‘বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী গীতা, ভাগবত, মিল, বেন্থামের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে উঠছিল। এই সময় বাঙালী কোনো কিছুকে যুক্তিতর্কের বিচার ছাড়া মেনে নিত না। অনেক পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। জনার জীবনে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মানবমুখী আচরণ ধীরে ধীরে বিশ্বাস্য হচ্ছিল। কাজেই আমরা বলেছি জনা নাটকটি দ্বিতীয় ভক্তিরত্নাকর। গিরিশচন্দ্র সেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কর্মময় সন্তান—উনিশ শতকের বাঙালী ভক্তিবাদকে তিনি সঠিকভাবে জনা নাটকে উপস্থিত করেছেন। ফলে ভক্তিরসের নাটক হিসেবে ‘জনা’ আজও বাঙালী দর্শক-পাঠককে সমানভাবে ব্যাকুল করে তোলে।

১.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘জনা’ নাটকের ভক্তিরস সৃষ্টিতে নাট্যকার কতটা সফল হয়েছেন, নাটকই বা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে এ বিষয়ে তোমার অভিমত দাও।

২। ‘জনা’ নাটকের ক্রোড় অঙ্কের গুরুত্ব বুঝিয়ে দাও।

———————

একক - ৪

জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র

বিন্যাসক্রম :

১.১.৪.১ : 'জনা' চরিত্র

১.১.৪.২ : নীলধ্বজ

১.১.৪.৩ : প্রবীর

১.১.৪.৪ : শ্রীকৃষ্ণ

১.১.৪.৫ : বিদূষক

১.১.৪.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.১.৪.১ : 'জনা' চরিত্র

'জনা' নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল—নীলধ্বজ, প্রবীর, বিদূষক, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, বৃষকেতু, অগ্নি, জনা, স্বাহা ও গঙ্গা। এই চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে প্রবীর ও জনা। কেননা নাট্য কাহিনী উভয়কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। তাই এই নাটকে সমস্যা আমাদের বিচার্য বিষয়।

জনার পুত্র প্রবীর হল ক্ষাত্রবীর। নাটকের প্রথমে দেখা যায় অগ্নির নিকটে তার একমাত্র বাসনা —

"প্রবীর ভুবন বিজয়ী রথী - দেহ মোরে অরি,

মরি কিংবা মারি, মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর।"

রাজা নীলধবজ কিন্তু এ ব্যাপারে একান্ত অরাজী। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয় জনা, সে বলে—

"হয় হোক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,

রণ সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।" (১/৪)

প্রবীরের এই রণসাধ মেটাতে গিয়েই জনার জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডির ঘনঘটা।

পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবীর পরাভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু মৃতুই ট্র্যাজেডির মুল কথা নয়। এই ট্র্যাজেডির কারণ চরিত্রের ভ্রান্তি (Error of Judgement বা Hamartia)। প্রথম ভ্রান্তি জনার এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি প্রবীরের। জনা নীলধবজকে বলেছে —

'মৃত্যুশ্রেয়, হেয় প্রাণ হতে' (১/৪)।

রাজ্যের মন্ত্রীকে সে প্রশ্ন করেছে —

'রণ মৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন?' (২/৩)।

নাটকে দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবীর কাম ও রতির সংস্পর্শে এসে হীনবল হয়েছে। যদিও এটা কৃষ্ণের কৌশল কিন্তু যুদ্ধে এই রণকৌশলকে দায়ী করলে চলবে না। সেখানে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। জনার আক্ষেপ কৃষ্ণের রণকৌশলের বিরুদ্ধে। তাই প্রতিহিংসায় জনার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে এবং তার জীবনে নেমে এসেছে ট্র্যাজেডি।

জনা নাট্যকারের অন্তরতম চরিত্র। এটি সমগ্র নাটকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। প্রবীরের মৃত্যু হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। প্রবীরকে নায়কের আসনে বসালে চতুর্থ অঙ্কেই নাটক শেষ হয়ে যায়। তাহলে পুত্রশোকাতুর জননীর হৃদয় দহনের চিত্র দেখানো সম্ভব হত না। পঞ্চম অঙ্কে প্রবীর নেই কিন্তু জনা আছে। নাটকের এটি অনিবার্য অংশ। প্রবীর চরিত্র এ নাটকের উপলক্ষ - নাট্যকারের লক্ষ তাঁর মানসকন্যা জনা। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় অগ্নির কাছে জনার প্রর্থনা —

"নাহি অন্য বাসনা আমার,

যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে ত্যাজি প্রাণ বায়ু।"

পরবর্তীকালে একথাই সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিশেষে জনা চরিত্রে বীরগর্ভ করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে। এখানেই ক্ষাত্রবীর্যের এই চরিত্রটি স্বতন্ত্র পরিণামে চিহ্নিত।

অন্যদিকে প্রবীরের মধ্যে নায়কোচিত কিছু গুণও আছে (বীরত্ব, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি)। নায়কত্ব নিয়ে জনা ও প্রবীরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও প্রবীর ও জনা পরস্পরের জীবনে অপরিহার্য সত্তা। একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে কল্পনা করা যায় না। প্রবীরের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা হল তার মা। সে একান্ত মাতৃভক্ত। তাই জনা চরিত্র প্রবীর চরিত্রের মূল আশ্রয়। জনা নাটকে জনা একাধারে কেন্দ্রীয় ও নাট্যঘটনায় গতিসঞ্চারক চরিত্র। তাই জনা যখন নীলধবজকে বলে —

"তব আজ্ঞা শিরোধার্য মম মহারাজ;

কিন্তু, প্রভু, ক্ষত্রিয় জননী, রণে যেতে

পুত্রে কেন করিব নিষেধ।" (১/৪)

তখন এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে জনার সৌন্দর্যবোধ ও বিচারবুদ্ধির কোমল-কঠোর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবার চরিত্রের পরবর্তী স্তরে দেখা যায় জনা আরো ব্যক্তিত্বময়ী। নীলধবজের প্রতি জনার আরও একটি উক্তি তুলে ধরে তা আমরা প্রমাণ করব। —

"দেহ আজ্ঞা, যার রণে নন্দনে লইয়া ;

আজ্ঞামাত্র চাই — একটা গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,

তনয়ে করিব রথী, সারথী হইব।" (১/৪)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে জনার এই অভীপ্সা উচ্ছাসের মাত্রাধিক্যে একটা অপ্রকৃতিস্থতা। কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনে এটাই তার স্বাভাবিক শক্তির স্ফুর্তি। অবাধ চরিত্র কল্পনার স্বর্গভূমিতে জনার এই নারীরূপ চিত্রণ অনবদ্য। এছাড়াও জনা দেবতার কাছে আরাধনা করে শক্তি অর্জনের প্রত্যাশায়, যাতে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য সে তৈরি হতে পারে। পৌরাণিক নাটকে এই শক্তিই দৈবশক্তি। জনা কায়-মনো-বাক্যে জাহ্নবীর কাছে আরাধনা করে —

"মা জাহ্নবী, তোর পাদপদ্মে পূজা করে পুত্র কোলে পেয়েছি।

দেখো মা, দাসীরে বঞ্চনা কোরোনা।

মা হয়ে মা মার প্রাণে ব্যথা দিয়োনা।" (২/১)

সে আবার নিজেকে পরীক্ষা করে —

"কে রে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠছিস?
আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে। যদি
স্থির না হোস, আমি জাহ্নবী তটে বসে
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে তোকে বার করব।" (২/১)

পরক্ষণেই আবার এ সংশয় কেটে যায় —

"বীরমাতা হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবের
পথে কি কণ্টক হব? জনার জীবন
থাকতে নয়। আমি পণ করেছি, রণ -
রণ-রণ। স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে তা বারণ
হবে না।" (২/১)

আত্মপ্রত্যয়ে অটল জনার এই হল চরিত্র মাধুর্য। এখানে জনা চরিত্রটি হল বহির্মুখী (Extrovert) এবং চরিত্রের মধ্যে বহুর্দ্বন্দ্ব (Direct Conflict) দেখা যায়। একটি উচ্চাঙ্গের চরিত্র চিত্রণের এই পরিস্থিতির সৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব হস্তচিহ্নের স্মারক।

এরপর দেখা যায় জনা প্রবীরের জন্য ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ে এবং জনা ছুটে যায় প্রবীরের শয়নকক্ষে। নিদ্রিত প্রবীরকে সে ডেকে তোলে এবং প্রবীরকে নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলে। মাতৃভক্ত প্রবীর মাতৃ আদেশে জাহ্নবীর আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় পাণ্ডব দমনের উদ্দেশ্যে।

এরপরই শুরু হয় পুত্রের জন্য জনার তীব্র ব্যাকুলতা। তার অশান্ত মন পুত্রের পথ চেয়ে বসে থাকে। এদিকে প্রবীর রণস্থলে কাম ও রতির মরণ ফাঁদে নিজেকে বিসর্জন দেয়। জনা কিন্তু দূর থেকে বোধদৃষ্টি দিয়ে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে। জনা নীলধবজকে বলে —

"প্রাণেশ্বর, প্রাণমম কাঁপে থর থর,
কোনো মায়াবিনী ভুলাল বাছারে।" (৩/২)

এদিকে প্রবীর পরাজিত হয় অর্জুনের কাছে। মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় জনার আদরের দুলালকে। আতঙ্কিতা ও আশঙ্কিতা জনা ছুটে যায় যুদ্ধপ্রান্তরে। মৃত পুত্রকে দেখে তার অসহায় আর্তনাদ —

"হা পুত্র, হা প্রবীর আমার।" (৩/৪)

নাট্যকার এখানে জনা চরিত্রের এক করুণ অথচ মহিমাময় মূর্তি এঁকেছেন। পরক্ষণেই জনার চোখে তপ্ত অশ্রু দেখা যায়। প্রতিশোধস্পৃহায় সে রণরঙ্গিণী মুর্তি ধারণ করে সকল প্রতিকুল শক্তির উদ্দেশ্যে বলে—

"সব মিলে যদি হয় অর্জুন সহায়,
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।" (৩/৪)

আবার স্বামী নীলধবজকে সে বলে —

"চল রণে, ক্ষত্রিয় বিক্রমে"

কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নীলধবজ সে আহ্বানে সাড়া না দিলে জনা তাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়ে না। এরপর থেকে জনা সর্বদাই প্রতিহিংসার অনলে জ্বলতে থাকে। এই শক্তিই তাকে ঘরছাড়া করে। সে আত্মধিক্কারে রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যায়। স্বাহার 'মাতৃ' সম্বোধন তার কাছে মিথ্যাভাষণ বলে মনে হয় এবং বলে—

"কে রাক্ষসী? মা বলিস মোরে,

মরেছে প্রবীর, পুত্রবধূ মম পড়িয়া সমরে,

ফুরায়েছে মা বলা আমার।" (৪/৫)

জনার নিঃশেষিত মাতৃত্ব ও আশাভঙ্গের চিত্রকে গিরিশচন্দ্রের কবিমানস অপূর্ব দক্ষতায় অঙ্কন করেছে। উন্মাদিনী জনার নয়নের তপ্ত অশ্রু শুকিয়ে যায় — 'অনল কেবল, শোক নাই জনার হৃদয়ে' জাহ্নবীতীরে শ্মশানভূমির নিবিড় অন্ধকারে চলে জনার অক্ষম ক্ষাত্রতেজের পিশাচী নৃত্য। ভাই উলুক তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু জনা বলে —

"ঘরে যাব - কোথা ঘর ... মরেছে প্রবীর — কে আছে আমার ... বেদনা বেজে আছে বুকে ... এ প্রতিহিংসা ..... প্রতিহিংসা জ্বলে।" (৫/৩)

শিল্পের (Art) একটা সর্বজনীন রূপ আছে। গিরিশচন্দ্র জনা চরিত্রে তাকে চিরায়ত করেছেন। 'অশুভ শক্তির প্রভাবে পরাজিত একজন পুত্রহারা নারীর কান্নাকে বিশ্বভুবনের' দরজায় তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। জনা এখানে ভারতীয় নারী হয়েও সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বজনের পরিচিত নারী — শিল্পীর হাতে শিল্পীত একটি ট্র্যাজিক চরিত্র।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকের অন্তিম পর্বে জনা চরিত্রের মধ্যে মানুষের এক চিরন্তন হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপ্রকৃতস্থ জনা জাহ্নবীর শীতল জলে আত্মবিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল জ্বালার অবসান ঘটিয়েছে।—

"এসেছি মা বঞ্চনা কোরোনা,

নন্দিনীরে নে গো কোলে।" (৫/৩)

আর এখানেই জনার মতো একটি বীরগর্ভ করুণ চরিত্রের সমুন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পৌরাণিক নাটকের শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভক্তিভাব মিশ্রিত আধ্যাত্মরসের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। জনা নাটকেও তা দেখা যায়। এখানে ক্রোড়অঙ্কে কৈলাসে হর-পার্বতীর পূজারতা প্রসন্নবদনা যে জনাকে দেখা যায়, তা আর এক জনা, গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরস সংস্কারজাত সে অন্য এক পৌরাণিক নারীর চিত্র ও চরিত্র যা তদানীন্তন দর্শক সমাজকে খুশী করেছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও দায়মুক্ত হয়েছেন। চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের এইটুকু দুর্বলতা।

১.১.৪.২ : নীলধ্বজ

জনা, বিদূষক ও প্রবীরের তুলনায় নীলধ্বজ চরিত্রটি অনেক কম জটিল। চরিত্রটির মাত্রাগত বিস্তারও বেশি নয়। নীলধ্বজ প্রকটভক্ত, বিদূষকের মতো প্রচ্ছন্ন নয়। সে রাজা হলেও ইহজগতে তার একমাত্র কামনা কৃষ্ণদর্শন, রাজ্যরক্ষা নয়। সে পিতা, কিন্তু সেখানে তার কৃষ্ণবাঞ্ছার সঙ্গে পুত্রের স্বাভাবিক

বীরত্ববাসনার বিরোধ, সেখানেও কৃষ্ণই তার কাম্য, পুত্রের জয় নয়। সে স্বামী কিন্তু পত্নীর মনোবাসনা ও পুত্রশোকের মর্মান্তিক হাহাকার তার কৃষ্ণার্তির কাছে পরাভব স্বীকার করে।

এ নাটকে নীলধ্বজই একমাত্র চরিত্র, যে দুটি বিবাদমান প্রবণতার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে জনা ও প্রবীরের অর্জুন বিরোধ, অন্যদিকে তার নিজের কৃষ্ণভক্তি। এই বিবাদে তার মধ্যে যে প্রবল অন্তঃসংক্ষোভ ও আত্মদ্বন্দ্বের উদ্ভব হওয়া উচিত ছিল, বিবেকের যে সংঘাত উপস্থিত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল, নাট্যকার তা থেকে নীলধ্বজকে বঞ্চিত করেছেন। নীলধ্বজ এ নাটকে ক্ষত্রিয় রাজা নয়, বীরপুত্রের পিতা নয়, দর্পিত স্ত্রীর স্বামী নয়, সে শেষপর্যন্ত ভক্ত। অগ্নির কাছে তার প্রার্থনা—

“দেহবর,

যেন নটবর নব-ঘন কায়

বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম

নররূপী নারায়ণে পাই দরশন।”

প্রথম থেকেই সে কৃষ্ণে সমর্পিত তার ধ্রুব বিশ্বাস—

“কৃষ্ণার্জুন নর-নারায়ণ,

অবতর হরিতে ধরার ভার

নরশ্রেষ্ঠ পুজ্য লোক-মাঝে।”

সুতরাং তার নির্দেশ ‘কৃষ্ণার্জুনে অবশ্য পূজিবে।’ প্রবীরকে সে বলেছে ‘রাখ বাক্য, রণসাধ ত্যজহ প্রবীর।’ একটু দুর্বলভাবে হলেও তার পিতৃত্বের অনুভব ফুটে উঠেছে প্রবীরের অন্তর্ধানে তার উদ্বেগে —

“কিছু ত বুঝিতে নারি,

বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে?

দেখ, দ্বিপ্রহর উদয় হইল,

তবু কেন গৃহে না আইল?”

কিন্তু পুত্রশোকের আর্তি মুহূর্তে মুছে গিয়েছে, সে ভেবেছে —

“সফল জীবন মম,

পাব আজ কৃষ্ণ দরশন।”

তার এই প্রার্থনা পূরণের জন্য যে মূল্য সে দিয়েছে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সে নিজেই যেন সচেতন নয়। জনার ধিক্কারেও সে আর বিচলিত হয়নি।

“কৃষ্ণ-দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায়

নরদেহ পবিত্র হইবে।”

এর চেয়ে মূল্যবান সেই মুহূর্তে তার কাছে আর কিছু নেই, তাই এই প্রতিরোধহীন রক্তমাংসের আবেগহীন, নিশ্চেষ্ট ও অমেরুদণ্ডী ভক্তি তার সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা জাগায় না।

এইভাবে দেখা যায় মহিষ্মতীপুরীরাজ নীলধবজ ভীরু ও দুর্বল চরিত্ররূপে কাশীরাম দাসের মহাভারতে চিত্রিত হয়েছেন। 'জনা' নাটকের নীলধবজ বীরপুরুষ নন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁকে পরমভক্তরূপে দেখিয়েছেন। যিনি মনে করেন, ঈশ্বরই সব — 'সকলই তোমার ইচ্ছা'। তিনি নিজে যন্ত্রমাত্র। এ যেন গীতার বাণী 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'। তাই তার যুদ্ধে আগ্রহ নেই। —

"জয় আশা নাহিক সমরে

অকারণ প্রজানাশ।"

এই চিন্তার মধ্যে তাঁর রাজার দায়িত্ববোধ ও মনুষ্যত্ব জাগ্রত দেখা যায়। এমনকি প্রবীরের হঠকারিতায় তাঁর দুর্ভাবনা —

"অবোধ বালক,

নাহি জানে পাণ্ডব বিক্রমঙ্গ"

একে ভীরুতা না বলে পিতৃহৃদয়ের সংগত স্নেহ-শঙ্কা বলা যায়। এই পিতৃত্ব পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে কন্যা স্বাহাকে বিদায় দেবার সময় —

"পতিগৃহে যাও, গুণবতী,

ছেদি হৃদয় বন্ধন

বিদায় দিতেছে তোরেঙ্গ

বাছা, কে আছে আমার তোমা বিনাঙ্গ"

তখন পিতৃস্নেহের সঙ্গে সংসারী মানুষের অভিমানও মিশে যায়। পুত্র অকালমৃত, পত্নী স্বামীবিমুখ, নিঃসঙ্গ নীলধবজকে ঈশ্বর ছাড়া দেখায়, আশ্রয় দেবার সত্যিই কেউ নেই। 'দগ্ধ কায়ে আছে মাত্র প্রাণ'— কন্যাকে একথা বলা আসলে খেদোক্তি; ভীরুতা বা দুর্বলতা নয়। কৃষ্ণদর্শন পেতে তাই তিনি উন্মুখ। অর্জুনকে বলেন —

"সখাঙ্গ সফল জীবন মম

পাব আজ কৃষ্ণ দরশন।"

পুত্রশোকের এই পটভূমিতে বাসনা কিংবা ঘোষণা - 'আনন্দের দিন আজি' বিসদৃশ মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে বলা যায় যিনি ঈশ্বরকে দেহমন প্রাণ দেন, তিনিই এমন পারেন। সাংসারিক ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলেনা।

মানুষ নীলধবজকে সেইভাবে দেখা হয় না। অর্জুন তার কাছে এলে তিনিই প্রশ্ন করেছেন —

"কেমনে হে পাষাণ পরাণে

সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম,

ব্যাথা কি হল না ধনঞ্জয়?"

পিতার ও পুরুষের শোকের প্রকাশ এর চেয়ে আর কোন্ ভাষায়, ভাবে সম্ভব? তবু ক্ষমা করেছেন, কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন বলে। সর্বস্ব ত্যাগ না করলে, তাঁকে যে পাওয়া যাবেনা। তবু কি সংশয় নেই? পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা অগ্নিকে বলেছেন —

"রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হল পুরী?"

আসলে শোককে বুকে চেপেই পতিত পাবনকে বরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার সেই অন্তর্গত রক্তের ভিতরে বহমান কান্না জনা বা কেউ দেখেননি। অগ্নি বুঝেছিলেন বলেই জ্ঞানদৃষ্টির কথা বলেন, কৃষ্ণ 'তাপ তব করুণ মোচন' আশীর্বাদ করেন। সেই তাপ দূর হয়েছে অলৌকিক শক্তিতে এও মনে রাখতে হবে। নীলধবজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন শান্তি — 'শান্ত কর অশান্ত প্রাণ' বলেছেন। সত্যিই কি পিতৃ হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত হয়েছে। জনার যে স্নেহ শোকে - ক্রোধে উদ্বেল, নীলধবজে তা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। তাই কৃষ্ণকে বলতে হয় — 'জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলি।' মহাকালের খেলা ও লীলা বলে শান্তনা দেন। দিব্যচক্ষু দান করেন। বস্তুত নীলধবজ এক ভাগ্যহত পুরুষ। সংসারে যিনি শান্তি পাননি; ঈশ্বরে আস্থা যাকে প্রাণপণে খুঁজে নিতে হয়। জনার বিশ্বাসের জোর তাঁর নেই বলে তাকেও ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে ভাবা যায়। যদিও ক্রোড়অঙ্কে নিত্য নিরঞ্জনের জয়গান গাওয়ায় সেই ধার তীব্রতা হারিয়েছে। তবুও যখন যবনিকা পতন হয়, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কোনোটা সত্য? যে আকস্মিক ঝড় নীলধবজের সুখের পরিবার বিপর্যস্ত করে দিল তা সত্য, না দিব্যদৃষ্টিতে তিনি যে দুঃখলেশহীন নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজ্য দেখতে পেলেন তাই-ই সত্য?

এইভাবে দেখা যায় প্রথমে ভক্তি ও আত্মসমর্পণ, পরে মানবিক স্নেহ ব্যাকুলতার মধ্যে নীলধবজের গতিবিধি স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি। কেবল স্বাহার বিদায়চিন্তার মধ্যে তার পিতৃহৃদয়ের বিষণ্ণতাটুকু আমাদের একটু যে ছুঁয়ে যায় তার কারণ এ বিষয়টি বাঙালীর স্বভাবিক বেদনার একটি স্থায়ী উৎস। দুই পরস্পরবিরোধী ধারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বে ও সক্রিয়তায় নীলধবজের চরিত্রটি যেভাবে উজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, নাট্যকার সে বিষয়ে উদাসীন থেকেছেন।

১.১.৪.৩ : প্রবীর

'জনা' নাটকের অপর একটি প্রধান চরিত্র প্রবীর। সে বীরত্বে কারও অপেক্ষা ছোটো নয়। তাকে বাঁচিয়ে রেখে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ্যের রাজা করা যায় না। তাই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করে, প্রবীরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ছলে-বলে-কৌশলে প্রবীরকে পরাজিত করা কৃষ্ণেরই চক্রান্ত।

এই নাটকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে একদিকে মহাবীর প্রবীর ও তার জননী জনা। অন্যদিকে নরনারায়ণ অর্জুন জনার্দনের শ্রীচরণাশ্রিত ভুবনবিজয়ী বীর। উভয়পক্ষই ধর্মের আশ্রিত বটে, কিন্তু প্রবীর কৃষ্ণকে নারায়ণ জেনেও নিজের ক্ষাত্রধর্ম বলি দিতে প্রস্তুত নয় —

প্রবীর —

"অহংকারে ধরিয়ছি ঘোড়া
প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।"

মদনমঞ্জরী —

"ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।"

প্রবীর —

"নিজধর্ম্ম করিলে সাধন
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রতি তাঁর ;
তবে কেন ভাব অকারণ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।"

প্রবীর মাতৃভক্ত। সমস্ত কাজে মাতৃ আজ্ঞা তার শিরোধার্য। প্রবীরের পিতা নীলধবজ যখন তাকে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আদেশ দেয়, তখন অভিমানী প্রবীর মায়ের কাছে এসে জানায় যে ঘোড়া সে ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের অপমান সহ্য করতে পারবে না, সে মৃত্যুবরণ করবে। জনা তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বললেন—বলবানে পূজো দেওয়ার নিয়ম আছে, নরনারায়ণ ধনঞ্জয় প্রবল প্রতাপ বীর, তাকে সম্মান জানাতে কোনো লজ্জা রাখা উচিত নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন —

"শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই, জননী,
দেবতার হবে অপমান।"

পাছে কোনো অকল্যাণ হয় এই ভয়েই জনা পুত্রকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পুত্রের দুর্দমনীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত জনা নিষেধ করতে পারেননি। তিনি ক্ষত্রিয় নারী, বীর জননী, পুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজাকে বুঝিয়ে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

"স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।"

জনা রাজাকে প্রবীরের যুদ্ধে যাবার সম্মতি দিতে বলে। রাজা কিছুতেই রাজী হন না — "জেনে শুনে নারায়ণে না করিব অরি।" দাম্ভিক ধনঞ্জয়কে পরাজিত করার জন্য পুত্র উন্মুখ। "যদি হয় জয়, পূজা লোকময় পাইবে নন্দন মম।" অতএব মহান কাজে ব্রতী পুত্রকে জনা কিছুতেই নিবারণ করবেন না। তিনি শুধু রাজার অনুমতি প্রার্থনা করেন —

"দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞামাত্র চাই;—"

সুতরাং প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সেই যুদ্ধ পরিচালনার প্রধান ভার গ্রহণ করলেন জননী জনা।

প্রবীর ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য নারায়ণের সঙ্গে বৈরিতা করতেও পিছপা হবে না। দেববলে বলীয়ান অর্জুন বাজী ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলে প্রবীর তাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় —

"অশ্ব দিব ফিরায়ে পরাজয় মানি,
ভেবনা সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।"

এই ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানই প্রবীরের পতনের কারণ। এই অভিমানই তাকে কৃষ্ণের সঙ্গে বৈরিতা করতে প্ররোচনা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু প্রবীর সে কথা শোনেনি, বরং কপটের শিরোমণি বলে শ্রীকৃষ্ণকে গালাগাল দিয়েছে —

"জগবন্ধু নারায়ণ, যদি হে কেশবঙ্গ
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার?"

প্রবীরকে কৃষ্ণ আবার অনুরোধ করেন বাজী প্রত্যর্পণের জন্য। কৃষ্ণ আশ্বাস দেয় যে এতে তার মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হবে না। প্রবীর তাও উপেক্ষা করে। সে ছিল অতুলনীয় পরাক্রমশীল বীর। তার অসামান্য বীরত্বের কথা ভীমের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে —

"রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্বেব্দ দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ
কিন্তু এ হেন বিক্রম
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান।"

অর্জুন বলছেন —

"বীর্যবান রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে
* * * *
কৃষ্ণসনে অর্জুনে জিনেছ রণে।"

প্রবীরের এই অপরিমেয় শক্তি ও বীরত্বের মূলে ছিল তার মাতৃভক্তি। —

"দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে
মাতৃভক্তি অপার তাহার।"

মায়ার ছলনায় যেদিন সে মাতৃপদধুলি গ্রহণ করতে বিস্মৃত হল, সেদিনই তার পরাজয় হল। প্রবীরের প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে মাতৃভক্তির অলৌকিক মহিমার কথা ব্যক্ত করেছেন —

"সত্য কহি, শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন-
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধুলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মান ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা,
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।"

প্রবীর চরিত্রের দুয়ি স্পষ্ট 'dimension' এ নাটকে নাট্যকার বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেছেন। প্রথমত, সে বীরকীর্তি ও বীরযশের প্রার্থী, আর তার নিজের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যের অভাব নেই। বয়সে বালক বলে তার এ বিষয়ে অভিমান বরং একটু বেশি প্রকট। দ্বিতীয়ত, সে ইন্দ্রিয় পরবশ; সুন্দরী রমণীর ছলা- কলা-লোভন-লাস্যে সে বীরের আত্মসংযম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি আকস্মিক, দেবতাদের চক্রান্তের ফল। তা সত্ত্বেও প্রবীর চরিত্রের এই পরস্পরবিরোধী দুটি প্রবণতা ঠিক সমন্বিত হয়নি, সামঞ্জস্য পায়নি। বলতে পারি নাটকের আখ্যানের প্রয়োজনের কাছে প্রবীর চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিকে বিসর্জন দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। প্রবীরের 'বীরের সদ্গতি' কামনা প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পরিস্ফুট হয়েছে।

পরের গর্ভাঙ্কে যখন দেখি যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ইন্দ্রজিৎ বধের ধরনে স্বর্গে-মর্ত্যে প্রবীরের পরাভব ও মৃত্যুর জন্য চক্রান্ত চলছে, তখন তার বীরত্বের মহিমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। কারণ সে দেবতাদের দ্বারা মৃত্যুর জন্য চিহ্নিত, সে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে একটি ক্ষুদ্র কীলক মাত্র। তখন তার বীরত্বের আস্ফালনকেও খানিকটা সাজানো ও কৃত্রিম মনে হয়।

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে আমরা লক্ষ করি প্রবীরের অভিমানের একটি অলৌকিক ভিত্তি আছে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শৌর্য নয়। সে মাতৃভক্ত এবং মাতার আশীর্বাদের দুর্দমনীয় শক্তির দ্বারা সমর্থিত—

"মা গো, তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীটি শিরে তোর পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে, -
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে?"

ব্যক্তিগত শক্তি ও যোদ্ধা অহমিকার লৌকিক গৌরবের সঙ্গে মাতৃপদধুলি ও মাতৃনামের অলৌকিক শক্তির ম্যাজিক, বিশ্বাসের আস্ফালন প্রবীরের বীরত্বকে উজ্জ্বল না করে বরং তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠান ভূমিটিকে দুর্বল করে তোলে।

কিন্তু তবু যে যুদ্ধে সে সহজে আত্মসমর্পন করেনি এতে তার প্রকৃতিগত শৌর্যের গৌরব সে অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে। অর্জুনের সন্ধি প্রস্তাব সে সঘৃণা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজের সাময়িক স্খলনের তীব্র অনুশোচনায় তার মধ্যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকে ধিক্কার ও ভর্ৎসনায় কঠোর আঘাত করে সে বলেছে —

"বুঝিয়াছি চক্রী, চক্র সকলই তোমার,

ধিক্ ধিক্‌ঙ্গ মৃত্যু শ্রেয়ঃ এ জীবনে ধিক্,

স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায় -

আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে।

অস্ত্র ধনু হরিয়াছ হরি,

ভাব কি হে তাতে হবে পরাজয়?

দেখিব, কেমনে তুমি রাখিবে অর্জুনে—।"

কৃষ্ণই তাকে বিভ্রান্ত করে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়েছে, কৃষ্ণই তাকে মাতৃপদধূলি দিয়ে যুদ্ধে অজেয় হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছে। কাজেই প্রবীর এখন একা, কেবল নিজের বীর্যবত্তার স্বাভাবিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, কোনো দেবী বা অলৌকিক সমর্থন তার পিছনে নেই, কাজেই সে হয় 'রণক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির' ঢালবে না হয় অর্থাৎ যদি সে জয়ীও হয়, সে আর গৃহে ফিরে যাবেনা, কারণ তাকে 'বেশ্যা-দাস কবে সবেঙ্গ' সে অগ্নিকুন্ডে আত্মবিসর্জন দেবে। এই শেষদিকেই প্রবীরকে আমরা যথার্থ বীরের মহিমা লাভ করতে দেখি। কিন্তু মৃত্যুকালীন স্বগতোক্তির মধ্যে যে সংবাদ আমরা পাই — সে শিবানুচর, মহেশ্বর, তার দাসকে আবার কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন — সে সংবাদ প্রবীর চরিত্রের এই স্বোপার্জিত ও অন্তিম মহত্বের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং হানিকর। ক্রোড় অঙ্কেও প্রবীর ও মদনমঞ্জরী কৈলাসে 'বিল্টবদলে জবাফুলে / পূজিছে পার্বতী-হরে" এই সংবাদ পাই আমরা। প্রবীরের মৃত্যুজনিত অপচয়বোধ তাতে বিন্দুমাত্র কমে বলে মনে হয় না।

১.১.৪.৪ : শ্রীকৃষ্ণ

যদিও এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'জনা' তবুও নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র জনা বা প্রবীর নয়। কেন্দ্রিয় চরিত্র হল শ্রীকৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রাচ্য ধারণার অনুরাগী। তাঁর নাটকে আদর্শ নায়ক হবার যোগ্যতা রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্রেই আছে, জনা বা প্রবীরের নেই। সুতরাং প্রাচ্য ধারণা অনুযায়ী আদর্শ নায়কের আসনে তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই অধিষ্ঠিত করেছেন এই নাটকে।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই এই নাটকের কাহিনী আবর্তিত। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই কৃষ্ণের উপস্থাপনা। নীলধবজ কর্তৃক কৃষ্ণদর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা দিয়েই এই নাটকের কাহিনী শুরু। অগ্নিরও মন্তব্য হল — "নররূপী পীতম্বর আমি এই পুরে; পুরাবেন বাসনা সবার।" মহিষ্মতীপুরে কৃষ্ণের আগমন ও আবির্ভাবের সংবাদ অগ্নি কর্তৃক ঘোষিত হলেও তা নিয়ে বিশেষ কোনো

আগ্রহ দেখাননি। কারণ কৃষ্ণের আগমনে মহিষ্মতীপুরে যে ঝড় উঠবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তার ভাষায় 'কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়," একথা নিশ্চয়। অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে বন্দী করে প্রবীর সেই সর্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অর্থাৎ বিরোধের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ আবির্ভাবের পথকে দ্রুততর করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ মহিষ্মতীপুরকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছে। প্রবীর কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বকে বন্দী করার যে ঘটনা অশ্বের রক্ষক অর্জুনের কাছে অজানা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের কাছে অজানা ছিল না। অলৌকিক শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানেই তা জানতে পেরে হস্তিনা ত্যাগ করে পাণ্ডব শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সেই সংবাদ অর্জুনকে প্রদান করে প্রবীর বিনাশের সকল দায়দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। মহাদেবের কাছ থেকে আশ্বাসবাণী সংগ্রহ করেছে, গঙ্গা রক্ষকদের অশ্বচুরির পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, মদনমঞ্জরী দুর্লভ অস্ত্রদান করে প্রবীর সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছে, আবার কাম ও রতিকে নিয়োগ করে প্রবীরের কাছে পুনরায় সেই দুর্লভ মন্ত্র উদ্ধার করেছে। সর্বশেষে তেজহীন, বলহীন দেবতার আশীর্বাদ বিহীন ব্যভিচারী দুষ্ট প্রবীরকে মাতৃপদ বন্দনার পূর্বে হত্যা করার ইঙ্গিত সে অর্জুনকে দিয়েছে। প্রবীরের মৃত্যুর জন্য কৃষ্ণকে যতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছে, জনার মৃত্যুর জন্য তার এক চতুর্থাংশও পরিশ্রম করতে হয়নি। কেবলমাত্র বৃক্ষরূপে জনার দীর্ঘনিশ্বাসকে বক্ষে ধারণ করে জনাকে করেছে নির্বীর্য ভুজঙ্গিনী, অর্জুনকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। এরপরই মহিষ্মতীতে তার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। এখানে কৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ মহিষ্মতীপুরে উদয় হয়ে সবার বাসনা সে পূর্ণ করেছে। নীলধ্বজকে দর্শন দিয়ে, বিদূষককে ধন্য করে, প্রবীরকে মুক্তি দিয়ে, জনাকে জাহ্নবীর কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মহিষ্মতীপুরে যা কিছু ঘটে গেল তার মূলে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। মহিষ্মতীপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। মহাকালের রথের রশি ধরে শ্রীকৃষ্ণ মহিষ্মতীপুরে আগমন করেছে এবং তারই ভাঙা গড়ার লীলাখেলাকে সমাপ্ত করেছে। ফলে শ্রীকৃষ্ণই এই নাটকের নায়ক চরিত্র, অবশ্য ট্র্যাজিক নায়ক নয়। কারণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী কোনো চরিত্র ট্র্যাজিক নায়ক হতে পারে না। অ্যারিস্টটল সুপারম্যানকে ট্র্যাজিক নায়কের আসন দিতে স্বীকৃত হননি। অতিমানব ট্র্যাজিক নায়ক হবার অযোগ্য।

১.১.৪.৫ : বিদূষক

আলোচ্য নাটকে একমাত্র বিদূষক ছাড়া অন্য কোনো মানব চরিত্রে কোনো প্রকার জটিলতা নেই। প্রতিটি চরিত্রে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র দু-একটি বিশিষ্ট বৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে প্রতিটি চরিত্র জীবনের স্পন্দনপূর্ণ সজীব চিত্র। বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের বংশোদ্ভব, তার ভোগ বিলাস এবং পরিহাসপটুতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু নাম মাহাত্ম্যে তার বিশ্বাস তার নিজস্ব সম্পদ।

বিদূষক নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে; কৃষ্ণভীতি তার চরিত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশই এই চরিত্রটিকে অনন্য সাধারণ করেছে। কথাটা একটু সতর্কভাবে বিচার করা প্রয়োজন। বিদূষক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছে। সুতরাং পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সে ইহকালকেও ভোগ করতে চায়, যদিও তার দৃষ্টিতে জীবনভোগের অর্থ নির্ঝঞ্ঝাটে মোণ্ডার সাহায্যে রসনার পরিতৃপ্তি। তার এই আকাঙ্ক্ষা বিদূষক খুব সহজ ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করেছে "হরি হে তোমার দোহাই, দুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি, দুদিন খেয়ে যাই।" (১/৪)। ইহকাল পরকালের সামঞ্জস্য রেখে তার প্রার্থনা ঃ "হরি হেঙ্গ তোমার মহিমা তুমি নিয়ে থেকো, অন্তিমকাল দেখো, আর রাজধানীতে দুটো মোণ্ডার পথ রেখো।" (ঐ) তাহার বিশ্বাস কৃষ্ণনাম স্মরণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির সাথে ঐহিরক সুখের নিত্যবৈরিতা। এই কারণেই কল্পতরু

উৎসবের সময় ‘হরি নিয়ে ছড়াছড়ি’তে সে অস্বস্তি বোধ করেছে। এই কারণেই জনার সংকল্পে হতবুদ্ধি নীলধবজ শ্রীহরিকে স্মরণ করলে সে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে, “কৃপাময়কে ডেকে ঐহ্যিকের ভালাই কারু কখন হয়নি। .... মহারাজ .... বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ করবেন না। .... বাঁকা ঠাকুর সোজা পথে চলতে শেখেননি।”

এটা ছাড়াও বিদূষকের কৃষ্ণভীতির প্রত্যক্ষ কারণ আছে। বিদুষক যে শুধুই অগ্নির সামনে কৃষ্ণ নামোচ্চারণ করেছে তা নয়। ব্রাহ্মণীর ভাষায় যদিও ‘উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম করেন না।’ (এই উক্তিতে আতিশয্য মার্জ্জনীয়), তবুও একদিন ‘উনি’ ঠিক এই ভুলটিই করেছিলেন—বিদূষক একদিন মনের খেয়ালে বলেছে, “দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বামনির হাতের খাড়ু খোল।” এই খেদোক্তির ভিতর অসাধারণত্ব কিছুই নাই। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে দাম্পত্য জীবনে এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক অনন্যসাধারণ। বিদূষক বলেছে, “সেই অবধি আমার গা ছমছমানি একদিনের তরে যায়নি। (৫/১)।” অবশ্য এই ‘গা ছমছমানি’কে আমরা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারি না, কারণ সত্যকার ‘গা ছমছমানি’ হলে এই সময় সে ব্রাহ্মণীর সাথে হাল্কা রহস্যালাপ করতে পারে না। তবে একথা ঠিক যে তার বিশ্বাস অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারিত তার প্রার্থনা শ্রীহরির চরণে পৌঁছেছে। তিনি আসবেন এবং আসনে তার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না। অর্থাৎ শ্রীহরির দর্শনমাত্র তার ঐহ্যিক ভোগ সুখের সমাপ্তি ঘটবে। আপাতবৈষম্য সত্ত্বেও বিদূষকের কৃষ্ণভীতি নামমাহাত্ম্যে তার বিশ্বাসের সাথে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত।

বিদুষকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তার নির্লিপ্ততা। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তার কথায় ও আচরণে একটা ঔদাসীন্য লক্ষ করা যায়। কল্পতরু উৎসবকালে হরিনামের ছড়াছড়িতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করলেও এই অনুভুতি তাকে কোনোরূপ বিচলিত করে নাই। অগ্নির প্রশ্নের উত্তরে হালকা জবার এর সাক্ষ্য দেয়। প্রবীরের মৃত্যুর পর অভিমানবশতঃ বৃক্ষতল থেকে রাজ্যের নোড়ানুড়ি সংগ্রহ করে শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণীর ইতুভাড় নিয়ে টানাটানি করলেও (৪/২) এই মর্মান্তিক ঘটনা যে সত্যিই তাকে অভিভূত করেছে এমন কোনো নিদর্শন নাই। কিন্তু এই পার্শ্বদৃশ্য (Side Scene) শোকোন্মাদ জনার কাহিনীর বর্ণনার ফাঁকে চিত্তের সমতা আনতে সাহায্য করে। অন্নদাতা রাজাকে ছেড়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করাতেও তার আচরণে কোনোরূপ চাঞ্চল্যের আভাস নেই। (বৈপরীত্য গুণে ‘নল দময়ন্তী’র বিদূষক এবং ‘পাণ্ডব গৌরবে’র কঞ্চুকার দুর্দশাগ্রস্থ রাজার জন্য ব্যাকুলতা স্মরনীয়)। অবশ্য এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। বিদূষকের ধারণা শ্রীকৃষ্ণের রাজপূরীতে আসায় রাজার আশু জীবনাবসানের সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিজের ক্ষেত্রে এইরূপ সম্ভাবনা সে ছাড়াতে চাই। এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিদূষক নিজেই বলেছে, “আমি তো সটকাই, রাজা আমার বাঁচবার আশা রইল, হরিদর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।” (৪/৩)। এই কি নির্লিপ্ততার সাক্ষ্য দেয়? প্রশ্নটি উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে অশ্বত্থবৃক্ষ উপন্যাসের তাগিদে এই চরিত্রটিকে রাজার আশ্রয় থেকে জনহীন প্রান্তরে টেনে আনতে হয়েছে এবং এই থেকেই জটিলতার সৃষ্টি। কিন্তু বিদূষকের এই সময়কার আচরণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবার আগে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আপাতদৃষ্টিতে বাঁচবার তাগিতে রাজার সান্নিধ্য ত্যাগ করলেও বিদূষকের ভোগতৃষ্ণা নেই, অথবা মৃত্যুকেও সে ভীতির চোক্ষে দেখে না। সে ভয় করে হানাহানি কাটাকাটিকে। এই কারণেই জনার সম্মুখে সে অস্বস্তিবোধ করেছে এবং তার কৃষ্ণভীতির পেছনে আছে ‘চক্রী’র নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার সুদীর্ঘ ইতিহাস। নাহলে নীলধ্বজের কাছ থেকে সে যেমন সহজভাবে বিদায় নিয়েছে, যাঁকে সে এড়াতে চেয়েছে এই কৃষ্ণের আগমনেও সে তেমনই সহজভাবে গ্রহণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রশ্ন করলেন, “ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় করো কেন?” বিদূষক সহজভাবে উত্তর দিলেন, “যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব চুকে গিয়েছে।” কিন্তু সেইসঙ্গে সে এটাও বলল, “কিন্তু সাফ বলছি, যেখানে নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে করে, কি শঙ্খ-চক্র-গদা-

পদ্ম ধরে এসে সামনে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুলছি না। যদি দেখা দেবে, — বাঁশী ধরে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সামনে দাঁড়াও,—আমি চোখের কাপড় খুলছি।" (৫/১)। বিদূষক তার সংকল্পে অটল থাকল এবং সে তখনই তার চোখের বাঁধন খুলল, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার ঈপ্সিত প্রেমময় মুর্তিতে দর্শন দিলেন। বিদূষক দেব-বাঞ্ছিত চতুর্ভুজ মুর্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইনা, একথা স্মরণ রাখলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পার্থসারথি এবং প্রবীরের হত্যাকারী শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আগে রাজার প্রতি আপাতদৃষ্টিতে তার বিসদৃশ আচরণ সহজবোধ্য হয়ে পড়ে এবং এতে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকে না।

বিদূষকের পরিকল্পনা গিরিশচন্দ্রের সাহসী মনের পরিচয় দেয়, কিন্তু এই চরিত্রটি কাহিনীকে কোনোরকম প্রভাবিত করেনি। তবুও বিদূষক কাহিনী নিরর্থক নয়, এটা নীলধবজ কাহিনীর উপর নীরব টিপ্পনী। বিদূষক বিশ্বাসবলে স্বীয়বঞ্চিত রূপে শ্রীকৃষ্ণের দেখা পেল; পক্ষান্তরে নীলধবজকে দুঃখের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হল।

১.১.৪.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জনা' নাটকে জনা চরিত্রটি আলোচনা করো।

২। 'জনা' নাটকে অপ্রধান চরিত্রগুলি আলোচনা করো।

৩। 'বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ'–এই উক্তির আলোক জনা চরিত্রের স্বরূপ পর্যালোচনা করো।

৪। 'জনা' নাটকের জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয় করো।

১.১.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাটকের কথা—সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৪। জনা : সম্পাদিত—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। জনা : সম্পাদিত—তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৬। নাটকের কথা—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

——————

প্রথম পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ২

নুরজাহান : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

একক - ৫

‘নুরজাহান’ নাটকের চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম :

১.২.৫.১ : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১.২.৫.২ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত প্রহসন

১.২.৫.৩ : পৌরাণিক নাটক

১.২.৫.৪ : সামাজিক নাটক

১.২.৫.৫ : নাটকের চরিত্র বিচার

১.২.৫.৬ : নুরজাহান

১.২.৫.৭ : জাহাঙ্গীর

১.২.৫.৮ : শের খাঁ

১.২.৫.৯ : লায়লা

১.২.৫.১০ : প্রধান দুই পুরুষ চরিত্রে নুরজাহানের প্রভাব

১.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৫.১ : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভূমিকা : কবি—নাট্যকার—গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতের একজন দিকপাল ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন মঞ্চ—অভিজ্ঞতা ও নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি মূলত ইউরোপীয় নাট্যদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক লিখতে শুরু করেন। আর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটক রচনার কৃতিত্বের মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন।

পুরাণের ভক্তিরস আবরণ থেকে মুক্ত করে বাংলা নাটককে নতুন পথে চালিত করার প্রত্যাশাই ছিল তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছেন। হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। আর সেই গানের সূত্র ধরেই বাংলা নাট্যজগতে তাঁর প্রবেশ। তাঁর নিজের ভাষায়—

“প্রথমত, প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়ে সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে ‘কল্কিঅবতার’ নামে একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব রচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া ‘বিরহ’

নাটক রচনা করি।.....তৎপরে উক্তরূপে 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং উহা স্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়"।

১.২.৫.২ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত প্রহসন

কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দবিদায় (১৯১২)।

প্রহসনগুলি রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার মূলত সামাজিক কুসংস্কার ও চরিত্রের অসঙ্গতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমকালীন অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামির পরিবর্তে তাঁর এই স্বতন্ত্রতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আনন্দবিদায়' প্রহসনটি সেই সময় বিশেষভাবে সাড়া ফেলেছিল। কারণ প্রহসনটিতে প্যারোডির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়। ফলে সমকালে প্রহসনটি বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছিল। তবে প্রহসনটিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব ও শিল্পমূল্য বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

১.২.৫.৩ : পৌরাণিক নাটক

সীতা (১৯০৮), পাষাণী (১৯০০), ভীষ্ম (১৯১৪)। দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্বে রচিত পৌরাণিক নাট্যধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে এসে মৌলিক চিন্তাধারা প্রসারের চেষ্টা করলেন। কারণ তাঁর পূর্বে রচিত নাট্যকারেরা মূলত নাটক রচনার ক্ষেত্রে তরল ভক্তিরস, যাত্রাসুলভ আঙ্গিক এবং গীতবাহুল্যকেই বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে কোথাও যাত্রাকে অনুসরণ করেননি, অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য দেখাননি, বরং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন : 'সীতা' নাটকে সীতার চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতি-প্রীতি, রাম চরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেমচেতনার দ্বন্দ্বের ছবি রয়েছে। শূদ্রক হত্যা প্রসঙ্গে তিনি শূদ্র অধিকারবোধ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সঙ্গে সংঘাতের চিত্রটি এঁকেছেন। 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার চরিত্রস্খলনে তিনি মানবিক মনস্তত্ত্বের সন্ধান চেষ্টা করেছেন। আবার 'ভীষ্ম' নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতিপালনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে হৃদয়বৃত্তির, এর আগের নাট্যকারেরা যে প্রতিভা দেখাতে পারেননি। বস্তুত, পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহসিকতার পরিচয় রেখেছেন। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনসত্যকে খোঁজার বা সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাই এই ধারার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ না হলেও অবিস্মরণীয়।

১.২.৫.৪ : সামাজিক নাটক

'পরপারে' (১৯১২), 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামক দুটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। তবে এই নাটক দুটির নাট্যোৎকর্ষতা সেইভাবে লক্ষ করা যায় না।

১.২.৫.৫ : নাটকের চরিত্র বিচার

নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্র বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাট্যকার কেবলমাত্র একটি কাহিনীকে কখনোই চরিত্র ছাড়া উপস্থাপন করতে পারেন না। বরং বলা ভালো চরিত্রকে আশ্রয় করেই নাট্যঘটনা এগিয়ে চলে। নাট্যকার চরিত্রকে আশ্রয় করে শুধুমাত্র নাটককে সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যান তা নয়, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে চরিত্রই তার মূল হাতিয়ার। সুতরাং বলতেই পারি চরিত্র নাটকের প্রাণ। নাট্যকার কথা

বলেন ঐ চরিত্রগুলির মুখ দিয়েই। নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রের এই প্রাসঙ্গিকতাকে মাথায় রেখেই আমরা 'নুরজাহান' নাটকের চরিত্রগুলির অবদান আলোচনা করব।

'নুরজাহান' নাটকটি চরিত্রমুখ্য নাটক। নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য নুরজাহানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপন করা নয়, কোনো একটি তত্ত্বকে রূপকাকারে প্রকাশ করা নয়, অথবা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সুযোগ বিশেষ কোনো ভাবাবেগকে রূপ দেওয়া নয়, নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য এখানে—নুরজাহান চরিত্র অবলম্বনে মানব চরিত্র রহস্যকে রূপ দেওয়া নয়, বরং নুরজাহান চরিত্র অবলম্বনে মানব চরিত্র রহস্যরূপ দেওয়া তথা ব্যক্তিত্ব রহস্যব্যক্ত করা। চরিত্রগুলির দোষ-গুণ, উত্থান-পতনকে জীবন্তরূপে উন্মোচিত করা।

১.২.৫.৬ : নুরজাহান

মোগল ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ, প্রহেলিকাময়, ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী হলেন নুরজাহান। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নারীচরিত্রকে তাঁর 'নুরজাহান' নামক নাটকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

সমগ্র নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নুরজাহানের মূল বিষয় নারীপ্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতা লিপ্সার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব জটিল প্রণয়ের বিচিত্র ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে স্থির একটি বিন্দুর মতো আপন প্রতিহিংসার লক্ষ্যে অটল নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহান। স্বামী শের খাঁর চারিত্রিক শক্তি ও ভালোবাসার গৌরবে সে যখন মহীয়সী ঠিক তখনই ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের কামনার লেলিহান শিখা পুড়িয়ে দিল তার অন্তর, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল তার প্রিয়তমকে এবং দস্যুর মত লুটে নিল তার রূপযৌবন। স্বামী প্রেমের অম্লান স্মৃতি আপন বক্ষপঞ্জরে লালন করেই সে হল জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী ভারত সম্রাজ্ঞী 'নুরজাহান'। সাথে সাথে শুরু হল আত্মক্ষয়ী প্রেমের তপস্যা। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নুরজাহান শের খাঁর নিষ্কলুস ভালোবাসার মহত্ব স্মরণ করে স্বামীহত্যার তীব্র ঘৃণায় রাজঅন্তঃপুরে জ্বালিয়ে দিল বিদ্রোহের আগুন। ধীরে ধীরে জাহাঙ্গীরের হাত থেকে কেড়ে নিল তার সকল শক্তির উৎস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।

কিন্তু নুরজাহান ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তার চরিত্রেও দুর্বলতা ছিল। নাট্যকার নাটকের শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্যামল-কোমল বঙ্গপ্রকৃতির সৌন্দর্য রসমুগ্ধ শের খাঁ যখন প্রাণবন্যায় উচ্ছ্বাসিত আবেগে বলে ওঠেন — 'কি সুখী আমারে মেহের', তখন নুরজাহান বলেছিল — 'কিন্তু এত সুখ বুঝি সইবে না'- শের খাঁ এর উত্তর জানতে চাইলে নুরজাহান বলেছিল —"এত সুখ সয় না, নিজের সইলেও পরের সয় না, ঈর্ষা হয়, লোভ হয়, কেড়ে নিতে ইচ্ছে হয়"।

নুরজাহানের এই নিস্পৃহ সংশয়দীর্ণ উক্তি কি তার অন্তরের গোপন লালসা ও ভারতসম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্নসাধের উপর ইঙ্গিত করে না? শের খাঁর প্রতি তার ভালোবাসা যে নিখাদ ছিল না তার প্রমাণ প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যেই আমরা পেয়ে যাই। সেখানে এক দাসীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল—'না আমি সম্রাটকে কখন ভালোবাসি নাই...।' কিন্তু নুরজাহানের এই উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। নৃত্যের সময় সেলিমের সঙ্গে তার চারিচক্ষুর মিলনে যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা অন্যকিছুরই ইঙ্গিত দেয় —

"রাত্রিযোগে আমরা নৃত্য আরম্ভ কল্লাম। কুমার সেলিম ছিলেন। বাদ্যের শব্দের উপর আমাদের নৃত্য, তরঙ্গের উপর তরীর মত তালে তালে উঠতে আর পড়তে লাগল। পরে আমি গান ধরে দিলাম। আমি অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে দেখলাম যে কুমার আমার নৃত্যে কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে

আছেন। তখন আমার ভিতরে শয়তান জেগে উঠল। হঠাৎ আমার মুখের আবরণ যেন আপনিই খুলে পড়ল। আমাদের চারিচক্ষুর সম্মিলন হল। যেন অতি ত্রস্তভাবে আমি আবরণ মুখের উপর তুলে নিলাম। সেলিম উন্মত্তবৎ হয়ে আমার দিকে ধেয়ে এলেন। পরিবারের অপর লোক তাঁকে গিয়ে ধরে বসিয়ে দিল। সভাভঙ্গ হোল। আমি যেন একটা বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরে এলাম। দুদিন পরে যখন একদিন আমার পিতা ও ভাই আসফ বাড়ি ছিলেন না, তখন সেলিম একেবারে আমার কাছে উপস্থিত। তাঁর উদভ্রান্ত কথাবার্ত্তায় বুঝলাম যে আমার জয় সম্পূর্ণ হয়েছে।"

নুরজাহানের এ জাতীয় উক্তি কি সেলিমের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন অনুরাগ-আসক্তির পরিচয় বহন করে না? মেহেরউন্নিসা তথা নুরজাহানের মধ্যে প্রথম জীবনের অনুরাগেরই অনুরণন দেখা যায়। কেননা প্রথম অনুরাগের কথা কোনোদিনও ভোলা যায় না। নাট্যকার সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলার জন্য প্রথম থেকেই এইভাবে দ্বন্দ্বের বীজ গেঁথে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শের খাঁর সঙ্গে তার বিবাহ এবং আকবর কর্তৃক শের খাঁকে বর্ধমানের শাসনকর্তা নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যখন জনৈকা সেই রমণী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তবে তোমার এখনও তার প্রতি আসক্তি আছে'? তার উত্তরে নুরজাহান জানিয়েছিল —

"না তাকে আসক্তি বলে না, সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি, হয়ত উচ্চাশা, হয়ত অহংকার, কিন্তু আসক্তি নয়।" তার এই উদ্দাম প্রবৃত্তি যদি আসক্তি না হয়ে উচ্চাশা ও অহংকারই হয় তবে তার চারিত্রিক শক্তির ঔদার্য কোথায়? এ তো আসলে রূপের আগুনে রূপাসক্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করার বিকৃত উল্লাস মাত্র। এই কি তার বিজয়গর্ব? যদি তা হয় তবে তো আরও ভয়াবহ। আবার এটি যে কেবল উচ্চাশা নয়, তার প্রমাণ মেলে নুরজাহান যখন বলে —

"সেই প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য জয় করেছিলাম।....তখন বুঝিনি যে সে প্রবৃত্তি তখন চাপা ছিল মাত্র, মরেনি। স্ফুলিঙ্গ ছাই ঢাকা ছিল — নিবে যায়নি। সেই স্ফুলিঙ্গ নতুন ইন্ধন সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে। ভগবান। নারীর হৃদয়কে এত দুর্বল করেছিল। — এই প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্ত্তে পাচ্ছি না?" (১/৮)

আগ্রায় অবরোধ থেকে নুরজাহানের যখন মুক্তির সুযোগ ঘটে তখন এক অনির্দেশ্য বেদনায় তার মন হতাশ হয়ে পড়ে —"ভারতের অধিশ্বরী। — 'না এ কথা ভাবাও পাপ'— কিন্তু আমার ভবিষ্যতে নিষ্ফল রোদন ছাড়া কি আর কিছু নেই।" (২/৫)

জাহাঙ্গীরকে প্রণয়ের খেলায় দীর্ঘ চার বছর হার মানায় মেহের। আর সেখানেই তার সার্থকতা। শেষে সে জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। মেহেরউন্নিসা পর্ব শেষ করে শুরু হয় নুরজাহান পর্ব। সম্মান, জৌলুস, উপভোগ সবই চলে আসে তার হাতের মুঠোয়। ভারতসম্রাজ্ঞী হয়ে সে ভুলে যায় ভালোবাসতে। বড্ড বেশি ভালবেসে ফেলে সাম্রাজ্যকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী নারীর নিজ মুখ থেকেই সেই উচ্চাশার কথা শুনতে পাওয়া যায়—"এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা, আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়। দাও ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, নুরজাহান। পড়ো পড়বে। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আজ আমারও সাধ্য নেই যে আমাকে ফিরাই।" (৪/২)

তাহলে কি আমরা বুঝবো নুরজাহানের দ্বন্দ্বটা আসলে শের খাঁর প্রণয়মুগ্ধ সুকোমল নারী প্রবৃত্তির সঙ্গে উদ্দাম প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং তাই যদি হয় তাহলে নুরজাহানকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব, নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হতে চায় অথচ সম্রাটকে ভালোবাসে না বরং তার সর্বনাশ কামনা করে। মনে মনে শের খাঁর ভালোবাসার সুখময় স্মৃতি বহন করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করে — এটা কি দ্বিচারিণী স্বভাব নয়। প্রবৃত্তির এই উদ্দাম রূপ যাকে রাষ্ট্রদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে সে কি মানবী না পিশাচী?

আসলে নাট্যকার নুরজাহানের মানসদ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করতে তাকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত অথচ জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ তৎপর রক্ত-মাংসের নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রের দ্বন্দ্বই যদি নাটকের প্রাণ হয় তবে নুরজাহানের চরিত্রে সেই দ্বন্দ্বচরিত্র বিকাশে ও নাট্যরস সৃষ্টিতে আলোচ্য নাটকে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং নাটকের শেষদিকে পরাভূত উন্মাদিনী নুরজাহানের দ্বৈতসত্তা দ্বন্দ্ব সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মত তার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের উপর যে বেদনার রেশ ছড়িয়েছিল তা পাঠক তথা দর্শক চিত্তকে আপ্লুত করে —

"আসফ ।। নুরজাহান।

নুরজাহান ।। কে নুরজাহান? সে ত নেই। সে ত মরে গিয়েছে

আসফ ।। শোনো মেহের —

নুরজাহান ।। মেহেরঙ্গ সেও মরে গিয়েছে। তারা দুজনেই মরে গিয়েছে।"

নুরজাহান চরিত্রে মনলোকের জটিল চলচ্ছবি সে-যুগে যে সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কন করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। 'আত্মার সামঞ্জস্য' হারানো এবং বহুচারী নুরজাহানের আশ্চর্য অন্তর্জগৎকে নাট্যকার সুচারু, সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে তুলেছেন।

১.২.৫.৭ : জাহাঙ্গীর

নুরজাহান নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে জাহাঙ্গীর অন্যতম। সেলিম (জাহাঙ্গীর) আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র। জানা যায় অল্প বয়সে তিনি নুরজাহানের প্রতি মনোমুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি তার প্রাক্‌যৌবনের স্মৃতিচারণা করে নুরজাহানকে পেতে চাইলেন। নুরজাহানকে পাওয়ার ইচ্ছা যে তার অন্যায় তা জেনেও তিনি নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেননি। জাহাঙ্গীর ভারত সম্রাট সুতরাং তাঁর জীবনে নারীর অভাব না হওয়ারই কথা। কিন্তু মানুষ তার বিচিত্র মনের কাছে হেরে যায়। জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রেও আমরা তাই-ই লক্ষ করি। কেননা জাহাঙ্গীরের প্রথম জীবনের প্রথম প্রেমের তৃষ্ণা মেটেনি, অপরিপূর্ণ ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। তাই তিনি ষড়যন্ত্র করে নুরজাহানের স্বামী শের খাঁকে হত্যা করেন। হত্যার পর তিনি তার মনের মানুষ নুরজাহানকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু নুরজাহান টানা চার বছর ধরে স্বামীর হত্যাকারীকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। ভালোবাসা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। তাই জাহাঙ্গীর নুরজাহানের প্রতি সবলের অত্যাচার করতে পারে না। ভালোবাসার মাধ্যমেই নুরজাহানকে পেতে চাইলেন জাহাঙ্গীর। অপেক্ষা করলেন চার বছর, এখানেই জাহাঙ্গীর চরিত্রের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

জাহাঙ্গীর জীবনকে ভোগবিলাসের মধ্যে দিয়েই উপভোগ করতে চান। নুরজাহানের প্রতি ভালোবাসায় ক্রমশ যখন মুগ্ধ হয়ে যান তিনি তখনই তার মনে হয় এই প্রণয়ের বা মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় জাহাঙ্গীর হেরে গেছেন। আর তখনই জাহাঙ্গীর নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। শুরু হয়েছে নুরজাহানের রাজত্ব। এই রাজত্বে তিনি 'সুরা, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত' - এর সাম্রাজ্যে গিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছেন। সম্রাট জীবনের গুরুর দিকে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও সুশাসক। তার প্রমাণ আমরা পাই খসরুকে সাবধান করে দেওয়ার মধ্যে—"প্রহরিঙ্গ একে কারাগারে নিয়ে যাও — আবদুলঙ্গ দেখ, এর হাত পা গরাদের সঙ্গে বেঁধে সমস্ত দিন সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখো। পৃষ্ঠে কোড়া দিয়ে প্রহার কর।" (২/২)

এখানে জাহাঙ্গীর সম্রাটরূপে পক্ষপাতশূন্য হতে চাইলেও পিতা হিসেবে ক্ষমাহীন। এ ছাড়া লায়লাকে শাস্তি দিতে চাওয়াও তার সুবিচারেরই পরিচয়। তার জীবনের আত্মিক সম্পদ বলতে শুধু ঐ ন্যায়বোধের অহংকারটুকুই সম্বল। তাও তিনি শেষপর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। তাই সাজাহানের শাস্তির কথা তুললে তিনি নুরজাহানকে বলেন—"ন্যায়বিচার। সেদিন গিয়েছে নুরজাহান। আর আমি সম্রাট নাই।..... ন্যায়বিচার নুরজাহানঙ্গ তা কর্ত্তে গেলে আমিও অব্যাহতি পেতাম না। তুমিও না।" (৩/৮)

এইভাবেই তিনি নুরজাহানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সুশাসকের মর্যাদা সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেন।

জাহাঙ্গীর ক্রমশই ভারতীয় ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে থাকেন। অথচ তিনি ভালোবাসায় বিশ্বস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের মধ্যে তাই এই সময় এক বৈরাগ্যের করুণ সুর বাজতে থাকে। নিজেই যেন নিজের প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার মুখে শুনি—"সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক। আমি ক্ষুব্ধ নই"।

এইভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছেন জাহাঙ্গীর, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তা তিনি খুঁজে পাননি।

এরপর জাহাঙ্গীর সুশাসক ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হয়ে নুরজাহানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। ঘোষণার পরক্ষণেই তিনি আবার মহাবৎ খাঁর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন—"একটা অনুরোধ।.... তোমার কাছে আমি নুরজাহানের প্রাণ ভিক্ষা চাই।" (৪/৮)

একজন সেনাপতির কাছে ভারত সম্রাটের এই প্রাণভিক্ষা চাওয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভালোবাসারই সাক্ষ্য দেয়। এখানে আমরা জাহাঙ্গীরকে একজন আদর্শ প্রেমিক হিসেবেই দেখতে পাই। এ যেন রবি ঠাকুরের— 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'—গানেরই অনুরণন। সব মিলিয়ে জাহাঙ্গীরের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

'নুরজাহান' নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত শেক্সপীয়রের নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রচনা করেছিলেন। আর সেই প্রভাব সবথেকে বেশি পড়েছে জাহাঙ্গীর চরিত্রের মধ্যে। এক্ষেত্রে আমরা 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অ্যান্টনির সঙ্গে জাহাঙ্গীর চরিত্রের জীবনের সাযুজ্য লক্ষ করি।

সব মিলিয়ে জাহাঙ্গীর চরিত্রটিকে নাট্যকার প্রাণ-মন-আত্মার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন। জাহাঙ্গীর নিজের ভাগ্যচক্র নিজেই তৈরি করেছেন। আর সেখানে নুরজাহানের প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করেছে। ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশাগ্রস্ত একটি পুরুষ চরিত্র আমাদের সামনে আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়। আর জাহাঙ্গীরের জীবনের এই পরিণতির জন্য মূলত দায়ী নুরজাহান।

১.২.৫.৮ : শের খাঁ

বার্গনেশিয়ার পুরুষ ছিল শের খাঁ। প্রকৃত নাম আলি কুলি। আলির বীরত্বে উৎসাহিত হয়ে সেলিম তাকে এই নাম দেয়। জীবনকে গড়ার জন্যই মূলত মোগল সেনাবাহিনীতে যোগদান এবং নিজস্ব ক্ষমতায় অল্পদিনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়। কথিত আছে সে একবার খালি হাতে বাঘ মেরেছিল। শের খাঁর সম্পর্কে নাট্যকার জানিয়েছেন—"দেবতার মত গঠন, সিংহর মত বীর্য্য, মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সারল্য।"

ঘটনাচক্রে এই বীরপুরুষ রাজনৈতিক কূট-কৌশলে জড়িয়ে পড়ে। সে মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করে বর্ধমানের সরকারি পদ নিয়ে ১২-১৩ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। তাদের এই সুখী-দাম্পত্য জীবনের একমাত্র ফসল কন্যা লায়লা। নুরজাহানের উক্তিতে জানা যায়—"না প্রিয়তম, আমার বোধ হয় এত সুখ ওদের সৈলো না, এত সুখ বুঝি কারো সয় না।" (১/২)

শের খাঁ, মেহেরউন্নিসাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত। মহৎ স্বামীর যাবতীয় কর্তব্য পালনেও সে দায়িত্ববান। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভয়ংকর অজানা দুর্দৈব নেমে আসে তার জীবনে, জাহাঙ্গীরের শিকার হয়ে পড়ে। এর কারণ সে নিজে নয় বরং নুরজাহানের স্বামী হওয়ায়। অর্থাৎ শের খাঁ নিজের জীবনচক্র নিজে তৈরি করল না। সেলিমের প্রাক্ যৌবনের অনুরাগের স্মৃতির অনুরণনের শিকার হতে হল তাকে। মেহেরউন্নিসার স্বামী বলেই তাকে নিয়তির হাতে পড়তে হয়। শের খাঁর প্রতি আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জাগে। সে প্রথমবার বীরের মতো জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও দ্বিতীয়বার ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জানতে পেরে আত্মসমর্পণ করে। শের খাঁকে আমরা বলতে শুনি—"তোমাদের সুবাদার কুতব ধরাশায়ী, তোমরা ক্ষুদ্র জীব, তোমাদের বধ করে আর কি হবে। যদি এ সময়ে একবার সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পেতাম। যাক। আমি এই অস্ত্রত্যাগ কর্লাম। একটু অপেক্ষা করো।.... এখন আমি মরতে প্রস্তুত। আমায় বধ করো।" (১/৯)

বলাবাহুল্য দুর্দৈবের মত অভাবনীয় ভয়ংকর নিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেই তার এই ইচ্ছামৃত্যু।

নুরজাহানের জীবনকে যদি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় — মেহেরউন্নিসা ও নুরজাহান — তাহলে প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত শের খাঁ। 'সরল উদার শের খাঁ'-কে মেহের বিশ্বাস দিয়েছে, ভক্তি দিয়েছে — কিন্তু অন্তরের প্রেমটুকু দিতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। শের খাঁ তাই নিজেই বলেছে —"আমি তোমার কাছে গিয়েছি শুষ্কতালু ফিরেছি শুষ্কতালু। মেহেরঙ্গ প্রেম শুদ্ধ বিশ্বাস আর সেবা চায় না। এ তৃষ্ণা অন্তরের।" (১/৮)

যে নারীর লালসা ও ভোগবিলাস প্রবণতা এত বেশি সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না। তাই শের খাঁ শুধুমাত্র মেহেরের 'রূপের সুরা' পান করেছিল মাত্র। হয়তো শের খাঁর স্মৃতির বশেই নুরজাহান জাহাঙ্গীরের প্রস্তাবে চার বছর সম্মত হয়নি বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। নুরজাহান চরিত্রে শের খাঁর প্রভাব এইটুকুই। অর্থাৎ আমরা দেখি শের খাঁর বাঁচা ও মরা নুরজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িত। যেন এ রকমই —'Lady thy name is fate'.

১.২.৫.৯ : লায়লা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান' নাটকের চরিত্রালোচনায় আমরা দেখি নুরজাহান ও শের খাঁর কন্যা লায়লা একটি বিকাশধর্মী ও অতিব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নাটকের শুরুতে বালিকা লায়লাকে বর্ধমানে দেখা গেছে সরল, মধুর ও আনন্দময়ী রূপে। সে আর তার মাতুল কন্যা অপূর্ব রূপসী খাদিজা গান গাইছে। সেই গানের ভাষায় এবং সুরে মুগ্ধ নুরজাহান ও শের খাঁ। অপূর্ব সুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে ইতস্তত বেড়াতে দেখা গেছে তাকে — মনে কোনো ঈর্ষা নেই, সারল্যের প্রতিমূর্তি সে। মায়ের প্রতি ভক্তিমতি লায়লা। পিতার প্রতিও লায়লার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সেই পিতাকে কেন্দ্র করেই মায়ের সঙ্গে তার বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। মানুষের আচরণের একটা নীতি থাকা চাই—এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল তার মনে। মাতা পিতৃহন্তার গৃহে আশ্রয় নিয়েছে বলে তার মনে ধিক্কার জন্মেছিল। সে জন্যই সে মায়ের উদ্দেশ্যে বলেছে — "জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করার পূর্বে তুমি বিষ খেতে পারতে।" দৃঢ়চেতা, কঠিন হৃদয়া, অসমসাহসী লায়লা

সম্রাটের প্রাসাদে থেকেই উচ্চকণ্ঠে বলে সম্রাট নীচ, কাপুরুষ। সম্রাটের সামনে দৃপ্তকণ্ঠে বলে—"কি আস্পর্দ্ধায় সম্রাট শের খাঁর পরিবারের উপর এই অত্যাচারের উপর অত্যাচার স্তুপীভূত করেন। আকাশে কি ঈশ্বর নাই? পৃথিবী থেকে কি ধর্ম একেবারে লুপ্ত হয়েছে?" (২/৪)

লায়লার দাঁড়াবার স্থান ঊর্ধ্বজগতে। তার অহংকার এই যে সে শের খাঁর কন্যা। এই কারণেই সে সম্রাটকে তুচ্ছ করে। তার ভর্ৎসনা নুরজাহানের চিত্তকে আলোড়িত করে।

লায়লা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ চরিত্র নয়। কিন্তু চরিত্রটিকে নাটকে উপস্থাপন করার কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্র লালের। আলোচ্য নাটকে লায়লা বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না তরুণী। সে তার মাকে সম্রাটের নিকট থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত মা-এর উচ্চাশার জন্য তার সেই মনোবাসনা ব্যর্থ হয়। তেজস্বিনী তরুণী তাই নুরজাহানকে মা বলে সম্বোধন করতেও ঘৃণাবোধ করে। সেই জন্যই নুরজাহানকে সে বলে—"আমার জীবনের সেরা দুঃখ এই, যে তুমি আমার মা। ওঃঙ্গ ছেলেবেলায় কেউ আমায় নুন খাইয়ে কেন মারেনি। তাহলে এ অপবাদ শুনতে হত না।"

মাতা পিতৃহত্যাকরীকে বিবাহ করায় পবিত্র হৃদয়া লায়লা মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। তার পাণ্ডুর, বিষণ্নমুখ, আনত চক্ষু, কম্পিত ভগ্নস্বর তার সেই মনোবেদনারই সাক্ষী। সারল্যের মধ্যেই সে সৌন্দর্যের সন্ধান পায়। শারিয়ার সকলের উপেক্ষিত, তার সরলতার মধ্যেই লায়লা খুঁজে পায় প্রকৃত সুন্দরকে। আসলে সরলতার প্রতি লায়লার ছিল শ্রদ্ধা, আর চালাক ও ধূর্তের প্রতি ছিল অগাধ ঘৃণা। দুর্বলচিত্ত শাহজাদা শারিয়ারকে ভালোবেসেও সে তাকে সম্রাট পুত্র বলেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি। তাই লায়লা বলেছে— "আপনাকে বিবাহ করতে পারি না, ...অপরাধ আপনি জাহাঙ্গীরের পুত্র।" (২/৭)

নুরজাহানের (মেহেরউন্নিসার) পূর্বের দাম্পত্য জীবন, পূর্ব প্রণয়ের স্মৃতিচারণা, শের খাঁকে মনে রাখা এবং নুরজাহান চরিত্রের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনেই লায়লা চরিত্র প্রাসঙ্গিক। সবমিলিয়ে বলা যায় কাঠিন্য ও মাধুর্যের সম্মিলনেই লায়লা চরিত্র গঠিত। এই বুদ্ধিমতী তরুণী সম্পর্কে শাজাহানের উক্তি স্মরণীয়—"নুরজাহানের মেয়ে যেন দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ।" এই উক্তিতে কিছুটা রহস্য থাকলেও বক্তব্যটা অনেকাংশেই সত্য। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে নাট্যকার লায়লা চরিত্রে একটু বেশিই বাস্তবহীন হয়ে উঠেছেন।

'নুরজাহান' নাটকটিতে আমরা আরো বেশ কিছু চরিত্রের সন্ধান পাই। সেক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্রই নাটকটিকে বিশেষকরে নুরজাহান চরিত্রের দ্বন্দ্ব প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। যেমন নাট্যকার নুরজাহান চরিত্রের বিপরীত দৃষ্টান্তরূপে সরলা, ধর্মপ্রাণা স্বামী প্রেমে একনিষ্ঠা, সন্তানস্নেহে বিগলিতপ্রাণা রেবা চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। নুরজাহানের ঈর্ষাকে ত্বরান্বিত করেছে জাহাঙ্গীর প্রশংসিত রেবা। তাই জাহাঙ্গীর রেবাকে 'ঊর্ধ্বস্থিত নক্ষত্রের' সঙ্গে তুলনা করায় নুরজাহানকে আমরা বলতে শুনি—"আচ্ছা তবে দেখি, যে সেই নক্ষত্রের রশ্মি এই পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় পাণ্ডুর হয়ে যায় কিনা।" (২/৮)

সবমিলিয়ে আমরা দেখি রেবা যথার্থই 'নুরজাহান' নাটকের একটা আলোক, একটা সংগীত, একটা প্রার্থনা।

নুরজাহানের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে আমরা জাহাঙ্গীরের মধ্যমপুত্র খুরমকে (পরবর্তীকালে সাজাহান উপাধি পান) পাই। সমগ্র নাটকে সে একজন দক্ষ যোদ্ধা, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও উৎসাহী চরিত্র। স্থান, কাল ও ঘটনার কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নাটকটিকে ঐতিহাসিক পদবাচ্য করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক এবং সেক্ষেত্রে চরিত্রটি সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

মহাবৎ খাঁ নুরজাহানের আর এক উপযুক্ত প্রতিপক্ষ। নাটকের গোটা চতুর্থ অঙ্ক জুড়েই মহাবৎ খাঁর বিচরণ। আমরা দেখি যে সে সাহসী ও স্পষ্টবাদী। তাই ভারত সম্রাজ্ঞীর সামনেই সে নিজস্ব মতামত জানাতে দ্বিধা করে না। সবমিলিয়ে বলা যায় মহাবৎ সৎ, গর্বী ও ক্ষমতাশালী এক যথার্থ চরিত্র এবং নাটকের অত্যন্ত সজীব ও চলমান চরিত্র।

এ ছাড়াও এ নাটকে বেশ কিছু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে যারা 'নুরজাহান' নাটকটির বুনটটিকে দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে। যেমন—পারভেজ, আসফ খান, আয়াস, শারিয়ার, খসরু, বন্দররাজ, কর্ণসিংহ, খাদিজা।

১.২.৫.১০ : প্রধান দুই পুরুষ চরিত্রে নুরজাহানের প্রভাব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নুরজাহানের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী একটি সূত্রে বিধৃত করে নাট্যরূপ দান করেছেন 'নুরজাহান' নাটকে। বলা বাহুল্য নাটকে সর্বোতভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র নুরজাহান। তার জীবনের উত্থান-পতন নাটকটির মূল উপজীব্য। নায়ক বলতে সেই অর্থে নাটকে কেউ নেই, সেই কেন্দ্রীয় স্থানে নুরজাহানের অবস্থান। নুরজাহানের সংস্পর্শে দুজনের (পুরুষ) সাক্ষাৎ বিশেষভাবে পাওয়া যায়—শের খাঁ ও জাহাঙ্গীর, এদের দুজনের সংযোগস্থল একটাই, তা হল নুরজাহান। এই দুই পুরুষের জীবনে নুরজাহানের প্রভাব বিস্তার। বস্তুতপক্ষে এই দুই পুরুষ চরিত্রের উত্থান-পতন নুরজাহানের সাথেই জড়িত। শের খাঁর পত্নী মেহেরউন্নিসা ও ভারতসম্রাজ্ঞী নুরজাহান—এই হল নুরজাহানের জীবনের দুটি পর্যায়। অজিত কুমার ঘোষ নুরজাহানের জীবনের দুই পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"শের খাঁ ও জাহাঙ্গীর—এই দুটি চরিত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা গূঢ় সাদৃশ্য আছে। নারীর প্রেমতৃষ্ণা উভয়ের জীবনের করুণ পরিণতি ঘটাইয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৯)

সুতরাং আলোচনা দীর্ঘায়িত করলে আমরা দেখতে পাই নুরজাহান কি প্রকারে উক্ত দুই পুরুষের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বর্ধমানে কন্যা লায়লা ও স্ত্রী মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটান শের খাঁ। তিনি অমিত শক্তিশালী বীর, কিন্তু তার উদার হৃদয়ের সবখানি জুড়ে এক সীমাহীন ভালোবাসা ব্যাপ্ত হয়েছিল। এককথায় ভালোবাসার যোগ্যপাত্র শের খাঁ। অথচ এই 'সরল উদার শের খাঁ' কেও তার স্ত্রী মেহেরউন্নিসা ওরফে নুরজাহান ভালোবাসতে পারেনি। মেহের তাকে সেবা দিয়েছে ভক্তি দিয়েছে কিন্তু প্রেম দিয়ে হৃদয় তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। উত্তেজিত মেহেরকে প্রশ্ন করেও শের খাঁ তার উত্তেজনার কারণ জানতে পারেনি। তাই শের খাঁর মনের অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ থেকে জন্ম নেয় ভীতি। আর সেই কারণেই মনের সন্দেহের মীমাংসা সে নিজেই করে —"এই রকম পালিয়ে পালিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল। দিবারাত্র একটা সন্দেহে, সংকোচে, শঙ্কায় জীবনধারণ কর্চ্ছি। কেন? কি অপরাধে?" (১/৮)

শের খাঁ মেহেরউন্নিসাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত। কিন্তু ঘটনাচক্র তাদের জীবনচক্রকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিকার হয়ে পড়ে শের খাঁ। এর কারণ সে নিজে নয়, কারণ সে কুমার সেলিমের প্রথম যৌবনের প্রণয় পাত্রী সুন্দরী মেহেরউন্নিসার স্বামী। অর্থাৎ তার মৃত্যুর কারণ তার স্ত্রী। আর সে জন্যই সে অস্ত্র ফেলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে প্রতিপক্ষের কাছে। এখানে আমরা দেখতে পাই শের খাঁর অভিমানক্ষুব্ধ অন্তর একটুও নালিশ করল না, একটি কথাও বলল না। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এক ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস চিরকালের জন্য নুরজাহানের চিত্ততলে সঞ্চিত করে রাখল। তার এ মৃত্যুর জন্য দায়ী যৌবনের মহামূল্য ভুল — মেহেরের 'রূপের সুরা পান'। তিনি যথার্থই বলেছেন—"হ্যাঁ, অন্যায়

আমার।.... সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুরা পান করেছিলাম। যানতান না যে বিষপান কর্ল্লাম।" (১/৮)

যাকে বিয়ে করতে ভারতের ভাবী সম্রাট উন্মত্ত তাকে 'বিবাহ' করা শের খাঁর পক্ষে 'পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাপ দেওয়াই সার' — এটাই সরল, নিষ্পাপ শের খাঁর আসল অন্যায়। একথা সে নিজেও উপলব্ধি করেছিল। আবার একথাও সত্য যে মেহেরের প্রেমের সুধা পেলে বোধ হয় শের খাঁকে হত্যা করার সাধ্য কোনো সম্রাটেরই হত না।

এখানে আমরা দেখতে পাই একজন পুরুষ তার নিজের জীবনচক্রকে নিজে তৈরি করলেন না। শের খাঁর জীবনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রক তার স্ত্রী — মেহেরউন্নিসা বা নুরজাহান। আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায় তার এই অন্তর্লীন ভালোবাসা। অদ্ভুত ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে পড়ে সে। জাহাঙ্গীরের মধ্যে প্রথম থেকেই যে দ্বন্দ্ব পাওয়া যায় তা নুরজাহানকে কেন্দ্র করেই। তিনি ন্যায় পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় নুরজাহানের রূপতৃষ্ণার কাছে পরাজিত হয়েছেন। তিনি জানেন পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অন্যায়, অন্যায়ভাবে শের খাঁকে হত্যা করা অপরাধ। তবুও সেখানে নিজেকে নিবৃত্ত করার জন্য কঠোর হতে পারেননি। জাহাঙ্গীরের কথাতেই দেখি রেবার প্রণয়ভিক্ষু হয়েই জীবন কাটালেন তিনি, কখনো হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাননি। তার আক্ষেপ—"যদি আমায় ভালোবাসতে পার্ত্তে।" (১/২)

জাহাঙ্গীর পার্থিব ভালোবাসার মুগ্ধতা নুরজাহানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন—"তোমার কি মোহমন্ত্রে আমায় মুগ্ধ করে রেখেছো হে যাদুকরী।" (৪/৪)

এই নুরজাহানের মূর্তি তার চেতনার সবটুকু জুড়ে রয়েছে। কিছুতেই এই নারীর স্মৃতি এড়াতে তিনি পারেন না। সমস্ত হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তার আচ্ছন্ন। আর এই আচ্ছন্নতার জন্যই জাহাঙ্গীর কূট-কৌশলে শের খাঁকে হত্যা করে কার্যসিদ্ধি করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি জাহাঙ্গীরের এইরূপ অন্যায় কর্মের পেছনে যে রমণীর মুখচ্ছবি ভেসে আসে সে — নুরজাহান।

নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে নুরজাহানের সম্মতিক্রমে তাকে জাহাঙ্গীর বিয়ে করেন। নুরজাহান বিয়ের পরেই নতুন হাসি নতুন বাসনা নিয়ে নিজের ও জাহাঙ্গীরের জীবন মরণ ভরিয়ে তুলবেন, সে আশারই প্রকাশ পাই নর্তকীদের গানে— "নতুন হাসিতে, বাসনা রাশিতে, জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।" (২/৬)

এই অঙ্কেরই প্রায় শেষের দিকে জাহাঙ্গীরকে দুর্বল ও নিষ্প্রভ মনে হয়। তবে জাহাঙ্গীরের এই দুর্বল ব্যক্তিত্বই মূলকাহিনীর নিয়ামক শক্তি। জাহাঙ্গীর দমিত হয়ে যান আর শুরু হয় নুরজাহানের রাজত্ব।

জাহাঙ্গীরের মনে হয় ভালোবাসা বুঝি হারজিতের খেলা। জাহাঙ্গীরকে পাবার আগেই নুরজাহানের তার প্রতি ভালোবাসা লোপ পেয়েছে। নুরজাহান তাকে বিয়ে করেছেন কেবলমাত্র ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহে। এই মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় জাহাঙ্গীর হেরে গেছেন। আর তা জানামাত্র নিজেকে নিজে গুটিয়ে নেন। তার আত্মগ্লানিই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বের হয়—"যা ইচ্ছা হয় কর। — আর ভাবতে পারিনা, ভাবতে চাহিনা।" (৪/৪) 'সুরা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত'—এর সাম্রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে তিনি যেন বাঁচতে চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর ভালো শাসক ছিলেন ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি নুরজাহানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ক্রমশ নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে লাগলেন অথচ তিনি ভালোবাসায় বিশ্বস্ত ছিলেন। নুরজাহানের অপরাধে তাকে তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন—তিনি সুশাসক ন্যায়বিচারের বিশ্বাসী।

এখানেই তার হৃদয়ের একটি অংশ ছেদ হয়ে যায়। ঘোষণার পরেই জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর কাছে নুরজাহানের প্রাণভিক্ষা করলেন। একজন সম্রাট একটি নারীর জন্য সেনাপতির কাছে প্রাণভিক্ষা করে গভীর ভালোবাসারই পরিচয় দিলেন। এ যেন ভালোবাসায় পূর্ণ—জাহাঙ্গীর। একটি নারীকে ভালোবেসে তাকে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়ার আকাঙক্ষা তার মধ্যে প্রকাশিত। জাহাঙ্গীর তার ভাগ্যচক্র নিজেই তৈরি করেছিলেন। সেখানে নুরজাহানের প্রভাব ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষ করে এই নুরজাহানের জন্যই ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশাগ্রস্ত এই পুরুষটি আমাদের সামনে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা দেখলাম একজন উদার, বীর, সরল, সদাশয় ব্যক্তি শের খাঁ নুরজাহানের রূপ-মৃগ-তৃষ্ণিকার পিছনে ছুটে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে এই নুরজাহানকে আলিঙ্গন করে জাহাঙ্গীরের জীবনে শোচনীয় করুণ পরিণাম ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে, এই দুই পুরুষেরই এমন জীবন পরিণতির নিয়ামক — নুরজাহান। অতএব এই দুই পুরুষ চরিত্রে নুরজাহান তার সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম — একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘নুরজাহান’ ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে কতখানি সার্থক হয়েছে তা যুক্তিসহ আলোচনা করো।

২। ‘‘সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে থাকুক আর তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, আলিঙ্গন দাও,...চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক’’–এই সংলাপের প্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

৩। সেলিম (জাহাঙ্গীর) চরিত্রটি ‘নুরজাহান’ নাটকে কেন অত্যধিক।

৪। ‘নুরজাহান’ নাটকে মহাবৎ খাঁ এবং লায়লা এই দুটি অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৫। ‘‘এ জয়ে তোমার গৌরব নাই। –আমি দুর্বল নারী মাত্র। তুমি বীর, তুমি পুরুষ। আর আমি যাই হই, নারী মাত্র। এ জয়ে তোমার পৌরষ নাই। আমি অবনতশিরে আমার পরাজয় স্বীকার করি।’’–বক্তা কে? তাঁর জীবনের কোন্ প্রেক্ষিতে তিনি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

———————

একক - ৬

ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে নুরজাহান

বিন্যাসক্রম :

১.২.৬.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে নুরজাহান

১.২.৬.২ : নুরজাহানের নাট্যদ্বন্দ্ব

১.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৬.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে নুরজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটক কোন্‌টি সে বিষয়ে হয়তো তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে তাঁর রচিত ১৯০৮ সালের 'নুরজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডির তীব্রতা এবং গভীরতা সর্বাধিক। 'নুরজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহানকে ঘিরে। আর তাই নাটকের নাম যখন নায়িকা নামাঙ্কিত তখন নাটকটির ট্র্যাজিক গৌরব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা সেই 'নুরজাহান' নাটকের ট্র্যাজিক সার্থকতা বিচারের পূর্বে ট্র্যাজেডির স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রথমে দৃষ্টিপাত করব।

ট্র্যাজেডি হল কোনো মহৎজীবনের মর্মন্তুদ বিনষ্টির কাহিনী। অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণত ট্র্যাজেডি বলা হয়। মানুষের জীবনের মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বিরাট মহীরূহের আকার ধারণ করে। এরপর নিদারুণ হাহাকার ও অসহায়ত্বের মধ্যে আভাসিত হয় সেই জীবনের পরিণাম। সেই পরিণাম হয় মৃত্যু আর না হয় মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। গ্রীক ট্র্যাজেডি অনুযায়ী মানুষের এই পরিণতি নিয়তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। আবার শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি অনুযায়ী তা চরিত্রটির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে বা ভুলের কারণে সংগঠিত হয়। এ বিষয়ে আরও বলা যায় চরিত্রটিকে অবশ্যই কাহিনীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সক্রিয় হতে হবে এবং তার মধ্যে doing and suffering বর্তমান থাকবে।

ট্র্যাজেডি দর্শক বা পাঠক মনে করুণা মিশ্রিত ভয়ের সৃষ্টি করে। স্নেহ-মমতা, করুণা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নারীর কোমল গুণগুলি ট্র্যাজেডিতে থাকে না, যা থাকে তা হল, নির্মম কাঠিন্য ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। নুরজাহান এরকমই অসাধারণ চরিত্র, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপ তার পক্ষে আত্মপীড়নে, আত্মক্ষয়ে পর্যবসিত হয়। নারী চরিত্রের ট্র্যাজেডি (She-Tragedy) অবলম্বনে লিখিত 'নুরজাহান' নাটকটি। অধ্যাপক এ. নিকল বলেছেন — ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র যদি নারী হয়, তবে সেই নারীকেও পুরুষায়িত হতে হবে। নুরজাহান চরিত্রে তা কতদূর রক্ষিত হয়েছে তা সবিশেষ আলোচনায় স্পষ্ট হয়।

সমগ্র 'নুরজাহান' নাটকের মধ্যে প্রথম দৃশ্য থেকেই ক্রুদ্ধ নাটিকার রক্তচক্ষু ও তার পক্ষবিস্তারের আভাস আমরা পাই। এটিই ক্রমশ দানা বেধে নাটকের ট্র্যাজেডির রসকে ঘনীভূত করে। নাটকের প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি নুরজাহান ও শের খাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন। নুরজাহান সুরভিত পদ্মের সৌন্দর্যে পত্নীপ্রাণ শের খাঁর পদতলে যে সুখের জীবন অতিবাহিত করেছিল তার মধ্যে হঠাৎ ঝড়ের তাড়না শুরু হয় সেলিমের আগমনে। এক উৎসব চঞ্চল রাতে নুরজাহান নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করে সেলিমের প্রতি

তার দুর্বলতা। নাটকে ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ববিক্ষত নুরজাহানের ট্র্যাজেডি। একদিকে স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা মিশ্রিত আনুগত্য অন্যদিকে সেলিমের প্রতি তার ভোগলোলুপ জিগীষা তার সেই নিশ্চিত হাস্যময় পদ্মকে দুলিয়ে দেয়।

নুরজাহান এই উভয় সংকটের মুহূর্তে আত্মরক্ষার জন্য স্বামীকে নিয়ে বর্ধমানে চলে আসে। কিন্তু পাঠকমাত্রই অবগত যে এর ফলে তার বিবেক কিংবা সংসার বাঁচলেও অবদমিত হৃদয়াবেগ ক্রমশই তাকে আকুল করে তুলেছে। এই বর্ধমানে আগমন এক অর্থে নুরজাহানের পরাজয়। এর মধ্যে শের খাঁর মৃত্যু হয়। নুরজাহান আবার আগ্রার প্রাসাদে ফিরে আসে এবং শুরু হয় স্বামী হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা ও অগ্নিদাহ। এক্ষেত্রে নাট্য সমালোচক অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ—“আশ্চর্য মানুষ, আর তারা অপেক্ষাও আশ্চর্য মানুষের মন।” (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

যে নুরজাহান স্বামী শের খাঁকে সেই অর্থে কোনোদিন ভালোবাসেনি, হঠাৎই স্বামীর মৃত্যুতে ভালোবাসা তীব্র হয়ে ওঠে। শুরু হয় তার বাইরে-ভিতরে-পশ্চাতে-সম্মুখে দাবদাহ। আর এই চরমমুহূর্তে লায়লা ও আসফের সাহায্যে প্রতিশোধস্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য সে সেলিমকে বিয়ে করে এবং সমগ্র রাজ্যে উত্তাল ঢেউ ও কালবৈশাখীর ঝড় তোলে। আর সেই সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলার শোষণে তার নারীত্ব ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে লায়লা ও আসফ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। যে শ্রদ্ধাশীল স্বামীর প্রেমের কারণে এই উন্মত্ত নুরজাহানের নবজন্ম তাও নিঃশেষে শুকিয়ে যায়। যে আগুন সে পরের ঘর জ্বালানোর জন্য লাগিয়েছিল সেই আগুন অবশেষে তাকেই লেহন করে। ব্যর্থ অসহায় নুরজাহান তারই সৃষ্ট পথের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তারই বিদায়ের দিন গুনতে থাকে। তীব্র আগুনে সে সোনায় পরিণত হয়। তাই ভাগ্য বিপর্যয়ের চরম মুহূর্তে সে আজ বলে—

“আসফ।। নুরজাহান।

নুরজাহান।। কে নুরজাহান? সে ত নেই। সে ত মরে গিয়েছে।

আসফ।। শোনো মেহের -

নুরজাহান।। মেহের। সেও মরে গিয়েছে। তারা দুজনেই মরে গিয়েছে।”

জীবনযুদ্ধে পরাভূত আশাহত নুরজাহানের নারীসত্তা যখন জেগে ওঠে তখনই সৃষ্টি হয় নাটকের চরম ট্র্যাজেডি। তখনই সৃষ্টি হয় পাঠকের মনে তীব্র সহানুভূতি। প্রসঙ্গত অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে—“উপরের দেবতা তাহাকে শাসন করিবার জন্য ঝড়ের গর্জন ও বিদ্যুতের কষাঘাত শুরু করিয়াছেন। নীচের মানুষ তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার শক্তি ও দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে সহায়সম্বলহীনা এক ভিখারিণী করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমরা আর কোথায় দেখিয়াছি?” (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

অ্যারিস্টটল তাঁর ‘Poetics’ গ্রন্থে ট্র্যাজেডির সারাৎসার যন্ত্রণা বা ‘suffering’ কে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন —“An action of a destructive or painful nature” রূপে। নুরজাহান চরিত্রে সে দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যা দর্শক মনকে করুণরসের আধারে অভিভূত করে।

যদিও সমালোচকেরা মনে করেন যে ট্র্যাজেডির চরিত্র যদি নারী হয় তবে সেক্ষেত্রে নারীর সুকোমল জীবন যথার্থ অর্থে ট্র্যাজিক মহিমা পায় না। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে ইউরিপিদিস কিংবা শেক্সপীয়র অথবা ইবসেনের নাটকে নায়ক চরিত্র ট্র্যাজেডির মহিমা পেল কি করে? সেক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে নুরজাহান মিডিয়ার ন্যায় প্রতিহিংসাময়ী, লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ। অর্থাৎ সে ভারতের সর্বময়ী অধিশ্বরী ছিল বলেই নয় দারুণতম অন্তঃসংঘাতের মধ্য দিয়ে একান্ত দুঃখময়

ট্র্যাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল। আর সে জন্যই নুরজাহান ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে অনন্য সাধারণ, নাটকটিও ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নুরজাহানের চরিত্রের অসংগতির মধ্যে সংগতিবিধান করতে চেয়েছিলেন। নাটকের সমাপ্তিতে নুরজাহানের সেই দ্বৈত ব্যাক্তিত্ব স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট—"...মেহেরউন্নিসা ছিল শের খাঁর স্ত্রী। আর নুরজাহান ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহেরউন্নিসা মার্‌ল্লো শের খাঁকে, নুরজাহান মার্‌ল্লো জাহাঙ্গীরকে।"

এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি নাটকে যে দুই পুরুষ চরিত্র নুরজাহানকে প্রভাবিত করেছিল তাদের মধ্যে একজন তাকে সংসার দিয়েছে আর একজন দিয়েছে সাম্রাজ্য। কিন্তু নুরজাহানের সর্বগ্রাসী ভুল সিদ্ধান্ত এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্চাশা শেষপর্যন্ত তাকে একেবারে পর্যুদস্ত করেছে। এখানেই সে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত এক অসহায় নিরুপায় নারীর আর্তনাদ এই পর্যায়েই ট্র্যাজেডির রসকে ঘনীভূত করে।

নাটকটিতে নুরজাহান চরিত্রের ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক শ্রী অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন—"নুরজাহান-এর ট্র্যাজেডি একমাত্র নুরজাহানের চরিত্র অবলম্বন করিয়াই অনন্য মহিমা লাভ করিয়াছে।.... বোধহয় বাংলা সাহিত্যে ইহার ন্যায় সংঘাত তাড়িত ট্র্যাজিক নারী চরিত্র আর একটিও নাই।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

এক্ষেত্রে নাট্যকার মূলত শেক্সপীয়রীয় রীতিতে প্রথম থেকে দ্বন্দ্বের বীজ গেঁথে দিয়েছেন। এ নাটকের দ্বন্দ্ব বাইরের নয়, অন্তরের।

নুরজাহানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চতুরতা, ক্ষমতা করায়ত্ব করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে তার ক্ষিপ্ততা ও দৃঢ় মনোভাব তার চরিত্রের এমন গুণ তাকে নায়কোচিত দীপ্তি দান করেছে। অন্যদিকে তার অনন্য সাধারণ রূপ, তার একাকিত্ব ও তার আত্মজ্ঞান ও নিজের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠার যন্ত্রণা তাকে ট্র্যাজিক মহিমা দান করেছে। মৃত্যু নয় বেঁচে থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুনে দগ্ধ হয়েই নুরজাহানের ট্র্যাজেডি। তাই ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন—"ইহা একখানি মনস্তাত্ত্বিক ট্র্যাজেডি।" (নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক নাটকবিচার)

চরিত্রগত ত্রুটির কারণে নুরজাহান ট্র্যাজিক চরিত্র। শেষপর্যন্ত সে দর্শক মনে করুণা জাগিয়ে, আবেগ পরিশুদ্ধ করে সার্থক ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে ওঠে এবং নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে ট্র্যাজেডি নাটক রূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

১.২.৬.২ : নুরজাহানের নাট্যদ্বন্দ্ব

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'নুরজাহান' অন্যতম। ড. অজিতকুমার ঘোষ এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"ট্র্যাজেডির বিস্তৃতি ও জটিলতা যেমন 'সাজাহান'-এ সর্বাপেক্ষা বেশি, ট্র্যাজেডির তীব্রতা ও গভীরতা তেমনি 'নুরজাহান'-এ সকলের তুলনায় অধিক। 'সাজাহান'-এর ট্র্যাজেডি সঞ্চারিত হইয়াছে সাজাহান, ঔরংজেব, দারা, সুজা, মহম্মদ, সোলেমান প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে ; কিন্তু 'নুরজাহান'-এর ট্র্যাজেডি একমাত্র নুরজাহান চরিত্র অবলম্বন করিয়াই অনন্য মহিমা লাভ করিয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৬, ৭ম সংস্করণ) প্রসঙ্গক্রমে আমরা 'নুরজাহান' নাটকটির নাট্যদ্বন্দ্ব বিচারে অগ্রসর হব।

নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যসংঘাত নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন আলংকারিক অ্যারিস্টটল বা ভরত

এই দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেননি। উনিশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল এই দ্বন্দ্ববাদের স্রষ্টা। পরবর্তীতে প্রচুর নাট্যসমালোচক নাট্যদ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাকে নাটকের প্রাণ বলেও মনে করেছেন। ট্র্যাজেডি, কমেডি যে নাটকই হোক না কেন তা দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। তবে ট্র্যাজেডি নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রাধান্য লাভ করে। কারণ সেখানে আত্মঅনুশোচনা ও ভাগ্যবিপর্যয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। 'নুরজাহান' নাটকের ভূমিকাতেই নাট্যকার দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন—"এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।" ভিতরের এই যুদ্ধ বলতে অন্তর্দ্বন্দ্ব (inner conflict)-কেই বোঝানো হয়েছে। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নুরজাহানের জীবনেরই। 'নুরজাহান' মূলত কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের উত্থান-পতনের কাহিনী। একটি কাহিনীতে নাট্যদ্বন্দ্বের রূপ দিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন উপকাহিনী ও শাখাকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে তার উচ্চাশা ও ফলাফলকে যথাযথ বোঝা যায়।

নয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ প্রথম অঙ্কটিতে নায়িকা সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের জীবনের পশ্চাদপট বর্ণিত। প্রথম স্বামী শের খাঁর সঙ্গে নুরজাহানের সম্পর্ক এবং প্রাক্-বিবাহ জীবনে কুমার সেলিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখানে নাট্যকাহিনীর পটভূমি রচনা করেছে। নাটক শুরু জাহাঙ্গীরের সম্রাট হওয়ার ঘটনা দিয়ে। এই সংবাদে নুরজাহান ও শের খাঁর প্রায় বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ক্রমে যখন এটা স্পষ্ট হয় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর শের খাঁকে হত্যা করে বিধবা মেহেরউন্নিসাকে পেতে চায়। তখন দ্বন্দ্ব ক্রমশ জমে ওঠে, আর নুরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও সূচনা লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে নুরজাহান প্রবৃত্তিকে জয় করার চেষ্টা করেছিল এইভাবে—"নুরজাহান। সেলিম সম্রাটঙ্গ — আবার সে কথা কেন মনে আসে? — না সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিব না। না না না। সে প্রথম যৌবনের একটা খেয়ালমাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেনঙ্গ সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?" (১/১)

প্রথম অঙ্কে জাহাঙ্গীরের পত্নী রেবা এবং পুত্র খসরুর উপকাহিনীরও অবতারণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রথম একটি উপকাহিনীকে মূলকাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল, নুরজাহানের সঙ্গে একদিকে শের খাঁর, অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং শের খাঁর মৃত্যুতে সেই জটিলতার নূতনতর দিককে নুরজাহানের মনের মুকুরে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ নাটকের প্রথম অঙ্কে দ্বন্দ্বের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্ব ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। এই অঙ্কে খসরুর উপকাহিনী যেমন বিস্তারলাভ করেছে তেমনি খসরুর বিচারকার্যে মহাবৎ খাঁ এবং জাহাঙ্গীরের অন্যান্য পুত্রদের উপস্থিতিও সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার এবং সর্বোপরি নুরজাহানের একমাত্র কন্যা লায়লার সাথে তার মায়ের একই সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্কের উন্মোচন ঘটে। পিতাহত্যাকারীকে বিবাহ করার জন্য লায়লা তার মা নুরজাহানকে ঘৃণা করলেও মায়ের সঙ্গে একযোগে একটা বিরাট ঝড় তুলতে চায়। তাদের পরিচয় এখন থেকে মা ও মেয়ে নয়, দুই শয়তানী শক্তি। এই অঙ্কে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হয়, তার ভাই আসফের মধ্যস্থতায়। এই বিবাহের পর সে উপলব্ধি করে যে, সে তার নিজের শয়তানী শক্তির সাথে যুদ্ধ করেও পরাস্ত হয়েছে। নুরজাহানের উচ্চাশাই তাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায় এবং নাট্যদ্বন্দ্ব ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে বিষবৃক্ষের রূপ নেয়। তাই নুরজাহানের মুখে অনির্দেশ্য বেদনার হতাশাবাণী শুনতে পাওয়া যায়—"ভারতের অধিশ্বরী। না একথা ভাবাও পাপ — কিন্তু আমার ভবিষ্যতে নিষ্ফল রোদন ছাড়া কি আর কিছু নাই।" (২/৫)

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই সাজাহান দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করে। নুরজাহান তাকে পরামর্শ দেয় ভাই খসরুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। নুরজাহানের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে খসরু হত্যার দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া

হয় সাজাহানের উপর। তৃতীয় অঙ্কের শেষে সাজাহানের বিচার শুরু হয় নুরজাহানের দরবার কক্ষে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শুধু সাজাহান নয়, সেনানী মহাবৎ খাঁ ও নুরজাহান আত্মজা লায়লা। চরম সংকট ঘনিয়ে আসে এবং দ্বন্দ্ব চরমোৎকর্ষতা লাভ করে।

চতুর্থ অঙ্কে নাট্যদ্বন্দ্ব নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষমতার শিখরে উঠে নুরজাহান তার শত্রুদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলে। মহাবৎ খাঁকে সেনাপতি পদ থেকে চ্যুত করে কুমার পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের সুবাদার করে পাঠানো হয়। পরে বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাবে তাকে বদলির আদেশ পাঠানো হয়। মহাবৎ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে সম্রাজ্ঞী তাতে বাধা দেয়। এখানে নুরজাহানের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে প্রধানত মহাবৎ খাঁ এবং তার সাথে যোগ দিয়েছে সাজাহান। এখানে নুরজাহান শিখরের কিনারায় দাঁড়িয়ে। যার পরই তার ক্রমপতন ঘটেছে। নুরজাহান লড়াই করেছে ঠিকই কিন্তু তা যেন অনিবার্য পতন ও পরাজয়ের জন্যই। তাই নুরজাহান নিজেকেই বলেছে—“এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা। আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়। দাও ঘোড়া ছুটিয়ে দাও নুরজাহান। পড়ো পড়বে—হয় জয়—না হয় মৃত্যু। আর আমারও সাধ্য নাই যে আমাকে ফিরাই।” (৪/২)

পঞ্চম অঙ্কে এ নাটকের পরিণতি। নুরজাহান এখানে মহাবতের বন্দী দশা থেকে মুক্তির কৌশল অবলম্বন করেছে। নিজেই নিজের থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। একটা অর্জিত অভ্যাস তাকে কলের পুতুলের মতো চালিয়ে নিয়ে যায়। সে চলতে চায় না, কিন্তু চলা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। কন্যাকে শেষে তাই করুণস্বরে বলে—“মেহেরউন্নিসাকে চিন্তিস? সে ছিল তোর মা। আর এই নুরজাহান ছিল তোর সৎ মা। আর আমি?—আমি তোর কে? আমি তোর কেউনা। আমি তোর কেউ না। কেউ না।” (৫/৮)

নাটকের জটিল ঘটনাসমূহের মালায় গাঁথা প্লটটি জটিলতর হয়ে উঠেছে নুরজাহানের কামনা-বাসনা-স্বপ্নসাধ ও প্রতিহিংসার অনেকান্ত ট্র্যাজিক অনুভবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের ও দ্বন্দ্বের পরাজয়কে একে একে তাই তিনি এখানে দেখিয়েছেন। সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন—“নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নুরজাহান কাহিনী আশ্রয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তিত্ব হারানোর তথা সর্বরিক্ততার ট্র্যাজেডি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখি, ‘বধু-মেহের’, ‘মাতা-মেহের’, ‘মহিষী মেহের’ (নুরজাহান)—এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে আপন সত্তার সবকিছুই হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে শোচনীয় পরিণাম লাভ করেছে। বহু ব্যক্তিত্বময় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিলোপের, নিরাশ্রয় অহং-এর মহাশূন্যতা ট্র্যাজেডি, গ্রীক বা শেক্সপীয়রের কোনো ট্র্যাজেডির আদর্শে পাওয়া যায় না, আদর্শ হিসেবে নুরজাহান ট্র্যাজেডির আদর্শকে আমরা মৌলিক বলেই গণ্য করতে পারি এবং সেই মৌলিক পরিকল্পনার জন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাকে বারবার ধন্যবাদ দিতে পারি।” (নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ২য় খণ্ড)

নুরজাহানের সম্রাটের প্রতি গোপন লালিত প্রেম, সেলিমের প্রতি আগ্রহ, শের খাঁর প্রতি প্রেমের বিগত স্মৃতি, স্বামী হন্তার কণ্ঠলগ্ন হওয়ার আত্মদায়—বহুচারী নুরজাহানের আশ্চর্য অন্তর্দ্বন্দ্বকে ও অন্তর্জগৎকে উন্মোচিত করে দেয়।

১.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘নুরজাহান’ নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব কিভাবে নাটকের পরিণতিতে পরিস্ফুট হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

২। ‘নুরজাহান’ নাটক অবলম্বনে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নাট্যকারের সাফল্যের পরিমাপ করো।

——————

একক - ৭

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

বিন্যাসক্রম :

১.২.৭.১ : ঐতিহাসিক নাটক

১.২.৭.২ : ইতিহাসাশ্রিত নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

১.২.৭.৩ : নুরজাহান নাটকের পটভূমি

১.২.৭.৪ : নাটকের গঠনশৈলী

১.২.৭.৫ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

১.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৭.১ : ঐতিহাসিক নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সর্বজনবিদিত। বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক এবং এই ধারার বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও তিনি। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল—'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'নুরজাহান' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১)।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বুকে বসে রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের লড়াইয়ের কাহিনী নিয়েই তাঁর বেশিরভাগ ঐতিহাসিক নাটক রচিত। এই নাটকগুলির মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, দেশানুরাগ, স্বাজাত্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। বলা যায় এই নাটকগুলির মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের একটি সংযোগসূত্র সৃষ্টির সঙ্গত চেষ্টাও করেছেন। অতিভাবালুতা, কবিত্ব ও আদর্শের বাড়াবাড়ি দ্বিজেন্দ্রলালকে উন্নততর নাট্যকারের মহিমা থেকে বঞ্চিত করেছে। কোনো কোনো নাটকে তাঁর কাব্যধর্মীয় সংলাপ অবশ্য শিল্পমূল্যের বিচারে সার্থকতা অর্জন করেছে, তবে নাট্যবিচারের ক্ষেত্রে তা দোষের। তিনি মঞ্চবদ্ধ নাট্যকার ছিলেন না বলেই তৎকালীন যুগে তাঁর নাটকগুলি অভিজাত সাহিত্যরুচির স্পর্শ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা প্রাসঙ্গিক যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে রুচিসম্পন্ন ও আধুনিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন নাটকের সংযোগসেতুটি গড়ে দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১.২.৭.২ : ইতিহাসাশ্রিত নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস, আর এই অতীত আশ্রয়ী ও জীবনব্যাখ্যাকে সাহিত্যিক যখন সাহিত্যরসে জারিত করে জীবনকে অনুভব করায়, তখনই তা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক বা গল্প ইত্যাদি। ইতিহাসের সত্য বিশেষ সত্য। আর সাহিত্যে প্রকাশ পায় নিত্যসত্য বা 'অধিকতর সত্য'। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস'। ইতিহাসের মর্যাদা পাওয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক আন্দোলনাদির এবং তৎসম্পর্কিত ব্যক্তির জীবন কথার

নাট্যরূপই হল ঐতিহাসিক নাটক। আর একটু অন্যভাবে বলা যায় — যে নাটকের মূল কাহিনী, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনা সহযোগে বা মানবিক গুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্যে রসোত্তীর্ণ হয় তাকেই আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলি। তবে একথা স্মরণীয় যে নাট্যকার ইতিহাসকার নন, তাই তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তথা পরিস্থিতির মধ্যে জীবনের যে রসরূপ নিহিত রয়েছে সেই রূপকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই কথাগুলি স্মরণে রেখে আমরা ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে এভাবে বলতে পারি —

এক, অতীত ইতিহাসের কোনো এক স্মরণীয় অধ্যায় অবলম্বন করে লিখিত হবে।

দুই, মূলকাহিনী ও প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক হতে হবে।

তিন, নাট্যকার ইতিহাসের অন্ধদাসত্ব করবেন না। স্বাধীন সৃজনশীল কল্পনায় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে প্রয়োজনমত তিনি বিশ্বাস্য ও মানবিক রূপ দেবেন। স্বাভাবিক কারণেই নাটকে অনৈতিহাসিক দু-একটি চরিত্র—ঘটনাও যুক্ত হতে দেখা যায়।

চার, বহু ঘটনা ও উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে থাকে ইতিহাসে, এগুলি গ্রহণের সময় তিনি সতর্কভাবে নির্বাচন করবেন। নিজ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবশ্যিক ঘটনাগুলিকে তিনি সজ্জিত করবেন। ঘটনা সন্নিবেশ এমন হবে যাতে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন ঘটনাগুলি একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়।

পাঁচ, মূল চরিত্রকে ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য হতে হবে।

ছয়, যে যুগ ও কালের পরিচয় নাটকে স্থান পাচ্ছে, সেই যুগের রীতিনীতি আচার-বিচার, সংস্কার, জীবনাদর্শ প্রভৃতিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

সাত, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যে 'কালের সারথি' একথা মনে রেখে তাদের ক্রিয়াকলাপ ও পরিচয়ে অসাধারণত্বের ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাদের ভাষার আভিজাত্য ও আচরণের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে হবে।

১.২.৭.৩ : নুরজাহান নাটকের পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে। তিনি এক্ষেত্রে সার্থক নাট্যকার না হলেও এই ধারার পথ প্রদর্শক। এরপর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ এই ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যান। আর কৃষ্ণনাগরিক তথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বনামধন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাতে এই ধারা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে। আর সেক্ষেত্রে তাঁর 'নুরজাহান', 'সাজাহান', ও 'মেবার পতন' নামক ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নাটকটি সম্পর্কে আমাদের অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন—"নুরজাহান নাটকের মূল ইতিবৃত্তভাগ আমি প্রধানত ডো সাহেব প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে লইয়াছি। জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছি। তবে তাহার উপর অধিক নির্ভর করিতে পারি নাই। কেননা, মানুষের আত্মদোষ গোপন ও আত্মগুণ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল ও সার্ব্বজনীন, যে তাহার আত্মসমালোচনার কথা দূরে থাকুক, স্ববিবৃত ঘটনাগুলি পর্যন্ত অতথ্য দোষে দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

এছাড়াও তিনি ভূমিকাতেই মৎ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটকের থেকে এই নাটকের মূল পার্থক্যগুলিকেও স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন। সেগুলি এইরূপ —

এক, নাটকে তিনি দেবচরিত্র সৃষ্টির পরিবর্তে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্যচরিত্র সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন।

দুই, বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধকেই অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

তিন, নাটকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে কারও স্বগতোক্তিকে একেবারেই বর্জন করেছেন।

অর্থাৎ নাটকটি রচনার পটভূমি হিসেবে তাঁর এই উদ্দেশ্যগুলি বেশি করে কাজ করেছে—প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র সৃষ্টি, অন্তর্বিরোধ এবং প্রকাশ্যে স্বগতোক্তির বর্জন। নুরজাহান ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য ও অসাধারণ নারী চরিত্র। যাঁকে ঘিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একাধিক সাহিত্য ও রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন তাঁর নাটক রচনার ক্ষেত্রে। আভিধানিক অর্থে 'নুরজাহান' শব্দের অর্থ 'জগতের আলো'। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এই নামকরণ করেন।

'নুরজাহান' নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হয়েছে। স্বভাবতই নাট্যকার ইতিহাসকে বা ইতিহাসের সাংস্কৃতিক পটভূমিকে নাটকে ব্যবহার করেছেন—

(ক) মোগলযুগের প্রাদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শাসনের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের ইঙ্গিতময়তা।

(খ) নুরজাহানের মতো মানসিকভাবে অস্থির চরিত্রের (অর্থাৎ Phychopathic personality) স্বরূপ উন্মোচনের সহায়ক মোগল পরিবেশ চিত্রণে।

(গ) ক্ষীণভাবে হলেও মোগল যুগে সম্রাটের অধীন ও সম্রাটচালিত শাসনব্যবস্থার সামাজিক গঠনের ইঙ্গিতদানে।

সুতরাং বলা যায় মোগল ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের কাহিনী সূত্রেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' নাটকটি রচিত। ইতিহাস অবলম্বনে হলেও স্বাদেশিকতার সমকালীনতামুক্ত এই নাটকে বেশ কিছু অনৈতিহাসিক পটভূমিও রয়েছে। যেমন :

(১) উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের পুত্রদের হত্যা করিয়েছেন।

(২) পুত্রশোকেই নুরজাহানের শুভাকাঙ্ক্ষিণী খসরু-জননীর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খসরুর মৃত্যুর অনেক আগেই তার জননীর মৃত্যু হয়েছিল।

(৩) সেলিমের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার পূর্ব প্রণয়।

(৪) শের খাঁর সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ দাম্পত্য জীবন।

(৫) স্বামীর মৃত্যুর পর আগ্রায় আগমন এবং দীর্ঘকাল পরে সম্রাটের পত্নীত্ব অর্জন।

১.২.৭.৪ : নাটকের গঠনশৈলী

'নুরজাহান' নাটকটি ভালো করে পড়লে দেখা যায় এর প্লট বা কাহিনী শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে বিবৃত হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে নাট্যকার বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার। ইতিহাসের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রেখে মূলত এই নাটকের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত 'নুরজাহান'—এর কাহিনী শুধু সুনির্মিত

নয় আদি ও অন্তের মধ্যে এক ঐক্যবোধের দ্বারা যুক্তও বটে। মোগল ভারতের কাহিনী নিয়ে লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত 'নুরজাহান' নাটকটি পাঁচ অঙ্কের। প্রথম অঙ্ক (৯টি দৃশ্য) বাদ দিয়ে বাকি প্রতিটি অঙ্কই আটটি দৃশ্যে সমাপ্ত। প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চমদৃশ্য পর্যন্ত নুরজাহান মেহেরউন্নিসা, অর্থাৎ ভিত্তিস্বরূপ হলেও প্রথম অঙ্কটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য 'নুরজাহান' নামকরণে প্রথম অঙ্কটি নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের গুরুত্ব নাটকে খুবই জরুরি। কারণ প্রথম অঙ্কই হল 'Key note of Play'। দ্বিজেন্দ্রলাল সেইভাবে তাঁর প্রথম অঙ্ক গড়ে তুলেছেন। সেলিমের দিল্লিশ্বর হওয়ার সংবাদ শুনে মেহেরউন্নিসার দীর্ঘশ্বাস ফেলার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু নাটকীয়তার প্রকৃত সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় অঙ্কে। প্রথম অঙ্কে শের খাঁর ও সম্রাটের অসম দ্বন্দ্বের ফলে সেইভাবে নাট্যদ্বন্দ্ব দানা বাঁধেনি। তবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে 'নুরজাহান'-এর বিবাহ সম্মতি ব্যাপকতর দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্বের সূচনামাত্র লক্ষ করা যায়। পঞ্চাঙ্ক নাটকে সাধারণত তৃতীয় অঙ্কে কাহিনী চরমোৎকর্ষতা লাভ করে। স্পষ্ট না হলেও এখানে পাঠক তথা দর্শক দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। এ নাটকে সংঘাতের একপক্ষে নুরজাহানের অবস্থান। তার প্রাচীন প্রতিপক্ষকে পাওয়া যায় অষ্টমদৃশ্যে। তিনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ — যিনি সম্রাটের শাসন মানলেও নুরজাহানের শাসন মানতে নারাজ। স্বাভাবিক কারণেই তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।

চতুর্থ অঙ্কে নুরজাহানের মানসিক টানাপোড়েন ব্যাপকতা লাভ করে। এখানে তিনি নিজেকে সাবধান করতে চাইলেও ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তা করতে পারছেন না। এই দ্বন্দ্ব তার ক্ষমতার রথ চালানোর পথে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই নুরজাহান নিজেকেই বলেছে—"এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা। আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়? দাও, ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, নুরজাহান। পড়ো পড়বে। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আর আমারও সাধ্য নাই যে আমাকে ফিরাই।" (৪/২)

এই অঙ্কেরই পঞ্চম দৃশ্যে মহাবৎ খাঁর সাথে যোগ দিয়েছে সাজাহান, রাণা কর্ণসিংহ। আর বন্দী হয়ে পড়েন জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান।

পঞ্চম অঙ্কে গ্রন্থিমোচন। মহাবৎ নুরজাহানের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেও নুরজাহান মহাবতের হত্যার চেষ্টা পরিত্যাগ করেননি। শেষদৃশ্যে অপরাধের শাস্তি বিধান। চারিত্রিক ত্রুটির কারণেই নুরজাহান উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। তাই করুণস্বরে উন্মাদিনী নুরজাহান তার কন্যাকে শেষপর্যন্ত বলে—"মেহেরউন্নিসাকে চিনতিস? — সে ছিল তোর মা। আর এই নুরজাহান ছিল তোর সৎমা। আর আমি? - আমি তোর কে? আমি তোর কেউনা। আর তোর কেউনা। কেউনা। ও-হো-হো-হো- ।" (৫/৮)

অর্থাৎ নাট্যকার নাটকটির গঠন বা প্লটের ক্ষেত্রে ফ্রেতাগের সূত্রটিকেই মূলত মাথায় রেখেছেন।

ক. উন্মোচন

খ. যেখান থেকে নাটকীয় গতিবেগ শুরু হয় সেই ঘটনা।

গ. চরমোন্নতির জন্য ঘটনার অগ্রগতি

ঘ. পরিবর্তিত বিন্দু

ঙ. নাটকের পরিসমাপ্তি

সেদিক থেকে শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র'—নাটকের সঙ্গে এর মিলও খুঁজে পাওয়া যায়।

নুরজাহানের কাহিনী শুধু সুনির্মিত নয়, আদি ও অন্তের মধ্যে এক ঐক্যবোধের দ্বারা যুক্তও বটে। এই নাটকের নানা ঘটনা ও চরিত্র শেষপর্যন্ত নুরজাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা — প্রমত্ততা ও তার পরিণামকেই তুলে ধরেছে। ফলে এই কাহিনীতে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নেই যা মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই উপকাহিনীগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

নুরজাহান

নুরজাহান জাহাঙ্গীর

মূলকাহিনী

উপকাহিনী

শের খাঁ লায়লা খসরু রেবা সাজাহান মহাবৎ খাঁ

আবার এই উপকাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে এক-একটি শাখা কাহিনী গড়ে উঠেছে। যেমন—

ক. শের খাঁর উপকাহিনী

শের খাঁ জাহাঙ্গীর লায়লা মেহেরউন্নিসা

খ. লায়লার উপকাহিনী

লায়লা নুরজাহান (মেহেরউন্নিসা) জাহাঙ্গীর শারিয়ার

গ. খসরুর উপকাহিনী

খসরু জাহাঙ্গীর শারিয়ার

ঘ. রেবার উপকাহিনী

রেবা জাহাঙ্গীর নুরজাহান

ঙ. সাজাহানের উপকাহিনী

সাজাহান নুরজাহান জাহাঙ্গীর খাদিজা

চ. মহাবৎ খাঁর উপকাহিনী

মহাবৎ জাহাঙ্গীর কর্ণাসিং নুরজাহান

উপরের রেখাচিত্রগুলি থেকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, প্রত্যেকটি কাহিনী, উপকাহিনী, শাখা কাহিনীর সঙ্গেই নুরজাহানের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি যে, সমগ্র নাটকটি শুধু নামকরণের দিক থেকেই নয় প্রকৃত অর্থেই নুরজাহানময়। নাটকের জটিল ঘটনামূহের মালায় গাঁথা প্লটটি জটিলতর হয়ে উঠেছে নুরজাহানের কামনা-বাসনা-স্বপ্নসাধ ও প্রতিহিংসার অনেকান্ত ট্র্যাজিক অনুভবে।

নাটকের প্রত্যেক অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যই হয়ে উঠেছে 'টার্নিং পয়েন্ট'। প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যেই শের খাঁ বুঝতে পারেন মেহেরের তার প্রতি ভালোবাসা শুধুমাত্র মোহ। এমন শূন্যতাবোধের মতই আছে, সংঘাত সৃষ্টির ইঙ্গিত, নূতনতর সংঘাতের শুরু। এমনকি নুরজাহানের মৃত্যুদণ্ড-রহিতের মতো ঘটনাও রয়েছে, চতুর্থ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে। আবার নাটকের শেষ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যেও উন্মাদিনী নুরজাহান ও অন্ধ স্বামীর পরিবারকে দুহাত ধরে লায়লার শোভন সুন্দর জীবনের শপথ গ্রহণ নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে গৌরবদীপ্ত। তবে নাট্যকার স্থানগত, কালগত ও কার্যগত এই ত্রিবিধ ঐক্য বজায় রাখতে পারেননি।

১.২.৭.৫ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

স্বাভাবিক অতীতচারিতা নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমান দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি পুনঃপুনঃ অতীতের বিস্তৃত নেপথ্যে মানস ভ্রমণ করেছেন। এখানে তাঁর জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, দেশানুরাগ, স্বাজাত্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। আলোচ্য 'নুরজাহান' (১৯০৮) নাটকটিতে অতীতের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কাল প্রতিবিম্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে—"ইতিহাসে অনেক সময় শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কবির কাব্যে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।" অর্থাৎ একজন ঐতিহাসিক নাট্যকারের মূল লক্ষ থাকে যুগের অভিপ্রায়, প্রবহমানধারা ও মানব চরিত্রকে পরিস্ফুট করে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করা।

ঐতিহাসিক নাটকের দুটি দিক — এক, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্য, উপাদান, ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি বর্ণিতব্য যুগের একটি যথাযথ ও অবিকৃত ভাবপরিমণ্ডল নির্মাণ। দুই, যেহেতু নাটক একটি যৌথ শিল্পকর্ম, ইতিহাসের নিরস উপকরণ ও চরিত্রাদি কল্পনার রসে এমনভাবে জারিত হয় যাতে নাটকের চিরকালীন আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিপন্নতা, আর্তি পরিস্ফুট হয়। ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয় এমনভাবে হওয়া চাই যাতে কল্পিত চরিত্র ও কাহিনী ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও যুগপরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। নাট্যকারের কাছে ইতিহাস বড়ো নয়, ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

পূর্বে আলোচিত ইতিহাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমানে ঐতিহাসিকতার প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে আমরা 'নুরজাহান' নাটকের ঐতিহাসিকতা যাচাই করব। নাট্যকার নাটকটির উপাদানগুলিকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসের সমস্ত উপাদানকে নাটক লেখার কাজে ব্যবহার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, সম্ভবও ছিল না। নাট্যকার ভূমিকাতেই বলেছেন—"মৎ প্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নুরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।.....দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতে আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।....তৃতীয় প্রভেদ এই যে আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি।" (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)।

তাই নাটকটি পড়লে দেখা যায় নাট্যকার অনেক স্থানেই তাঁর স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিলেও ইতিহাস নিষ্ঠার কোনো অভাব রাখেননি। 'নুরজাহান' নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিধৃত। প্রায় প্রতিটি অঙ্কেরই বিষয়বস্তু বা কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথম অঙ্কের ঘটনা ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে শের খাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল। প্রথম অঙ্কটি ন-টি দৃশ্যে বর্ণিত। নুরজাহান ও শের খাঁর দাম্পত্য জীবন, নুরজাহান সেলিমের প্রাক্-বিবাহ সম্পর্ক এই অঙ্কের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে জাহাঙ্গীরের নুরজাহানের প্রতি দুর্বলতা, শের খাঁকে মেরে বিধবা নুরজাহানকে লাভ করার বাসনা এবং নুরজাহানের আত্মিক দ্বন্দ্ব প্রথম অঙ্কেই ধীরে ধীরে ঘটেছে। নাট্যকার এখান থেকেই নাটক রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এই অঙ্কে শের খাঁকে পরাস্ত করতে জাহাঙ্গীর যে বঙ্গদেশের সুবাদার কুতবউদ্দিন খাঁকে নির্দেশ দেন এবং আক্রমণে শের খাঁর মৃত্যু ঐতিহাসিক ঘটনা। আবার আকবরের সমাধির পাশে রাত্রিকালে খসরু ও তার সহচরদের ষড়যন্ত্রের এই দৃশ্য ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। তবে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছেন নাটকের প্রয়োজনে।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাকাল ১৬০৮-১৬১১ খ্রিস্টাব্দ। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিবাহ হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে নাট্যক্রিয়া উর্ধ্বগতি লাভ করেছে। নুরজাহান তার শয়তানী প্রবৃত্তিকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। নুরজাহান তাই স্বগতোক্তিতে বলেন—"ঈশ্বর জানেন তোমায় ভালোবাসার জন্য নিজের সঙ্গে কি যুদ্ধ করেছি, তবু পাল্লাম না। তাই তুমি অসীম বৈরাগ্য মৃত্যুকে সেধে ডেকে নিলে। আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ করেছে, আমারও সর্বনাশ করেছে।—না তবু যুদ্ধ কর্ব্ব। এ শয়তানীকে দমন কর্ব্ব।" (২/৩)

প্রথম অঙ্কে সংঘাতের যে বীজ দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় অঙ্কে নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হবার পর তা ক্রমশ অঙ্কুরিত হয় এবং বিষবৃক্ষের রূপ ধরে, এই অঙ্কে জাহাঙ্গীরের দরবারে খসরুর বিচার সম্পূর্ণতই ঐতিহাসিক ঘটনা।

তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাকাল ১৬২০-১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই অঙ্কের নাট্য ঘটনা চরম ক্লাইম্যাক্সে ওঠে। এই অঙ্কের শুরুতেই জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সাজাহান বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করে। নুরজাহানের পরামর্শে খসরুকে সঙ্গে নিয়ে যায়। সাজাহান খসরুকে হত্যা করেছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আর এই মতভেদেই নাট্যকার তা কাজে লাগিয়েছেন। বন্দররাজের খসরু হত্যা, সাজাহানের ওপর দায়ভাগ, নুরজাহানের দরবারে সাজাহানের বিচার, সাজাহানের ব্যর্থ বিদ্রোহ, সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ ইতিহাস সমর্থিত।

চতুর্থ অঙ্কে নাট্যক্রিয়া পতনমুখী হয়েছে। এ অঙ্কের ঘটনাকাল ১৬২০-১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এখানে নুরজাহানের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে প্রধানত মহাবৎ খাঁ এবং তার সাথে যোগ দিয়েছে তার অপর শত্রু সাজাহান। নাট্যকার এই অঙ্কে নুরজাহানের সঙ্গে মহাবৎ খাঁর সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কারণ তথা সূত্রগুলিকে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

পঞ্চম অঙ্কের সময়কাল ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ। নুরজাহান এখানে মহাবতের বন্দী দশা থেকে মুক্তির নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। জাহাঙ্গীরের হাতে তার রাজত্ব প্রত্যার্পণের ঘটনা, শারিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার জন্য নুরজাহানের চেষ্টা, জাহাঙ্গীরকে মৃত্যুর পর সম্রাটরূপে সাজাহানের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন ও নুরজাহানের জন্য পেনশন মঞ্জুর, পারভেজের মৃত্যু ও শারিয়ারের অন্ধত্ব ইতিহাসসম্মত ঘটনা। এই সব ঘটনার প্রেক্ষাপটে নুরজাহানের পতনকে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমদিকে ভাই

আসফ নুরজাহানের সহযোগী থাকলেও পরে যে সে মহাবৎ খাঁর দলভুক্ত হয় তা ঐতিহাসিক সত্য। মহাবৎ খাঁর শাসন ইতিহাসে তাই ১০০ দিনের শাসন নামে পরিচিত।

চরিত্রের ক্ষেত্রে বলা যায় 'নুরজাহান' নাটকে নারী-পুরুষ মিলে ১৪টি চরিত্র থাকলেও নাট্যকারের সব থেকে বেশি দৃষ্টি কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহানের দিকে। তার কুমারী জীবন, বিবাহিত জীবন, জননী জীবন এবং স্বামী হত্যার পরে দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বময় বৈধব্য জীবন ও পরে জাহাঙ্গীরকে বিবাহের পর ভারত সম্রাজ্ঞীর জীবন ও সম্রাটের মৃত্যুর পর তার জীবন পরিণাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার অঙ্কন করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক নুরজাহানের প্রতি সেলিমের ও সেলিমের প্রতি নুরজাহানের আকর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। শের খাঁ ও মেহেরের দাম্পত্য জীবনের কথা ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে নেই। নাটকে এদের জীবনচিত্র নাট্যকারের কল্পিত। নাট্যকার ইতিহাসের নুরজাহানের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কল্পনাকে যুক্ত করে তার একটি পূর্ণরূপ গড়ে তুলেছেন। শুধু নুরজাহানই নয় মহাবৎ খাঁ, জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীরের পুত্র সকল, শের খাঁ, লায়লা প্রভৃতি চরিত্রগুলির চিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসের অমর্যাদা করেননি।

মোগল যুগের সুন্দর একটি প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। যুগের মর্জি ও সুরকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী মোগল যুগের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কালগত বিচারে ইতিহাস সম্মত। নাটকটি বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যায় যে, একদিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের মেয়েদের উদ্দামতা, পাশাপাশি সুন্দরী রমণীদের প্রতি বাদশাহের দুর্বলতা সেই সময়ের চিত্রকে আভাসিত করেছে। তেমনি ঝিলামতীর, কাবুল, বারুণীদুর্গ, মেবার, সুবে, বাংলা, আগ্রা, বর্ধমান, উড়িষ্যা প্রভৃতি মোগল আমলের শাসিত স্থানগুলি এই নাটকে পাওয়া যায়। আবার এই নাটকের মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ তথা মেবার বিজয়ের সন্ধি কিংবা তৎকালীন জায়গীরদার প্রথা, সুবাদার প্রথা, সমকালীন যুগ পরিবেশকে চিহ্নিত করে।

ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন অসাধারণত্ব থাকে নুরজাহানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চতুরতা, ক্ষমতা করায়ত্ব করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে তার ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ় মনোভাব তার চরিত্রের এমন গুণ যা তাকে নায়কোচিত দীপ্তিদান করেছে অর্থাৎ নুরজাহানের চরিত্রে অসাধারণত্ব রক্ষিত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকের শর্তানুযায়ী 'নুরজাহান' নাটকে আভিজাত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে—"রেবা।। দেখ খসরু, আমি তোমার মা, মায়ের চেয়ে ভাববার জন্য সংসারে আর কেউ নেই। তার দেহ, স্নেহ, মন, তার প্রবৃত্তি, তার ইহ জীবন, সন্তানের লালনের জন্যই গঠিত। আমি তোমার সেই মা।... একাজ কদাপি কোরোনা। বলো কর্ব্বে না?"

'ঐতিহাসিক' শব্দটি নাটকের বিশেষণ। কেননা সর্বপ্রথম রচনাটিকে নাটক পদবাচ্য হয়ে উঠতে হবে। কোনো পাঠকই ইতিহাস জানার জন্য ঐতিহাসিক নাটক পড়ে না। তবে নাট্যকারকে ইতিহাসের কথা মাথায় রেখেই নাটক রচনায় অগ্রসর হতে হয়। তাই ইতিহাসকে অনুসরণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই ঐতিহাসিক নাটকটি রচনা করেছেন। কিন্তু নুরজাহানের ঐতিহাসিক বিবরণদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তার লক্ষ ছিল রসসৃষ্টি। এদিক থেকে নুরজাহান নাটকে নাট্যকারের কয়েকটি সাফল্য হল—

ক. নাট্যকার ইতিহাসকে নাটকের প্রেক্ষাপট ও আবহসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন।

খ. ঐতিহাসিক চরিত্রের কঙ্কালে তিনি রক্ত-মাংসের মানুষের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ. তিনি ইতিহাসের অন্ধকারকে কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল করে ভরিয়ে তুলেছেন।

ঘ. ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবন রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও কল্পনার শিল্পসম্মত সংমিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

৬. দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক চরিত্র রূপায়ণের পাশাপাশি এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা পুরোপুরি ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনাজাত এবং এই ধরনের (যেমন-বন্দররাজ) চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন।

এইজন্যই 'নুরজাহান' নাটকটি ইতিহাসেরই স্মরণ-বিস্মরণে গড়া এক আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি—একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক।

১.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নুরজাহান' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

২। 'নুরজাহান' নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে সফল–আলোচনা করো।

৩। 'নুরজাহান' নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করো।

——————

একক - ৮

'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের তাৎপর্য

বিন্যাসক্রম :

১.২.৮.১ : 'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সংগীতের তাৎপর্য

১.২.৮.২ : 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ বিচার

১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.২.৮.১ : 'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সংগীতের তাৎপর্য

সংগীত ও সংগীত সম্বলিত নৃত্য থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। গ্রীক-'tragoedia' র অর্থই হল ছাগসংগীত। আবার গ্রীক কমেডির উৎপত্তি হয়েছিল লিঙ্গ সঙ্গীত অথবা Phalic Song থেকে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাট্যরীতির সঙ্গে দেশীয় যাত্রার মিশ্রণেই বাংলা নাটকের জন্ম হয়। আবার যাত্রার প্রাণই হল গান। লোকে আগে যাত্রা দেখত না, যাত্রা শুনতো। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে গানের প্রাধান্য দেখা দেয়। আর বাংলার প্রথম দৃশ্য-কাব্যের যে পরিচয় পাওয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে — যেখানে গীতেরই সমাহার। এরপর যখন বাংলা নাটকের মৌলিকতা লক্ষ করা যায়, তখন নাটকগুলি গীতাভিনয়ের মাধ্যমে হত এবং যেগুলি গীতাভিনয় নামেই পরিচিত ছিল। বাংলার জলবায়ু গানের অনুকূলে, এখানকার প্রকৃতিতে, আকাশে - বাতাসে গানের রেশ শোনা যায়। বলাবাহুল্য গান বাঙালীর সত্তা ও রক্তে প্রবাহিত।

শব্দ যেখানে এসে শেষ হয়, সুরের সেখানে আরম্ভ হয়। সঙ্গত কারণে নাটক তথা বাংলা নাটকে সংযোজিত গান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে যে কোনো নাটকের গানের ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি প্রাথমিক কথা বলা যায় —

"Music can serve many functions. It can establish the label of probability, it can characterise, it can convey ideas, it can condense by speeding up characterization and exposition, it can lend variety and it can be pleasurable in itself."

[The Essential Theatre, Oscar o, Brockett Holt, Rineheart and winston, 1976, Page - 22]

এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় গান মানুষের আবেগকে কথার তুলনায় আরও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ কথায় আমরা যার নাগাল পাই না, সুরই ছুঁয়ে দিতে পারে তার চরণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্য কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এই জন্যে কথার সঙ্গে যখন মানুষ সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।" (শ্রাবণ সন্ধ্যা)

গানের এই প্রাসঙ্গিকতাকে স্মরণে রেখে আমরা 'নুরজাহান' নাটকের গান ব্যবহারের অপরিহার্যতা দেখতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট সুরকার। প্রথম জীবনের পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা ও অনুরাগ তাঁর নাটকের সংগীত রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। বস্তুত, তাঁর নাটকগুলিতে সংগীত ব্যবহার প্রায়শই লক্ষিত হয়। নাট্যকার স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগেই তাঁর বেশিরভাগ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বদেশী গানের ও সুরের মূর্ছনা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। যেমন — 'মেবার পতন' (১৯০৮) নাটকের 'কিসের শোক করিস ভাই'; 'সাজাহান' (১৯০৯) নাটকে 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' অথবা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' প্রভৃতি গানগুলি দেশাত্মবোধক সংগীতেরই সাক্ষী বহন করে। কিন্তু 'নুরজাহান' নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার এরূপ কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। এখানে তিনি মূলত চরিত্র ও নাটকের পরিবেশ অনুযায়ী সংগীতের ব্যবহার করেছেন। যেগুলির মধ্যে হাস্যরসাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলেও, বাহ্যিক মূল্যকে একদমই অস্বীকার করা যায় না। সবমিলিয়ে নাটকে নয়টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলির প্রথম চরণ, কোনো অঙ্কের কোনো দৃশ্যে এবং কাদের মুখে গীত হয়েছে তা ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল।

	গানের প্রথমচরণ	অঙ্ক ও দৃশ্য	কে গেয়েছে
১.	অতুল চির বিমোহন তুমি সুন্দর সুরাধাম	১ম/১ম	লালয়া ও খাদিজা
২.	কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়	১/৬	লায়লা
৩.	আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে	২/৭	নর্তকীরা
৪.	কেন এত সুন্দর শশধর?	৩/১	খাদিজা
৫.	কি শেল বিঁধে আমার হৃদে	৩/৬	লায়লা
৬.	আমি যদি পীঠে তোর ঐ/লাথি একটা মারিই রাগে	৪/১	সভাসদ
৭.	গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে	৪/২	নর্তকীরা
৮.	আমরা এমনই এসে ভেসে যাই	৪/২	ঐ
৯.	নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয়	৫/৫	খাদিজা

নাটকের শুরুতেই লায়লা ও খাদিজার কণ্ঠে গাওয়া দ্বৈত সংগীতটি শুরুতেই আমাদের সামনে নাটকের অন্তর্বিরোধ সূচিত করে দেয়। এই গানে তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির এবং সৌন্দর্যের উর্বরতার মধ্যে তার ধ্বংসের কারণ নিহিত থাকার যে কথা আছে তা শের খাঁ ও মেহেরউন্নিসার কথাবার্তাতেও প্রকাশিত। গানটি সমগ্র নাটকের ভূমিকাকে ব্যক্ত করায় এই নাটকের থিম সং (Theme Song) হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি গানটি সমকালীন বন্দদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনুপম চিত্র। লায়লার একক কণ্ঠে গীত অপর দুটি গানও নাটকে নাট্যকার সঠিকভাবে সংযোজন করেছেন। 'কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়'—গানটি নুরজাহানের দ্বন্দ্বদীর্ণ অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত করার মূর্ত প্রকাশ। নুরজাহানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সেই সত্যই প্রমাণ করে। গানটির শেষ দুটি ছত্রে নাট্যকার অদ্ভুত নাট্য সফলতা সৃষ্টি করেছেন।—

"তবু যদি হাসে ধারা মুখের সে হাসি হায়

অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে যায় জ্বলে যায়।"

নিজের মেয়ের কণ্ঠে নুরজাহান এই গান শুনে জ্বলে পুড়ে তীব্র অভিমানে জানায়—

"খবরদার আর এ গান আমার কাছে কখনো গেও না বুঝলে বালিকা?"

নুরজাহানের এই গান শুনে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশই গানটিকে নাটকে সার্থক করে তুলেছে।

পিতৃহারা লায়লা, মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন লায়লার হৃদয়ের বেদনা ও একাকিত্ব প্রকাশ পেয়েছে—

"কি শেল বিঁধে আমার হৃদে আমারই প্রাণ জানে গো।"

গানটি সেইসঙ্গে লায়লার জীবনের ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নাট্যকার নাটকের গোড়া থেকেই লায়লাকে দ্বন্দ্বদীর্ণ ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পিতা শের খাঁর মৃত্যুর পর যার মাতা নুরজাহান জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী, জাহাঙ্গীরের পুত্র শারিয়ারকে ভলোবেসেও তাকে গ্রহণ করতে না পেরে দুঃখ আর নৈরাশ্যের মধ্যে যার আশ্রয়—এমন ট্র্যাজিক চরিত্রের মুখে এই গানটি সার্থক রূপ পেয়েছে।

খাদিজার গাওয়া গান দুটির মধ্যে তার প্রেমার্তি আর মিলনের মধ্যেও অতৃপ্তির ভাবকেই প্রকাশ করেছে। 'নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয়'—গানটি সাজাহানের উদ্দেশ্যে তার প্রেমসঙ্গীত। গানটি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমবৈচিত্ত্যের রাধার কথা স্মরণ করায়,

"বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়ে না পাই কাছে,

অন্তরে রয়েছে সদা, তবু কেন ভয়।"

প্রিয়তম সাজাহানকে কাছে পেয়েও হারাবার ভয়ে ভীতা খাদিজা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মতোই বিরহ কাতরা। নর্তকীদের গাওয়া গানগুলির মধ্যে জাহাঙ্গীরের শোচনীয় ও বিপর্যস্ত জীবনই প্রকাশিত হয়েছে। 'সুরা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত' — এর সাম্রাজ্যে পলায়নপর জাহাঙ্গীরের চরিত্রই নর্তকীদের গানে প্রকাশিত হয়। 'পিশাচী'-নুরজাহান চরিত্রেরও উন্মোচন ঘটাতেও গানগুলি সুপ্রযুক্ত। অর্থাৎ নর্তকীদের গাওয়া তিনটি গানও নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর সভাসদ দ্বারা গীত গানটি হাস্যরসাত্মক ও কৌতুক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। তাই পলায়নপর রাজাকে দেখে দর্শকদের হাসি পায়, অনুকম্পা জাগে না। সবমিলিয়ে বলা যায় মোগল বাদশাহের বিলাসের চিরাচরিত উপকরণ, নর্তকীদের নৃত্য-গীত হিসেবে সার্থক। সেইসঙ্গে ট্র্যাজিক রসসৃষ্টি করতেও সহায়ক। নাটকের চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গীতগুলি সুসম্পর্ক যুক্তও বটে। তাই সংগীতগুলিকে আমাদের 'Contextual Song' বলতে কোনো বাধা থাকেনা।

১.২.৮.২ : 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপবিচার

কাহিনী, চরিত্র, বাক্‌রীতি বা সংলাপ, ভাবনা, দৃশ্যই সঙ্গীত—এই ৬টি উপাদানের সমবায়ে গড়ে ওঠে নাটক—এমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন অ্যারিস্টটল তার আলোচনায়। নাটকের ষড়াঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, Diction (ডনিতি) এর মাধ্যমে চরিত্র বিকশিত হয়, নাটক সম্মুখগতিতে এগিয়ে যায়। নাটকে নাট্যকারকে সবকথা বলতে হয় — ঘটনার ও পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে, তাই নাটকে নাট্যকার নীরব, মুখর শুধু ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী। নাটকীয় ঘটনা এমন যা 'Should, speak for themselves without verbal exposition' এবং নাট্যসংলাপকে এমন হতে হবে যার উদ্দেশ্যে অ্যারিস্টটল বলেন —

"The effects aimed in speech should be produced by
the speaker and as a result of the speech."

—এই দিকদিয়ে নাটকের সংলাপ অভিভাবকহীন, ফলে তার সমস্ত দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হয়। দোষ, ত্রুটি সংশোধনের জন্য কেউ নেই। উপন্যাসিক তাঁর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই চলেন। পাত্র-পাত্রী কথা দিয়ে যা বোঝাতে পারেন না ; তিনি তা বিশ্লেষণ করেন, আগের সঙ্গে পরের আনুপূর্বিক সম্পর্ক তুলে ধরেন এবং তা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু নাট্যকার নেপথ্যে থাকেন বলে সব কিছুর তার তার সংলাপকেই বহন করতে হয়। তাই চরিত্রের প্রকাশন বা বিকাশন, অগ্রগতি-সৃষ্টি-সমস্ত দায়িত্ব সংলাপের।

সংলাপ শুধুমাত্র নাটকের বাহন নয়, তা নাটকের প্রাণ—"Action is to drama is body is to man, in its language, resides the drama soul."

—নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিছু আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। নাটকের চরিত্রানুযায়ী নাট্যকার সংলাপ সৃষ্টি করেন।

নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের সাফল্যের পেছনে তার শক্তি প্রয়োগ করে। এর ফলে নাট্যগতির সৃষ্টি হয় এবং নাট্যরস দর্শক মনে চরিত্রগুলির মূলরস পৌঁছে দিতে পারে। নাটকের সমস্ত গতিপ্রকৃতি সংলাপের উপরই নির্ভরশীল। চরিত্ররূপে সুষ্ঠু অভিব্যক্তির কারণে বাক্‌ভঙ্গির অবতারণা, মধ্যে শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের, চিত্রকল্পের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। সংলাপই নাটকের মধ্যে আবেগ; দ্বন্দ্বের উত্থান পতন, উৎকণ্ঠা, প্রভৃতি সৃষ্টি করে নাটকটিকে গতি সঞ্চারী করে তোলে।

নাটকীয় সংলাপ হবে সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, চরিত্র প্রকাশক ও প্রাণময়, ঔচিত্য অনুযায়ী তা পাত্র-পাত্রীদের মুখে সংযোজিত হবে। আর ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণত সংলাপ হবে আভিজাত্যপূর্ণ ও গাম্ভীর্য। তাদের সংলাপের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হবে তাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক 'নুরজাহান' এর ক্ষেত্রে তা কতদূর রঞ্জিত হয়েছে আলোচনায় তা বিচার্য। 'নুরজাহান' ঐতিহাসিক নাটক এই নাটকে নানা ধরনের চরিত্রসৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। প্রধান প্রধান চরিত্র ছাড়াও রয়েছে ইতিহাসের সম্ভাবনাজাত কিছু চরিত্র এবং বেশ কিছু কাল্পনিক চরিত্র, যারা নাটকের পরিবেশ রচনার উপযোগী। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রে উপযোগী ভাষা সৃষ্টিতে মনযোগী শিল্পী। সেইজন্য এক একটি চরিত্র তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছে, অন্তত চরিত্রানুযায়ী ভাষা তথা সংলাপ নির্মাণে লেখক অত্যন্ত যত্নবান।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নাট্যকার ঐতিহাসিক রাজপুরুষের চরিত্রে যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা সাধারণ মানুষের চরিত্রে ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের অবস্থানগত পার্থক্য এ নাটকে অত্যন্ত স্পষ্ট। জাহাঙ্গীর বা নুরজাহানের মতো চরিত্র যে ভাষায় কথা বলে পুরোবাসিরা বা সভাসদবর্গ সে ভাষায় কথা বলে না। আরো লক্ষণীয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্রে সম্রাটোচিত গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আনার জন্য নাট্যকার ঐ চরিত্রটির মুখে তৎসমশব্দ ব্যবহার করেছেন—

"বলবে না? কুলাঙ্গারঙ্গ তোমায় বলতে হবে। আমি

তোমায় বলব। আমি তোমায় যন্ত্রনার যন্ত্রে চড়াব।

আমি বেত্রাঘাতে তোমার পৃষ্ঠচর্ম লোলখন্ডিত করব।"

এই নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মুখে আবেগ প্রধান সংলাপের পাশাপাশি কাব্যধর্মী সংলাপের অবস্থান লক্ষ করা যায়। 'নুরজাহান' এর সংলাপে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে—

"কি সুন্দর এই বঙ্গদেশ। এ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যার

উপরদিয়ে শ্যামলতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে.....

সমস্ত দেশটা যেন একটা অপার্থিব সুখস্বপ্ন দেখছে।" (১/১)

—ভাবকোমলের আবেগের প্রকাশে সূক্ষ্মতা যেমন আছে তার সঙ্গে সিক্ততাও রয়েছে এই সংলাপে।

উপমা সৃষ্টিতে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, উপমাদানের ক্ষেত্রে তার উপমানের চয়ন প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন। তার উপমাদানের একটি উদাহরণ রেবার সংলাপে পাওয়া যায়—"যে কর্ত্তব্য সাধন কর্তে যদি না পার নাথ, তাহলে এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের প্রাসাদের মত বিলিন হয়ে যাবে।" (৩/২)

চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য তিনি স্বগতোক্তি ব্যবহার করেছেন। এই স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাই। নুরজাহান বলেছে—

"সেলিম সম্রাট্য আবার সেকথা কেন মনে আসে? - না

সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিবনা।"

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই স্বগতোক্তিগুলি লক্ষ করবার মতো, এগুলির মধ্যে কাব্যিক সুষমা ফুটেছে, একাধিক অলংকার সমৃদ্ধ ভাষার প্রয়োগে।

সাধারণ মানুষের সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাত্যহিক জীবনের সরল ভাষাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন অথচ ভাব যেখানে গভীর ও সমুন্নত হয়েছে সেখানে ভাষাও হয়েছে উচ্চভাব প্রকাশের উপযোগী। পুরবাসীদের কথোপকথনে দৃশ্যের সংলাপ কথ্যভাষাশ্রয়ী।—

"পঞ্চম পুরবাসী।। আরে ছাড়ো ছাড়ো উঃ বাবারে

ছাড়ো—দেখ তোমরা।"

—এখানে কথ্যভাষার সংলাপ রচনা একেবারে উপযুক্ত হয়েছে।

'নুরজাহান' নাটকে নারীচরিত্রের সংলাপে তীব্রতা যেন বেশি। নুরজাহান চরিত্রের বুদ্ধি ও হৃদয়কে আশ্রয় করে নানা সত্তার দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে। পত্নীমেহের, মাতা মেহের ও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান একই নুরজাহানের তিনসত্তা, একদিকে স্বামীর স্মৃতি ও কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে উচ্চাশা ও ক্ষমতালিপ্সা নুরজাহান চরিত্রটি এই বিপরীত বৃত্তির সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছে। তার বিশ্লেষণী মনের একটি সংলাপ স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে—"মানুষের মধ্যে কি দুটি মানুষ আছে? তা না হলে অশান্তদ্বন্দ্ব চলছে কার সঙ্গে?"

নুরজাহান নাটকের সংলাপে শেক্সপীয়রের নাট্যরীতির সংলাপ প্রয়োগের মতো ব্যবহার দেখা যায়। ওথেলোর আবেগদীপ্ত কণ্ঠোস্বরে এক অনির্বচনীয় ভাষা স্ফুটে ওঠে—

"Speek of me as I am ; nothing axtenuate

nor set down aught in malice, then must you speak."

নুরজাহান নাটকের পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠদৃশ্যে দ্বিতীয় বার বিধবা নুরজাহান বলেছে—

"সেদিন আমার ছিল ছুটবার আগে অশ্বের একটি

অধীর উদ্দত আবেগ। আর আজ আমার আছে-

পথশ্রান্ত অশ্বের মন্দীভূত তেজ।"

'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ ব্যবহারে যে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ—

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) নাট্যকার তার নিজস্ব নির্দেশ অর্থাৎ চরিত্র ও দৃশ্য নির্দেশ রচনা করেছেন সাধুভাষায় কিন্তু নাটকের সংলাপ রচিত হয়েছে চলিত ভাষায়।

(২) পুরবাসী সাধারণ মানুষের ভাষা রচিত হয়েছে মান্যচলিত ভাষায়।

(৩) অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ বা কথ্য বাংলায় লেখা হলেও জাহাঙ্গীর বা নুরজাহানের সংলাপে কিছুই বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(৪) জাহাঙ্গীর সংলাপ তৎসম শব্দবহুল এবং সমাসবদ্ধ পদ নির্মিত এবং সম্রাটৌচিত গাম্ভীর্য ও পদমর্যাদা প্রকাশের উপযোগী।

(৫) নুরজাহানের সংলাপ ব্যবহারে স্পষ্টতই ৩টি স্তর লক্ষ করা যায়—সাধারণ মানুষরূপে, সম্রাজ্ঞীরূপে, এবং স্বগতোক্তির ব্যবহারে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) প্রত্যক্ষ ভাষণের ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিভক্তির মহাপ্রাণতা প্রায় অক্ষুণ্ণ।

(২) মান্যকথা বাংলার আদর্শই এই নাটকে অনুসৃত হয়েছে।

(৩) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার রীতিগতভাবে লক্ষণীয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

(১) নঞর্থক অব্যয়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার।

(২) প্রবাদ প্রবচনের সীমিত ব্যবহার।

(৩) সমন্ধসূচক পদের বহুল প্রয়োগ।

(৪) বিশেষ শব্দযুক্ত সমাসের দ্বারা গঠিত বিশেষণ পদের বহুল ব্যবহার।

এককথায় বলা যায় নুরজাহান নাটকের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে সংলাপ নির্মাণে শিল্পজাত কৌশলের চাবিকাঠি। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই চাবিকাঠিকে সঙ্গে নিয়েই তার ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সেদিক থেকে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ও নান্দনিক উপাদানের মিশ্রণে যে শিল্পের সৌধ নির্মিত হয়েছে তা 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ রচনার গুণেই।

১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব বিচার করো।

২। 'নুরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৩। 'নুরজাহান' নাটকের হাস্যরস।

৪। 'নুরজাহান' নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

৫। 'নুরজাহান' নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব।

৬। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'নুরজাহান' নাটকে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আঙ্গিকে সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধন তুলে ধরেছেন।—আলোচনা করো।

১.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ক্ষেত্র গুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।

২। ড. অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ও ২য়।

৪। ড. বিপ্লব চক্রবর্তী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নুরজাহান।

৫। সাধনকুমার ভট্টাচার্য—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ২য় খণ্ড।

৬। ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালজয়ী বাংলা নাটক : পুনর্বিচার।

৭। আজকের প্রতিভাস—দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ সংখ্যা।

——————

পত্র - B-Core - 208

পর্যায় গ্রন্থ - ৩ নবান্ন

একক - ৯ - নবান্ন নাটকের কাহিনি বিন্যাস

বিন্যাসক্রম

২০৮.৩.৯.১ : ভূমিকা

২০৮.৩.৯.২ : নবান্ন নাটক রচনার প্রেক্ষাপট

২০৮.৩.৯.৩ : নবান্ন নাটকের কাহিনি বিন্যাস

২০৮.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৮.৩.৯.১ : ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য নাট্যকার আবির্ভুত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য শুধুমাত্র নাট্যকারই ছিলেন না বাংলা নাট্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছিলেন। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের খানখানাপুর গ্রামে ১৯১৫ সালে ১৭ই জুলাই। পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও মাতা সুবর্ণপ্রভা ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান বিজন ভট্টাচার্য। তিনি বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন। আশুতোষ কলেজ এবং রিপন কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই ছাত্র আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরিতে যোগদান করেন। তৎকালীন সময়ে প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য এবং রেবতী বর্মনের মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা এবং নভেম্বর বিপ্লব তার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল, ১৯৪২ সালে বিজন ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে আনন্দবাজারের চাকরি ছেড়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হন।

২০৮.৩.৯.২ : নবান্ন নাটক রচনার প্রেক্ষাপট

বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকটি শুধু বাংলার নয় আমাদের দেশের গণনাট্য আন্দোলনের ফসল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক গণসংগঠন হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার কারণে প্রগতিশীল এবং বামপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকরা বিভিন্ন নামে সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করে তাদের আন্দোলন চালিয়ে গেছে। ১৯৪৩ সালে ২৫শে মে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার গণনাট্য সংঘ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। গণনাট্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজন ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম ছোট্ট নাটিকা 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' লেখেন। 'নবান্ন' নাটকটি লিখতে গিয়ে নাট্যকারের যে মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় নাট্যকার সে সম্পর্কে নিজেই উল্লেখ করেছেন—

"কমিউনিস্ট পার্টি আমার বাহ্য-ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পিছনে মানসিকতার দিক দিয়ে সেই দিব্যশক্তির কাজ করেছে। যে কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে দেখতে শিখিয়েছে। গণনাট্য সংঘ বা পি-ডব্লু-এ'র ভূমিকাও ঠিক তেমনি আমার জ্ঞানকান্ডে প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছে। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দুর্গত দুনিয়ায় শিল্পীর একমাত্র ধর্ম, যেটা শাস্ত্রের মতো বিপদে আপদে, প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ, শিল্পীকে সর্বদা রক্ষা করে।" (বহুরূপী-৩৩, সাক্ষাৎকার)

এই প্রথম নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রেণিচেতনার উন্মেষ ঘটানো শুরু হল। শিল্প সাহিত্য শুধুমাত্র আনন্দ দানের মাধ্যমই নয় আনন্দ দানের মধ্যে দিয়ে শ্রেণিগত দায়বদ্ধতা, প্রতিবাদ ও লড়াই সংগ্রামের জেহাদ ঘোষণা করতে চেয়েছিল গণনাট্য সংঘ। এই ভাবনা থেকেই নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। বাংলাদেশে ভয়াবহ মন্বন্তরের দুর্যোগ দৃশ্য নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সচক্ষে দেখলেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। অপরদিকে মানুষের কান্না শুনেছেন এবং ব্যথা বেদনাকে আত্মস্থ করেছেন। সেগুলিকেই নাটকের রূপ দিলেন সাম্যবাদী আদর্শের অনুপ্রেরণায়। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা বা সহানুভূতি নয় বিশেষভাবে দর্শনও তার জীবন ভাবনায় ধরা পড়েছে।

২০৮.৩.৯.৩ : 'নবান্ন' নাটকের কাহিনি বিন্যাস

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটির প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪ সালে 'অরণি' পত্রিকায়। ১৯৪৭ সালে 'নবান্ন' নাটকের হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি চারটি অঙ্কে বিভক্ত রয়েছে। প্রথম অঙ্কে ৫টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ৫, তৃতীয় অঙ্কে ২টি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে ৩টি দৃশ্য, মোট ১৫টি দৃশ্যে বিভক্ত। চার অঙ্কে সজ্জিত এই নাটকে আমিনপুর গ্রাম শহর কলকাতা এবং গ্রামের হারু দত্তের বাড়ির দৃশ্য রয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়

অন্ধকারের বুকে উঁচু একটা জায়গা তার সুদূরে রক্তিম পটভূমি। ছায়ামূর্তির মতো বিভিন্ন মানুষের আনাগোনা সেখানে। রক্তিম পটভূমিতে আগুন ও ছাই দেখা যায়। প্রবীণ ব্যক্তি প্রধান সমাদ্দার এবং যুবক জোয়ান কুঞ্জ (প্রধানের ভাইপো) এগিয়ে আসে। নাটক এখান থেকেই শুরু হয়, প্রধান সমাদ্দারের সংলাপের মধ্য দিয়ে—

"প্রধান । (হাত তুলে রক্তিম পটভূমির দিকে ইঙ্গিত করে) তা এসব কিছুর পর, সব কিছুর পর যেদিন আসবে, আমার শ্রীপতি-ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরণ হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওই, ওই রকম। ওই রকম সোন্দর, ওই রকম নিদারুণ সোন্দর। (অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যভার হেসে) তিন মরাই ধান! তিন মরাই ধান, তুই আমাকে কি বলিস্ কুঞ্জ। জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্তি নেই, তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ ও কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেবরে কুঞ্জ! শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেবরে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি ভূপতি—"

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই প্রধান সমাদ্দার পুত্রের মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার চেহারার মধ্যে অনাগত দিনের রক্তিম চিত্র এবং উদভ্রান্তি জড়িয়ে রয়েছে। প্রধান সমাদ্দারের এই চিত্র কুঞ্জের চোখে ধরা পড়ে। পুত্র সন্তান দুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত কিন্তু সর্বব্যাপী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যুতে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকুও চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র, তিন মড়াই ধান নষ্ট হয়ে গেল, পঞ্চাননীর প্রাণ গেল। তার মধ্যে ভাইপোর সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। যেটুকু জমি জায়গা ছিল তার উপর ভর করে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিল। তারপর তার জীবনে এল চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্ত হতে হল প্রধান সমাদ্দারকে, ছাড়তে হল গ্রাম। শহরের বিভিন্ন পার্ক এবং ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন প্রধান সমাদ্দার। গ্রামের এই সহজ সরল সাদামাটা লোকটি প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী সাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয় শহর কলকাতায়। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় চালব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকান, সেখানে বসে আছে হারু দত্ত। দোকানের মধ্যে খালি বস্তা ও ওজনদাড়ি।

সেখানে চাল নেই। আর দু মনি চালের বস্তা কুলির পিঠে করে চোরা কুঠুরির গলিতে মজুদ করা হচ্ছে। গ্রামের জোতদার হারু দত্ত আর শহরের মজুতদার কালীধন হাত মিলিয়ে চোরা চালান আর কালোবাজারির ব্যবসা চালাচ্ছে। এখানে দেখা যায় গ্রাম ছেড়ে চলে আসা প্রধান সমাদ্দারের ভাইপো নিরঞ্জন, রামহরি নামে গোমস্তার কাজ করছে। যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারি আর মজুতদারের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ যারা তৈরি করেছিল, ব্রিটিশ শাসক তার মাথায় থাকলেও হারুদত্ত, কালীধন তার দূরতম অস্ত্র। গ্রামের সব ধান সংগ্রহ করে শহরের কালীধনকে দেয়। কালীধন তা মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন করে। আবার মজুতদারিতে টাকা লগ্নি করেও দুশ্চিন্তায় কালীধন রাত্রিতে ঘুমাতে পারে না। কালীধন বলে 'না না দত্ত তুমি বোঝ কি! নিদেনপক্ষে এখনও সওয়া লাখ টাকার মাল আমার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অন্তত এই টাকাটা উশুল না হয়ে আসলে ... রাত্তিরে ঘুমতে পারিনে দত্ত!' একদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ অপরদিকে চলে কালীধন, হারু দত্তের অবাধ কালোবাজারি। এর থেকে সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত কারোরই রেহাই নেই। নেই কোনো প্রতিরোধের পথও। কারণ শাসকেরই প্রশ্রয়ে পালিত এই কালোবাজারির দল। আবার ব্যবসায়ীরা শাসকের দলকে নিজের প্রয়োজনে হাত করে রেখেছে। শাসকের প্রতিভূ পুলিশ মন্বন্তরের সময়ে কর্মচারি রাজীব, হারু দত্ত, কালীধনকে গ্রেপ্তার করলেও জেল থেকে ফিরে আসতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। মন্বন্তরের দুর্দিনে, মানুষের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধিতে সুদখোর, মহাজন, জোতদার, চোরাচালানকারী, মজুতদার সকলেই ফুলে ফেঁপে উঠে। তাদের প্রশ্রয় দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। একে অপরের পারস্পরিক গাঁটছাড়া বাঁধার মধ্য দিয়ে সেদিন এই সংকট ঘনীভূত হয়েছিল।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় 'নিখরচার লঙ্গরখানা'। সেখানে পোস্টার দেওয়া আছে 'ফ্রি কিচেন'। গ্রাম থেকে চলে আসা অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় সেখানে। কুঞ্জ-রাধিকাকেও সেখান দেখা যায়। নানা জনের হৈ-হট্টগোল চিৎকারে জায়গাটা সরগরম। এখানে নানা ভিখারীদের কথাবার্তা উঠে আসে। তাদের জীবন যন্ত্রণার নানা দিক নাট্যকার তুলে ধরেন। যেমন—

১ম ভিখারিনী। দ্যাখো দিকি কান্ড। হু (আশে পাশের পাঁচজনের প্রতি) আচ্ছা,

নিবিতো সব একসঙ্গে করে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য়্যাঁ, সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কীরকম ধারা বে-আক্কেলে কান্ড! (চেঁচিয়ে) মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এট্টা প্রাণে একটা কথা বলল না!

বাংলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে উঠে আসা সহায় সম্বলহীন মানুষের ভিড় কলকাতার নগর জীবনে আছড়ে পড়ে। কলকাতার সুস্থময় পরিবেশ হয়ে উঠে গন্ধময়। এই অবস্থা প্রতিকারের কোনো উপায় ব্রিটিশ সরকার করেননি। উপরন্তু শহরকে বাঁচাবার জন্য এই সব ক্ষুধার্ত মানুষদের জোর করে লড়িতে তুলে শহরের বাইরে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। আবার এই ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খল ভাবে হয়নি। যাকে যেমনভাবে পেরেছে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এক পরিবারের কেউ হয়তো রয়ে গেছে, কেউ পাচার হয়েছে। কোথাও স্বামী পড়ে আছে, স্ত্রী চলে গেছে। সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে পিতা-মাতার বিচ্ছেদ হয়েছে। সে এক অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতার পরিবেশ। মহামারী ও মড়কে মানুষের মৃত্যুর ফলে এই সময়ে নানা ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাতে সংক্রমণের ভয় ছিল। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার অকিঞ্চিৎকর হলেও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও নতুন ভীতির সঞ্চার হয়।

নিপীড়ন এবং অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যার ফলে কোনটা সহজ কোনটা কঠিন, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা বোঝার উপায় ছিল না। গ্রামের চাষির কাছে সবচেয়ে বড় খবর হলো প্রচুর ধান হওয়া। ঘরের চাষি আবার ঘরে ফিরে যাবে। নতুন ধান কেটে আবার ফসলে ঘর ভরে উঠতে এই সব স্বপ্নে চাষিরা মুগ্ধ হয়ে যায়। কুঞ্জও তাই ঠিক করে নিজের পায়ে হেঁটে আবার গ্রামে ফিরে যাবে, সোজা উত্তরের পথ ধরে। তাতে রাধিকার হারাবার ভয় থাকে না। গাঁয়ে ফেরার কথায় রঙিন হয় কুঞ্জ রাধিকার মন। সব চাষির বোধ হয় একই অবস্থা।

কুঞ্জ। (রাধিকার প্রতি) গাঁয়ে ফিরে যাব কথাটা মনে করলে সে বুকের ভেতরটা একেবারে আমার, এই দ্যাখনা, হাত দিয়ে দ্যাখ বুকে, দ্যাখ—(রাধিকার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে) দেখেছিস—!

রাধিকা। সত্যিই তো।

চতুর্থ অঙ্ক শুরু হচ্ছে আমিনপুর গ্রামে। গাঁয়ে মানুষ যারা মন্বন্তরের প্রাক্কালে ঘর ছেড়ে বাঁচার তাগিদে শহরে চলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা শত বিপর্যয়েও প্রাণ হারায়নি তারা সকলে ফিরে এসেছে গ্রামে। নতুন করে ঘর বাড়ি তৈরি করে হারানো ভিটেতে আবার মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে ফিরে এসেছে। প্রধানের ভিটের সেই ভাঙা ঘরখানাকে বাসপোযোগী করে নিয়েছে। প্রথম দৃশ্য শুরু হয় প্রধান সমাদ্দারের উঠানে কুড়ি-পঁচিশজন চাষী পারস্পরিক আলোচনায় ব্যস্ত, নাট্যকার চাষীদের এই পারস্পরিক আলোচনাকে তিনটি দলে ভাগ করে দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, দৃশ্যটি দীর্ঘ। সুচিন্তিত এবং সুশৃঙ্খলভাবে এই সভা হচ্ছে না। প্রাণের দাবিতে ফিরে আসা মানুষগুলি নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য একত্রে মিলিত হয়েছে। অথচ এই অভিজ্ঞতা কারোর আগে হয়নি, প্রস্তুতও ছিল না এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এইসব ভাগ্যহারা কৃষকদের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই কিসে কী হবে? তার উপর ঘটনা বিশ্লেষণের সুনিপুণ কৌশলও তাদের অজানা। তবু আজ তারা মিলিত হয়েছে বাঁচার তাগিদে। আলোচনার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হবে। বিজন ভট্টাচার্য এই দৃশ্যে কৃষকমন্ডলীর বিশৃঙ্খল সভার মধ্যে দিয়েই একটি জনসমষ্টির সমষ্টিগতভাবে বেঁচে থাকার প্রয়াস দেখিয়েছেন। 'হোক না তা বিশৃঙ্খল! কিন্তু যা গ্রহণ করতে হবে তা সকলের মতামতকে মান্যতা দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

দ্বিতীয় দৃশ্যে সদ্য কাটা ফসলে ভরে গিয়েছে বাড়ির উঠান। দু-চারজন বাড়তি লোক সহ বাড়ির সবাই ধান ঝাড়াই বাছাইয়ের তদারকিতে ব্যস্ত। নিরঞ্জন, কুঞ্জ পূর্বেকার মতোই আবার কৃষকের মেজাজে ফিরে এসেছে। তাদের যোগ্য সহযোগিতা করছে দুই বৌ রাধিকা বিনোদিনী। 'উজ্জ্বল দিবালোকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে এতদিনে বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে দূর থেকে।' মন্বন্তরের শেষে গ্রামবাংলার কৃষিজীবন পুনরায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে। প্রাণোচ্ছলতায় কৃষক কুঞ্জ ধর্মগোলায় জমা দেবার ধানের মাপ বাড়িয়ে এগারো কাঠা করে দেয়। পরিবার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না কারণ এই ধান তো সবার জন্য ধর্মগোলাতেই যাবে। দয়াল বাড়ি ঘুরে সব ব্যবস্থা তদারকি করে। রাধিকাকে আনন্দে নতুন চালের পিঠে খাওয়াতে বলে। সেই প্রসঙ্গেই 'নবান্ন' নাটকে আসে নবান্ন অনুষ্ঠানের কথা। কৃষকদের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে আনন্দের অনুষ্ঠান নবান্ন। নবপ্রাণের উন্মাদনায় কৃষকেরা মজে উঠে। নিরঞ্জন, দয়ালের সঙ্গে লাঠি খেলতে যায়, হারলে একসের গরম জিলিপি খাবার

প্রস্তাব রাখে। দয়ালও রাজি হয়। এই নিয়ে বিনোদিনী ও রাধিকা মস্করা করে নিরঞ্জনের সঙ্গে। অপরদিকে সামনে চলেছে মোরগের লড়াইয়ের প্রস্তুতি, কোথাও আবার চাষী রমনীদের গানের আয়োজন। এই খেলায় যে জিতল তাকে নতুন গামছা, কাস্তে দিয়ে সম্মানিত করা হল। এইভাবেই আনন্দের দিনে মনে পড়ে ফেলে আসা সেই মন্বন্তরের কালো ছায়া। এবার তারা অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। এবার তারা ভাবে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় এলে সংঘটিত ভাবে তা মোকাবিলা করতে হবে। এবার তারা ধর্মগোলা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কালোবাজারি, জোতদারদের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে তার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়।

২০৮.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নবান্ন' নাটকের শিল্পমূল্য আলোচনা করো।

২। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৩। 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। 'নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতা আলোচনা করো।

২০৮.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'নবান্ন'—বিজন ভট্টচার্য, দে'জ পাবলিশার্স।

২। গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়—দর্শন চৌধুরী।

৩। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত—মন্দিরা রায়।

৪। 'নবান্ন' : প্রযোজনা ও প্রভাব—সুধী প্রধান।

৫। প্রসঙ্গ নবান্ন—দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার নন্দী।

৬। উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব—অমলেন্দু সেনগুপ্ত।

একক - ১০ - নবান্ন নাটকের নামকরণেও গানের ব্যবহার

<u>বিন্যাসক্রম</u>

২০৮.৩.১০.১ : নামকরণ

২০৮.৩.১০.২ : নবান্ন নাটকে গানের ব্যবহার

২০৮.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৮.৩.১০.১ : নামকরণ

১৩৫০ বঙ্গাব্দে অবিভক্ত বাংলায় ভয়ঙ্করতম মন্বন্তর দেখা দেয়। ইংরেজি সাল অনুযায়ী ১৯৪৩ সালে। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে যা বাংলার ইতিহাসে গভীরতম ক্ষতচিহ্ন হিসাবে ছাপ রেখে গেছে। 'নবান্ন' নাটকটি মন্বন্তরের সময়ে 'অরনি' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মন্বন্তর। আবার মন্বন্তরের বিপর্যয়ই এই নাটকের শেষ কথা নয়। মন্বন্তরের শেষে বেঁচে থাকা গ্রামবাংলার মানুষ শহর থেকে আবার গ্রামে ফিরে এসে নতুন ভাবে নতুন করে সংঘবদ্ধভাবে বাঁচার শপথ গ্রহণ করেছে। মন্বন্তরের মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষেরা মন্বন্তর শেষে গ্রামে ফিরে এসে নতুন ধানে নবান্ন উৎসব করেছে। মানুষের এই নতুন করে বেঁচে উঠার জয়গান নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু মন্বন্তর হলেও, 'তিমির বিনাশী' প্রত্যয়ের কারণে নাটকের নাম হয়েছে 'নবান্ন'। এই প্রসঙ্গে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'আকাল' (১৩৫১)-এর কথামুখ অংশে বলেছেন—

> "তেরোশ পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘর ভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।"

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের পতন ঘটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেন ১৭৫৭ সালে। কার্যত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসনের দায়িত্বলাভের প্রথম দিকেই মন্বন্তর দেখা দিল যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। বাংলার সাল ছিল ১৭৭৬ ব.। পরবর্তীতে চলে যাওয়ার প্রাকমূহুর্তে ১৯৪৩ সাল, বাংলার ১৩৫০ বঙ্গাব্দে পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা যায়। এই দুই মহা মন্বন্তরের মাঝে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছে। বাঙালি যে নিয়ত দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তর নিয়ে ঘর করে এসেছে পরাধীন ভারতে তা একাধিকবার প্রমাণিত।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে মন্বন্তর বাঙালির জীবনে গভীর ক্ষতের চিহ্ন রেখে যায়। তৎকালীন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল—

"সমগ্র বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের যে ঝড় বহিয়া গেল তাহার সঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেরই তুলনা হইতে পারে। এই দুর্বিপাক বাঙলাদেশকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, ইহার আসাতে এদেশের সমাজব্যবস্থা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। বহু গ্রাম জনহীন শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে;"

পঞ্চাশের এই মন্বন্তর মানুষেরই সৃষ্টি করা। মন্বন্তরের শেষে চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন ১৯৪৪ সালের জুন মাসে, যা 'উড হ্যাড কমিশন' নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরেই ভারত খাদ্য ঘাটতির দেশ। এক নিঃশব্দ দুর্ভিক্ষ ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরও আচমকা হয়নি। এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯৪১ সাল থেকে যখন প্রবল বেগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের মহামন্বন্তর বিষয়টি উঠে আসে। আমিনপুর গ্রামের মানুষদের নিয়ে নবান্ন নাটক গড়ে উঠেছে। মোটামুটি প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। এদের মধ্যে প্রধান সমাদ্দার ও তার পরিবারবর্গকে কেন্দ্র করে গ্রামের অন্যান্য মানুষদের পরিধি নির্দিষ্ট হয়েছে। সুখে দুঃখে এদের দিন কাটে, যেমন কেটে এসেছে ইতিপূর্বে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের। আমিনপুর গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানের পরিবারেও খাদ্য সংকট শুরু হয়। প্রধান সমাদ্দার দুঃখ করে বলে সব নৌকা আটকে রেখে উপকূলবর্তী সব মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্য ভয়াবহ বিপদের আকালকে তবুও ঠেকানো যায় না। নিরন্ন অসহায় মানুষ ফ্যান দাও চিৎকার করতে থাকে অপরদিকে মৃত মানুষের জন্য হরিবোল ধ্বনিতে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নবান্ন রচনাকালে বাংলাদেশের জনমানসে নতুন জীবনবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ গণমানসে বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে তুলেছে। 'নবান্ন' নাটক নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছে। মরা গাঙে আবার নবান্ন উৎসব শুরু হয়েছে। কৃষকদের জীবনে মহার্ঘতম উৎসব 'নবান্ন'। নতুন ধানের উৎসব। কৃষকের প্রাণের উৎসব। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা কৃষক দয়াল শপথ করছেন—'এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হত প্রধান, তবে, তবে যদি পারে, জোর, জোর প্রতিরোধ এবার।'

২০৮.৩.১০.২ : ‘নবান্ন’ নাটকে গানের ব্যবহার

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। গণনাট্যের অনুপ্রেরনায় তার নাটক লেখা। তিনি গান লিখতেও পারতেন গাইতেও পারতেন। অল্পবয়সে গ্রামজীবন অতিবাহিত করার ফলে গ্রামজীবনের সঙ্গীত তার জানা ছিল। নাট্যকার তার পিতার কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা নিতেন। গণনাট্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তিনি যখন নাটক লিখতে শুরু করলেন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং গ্রামবাংলার লোকসঙ্গীতের স্থান এবং গণসঙ্গীতের উন্মাদনা তার নাটক জুড়েই থাকবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাঙালির গানের ঐতিহ্য চিরকালীন। বাংলার যাত্রা, নাটকে গানের ব্যবহার বহুকাল থেকে চলে এসেছে। বাঙালি বরাবরই গান শুনতে ভালোবাসে। বাঙালি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, নানা উৎসবাদিতে গানের মহিমা প্রচার করে। বাঙালির জীবন নির্ভর নাটকেও গানের ব্যবহার দেখা যায়। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের গানের প্রতিভার উল্লেখ করতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি অরুণ মিত্র লিখেছেন—

“আমি নাট্যের চেয়ে সংগীতে তাঁর ক্ষমতার বেশী অনুরাগী ছিলাম এবং আমার দৃঢ় ধারণা, নাটকের মতো সংগীতে নিজেকে নিয়োজিত করলে সে এক্ষেত্রেও নতুন পথ খুলে দিতে পারত।” (পরিচয়, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৭৮)

বাংলা নাটকে গানের যে ব্যবহার ছিল সেগুলিতে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ব্যবহার করা হত। তখনকার পাঠক এবং দর্শক সেগুলি উপভোগ করত।

নবান্ন প্রথাসিদ্ধ কোনো নাটক নয়। এই নাটকের গঠনভঙ্গীতে, ঘটনার উপস্থাপনায় এবং চরিত্র নির্মাণের মধ্যে প্রথাসিদ্ধ নাটকের ধরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই নাটকের মধ্যে দৃশ্যের মাধ্যমে একটা যুগের, এবং সেই কালের সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে। অভিজ্ঞতার নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দল নতুন করে বেঁচে ওঠার পথ খুঁজেছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই কৃষকেরা গ্রামে ফিরে আসলে নিজেদের মধ্যে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় বসেছে। নিরঞ্জন বিনোদিনীর পরিচয় হয়েছে শহরে, তারাও গ্রামে ফিরে এসেছে। নিজেদের ভাঙা ঘর মেরামত করে নিয়ে বাসপোযোগী করেছে। সেখানে নতুন করে বাঁচার কথা আলোচিত হয়েছে। সভা শেষ করে সকলে চলে যায়।

অন্ধকারে বিনোদিনী উনুন জ্বালিয়ে মাটির হাড়িতে ভাত রান্না করে। অপরদিকে নিরঞ্জন শুয়ে পড়ে গান ধরে—

> "বড় জ্বালা বিষম জ্বালায় / পুড়ে পুড়ে হব সোনা,
> সে কথা তো মিথ্যে হল / হলাম অনুপায়।
> দুঃখের দাহন সুখের আসন / বিজ্ঞজনের হক কথা,
> শুনে এলাম এই তথ্য / চলতি পথের এক তারায়
> হলাম নিরুপায়।"

এই নাটকের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই ফকির এবং দোহারেরা বিবেকের ভূমিকার মতো গ্রামীন জীবনের গান বেঁধে সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনেকটা মানিক পাড়ের পাঁচালির মতো গানের মধ্যে কাহিনি বলা। অন্নবস্ত্রহীন গ্রামীন মানুষের দুর্গতির স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়া যে গানটি আজকের দিনে দাঁড়িয়েও অনেক প্রাসঙ্গিক। সংঘবদ্ধতা ব্যতীত মানুষের জীবন যন্ত্রনার ছবি বদলানো সম্ভব নয়। সেই কারণে ফকির ও দোহারের গান আজকের দিনে দাঁড়িয়েও সম প্রাসঙ্গিক—

> "আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
> হিন্দু মুসলিম যতেক চাষি দোস্তালি পাতান।।
> এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
> আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।
> (এখন) বুঝে শুনে যেবা জন পৃথক হয়ে রয়।
> ছয় মাসের মধ্যে তার এন্তেকাল ফরমায়।।
> মলিনপুরের জব্বর মিঞার দুঃখের কথা জানো।
> প্রতিবেশী পতিতপাবর বৈরী যে কারণ।।
> কালান্ত আকালে এমন কত চাষি ভাই।
> অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হলে দাঙ্গা বাঁধে। তাতে গ্রামের উভয় ধর্মের কৃষকদের ক্ষতি হয়। লাভ শুধু হয় শাসকের এবং দালাল মজুতদারদের। তাই নাট্যকার সুন্দরভাবে নাটকের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন ফকিরের গানটি। লড়াইয়ের পূর্বমুহূর্তে সাবধান করে

দিয়েছেন কোনোরকম বিভেদকামী শক্তি ধর্মের নামে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধতাকে যাতে নষ্ট করতে না পারে। আমরা জানি যে এই নাটকের পূর্বে ১৯৩৬ সালে সারা ভারতে কৃষক সভা সংগঠনটি তৈরি হয়েছে। নাটকের মধ্যে শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা সমসংখ্যায় অবস্থান করেছে। নবান্ন উৎসবে সকলের সমান উৎসাহ ও অধিকার লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমনীদের কণ্ঠে গানের প্রসঙ্গটি আবার উঠে এসেছে। তৃতীয় দৃশ্য জুড়ে চলেছে নবান্ন উৎসব। অন্নের অভাবে কৃষক, কৃষক রমনীরা শহরের ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল। রাস্তায় পথে ঘাটে ভাত নয় একটু ফ্যান চাই বলে ঘুরতে হয়েছে। কত প্রিয়জন মরে গেছে অনেকে আবার হারিয়ে গেছে। রোগে, শোকে বিধ্বস্ত হয়েছে গ্রাম। তারপর সুদিন এসেছে। ধান কেটে গোলায় তোলা হয়েছে। গ্রামের কৃষক, বধূরা প্রাণের উৎসব নবান্ন নিয়ে মেতে উঠেছে। শত শত বিপর্যয়েও গ্রামের এই মানুষদের অন্তহীন প্রাণের উল্লাস নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য জুড়ে বিন্যস্ত হয়েছে।

"নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি। কনে দেখা আলো মেখে আস্‌বে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।"

বাংলার গ্রামজীবনের কৃষকরমণীর দল তাদের প্রিয়জনকে নিয়ে প্রাণস্ফূর্তির এই গান পরিবেশন করে। এই গানের মধ্যে গ্রাম জীবনের স্বচ্ছলতার আভাস। একসময়ের হারানো আনন্দ ফিরে পেয়েছে তারা। তাদের কণ্ঠের গান সেই সুখ ও আনন্দের জানান দিয়েছে। মানুষের হারানো বিশ্বাস, ভালোবাসা পুনরায় ফিরে এসেছে।

২০৮.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নবান্ন' নাটকটির নামকরণ কতদূর যথার্থ—তা আলোচনা করো।

২। 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। 'আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পিছু হটছিস।'—প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২০৮.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ‘নবান্ন’—বিজন ভট্টচার্য, দে’জ পাবলিশার্স।

২। গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়—দর্শন চৌধুরী।

৩। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত—মন্দিরা রায়।

৪। ‘নবান্ন’ : প্রযোজনা ও প্রভাব—সুধী প্রধান।

৫। প্রসঙ্গ নবান্ন—দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার নন্দী।

৬। উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব—অমলেন্দু সেনগুপ্ত।

একক - ১১ - নবান্ন নাটক ও গণনাট্য, নবান্ন নাটকের সংলাপ

<u>বিন্যাসক্রম</u>

২০৮.৩.১১.১ : নবান্ন নাটক ও গণনাট্য

২০৮.৩.১১.২ : নবান্ন নাটকের সংলাপ

২০৮.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

<u>২০৮.৩.১১.১ : 'নবান্ন' নাটক ও গণনাট্য</u>

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA প্রকাশিত প্রথম ইস্তাহারে People বা গণ অর্থে সমাজের বৃহৎ অংশের শ্রমিক, কৃষক মেহনতি মানুষকে বোঝানো হয়েছিল। মার্কসবাদী ভাবনায় পুষ্ট গণনাট্য সংঘ বিশ্বাস করত 'মানুষের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস'। ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের অভিমত ছিল 'ভারতের নবীন সাহিত্যকে বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা-ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পরান্মুখতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীময় ফ্যাসিবাদের বর্বর অমানবিক আগ্রাসীর ফলে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ভাবনার মানুষেরা আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী কার্যকলাপকে গুরুত্ব দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ নামে পরিবর্তিত হল। বাংলায় গণনাট্য সংঘ এই ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৪৩ সালে মে মাসে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার গণনাট্য সংঘ তার প্রাদেশিক শাখা হিসাবে কাজ শুরু করে। ফ্রান্সে রঁমা রোল্যা ১৯০৩ সালে The 'People's Theatre -এর প্রভাব গণনাট্যে পড়েছিল। অপরদিকে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আয়ারল্যান্ড, স্পেনেও People's Theatre কাজ করেছিল। রঁমা রোল্যা ইউরোপের চিরায়ত নাট্যভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে নাটক করতে হবে, কি ভাবনায় করতে হবে এবং কাদের জন্য করতে হবে। তার অর্থ হল People's Theatre কি, কেন, এবং কাদের জন্য এই তিনটি সূত্র সহজ সরল করে তুলে ধরলেন। আমাদের চিরায়ত ধারণা ছিল, লোকে নাটক দেখবে, খুশী হবে। জীবনকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকবে, প্রমোদ বা আনন্দ ঢেলে দেবে। এবং জীবনের অলৌকিক মায়ায় (illution) নিজেদের বিভ্রান্ত করবে—ব্যস এই পর্যন্ত। পিপলস থিয়েটারের মূল লক্ষ্যই হল জনগণ। তাদের ভাবনাচিন্তা, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রাম।

থিয়েটার আর বিশুদ্ধ শিল্পের প্রকাশের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। পিপলস থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি প্রধান তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। প্রথম শর্ত হল—সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে হবে। তাদের প্রাণের কথা সহজবোধ্য প্রমোদের মাধ্যমে বলতে হবে। সাধারণ দর্শক বলতে বৃহৎ অর্থে জনসাধারণ, শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষকে তিনি বুঝিয়েছেন। পরিশ্রমক্লান্ত মানুষ খুশী মনে এই নাটক না দেখলে পরবর্তী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় শর্ত হল—দর্শকদের শুধু আনন্দপ্রদান নয় তাদের নতুন জীবন ভাবনায় উজ্জীবিত করতে হবে। সাধারণ মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত যে সমস্যা ও চিন্তার জটে জড়িয়ে থাকে তারা যেন সেগুলিকে থেকে পরিত্রানের শিক্ষা পায় নাটক দেখার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ জীবন সমস্যা, কারণ এবং মুক্তির চিন্তা ও উপায় অনুসন্ধানই পিপলস থিয়েটারের প্রধান লক্ষ্য।

তৃতীয় শর্ত হল—পিপলস থিয়েটারকে সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে। এর পরিধি আনন্দদান এবং শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দর্শককে জীবনের আনন্দের মধ্যে দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করার লক্ষ্যেই আধুনিক থিয়েটার ‘পিপলস থিয়েটারে’ পরিণত হয়। ভারতীয় গণনাট্যসংঘের নাট্যভাবনার চিন্তাসূত্রগুলি থেকে নতুন যে দিকগুলি উৎমাচিত হল—

ক। গণনাট্যের নাটকে কাহিনি আবর্তিত হবে জীবনের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে।

খ। নাটকে থাকবে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ।

গ। প্রথানুগ নাটকের একনায়কত্ব মহিমার পরিবর্তে স্বীকৃত হলো সমষ্টির মূল্য। ব্যক্তির পরিচয় এখানে ব্যক্তি হয়েও শ্রেণি প্রতিনিধি।

ঘ। সাধারণ দর্শক বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের মনোরঞ্জন ও তাদের শিক্ষা ও চেতনার জাগরণ ঘটাবে।

ঙ। এই ধরণের নাটকে লোকজীবনের স্পর্শ, লোকসঙ্গীত, গণসঙ্গীতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাটক আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তাই আমরা দেখতে পাই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দারের মুখে দুই পুত্র ভূপতি-শ্রীপতি শহীদ হবার কথা। মাতঙ্গিনী হাজরার স্মৃতিতে স্ত্রী পঞ্চাননীর মৃত্যুবরণ, সেই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে জনতার অর্থই হল 'ভারতছাড়ো আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় এই নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। মেদিনীপুর হয়েছে এক অর্থে আমিনপুর। শুধু ব্রিটিশের আক্রমণ নয়, তার প্রতিরোধ লড়াই সংগ্রাম এই দৃশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। ভূপতি-শ্রীপতি, পঞ্চাননীর সঙ্গে আরও অনেকে হতাহত হয়েছে। গ্রামবাসী ভয়ে দিশেহারা হলেও পঞ্চাননী তাদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়ে নিজে মরেছে এবং স্বজন হারিয়ে প্রধান সমাদ্দার বলে চলেছে—'চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলিগে ওদের। ডাক সব ওদের কুঞ্জ।' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন 'পোড়ামাটি' নীতির ফলে ধান নষ্ট করার খবর আমরা পেয়েছি। নৌকা ডুবিয়ে ধান নষ্ট করার খবরও আমরা পেয়েছি। তার ওপরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সেই সঙ্গে গ্রামে জোতদার, জমিদার, মুনাফাদারদের লোভ লালসা, হতভাগ্য মানুষের দুর্দশার সুযোগে জমি জায়গা অল্প দামে কিনে নেওয়ার প্রবণতা, খাদ্যাভাবে, অনাহারে, অনটনে, রোগে শোকে, মহামারী ও মড়কে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। ভেসে এল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের স্মৃতি, এই আকাল, অভাব, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও হার মানিয়েছে। এই নাটকের নির্যাতিত মানুষ একা নয়। সমষ্টিগত মানুষের জীবন, যন্ত্রণা, বেদনা, হাহাকার উল্লিখিত হয়েছে। অপরদিকে প্রতিরোধ, লড়াই, সংগ্রামের যে চিত্র সেখানেও উপস্থাপিত হয়েছে যৌথ নেতৃত্ব, সমষ্টিগত মানুষের উপস্থিতি। প্রথানুগ নাটককে অতিক্রম করে 'নবান্ন' নাটক গণনাট্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

গণনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জীবনের সমস্যাকে শুধুমাত্র তুলে ধরাই নয় তার সঙ্গে থাকবে সমাধানের পথও। মানুষ শুধুমাত্র পড়ে পড়ে মার খাবে, পরিবেশের চাপে হাপিয়ে ওঠে শেষ হয়ে যাবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণের চাপে শুধুমাত্র হাহাকার ও আর্তনাদ করবে—এভাবে অসহায় বেদনার মধ্যে দিয়ে নাটক শেষ হবে গণনাট্য সেকথা বিশ্বাস করে না। অপরাজেয় মানব শক্তির জয়গান প্রতিধ্বনিত হবে নাটকে। 'নবান্ন' নাটকে তাই আমরা দেখি জাতির সামগ্রিক ট্র্যাজেডির পরেও নাটকের শেষে মহামিলনের ছবি। গণনাট্যের ব্যক্তিকেন্দ্রীক জীবনের পরিবর্তে যুগ ও পরিবেশজাত সামগ্রিক জীবন গণনাট্যে

প্রকাশিত। 'নবান্ন' নাটকে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নাটকের প্রতিটি চরিত্র সমাজ থেকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার বিবাহ বাড়িতে নির্মলবাবুর চরিত্রটিও মধ্যবিত্ত সমাজের এক অংশের উদার মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

সাধারণ দর্শকদের আমোদ-প্রমোদ, তাদের শিক্ষা ও চেতনার জাগরণে 'নবান্ন'র সার্থকতা অনেক বেশি। সমাজের নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কাছে এই নাটক অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তাদের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি নবান্ন নাটকের মূল উপজীব্য। বাস্তব জীবনের মহাজন, জোতদার, জমিদার, কালোবাজারি, খরা, বন্যা প্রভৃতির প্রকোপে পড়া জীবনের ফাঁসে বাঁধা। স্বাভাবিকভাবেই গণনাট্যের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা এই নাটকের মধ্যে বিদ্যমান।

গণনাট্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'নবান্ন' নাটকে গণসঙ্গীতের মর্যাদাও রক্ষিত হয়েছে। লোকজীবনের নানা সঙ্গীত, তার পরিবেশনের ধারাও এই নাটকের গানে প্রকাশ পেয়েছে। নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আগে ফকিরের কণ্ঠে যে গান আমরা শুনতে পাই তা স্মরণ করিয়ে দেয় 'মানিক পীড়', 'মুশকিল আসান' অথবা 'গাজী'র গানের কথা। তাদের এই গানে জীবনের প্রত্যাশা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এদিক থেকে গানের নানা বৈশিষ্ট্যই 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে পরিলক্ষিত করা যায়। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, শুধুমাত্র মফস্বল শহর নয় প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল 'নবান্ন' নাটককে কেন্দ্র করে। এখানে গণনাট্যের সার্থকতা 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। 'নবান্ন' ও গননাট্যের আবির্ভাবের ফলে তৎকালীন শাসক ইংরেজ এবং তার তল্পিবাহক বুর্জোয়া পেশাদারি থিয়েটার ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। স্বার্থরক্ষাকারীর দল ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে তাদের থিয়েটার ভাড়া দেয়নি। 'শ্রীরঙ্গম' থিয়েটার প্রথম সাতদিন ভাড়া দেবার পর বন্ধ করে দিয়েছিল ভাড়া দেওয়া। শিল্পকলার নন্দিত রূপচর্চার চেয়ে নাটকের সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেক গুণে বেশি। যুগে যুগে কালে কালে দেশে দেশে তা স্বীকৃত। 'নবান্ন' সে দায়িত্ব সেদিন যথাযথ পালন করে গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্যের সাথী হয়েছিল।

২০৮.৩.১১.২ : 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ

সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। সেই নাটক যদি হয় জীবনধর্মী কোনো ঘটনা বা বাস্তব চরিত্রের সম্মিলন তাহলে তার সংলাপকেও হতে হবে জীবন্ত। স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতাশূন্য। বিজন

ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটিতে মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রামবাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্যোগ ও দুর্গতির কাহিনি বর্ণিত। বিজন ভট্টাচার্য নাটকটিকে রচনা করতে গিয়ে জীবন থেকে নাটকের দিকে এগিয়েছেন। নাট্যকার তার জীবন অভিজ্ঞতায় দুর্ভিক্ষের মানুষজনদের দেখেছেন। শোষিত কৃষক, অত্যাচারী শাসক, জোতদার, কালোবাজারি তার নিজের চক্ষে দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন শহরবাসী দালাল, টাউটার, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত শ্রেণির এক অংশের নিস্পৃহ উদাসীনতা। আমিনপুর গ্রামের কৃষকদের সংলাপের প্রসঙ্গ প্রথমে আলোচনা করা যাক— গ্রামের মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনা, মহামন্বন্তরের ভয়ঙ্করতম পরিবেশের ব্যথা বেদনা সমগ্র কৃষক সমাজেরই ব্যথা বেদনাতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের চরিত্রগুলি জীবন্ত করতে গিয়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য সময়োপযোগী সংলাপকেই তুলে ধরেছেন। বিজন ভট্টাচার্য পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাটকে সাধারণ মানুষ যা কৃষকদের চরিত্র প্রকাশে বেশির ভাগ নাট্যকারই ব্যর্থ হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবিকল মানুষের মুখের ভাষা নাটকে তুলে ধরেছেন অনেক নাট্যকারই। বিজন ভট্টাচার্য গ্রামবাংলার নানা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে কৃষকদের সংলাপের মধ্যে একটি আঞ্চলিক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অবিভক্ত বাংলার একাধিক জেলার গ্রামীণ ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আবার অনেক জায়গায় প্রচলিত গ্রাম্য ও চলিত ভাষার কাছাকাছিও রেখেছেন নাটকের ভাষাকে। নাটকের মধ্যে কৃষকদের একটা সর্বজনবোধ্য ভাষা তুলে ধরেছেন নাট্যকার। আমরা সহজেই বুঝতে পারি নাট্যকার কোন এক প্রান্তের কৃষক অথবা পরিবারে নয়। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল নয়, সমগ্র দেশের নির্যাতিত কৃষকদের একাত্ম করে দিতে পেরেছেন তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে। বাংলা নাটকে সংলাপের এই সার্বজনীনতা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। পরবর্তী বাংলা নাটকে 'নবান্ন' প্রবর্তিত কৃষকের এই সংলাপের ভাগ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। নাট্য সংলাপ শুনে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকারকে বলেছিলেন আপনি তো জাত চাষা। তার উত্তরে নাট্যকার চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় জানিয়েছেন—'আমি চাষা নই, তবু চাষার ভাষা আমার আয়ত্ত ছিল।'

'নবান্ন' নাটকের মধ্যে কৃষকদের সংলাপের স্বাভাবিক রূপই উঠে এসেছে তার উদাহরণ—

দয়াল। বলো কী ব্যবস্থা করবে। আমি তাতেই আছি।

প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কেন শহরে! অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা। (১/৩ দৃশ্য)

নিরক্ষর কৃষকেরা সাধারণত ছোট ছোট কথাতেই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। এই সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই থাকে সংলাপধর্মীতা ও নাটকীয়তা। তাই প্রধান সমাদ্দারের উক্তির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংলাপধর্মীতা ও নাটকীয়তা। যেমন—

প্রধান। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো, ভালো ভালো, কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আসে আবার, মন্বন্তর আবার আসে যদি সে মন্বন্তর। (৪/২ দৃশ্য)

কিংবা—

প্রধান। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা, ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। (৩/২ দৃশ্য)

প্রধান সমাদ্দারের ভয় ভীতি অকৃত্রিম সজীবতা লাভ করে, এই ধরণের সংলাপের মধ্যে দিয়ে। শুধুমাত্র প্রধান সমাদ্দার নয় অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও সেই অভ্যাস পরিলক্ষিত করা যায়। যেমন—

দয়াল। হ্যাঁ, আর দেরি কী?

নিরঞ্জন। না, আর দেরি কী! এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।

বরকর। হ্যাঁ, শুরু করে দাও।

সমীচরণ। আরম্ভ করো। (৪/১ দৃশ্য)

গ্রামীন মানুষ বলে এদের ভাষা অক্ষম বা দুর্বল নয়। গ্রামীন জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের আবেগকে, তাদের ভাবকে নানা লৌকিকে উদাহরণ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারে। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম থেকেই ইতিবাচক চরিত্র যুধিষ্ঠির অগাস্ট আন্দোলনের সহিংসপন্থী নেতা। যে প্রথম থেকেই প্রতিরোধের কথা বলে এসেছে। তার চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার একেবারেই ব্যর্থ। যুধিষ্ঠির এই নাটকের মূল চরিত্রদের সাথে একাত্ম হতে পারে নি। শুধুমাত্র

নাটকের প্রয়োজনে চরিত্রটি শেখানো বুলি বলে বিদায় নিয়েছে। এই নাটকে যুধিষ্ঠিরের সংলাপই একমাত্র কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, প্রাণহীন। যেমন—

> যুধিষ্ঠির। কথাটা হচ্ছে যে, যারাই আমাদের কর্তব্যের পথে সামান্যতম অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে এখন থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার দিক থেকে যে কোনো ব্যবস্থা, তা যতই নির্মম হোক না কেন, গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করলে আমাদের চলবে না। (১/১)

'নবান্ন' নাটকে সাফল্যের খতিয়ান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নাট্য সংলাপ সাফল্যের পিছনে বড় স্তম্ভ। নাট্যকারের নানান জীবন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি চরিত্রগুলিকে যেমন জীবন্ত করে তুলেছে ঠিক তেমনি চরিত্রের মুখের সংলাপও অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক হয়েছে। জীবন্ত এই চরিত্রগুলির সংলাপগুলি সর্বোপরি 'নবান্ন' নাটককে ভিন্ন এক মাত্রাদান করেছে।

২০৮.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নবান্ন একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক'—আলোচনা করো।

২। 'নবান্ন' নাটকের সমাজ বাস্তবতা ব্যাখ্যা করো।

৩। গণনাট্য আন্দোলনের আলোয় 'নবান্ন' নাটকটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৪। 'এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই!'—কোন প্রসঙ্গে কে কাকে এ কথা বলেছেন?

২০৮.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'নবান্ন'—বিজন ভট্টচার্য, দে'জ পাবলিশার্স।

২। গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়—দর্শন চৌধুরী।

৩। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত—মন্দিরা রায়।

৪। 'নবান্ন' : প্রযোজনা ও প্রভাব—সুধী প্রধান।

৫। প্রসঙ্গ নবান্ন—দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার নন্দী।

৬। উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব—অমলেন্দু সেনগুপ্ত।

একক - ১২ - 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম

২০৮.৩.১২.১ : 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র বিচার

২০৮.৩.১২.২ : প্রধান সমাদ্দার

২০৮.৩.১২.৩: হারু দত্ত

২০৮.৩.১২.৪ : কালীধন ধাড়া

২০৮.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৮.৩.১২.১ : 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র বিচার

আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে এই নাটকে গঠনকৌশল যেমন নতুন তেমনভাবেই চরিত্রগুলি নতুনত্বের আদলে তৈরি। প্রথাগত বাংলা নাটকে যে ধারা বহমান ছিল সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নাট্যকার নতুন ধারায় চরিত্রের উপস্থাপন করেছেন নাটকে। স্বাভাবিক ভাবেই পূর্বেকার বাংলা নাটকের চরিত্রবিচারের যে পদ্ধতি ছিল সেই পদ্ধতি এই নাটকে অবলম্বন করা হয়নি। গণনাট্যের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকে একদিকে যেমন গণের প্রতি দায়বদ্ধ অপরদিকে তেমনি যৌথ নেতৃত্ব নাটকে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে নাটক প্রথমে আবর্তিত হলেও পরবর্তীতে তা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আবার শুধুমাত্র গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি সমগ্র বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের ছবি একাকার হয়ে গেছে। এই নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র একটি বা দুটি চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজেডি অথবা কমেডি সীমাবদ্ধ নেই। গোটা সমাজের ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যেই কিভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ আন্দোলিত হল তাদের সেই নিশ্চিত ছবি নাট্যকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এই নাটকটিতে শ্রেণি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের ব্যক্তি চরিত্রের মূল্যায়ন করতে হবে।

২০৮.৩.১২.২ : প্রধান সমাদ্দার

'নবান্ন' নাটকের মধ্যে গোটা আমিনপুরের কৃষক সমাজ নায়ক চরিত্র হয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে প্রধান সমাদ্দার একটু ভিন্নধর্মী। এই নাটকে মন্বন্তর এবং শোষণের চিত্র বর্ণিত হওয়ায় চরিত্রগুলি তথ্যধর্মী হয়েছে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন সামাজিক

টাইপের চরিত্র হিসাবে। তার মধ্য থেকেই প্রধান সমাদ্দার স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। প্রধান সমাদ্দারের মানসিক বেসামাল অবস্থা, অর্ন্তদ্বন্দ্ব, স্মৃতিকথা সব মিলিয়ে কৃষক সমাজের মুখ্য প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করতে হয়। প্রধান সমাদ্দার গ্রামের মোড়ল, শ্রদ্ধা সম্মানে সে গ্রামের মাথা। তার পরিবারের কাহিনি নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। সমগ্র গ্রাম জুড়ে কৃষকদের যে দুর্যোগ তা প্রধান সমাদ্দারকে বিচলিত করে এবং বিপর্যস্তও করে তোলে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশের বিপর্যয়ের মধ্যে চরিত্রটিকে স্থাপিত করেছেন নাট্যকার। নাটকের মধ্যে প্রধান সমাদ্দারকে কেন্দ্র করে কাহিনি ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে জেলা, জেলা থেকে সারা দেশের মধ্যে ব্যপ্ত হয়েছে। যাকে কিনা আমরা বলি পঞ্চাশের মন্বন্তর।

নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান সমাদ্দার দ্বন্দ্বময় অন্তর্জ্বালায় ব্যক্তিত্বময় হয়ে উঠেছে। নাটকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংঘাত, প্রধান সমাদ্দারকে স্বতন্ত্র করেছে। নাটকের মধ্যে অন্যান্য চরিত্র থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী বলে প্রতিরোধের কথা। প্রধান সমাদ্দারের ভাইপো নিরঞ্জন, কুঞ্জ গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার কথা বলে। প্রধান সমাদ্দার এই কথা শুনে দ্বিধান্বিত হয় কারণ তার ইচ্ছা প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিকে। তার দুই যুবক পুত্র শ্রীপতি ও ভূপতির মৃত্যু হয়েছে আগস্ট আন্দোলনে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে, সেকথা সে এখনো ভুলতে পারেনি। ক্ষোভে, যন্ত্রণায়, অভিমানে প্রধান সমাদ্দার বলেন—'শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেবরে কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব।'

নাটকের গোড়ার দিকে প্রদান সমাদ্দারের কথাবার্তায় এবং চালচলনে কিছুটা ভারসাম্যহীনতা এবং পাগলামি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় পাগলামির মধ্যেও রয়েছে গভীর অন্তর্দাহ। এই গভীর অন্তর্জ্বালা প্রধান সমাদ্দারকে পাগলে পরিগণিত করেছে। খাদ্য উৎপাদনকারী গ্রামের কৃষকেরা ভিখারিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রিয়জনের মৃত্য, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু এবং কৃষকের ভিক্ষাবৃত্তি এই মর্মান্তিক উপলব্ধি প্রধান সমাদ্দারের স্থিতাবস্থাকে বিচলিত করেছে। দুর্যোগের ঘনঘটার শেষে নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গ্রামের অনেকেই ফিরে এসেছে। আসেনি প্রধান সমাদ্দার, নবান্নের উৎসমুখর দিনে নিরঞ্জনের মনে পড়ে প্রধান সমাদ্দারের কথা, কেননা তিনি না এলে নতুন ধানের উৎসব পরিপূর্ণতা পাবে না। প্রধান সমাদ্দার ফিরে আসে গ্রামে। সুখের ছবি সম্পূর্ণ হয়। প্রধান এসে সবকিছু নিরীক্ষণ করে

বলে—'ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো! সুদিন এসেছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে, কেটে গেছে সব দুঃখের দিন, আর আসবে না।'

গ্রামে এসে প্রধান সমাদ্দার মানুষের কাছে অনাগত ভবিষ্যতের আশার কথা শোনায়। সূচনাপর্বে দয়াল সকলের প্রতিনিধি হয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধের শপথ নেয় যাতে আবার দুর্ভিক্ষ এলে আবার প্রতিরোধ করতে পারে। অভিভূত প্রধান সমাদ্দার দয়ালকে জড়িয়ে ধরে বলেন—'দয়াল! এ যেন তার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হল, সংগঠিত গ্রামবাসীদের প্রতিরোধস্পৃহা নতুন আশায় প্রধান সমাদ্দার জেগে উঠে। সংগঠিত জনগণের প্রতিরোধ ভাবনা প্রধান সমাদ্দারকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেয়।

২০৮.৩.১২.৩ : হারু দত্ত

'মনুষ্যসৃষ্ট' পঞ্চাশের মন্বন্তরের 'মনুষ্য' শ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র হারু দত্ত। একশ্রেণির মানুষের অপরিমেয় লোভ, লালসা চক্রান্তের ফলেই মন্বন্তরের ধ্বংসলীলা গ্রামবাংলার বুকে নেমে এসেছিল। 'নবান্ন' নাটকে হারুদত্ত গ্রামের জোতদার। সাবেক জমিদার শ্রেণির বদলে নতুন এক শ্রেণি জোতদার গ্রামবাংলায় মানুষদের লোভ লালসার চক্রান্তের জালে জড়িয়ে ফেলছিল। বিপর্যস্ত মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের জমি কিনে অধিকার বাড়িয়ে ক্ষমতাবান হয়ে উঠে ছিল এই জোতদার শ্রেণি। হারু দত্ত প্রধান সমাদ্দারের মগরার বিলের জমি কিনে নেয় বাকি তিন বিঘা জমি ছলে বলে কৌশলে বাগিয়ে নিতে চায়। গ্রামের জোতদার হারু দত্ত শহরের চালের মজুতদার কালীধন ধাড়ার সাথে হাত মিলিয়েছে। শুধু সেখানে সীমাবদ্ধ নয় হারু দত্ত গ্রামের অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে শহরের কালীধনদের কাছে পৌঁছে দিত ভোগ করার জন্য। সহজেই বোঝা যায় শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং বিবেকহীন অমানবিক বেসাতির জাল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নাটকের শেষে লক্ষ্য করা যায় হারু দত্তদের উপস্থিতি নাট্যকার না দেখিয়ে নাট্যকার যে প্রতিরোধের ডাক দিলেন প্রধান সমাদ্দার এবং দয়ালদের মধ্যে দিয়ে সেই ডাকের মধ্যে কালোবাজারি, কালীধন এবং হারু দত্তের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোনো বার্তা নেই। আমরা মনে করি কালীধন এবং হারু দত্তের বিরুদ্ধে প্রধান সমাদ্দার এবং দয়ালদের সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া উচিত ছিল।

২০৮.৩.১২.৪ : কালীধন ধাড়া

'নবান্ন' নাটকের চরিত্র কালীধন ধাড়া শহরের চালের আড়তদার। সে মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ভিক্ষের একজন অন্যতম চক্রান্তকারী প্রতিনিধি। দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে চাল মজুত করে কালোবাজারি করে বেশি দামে বিক্রি করে। কালীধনের চেহারা মোটা, কালো, গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। গ্রামের জোতদার হারু দত্ত গ্রাম থেকে চাল সংগ্রহ করে শহরে কালীধনের গুদামে চালান দেয়। এইভাবে অন্যায় মাধ্যমে মজুতদারি ও কালোবাজারি চলে আর খাদ্যের আকাল তৈরি করে। গ্রামের সাধারণ মানুষদের সাথে শহরের মানুষদেরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে খাদ্য সংগ্রহ। নিরঞ্জন এবং কয়েকজন ভদ্রলোকের প্রচেষ্টায় কালীধন গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কালীধনের যোগসাজশ রয়েছে তা বুঝতেও আমাদের অসুবিধা হয়। পুলিশ প্রশাসন এবং মজুদতার, জোতদার এরা সকলেই শোষণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। লোভ লালসাপূর্ণ বিবেকহীন কালীধন এবং হারু দত্তদের সহযোগে দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত হয়েছিল, নাট্যকার তা উল্লেখ করেছেন নাটকে।

২০৮.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নবান্ন' নাটকের প্রধান সম্মাদার চরিত্রের ভূমিকা আলোচনা কর।

২। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করো।

৩। 'এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।'—বক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? 'পোড়ো মাটির দেশ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

২০৮.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'নবান্ন'—বিজন ভট্টচার্য, দে'জ পাবলিশার্স।

২। গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়—দর্শন চৌধুরী।

৩। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত—মন্দিরা রায়।

৪। 'নবান্ন' : প্রযোজনা ও প্রভাব—সুধী প্রধান।

৫। প্রসঙ্গ নবান্ন—দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার নন্দী।

৬। উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব—অমলেন্দু সেনগুপ্ত।

পত্র - B-CORE-208

টিনের তলোয়ার

পর্যায় গ্রন্থ - ৪, একক ১৩ - নাট্যকাহিনি

<u>বিন্যাসক্রম</u>

২০৮.৪.১৩.১ : ভূমিকা

২০৮.৪.১৩.২ : নাট্যকাহিনি

২০৮.৪.১৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৪.১৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

<u>২০৮.৪.১৩.১ : ভূমিকা</u>

অধুনা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক স্মরণীয় নাট্যব্যক্তিত্ব। একাধারে নাট্যকার, নাট্যভিনেতা, চলচ্চিত্র অভিনেতা উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত তাঁর বিভিন্ন নাটকে শুধুমাত্র সমকালকে তুলে ধরেন নি, অতীত ইতিহাসকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছন তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে। নাটকের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক ভাবনাকেও স্পর্শ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন। উৎপল দত্তের জন্ম ২৯ শে মার্চ, ১৯২৯, পিতা-গিরিজারঞ্জন দত্ত, মাতা-শৈলবালা দত্ত। পিতা গিরিজারঞ্জন দত্তের দেওয়া নাম উৎপল দত্ত। উৎপল দত্তের ডাক নাম ছিল শংকর। তাঁর মৃত্যু ১৯শে আগস্ট ১৯৯৩। পিতা গিরিজারঞ্জন দত্তের বদলির চাকরির সূত্রে উৎপল দত্তকে নানা স্থানে থাকতে হয়েছে। প্রথমে শিলা, তারপর বহরমপুর হয়ে কলকাতায় তার পড়াশোনা শুরু হয়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হন। স্কুল জীবন থেকেই নাটকে তাঁর হাতেখড়ি। কলেজে পড়াকালীন শেক্সপীয়রের নাটক পাঠ ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। শেক্সপীয়রের সঙ্গে মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি দার্শনিকদের গ্রন্থাদিও তিনি পাঠ করেন। কলেজ জীবন থেকে নাটক পাঠ ও নাট্যাভিনয়ে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কয়েকজন বন্ধু মিলে 'দ্য অ্যামেচার 'শেক্সপীরিয়ান্স' নামে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন। এই নাট্যদলের প্রাণপুরুষ ছিলেন উৎপল দত্ত। সব নাটক অভিনীত হত ইংরেজি ভাষায়। এখানে অভিনীত বেশিরভাগ নাটকই শেক্সপীয়রের। 'রোমিও-অ্যান্ড জুলিয়েট', 'ম্যাকবেথ', 'জুলিয়াস-সিজার', 'হ্যামলেট' প্রভৃতি। এই সময়েই ১৯৪৭ সালে কলকাতায় এসেছিলেন বিখ্যাত নাট্য প্রযোজক জিওফ্রে ক্যান্ড্যাল

এবং স্ত্রী লরা ক্যান্ড্যাল। তাদের পেশাদারী নাট্যদল—দ্য শেক্সপিরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির পরিচালক ছিলেন ক্যান্ডাল। ক্যান্ডালের খ্যাতি জগৎজোড়া। কলকাতার অভিনয়ে ক্যান্ডাল কয়েকজন স্থানীয় যুবককে দলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই দলের মধ্যে থেকে ক্যান্ডাল উৎপল দত্তকে নির্বাচন করেন, তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে। উৎপল দত্ত নাট্যাভিনয়ের শিক্ষা গ্রহন করলেন জিওফ্রে ক্যান্ডালের কাছ থেকে। কীভাবে একজন অভিনেতা বাক্‌ভঙ্গি, বাচনের তীব্রতা, কণ্ঠ নিয়ন্ত্রন করবেন, তা এখান থেকে শিখলেন উৎপল দত্ত। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ (১৯৪৮) হয়। অনেক কর্মী সংগঠক সেদিন কারারুদ্ধ হন। ১৯৫০ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে পার্টিকর্মীরা মুক্ত হন। এরপর দ্বিগুন উৎসাহে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীরা কাজ শুরু করে। এর পরপরই উৎপল দত্ত সক্রিয়ভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন। তাঁর ভাষায় শুরু হল—নাটকের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। মধ্যকলকাতার গণনাট্য শাখায় যোগ দিয়ে তিনি নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয় করতে শুরু করেন। উৎপল দত্ত যখন গণনাট্য সংঘে আসেন, তখন অনেকেই গণনাট্য ছেড়ে নিজের নাট্যদল তৈরী করছেন, সেই সময় উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন। পানু পালের 'ভাঙ্গা বদর' নাটকে গজাননের চরিত্রে অভিনয় করে উৎপল দত্ত অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। নিজের লেখা পোষ্টার ড্রামা 'পাসপোর্ট' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে তিনি অভিনয় করেন। ১৯৫১-১৯৫২ সালের মধ্যে মোট দশমাস গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই সময় খুব সক্রিয় ভাবেই সংগঠনের হয়ে অভিনয় ও নাটক লেখার কাজ তিনি করেছিলেন। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে গেলেও তিনি কখনো গণনাট্যের আদর্শের প্রতি আস্থা হারাননি। এদেশ ও বিদেশের গণনাট্য আন্দোলনের প্রতি তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর নাট্যভাবনাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল। থিয়েটারে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ নতুনভাবে তাঁর নাট্যভাবনায় প্রাণ সঞ্চার করেছিল। ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে উৎপল দত্ত তার নাটকের দলের নাম রেখেছিলেন—'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ (LTG)। এখানে অভিনীত হয়েছিল অডেটসের লেখা—'ওয়েটিং ফর লেফটি'। এ সময় তিনি ইংরেজী ভাষায় লেখা নাটক অভিনয় করেছিলেন। এরপর ১৯৫০ সাল নাগাদ তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে মার্কসীয় ভাবনায় দীক্ষিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে—থিয়েটার কেবলমাত্র শিল্পকলা নয়। সেই শিল্পের

মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে হবে এবং সাধারণ মানুষের বোধকে উদ্দীপিত করতে হবে—এই ছিল তাঁর অভিমত। এর সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনতত্ত্ব অধ্যয়ন করার ফলে সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে উৎপল দত্তের লিখিত নাটকে এবং তাঁর জীবন দর্শনে। ক্রমাগত নিবিড় অধ্যয়ন এবং মানুষের সঙ্গে সংযোগ তাঁর রাজনৈতিক বোধকে আরও গভীর করে তোলে। এরপর থিয়েটারের মাধ্যমেই তিনি তাঁর প্রতিবাদ জানান। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নাট্যকার উৎপল দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদ) প্রতি আকৃষ্ট হন। আবার ১৯৬৭ সালে উৎপল দত্ত অতিবামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। নাট্যকার নিজেও স্বীকার করেছেন—তার এ সময়ের রাজনৈতিক পন্থা ছিল উগ্রবিপ্লবমুখী। অবশ্য এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে উৎপল দত্ত লিটিল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বেরিয়ে এসে নিঃসঙ্গ ও একাকীত্ব বোধ করলেন এবং 'বিবেক যাত্রাদল' তৈরী করেন। কিছুকালের মধ্যে তিনি নকশালপন্থীদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। এরপর তিনি বিবেক নাট্যসমাজ বন্ধ করে দিয়ে ১৯৬৯ সালের ১৮ই মে তিনি পিপলস্ লিটিল থিয়েটার তৈরী করেন। PLT-এর হয়ে প্রথম প্রযোজনা করলেন 'ঠিকানা' ১৯৭১ সালে। নতুন দলের নিবন্ধিকরণ হল ১৯৭১ সালের ১৯শে অক্টোবর। লিটিল থিয়েটার গ্রুপ নাট্যপ্রযোজনা একটানা এগারো বছর করেছিলেন মিনার্ভায়। কিন্তু এবারে PLT-এর সময়ে তার নির্দিষ্ট মঞ্চ ছিল না। অনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন মঞ্চে তিনি অভিনয় করে গেলেন। বাঁধা মঞ্চে—অঙ্গার, কল্লোল, তিতাস প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের যে সুবিধাজনক মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোর ব্যবস্থা ছিল, তা আর রইলো না। LTG থেকে পরে যখন PLT চালু করলেন তখন নতুন করে মঞ্চ বাঁধার পরিকল্পনা উৎপল দত্তকে করতে হল। সেভাবেই তৈরী হল—দুঃস্বপ্নের নগরী, এবার রাজার পালা ইত্যাদি। ১৯৬৯-৭০-৭২ সময়কালে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে। কিছুদিন যেতে না যেতেই কেন্দ্রের কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গের এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। এরপর নকশালবাড়ির রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল। আবার ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্যবর্তী নির্বাচন হল। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় ফিরে এল। এই যুক্তফ্রন্টের শরিক এখন সি.পি.আই.এম। ১৯৭০ সালে এই সরকারকে আবার ভেঙে দেওয়া হয়। শুরু হয় রাষ্ট্রপতির শাসন। রাজনৈতিক ভাবে টালমাটাল এই সময়ে খুন, জখম, সন্ত্রাস শুরু হল। বামপন্থীদের উপর এই আঘাত এল বৃহত্তরভাবে। খুন, জখম, হত্যা, কারাবরণ—তার ইতিহাস এখনও লেখা শেষ হয়নি। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সময়ে

রাষ্ট্রপতিশাসনের সেই কালো দিনগুলির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। উৎপল দল তখন সব হারিয়ে .... একক। নিজের ভাবাদর্শগত বিশ্বাসে রাজনৈতিক দল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন আবার নিজের রাজনৈতিক দল থেকেও তিনি প্রত্যাহত। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার টিনের তলোয়ার নাটকে বেণীমাধমের মাধ্যমে বলেছেন—'আমি বড় একা। কেউ-ই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন, অবজ্ঞার মতন একা।' উৎপল দত্ত সমস্ত জনসমর্থন হারিয়ে বসে আছেন। পিপলস লিটিল থিয়েটার নামে নাট্যদল তৈরী করেন। এখানে সব অভিনেতারাই নতুন। পত্নী শোভা সেন, বন্ধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস সেন, মনু দত্ত প্রভৃতি সব সময় সঙ্গে ছিলেন এবং রইলেন। নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা উৎপল দত্ত ব্যবহার করলেন, লিখলেন—টিনের তলোয়ার। অনেকদিন বাদে প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অংশগ্রহন করলেন। টিনের তলোয়ার নাটকে বেণীমাধবের ভূমিকায় তিনি অংশগ্রহণ করলেন। উনিশ শতকের এক নাট্যকর্মীর মাধ্যমে তিনি প্রতিবাদী বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন, তখন উৎপল দত্ত নিজের বিপ্লবী সত্ত্বাকে গত শতকের নাট্যকর্মীর মাধ্যমে প্রতিফলিত করেন। উৎপল দত্ত নিজে অভিনয় করেছেন বেণীমাধব চরিত্রে। বিশ শতকের শেষ পর্যায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনয় করেছেন উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে একজন শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতার চরিত্রে। থিয়েটার যাকে মঞ্চের গ্যারিক উপাধি দিয়েছে। মাঝে ঠিক একশ বছরের ব্যবধান। বেণীর চরিত্রে অভিনয় করতে করতে উৎপল দত্তকে মুহূর্তে একশ বছর পেরিয়ে যেতে হয়। এককালের অভিনেতাকে ফিরে যেতে হয় আরেক কালে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বিদ্রোহী কৃষকের চরিত্রে রূপান্তরিত হতে হয়। যে তিতুমীরের চরিত্রের অভিনয় করার সময়ে উৎপল দত্তকে রূপান্তরিত হতে হয়। অভিনয়ের কত গভীর অনুশীলন থাকলে তবেই এই রূপান্তর ঘটে। উপলব্ধির বিচিত্র স্তরের চরিত্রে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। অভিনয়ের বহু প্রকার ডাইমেনশনের কারণে উৎপল দত্তের শ্রেষ্ঠতম নাটক—'টিনের তলোয়ার।'

২০৮.৪.১৩.২ : নাট্যকাহিনি

টিনের তলোয়ার নাটকে কোন অঙ্ক বা দৃশ্যভাগ নেই। পরিবর্তে অঙ্ক বা দৃশ্যগুলিকে সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছিল। নাটকটিতে ৭টি দৃশ্য আছে। নাটকের শুরুতেই দেখা যাবে মঞ্চ জুড়ে টাঙানো রয়েছে এক বিরাট পোষ্টার, সেখানে নিউ গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অগ্রিম নাটকের বিজ্ঞাপন। অনিন্দ্য চৌধুরীর নতুন নাটক 'ময়ূরবাহন' নাটক। এই বিজ্ঞাপনে দেওয়া আছে

সত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণ দাঁ, শেষরাত্রিতে নটবর নামে এক শীর্ণকায় যুবক পোষ্টার সাটছেন দেওয়ালে। বেণীমাধব মই ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, মদের ঘোরে বেসামাল মথুর নামে এক মেথর ম্যানহোল থেকে বালতি বালতি ময়লা তুলে ফেলছে বেণীমাধবের পায়ের কাছে। নটবর মঞ্চ ত্যাগ করলে বেণীমাধবের পায়ে মথুর ঢেলে দিল আর এক বালতি ময়লা। তারপরেও বেণীমাধব তাকে জিজ্ঞেস করে পোষ্টারটি কেমন লেখা হল—উত্তরে মথুর জানায়, সে লেখাপড়া জানে না। ম্যানহোলের খবর জানে, ময়লা সাফাই তার কাজ। নেশাখোর বেণীমাধব মথুরকে শোনায় মাইকেলের লেখার কথা। ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় প্রশংসা বেরিয়েছে বেণীমাধবের। তিনি 'বাংলার গ্যারিক' অভিধায় ভূষিত হয়েছেন পত্রিকায়। 'বাংলার গ্যারিক' উপাধি পেয়ে বেণীমাধব তার জন্য আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। অর্ধেন্দুশেখরকে কিঞ্চিৎ উপহাসও করেন বেণীমাধব। 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে কাজ কি?'—মেথর সাতপাঁচ বুঝতে চায় না। বেণীমাধবের রাশিকৃত খবরে তার কিছু যায় আসে না তবু বেণীমাধব মথুর মেথরকে তাঁর গর্বের অভিনয় জীবনের কীর্তিকলাপ না জানিয়ে ছাড়বে না। বেণীমাধব নিজেকে জাত 'থিয়েটারওয়ালা' বলে মনে করেন। মথুর বেণীমাধবের দুঃখে কাতর হয়। কৌতূহলী যে বেণীমাধবকে জিজ্ঞেস করে—'ধেত্তেরি যুবরাজ। মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধুতি পরে, লাল-নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা-উজীর সাজো কেন? এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষী করো কেন?

বেণী।। টিনের তলোয়ার। ছেলেমানুষী?

মেথর।। যা আছে তাই সাজো না। গায়ে বিষ্ঠা আর কাদা লেগে আছে দেখছো?

বেণী।। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর।। সেটা দেখাতে নজ্জা হয় বুঝি? তাই চকচকে পোষাক পরে চৌগোপ্পা দাড়ি এঁটে রবক সবক কিছু কবিতা বলে ধাপ্পা মারো। কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে নিয়ে লাটক ফাঁদতে পারবে? হেঁ: চাটুজ্জে বামুনের জাত যাবে তাতে।

বেণীমাধব মেথরের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত যখন, সেই সময় ময়না প্রবেশ করে। যে রাস্তার মেয়ে। বৈদ্যবাটির আলু আর হাসনাবাদের বেগুন বিক্রি করে সে জীবিকা নির্বাহ করে।

ময়না সুকণ্ঠী সে গান গাইতে গাইতে একদিক দিয়ে প্রবেশ করে। ময়নার গানে মুগ্ধ হয় বেণীমাধব। প্রথম কাহিনি থেকে স্পষ্ট হয় বেণীমাধব তার নাট্যচিন্তার প্রকাশ ও প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে রীতিমতো আন্তরিক। মথুরকে আত্মপরিচয় দান থেকে জানা গেল বেণী শুধু পেশাদারী অভিনেতা নন। তিনি সুদক্ষ শিল্পী ও কারিগর। তার দক্ষতায় ম্লান অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দলচালানোর সমস্ত সমস্যার সমাধান বেণীমাধবকে করতে হয়। তিনি পতিতাপল্লী থেকে মেয়ে নিয়ে আসেন। তার হাতে গড়া অভিনেত্রীকে দি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সত্বাধিকারী ফুসলে নিয়ে যায়—এটিই তার চরম দুঃখের কারণ। বেণীমাধবের আরেকটি দুঃখের কারণ—মূলরুচি সম্পন্ন পয়সাওয়ালা বীরকৃষ্ণ দাঁ। বীরকৃষ্ণ দাঁ থিয়েটারের শেয়াল পন্ডিত। থিয়েটারের সুন্দরী মেয়েদের রক্ষিতা বানানোই তার উদ্দেশ্যে। এহেন বীরকৃষ্ণ দাঁর কাছে বেণীমাধবকে নতজানু হতে হয়। বেণীমাধব যাবতীয় অভিমান ধুয়ে মুছে ফেলেন। সুকণ্ঠী ময়নাকে পেয়ে বেণীমাধব আনন্দিত।

থিয়েটার চলে মালিকের টাকায়। লভ্যাংশ বৃদ্ধি না পেলে থিয়েটার চলে না। মালিক চায়—নাচ গানে ভরপুর নাটক চালাতে। এ বিষয়ে বেণীমাধব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। বেঙ্গল থিয়েটারের রিহার্সালের ঘরটি চিৎপুরে অবস্থিত। ঘরের দড়িতে ঝুলছে শাড়ি, জামা, ঘরের এককোণে আছে এক পেল্লাই সিংহাসন। সেই সঙ্গে আছে কয়েকটি বাকা তলোয়ার। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাড়ি-পাতিল বাতিল গহনা। ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে নানা নাটকের পোষ্টার। এই ঘরটিকে নাট্যকার নিজেই বলেছেন নরককুন্ড। এই নরকুন্ডের অভিনেতাকে পার্ট মুখস্থ করাচ্ছে প্রম্পটার 'টগর'। সেই ঘরে রিহার্সালের মাঝে অভিনেতা জলদ ভারত সংস্কারক পত্রিকা পাঠ করে জানায় যে সেখানে লেখা হয়েছে বেঙ্গল অপেরায় সধবার একাদশী নাটকের অভিনয় অত্যন্ত নিম্নমানের এবং কুরুচিকর। সেখানে অভিনেত্রী বসুন্ধরাকেও পরোক্ষে এই কুরুচির সামিল করা হয়। এখানেই দেখা মেলে নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিকের। ময়নারও আবির্ভাব হয় এসময়। ময়নাকে দেখে অনেকেই নানারকম মন্তব্য করে। মদ্যপ কাপ্তেন বার ময়নাকে চিনতে প্রথম দিকে ব্যর্থ হলেও পরেরদিকে নেশার ঘোর কেটে গেলে ময়নার সাথে আলাপ চারিতার কথা মনে পড়ে। সুকণ্ঠী ময়নাকে তার প্রয়োজন আছে ভেবে ময়নাকে থিয়েটারে পাট দেবেন বলেছিলেন। এরপর বসুন্ধরাকে তিনি বলেন যে যেন ময়নাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে আসে। শেষে তাকে রাজকুমারীর বেশ পরিয়ে আনতে বলায় সকলেই বোঝে যে তাকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্যই নিয়ে আসা হয়েছে।

রাজার মেয়ে ও আলু বেগুনওয়ালী মেয়েকে অভিনয়ের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, বেণীমাধব বলেন—'তুমি হবে ওর হিরো। উঠে পড়ে লাগো, নইলে ওর অসুবিধা হবে।

তারপর নানান বাক্-বিতর্কের মধ্যে অভিনেতা হরবল্লভ যখন বেণীকে শোনায়—

'অনুরাধা বড় শক্ত পার্ট বাবু, পড়ে দেখলাম নাটকটা, নাটকটা শেকসপীয়রের হ্যামলেট আর ম্যাকবেথ মিশিয়ে মেরে দেয়া। ওফিলিয়াই হচ্ছে অনুরাধা। এমন জটিল—'

নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত প্রিয়নাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র সা সুঁসি থিয়েটারে অভিনয় শিক্ষা করেন। সে বলে তৎকালীন রঙ্গালয়ে এমন সব নাটক অভিনীত হয়েছে যা জীবনবোধ বর্জিত, কদর্য মিথ্যা আড়ম্বরে ভরা। পুরাতন, জীর্ণ অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ ধ্বস নামছে আর বেণীমাধবের থিয়েটারে কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের .... কাহিনি নির্মিত হয়েছে। প্রিয়নাথ এর পরিবর্তন চায়। বেণীমাধবের কাছে প্রিয়নাথের কথাগুলি তৎক্ষনাৎ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। প্রিয়নাথ সপ্তাখানেক পরে দিনের পর দিন এসে ঘুরে গিয়েছে। তার লেখা নাটকের ম্যানুস্ক্রিপ্ট বেণীকে পড়তে দিয়েছিল কিন্তু বেণীমাধব সেটাকে না বুঝে কাগজের ঠোঙায় মুড়ি বানিয়ে খেয়েছে। প্রিয়নাথের নাটকের নাম—পলাশীর যুদ্ধ প্রিয়নাথ পাণ্ডুলিপির প্রয়োগ চায় বেণীমাধবের কাছে। বেণীমাধব প্রিয়নাথের পোশাক পরিচ্ছদ লক্ষ্য করে তাকে ঠাট্টা করে। প্রিয়নাথ জানায় সে বাবুয়ানি না ছাড়তে পারলেও তার কাছে বাবুয়ানির পয়সা নেই। সে তার পিতার বিরুদ্ধে। তার পিতা নিজের স্ত্রীকে মারধর করে। ইতিমধ্যে ঘরে ইট-পাটকেল পড়তে শুরু করে। সমাজবিরোধী বাচস্পতিকে ঠেকাবার জন্য অভিনেতারা টিনের তলোয়ার তুলে নেয় হাতে। প্রিয়নাথ সময়মতো পথ আগলাতে না পারায় বাচস্পতি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাচস্পতি বেণীমাধবের নাটকে পার্ট করতে চাইলে বেণী তলোয়ার ঘুরিয়ে যুদ্ধ করে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। বেণী আরও জানায়—সে তার পিতার অর্থে মদ্যপান করে না। এরপর বেণী টিনের তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করলে বাচস্পতি তার দলবলকে বলে টিনের তলোয়ারে ভয় না পেতে। এরপর প্রিয়নাথের ইংরেজী গালাগাল ও পুলিশের কথায় বাচস্পতির দল পালায়। এরপর নাটকের দলের প্রিয়নাথের উপর আস্থা বাড়ে। বেণীকে প্রিয়নাথ জানায় যে আরেকটি নাটক লিখেছে। বেণী প্রিয়নাথকে মঞ্চোপযোগী নাটক লিখতে বলে। বেণী আরও বলে—

> ‘শোন ছোকরা, তোমার ঐ চুল ছাটতে হবে। এমন টুনটুনি মার্কা পোষাক পরে .... সং সাজা ছাড়তে হবে, সারারাত আমাদের সঙ্গে খাটতে হবে, এস্টেজ ঝাট দিতে হবে, কস্টিউম কাচতে হবে। এসব করো কিছু দিন, থিয়েটার কাকে বলে বোঝ, তারপরে নাটক লিখো।’

বেণীমাধব ও প্রিয়নাথের কথোপকথনের মধ্যে বীরকৃষ্ণ দাঁ হাজির হন। সে তার আর্থিক বনেদীয়ানার গল্প শোনায়। বীরকৃষ্ণ দাঁকে দেখে সকলে আবেগে প্রণত হয়। বীরকৃষ্ণ দাঁয়ের কাছে বেণী অভিযোগ জানায় যে গ্রেট ন্যাশনালের ভুবন নিয়োগী তার থিয়েটারের অভিনেত্রী মানদাসুন্দরীকে ফুসলে নিয়ে গেছে। একথা শুনে বীরকৃষ্ণ আক্ষেপ করে, কারণ মানদাসুন্দরীকে ভোগ করার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর। রাগে বীরকৃষ্ণ দাঁ দ্য গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রমান করতে চায় তার দলের শ্রেষ্ঠত্ব।

২০৮.৪.১৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন’ (১৮৭৬) দ্বারা নাটকের কণ্ঠরোধ এবং তৎকালীন নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদের যে চিত্র ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় দাও।

২। টিনের তলোয়ার নাটকে হাস্যরসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো।

৩। টিনের তলোয়ার নাটকের গঠন কৌশল আলোচনা করো।

২০৮.৪.১৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম এবং ২য় খণ্ড—শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা।

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

৩। থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত—দর্শন চৌধুরী, সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ্ সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৩৪।

টিনের তলোয়ার

একক ১৪ - নাটকের নামকরণ

বিন্যাসক্রম

২০৮.৪.১৪.১ : নামকরণ

২০৮.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৮.৪.১৪.১ : নামকরণ

নামকরণ বিষয়টি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, অন্যান্য সাহিত্যেও নামকরণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ মূল বিষয়বস্তু বোঝার জন্য প্রথম উপায় হয়ে ওঠে। নাটকের ক্ষেত্রে কখনো প্রধান অথবা কেন্দ্রীয় চরিত্র, কখনো বিষয়বস্তু প্রাধান্য দিয়েই নাট্যকার নামকরণ করেন। 'সীতার বনবাস' বা 'মেবার পতন' নামকরণ নাট্যবস্তুর মূল বিষয়ের সন্ধান তুলে ধরেন। আমরা বলতে পারি 'রক্তকরবী' সজীব যৌবনের প্রাণের প্রতীক হয়ে ওঠে নাটকে। অপরদিকে 'মুক্তধারার' মধ্যে জল আটকাবার এবং বাঁধ ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়াটি সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। আবার 'ছেঁড়াতার' নাটকে শুধুমাত্র দিলরুবার তার ছিড়ে যাওয়ার কাহিনীই নয় এক দরিদ্র কৃষক দম্পত্তির জীবনের ভাঙনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। নাটকের বিষয়টি উপলব্ধি করতে নামকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাট্যকার উৎপল দত্ত 'টিনের তলোয়ার' নাটকের মধ্যে দেখিয়েছেন নকল তলোয়ার হওয়া সত্ত্বেও এই তলোয়ারের অসীম ক্ষমতা। আমরা জানি বেণীমাধব বলেছিল "ইঃ! টিনের তলোয়ার নিয়ে গোরা সৈন্যের সঙ্গে লড়বেন?" নাটক বা থিয়েটার বিপ্লব করে না, আন্দোলনও করে না কিন্তু বিদ্রোহ, বিপ্লব, আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। ইংরেজ শাসিত ভারতের নাট্যকর্মীদের প্রধান ও প্রথমতম কাজ হওয়া উচিত ছিল পরাধীনতার বেদনা, শোষকের স্বরূপ উন্মোচনে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নাটক নাট্যশালা এই দায়-দায়িত্ব পালন করে। বাংলা থিয়েটার এবং নাটক নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের দর্শকদের চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি মেথর যখন বলে ওঠে—

বেণী : টিনের তলোয়ার! ছেলেমানুষী?

মেথর : যা আছো তাই সাজো না! গায়ে বিষ্ঠা আর কাদা লেগে আছে দেখছো?

বেণী : ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর : সেটা দেখাতে নজ্জা হয় বুঝি? তাই চকচকে পোশাক পরে চৌগোপ্পা দাঁড়ি এঁটে রবক সবক কিছু কবিতা বলে ধাপ্পা মারো। কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে লিয়ে লাটক ফাঁদতে পারবে? হেঃ চাটুজ্যে বামুনের জাত যাবে তাতে।

নকল টিনের তলোয়ার নিয়ে রঙ মেখে সঙ সেজে বাল্যখেলার দিন শেষ। আবার রাজা উজীরদের কাহিনীর বর্ণনার দিনও শেষ। থিয়েটার এবং নাটকে বলতে হবে বিদ্রোহের কথা, শোষিত জনগণের যন্ত্রণার কথা। রাজশক্তির বিরুদ্ধে জন জাগরণের কথা। সাধারণ দর্শক তাহলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে, বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। মুক্তির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিপ্লবের রূপ ধারণ করবে। তাহলেই নকল টিনের তলোয়ারের ঝনঝনে আওয়াজ আর শোনা যাবে না। সেটি হয়ে উঠবে ইস্পাতের শানিত তরোবারী। প্রতিবাদ প্রতিরোধের উন্মাদনা, শাসন মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনিত হবে নাটকের মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই বিপ্লবের বা আন্দোলনের প্রক্রিয়া সফল করার জন্য সেই প্রান্তের মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণ ঘটানো আবশ্যিক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধানতম হাতিয়ারগুলির মধ্যে অন্যতম হল নাটক ও নাট্যাভিনয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই থিয়েটার সমাজ বিপ্লবের সেরাতম হাতিয়ার হিসেবে গন্য হয়ে উঠেছে। থিয়টারের পোশাক, পরিচ্ছদ কলা কুশলীদের অভিনয়ের চরিত্রের মতো সাজিয়ে তোলে। সেগুলি নকল।

আলোকজ্জ্বল পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের নাটকপোযোগী চরিত্রের মতো করে সাজিয়ে তোলা হয়। তারা কখনো বা নকল মুকুট, টিনের ঢাল তলোয়ার নিয়ে রাজার সাজে সজ্জিত হয় আবার কখনো ধূসর মলিন পোশাক পড়ে মেথরের রূপ ধারণ করে। এদের মাধ্যমেই মঞ্চকে এক মায়ার জগৎ বলে মনে হয়। আর এই মায়ার জগতের মধ্যে থেকেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের শোষন, সংগ্রাম, লড়াইয়ের চিত্রকে তুলে ধরতে হবে। কল্পনার জগতের মধ্যে দিয়ে থিয়েটারকে এমন একটি স্তরে পৌঁছে দিতে হয় যার মধ্যে দিয়ে মানুষের সংগ্রাম, মানুষের লড়াইয়ের ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলে। সেখানে সে নিজেই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। দর্শককে চেতনা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে

থিয়েটারে ফুটিয়ে তোলা যায় থিয়েটারের মেকি অস্ত্র, তখন আর মিথ্যা আড়ম্বরে ঢাকা থাকে না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক লড়াই সংগ্রামে বিশেষ অস্ত্র রূপে পরিগণিত হয় থিয়েটার। 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'টিনের তলোয়ার' নাটকটিকে বিপ্লবী নাটকের অভিধায় অভিহিত করতে পারি।

উনিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পরাধীন ভারতের আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ঘটছে ইংরেজদের হাত ধরে। শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল ধীর গতিতে। শুধু তাই নয় শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার ঘটেছে ততটুকুই। আপামর জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যেমন ঘটে নি তেমন রাষ্ট্র ও আপামর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব পালন করেনি। এমত পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের যে গতি থাকার কথা ছিল তাও ব্যহত হয়েছে।

তবুও বলে রাখা প্রয়োজন উনিশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষে একাধিক লড়াই ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। নাট্যকার উৎপল দত্ত বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে সংস্কৃতি কর্মী হয়েও ইংরেজদের অত্যাচারের নানা কাহিনী বিভিন্নভাবে নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে নাট্যকার 'টিনের তলোয়ার'কে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে উল্লেখ করেছে। থিয়েটারের মধ্যে দিয়েই ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সামগ্রিক ভাবে উনিশ শতকের সমাজের নানানদিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের কথা তুলে ধরেছেন। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র টিনের তলোয়ার নয় রাইফেল, তীর, তরোবারী অন্য নাটকের মধ্যেও উঠে এসেছে।

নাট্যকার 'টিনের তলোয়ার' নাটকের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন নাটক লেখার একশত বছর পূর্বে পেশাদারী রঙ্গালয়ে সেখানকার মানুষের জীবনের, অভিনেতা অভিনেত্রীদের টানাপোড়েন, অভাব-অভিযোগ নিপীড়ন। তৎকালীন সময়ের থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। আমরা এই নাটকের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই 'টিনের তলোয়ারকে' শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটকে পরিগণিত করেছে। পরাধীন দেশের নাট্যকর্মীরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালনের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ভূমিকার নিদর্শন রেখেছেন 'টিনের তলোয়ার' নাটকে তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দেশবাসীর কাছে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শোষিত পরাধীন ভারতবর্ষের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। একদিকে যখন গোরা ইংরেজদের শাসনের দেশবাসী বিপর্যস্ত অন্যদিকে তখন সাধারণ মানুষের উপর শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে নতুন নতুন আইন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে চলেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালি নাটক প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী বা নাট্যকর্মীরা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। আগ্রাসী ব্রিটিশ রাজশক্তি অত্যাচার নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধেও কঠোর নিয়ম চালু করেছিল। নাট্য নিয়ন্ত্রন আইনের মধ্যে দিয়ে পরাধীন দেশে নাটক ও নাট্যকর্মীদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। নাট্যকর্মীরা শাসকশ্রেণীর চোখ রাঙানি এবং কালা আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে দেশের জনগণকে চেতনা দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। নাট্যকর্মীদের উপর নানারকম দমন পীড়ন চালীয়ে শাসকগোষ্ঠী নাটক এবং নাট্যশালার কণ্ঠ রোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। পেশাদারী রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যশিল্পীরা শাসক শ্রেণীর স্বরূপ জনগণের সম্মুখে উন্মোচিত করেছে। নাট্যকর্মীরা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণকে সচেতন করা এবং পরাধীনতা শৃঙ্খলমোচনের বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছে।

তৎকালীন সময়ের নাট্যকর্মীরা শুধুমাত্র ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেই নয়, দেশীয় বাণিজ্যিক শ্রেণীর বিরুদ্ধেও তারা লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। বীরকৃষ্ণ দাঁর মতো ব্যক্তিরা মনে করে ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশের উপকার করেছে। বীরকৃষ্ণর বাণিজ্যিকারীরা ব্রিটিশ রাজশক্তির সহায়ক শক্তি হিসাবে নিজেদের তুলে ধরেছিল। বাংলা পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজপতি শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিও সুখকর ছিল না। পাড়ার মস্তান দাদা থেকে শুরু করে মুদির দোকানদার, শাসকশ্রেণী, সংবাদপত্র পরিবেশনকারী ব্যক্তি কেউ নাট্যকর্মীদের ভালো চোখে দেখে নি। এই নাটকের মধ্যে প্রিয়নাথ মল্লিক 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে গর্জে ওঠার বার্তা দিয়েছেন। নাটকের পরিশেষে আমরা দেখতে পাই 'সধবার একাদশী'র অভিনয় চলাকালীন প্রিয়নাথ মল্লিকের 'তিতুমীর' নাটকে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত কৃষকদের লড়াই তিতুমীরের নেতৃত্বে উঠে এসেছে। দেশের মুক্তিকামী জনগণ স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করেছে তা এই 'টিনের তলোয়ার' নাটকের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি মানুষের লড়াই সংগ্রামের চিত্রই বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। পরাধীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের উপরে যে অমানবিক আঘাত নেমে এসেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেও নাট্যকর্মীরা

পিছুপা হয় নি। নাট্যকার নাটকের নামকরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক এবং পাঠকের সামনে পরাধীন ভারতের লড়াইয়ের অনন্য এক ইতিহাস উল্লেখ করেছেন।

২০৮.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটির নামকরণের সার্থকতা কতখানি আলোচনা করো।

২। সাম্রাজ্যবাদী নাটক হিসেবে ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের সার্থকতা বিচার করো।

২০৮.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ‘টিনের তলোয়ার’—দর্শন চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনীয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১০।

২। উৎপল দত্তের নাটক টিনের তলোয়ার, ড. সরোজমোহন মিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ-মার্চ, ২০০৭।

৩। উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার একটি ভাষ্য, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, রত্নাবলী প্রকাশনী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪১৪/ফেব্রুয়ারী-২০০৮।

টিনের তলোয়ার

একক ১৫ - সংলাপ

বিন্যাসক্রম

২০৮.৪.১৫.১ : টিনের তলোয়ার নাটকের সংলাপ

২০৮.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৮.৪.১৫.১ : টিনের তলোয়ার নাটকের সংলাপ

সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। ছাদ ও দেওয়ালের মধ্যে যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তেমনি নাটক ও সংলাপের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। সুপ্রাচীন কাল থেকেই নাটকে সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার নাটকের বিষয় ও চরিত্রের বিন্যাস করে থাকেন। চরিত্রের মুখেই সংলাপ বসিয়ে নাট্যকার নাট্যঘটনা উপস্থাপন করেন। গতি আনয়ন করে থাকেন। চরিত্রের যাবতীয় আচরণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার দায়িত্ব সংলাপের। সামাজিক নাটকের সংলাপ, পৌরাণিক নাটকের সংলাপ এবং ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ কখনোই একরকম হয় না। সামাজিক নাটকে চরিত্রের স্বর এবং ঐতিহাসিক নাটকে চরিত্রের স্বর একরকম নয়। নাটকের বিষয় চরিত্র সময়োপযোগী সংলাপ না হলে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও নাটক ব্যর্থ হয়। নাট্যকারকে তার সংলাপের মধ্যে দিয়েই সমস্ত কিছু গড়ে তুলতে হয়। 'টিনের তলোয়ার' নাটকে একশো বছর আগেকার বাংলা নাটকের নাট্যশালা, বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন চরিত্র, পরাধীনতার জ্বালা, প্রতিবাদ, ক্ষোভ নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকীয় কলকাতায় নাটকের সংলাপে সেই সময়কার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অবস্থানগত ভাষা উঠে এসেছে—হুতুমী ভাষা, চলিত ভাষা, মেথরের ভাষা, বারাঙ্গনা পল্লীর ভাষা, কাগজে ভাষা, শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী তরুণের ভাষা প্রভৃতি। অপরদিকে নাট্যদলের ক্যাপ্টেন বেণীমাধব, অশিক্ষিত মুৎসুদ্দি মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ, ল্যাম্বাট সাহেব সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এই নাটকের মধ্যে বেণীমাধব একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র। বেণীমাধবের সংলাপে নাট্যকারের মুন্সিয়ানা যেমন রয়েছে তেমনি ক্ষুরধার সংলাপও ব্যবহার করেছে—

বেণী : দেখবেন লোকটা আবার ম্যাজিস্ট্রেট তো, গুলি-টুলি না করে বসে।

বীর : (আঙুল মেলে ধরে) দু'হাতে দশটা হারের আংটি। যে কোন একটা দিয়ে সাহিত্য-ফাহিত্য কিনে রাখতে পারি। (মৃদু হাসলেন) তা আপাতত কিছু ভাল পালা ধরুন। কি সব ছকড়া-ছ্যাকরা নাটক ধরেছেন। মধুসূদনের কিছু ধরুন না।

বেণী : সে লিতে জানে তো?

বীর : নিশ্চয়ই, অতবড় কবি।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই মেথুর মথুর বেণীকে প্রশ্ন করেছিল—"টিনের তলোয়ার নিয়ে রঙ মেখে সঙ সেজে ছেলে মানুষী কর কেন?" অপরদিকে নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রিয়নাথ মল্লিকও বলেছিলেন—

"নাটক নিয়ে ছেলে মানুষীর দিন শেষ। দুর্ভিক্ষে দেশ শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, ব্রিটিশের হাতে দেশবাসী প্রহৃত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা নাটক বা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে কোথায়?"

তখন বেণীমাধব প্রথমের দিকে বুঝতে পারেন নি। পরে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে পড়ে যান বেণীমাধব। পরবর্তীতে বুঝতে পারেন পরাধীন দেশে নাটক এবং নাট্যশালার গুরুত্ব অপরিসীম। 'সধবার একাদশী' নাটকটি অভিনয়কালে নব্যবাবু সম্প্রদায়কে সংলাপের ভর্ৎসনা করতে থাকে। যা পরবর্তীতে থিয়েটার মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁর উপর এসে পড়ে। মুৎসুদ্দিদের হাত থেকে থিয়েটার কোনোক্রমে রক্ষা পায়। কিন্তু তখনও আমাদের দেশে ইংরেজ রাজশক্তি বর্তমান। এমতাবস্থায় বেণীমাধব 'সধবার একাদশী' নাটক থেকে সরাসরি হাজির হয় 'তিতুমীর' নাটকে। নানা প্রতিবন্ধকতাই এবং দোলাচলতায় অভিনয় করে উঠতে পারছিল না 'তিতুমীর' নাটকটি। ল্যাম্বার্ট সাহেবের অত্যাচারের প্রতিবাদে বেণী সেই 'তিতুমীর' নাটকেরই সংলাপ রঙ্গমঞ্চে আছড়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীর দল পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে তিতুমীর অভিনয় করে। যেমন—

"হার্মাদ: দস্যু। যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততদিন কারুর নেই বিশ্রাম। আমি বাংলার গ্যারিক বলছি—অমৃতলাল ... কারাগারে অমৃতলাল। ...

বেণী : ডুয়েল লড়বো। সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করি নি। আমরা তো ছেলাম ভায়ে ভায়ে গলাগলি করে। হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বাহু বেঁধে। বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এদেশে এসে কেনে ঐ বুট জোড়ায় মাড়গে দিলে মোদের স্বাধীনতা?

বসুন্ধরা: কেনে এয়েছে জানো না, তিতুমীর? এরা হার্মাদ, জলদস্যু। এয়েছে লুট করতে। নারীর সতীত্ব নাশ কর্য়ে, সোনার ভারতরে ছারখার কর্য়ে চলে যাবে সপ্তডিঙ্গা ভাস্যে।

জলদ: তোমরা আমাকে মারতে পারো আমি জবাব দেব না।

কামিনী: (গান) স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির্মন্ডলী। ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি সে দিন তোমার—

ময়না: বিদেশী দস্যুর তীরে হৃদয় রুধিরধার।
কোথা সে গরামী, মহিমা কোথায়?
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার,
দুখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?”

বেণী : যতক্ষণ এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে না কখনো।”

২০৮.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। টিনের তলোয়ার নাটকের সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। টিনের তলোয়ার নাটকে গানের গুরুত্ব লেখো।

২০৮.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। টিনের তলোয়ার ইস্পাতের তলোয়ার—সম্পাদনা অপূর্ব দে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ—বড়দিন, ২০০৭।

২। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস—দর্শন চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি, ১৯৯৫।

টিনের তলোয়ার

একক ১৬ - চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম

২০৮.৪.১৬.১ : নাটকের চরিত্র

২০৮.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২০৮.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২০৮.৪.১৬.১ : নাটকের চরিত্র

চরিত্র নাটকের প্রাণ। নাটকের চরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাট্যকার উৎপল দত্ত নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট বলতেন। শিল্প সংস্কৃতির নানান উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল শিল্পীর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করা। 'টিনের তলোয়ার' নাটকটিও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। আলোচ্য এই নাটকটির মধ্যে নাটকের একাধিক চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়, পার্শ্বচরিত্রগুলিও নিজ নিজ গুণে উন্মোচিত হয়েছে।

বেণিমাধব: 'টিনের তলোয়ার' নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বেণিমাধব নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলে আমার নাম বেণীমাধব চাটুয্যে ওরফে কাপ্তেনবাবু। আমি বাংলার গ্যারিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে ইংল্যান্ডের ডেভিড গ্যারিকের সমান বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় তৎকালীন সময়ে ডেভিড গ্যারিকের সঙ্গে গিরীশ ঘোষের তুলনা করা হয়েছিল। নিজের সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে বেণীমাধব স্বীকার করেছেন—"বিশ বৎসর একদিক্রমে অভিনয় করে বুঝলাম, আমি অভিনয় করতে জানি না।"

নাটকের মধ্যে প্রিয়নাথ মল্লিকের প্রশ্নের উত্তরে বেণীমাধব বলেছেন—'ততদিনে যে আমি বাংলার গ্যারিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছি।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর 'দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা' নাট্যদলের মাস্টার ছিলেন বেণীমাধব। সে একাধারে নাট্যশিক্ষক, পরিচালক এবং অভিনেতা। বেণীমাধব নিজেকে বামুন বলে স্বীকার করে না। বেণীমাধব নিজেই বলেছেন—"আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা। অভিনয় বেঁচে খাই। তৎকালীন সময়ে কবি মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সে অনবদ্য মুখস্ত বলে যেতে

পারত। কেবল তাই নয় তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। যেমন দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র। বেণীমাধব থিয়েটারে আসার পূর্বে যাত্রাদলে 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় কোটালের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। এখন তার ধ্যান ও জ্ঞান হয়েছে থিয়েটার। তিনি বিশ্বাস করতেন—'রাগ লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়।' আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে বেণীমাধব মদ্যপ মাতাল। সামান্য চার পাঁইটে তার নেশা হয় না। সে বাংলা মদ খেয়েছে তেরো বছর বয়স থেকে গাঁজা খেয়েছে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আর চরস ও আফিং খেয়েছে ষোল বছর বয়স থেকে। পাড়ার দর্জিকে জামা বানাতে দিলে মদ্যপ বেণীকে চিনে ফেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করে ফুল পাঁইট না হাফ পাঁইট। এটি গেল বেণীমাধবের বহিরাঙ্গের পরিচয়।

বেণীমাধব তৎকালীন সময়ে থিয়েটারের প্রয়োজনে বারাঙ্গনা পল্লী থেকে মেয়েদের নিয়ে এসেছিল অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। সেইভাবেই মানদাসুন্দরীকেও যোগ্য অভিনেত্রীতে পরিণত করেছিল। মানদাসুন্দরীকে অর্ধেন্দুশেখরের দল নিয়ে গেলে খুঁজে পেয়েছে সব্জীওয়ালী ময়নাকে। যে ময়নার বাংলা উচ্চারণে জিভের জড়তা ভাঙেনি। সেই ময়নাকেই বেণীমাধব যোগ্য অভিনেত্রী তৈরী করেছে। নাট্যশিক্ষক বেণীমাধবের উক্তি—

"আমি স্রষ্টা, আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।"

বেণীমাধব সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ থিয়েটার কর্মী হিসাবে নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে নাট্যকর্ম চালিয়ে গিয়েছে। থিয়েটারকে বাঁচাতে গিয়ে সে ময়নাকে সঁপে দিয়েছে মদ্যপ লম্পট .... বীরকৃষ্ণর কাছে। বিনিময়ে সে পেয়েছে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী। বেণীর নিজের হাতে গড়া অভিনেত্রী ময়না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষিত হচ্ছে বীরকৃষ্ণের হাতে। ময়নার বেদনায় বেণীমাধবের হৃদয়ের তার ছিঁড়ে গিয়েছে। বেণীমাধব প্রথমে কিছু বুঝতে না দিলেও নিভৃতে একান্তে স্বীকার করেছে বসুন্ধরার কাছে ময়নাকে হারানোর ব্যথা—'মেয়ের চেয়ে আরো কিছু বেশি'।

<u>ময়না</u>: 'টিনের তলোয়ার' নাটকে সমাজের নিম্নশ্রেণী তথা, নিচুতলার মানুষের আগমন ঘটেছিল। এই নাটকের মধ্যে মথুর, বসুন্ধরা, ময়না ইত্যাদি অনেক চরিত্রই সমাজের নিম্নশ্রেণীর

মধ্যে থেকে উঠে আসা চরিত্র। ময়না জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসে সব্জী বিক্রি করতো। এই ময়নার সঙ্গেই একদিন বেণীমাধবের পরিচয় ঘটে। তারপর এই ময়নাকেই নিয়ে আসা হয় থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসেবে। সদ্য দল ছেড়ে চলে যাওয়া মানদাসুন্দরীর অভাব পূরণ করতে ময়নাকে বেণীমাধব অভিনেত্রী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। ময়নার পুরনো পোশাক পরিচ্ছদ আগুনে পোড়ানোর পাশাপাশি তাকেও গরম জল ও সোডা দিয়ে ঘষে মেঝে অনুরাধা বানানো হল। ময়নার পুরনো রূপ, পুরনো পোশাক, পুরনো জীবনযাপন সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হল। দিবারাত্রি তপস্যার মধ্যে দিয়েই সব্জীয়ালী ময়না থেকে থিয়েটারের রাণীতে পরিণত হয়। প্রথম রাত্রের অভিনয়েই ময়না দুই শ্রেণীর দর্শকের সম্মুখে অভিনয় করেই প্রশংসা লাভ করেছিল। এখান থেকেই শুরু হয় ময়নার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। সমাজের ধনাঢ্য শ্রেণীর সঙ্গে ময়নার ওঠাবসা শুরু হয়—"বাংলাদেশে যত বাবু আছে সব হেড়াহেড়ি করতে লেগেছে।"

কখনো সে বেড়াতে গিয়েছে ঝামাপুকুরের মুখুয্যেবাবুদের জুড়িগাড়ি করে আবার কখনো বা কলকাতার চৌধুরীদের বজরায়। তার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়েছে। সে বাবুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করলেও নিজেকে কখনোই বিকিয়ে দেয় নি। বেণীমাধব নিজেদের থিয়েটার করে দেবার শর্তে ময়নাকে বীরকৃষ্ণের হাতে সপে দিয়েছে। বীরকৃষ্ণ দাঁ ময়নাকে পাটরাণী রাখতে চায়। ধোপাপুকুরের বাড়িটাও তার নামে লিখে দেয়। আবার ময়নাকে থিয়েটারে অভিনয় করার অধিকারও দেয়। ভদ্র ঘরের মেয়েকে রাখার আহ্লাদে বীরকৃষ্ণ ময়নাকে গ্রহণ করে। বেণীমাধব ময়নাকে থিয়েটারের প্রয়োজনে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। তারপর তাকেই আবার তুলে দিয়েছিল বীরকৃষ্ণ দাঁর হাতে নিজস্ব থিয়েটারের স্বপ্নে। বেণীমাধব এক নতুন জীবনের গল্প শোনায় ময়নাকে। তার গাড়ি, বাড়ি, ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের কোলে অভাবে থাকবে না। প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বসুন্ধরা বলেছিলেন—"মেয়েটার মনেও তোমরা গয়না পরাবে নাকি।"

২০৮.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। টিনের তলোয়ার নাটকে নাট্যকার বেণিমাধব চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে বৈপ্লবিক ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন তা আলোচনা করো।

২। চরিত্র বিশ্লেষণ করো—

(ক) ময়না

(খ) বীরকৃষ্ণদা

(গ) বসুন্ধরা

(ঘ) প্রিয়নাথ

<u>২০৮.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী</u>

১। আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার—উৎপল দত্ত, নাট্যচিন্তা, ১০ বি ক্রিক লেন, কলকাতা-৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ—বইমেলা, জানুয়ারি-২০০৫।

২। কালজয়ী বাংলা নাটক পুনর্বিচার—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১ এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি-২০০৫।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ.

দ্বিতীয় সেমেস্টার

(ছাত্র নির্বাচিত)

GEC/CBCS

বাংলাভাষাওসাহিত্যপরিচয়

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১.	বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২.	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. রাজশেখর নন্দী— সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. শ্রাবন্তী পান— সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই ২০২২

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) **Manas Kumar Sanyal**, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পত্র – GEC/CBCS

বাংলা (ছাত্র নির্বাচিত)

শিরোনাম : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়

পর্যায় গ্রন্থ : ১ বাংলা কবিতা (সময় : ৪ ঘণ্টা).

একক ১. রবীন্দ্রনাথের কবিতা (সোনার তরী, জীবন দেবতা, ভারততীর্থ)

একক ২. কাজী নজরুল ইসলাম – মানুষ (সাম্যবাদী/ সঞ্চিতা)

একক ৩. জীবনানন্দ দাশ- বনলতা সেন (বনলতা সেন)

একক ৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায় – অবনী বাড়ী আছো, কেউ কথা রাখেনি

পর্যায় গ্রন্থ : ২ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. কবি – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ৬. ছোটগল্প –

উপ একক – ১- বরযাত্রী, ক্যানভাসার

উপ একক – ২- সংসারসীমান্তে, টোপ

উপ একক – ৩- নিষাদ, আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

উপ একক – ৪- একটি তুলসী গাছের কাহিনী, স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ প্রয়োগের বাংলা ভাষা (সময় : ২ ঘণ্টা)

একক ৭. বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

একক ৮. বাংলা ভাষার প্রয়োগগত দিক

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ নাটক ও নাট্যমঞ্চ (সময় : ২ ঘণ্টা)

একক ৯. মুক্তধারা

একক ১০. নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ৫ বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১১. চলচ্চিত্রের স্বরূপ

একক ১২. বাংলাসাহিত্য, চিত্রনাট্য

একক ১৩. চলচ্চিত্রে জীবন ও সমাজ

একক ১৪. চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা

সূচিপত্র

GEC/CBCS

GEC/CBCS	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	রবীন্দ্রনাথের কবিতা (সোনার তরী, জীবন দেবতা, ভারততীর্থ)	ড. শ্রাবন্তী পান	১-৬
	২.	কাজী নজরুল ইসলাম – মানুষ (সাম্যবাদী/ সঞ্চিতা)	ড. শ্রাবন্তী পান	৬-৭
	৩.	জীবনানন্দ দাশ- বনলতা সেন (বনলতা সেন)	ড. শ্রাবন্তী পান	৭-১০
	৪.	শক্তিচট্টোপাধ্যায় – অবনী বাড়ী আছো, কেউ কথা রাখেনি	ড. শ্রাবন্তী পান	১০-৩০
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	কবি – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ড. রাজশেখর নন্দী	৩১-৩৪
	৬.	ছোটগল্প – উপএকক – ১- বরযাত্রী, ক্যানভাসার উপএকক – ২- সংসারসীমান্তে, টোপ উপএকক – ৩- নিষাদ, আমি আমার স্বামীওএকটিনুলিয়া উপএকক – ৪- একটিতুলসীগাছেরকাহিনী, স্বপ্নেরভিতরমৃত্যু	ড. রাজশেখর নন্দী	৩৪-৩৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৭.	বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩৫-৩৮
	৮.	বাংলা ভাষার প্রয়োগগত দিক	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩৮-৫২
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	৯	মুক্তধারা	ড. শ্রাবন্তী পান	৫৩-৫৮
	১০	নাট্যমঞ্চ	ড. শ্রাবন্তী পান	৫৮-৬০
	১১	চলচ্চিত্রেরস্বরূপ	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৬০-৬৪
	১২	বাংলাসাহিত্য, চিত্রনাট্য	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৬৪-৯৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৫	১৩	চলচ্চিত্রে জীবন ও সমাজ	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৯৬-১০১
	১৪.	চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	১০১-১০৩

পর্যায় গ্রন্থ - ১

কবিতা

একক ১

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

বিন্যাসক্রম

৫.১.১.১ : রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা

৫.১.১.২ : সোনার তরী

৫.১.১.৩ : জীবনদেবতা

৫.১.১.৪ : অভিসার

৫.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.১.১ : রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কাব্যসাহিত্যের পথিকৃৎ। জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যসাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র কবিমানসের রোমান্টিক কাব্যধারা ও রোমান্টিক জীবনে উপলব্ধি হলো মানসী থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত। এই সময়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে রবীন্দ্র কবিমানসের যে নিবিড় পরিচিতি ঘটেছিল, তারই রূপ ফুটে উঠেছে এই কাব্যধারায়।

মাত্র বারো বছর বয়েস থেকে শুরু করে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত একের পর এক যিনি সৃষ্টি করেছেন কাব্যের পাহাড়। আর সেই কাব্যের পরিচয় যতোই সংক্ষেপে দেওয়া হোক না কেনো তার বলার শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। তাঁর কাব্য ছোটো করে বলা চলে না। কবির প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য, আবেগের সুবিশাল গভীরতা, রোমান্সের কল্পস্বর্গপরিক্রমা যিনি নিজেই যেন এক গোটা বিশ্ব। এককভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার সাথে কোনো কবির তুলনা চলে না। বিশ্বের বিখ্যাত বিখ্যাত কাব্যকার, ব্যাস, বাল্মীকি, শেলী, কীটস সবার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অনুপম। তাঁর কাব্যগুলি গুণে, স্বাতন্ত্রে অনন্য।

অতি শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যচর্চা শুরু করেন। ঠাকুরবাড়ি সাহিত্যিক পরিবেশ বেড়ে ওঠার দরুন ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের শিল্পরুচির সান্নিধ্যে এসে। সেই থেকেই আবেগপ্রবণ বালক কবি নিজেকে স্বতন্ত্র্যভাবে মেলে ধরতে সক্ষম হয়। কিন্তু শৈশবে বেশ কিছুদিন তাঁকে বিদ্যালয়ের চারদেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছিল। যা তাঁর কাছে ছিলো খুবই দম আটকানো পরিবেশে থাকার মতন। বিদ্যালয় জীবন থেকে ছুটি পেয়ে বালক রবি

নিজগৃহেই পরিবেশ যোগ্য শিক্ষক দ্বারা নানান বিষয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বাড়িতেই বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার যে ঢালাও পরিবেশ ছিলো তার থেকেই রবীন্দ্রনাথ একটু একটু শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ফলে বয়েসের তুলনায় অধিক পড়েছিলেন এবং অল্প বয়েসে মনন, আবেগ প্রভৃতি অনেক পরিপক্কতা লাভ করেছিল সাহিত্য চর্চার ফলে। কৈশরে মা সরদা দেবী চলে যাওয়ায় বালক রবি কিছুটা হলেও একা হয়ে যান। কিন্তু সেই মাতৃহারা কিশোর আবার উৎসাহিত হয় নতুন বৌঠানের সান্নিধ্যে এসে। তাঁর শিল্পী মন বৌঠাকুরাণীর সান্নিধ্যে এসে মুকুলিত হতে থাকে।

কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে আরো উৎসাহিত করেছিল কাব্যগুরু বিহারীলালের গীতিরসসিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত পিপাসা, তাঁর দাদাদের সাহচর্যা এছাড়াও তখন কবি নেশায় ডুবে আছেন শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ ও কালিদাসের কুমারসম্ভবের। এছাড়াও পড়ছেন সংস্কৃত সাহিত্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদ। যা রবীন্দ্রনাথকে কাব্য লিখতে অনেকটা উৎসাহিত করেছিলো। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা ‘‘হিন্দুমেলার উপহার”। ১৮৭৫ সালে যে কবিতাটি তিনি হিন্দুমেলায় পাঠ করে শোনান। ১২৮১ বঙ্গাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম না দিয়ে একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারা যায় যে কাব্যটি তাঁরই লেখা।

১৮৭৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে তিনি লিখলেন কিছু নাট্যকাব্য। যেমন— ‘‘রুদ্রচণ্ড”, ‘‘শৈশবসঙ্গীত” ও ‘‘কালমৃগয়া”। কিন্তু কিশোর কবি প্রথম মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন ১৮৭১ সালে। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় আদবকায়দায় লিখলেন ‘‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী”। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ১৭ বছরের বালক মাত্র। কিন্তু তাঁর এই কাব্যে ভাবের গুণ, ভাষার চাতুর্য এতই প্রখর ছিল যে তখন যে সব বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে লিখছিলেন তাঁদেরকেও বালক রবীন্দ্রনাথ হার মানিয়ে ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সাথে এই কাব্যের তেমন সাদৃশ্য না থাকলেও এতে বালক কবি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উন্মেষ পর্বের মধ্যে দিয়ে কবির কাব্যধারার বিকাশ শুরু হয়। এই প্রথম তিনি রোমান্সের কল্পলোক ত্যাগ করে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন। লিখলেন— ‘‘সন্ধ্যাসঙ্গীত,” ‘‘প্রভাতসঙ্গীত”, ‘‘ছবি ও গান”, ‘‘কড়ি ও কোমল” প্রভৃতি কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কাব্য লিখেছিলেন সেগুলি রোমন্টিকতায় ভরপুর। এই অধ্যায়কে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত কাব্যগুলি এই পর্যায়ে রচিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম ‘‘চিত্রা”, ‘‘চৈতালি”, ‘‘সোনার তরী”, ‘‘মানসী” প্রভৃতি।

‘‘মানসী” কাব্যগ্রন্থতে কবি মর্ত্যকেন্দ্রিক বাসনা ত্যাগ করে বাইরের জগতের সাথে অন্তরের জগতের মেলবন্ধন ঘটাতে না পেরে, রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত জীবনের সাথে নিজেকে না মেলাতে পেরে এক অন্য বিচ্ছিন্ন জগতকে আশ্রয় করেছেন। কখনো প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেয়েছেন মানব জীবনের আস্বাদ আবার কখনো মৃত্যুর বিভৎসতাকে উপলব্ধি করেছেন কিংবা আবার কখনো তীব্র ব্যঙ্গের সাথে বাঙালি জীবনকে কটাক্ষ করেছেন।

মানসীর কিছু পরেই প্রকাশিত হয়েছিলো রবীন্দ্রসাহিত্যের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ তথা কবির সেই সোনার ফসল যা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ‘‘সোনার তরী”। রবীন্দ্রকবিজীবনের এক বিশেষ প্রতীক। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় হয় জীবনদেবতার। যার নৌকায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সোনার ফসল ঠাসা। কিন্তু কবির কোনো স্থান নেই। আবার নিরুদ্দেশ যাত্রাতে রবীন্দ্রনাথ দেখছেন কোনো এক নিরুদ্দেশের পথে কবি যাচ্ছেন কিন্তু তখনও সেই মানস

সুন্দরী কবি যাকে প্রশ্ন করছেন তার সাথে পুরোপুরিভাবে পরিচয় হয় নি। সে পুরুষ না নারী তাও কবি জানেন না।

‘‘চিত্রা’’ কবির বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৮৯৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার সম্পদ। এই কাব্যে মানস সুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ‘‘চিত্রা’’ কাব্যসীমার সঙ্গে অসীমের, বাইরের জীবনের সঙ্গে অন্তরের যে বিচিত্র ভাব দেখা যায় তাতে ‘‘চিত্রা’’ কে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে সবথেকে উৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে। এর অন্তর্বতী পর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘‘কথা’’, ‘‘কাহিনী’’, ‘‘ক্ষণিকা’’, ‘‘নৈবেদ্য’’, ‘‘স্মরণ’’ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের কিছু কাব্যগ্রন্থ।

গীতাঞ্জলি পর্বে রবীন্দ্রনাথ জীবনের মায়া কাটিয়ে ভগবানকেই প্রিয় ও বন্ধু বলে ভাবলেন। রবীন্দ্রকাব্য জীবনের এটিকে আধ্যাত্মিক পর্বও বলা হয়। এছাড়াও এই গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হিসাবে সমাজ ও সাহিত্যে পরিচয় লাভ করেছিলেন। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি ইংরেজি অনুবাদ ‘‘song offerings’’ -এর জন্য তিনি প্রথম এশিয়ার কবি হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশে বিদেশে এই বাঙালি কবি ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্যকে নিয়ে বহু প্রশংসা হয়। শুধু গীতাঞ্জলী নয় তার সাথে ‘‘গীতিমাল্য’’, ‘‘গীতালি’’ এই দুটি কাব্য একত্রে ‘‘গীতাঞ্জলি’’ পর্ব নাম দেওয়া হয়। ‘‘গীতাঞ্জলি’’ তে রবীন্দ্রনাথ অন্তর দেবতাকে প্রিয়রূপে, সখারূপে ও প্রাণেশরূপে কল্পনা করেছেন। শূন্য জীবনে ভগবানকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন বারবার। তাই কবি ভয়াবহ ঝড়ের রাতে সেই প্রিয়ের সন্ধান করেন কিংবা আষাঢ়ের সন্ধ্যায় যখন কবি একলা তখন তিনি বলছেন ‘‘এই যে আসে, আসে, আসে’’। ‘‘গীতাঞ্জলি’’ কে তাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে ধার হয়।

শেষ জীবনেও রবীন্দ্রনাথ বারোখানি কাব্য লিখেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধি। কিন্তু জীবনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে তিনি বারবার হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। জীবন ও মৃত্যুর দোলায় দুলতে দুলতে সৃষ্টি করেছিলেন আরো কতোগুলি কাব্য। জীবনের শেষ দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও কল্পনার জোয়ার কিন্তু সমানভাবে বয়ে চলেছিলো কবি হৃদয়ে। আবেগের উচ্ছাসও কম ছিলো না। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আরো বেড়ে গিয়েছিলো। এই সময়ে কবি লিখলেন—‘‘পুনশ্চ’’–১৯৩২, ‘‘বিচিত্রা’’–১৯৩৩, ‘‘শেষ সপ্তক’’–১৯৩৫, ‘‘বীথিকা’’–১৯৩৫, ‘‘পত্রপুট’’–১৯৩৬, ‘‘শ্যামলী’’–১৯৩৬, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

এজন্য ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত কবির শেষ জীবনে লেখা কাব্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম, রোমান্স ছেড়ে এক আধ্যাত্মিকতার কবি হিসাবে পৃথিবীর কবি হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির বিস্ময়। বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়। বাঙালির কাব্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর কাব্য সোনার ফসল আপামর বাঙালির কাছে। তাই বলা যেতে পারে গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সবধারার মতোই সাহিত্যের এই ধারাতেও তিনি সর্বেসর্বা।

৫.১.১.২ : সোনার তরী

সোনার তরী (১৮৯৪) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘সোনার তরী’। এটি বহুল পঠিত ও আলোচিত কবিতার মধ্যে একটি। একটি গ্রামীণ দৃশ্যপটের নিটোল বর্ণনা এতে উপস্থাপিত হয়েছে। কবিতার দৃশ্যকল্প মানুষকে চিরচেনা প্রকৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

■ কবিতার দৃশ্যকল্প :

- আকাশে মেঘ গর্জন করছে। চারিদিকে বরষার জল থৈথৈ করছে। সঙ্গে খরস্রোত বয়ে চলছে। জমির ধান কেটে একটি ছোট খেতে কৃষক একা বসে আছেন, পার হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ধান কাটতে কাটতে নদীর জল বেড়ে গেছে। খেতের চারিদিকে নদীর বাঁকা জল খেলা করছে।
- ওদিকে ওপারের দিকে তাকিয়ে কৃষক দেখলেন এই সকালেই মেঘ ছেয়ে আছে। ওপারের গাছগুলো ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। এমনকি তার গ্রাম পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে কেউ একজন গান গেয়ে নৌকা বেয়ে এপারের দিকে আসছে। দেখে তাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে তো কোনো দিকে না তাকিয়ে ভরা নৌকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কৃষক তাকে গলা ছেড়ে ডাকে —'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে,/বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।'
- কৃষকের ডাকে কেউ একজন নৌকা নিয়ে আসতে থাকে তীরের দিকে। জানতে চায়, কৃষক কোথায় যাবে? কৃষক বলেন, 'যেয়ো যেথা যেতে চাও,/ যারে খুশি তারে দাও, /শুধু তুমি নিয়ে যাও,/ ক্ষণিক হেসে/ আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।'
- মাঝি এসে নৌকায় সাধ্যমতো ধান তোলে। এতক্ষণ কৃষক যে ধান নিয়ে নদীর তীরে পারাপারের অপেক্ষা করছিলেন তা সব নৌকায় তুললেন। কিন্তু কৃষককে নেওয়ার মতো জায়গা হলো না। কৃষক রয়ে গেলেন ধানখেতে শূন্য নদীর তীরে। তার যা কিছু অর্জন ছিল তা নিয়ে গেলে সোনার তরী।

■ অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা :

এমন দৃশ্যপটের অন্তরালেও গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। তাই 'সোনার তরী' কবিতার ব্যাখ্যা একেকজন একেকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে কবির নিজের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হল :

"মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত-কর্ম কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্য কালে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ মহাকালকে অনুরোধ করিল-যে 'এখন আমারে লহ করুণা ক'রে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'!

মহাকাল মানুষের কর্ম কীতি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না। হোমার বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস শেক্‌স্‌পীয়ার নেপোলিয়ান আলেক্‌জাণ্ডার প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিয়া লইয়া চলিতেছে, কিন্তু সে সেই সব কীর্তিমান্‌দের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বস্ত্রবয়নের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি মানব-সভ্যতার ইতিহাস অমর হইয়া আছে।"

এই সন্ধ্যার পরদিন প্রত্যুষেই কবি শান্তিনিকেতন-মন্দিরে উপাসনা করেন এবং ঐ সোনার তরীর কথা নিয়েই উপদেশ দেন। এটি অনুলিখিত হয়ে 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তক-পর্যায়ের সপ্তম ভাগে 'তরী বোঝাই' শিরোনামে ছেপে প্রকাশ করা হয় :

সোনার তরী ব'লে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।—মানুষ সমস্ত জীবন ধ'রে ফসল চাষ কর্‌ছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্য গীতায় ভগবান বলেছেন—

'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। / অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।'

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠ্‌ছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হলো— তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য-ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই ক'রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না--কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকে রাখ, তখন সংসার বলে-তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখ্‌বার সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখ্‌বার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান কর্‌ছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ কর্‌ছে রক্ষা কর্‌ছে, কিছুই নষ্ট হ'তে দিচ্ছে না,--কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন ক'রে রাখ্‌তে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাবে চুকিয়ে যেতে হবে-ওটি কোনো মতেই জমাবার জিনিস নয়। —৪ঠা চৈত্র ১৩১৫

কবি যে মহাকালকেই সোনার তরীর নেয়ে বলেছেন তাহার সমর্থন তাঁহার অপর একটি রচনা হইতে পাওয়া যায় : গ্রীস ও রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।—সঙ্কলন, পূর্ব ও পশ্চিম

■ কবিতার মর্মার্থ :

কবিকৃত ব্যাখ্যা থেকে সোনার তরী কবিতার মর্মার্থ যা দাঁড়ায়, সেটা অনেকটা এরকম : কবি দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করেছেন। মহাকালের সোনার তরীতে কবির কবিতা-নির্মাল্য অর্পণ করিবার সময় এসেছে। কবি তাঁর সাধনার সোনার ফসল মহাকালের হাতে সঁপে দিয়ে রিক্ত হস্তে মিনতি করেন,—"এখন আমারে লহ করুণা করে"। কালস্রোত কবির সোনার ধান--কবিতার অর্ঘ্য-নৌকা বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল। অথচ কবির স্থান সে নৌকায় হইল না। কারণ, কবির ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সোনার তরীর নেয়ে (মহাকাল) কবির সৃষ্টিকে গ্রহণ করেলন মাত্র। তিনি যেন কবিকে বলে গেলেন, —তোমার জীবনে যা কিছু তুমি সঞ্চয় করিয়াছ, তা তোমার চরম সঞ্চয় নয়। তোমার জীবনে আরও অনেক বর্ষা বসন্ত আসবে, এখনও বহুকাল এই শূন্য নদীর তীরে বসে তোমাকে সোনার ফসল ফলাতে হবে।

কাজেই শূন্য নদীর তীরে কবি পড়ে রইলেন—

'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'

কবির বক্ষ ভেদ করে তখন কেবল একটি বেদনার রাগিণী ধ্বনিত হল—

'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'

'সোনার তরী' কবিতার প্রাণই হল এই করুণরসে মথিত কবির হৃদয়োত্থিত গভীর বেদনাসম্ভার।

এই কবিতায় সঞ্চিত ধান তরীতে বোঝাই করবার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কবিজীবনের একটি সাময়িক বিষাদকরুণ মানচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। কবি যেখানে তাঁর কবিকর্মের ছেদ টানতে চান, কবির কাব্যপ্রেরণাদাত্রী সেইখানে তাঁকে দাঁড়ি টানতে দেন না, আরও বহুতর ও মহার্ঘতর ফসল ফলাবার জন্য কবিকে কর্মক্ষেত্রে প্রতীক্ষারত রেখে চলে যান। তাই বেদনার মধ্যেও আশ্বাসের একটি ব্যঞ্জনার আভাসও এই কবিতায় পাওয়া গেছে। কবিতাটির মধ্যে ভরা বর্ষার ছবি ও গতি সুস্পষ্ট হয়ে আছে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
এবং
শ্রাবণ-গগন ঘিরেঘন মেঘ ঘুরে-ফিরে,

ইত্যাদি বর্ণনা বর্ষাদৃশ্যকে আমাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলেছে। যেদিন ভরা বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোতা পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে বোঝাই নৌকার চাষীরা পারাপার করছিল, সেই দিনেই ‘সোনার তরী’ কবিতার সঞ্চার হয়েছিল কবির মনে। কিন্তু কবিতাটির রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৮। ভরা বসন্তে, ভরা বর্ষার কথা-শ্রাবণ-গগনের মেঘরাজির কথা স্মরণ করে কবি যে কবিতা লিখেছেন-সোনার তরী কবিতাটি সেই জাতের কবিতা ‘‘যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে’’। এই কবিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। একবার পত্রদ্বারা কবির কাছে তাঁরই লেখা কয়েকটি অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি সোনার তরীর প্রসঙ্গে লেখেন—

> ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরু-শ্রেণীর গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ব’য়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু-হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।... ভরা-পদ্মার উপরকার ঐ বাদল-দিনের ছবি ‘সোনার তরী’ কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

৫.১.১.৩ : জীবনদেবতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ‘জীবনদেবতা’ কবিতাটি ‘চিত্রা’ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটির রচনাকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দে ২৯ মাঘ। জীবনদেবতা তত্ত্বের যে বীজ প্রোথিত হয়েছে ‘সোনার তরী’তে—এখানে যেন তাই হয়ে উঠেছে মহীরূহ।

★ জীবনদেবতা তত্ত্ব

কবি মাত্রেরই বিশ্বাস তাঁর কবিতা রচনার পশ্চাতে রয়েছে কোনো এক অমোঘ শক্তির দিব্য প্রেরণা। যা জীবনের পরিচালনী শক্তি, তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অন্তর্যামী বা জীবনদেবতা। জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে কবি জানেন না এর পরিণতি। কবি জীবনের প্রারম্ভে তিনি জীবনদেবতাকে তাঁর জীবনে আহাবান করেছিলেন এই কাজে তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে—তাঁকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে কিন্তু ‘জীবনদেবতা’ কবিতায় কবি বুঝেছেন নিজের দীনতা-যে বিশাল কাজের ভার তাঁর উপর এসে পড়েছে তা সফল করায় নিজ অক্ষমতার কথা।

★ বিষয় বিশ্লেষণ

জীবন দেবতাকে সম্বোধন করে কবি জানতে চেয়েছেন তাঁর অন্তরে স্থান নিয়ে তাঁর সব আশা মিটেছে কি না! তিনি তাঁকে জানিয়েছেন জীবনদেবতাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে কবিকেও কম ত্যাগ করতে হয়নি— তিনি দুঃখসুখের লক্ষধারায় তাঁর পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছেন জীবনদেবতাকে-এজন্য দ্রাক্ষাকে দলিত করার মতো নিজের হৃদয়কে নিষ্ঠুর পীড়নে পেষণ করতে হয়েছে তাঁকে। বর্ণের নানা বৈচিত্র্যের সম্ভারে গন্ধের নানা উপচারে, বিচিত্র রাগরাগিনী অভিনব ছন্দের সূত্রে গেঁথে রচনা করেছেন তাঁর সঙ্গে বাসর শয়নের লজ্জা। তিনি নিজের কামনা বাসনার সোনা গলিয়ে প্রতিদিন যেন নতুন নতুনরূপে নির্মাণ করেছেন জীবনদেবতাকে।

জীবন দেবতার সঙ্গে বিচিত্র লীলা : কবিকে এক সময় নিজেই বরণ করে নিয়েছিলেন জীবন দেবতা (স্মরণীয় 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা)। 'জীবনদেবতা' কবিতায় জীবন দেবতা হলেন কবির জীবনলীলার সাথী। তিনি কবির অনুপ্রাণিকা শক্তি। কবিতাটির চারটি স্তবকে কবি স্তরে ব্যক্ত করেছেন জীবনদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক। প্রথম স্তবকে কী ভাবে নিজের মনের ভেতর গড়ে তুলেছেন জীবনদেবতার অবয়ব। সেই মনের মানুষ, সেই অন্তরতমের জন্য নিজের বক্ষ নিংড়ে সুখদুঃখের রসের ধারায় ভরে দিয়েছেন তাঁর পাত্র-তাঁরই জন্য তিনি আয়োজন করেছেন বিচিত্র বর্ণের গন্ধের-রাগরাগিনীর- নানান ছন্দে তাকে গেঁথে দেবার প্রয়াস করেছেন তিনি সাধ্যানুসারে। আর এরই মধ্যে তিনি চেয়েছেন জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর মিলন মুহূর্ত হয়ে উঠুক অক্ষয়।

কবির অনুযোগ— কবি চাননি জীবনদেবতাকে, জীবন দেবতাই বরণ করে নিয়েছিলেন কবিকে-কবি আপত্তি করেননি, সে আহ্বানে। জীবন দেবতার ইচ্ছে মতো তিনি চেষ্টা করেছেন নিজেকে তাঁর বাহকরূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু কবি জানেন তাঁর সে প্রয়াস অনেকক্ষেত্রেই হয়ে গেছে অসফল। কবি নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর অক্ষমতা।

বেদনাহত চিত্তে কবি উপলব্ধি করেছেন জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর মিলনপর্ব বুঝি শেষ। কিন্তু যে সম্পর্ক বহুকালের-সে সম্পর্ক শেষ বললেই তো আর শেষ হয়ে যায় না। যে জীবন দেবতা কবির জীবন নিয়ন্ত্রক তিনিই তো পারেন কবির অপূর্ণতা দূর করে তাঁকে নতুন করে গড়ে, যোগ্য করে গড়ে নিতে! এই আকাঙ্ক্ষাতেই এ কবিতার সমাপ্তি। তাই জীবনদেবতার সঙ্গে যে লীলা চলেছে তাঁর তা এখানেই যায় নি থেমে-তা এগিয়েছে আরো আগামীর দিকে।

★ কবিতার ছন্দ

কলাবৃত্ত ছন্দের মধ্য লয় কবিতার আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতাকে যেমন ফুটিয়েছে তেমনি বহু যুগ পূর্ব থেকে জীবনদেবতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন লীলার ছন্দ ফুটেছে এ কবিতায়। কবিতার শুরুতেই দেখা যায়,—

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব / সকল তিয়াষ / আসি অন্তরে মম?"

যেখানে রয়েছে লীলার গতি—সেখানে ছন্দের স্পন্দনে বদল না ঘটলেও ত্রিপদীর মতো যতিপাত দেখা গেছে,

'কত যে চরণ / কত যে গন্ধ
কত যে রাগিনী / কত যে ছন্দ
গাঁথিয়া গাঁথিয়া / করেছি চয়ন / বাসন শয়ন তব—"

একক ৩

কাজী নজরুল ইসলাম : মানুষ (সাম্যবাদী/সঞ্চিতা)

বিন্যাসক্রম

৫.১.৩.১ : কবিজীবন

৫.১.৩.২: কাব্যপরিচয়

৫.১.৩.৩ : সাম্যবাদী

৫.১.৩.৪ : সঞ্চিতা

৫.১.৩.৫ : মানুষ

৫.১.৩.৬ : কবিতার বিশ্লেষণ

৫.১.৩.৭ : সমালোচনা

৫.১.৩.৮ : শিল্পসুষমা

৫.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১.৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.৩.১ : কবি পরিচয়

কাজী নজরুল ইসলাম (মে ২৫, ১৮৯৯-আগস্ট ২৯, ১৯৭৬), বাঙালি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক, যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বাংলাভাষার অন্যতম সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ-দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তার কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ওগুরুত্ব অপরিসীম। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, রাজনীতিবিদ এবং সৈনিক হিসেবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। তাঁর কবিতা ও গানে এই মনোভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা হাতে তাঁর প্রবেশ, ধূমকেতুর মতো তাঁর প্রকাশ। যেমন লেখাতে বিদ্রোহী, তেমনই জীবনে—কাজেই 'বিদ্রোহী কবি'।

নজরুল এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মের। স্থানীয় এক মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজও করেছিলেন। বিভিন্ন থিয়েটার দলের সাথে কাজ করতে যেয়ে তিনি কবিতা, নাটক এবং সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এসময় তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। এসময় তিনি ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ

সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রকাশ করেন বিদ্রোহী এবং ভাঙার গানের মত কবিতা, ধূমকেতুর মত সাময়িকী। জেলে বন্দী হলে তারপর লেখেন রাজবন্দীর জবানবন্দী। এই সব সাহিত্যকর্মে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট। ধার্মিক মুসলিম সমাজ এবং অবহেলিত ভারতীয় জনগণের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলাকাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জন্ম দেন। এটি হল ইসলামী সঙ্গীত তথা গজল। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা এবং সুর করেছেন যেগুলো এখন নজরুল সঙ্গীত বা 'নজরুলগীতি' নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয়। মধ্যবয়সে তিনি পিক্‌স রোগে আক্রান্ত হন। এর ফলে দীর্ঘদিন তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। একই সাথে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালে তিনি সপরিবারে ঢাকা আসেন। এসময় তাকে বাংলাদেশের জাতীয়তাপ্রদান করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫.১.৩.২ : কাব্যপরিচয়

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল দুটি বৈপ্লবিক সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন। এই দুটি হচ্ছে বিদ্রোহী কবিতা ও ভাঙ্গার গান সঙ্গীত। এগুলো বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। বিদ্রোহী কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একই সময় রচিত আরেকটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে কামাল পাশা-এতে ভারতীয় মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতা সম্বন্ধে নজরুলে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২২ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতায় একটি নতুনত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এর মাধ্যমেই বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরপর এর কয়েকটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে : "প্রলয়োল্লাস, আগমনী, খেয়াপারের তরণী, শাত-ইল্‌-আরব, বিদ্রোহী, কামাল পাশা" ইত্যাদি। এগুলে বাংলা কবিতার মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর শিশুতোষ কবিতা বাংলা কবিতায় এনেছে নান্দনিকতা খুকী ও কাঠবিড়লি, লিচু-চোড়, খাঁদু-দাদু ইত্যাদি তারই প্রমাণ। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি নিম্নরূপ :

- অগ্নিবীণা ১৯২২
- সঞ্চিতা ১৯২৫
- সাম্যবাদী ১৯২৫
- ফনী-মনসা ১৯২৭
- চক্রবাক ১৯২৯
- সাতভাই চম্পা ১৯৩৩
- নির্ঝর ১৯৩৯
- নতুন চাঁদ ১৯৩৯

- মরুভাস্কর ১৯৫১
- সঞ্চয়ন ১৯৫৫
- নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা ১৯৮২
- আনন্দময়ীর আগমনে

৫.১.৩.৩ : সাম্যবাদী

সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে (পৌষ, ১৩৩২) প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এই বইটির কবিতাগুলোতে নজরুল ইসলাম সাম্যের কথা বলেছেন। বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জাতি নিয়েও কবিতা এই বইতে রয়েছে। ধর্ম, জাত, লিঙ্গ সবকিছু পিছনে ফেলে মানুষের পরিচয়ই যে মহান তা তিনি এ কবিতাগুলোর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তবি তার মানুষকবিতায় বলেছিলেন :

"পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল মূর্খরা সব শোন/মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন"

এই কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ১১টি কবিতা রয়েছে। সবগুলিতেই মানুষের সমতা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কবিতাসমূহের তালিতা নিম্ন দেওয়া হল—

- সাম্যবাদী
- ইশ্বর
- মানুষ
- পাপ
- চোর-জাকাত
- বারাঙ্গনা
- মিথ্যাবাদী
- নারী
- রাজা-প্রজা
- সাম্য
- কলিমজুর

৫.১.৩.৪ : সঞ্চিতা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সংকলন হলো সঞ্চিতা। এই গ্রন্থে মোট ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। এর মধ্যে—'বিদ্রাহী', 'সর্বহারা', 'মানুষ', 'জীবন বন্দনা', 'খুকী ও কাঠবেলালী,' 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি প্রধান। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে : "বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু"।

৫.১.৩.৫ : মানুষ

মানুষ কবিতাটি নজরুল ইসলামের একটি অন্যতম কবিতা। এই কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় The labour Swaraj party of the Indian Congress-এর মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকায়। পরে কবিতাটি ''সাম্যবাদী'' কাব্যগ্রন্থে অন্তভুক্ত হয়। এই কবিতাটিকে কবি নজরুলের মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও সমবেদনার এক উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এ উজ্জ্বলতা তাঁর মানবিকবোধের। শত ঝড়-ঝাপটা ও দ্রারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাপনের মধ্যেও যা তিনি কখনো হারাননি, মনের ভেতরে লালিত করেছিলেন সযত্নে। তাই তিনি অকপটে পরাধীন ভারতে শোষণ ও শাসনের নিপীড়ন সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা ও অপমান দেখেও, এমনকি নিজেও তার শরীক হয়েও বলতে পেরেছেন আমাদের অম্লানবদনে এ কথা-'গাহি সাম্যের গান'-মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।'

৫.১.৩.৬ : কবিতার বিশ্লেষণ

মানুষই যে ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির সুন্দর ও মঙ্গলময়ের প্রকাশের মূলেই যে মানুষ-এ বোধ নজরুলের ছিল বলেই তিনিই সাম্যের গানের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সৃষ্টিশীল আনন্দময় মানবজাতির কামনা করেছেন। এ কামনা তিনি করেন সমস্ত ধর্ম-বর্ণ ও জাতিগত স্থুলতার ঊর্দ্ধে উঠে। এ কারণেই বলতে নেই তাঁর কাছে তাই ধর্ম ও জাতিগত বিভাজন মূল্যহীন বলে মনে হয়। কবিতার শুরুতেই মানুষের জয়গান করে, মানুষকে সবার বড় বলে এবং সর্বোপরি মানুষকে মহত্ত্বের আসনে বসিয়ে বলতে দ্বিধা করেননি এ কথা বলতে—

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশ, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধায় ঠাকুর দাঁড়ায়ে, পূজার সময় হল।

'ক্ষুধায় ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে'—এ কথাগুলির মধ্যে কবি নজরুলের নিপীড়িত বুভুক্ষ দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের প্রতি ভালোবাসার গভীরতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

এই 'মানুষ' কবিতাটির প্রথমাংশেই কবি যেমন একদিকে পূজারীর অহংসর্বস্বতার রূপকে তুলে ধরেছেন, তেমনি পূজারীকে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। মানবতাবাদী কবি ছিলেন বলেই কবি নজরুলের চোখে পূজারীর অহমিকা ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। নজরুলের চোখে মানুষ ও দেবতায় কোনো প্রভেদ নেই বলেই 'জীব প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'— এই মন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী। জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণগাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ' এক ভিখারী মানুষের বা মুসাফির কাতর আহবানে মন্দিরের দরজা খুলেও পুজারীর দরজা বন্ধ করে দেবার মধ্যে কবি ধর্মের সংকীর্ণ মনোভাবের যে রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, বলতে নেই তা শুধু অপমানকরই নয়— হত দরিদ্র মানুষের প্রতি এক শ্রেণি বিভাজনের অবজ্ঞা। এইজন্যেই কবি আমাদের হয়ে, মানুষের হয়ে বলেন—'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়'।

প্রশ্ন জাগে মনে ঈশ্বর কি কেবল পূজারী ও মোল্লাতন্ত্রের? না হলে সামান্য নামাজের ছুতো তুলে অভুক্ত

ভিখারী-মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে যেমন তার বাধে না, তেমনি কোনো সংকোচ বোধ হয়না তার মুখের ওপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিতে। এমনকি কোনো দ্বিধা বোধ করেন না 'মর গো-ভাগারে' বলে অপমান বা তাচ্ছিল্য করতে। কবি-ভাষাতেই যা স্পষ্ট চিত্রিত হয়েছে। যেমন—

এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্
বলে, ''বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি নিয়ে সাত দিন!''
তেরিয়া হইয়া হঁকিয়া মোল্লা—'ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা',
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস্ বেটা?'

মোল্লা বা পূজারীর এ আচরণে রিক্ত-নিঃস্ব হতদ্ররিদ্র মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় পিষ্ট হয়ে উপলব্ধি করেন, মন্দির-মসজিদে মানুষের প্রকৃত কোনো দাবি নেই। মন্দির-মসজিদে কেবল একমাত্র মোল্লা ও পূজারীদের একচ্ছত্র অধিকার। এ কারণেই দৃপ্তকণ্ঠে জেহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হন দরজা ভেঙে ফেলার জন্য। যে বন্ধ দরজা কেবল সংকীর্ণতা ধর্মভাবের ও অবিশ্বাসের, যে দরজা এক শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিকারীর, সেই দরজা—

কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চলো হাতুড়ি শাবল চালা।

ধর্ম ব্যাপারটার আসল সার্থকতা মানবিক সুউচ্চ বোধে প্রেম ও ভালোবাসায়, ধর্মের গোঁড়ামি অনুশাসনের নয়-এ সত্য কবি নজরুল তার হৃদয়ের মানবিকতার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মোল্লা ও পুরোহিতদের ভণ্ডামির মুখোশটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন হাতুড়ি আর শাবলের ঘায়ে তালা লাগানো ভজনালয়ের দরজা ভেঙে ফেলতে।

মানুষকে ঘৃণা করেই যে কতিপয় মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভণ্ডধার্মিকের দলে নাম লিখিয়ে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ধর্মের অনুশাসনগুলি নিজেদের ইচ্ছেমতো সমাজবদ্ধ মানুষের চাপিয়ে দেয়-তা কবির দষ্টি এড়ায়নি। অথচ, ভণ্ডধার্মিকরা ধর্মের দোহাই দিয়েই কিন্তু প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে বেদ-কোরান-বাইবেলের কথা বলে সমাজের বুকে যে জ্ঞান বিতরণ করেন—তা এরকম দ্বিচারিতা। কেননা, এসব গ্রন্থ এসেছে মানুষেরই হাতেই। কোনো অদৃশ্য দেবতার হাতে নয়। কবির খেদোক্তিতেই তা ব্যক্ত হয়েছে—

যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! —মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,-গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!

পুরোহিত ও মোল্লাতন্ত্র বেদ-কোরান ও বাইবেলের সারসত্যকে না বুঝে মানুষদের মধ্যে নিজেরাই তাদের মনগড়া কতকগুলো অনুশাসন জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়। যার ফলে সমাজে তৈরি হয় অসম অবস্থার।

আমরা জানি কবি নজরুল মানবতাবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কবি ছিলেন বলেই তিনি আজকের মানুষকে আদম দাউদ ঈষা মুসা ইব্রাহিম মোহম্মদ কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবিরের উত্তরাধিকার রূপে পরিগণিত করেন। কাজেই,

আজকের মানুষ কবির কাছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বরেরই সমতুল। 'মানুষ মানুষের জন্যই' এ সত্য কবি জানেন বলেই কবির কাছে পাপী-তাপী কোনো মানুষও অচ্যুত বা অস্পৃশ্য নয়। কবির কাছে তা তাই নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ হয়ে যায়—

তবু জগতের যত্র পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!

বলতে নেই, এমন পবিত্র দেহমন্দিরেই জন্ম নেয় মহামানবেরা। কবি-কথাতেই যা ইঙ্গিতবাহীরূপে উদ্‌ভাসিত—

ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কন? নহে ও ঘৃণ্যজীব!
ওই হ'তে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।

চণ্ডালের মধ্যেই মিলেমিশে থাকেন রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং স্বয়ং শিব। আজ যাকে আমরা অবহেলা করছি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞানে, কাল হয়তো তাকেই পূজা করতে হবে আমাদের।

কেননা, আমরা কেউই জানিনা রাখাল বা চাষার মধ্যে মূর্ত প্রকাশ ঘটতে পারে ব্রজের গোপাল, অর্থাৎ আমাদের আরাধ্য কৃষ্ণ ও বলরামের। বলতে কুণ্ঠা নেই, এখানে সাম্যবাদী কবি নজরুলের মনে যে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া লেগেছে, তা কিন্তু এসেছে মানবতাবাদীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের জন্য।

৫.১.৩.৭ : সমালোচনা

অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক তরুণ মুখোপাধ্যায় ''নজরুল ও সঞ্চিতা'' গ্রন্থে 'মানুষ' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'বঙ্কিমচন্দ্র-তাঁর 'বিড়াল' প্রবন্ধে কৃপণ ধনীকে চোরের চেয়েও ঘৃণ্য, শাস্তিযোগ্য মনে করেছিলেন। নজরুল আরো একধাপ এগিয়ে এসে ঘোষণা করেন, এই বঞ্চনা কোনোদিন ক্ষমা পবে না—'সে মোর রহিম জনা' উক্তিতে প্রতিশোধ নেওয়ার ইঙ্গিত আছে।' যারা মানুষের মধ্যে নিহিত আছে যে দেবতা ও প্রেম ভালোবাসা, যা নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহৃত করে তাদেরকে ছিবড়ে করে দিয়ে পথের ভিখারী করে দেয়— তারা জানে না এই পাপের ফলভোগ তাদেরকে একদিন করতে হয়। প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার দেব 'কবি নজরুল ও সঞ্চিতা' গ্রন্থে মানুষ কবিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে এখানে 'নজরুল মানুষকে ঈশ্বর রূপে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন।' আসলে সর্বদেশের সর্বকালের সমস্ত মানুষের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের সমান আত্মীয়তা অনুভব করেন। এই সমানুভূতি 'মানুষ' কবিতায় নজরুলীয় সাম্যবাদের শিকড় প্রোথিত করে দিয়েছে। তাই আজ আর আমাদের বলতে সংকোচ নেই যে, নজরুলই প্রথম আমাদের দেশের একজন প্রকৃত বিশ্বমুখীন সাম্যবাদী কবি। যা তাঁর 'মানুষ' কবিতায় গভীরতা পেয়েছে।

৫.১.৩.৮ : শিল্পসুষমা

'মানুষ' কবিতাটি ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। যা নজরুলের প্রিয় ছন্দ। যদিও কবিতাটিতে কবির বক্তব্য বক্তৃতার আকারে আবেগঘন প্রকাশ ঘটেছে। তবু কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে কবি-মনের অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে তা বেশ রসোত্তীর্ণ।

অন্যদিকে বক্তৃতাধর্মী প্রবল হওয়ার জন্য এর অলঙ্করণ সেভাবে চোখে পড়ে না। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

১. অনুপ্রাস :

ক) জীর্ণবস্ত্র শীর্ণপাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ

খ) ও কারা কোরাণ, বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি

২. উপমা :

যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়

ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

৩. রূপক :

ক) তোমার মৃত্যুবাণ

খ) তোমারি কামনা রাণী

গ) দু'চোখে স্বার্থ ঠুলি।

৪. নিশ্চয় : মানুষ এনেছে গ্রন্থ : গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

৫. ব্যতিরেক : মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

একটি সুন্দর চিত্রকল্পও নির্মাণ করেছেন কবি। যেমন—'তিমির রাত্রি পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মাণিক জ্বলে'।

এমনকি, শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও নজরুল তাঁর কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাচুর্য। যেমন—ক্ষুধা, পান্থ, ক্লেদাক্ত, ভূখারী, আজরিন চিন, শির্‌ণী, গোস্ত, ভ্যালা, ল্যাঠা, তেরিয়া, ঠুলি, মথিত ইত্যাদি।

সবশেষে এভাবে সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেহেতু নজরুল মানবতাবাদের পূজারী, তাই তিনি তাঁর সাম্যবাদের জয়গানকে ঘোষিত করার লক্ষ্য নিয়ে সাদামাটা কথায় 'মানুষ' কবিতাটি রচনা করেছেন বৃহৎ সমষ্টিগত সাধারণ মানুষের বোধগম্যের কথা ভেবে। কোনো মননঋদ্ধ শিল্পসুষমার দিকে ঝোঁকেননি। সহজ-সরল গদ্যকেই তাঁর কবিতার বাহন করে নিয়েছেন ভাষা হিসাবে। যদিও আমরা জানি কবিত্ব অপেক্ষা বড় করে দেখা দিয়েছে কবি মনের আবেগ।

৫.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'সঞ্চিতা' সংকলনটি কোন কবির কবিতা সংকলন?

২. 'মানুষ' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

৩. 'মানুষ' কবিতাটিতে কবি নজরুলের যে মানবতাবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

৪. সাম্যবাদ, নজরুলের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বক্তব্যটি কতদূর সমর্থনযোগ্য 'মানুষ' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।

৫. 'মানুষ' কবিতার ভাববস্তু আলোচনা করো।

৫.১.৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সঞ্চিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. নজরুল মানস—সনজিদা খাতুন।

৩. আধুনিক কবিতার দিগবলয়— অশ্রুকুমার সিকদার।

৪. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠি।

৫. আধুনিক বাংলা কাব্য— তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৬. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮)—আশোককুমার মিশ্র।

৭. কবিতার কী ও কেন —নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৮. কবিতার ক্লাস— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৯. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা—বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়।

একক ২

বনলতা সেন

বিন্যাসক্রম

৫.১.২.১ : কবি পরিচয়

৫.১.২.২ : কাব্যগ্রন্থ

৫.১.২.৩ : বনলতা সেন

৫.১.২.৪ : রচনা প্রকাশের ইতিহাস

৫.১.২.৫ : নামকরণ

৫.১.২.৬ : কাঠামো এবং রচনাকৌশল

৫.১.২.৭ : ভাববস্তু

৫.১.২.৮ : সাহিত্য সমালোচনা

৫.১.২.৯ : অনুবাদ

৫.১.২.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১.২.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.২.১ : কবি পরিচয়

জীবনানন্দ দাশ (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯-২২ অক্টোবর, ১৯৫৪; ৬ফাল্গুন, ১৩০৫–৫ কার্তিক, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল ইসলামের প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এংব ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতে পরিণত হয়েছেন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ জীবনানন্দের কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়, তাতে তিনি 'রূপসী বাংলা কবি' অভিধায় খ্যাত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে নির্জনতম কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁকে শুদ্ধতম কবি বলেছেন। সমালোচকদের অনেকে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ও

নজরুল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি বলে মনে করেন। জীবনানন্দের *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত (১৯৫৩) হয়। ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থটি ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মাঝে রয়েছে রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি।

জীবনানন্দ দাশ প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ২১টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যার একটিও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকালে অনপনেয়ভাবে বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে।

৫.১.২.২ : কাব্যগ্রন্থ

জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে কেবল প্রথম প্রকাশনায় বৎসর উল্লিখিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। এর দীর্ঘ কাল পর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পুণ্ডুলিপি*। ইত্যবসরে কবির মনোজগতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি রচনাকৌশলও অর্জন করেছে সংহতি এবং পরিপক্কতা। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বনলতা সেন* প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ। এটি “কবিতাভবন সংস্করণ” নামে অভিহিত। সিগনেট প্রেস বনলতা সেন প্রকাশ করে ১৯৫২-তে। *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ সহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ *মহাপৃথিবী* ১৯৪৪-এ প্রকাশিত। জীবনানন্দর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮)। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবির মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো ১৯৫৭-তে প্রকাশিত রূপসী বাংলা এবং ১৯৬১-তে প্রকাশিত বেলা অবেলা কালবেলা। জীবনানন্দ দাশ *রূপসী বাংলার* পাণ্ডুলিপি তৈরি করে থাকলেও জীবদ্দশায় এর প্রকাশের উদ্যোগ নেন নি। তিনি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম নির্ধারণ করেছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশকালে এর নামকরণ করা হয় “রূপসী বাংলা”। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতাবলি নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলো হলো— *সুদর্শনা* (১৯৭৩), *আলো পৃথিবী* (১৯৮১), *মনোবিহঙ্গম*, হে প্রেম তোমার কথা ভেবে (১৯৯৮), *অপ্রকাশিত একান্ন* (১৯৯৯) এবং *আবছায়া* (২০০৪)।

কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আকর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। অব্যবহিত পরে গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মান্নান সৈয়দের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত আরো কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষেত্র গুপ্ত ২০০১-এ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশে কাব্য সমগ্র। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ভূমেন্দ্র গুহ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আকর গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ।

৫.১.২.৩ : বনলতা সেন

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তম কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম বনলতা সেন। কবিতাটির রচয়িতা বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশ। বনলতা সেন প্রধানত রোমাণ্টিক গীতি কবিতা হিসেবে সমাদৃত।

৫.১.২.৪ : রচনা-প্রকাশের ইতিহাস

বনলতা সেন কবিতাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত কবিতার পৌষ, ১৩৪২ সংখ্যার মাধ্যমে বনলতা সেন সর্বপ্রথম পাঠকের হাতে এসে পৌঁছায়। জীবনানন্দ দাশ বাংলা ১৩৪৯, ইংরেজি ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বনলতা সেন নামক তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি অন্তভুক্ত করেন। কবিতা-ভবন কর্তৃক প্রকাশিত ''এক পয়সায় একটি'' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। প্রকাশক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ নিজেই। ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মোট ১২টি। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন শম্ভু সাহা। পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাশ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ কাব্য মহাপৃথিবীতে উক্ত বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতাই অন্তভুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ ''মহাপৃথিবী'' কাব্যগ্রন্থেরও প্রথম কবিতা ছিল 'বনলতা সেন'।

কবির জীবদ্দশায় বাংলা শ্রাবণ, ১৩৫৯, ইংরেজি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। ৪৯ পৃষ্ঠার বর্ধিত কলেবর প্রকাশিত সংস্করণে আগের ১২টি কবিতার সাথে আরও ১৮টি কবিতা যোগ করে মোট ৩০টি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। মূল্য ছিল ২ টাকা। সিগনেট সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠকবিতা গ্রন্থটিতেও কবিতাটি সংকলিত হয়। এছাড়া আবু সায়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আধুনিক বাঙলা কবিতাশীর্ষক গ্রন্থেও কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছিল। কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত পুণ্ডুলিপিসমূহের ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ চিহ্নিত ৮নং খাতায় এ কবিতাটি আছে। তাই, পুণ্ডুলিপির হিসেবে, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

কবিতাটি প্রকাশের সময় সিটি কলেজে টিউটরের চাকুরি হারিয়ে বেকার জীবনানন্দ সম্পূর্ণ নি:স্ব অবস্থায় কোলকাতায় দিনাতিপাত করছিলেন। এ ঘটনার মাত্র কয়েক বৎসর আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রীর সাথে বনিবনা হবে না কোনোদিন তা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

কবিতাটি সঠিক পাঠ নিয়ে প্রশ্ন আছে, কেননা ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। যদিও সেসবের পার্থক্য ব্যাপক কিছু নয়। তবে ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির কবিতা শীর্ষক গ্রন্থের পাঠটি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

৫.১.২.৫ : নামকরণ

আপাতদৃষ্টিতে 'বনলতা সেন' একটি প্রেমের কবিতা যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বনলতা সেন নাম্নী কোনো এক রমণীর স্মৃতি রোমন্থন। শুরু থেকেই পাঠকের কৌতুহল বনলতা সেন কী বাস্তবের কোনো নারী নাকি সম্পূর্ণ কল্পিত একটি কাব্যচরিত্র। এ কবিতার তিনটি স্তবকের প্রতিটির শেষ চরণে বনলতা সেন নামের এক নারীর উল্লেখ আছে।

প্রথম স্তবকের শেষ চরণ : ''আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন"

দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণ : ''পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন", এবং

তৃতীয় স্তবকের শেষ চরণ : ''থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'।

বনলতা সেন ছাড়াও জীবনানন্দের কাব্যে বেশ কিছু নারী চরিত্রের উপস্থিত আছে, যেমন শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সরোজনী, শেফালিকা বোস, সুজাতা ও অমিতা সেন। তবে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অন্তরালবাসী 'কারুবাসনা' নামীয় উপন্যাসে প্রথম 'বনলতা সেন' নামটি পাওয়া যায়। অধিকন্তু 'হাজার বছর ধরে খেলা করে', 'একটি পুরোনো কবিতা' এবং 'বাঙালি পাঞ্জাবী মারাঠি গুজরাটি' শার্ষক আরও তিনটি কবিতায় এ নামটি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কারুবাসনা উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে, কবির মৃত্যুর বহুকাল পর। এর ভাষা-ভঙ্গিতে অনবগুণ্ঠিত আত্মজৈবনিকতা সেকালের পাঠক মনে বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল। বনলতা সেন রক্ত মাংসের কোনও মানবী না-কি নিছকই কল্পিত কোনও কবিতাশ্রিত নারী এ প্রশ্নটি অবসিত না-হলেও রহস্যের কিনারা হয়েছে কিছু। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি উদ্ধারক ডা. ভূমেন্দ গুহ কবির 'লিটেরেরি নোটস' গবেষণা করে জানিয়েছেন যে কবির জীবনে প্রেম এসেছিল সন্দেহ নেই। দিনলিপি বা লিটেরেরি নোটস-এ ওয়াই (Y) হিসেবে উল্লিখিত মেয়েটিই কবির কাঙ্ক্ষিত নারী। বাস্তবে সে শোভনা-কবির এক কাকা অতুলান্ত দাশের মেয়ে-যার ঘরোয়া নাম বেবী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লাবণ্য দাশকে বিয়ের আগেই এই বালিকার প্রতি যুবক জীবনানন্দ গভীর অনুরাগ করেছিলেন। একটি উপন্যাসে শচী নামেও একে দেখতে পাওয়া যায়। শোভনাকে নিয়ে জীবনানন্দের অনুরাগ উন্নীত হয়েছে অনুক্ত প্রেমে, লাবণ্য দাশের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন আদৌ সুখকর না-হওয়ায় এই প্রেম তীব্রতর হয়ে ক্রমশ এক প্রকার অভিভুতিতে পর্যবসিত হয়েছিল।

৫.১.২.৬ : কাঠামো এবং রচনা কৌশল

নাতিদীর্ঘ আঠারো পংক্তির নিরেট স্থাপত্যের এই গীতিকবিতায় রয়েছে ছয় পংক্তির তিনটি স্তবক। প্রথম স্তবকে কবি মূলত নিজের কথা বলেছেন, দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন এক ঝলক দেখা প্রিয় মুখের কথা এবং তৃতীয় স্তবকে বলেছেন একটি স্বপ্নের কথা। কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের প্রিয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারে রচিত। তবে পর্ব বিন্যাসে সমতা রক্ষা করা হয়নি।

প্রথম স্তবকের প্রতি পংক্তি তিন পর্বের, যার মাত্রা বিন্যাস ৮ + ৮ + ৬। ৮ মাত্রার একটি পর্ব মধ্যভাগে থাকার কারণে এ স্তবকের ছন্দবিন্যাসকে মহাপয়ার পর্যায়ী বলা যায়।

দ্বিতীয় স্তবকে বিভিন্ন পংক্তির পর্ব বিন্যাস বিভিন্ন, যেমন—৮ + ৮ + ২; ৪ + ৮ + ১০; ৮ + ৬, ৮ + ৮ + ১০; ৮ + ৮ + ১০; ৮ + ৪ + ৪ + ১০ এবং ৮ + ৮ + ১০।

তৃতীয় স্তবকের পর্ব ও মাত্রা বিন্যাস এরকম : ৮ + ১০; ৪ + ৮ + ৬; ৮ + ৪ + ১০; ৮ + ১০; ৮ + ৪ + ৮ + ৬ এবং ৮ + ৮ + ৬ পয়ারে বা অক্ষরবৃত্তের এরূপ সূত্রহীন ব্যবহার সত্ত্বেও কবিতাটির সঙ্গীতময়তা অতুলনীয়। এ কারণে অনুমতি হয় যে শব্দবিন্যাস এদিন-সেদিক করে কবিতাটির সঠিক পর্ববিন্যাস নির্ণয় করা আবশ্যক।

৫.১.২.৭ : ভাববস্তু

কবিতাটির প্রথম স্তবকে হাজার বছর ব্যাপী ক্লান্তিকর এক ভ্রমণের কথা বলেছেন কবি তিনি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে ফিরেছেন—যার যাত্রাপথ সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর অবধি পরিবাপ্ত। তার উপস্থিতি ছিল বিম্বিসার অশোকের জগতে যার স্মৃতি আজ ধূসর। এমনকী আরো দূরবর্তী বিদর্ভ নগরেও স্বীয় উপস্থিতির কথা জানাচ্ছেন কবি। এই পরিব্যাপ্ত ভ্রমণ তাকে দিয়েছে অপরিসীম ক্লান্তি। এই ক্লান্তিময় অস্তিত্বের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য শান্তির ঝলক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বনলতা সেন নামের এক রমণী। কবি জানাচ্ছেন সে নাটোরের বনলতা সেন। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলাত সেনের আশ্চর্য নান্দনিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। বনলতা সেনকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ধকারে। তার কেশরাজি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, “ চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা”, মুখায়ব প্রতীয়মান হয়েছে শ্রীবস্তীর কারুকার্যের মতো। বনলতাকে দেখে গভীর সমুদ্রে হাল-ভাঙ্গা জাহাজের দিশেগুারা নাবিকের উদ্ধারলাভের অনুভূতি হয়েছে কবির, যেন একটি সবুজ ঘাসের দারুচিনি দ্বীপ সহসা ঐ নাবিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বনলতা সেনও তার পাখির নীড়ের মতো আশ্রয়ময় চোখ দুটি তুলে জানতে চেয়েছে, “এতদিন কোথায় ছিলেন?”

তৃতীয় স্তবকটি স্তগতোক্তির মতো মৃদু উচ্চারণে একটি স্বপ্ন-উন্মোচনের কথা শোনা যায়। কবি জানাচ্ছেন (হেমন্তের) দিন শেষ হয়ে গেল সন্ধ্যা আসে, ধীরে, ধীরলয়ে শিশিরপাতের টুপটাপ শব্দের মতো। তখন (দিনভর আকাশচারী) চিলের ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে যায়। এ সময় পাখিদের ঘরে ফিরে আসার তাড়া, এসময় (যেন) সব নদীরও ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা। পৃথিবীর সব আলো মুছে যায়, অন্ধকারে কেবল কয়কেটি জোনাকি জ্বলে। সারাদিনের জাগতিক সব লেনদেন সমাপ্ত হয়েছে, গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরি, তখন (কেবল) অন্ধকার বনলতা সেনের মুখোমুখি বসে গল্প করার অবসর।

৫.১.২.৮ : সাহিত্য সমালোচনা

‘বনলতা সেন’ কবিতাটি সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক পঠিত বাংলা কবিতাগুলোর একটি। জীবনানন্দের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার বেশ আগেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ শেষ দিককার

কবিতায় যে দুর্গম সান্ধ্যভাষা পরিলক্ষিত হয় এ কবিতায়ও তা অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এমনই এক দুর্মর রোমান্টিকতা কবিতাটির অবয়বে পরিব্যপ্ত যা পাঠককে সহজে আচ্ছন্ন করে, ফলে কবিতাটির আন্তর্ভাষ্য নিয়ে চিন্তায় প্রণোদনা পাঠকের হৃদয়ে সহজে প্রশ্রয় লাভ করে না। সাধারণ পাঠকের কাছে এটি নিছকই একটি প্রেমের কবিতা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে, অথচ এর মর্মমূলে রয়েছে সুগভীর ঐতিহাসিকতা।

■ **এলান পো'র টু হেলেন-এর সঙ্গে সাযুজ্য**

এ কবিতাটির বিভিন্ন আলোচনায় বলা হয়েছে যে এডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' (বাংলা হেলেনের প্রতি) কবিতাটির সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে জীবনানন্দ দাশ এই কবিতাটি পড়ে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে 'বনলতা সেন' এবং 'টু হেলেন'-এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.১.২.৯ : অনুবাদ

সেই পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি নানা হাতে 'বনলতা সেন' কবিতাটি বহুবার অনুদিত হয়েছে। প্রথম অনুবাদটি করেছিলেন মার্টিন কার্কম্যান, যা একটি কবিতা সংকলনে গৃহীত হয়েছিল। অব্যবহিত পরেই কবি নিজে করেছেন এর অনুবাদ। আরও যাদের হাতে কবিতাটি অনুদিত হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সনৎ ভট্টাচার্য্য, পুরুষোত্তম লাল ও শ্যামশ্রী দেবী, ম্যারি ল্যাগো (তরুণ গুপ্তর সহযোগে), চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হায়াৎ সাইফ, মুকুল শর্মা, ক্লিনটন সিলি, আনন্দ লাল, সুকান্ত চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, অনুপম ব্যানার্জী, অঞ্জন বসু, ফখরুল আলম, জো উইন্টার, অরুণ সরকার, ডি কে ব্যানার্জী, অমিতাভ মুখার্জী এবং জয়দেব ভট্টাচার্য্য। অনুবাদগুলো পাঠ করলে অনুবাদকদের উপলব্ধির প্রভেদ এবং মর্মার্থ অনুধাবনে ভিন্নতা প্রতিভাসিত হয়। সুজিত মুখার্জী তাঁর *ট্র্যান্সলেশন এড ডিসকভারী* (১৯৯৪) শীর্ষক গ্রন্থে ৬টি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ মার্টিন কার্কম্যানকৃত অনুবাদে ''পাখির নীড়ের মতো চোখ'' কথাটির আক্ষরিক অনুবাদে আপত্তি জানিয়েছিলেন। অধিকাংশ অনুবাদক প্রথম ছত্রের (''হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'') হাজার বছর ব্যাপী পথ চলাকে ঘটমান বর্তমান কাল হিসেবে অনুবাদ করেননি। তৃতীয় স্তবকের দুটি লাইন ''পৃথিরীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন/ তখন গল্পের তবে জোনাকির রঙে ঝিলমিল''-এর মর্মার্থ রূপায়নে সক্ষম হয়নি অনেক অনুবাদক : ''পুণ্ডুলিপি করে আয়োজন'' বা 'গল্পের তরে'' কথার অর্থ স্বতঃস্ফুট নয়।

৫.১.২.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বনলতা সেন কবিতাটির রচয়িতা কে? কোন কাব্যের অন্তর্গত?

২. বনলতা সেন কবিতাটির রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস বর্ণনা করো।

৩. কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৪. বনলতা সেন কবিতাটির ভাবসৌন্দর্য আলোচনা করো।

৫. জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেন কবিতাটির ভাববস্তু অবলম্বনে এর কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো।

৬. বনলতা সেন কবিতাটির কয়েকজন অনুবাদকের নাম লেখো।

৫.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বনলতা সেন— জীবনানন্দ দাশ।

২. কবিতার কথা— জীবনানন্দ দাশ।

৩. আধুনিক কবিতার দিগবলয়— অশ্রুকুমার সিকদার।

৪. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠি।

৫. আধুনিক বাংলা কাব্য— তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৬. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-৩০০৮)— অশোককুমার মিশ্র।

৭. কবিতার কী ও কেন— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৮. কবিতার ক্লাস— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৯. জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল— সুমিতা চক্রবর্তী।

পর্যায় গ্রন্থ : ১

কবিতা

একক ৪.

শক্তি চট্টোপাধ্যায় – অবনী বাড়ী আছো,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - কেউ কথা রাখেনি

বিন্যাসক্রম :

১.৪.১ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিজীবন

১.৪.২ : ‘অবনী বাড়ী আছো’ কবিতার উৎস

১.৪.৩ : ‘অবনী বাড়ী আছো’ বিষয়বস্তু

১.৪.৪ : ‘অবনী বাড়ী আছো’ কবিতার গঠন

১.৪.৫ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিজীবন

১.৪.৬ : ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতার উৎস

১.৪.৭ : ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতার বিষয়বস্তু

১.৪.৮:‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতার প্রেক্ষিত

১.৪.৯ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১.৪.১০ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.৪.১ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিজীবন

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩, ২৭ নভেম্বর – ১৯৯৫, ২৩ মার্চ) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বহড়ু গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বামানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম কমলা দেবী। তিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতার বাগবাজারে এক জন স্কুল শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি প্রথম মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৯৫১ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৬ সালের মার্চে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় তাঁর যম কবিতাটি ছাপা হয়। পরে তিনি কৃত্তিবাস ও অন্যান্য পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কের ইতি টানেন।

১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায়। শেষোক্ত তিন জনের সঙ্গে সাহিত্যিক মতান্তরের জন্য ১৯৬৩ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম উপন্যাসের নাম ছিল কুয়োতলা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৭), সোনার মাছি খুন করেছি (১৯৬৮); অন্ধকার নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকার (১৯৬৮); হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯); চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৯৭০); পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি (১৯৭১); প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (১৯৭২); জ্বলন্ত রুমাল (১৯৭৫); সুন্দর এখানে একা নয় (১৯৭৬); ভাত নেই পাথর রয়েছে (১৯৭৯); যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮৩) ইত্যাদি।
কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ পুরস্কার ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

১.৪.২: 'অবনী বাড়ী আছো' কবিতার উৎস

শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অবনী বাড়ি আছো' মাত্র বারো পঙ্‌ক্তির রসোত্তীর্ণ কবিতা। এটি তার 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে (আশ্বিন ১৩৭২ বঙ্গাব্দ) বীক্ষণ প্রকাশ ভবন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পাঠকপ্রিয়, বহুল প্রচারিত এবং আবৃত্তির কবিতা হিসেবে ব্যপক পরিচিত।

আগস্ট ১৯৭৩ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'অবনী বাড়ি আছো' শিরোনামে একটি উপন্যাসও প্রকাশ করেন।

১.৪.৩: 'অবনী বাড়ী আছো' কবিতার বিষয়বস্তু

অবনী বাড়ি আছো কবিতাটি এক বর্ষামুখর রাতের কবিতা, যেখানে কবি নিজেকেই অবনী চরিত্র রূপে প্রকাশ করেছেন। তবে এ কবিতা রচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, নির্জন বাড়িতে মহুয়ার বোতলকে সঙ্গী করে কবি যখন সামনে মেঘদূত মালাকে দেখলেন তখন তার মনে হলো অসংখ্য গরু যেন যাত্রা করেছে। মেঘেরা গাভির মতো চড়ে বেড়াচ্ছে। অবনী দুয়ার এঁটে ঘুমিয়েছে, কে বা কারা যেন তার দরজার কড়া নাড়ছে। কে যেন তাকে ডাকছে আয় আয়। অবনী যেতে চায় নি। অবনী বলছে তুমি আমায় ডাকছো আমি চলে যেতে পারি। কিন্তু কেনো যাবো?

আমারতো একটা ছোটো শিশুসন্তান রয়েছে, ওর মুখ ধরে চুমু খাবো। এই যে পারিবারিক মায়া-মমতা কবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাচ্ছে।

পরক্ষণেই হয়ত কবি আবার বুঝতে পারলেন যে, সে ইচ্ছে করলেই থাকতে পারবে না। চলে তার যেতে হবে। কোনো মমতার বন্ধন সন্তানের লাবণ্যময় মুখ তাকে আঁকড়ে রাখতে পারবে না। এ সব ভেবে কবি আবার বললেন, আমি যাবো কিন্তু এখনি যাবো না—

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে–
'অবনী বাড়ি আছো?'

১.৪.৪: 'অবনী বাড়ী আছো' কবিতার গঠন

কবিতাটি পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

দুয়ার এঁটে / ঘুমিয়ে আছে / পাড়া ৫+৫+২
কেবল শুনি / রাতের কড়া / নাড়া ৫+৫+২
'অবনী বাড়ি / আছো?' ৫+২

১.৪.৫ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিজীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪ - ২০১২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। কবিতা ও উপন্যাস দুই দিকেই ছিল তার অসাধারণ নৈপুণ্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলাদেশের মাদারীপুরে। তবে তিনি বড় হয়েছেন কলকাতায়। কেউ কথা রাখেনি, ভালোবাসি ভালোবাসি, হঠাৎ নীরার জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর বিখ্যাত কবিতা তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ পরবর্তী সময়ের অন্যতম প্রধান কবি।

১.৪.৬ : 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার উৎস

আলোচ্য কবিতাটি কবির 'বন্দী জেগে আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১.৪.৭: 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার বিষয়বস্তু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কবিতা ‘কেউ কথা রাখেনি’। কবি জীবনের বিভিন্ন পর্বে আপন জানা মানুষদের কথা না রাখার বেদনা ও যাতনা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি তেত্রিশটি বছর পার করেছেন।কবিতার একটি ঘটনা- মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, তুমি বড় হও দাদাঠাকুর, তোমাকে তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাব। কবির প্রশ্ন- নাদের আলি আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তবে কি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবে?

কবি বলেছিলেন, তার বয়স যখন তেত্রিশ পেরিয়ে গেছে তখন এমন অনুভূতি তাকে তাড়িত করেছে। তাই তিনি লিখলেন ‘কেউ কথা রাখেনি’। কবিতার কিছু অংশে কল্পনার সংমিশ্রণ থাকলেও পুরো কবিতাটিই বাস্তবতার আলোকে লেখা। কবিতায় বোষ্টমীর প্রসঙ্গ কাল্পনিক হলেও অবাস্তব নয়। কবি ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার আমগ্রামের মামাবাড়িতে। তখন পৈতৃক নিবাস কালকিনির মাইজপাড়ায়। সম্ভবত ১০-১১ বছর বয়সে অর্থাৎ দেশভাগের আগেই পরিবারের সঙ্গে চলে যান কলকাতা। তবু তিনি ভুলতে পারেননি শৈশবের স্মৃতি।

কবি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ‘পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায়’ থেকেছেন। সে সময় মনে হয়েছে তার মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলী তাকে বলেছিল, ‘বড় হও দাদাঠাকুর তোমাকে আমি/তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাব’। তিন প্রহরের বিলে সাপ আর ভ্রমরের প্রসঙ্গ এলে কবি মুচকি হেসে বললেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। মামারা যখন নৌকা নিয়ে বিলে যেত তখন আমিও বায়না ধরতাম। কিন্তু মামারা নিতেন না। ছোট্ট সুনীলকে ভয় দেখানোর জন্য বলতেন, সে বিলে যেতে-আসতে তিন প্রহর লেগে যায়। আর সেখানে ভয়ঙ্কর সাপ রয়েছে। সেই বোধ থেকেই বিলের নাম দেন তিন প্রহরের বিল। এবং সাপ আর ভ্রমরের খেলাটা বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য বলা। এ সময় আ জ ম কামাল অভিযোগ করে বললেন, কবি কবিতায় আপনি মুসলমানদের ছোট করেছেন। একটি মাত্র চরিত্র তাও আবার মাঝি। কবি তখনো হাসলেন। বললেন, তখন মুসলমানরা এখনকার মতো এত সচেতন ছিল না। আমি তাদের ছোট করিনি বরং তাদের পশ্চাৎপদতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তখনো মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মামাবাড়ির আশপাশের মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের বাড়ির কামলা খাটত বা নৌকা বেয়ে জীবিকা নির্বাহ করত।

কবিরা আর্থিকভাবে অতটা সচ্ছল ছিলেন না। মার্বেল খেলার জন্য একটা রয়্যাল গুলিও তিনি কিনতে পারেননি। তখন মাইজপাড়ার লস্কররা খুবই বিত্তবান ছিল। লস্করবাড়ির ছেলেদের লাঠিলজেন্স খেতে দেখে কবি বাবার কাছে বায়না ধরতেন। বাবা বলতেন, পরে কিনে দেব। কবি অপেক্ষায় থেকেছেন। বাবা স্কুলমাস্টার। বেতন কম। তাই তার মা কবিকে বলতেন, জীবনে অন্য কিছু করবে তবু মাস্টারি করবে না। তাই কবি কখনো মাস্টারি করতে যাননি।

রাস উৎসব প্রসঙ্গে কবি বললেন, তিনি ছেলেবেলায় খুব ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন। তাদের গাঙ্গুলিবাড়িতে যখন রাস উৎসব হতো তখন ভেতর বাড়িতে মহিলারা নাচ-গান করত। কবি তার ব্যাঘাত ঘটাবেন বলে তাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হতো না। নিজেকে অসহায় কল্পনা করে কবি এমন অভিব্যক্তি করেছেন। কবি তখন ভাবতেন, একদিন আমিও সব পাব। রয়্যাল গুলি, লাঠিলজেন্স আর রাস উৎসব সবই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু তার বাবা এসব

কিছুই দেখে যেতে পারেননি। আজ সুনীলের সব আছে কিন্তু তার স্কুলমাস্টার বাবা নেই। এই শূন্যতা তাকে বার বার গ্রাস করেছে।

কবিকে যখন বরুণা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবি তখন মুচকি হেসে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেন। তখন কবির সঙ্গে তার স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন। কবি শুধু এটুকু বললেন, এটা কল্পনা। বরুণা বলে কেউ ছিল না। তবে পরে আমরা জেনেছি, কবির এক বন্ধুর বোনের প্রতি কবির দুর্বলতা বা ভালোবাসা জন্মেছিল। কবি তার কোনো এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সে সময়ে একমাত্র বন্ধুর সুবাদে কেবল বন্ধুর বোনের সঙ্গেই কথা বলার বা ভাববিনিময়ের সুযোগ ছিল। হয়তো বরুণা তার কল্পনার নারী।

১.৪.৮:'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার প্রেক্ষিত

"কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি" এ যেন ধ্রুব সত্য। তেত্রিশ কেন তিনশো বছর পরেও রাখা-না রাখার এই শব্দবন্ধে যেন নিজেকেই প্রতিফলিত করতে পারবে পাঠক। আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে সর্বত্র আঁকিবুকি কেটে বেড়াচ্ছে ইতিহাস। কিন্তু বাঙালি বড্ড ইতিহাস বিমুখ। স্মৃতির কোনও এক নির্জন কোণে কিংবা বিস্মৃতির জীর্ণ এক পাতায় বাঙালি স্থান দেয় ইতিহাসকে। ইতিহাস ধরে রাখা তো দূরের কথা ইতিহাসটা খুলেও কেউ পড়ে না। এই আক্ষেপ বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্বের। অভিযোগ জমা পড়েছে তাঁর কাছেও। তাই তিনি ইতিহাস আর বর্তমানের মেলবন্ধনে গড়ে তুলেছেন একের পর এক সৃষ্টি। তিনি নীললোহিত।

কাশ ফুল দেখলেই বাঙালির মন কেমন করে। সে যেন আচমকাই শুনতে পায় ঢাকের বাদ্যি। সেবারেও হয়তো কাশফুল ফুটেছিল। স্বাধীনতার তেরো বছর আগে কাঁটাতারের ওপারের আমগাঁয় পুজোর তোড়ঝোড় তুঙ্গে। বাড়িটা মাটির, উপরে টিনের ছাদ, বৃষ্টি পড়লে দারুণ সুর হয়। সেই বাড়ির সামনেই অস্থায়ী আঁতুড়ঘরে মীরার কোল আলো করে এসেছিলেন বাঙালির সুনীল।

দিন কয়েক আগেই ফাঁসি হয়েছে মাস্টারদার। সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তখন ভাটা এসেছে। দেশের নেতা তখন গান্ধীজি। বিশ্বে অবশ্য হিটলারি চলছে। এমনই প্লটে বেড়ে ওঠেন বাঙালির নয়নের মণি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আজকাল বোস্টনে কিংবা বার্মিংহামে যাকে নিয়ে লড়তে পারে আধুনিক বাংলা কাব্যজগত। তবে সুনীল বাবু কিন্তু নিজেকে খুব ধন্য মনে করতেন, কারণ তাঁর শৈশব জুড়ে গ্রাম-শহর দুইয়েরই মেলবন্ধন। ঠিক যেমন আজ খেয়েছি তো কাল খাইসি। আজ পাকা রাস্তায় মাথা ফাটছে, তো কাল কাঁটায় পা কাটছে।

বয়স তখন মেরে কেটে ৭, সেদিন স্কুল বন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গিয়েছেন। ছেলের দল প্রস্তুত বিবেকানন্দ রোডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মরদেহ দেখতে যাবে। কিন্তু ছোট্ট সুনীলের মনে প্রশ্ন, বিশ্বকবি কে? সুভাষচন্দ্র বসু সাহেবকে বোকা বানিয়ে লড়তে গিয়েছেন এটা জানা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তখন খুব একটা বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। কে জানত, ভবিষ্যতে এনার লেখায়ই বারবার ফিরে ফিরে আসবেন রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে গিয়েছে জাপান কলকাতায় দুটো বোমও ফেলে দিয়েছে। বাবার চাকরি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। অগত্যা ফিরতে হলো গ্রামে।

"একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনও! লাঠি লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনই তাঁর সৃষ্টির রশদ। তখন টাউন স্কুলে পড়ছেন তিনি, লস্করবাবু হেডমাস্টার। কোনও ক্রমে আলু সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটছে। তখন একথালা ভাতা অমৃত। আর হেডমাস্টারের ছেলে গল্প করে বলত ভোগবিলাসের কথা, আর লাঠি লজেন্স চুষতো। তাই হয়তো *বন্দি জেগে আছো* কাব্যগ্রন্থের ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতায় এই লাইন।

১.৪.৯ : আদর্শ প্রশ্নমালা

---

১. কবিজীবনের প্রেক্ষিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘অবনী বাড়ী আছো’ কবিতাটি ভাববস্তু আলোচনা করো।

২. ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

১.৪.১০ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

---

১. দশক পঞ্চাশ ও তিন কবি – তরুণ মুখোপাধ্যায়

২. আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় - অশ্রুকুমার সিকদার

৩. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় - দীপ্তি ত্রিপাঠী

৪. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা - বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়

একক ৬

কবি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম

৫.২.৬.১ : ভূমিকা

৫.২.৬.২ : কবি উপন্যাসের কাহিনী

৫.২.৬.৩ : নামকরণ

৫.২.৬.৪ : চরিত্র বিচার :

৫.২.৬.৪.১ : নিতাইচরণ

৫.২.৬.৪.২ : ঠাকুরঝি

৫.২.৬.৪.৩ : বসন্ত

৫.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.২.৬.১ : ভূমিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যে স্বনামধন্য শিল্পী। রাঢ়বঙ্গের সুদক্ষ চিত্রকর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জগতে এক স্বতন্ত্র কারিগর। তাঁর উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বাস্তব জীবনাশ্রয়ী প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত মানুষের বিবিধ সমস্যা, আর্থিক সংকট ও নিরাপত্তার অভাব লক্ষণীয় বিষয় ছিল। সেই পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে সর্বত্রই হাহাকার থাকা সত্ত্বেও তারা আশাহীন ছিলেন না। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''শশী, অপু অথবা শিবনাথ কিংবা শঙ্কর, প্রত্যেকেই পরস্পরের থেকে দূরে হলেও এদের সমস্যার একটা সাধারণ উৎস বিদ্যমান ছিল। জীবন সম্পর্কিত আশা বা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারা-না-পারা ব্যাপারটাই এদের জীবনের মুখ্য ব্যাপার। অপুর শিশুচিত্তে সুদূরের আহ্বান, অথবা শশীর নগর-স্বপ্নের সঙ্গে গাওদিয়ার সংঘর্ষ কিংবা শিবনাথের ধরিত্রীকে চেনার বাসনা জীবন সম্পর্কিত আশা—আকাঙ্খারই প্রমাণ'। (পৃ.২৪২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন, সময়ের অমোঘ নিয়মে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন অনিবার্য। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত্রতন্ত্র অপরদিকে পশ্চিমী নগরতন্ত্র—এক ধনতান্ত্রিক সমাজ চেতনার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলের জমিদার পরিবারের সন্তান, কাহার, বাগদী, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন কথাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

আবার বীরভূম জেলাতে প্রবলভাবে প্রবাহিত বৈষ্ণবধর্মের ধারাও। একান্নপীঠের একাধিক পীঠস্থান এই অঞ্চলে। বৈষ্ণবতীর্থ জয়দেব এর কেন্দ্র বিন্দু এই অঞ্চলের মানুষের রক্তে-মজ্জায়। আবার ঐ বীরভূমেরই নান্নুরে রয়েছেন স্বনামধন্য বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। যিনি নিজে দাস হয়েও রচনাগুণে দাস করেছেন সকলকে। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় সহাবস্থান ঘটেছে শ্যাম এবং শ্যামা দুইয়েরই।

বিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা উপন্যাসে ব্যাপক হারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ঐ সময় মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবন চেতনায় নানা দিক থেকে হতাশা প্রাধান্য পেয়েছে। ঐ সময় বাংলা সাহিত্যে তিনজন প্রধান ঔপন্যাসিককেও আমরা পেয়েছি। তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। যাঁদেরকে একসঙ্গে 'ত্রয়ী' বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলা হয়। যখন আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যেপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'(১৯২৯) উপন্যাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাস বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাস পাঠ করি, তখন নতুন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরিচিত হই। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''তিরিশের কাল বাঙালি মধ্যবিত্তের এই উপলব্ধির কাল যে, এই মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে, গ্রামীন মধ্যবিত্তের জীবন—রঙ্গমঞ্চে যবনিকা দুলছে, নতুন পালা নতুন করে বাঁধতে হবে। এইসময় এই তিনজন ঔপন্যাসিক তিন রকম ভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে অস্তিত্বের ভাষ্য ও বেঁচে থাকার মানে খুঁজে দেবার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনজনের মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে একটা বোধ, যার মূল কথা হল সঙ্কট। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন একটা শ্রেণীর সঙ্কট, বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন একটা অনুভূতির সঙ্কট, মানিক দেখিয়েছেন ব্যক্তির সঙ্কট অথবা জটিলতা। তারাশঙ্করের ইতিহাসবোধ, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধ ও মানিকের সমাজবোধ সেই জটিলতার ওপর আলো ফেলেছে"। (পৃ.২৪১)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে যেমন লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কার রয়েছে, তেমনি অকৃত্রিমতা ও ভাষার ঐশ্বর্যের পরিচয় হয়েছে প্রকাশিত। ঐ অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রাধান্য যেমন রয়েছে, তেমনি লোক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বীরভূমের মানুষদের সংস্কার, তাদের জীবনযাত্রা, সেখানকার রুক্ষ-শুষ্ক প্রকৃতি সবই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি হল— 'রসকলি', 'জলসাঘর', 'তারিণী মাঝি', 'নারী ও নাগিনী', 'ডাইনী', 'পৌষলক্ষী','কালাপাহাড়', 'অগ্রদানী', 'বেদেনী' প্রভৃতি। তিনি যেমন ছোটগল্প রচনা করেছেন, তেমনি উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের শিরোপা পেয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে 'নীলকণ্ঠ'(১৯৩৩), 'রাইকমল' (১৯৩৪), 'আগুন' (১৯৩৭), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'কবি' (১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'(১৯৪৭), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫২), 'কালান্তর' (১৯৫৬), 'বিচারক' (১৯৫৬), 'সপ্তপদী' (১৯৫৭), 'রাধা' (১৯৫৮), 'উত্তরায়ণ' (১৯৫৮), 'মহাশ্বেতা' (১৯৬০), 'যোগভ্রষ্ট' (১৯৬০), 'ভুবনপুরের হাট' (১৯৬৩), 'মঞ্জুরী অপেরা' (১৯৬৪), 'গন্না বেগম' (১৯৬৪) প্রভৃতি।

৫.২.৬.২ : কবি উপন্যাসের কাহিনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪০ খ্রিঃ 'কবি' নাম দিয়ে একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। গল্পটি প্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'কবি'কে গল্প থেকে উপন্যাসের রূপ দেন। 'কবি' উপন্যাসটি প্রথম ১৯৪৪ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচনে চোর-ডাকাত বংশের ছেলে নিতাইকে 'কবি' করে তুলেছেন। নিতাইকে অবশ্য কবি হয়ে ওঠার জন্য ব্যক্তিজীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল। বাপ-ঠাকুরদারা যে কাজ করতো, লোকের বাড়িতে চুরি করতো, নিতাই কিন্তু সে কাজ পছন্দ করেনি। তবে তার স্বভাব তার বাবা-কাকাদের মতো নয়। নিতাই সেই জীবন থেকে বেরিয়ে এসে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে হাজির হতে চেয়েছে। অবশ্য সেই পথ অতিক্রম করতে নিতাইকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত নিতাই নিজের কৃতিত্বের জোরে বাবুদের দ্বারা প্রশংসাও পেয়েছে—'তুই বেটা কবি—a Poet।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ডোম বলতে 'কবি' উপন্যাসে যাঁদের বুঝিয়েছেন, নিতাইচরণের পূর্বপুরুষ তা নয়। "ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী।" বীরবংশীরা কোম্পানীর আমলে ডাকাতে পরিণত হয়েছে। আর এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত হল গৌর ডোম। সে আবার সম্পর্কে নিতাইয়ের মাতামহ। গৌরের বাবা ছিলেন শম্ভু বীরবংশী। যিনি অনেকদিন আগে আন্দামানে দেহ রেখেছেন। আর নিতাইচরণের বাবা ছিল সিঁদেল চোর। উপন্যাসে দেখা যায়—"পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজেই জামাইকেই নাকি সে রাঢ়ের অন্ধকারে পথিক হিসেবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে।"

নিতাইচরণ যেখানে বসবাস করে, সেই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস। সেটি একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। সেই মহাপীঠে এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকেন। তাঁর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমার সময় সেখানে চামুণ্ডার পূজা হয়। সেই পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গনে মেলা বসে। মেলাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে জমজমাট কবিগানের পালাও গাওয়া হয়। এই অঞ্চলের দু'জন খ্যাতনামা কবিগান রচয়িতা হলেন, নোটনদাস ও মহাদেব পাল। তাঁরা এই আসরে কবিগান গাইবে বলে, মেলা কর্তৃপক্ষ আগাম জানিয়েছে। "কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না।" উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি নোটন দাস নগদ পনের টাকা প্রতি রাত্রে পাবে বলে অন্য কোথায় চলে গেছে, এখানে গান করতে আসেনি।

মহাদেব কবিয়াল একাই ক্ষিপ্ত জনগণকে কবিগান পাঠ করে শোনাবে বলে মনস্থির করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য একজন ঢুলী ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক ঐ সময়েই নিতাইচরণের কথা মনে হল, ও আসরে নিতাইয়ের আবির্ভাব ঘটল। "নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিন, পেশী দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।"

নিতাইচরণের গলাখানি বড় ভাল, তার উপর দোয়ারি করেও সুন্দর। তখন দর্শকাসন থেকে অনেকেই হাততালি দিয়েছে, নিতাইয়ের প্রশংসা করেছে। গ্রাম্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলকাতা প্রবাসী চাকুরে বাবুরা তখন গ্রামে এসেছেন, তারাও মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠান দেখেছেন। নিতাইয়ের প্রশংসায় ওনারাও আপ্লুত। —"He is a

poet". সেই পরিস্থিতিতে মোহন্ত হেসে হেসে বলতে লাগলেন, নোটনকবি, কবিগান করতে এল না বলে, আমরা নিতাইয়ের গান শুনতে পেলাম। কেননা সবার মুখে তখন একই কথা—"ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক!" কিন্তু নিতাইয়ের প্রশংসা শুনে মহাদেব কবিয়ালের ঈর্ষা হল। উনি তখন রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে, গালি গালাজ করে নিতাইয়ের বিরুদ্ধে কবিগান গাইতে লাগলেন—

"সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার-দীপান্তরে মরে।।
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, মানুষের আবার জাতের অহংকার কিসের জন্য। ডোম পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিতাই কবিগানের আসরে যেতে পারবে না বা কবিগান রচনা করতে পারবে না, তা তো নয়। লেখকের চোখে—"ডোম ও মানুষ বামুনও মানুষ।"

উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নিতাইয়ের সখ-আহ্লাদ কিছু নেই। তার পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে স্টেশনে রাজন পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। স্টেশনে কুলিগিরি করে যা অর্থ উপার্জন হয়, সেই দিয়েই কোনরকমে নিতাইয়ের জীবন চলে যায়। সত্যি-সত্যিই নিতাই একজন সাচ্চা ভালো মানুষ। উপন্যাসে দেখা যায়—"আজ্ঞে প্রভু, চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলিনা হুজুর, নেশা পর্যন্ত আমি করি না। জাত-জ্ঞাত মা ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার। ঘর তো ঘর, আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাজ্য করেছি একরকম।" কারণ নিতাই এর মামা গৌরচরণ এসব ভালোমানসিকতা একদম পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন নিতাইও তাদের মতো চুরি-ডাকাতি করবে। লেখাপড়া করে কি আর করবে। গৌরচরণ হঠাৎ একদিন নিতাই এর বই-খাতা পর্যন্ত ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর নিতাই তা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারপর গোঁসাইজীর বাড়িতে থাকবে বলে হাজির হয়। কিন্তু সেখানেও নানারকম অন্যায় দেখে সেই বাড়ি ত্যাগ করল। কেননা সে মুখ্যু মানুষ, তার কথার কে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু নিতাই যে মা চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছে সে জীবনে কোনও অন্যায় কাজ করবে না। তাই গোঁসাইদের বাড়ি ছেড়ে রাজেনের কাছে স্টেশনে এসে উপস্থিত হল।

বন্ধু রাজন এর সঙ্গে নিতাই স্টেশন চত্বরে থাকতে থাকতে তার বউয়ের বোন ঠাকুরঝির সঙ্গে পরিচয় হয়। রাজন যেমন শ্যালিকাটিকে ঠাকুরঝি বলে, তেমনি নিতাইও তাকে ডাকে ঠাকুরঝি। নিতাই প্রতিদিন ঠাকুরঝির কাছ থেকে এক পোয়া দুধ নেয়। ঠাকুরঝি দেখতে কালো হলে কি হবে, মেয়েটি বড় ভালো মনের। উপন্যাসে দেখা যায়—"কালো যদি মন্দ তবে বেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

তখন নিতাইচরণ মনে করিয়ে দেয়, কৃষ্ণকে দেখতে কালো, কোকিলও কালো রঙের। এমনকী মানুষের মাথার চুলও কালো। তাই ওসব না ভেবে যার যেটা কর্ম, করে যাও তাহলে সংসারে সুখ মিলবে। কেননা 'সংসারের সুখ ভালোবাসায়, মিষ্টি কথায়"। সেই পরিস্থিতিতে নিতাই, ঠাকুরঝির হাতে দুটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়ার

ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে—''নাও। কবিয়ালের হাতে ফুল নিতে হয়।'' নিতাই ও ঠাকুরঝির জীবন ধারণ পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয় তারা দু'জন—দু'জনকে ভালোবাসে। ঠাকুরঝি বিবাহিত নারী হলেও তাতে দোষের নয়। কেননা অবাধ্য মন কিছুতেই তা মেনে নিতে চায়না। তাই নিতাইয়ের কাছে ঠাকুরঝি চাঁদের মতো। তাকে না দেখলে নিতাইয়ের মন ছটফট করে। কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিতে দেখা যায়, নিতাই ঠাকুরঝিকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকী যেদিন নিতাই কাশী চলে গেল, আর গ্রামে ফিরে আসবে না। সেই কথা শুনে ঠাকুরঝি মারা গেল। তখন ঠাকুরঝি আকাশের চাঁদ হয়েই নিতাইয়ের মণিকোঠায় থেকে গেছে।

আবার উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নিতাই যেখানে গেছে, সেখানেই দু'একখানা করে বই কিনেছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জার গান, রামায়ণ, মহাভারত, মনসার ভাসান ইত্যাদি বই নিতাই এর দপ্তরে পাওয়া যায়। এমনকী নিতাই যে গান রচনা করে, তাও সে খাতায় লিখে রাখে। নিতাই নীচু কুলে জন্ম নিলেও তার জীবন ধারণ পদ্ধতি উচ্চু মানের। তাই নিতাই এত সব ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করতে চায় না।—''মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু।''

'কবি' উপন্যাসে আরেকজন মহিলার কথা আমরা জানতে পারি, সে হল বসন্ত। সবাই তাকে বসন বলে ডাকে। বসন্ত নিম্নশ্রেণীর দেহ ব্যবসায়িনী। ঝুমুর দলের মেয়ে হয়ে তাকে ঘুরতে হয়, সেইজন্য তার কোন লজ্জা নেই। বীরবংশীয় সন্তান নিতাই, বসনকে ভালোবেসে ফেলেছে। তবে নিতাই, বসন্তকে ভালোবাসলেও ঠাকুরঝি কে ভুলিল না। উপন্যাসে দেখা যায়—

''বঁধূ তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে।
ত্যেজি' জাতি-কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে''।

নিতাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে বসন আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে না। তবে আসরে মন দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। তার নৃত্য দেখে লোকেও মুগ্ধ হয়। আবার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে, বসন কান্না-কাটি করলে, নিতাই খুব কষ্ট পায়। নিতাই পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার করে বসন্তকে কথা দিয়েছিল, তাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবেনা। ''বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন। কয়টা দিন। ইহার মধ্যে বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি ভালবাসার শেষ করিতে পারিবে সে?''

এরপর নিতাই নতুন একটা গান বেঁধেছে, তারপর সেই গান বসন্তকে শোনানো হল। গান শুনে বসন্তের মন খারাপ।

''এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ-কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে?''

বসন্ত, এ গান শোনার পর কষ্ট পেয়েছিল। সে তখন নিতাইকে বলেছে, আমি তো ভাল আছি। তবু কেন তোমার মনে হল জীবন এত ছোট কেন। ''বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''কবি উপন্যাসে তারাশঙ্কর নিতাই, ঠাকুরঝি ও বসনের ত্রিভুজে জীবনের যে প্রাকৃত অপ্রাকৃত বেগ ও শ্রীকে বেঁধেছেন তা তাঁর অন্য উপন্যাসে দুর্লভ।'' (পৃ.২৫৭)

বসন যেহেতু ঝুমুর গানের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই তাদের দলকে এখানে-ওখানে যেতে হতো। তার উপর খাওয়া-দাওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। বসন আবার খুব মদ্যপান করতো। নিতাইও পারেনি, বসনকে মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে। তার ফলে বসনের মৃত্যু হয়েছে, তখন নিতাইয়ের গানটা বসনের জীবনে সত্যি হয়ে ধরা পড়েছে ‘‘হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ-যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে?” এর পর একরাশ হতাশা নিয়ে নিতাই ঝুমুরের দল ত্যাগ করে কাশী চলে গেল। সেখানে এক মা তাকে যা শেখালেন, তাতে তার চেতনা ফিরে এল। সেই মা নিতাইকে বললেন—‘‘সুখ সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।” নিতাই কবিয়াল মানুষ। তাই কম বয়সে কাশীতে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। মায়ের পরামর্শে নিতাই কাশী থেকে বিদায় নিয়েছে, তারপর দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে—‘‘তুমি কবিয়াল—গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, সুখ হবে।”

সত্যিই তো নিতাই কবিয়াল মানুষ। তাই কবিগান করে, কবির দল তৈরি করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া উচিত। সেইজন্য সে ভালোবাসার গানকেই বড় করে দেখবে এবং বাকি জীবনটা গানকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবে। নিতাইয়ের লক্ষ্য বিভিন্ন ধর্মস্থানে, বিশেষতঃ তারকেশ্বরে-কালীঘাটে গিয়ে মানুষকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া। এইভাবনা থেকে নিতাই বাড়ি ফিরে চণ্ডীতলায় মা চণ্ডীকে প্রণাম করতে গিয়ে মা কে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—

‘‘বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এই একই খেদ। জীবন এত ছোট কেনে?” তার কোন উত্তর নেই। আসলে লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে আমরাও সেই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, এই সংকটের মুখোমুখি আমরা সকলে। মানুষ শুধু শুধু ঝগড়া করে, আমার-আমার করে মারা মারি করে। কিন্তু এই পার্থিব জগতে সবার সঙ্গে পরিচয়ে ভালো ব্যবহারই আসল লক্ষ্য। নিজের কর্মের মধ্যে দিয়ে সেই সুন্দর মানসিকতার পরিচয় প্রদানই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা এই ছোট্ট জীবনে, কয়দিনের দেখাশোনায় হিংসাভুলে মানুষের মনের সবুজতা প্রকাশই গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের কাহিনীর অগ্রগতিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই জীবন আর্তিটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

৫.২.৬.৩ : উপন্যাসের নামকরণ

‘কবি’ (১৯৪২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাসে বীরভূমের নানা উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের ছবি এঁকেছেন। গল্প ও উপন্যাসের প্রাপ্ত চরিত্রগুলি লেখকের চোখে দেখা ঐ বীরভূম জেলায় বসবাসকারী বৈষ্ণব, বেদে, কাহার, বাগ্‌দী, সাঁওতাল, লাঠিয়াল ও মাঝি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর। তাদের কেউ সাপ খেলা দেখায়, কেউ মানুষকে ডিঙিতে করে নদী পার করে দেয়। কেউ বা কবিগান করে, কেউ আবার চাষ-বাস করে। এই সব বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের প্রতি লেখকের আন্তরিকতা ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ঐ সব জীবিকার মানুষেরা উপাদানের বৈচিত্র্য হিসেবে বারবার উঠে এসেছে।

আমরা জানি, বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের নামকরণ নানাভাবে হতে পারে। বিষয় ভিত্তিক, চরিত্র ভিত্তিক ও রূপক

সাংকেতিক উপায়ে নামকরণ হয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাইচরণের, নিতাই কবিয়াল হয়ে ওঠার কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। নিতাইচরণ, সিঁদেল চোরের পুত্র হয়েও কোনদিন চুরি করেনি। নেশা পর্যন্ত করে না, সে খুব ভালছেলে। বীরবংশী উপাধির পিছিয়ে পড়া মানুষ হয়েও নিতাই শিল্পী হতে চেয়েছে। তাদের সমাজের লোকজ প্রথা, লোক সংস্কার ত্যাগ করে নিতাই হয়ে উঠতে চেয়েছে কবিয়াল। তারজন্য নিতাইচরণকে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় —"রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইস্কুলে চলিয়াছে।" তখনকার দিনে সমাজের যারা নিরক্ষর মানুষ, তাদের জন্য সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হতো নাইট স্কুল পরিচালনার জন্য। এখন যেমন সরকার স্কুলের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য মিড ডে মিল চালু করেছে। 'কবি' উপন্যাসে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের আনন্দ বেদনার রোম্যান্টিক আলেখ্য রচনা করা হয়েছে। নিতাই কবিয়ালের পথ চলার কাহিনীতে 'প্রেম ও বিরহ-বেদনার সম্মিলন ঘটেছে।

নিতাইচরণের শুধু কবিগান নয়, যাত্রাগান, মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ভাললাগার বিষয় ছিল। তার যেমন ভালোলাগে নানা রকমের বই সংগ্রহ করতে, তেমনি রাস্তায় হাঁটার সময় ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতাও সংগ্রহ করে রাখতো। নিতাই, জীবনকে এইভাবেই পরিচালনা করতে পছন্দ করে। তাই তার যা ভালো লাগে না, সে কাজ জোর করেও করে না। উপন্যাসে দেখা যায়—"যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শত নাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য।" নিতাইচরণের অপ্রাপ্যকে পাওয়ার জন্য যে আকৃতি, অচেনার জন্য যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভালোবাসা-তা তার রোমান্টিক স্বপ্ন ঠিকই। আবার চণ্ডীমণ্ডপ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরে যে জগৎ রয়েছে। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিতাইকে অন্য জীবনের সন্ধান দিয়েছে। তবে সেই পথ অতিক্রম করতে নিতাইকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে।

নিতাইচরণ থেকে নিতাই কবিয়াল হয়ে ওঠার জন্য সে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি যেমন ত্যাগ করেছিল, তেমনি কুলিগিরি করা ছেড়ে দিয়েছিল। কেননা কুলিগিরি করে অর্থ উপার্জন করলে লোকে ভাল বলবে না। তখন কেউ বলবে ঐ দেখ—"কবি মোট বহন করছে"। সেই পরিস্থিতিতে নিতাই দু'বেলা খাওয়ার পরিবর্তে একবেলা খেয়ে থাকবে, তাও ভাল। "ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—! নিতাই বারবার অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না-না-না! তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর বহিবে না।" সেই দিক থেকেও উপন্যাসের নাম 'কবি' হওয়া সার্থক।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসে বীরভূমের কবিয়াল সম্প্রদায়ের এক অতি মনোজ্ঞ ও পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছেন। নিতাইচরণ তাদের অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের মতো কবি হতে চায়। কেননা তারণ মণ্ডল যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিতাইচরণ তাকেই গুরু বলে স্বীকার করতো। এমনকী নিতাইচরণ প্রায়ই স্বপ্ন দেখতো, কত লোক তারণ মণ্ডলকে প্রশংসা করছে; হাততালি দিচ্ছে। নিতাইয়ের সেই স্বপ্ন এখন সার্থক হয়েছে। অনেক জীবন সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে নিতাই ঐ অঞ্চলের মানুষের মন জয় করে নিতে চেয়েছে। শহরের চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত প্রশংসা করে নিতাইকে বলেছেন— " You are a poet" তুই তো একজন কবি রে। সেই দিক থেকেও উপন্যাসের নাম 'কবি' হওয়া যুক্তিযুক্ত।

আবার নিতাইচরণের শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে দুটি নারীর কথা অবশ্যই বলতে হবে। তারা হলো ঠাকুরঝি

ও বসন্ত। দু'জনকেই নিতাই ভালোবেসেছিল। নিতাইয়ের চলমান জীবনে মৃত্যু এসে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। জীবনছন্দে বিশ্বাসী হয়েও নিতাইকে সংকটে আবদ্ধ হতে হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে নিতাইচরণ বলেছে—

"এই খেদ আমার মনে—
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে
হায়-জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি বসন্তের মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে নিতাইয়ের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে কাশীতে চলে গেছে। কাশীতে যাওয়ার পর সেখানের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। তখন সে আবার নিজের গ্রামেই ফিরে এসেছে। নিতাইয়ের জীবনাভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে সুখ সংসারের কোথাও নেই, সর্বত্রই সংকট ও হাহাকার। এ জগতের যত অতৃপ্তি, বিরহ-বেদনা সবই পূর্ণতায় ভরে উঠে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তাই এই জগতে যেটুকু আনন্দ ও শান্তি রয়েছে, তা নিজের আপন কাজের মধ্যে। "নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে।" শিল্পী নিতাই কবিয়াল সেই জীবনের মানে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এখানে ব্যক্তি নিতাইচরণের পরিবর্তে শিল্পী নিতাইকে লোকে মনে রেখেছে। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"কবি উপন্যাসে একটি নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে কবিত্ব শক্তি স্ফুরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকার কবির মত, স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী" (পৃ.৫৪৮)। সেই অর্থে উপন্যাসের নামকরণ 'কবি' যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.২.৬.৪ : চরিত্র বিচার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনচিত্র বর্ণনা করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানব জীবনের প্রবৃত্তির লীলা দেখেছেন। এ প্রবৃত্তি যেমন জৈবিক, তেমনি আদিম, সভ্যদৃষ্টিতে যা অশোভনীয় ও কদাকার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের মাটি, প্রকৃতি— মানুষকে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর মূল ধন। চরিত্র নির্মানে মানব প্রকৃতির অসংবৃত রূপকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসে প্রধান তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। উপন্যাসটিতে নিতাইচরণ, ঠাকুরঝি, বসন্ত চরিত্র অঙ্কনে কোনও দার্শনিক চিন্তা ভাবনা লেখকের মনকে প্রভাবিত করেনি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ-সরল ভাবে অন্যান্য উপন্যাসের মতো 'কবি' উপন্যাসেও জীবনের প্রবাহকে তুলে ধরেছেন। রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমার মাঝখানে যে জীবন ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই আমদানি করেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।

৫.২.৬.৪.১ : নিতাই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' (১৯৪২) উপন্যাসের নায়ক নিতাই। সে নিম্নবিত্ত সমাজের সন্তান। 'যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ।' নিতাইয়ের বাবা

ছিল সিঁদেল চোর। আর পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিতাইয়ের জামাইবাবু— ‘‘এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল। রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রম করে, ভাঙ্গা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায় ও সের দরুণে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয়—এই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে।’’ নিতাইচরণ গ্রাম্য, ডোম সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর শিক্ষা-দীক্ষায় ও জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে নিজের মতো করে বাঁচতে শিখেছে। ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ‘‘নিতাইয়ের জীবন বৃত্তের দুই অংশ-ঠাকুরঝি ও বসন নিজেরাই যেন নিতাইয়ের পটভূমি। ঠাকুরঝি ও বসন নিতাইয়ের কাছে জীবনের দুই রূপের সন্ধান দিয়েছে। (পৃ.২৫৬)

নিতাই বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে। তেমনি তার বইয়ের সংগ্রহও প্রচুর। তবে নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ লক্ষ্য করা যায়। সে বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী ও কবিতার ছন্দ মিল লক্ষ্য করে পড়াশোনা করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) উপন্যাসে একটি শিশুর (অপুর) বড় হয়ে ওঠার কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অপু’ এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতাইচরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। নিতাই কাশীতে গেলেও উপন্যাসের শেষেরদিকে আবার নিজের গ্রাম, চণ্ডীতলাতে ফিরে এসেছে। উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়— ‘‘তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে।’’

উপন্যাসের শেষে নিতাইচরণ গ্রামে ফিরে এসেছে। তবে আগের নিতাইচরণ নয়, শিল্পী নিতাই কবিয়াল। এখন আর ডোম বংশের পূর্বপরিচিতি নিয়ে সে বাঁচবে না, সে মাথা উঁচু করে শিল্পী হয়ে বেঁচে থাকবে। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ‘নিতাই-এর চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয় কুণ্ঠিত আচরণের মধ্য দিয়া চরিত্র গৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।’’ (পৃ. ৫৪৯) সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে এমন কিছু কাহিনী, চরিত্র আছে যা ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে। লেখকের উপন্যাস ও ছোটগল্পের চরিত্রগুলি লেখকের নিজস্ব রচনাগুনে নূতন বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাইচরণ চরিত্রটির মধ্যে আমরা শিল্পীসত্ত্বার মানুষকে দেখতে পেয়েছি। যদিও চরিত্রটি বিবর্তিত হলেও উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনে আবার নিজের গ্রামেই ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রাঢ়ের পরিবেশে এক জীবন্ত সত্য হিসেবে নিতাই কবিয়াল আত্মপ্রকাশ করেছে।

৫.২.৬.৪.২ : ঠাকুরঝি

নিতাইয়ের পরম বন্ধু ছিল, স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজেন। রাজেনের বউয়ের বোন হল ঠাকুরঝি। তার বয়স প্রায় ষোল-সতের বছর। ঠাকুরঝির দেহখানি শুধু লতার মত নয়, তার মনও দীঘল দেহের অনুরূপ। ‘‘ঠাকুরঝির সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে।’’ তা তাকে দেখলে বোঝা যায়।

ঠাকুরঝি পাশের গ্রামের বউ। তার শ্বশুর বাড়িতে অনেকগুলি গাই-গরু আছে। তাদের রোজ দেখাশোনা করাই তার কাজ। তারপর গাইয়ের দোয়া দুধ নিয়ে বিক্রি করতে যায় পাশের গ্রামে রেলস্টেশনে। সেই সূত্রেই ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাই এর পরিচয়। ‘‘নিতাই নিজেও তাহার কাছে একপোয়া করিয়া দুধের ‘রোজ’ লইয়া থাকে।’’

ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভালো। কেননা সে অল্পেতেই রেগে যায়না, দুঃখ প্রকাশও করে না। ঠাকুরঝির নমনীয়তা তার স্বভাবজাত গুণ। কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?" নিতাই কবিয়ালের এই গান শুনে ঠাকুরঝি নিতাইয়ের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। ঠাকুরঝির গায়ের রঙ কালো বলে তার মনে কোন হীনমন্যতা ছিল না। শেষপর্যন্ত নিতাই কবিয়াল ঠাকুরঝিকে ভালোবেসে ছিল। উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নিতাই ঠাকুরঝির জন্য একটি হার নিয়ে এসেছিল—"হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্ত দিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচিপাতার মত"। নিতাই যে কত বড় কবিয়াল, তা ঠাকুরঝি জানে, কেননা নিতাই এর গান সে শুনেছে। নিতাইয়ের প্রেমে ঠাকুরঝিও ভরসা করেছে। নিতাই কাশী চলে গেলে, আর গ্রামে ফিরে আসবে না শুনে পরবর্তীকালে ঠাকুরঝি মারা গেছে। তখন নিতাই কবিয়াল আপন মনেই বলতে পেরেছে—"আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি, তুমি আকাশেই থাক।" সর্বোপরি বলা যায় ঠাকুরঝি চরিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করেছে। 'কবি' উপন্যাসের কাহিনীর শোভা বর্ধনকারী হিসেবে ঠাকুরঝি চরিত্রটির গুরুত্বও আছে।

৫.২.৬.৪.৩ : বসন্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের একটি অন্যতম নারী চরিত্র 'বসন্ত'। লোকে তাকে বসন বলেও ডাকে। ঝুমুর দলের মেয়েটির নাম বসন্ত। সে 'নিম্নশ্রেণীর দেহ ব্যবসায়িনী'। ঝুমুর দলের মেয়ে হয়েও তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বসন এ পথে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছে। ঝুমুরের দলকে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, গাছ তলায় আস্তানা পাততে হয়। "কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাড়িয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়-অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়"। মেয়ে-পুরুষের ঝুমুরের দলটিতে বসন গায়িকা হিসেবে কাজ করে। প্রজাপতি বৃত্তিই বসনের মূল প্রবৃত্তি। এই বহুভোগ্যা নারীর বাসনা সর্বস্ব ভালোলাগা, ভালোবাসার বিবরণই ধরা পড়েছে 'কবি' উপন্যাসটিতে।

বসনের দেহের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে—"দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার-সেই শানিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল।" বসন খিলখিল করে হাসে। সে শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরে হাসে। আলেপুরের রাসপূর্ণিমায় মেলায় নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে বসনের পরিচয় হয়। সেই আসরে বসন নাচিবে ও নিতাই কবিয়াল গান গাইবে। ধীরে ধীরে নিতাইয়ের সঙ্গে বসনের পরিচয় মধুর হয়। তখন নিতাইকে, বসন কালোমানিক বলে ডাকতে শুরু করেছে। নিতাই কবিয়ালের সংস্পর্শে এসে ও তার গান শুনে বসন তাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

বসনকে নিয়েই নিতাই কবিয়াল এ জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সার্থক হয়নি। প্রেমের এই বিচিত্র অনুভূতি নিতাইয়ের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করেছে বসন। উপন্যাসে দেখা যায়, নিতাই বলেছে— "তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু-তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ —তুমিই তো রচনা করিয়াছ-পূর্ণিমায়, পূর্ণিমায়-কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া-তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল রূপের মাধুরী।" নিতাই কবিয়াল বসন্তকে কথা দিয়েছেন, সে যতদিন বেঁচে থাকবে, বসনকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু বসন্তই তাকে চেড়ে চলে গেল। বসন্ত প্রচুর মদ খেয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল। 'এত মদ খেলে কি শরীর থাকে'! তাই জটিল রোগে বসন্ত

আক্রান্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিন পরই বসন্ত মারা গেল। বসন্তকে সে ভালোবেসেছিল, তাই তাকে হারিয়ে নিতাইয়ের মনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে লেখকের জীবনজিজ্ঞাসা নিতাইয়ের মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশা-কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নর-নারীর প্রেম ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করেননি, সেই সঙ্গে সমাজের বহুবিধ সংকটের মধ্যে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। 'কবি' উপন্যাসের বসনের মধ্যেও রাগ, হিংসা নেই। নিতাইয়ের প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত নেই। সে শুধু অতিরিক্ত মদ্য পান করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বসন্তের চরিত্রে তীক্ষ, হিংস্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ও উদ্দাম, বেপরোয়া জীবন উপভোগ স্পৃহার সঙ্গে আত্মগ্লানি ও একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা উপলব্ধির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। (পৃ. ৫৪৯)

সবশেষে একথা বলা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবি' উপন্যাসে বসন চরিত্রটিকে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। নিতাইচরণ থেকে নিতাই কবিয়ালে উত্তীর্ণ হওয়ার পেছনে বসন চরিত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপন্যাসের ঘটনা-গতির অগ্রগতিতে বসন চরিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করেছে।

৫.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর (১৯২৩-১৯৯৭)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

৫। বাস্তবের গভীরে : তারাশঙ্কর ও তিন নক্ষত্র—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

৫.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কবি উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

২। কবি উপন্যাস অবলম্বনে তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের পরিচয় দাও।

৩। কবি উপন্যাসে নিতাইচরণ চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার করো।

৪। কবি উপন্যাসে নারী চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

GEC / CBCS

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়

পর্যায় গ্রন্থ - ২, একক ৬ - ছোটগল্প

উপএকক - ১ - বরযাত্রী

বিন্যাসক্রম

২.৬.১.১ : ভূমিকা

২.৬.১.২ : বরযাত্রী গল্পের সাধারণ পরিচিতি

২.৬.১.৩ : নামকরণ

২.৬.১.৪ : হাস্যরস

২.৬.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৬.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৬.১.১ : ভূমিকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার পান্ডুল গ্রাম ছিল লেখকের জন্মস্থান। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম ছিল বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়। লেখক জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন পাটনা আর দ্বারভাঙ্গায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটে ১৯৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত চাকরি করেছিলেন। তারপর জীবনে একটানা সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘বিয়ের ফুল’ (১৯২৫)। এর কয়েক বছর পর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ নামে গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে। ‘বরযাত্রী’ গল্পটি লেখকের একটি জনপ্রিয় গল্প। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা অন্যান্য গল্পগুলি হলো—রানু সিরিজের গল্পগুলি—‘রাণুর প্রথম ভাগ’ (১৯৩৭), ‘রাণুর দ্বিতীয় ভাগ’ (১৯৩৮), ‘রাণুর তৃতীয় ভাগ’ (১৯৪০), ‘রাণুর কথামালা’ (১৯৪১), ‘বরযাত্রী’ (১৯৪২), ‘বাসর’ (১৯৫১)।

তাঁর লেখা রম্যভ্রমণধর্মী রচনাগুলি হলো—‘দুয়ার হতে অদূরে’, ‘কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি’, ‘একই পথের দুই প্রান্তে’, ‘অযাত্রার জয়যাত্রা’।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নাটক লিখেছিলেন দুটি—'বিশেষ রজনী' ও 'গণশার বিয়ে'।

ছোটদের জন্য তিনি লিখেছিলেন—'পনুর চিঠি', 'কৈলাশের পাঠরাণী', 'দুষ্টুলক্ষ্মীদের গল্প'।

'জীবনতীর্থ' হলো বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আত্মজীবনী' গ্রন্থ।

লেখক 'এবার প্রিয়ংবদা' রচনার জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৯৪২) পেয়েছিলেন। সাহিত্য কর্ম 'কাঞ্চন মূল্য' রচনা করে 'শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৮৭) লাভ করেছিলেন। বিহারের লোকজীবনের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তার প্রতিফলন রয়েছে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসের মধ্যে বিখ্যাত রচনা হলো—'নীলাঙ্গ ুরীয়' (১৯৪২), 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' (১৯৪৫) ও 'কাঞ্চনমূল্য' (১৯৫৬), 'নয়ন বৌ' (১৯৫৭) , 'রিকসার গান' (১৯৫৯), 'মিলনান্তক' (১৯৫৯) প্রভৃতি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুক-রসাত্মক, রঙ্গব্যঙ্গমূলক গল্পের বই 'বরযাত্রী'র ছয় বন্ধু বাসরঘরকে কেন্দ্র করে কৌতুককর দুরবস্থার চিত্র পাঠকদের হাসির উদ্রেক করেছে। ছয়বন্ধু হলো—গণশা, ঘোঁতনা, ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ, রাজেন আর কে. গুপ্ত বাংলা ছোটগল্পের ধারায় কৌতুক-রসাত্মক চরিত্র। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তখনকার সমাজকে যেমন দেখেছেন, তেমনি সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কৌতুকরসের গল্প হিসেবে 'বরযাত্রী' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বনাম ধন্য এই লেখক ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় পরলোক গমন করেন।

২.৬.১.২ : বরযাত্রী গল্প পরিচিতি

'বরযাত্রী' গল্পের শুরুতেই আছে—"ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গণশার অপেক্ষা; সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজ-গোজের মধ্যে এর পূর্ব্বেও আসিয়া কয়েকবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গালটা নির্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল।" এদের মধ্যে কে. গুপ্ত বিহারের ছেলে। ছাপরার এক মহকুমার স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছে। কে. গুপ্ত বাংলার ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই কথায় পেরে উঠে না। গণশা কথা বলার সময় তোতলামি করে। একটু রেগে গিয়ে সে বলেছে—"বা-ব্বাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই। সে সব আপনাদের ছা-চ্ছাতুর দেশে চলে।" গণশা, ত্রিলোচনকে বরের সাজে সাজিয়ে তোলার জন্য নানা বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। তাছাড়াও বরযাত্রীদের

এসেন্স, গোলাপজল, মালা ইত্যাদি এসেছে কিনা তার খোঁজ খবর নিয়েছে। রাজেন কবি স্বভাবের মানুষ। ত্রিলোচনের বিয়ে উপলক্ষ্যে সে বিয়ের পদ্য লিখেছে। রাজেন কনের বাড়িতে গিয়ে কনেযাত্রীদের বিয়ের ছড়া বা পদ্য বিলি করতে চেয়েছে। কবি রাজেন বলেছে—"কণ্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।" গোরাচাঁদ খেতে ভালোবাসে বলে বিয়ের দিনে বরপক্ষের ও কনেপক্ষের বাড়িতে নানারকম খাবার খাবে, সেই ইচ্ছাতে মগ্ন থেকেছে। "গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্য্যের গন্ধ থাকা নিয়ম; সে বলিল, সতা হলে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।" ত্রিলোচনের বিয়ে উপলক্ষে ঘোঁৎনার ভাবনা খুবই বাস্তবসম্মত। ঘোঁৎনা বলেছে, বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।" বিয়েবাড়িতে আনন্দফুর্তি করবে এই তার ভাবনা। সেইজন্য বেশি বরযাত্রী নিয়ে গেলে ভেজাল বাড়বে বলে সে মনে করেছে। তার ফলে বিয়েবাড়ির সমস্ত আনন্দটা মাটি হয়ে যাবে।

অপরদিকে ত্রিলোচনের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কে কে বরযাত্রী যাবে সেই প্রসঙ্গ আসে। তখন ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙ্গুলের পর্ব্ব গুণতে গুণতে বলেছে—"বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হল চার, আর আর—" কে গুপ্ত পুরুত মশাইয়ের কথা তুললে, তার উত্তরে ত্রিলোচন বলেছে—"পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুত-মশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্ন মশাই যাবেন"। ন্যায়রত্ন মশাই সম্পর্কে ঘোঁৎনার ভাবনা পাঠকদের হাস্যকৌতুক করে তুলেছে। "পুরুত ঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে।" সেই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিলোচন বলেছে তাকে দীনে নাপিত সামলাবে। তখন ত্রিলোচনকে লক্ষ করে রাজেন বলতে শুরু করেছে—"একা দীনে ব্যাটা ক'জনকে সামলাবে। ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জের যাওয়া মানেই বোতলের শ্রাদ্ধ।" সবদিক ভেবে চিন্তে ত্রিলোচন বলেছে, কোনো অসুবিধা নেই সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্রিরেই চলে আসবে। কেননা তাদের অফিসের মেল-ডে কিনা, তারা ছুটি পাবে না। আর বোতল? দু পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দুডজন চপ কাটলেট—" এইভাবে ত্রিলোচন বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের ও বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর বিয়ে করতে যেতে উদ্যত হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে গোরাচাঁদ বলতে শুরু করেছে—"আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গণশা?"

গণশা তার উত্তরে গোরাচাঁদকে লক্ষ্য করে বলেছে—“বে-ঝোচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করবার সময় করবে? খ্যাঁটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে। আমায় আবার সা-স্‌সাক্ষী মানতে কে বলেছিল র‍্যা? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই;না রে গণশা?” এরপর ত্রিলোচনের সঙ্গে বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষের বাড়িতে হাজির হয়েছে। যে গ্রামে বিয়ে হচ্ছে সেই গ্রামের নাম হলো গোকুলপুর। পরে এই গ্রামের নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘কালসিটে গোকুলপুর’ রাখা হয়েছে। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায়—“কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু কালসিটেতে দাঁড়াইয়াছে।”

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ গল্পে দেখা যায়, গ্রামটির অবস্থান ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি। স্টেশন থেকে মাইল তিন-চার দূরে। গল্প পাঠে আমরা জানতে পারি—কালসিটে গোকুলপুরের বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা রয়েছে। অন্যান্য গ্রামের মতো এই বাড়িটির পরিবেশও গ্রাম্য প্রকৃতির। গ্রামের পরিবেশে দেখা যায় যেখানে জঙ্গল নেই, সেখানে রয়েছে খানা-ডোবা। দুই-একটা মাঝারি সাইজের পুকুরও লক্ষ্য করা গেছে। সেইসময় গ্রামটির অধিকাংশ পুকুর জলে ভর্তি রয়েছে। পুকুরের ঘাটের কাছে জল পরিষ্কার রয়েছে। তার কারণ গ্রামের মানুষ প্রতিদিন ঐ ঘাট ব্যবহার করে। আর যেখানটা ব্যবহার হয় না, সেখানে ঘন সতেজ পানা গাছে ঢাকা থাকে। অবশেষে কালসিটে গোকুলপুর গ্রামে বরযাত্রীরা প্রবেশ করেছে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি বাড়ির সদরের কাছে বর বসার জন্য ছোট শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। বরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরের বন্ধুরা ও কন্যেপক্ষের অতিথিবৃন্দ। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির আলো জ্বলছে তাও লক্ষ্য করা গেছে। মাঝখানে একটি গ্যাসের আলো রয়েছে, তার থেকে ঠিকরে পড়া আলো বিবাহবাসরকে আলোকিত করে তুলেছে। সর্বোপরি অন্দর-বাহির মিলিয়ে অনেকগুলি গ্যাসের আলো লক্ষ্য করা গেছে। এদিকে আবার বরযাত্রীদের প্রায় সকলেই কম-বেশি মদ্য পান করে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে আড্ডা মারছেন। কনেযাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তিনি অনেক জায়গায় বরযাত্রী গেছেন—“কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানারকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং

ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর, বরপক্ষীয়েরাই বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী আসে নাই।"

বিয়েবাড়িতে হাজির হয়ে নেশার ঘোরে কন্যাপক্ষের সঙ্গে উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করেছে। তখন গ্রামের একজনকে বলতে শোনা গেছে—"এটা কালসিটে মশাই, মনে থাকে যেন।" বিয়ের আসরে ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা বাড়াবাড়ি রকম হতে যাচ্ছিল, কিন্তু কনেপক্ষের লোকেরা তাড়াতাড়ি তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে কথা বলা থামিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিলোচনের বন্ধু কবি রাজেন নিজের লেখা কবিতা কন্যাপক্ষের মধ্যে বিলি করতে যাচ্ছিল, তখন ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি রাজেনকে কবিতা বিলি করতে নিষেধ করেছে। সে 'বলিল এই সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাটাসনি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।" পরবর্তীকালে আমরা গল্প পাঠে জানতে পারি, ত্রিলোচনের পিতাও বরপক্ষের ও কনেপক্ষের তর্ক বিতর্কের মধ্যে জেদ ধরে বসেছেন। ত্রিলোচনের পিতা গোরাচাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—"তা, হলে একটি কথা—কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ করো না আজ।" তখন খাদ্যরসিক গোরাচাঁদ বলেছে খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু কালসিটে গোকুলপুরের গ্রামের লোক যে রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেল লোক একটা হাঙ্গামা না বাঁধিয়ে দেয়। তার কিছুক্ষণ পরে বিয়ের আসরে কন্যাকর্তা গলায় গামছা দিয়ে কর জোড়ে বরের আসরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। "সাধারণভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এইবার বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেয়াই-মশাই কোথায়? এই যে—"। তখন ত্রিলোচনের পিতা কন্যা কর্তাকে বুকে জড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—"তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ! গলাটা অশ্রুবদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।" কন্যা কর্তা বিয়ে দেওয়ার জন্য ছাদনাতলায় বরকে নিয়ে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে গোরাচাঁদ ত্রিলোচনের পিতাকে বলতে শুরু করেছে, তবে আর না খাওয়ার হাঙ্গামাটা করে কাজ নেই, যখন সবকিছু মিটমাট হয়ে গেছে। গনশা, গোরাচাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলেছে "খা-খ্‌খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখব নি?" ত্রিলোচনের বন্ধুরা স্ত্রী আচার দেখার জন্য বিয়ের আসরে উপস্থিত হয়েছে। বিভিন্ন রকমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখে তারা আনন্দ লাভ করতে চেয়েছে। অপরদিকে গোরাচাঁদ খেতে ভালোবাসে বলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খেতে যেতে উদ্যত হয়েছে।

কালসিটেতে বরযাত্রী এসে স্ত্রী আচার দেখার সুযোগ হবে কিনা গণশা, ঘোঁৎনারা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। গোরাচাঁদের বরঞ্চ ইচ্ছে বরং খেয়ে নিলেই ভালো হতো। সেই পরিস্থিতিতে 'বরযাত্রী' গল্পে গণশাকে বলতে শোনা গেছে—"ভী-ভ্‌ভীরু কোথাকার! বি-ব্বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী আচারই দেখলাম না তো—। চল সবাই, দে-দ্দেখি কে কি করে। গণশা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু পিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গণশার পাশে রহিল।" এইভাবে আরও ঘন্টা দুয়েক সময় কেটে গেল। বরযাত্রীর দলটা বিয়েবাড়িতে খানিকক্ষণ স্রোতের কুঠাকাঠির মত এদিক সেদিক করে সময় কাটাল। দু-একজন সহায় রামবাবুদের সঙ্গে বাড়ি চলে যেতে চাইলে বাকি সবাই তাদেরকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে।

'বরযাত্রী' গল্পে দেখা যায়—খাওয়া-দাওয়ার পর বরযাত্রীরা আবার সবাই বিয়ের আসরে এসে জুটেছে। তখন অনেকে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে, কনেপক্ষের কেউবা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। বরযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব শুরু করেছে। "গোরাচাঁদ একটা বালিশের উপর কাত হইয়া বলিল, খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরের পড়ে গিয়েছিলাম এই যা।" এইভাবে তারা কিছুক্ষণ খাওয়ার বিষয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর—গোরাচাঁদ, রাজেন, ঘোঁৎনা, গণশার খোঁজ করতেই বোঝা যায়, গণশাকে বিয়ের আসরে দেখা যাচ্ছে না। তখন রাজেন, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনারা গণশার খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিয়েবাড়ির সদর বাড়ির বাঁদিক দিয়ে একটি রাস্তা স্টেশনের দিকে গেছে, সেখানে তারা খোঁজ নিয়েছে। তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বনজঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারিয়ে গেছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে ত্রিলোচনের বন্ধুরা গণশাকে দেখতে পেয়েছে। ঘোঁৎনা, গণেশকে লক্ষ্য করে বলেছে—"কোথায় গিয়েছিলি রে গণশা?" তার উত্তরে গণশা মুখটা নীচু করে বলেছে—"তি-তিলুর বাসর ঘর দেখে এলাম।" কে. গুপ্ত, ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ, রাজেনরা প্রথমে গণশার কথায় বিশ্বাস করতে চায়নি। তারপর তারাও গণশার কথাতে বাসরঘর অভিযানে রওনা দিয়েছে। গণশা, তার বন্ধুদের বলেছে যে বাড়িতে বাসরঘর বসেছে, সেই বাড়ির পিছনে স্বাভাবিক রাস্তা নেই। দূরের গান বাজনা আর মাঝে মাঝে বাসরঘরের হাসির শব্দ লক্ষ্য করে ত্রিলোচনের বন্ধুরা বাসরঘরের দিকে এগিয়ে গেছে। বাসরঘর যাওয়ার রাস্তা খুবই

সংকীর্ণ। তবুও তারা আগাছার মধ্য দিয়ে ছাই, গোবর, ভাঙা ইট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে উপস্থিত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়—"সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপ জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা, শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নীচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়িয়া গিয়াছে। ভ-ভভ্‌গবানের দয়া—। বলিয়া গণশা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, বো-ঝোঝ; চাও যেতে কেউ?" গণেশ, তার বন্ধুদের বলেছে—বাসরঘরে ত্রিলোচন এবং সহস্রলোচন ইন্দ্র হয়ে বসে রয়েছে। চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদিরা ত্রিলোচনকে ঘিরে ধরেছে। সেই দৃশ্য দেখতে সবাই যেতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। গণশা আরও জানিয়েছে, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা—মাঠ আছে, যদি তাড়া করে তো পালানো যাবে।

অতঃপর গল্পপাঠে জানা যায়—বাসরঘরের দুটি জানলা রাজেন, গণশা, ঘোঁৎনা, আর কে. গুপ্ত দখল করে নিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে গোরাচাঁদ নিরাশ হয়ে কি করবে ভেবে পায়না। "ঘোঁৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ"। তার উত্তরে সে বলে না, হয় না। গোরাচাঁদ, গণশা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজে দিয়ে জানলা থেকে বাসরঘরের দৃশ্য দেখছিল, কিছুক্ষণ পরে—"পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, খুরি গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই ওগো বাবা গো, ডাকাত—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন এক মুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।" সেই পরিস্থিতিতে বরযাত্রী দলের সদস্যরা হতভম্ব হয়ে গেছে। যে-যেদিকে পেরেছে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। কে. গুপ্ত যেদিক হইতে এসেছিল, সেদিকেই ছুটে পালিয়েছে। সদরের দিকে না গিয়ে একেবারে সোজা। ঘোঁৎনা পালাতে গিয়ে পেঁপে গাছে ধাক্কা খেয়েছে। তারপর পেঁপে গাছে উঠে গেছে। একটু উপরে উঠে সে টের পেয়েছে—"কতকগুলো ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ; আপাতত সেখানটায় একটু থামিল।"

গণশা, গোরাচাঁদের কোমরের র‍্যাপারটা টেনে বলতে শুরু করেছে সামনেই ফাঁকা মাঠ রয়েছে, ওখানে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তো। রাজেনও অদ্ভূত পরিস্থিতিতে এক রকম লাফ দিয়ে গণশা-গোরাচাঁদকে ধরে ফেলেছে। গল্পে দেখা গেছে—"হাত-কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালটুকু একরকম লাফ দিয়াই কাটাইল; পরক্ষণেই ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।" গণশা, গোরাচাঁদ, রাজেন ফাঁকা মাঠ ভেবে পানা পুকুরের জলে ঝপাং করে পড়ে গেছে।

এদিকে কন্যাপক্ষের লোকজন ডাকাত পড়েছে ভেবে চিৎকার করতে শুরু করেছে। বাড়ি থেকে লাঠি-শড়কি নিয়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত অনেকেই চিৎকার শুরু করেছে। সেইসময় কন্যাপক্ষের চিৎকারে কয়েকজন গ্রামের লোকও বেরিয়ে এসেছে। "যে টর্চ আনিতে গিয়াছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দুজন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে! ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, পড়ে থাক, উঠিও না।" পুকুরের এক দিক থেকে মেয়ের কাকা জগুদার কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছে। তখন পুকুরের মধ্যে ঢিল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কারো হাতে বন্দুকের নল দেখা গেছে। তখন ত্রিলোচনের তিন বন্ধু মহা বিপদে পড়ে গেছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে পানাপুকুরের জল থেকে গোরাচাঁদকে বলতে শোনা গেছে—"আমরা বরযাত্রীরা দল।" কিন্তু কন্যেপক্ষের লোক ঐ মুহূর্তে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি। গোরাচাঁদ কন্যাপক্ষের লোকজনকে বোঝাতে চেয়েছে আমরা পাঁচজন ছিলাম। তখন কন্যাকর্তা ত্রিলোচনের বন্ধুদের প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছে ওদিকে কি করছিলে সব? "পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, ওই যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না—ওরে আমার চালাক রে! তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল, না, দিব্যি করে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন।"

তারও কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্তাদের উদ্দেশ্যে গোরাচাঁদ বলতে শুরু করেছে—"রাজেন বললে, দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দরলোকেরা, চল্, তিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, বাড়ির পেছনে দিব্যি নিরিবিলিতে।" কন্যাকর্তা তোমাদের সব ধাপ্পাবাজি বলে বিশ্বাস করতে চাননি। জগুদা 'বেয়াই-মশাই' বলে বরকর্তাকে ঘুম থেকে তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় জনৈক গ্রামের ছেলেটা সামনে এসে বলেছে—"দাঁড়ান,ওরাই আগে দেখাক, কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের পুরুতমশাই, কে বরের—" সেই পরিস্থিতিতে গোরাচাঁদ বলে উঠেছে

ওই তো বরের বাবা, গণশা টীকা করে ডাকতে লাগল—ভ-ভ্ভবতারণবাবু। "ওই বরের মেসো অনন্তবাবু, ওই পুরুত-মশাই-কালা, রাতকানা। বাইরে দীনে নাপতে।" বলাবাহুল্য অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর কালসিটে গোকুলপুর গ্রামের বয়স্কদের মধ্যে চোর সন্দেহটা দূর হয়েছিল। তারা যে ত্রিলোচনের বন্ধু, বরযাত্রী হিসেবে এই গ্রামে হাজির হয়েছে তখন কিছুটা হলেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ঘোঁৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেঁপে গাছ থেকে নেমে সদরবাড়িতে দলটির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে কথাবার্তার সুযোগ না পেয়ে খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়—"ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া, কি হয়েছে র‍্যা গণশা? এত গোলমাল কিসের? বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে—অ্যাঁ, তোদের এ কি দশা?—বলিয়া হাত-চোখ-কাঁধের ভঙ্গীসহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।" তাও কন্যেপক্ষের লোকেদের কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায়নি যে তারা ডাকাত নয়, বরযাত্রী। এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন বাসরঘর থেকে এসে রকে দাঁড়িয়েছে। বাসরঘরে ডাকাত পড়া প্রসঙ্গে ত্রিলোচনকে বলতে শোনা গেছে—"সত্যি যে তোরাই দেখছি। আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়? গোরা, তোর দাঁড়িতে কি ঝুলছে, মুখ তোল তো!" গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি—বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিলোচনই তার বন্ধুদের লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। গল্পে দেখা যায়—"দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছিল, কিন্তু মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না—গোরাচাঁদেরও নয়, গণশারও নয়, রাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয়।" সেই পরিস্থিতিতে কন্যাপক্ষের সকল প্রকার সন্দেহ কেটে গেল। তারা যে বরযাত্রী, তা তারা স্বীকার করে নিলেন। তারপর কন্যাপক্ষের বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বরযাত্রীদের জন্য শুকনো তিনখানা কাপড়, জামা, র‍্যাপার আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গণশা, রাজেন, গোরাচাঁদ অনেকক্ষণ পানাপুকুরে জলের মধ্যে ছিল বলে চা-খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিলোচনের বন্ধুদের সান্ত্বনা দেবার সময় কন্যে পক্ষের লোকজন বলে উঠেছে, আহা ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল বলে জানলার ধারে তারা হাজির হয়েছিল। তারপর কি চরমদুর্গতি ও হেনস্থার চিত্র তাদেরকে ভোগ করতে

হয়েছে। বাসরঘরে একটি কিশোরীকে বলতে শোনা গেছে—“হ্যাঁলা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয়? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয়?” ত্রিলোচনের বাসরঘরে উপস্থিত অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদিদের কথোপকথন বা ঠাট্টা-ইয়ার্কি শোনার কৌতূহল গল্পে এক রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি করেছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ‘বরযাত্রী’ গল্পের শেষে শ্লেষাত্মকভাবে বলেছেন—“কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়া পেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্টি ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।” বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকরসের ছোটগল্পের বই ‘বরযাত্রী’-র ছয় বন্ধু গণশা, ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ, রাজেন, আর কে গুপ্তের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচয় অনেক দিন ধরে। বরযাত্রীর বেশে সেজেগুজে বরের সঙ্গে কন্যেবাড়িতে হাজির হবে, এই চিত্র সাহিত্যে হোক বা বাস্তবে, সবসময় তা হাসির উদ্রেক করে। বিয়ে নামক যে সামাজিক বন্ধন প্রচলিত আছে, তার মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণতা। একজন পুরুষ, একজন নারীর সংস্পর্শে দুটি পরিবার পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর বিয়েকে কেন্দ্র করে বরযাত্রীদের কৌতকপূর্ণ মনোভাব বিয়ের আসরকে পুলকিত করে তুলেছে।

২.৬.১.৩ : নামকরণ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ ছোটগল্পটির একমাত্র উপলক্ষ্য ত্রিলোচনের বিবাহকে কেন্দ্র করে। ত্রিলোচনের বন্ধু রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা আর গণশার প্রধান লক্ষ্য বাসরঘরের রঙ্গ-রসিকতা উপভোগ করার। “গল্পের নাম ‘বরযাত্রী’, বরযাত্রী এমন নামে চিহ্নিত করার মধ্যে একটি Group কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে—যারা বিবাহ উৎসবে বরানুগমনে অন্তরঙ্গ সঙ্গীর ভূমিকা নেয়। কোনো ব্যক্তিনাম বা গভীর ব্যঞ্জনা এমন মূল তাৎপর্য ধরে ব্যক্ত হয়নি।” পৃ. ৩৯২ (বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত) শুধু বর-কনে নয়, সামাজিকতার বন্ধনে এভাবেই বাঁধা পড়ে দুটি পরিবার। আমরা সকলেই জানি বর বিয়ে করতে গেলে, তার সঙ্গে বারযাত্রীরাও সেজে গুজে হাজির হয়। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি গণশা আবার একটু তোতলা টাইপের। সে রেগে গেলে বা আনন্দিত হলে এক একটা অক্ষর প্রায় দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। রাজেন কবি মানুষ। সে ঠাট্টা করে গণশাকে বলেছে, বরযাত্রী না গেলেই বরঞ্চ ভালো হতো। তার উত্তরে গণশা বলেছে—“তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এরপর আমার নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গ্গণশা তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা—চ্চাকরির

খোঁজ করগে।” বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় উঁচুদরের সহানুভূতিশীল হাসির শিল্পী তা উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। ত্রিলোচনকে তাস খেলা, সিগারেট খাওয়া, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করা সবই গণশা শিখিয়েছে। এমনকী নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়াল নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর যত সিনেমা জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করিয়ে ত্রিলোচনকে লায়েক করে তুলেছে। “শুধু তাই নহে, আপাততঃ এ কয়েকদিন ধরিয়া দাম্পত্যনীতিতে জোর তালিম দিতেছে সেই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্ব্বে বাসর দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল-কানুন অধিগত করা হইতেছে ওই গণশারই নিকট।” ‘বরযাত্রী’ গল্পটি পাঠ করে জানতে পারি—‘বাসরঘরের’ চিত্রকে কল্পনা করে ত্রিলোচনও ভয় পেয়েছে, কিন্তু গণশার কাছে পরামর্শ নেওয়ার পর সে ভয় দূরীভূত হয়েছে। “বউদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি, আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আর জল খাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে, সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হ’ত। কার কথার যে কি উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফ জোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর আবার গানের ফরমাশ আছে, কারুর হেঁয়ালি আছে।” বিয়ে বাড়ির পরিবেশে বাসরঘরকে কেন্দ্র করে শ্যালিকাবৃন্দ ঠাকুমাবৃন্দরা যে রঙ্গ-তামাশায় মেতে ওঠে তা খুবই রোমাঞ্চকর। বাঙালি পরিবারের ক্ষেত্রে এদৃশ্য চরমসত্য ঘটনা। ছাদনাতলায় বিয়ের পর, খাওয়া-দাওয়া করে বর-কনে ও অন্যান্য চরিত্ররা উপস্থিত হয়েছে বাসরঘরে। শুধুমাত্র নমোনমো করে চার হাত মেলানো মূল উদ্দেশ্য নয়, এর বাইরে সারারাত জেগে থেকে রঙ্গ-তামাশার মধ্যে দিয়ে অতিথিবৃন্দ আনন্দ উপভোগ করেছে। কনেপক্ষ আর বরপক্ষের সম্মিলিত চেষ্টায় বাসরঘরের কৌতুকময় পরিবেশ তখনকার জীবনধারণ পদ্ধতিকে তুলে ধরেছে। ‘বরযাত্রী’ গল্পে দেখা যায়, “গোরাচাঁদ বলিল, তা হলে তো নাক কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।” আমাদের আলোচ্য গল্পের মধ্যে বাসরঘর, নামটির গুরুত্ব একেবারে সরিয়ে দেওয়ার নয়। আবার রাজেন ‘বাসর-তান্ডব’ নাম দিয়ে ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত কাহিনি অবলম্বন করে একটি নাটক লিখিতেছে, কিন্তু ত্রিলোচনের বিয়ের হাঙ্গামাটা এসে পড়ায় নাটকটা আর লেখা হয়নি।

সর্বোপরি গল্পের ‘বরযাত্রী’ নামটিকেই আমরা বেশি করে প্রাধান্য দেব। কেননা বরযাত্রী বললে শুধুমাত্র ত্রিলোচনের পাঁচবন্ধু গণশা, গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত, ঘোঁৎনা, রাজেনকেই বোঝায় না। তার সঙ্গে পাত্রপক্ষের অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে বোঝানো হয়েছে। ত্রিলোচনের

কথায়—“বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হল চার, আর পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুত মশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্ন মশাই যাবেন।” ‘বরযাত্রী’ গল্পটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বিয়ের আসর যে গ্রামে বসেছিল, তার নাম ‘কালসিটে গোকুলপুর’। গ্রামটা ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি, স্টেশন থেকে মাইল তিন-চার দূরে—বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গল্পে দেখা যায়—“সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রশি দুয়েকের তফাত হইবে। উৎসব উপলক্ষ্যে সদর-বাড়ির সামনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটি তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো-বকমধ্যে হংস যথা শোভা পাইতেছে। অন্দর-বাহির মিলিয়া আরও গোটা কতক গ্যাসের আলো।” বরের সঙ্গে বরযাত্রীরা ও অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত হয়ে বিয়েবাড়ির পরিবেশটিকে আনন্দদায়ক করে তুলেছে।

অপরদিকে বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হয়েছে কনের কাকা জগুদা, কন্যাকর্তা ও কনেপক্ষের লোকজন, বাসরঘরের রাত জাগানি সদস্য ও সদস্যরা। প্রতিবেশী গ্রামবাসীরাও সেই নামহীন ছেলেটির ফোড়ন কাটা বিয়েবাড়ির বাস্তব পরিবেশকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছে। ত্রিলোচনের বন্ধু গোরাচাঁদের বিয়েবাড়ির খাবারের প্রতি লোভ লক্ষ্য করা গেছে। “বলছিলান, আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও করে কাজ নেই কি বলেন? যখন মিটেই গেল।” বিয়েবাড়ির পরিবেশে চরিত্রটির মনোভাব মানানসই হয়েছে। কবি রাজেনের কথায়—“তাহলে এগুলো কি হবে? এত কষ্ট করে লিখলাম, ছাপালাম, কেউ পড়বে না।” ত্রিলোচনের বিবাহ উপলক্ষ্যে বিয়ের পদ্য লিখে, ছাপিয়ে বরযাত্রী সেজে বিয়ের আসরে রাজেন উপস্থিত হয়েছে। আগেকার দিনে বিয়েবাড়িতে ছড়া কাটার রেওয়াজ ছিলো। এখনও অনেক জায়গায় সেই রীতি লোকসমাজে লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের আলোচ্য গল্পেও রাজেনের বিয়ের পদ্য বিয়েবাড়ির পরিবেশে খুবই মাননসই হয়েছে। আসলে বিয়েবাড়ি উপলক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ, তাদের আনন্দ-উল্লাস সামাজিক বন্ধনের কথাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। আমাদের আলোচ্য গল্পে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিবাহ-বিষয়ক অনুষ্ঠানের নিপুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পে বরযাত্রীরাই প্রধান, তাদেরকে কেন্দ্র করেই ‘বরযাত্রী’ গল্পটি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত গতিশীলতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই গল্পটির নাম ‘বরযাত্রী’ সবদিক থেকে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

২.৬.১.৪ : হাস্যরস

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' ছোটগল্পে হাসির ঝর্ণাধারার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি হাস্যরসের মূল উপাদান হলো পারিবারিক বা সামাজিক মানুষের আচার-আচারণ বা জীবনধারণ পদ্ধতির অসংগতি বা অসংলগ্নতা। সামাজিক মানুষের কাজ-কর্ম দেখে অসংগতির তারতম্য হেতু হাস্যরস কখনো উদ্ভট রসে কখনও আবার তীব্র ব্যঙ্গ রসে পরিণত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যের রস সৃষ্টি ছিল সাবলীল ও মার্জিত। 'আমার সাহিত্যজীবন' প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন—"হাসি নিয়েই মূল কারবারের চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তরের তাগিদেই সব কিছু উলটে গেছে। এর কারণ নিজেকে যতটা জানি, বিষণ্নতাই আমার মর্মের গঠনে যেন মূল উপাদান।" লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রসাত্মক ছোটগল্প রচনায় অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনিই ছিলেন প্রকৃত হিউমার বা কৌতুক রসাশ্রয়ী গল্পকাহিনির স্রষ্টা। তিনি অনেক রঙ্গ-রসের গল্প বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ', 'রাণুর তৃতীয় ভাগ', 'রাণুর কথামালা' গল্পগুলি তাঁর হাস্যরসের বিখ্যাত শিল্পকর্ম। কৌতুকরসের গল্পের বই হিসেবে 'বরযাত্রী'র ছয় বন্ধু গণশা, ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, রাজেন, আর কে. গুপ্ত ও গোরাচাঁদ বাংলা রসসাহিত্যের পরিচিত চরিত্র। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ক্ষমাপরায়ণ উদার সহৃদয় স্থিতধী শান্ত এবং সামগ্রিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন নির্লিপ্ত শিল্পী। তাঁর হাস্যরসের প্রকৃতি নির্মল। হিউমর তাঁর নিজস্ব এলাকা। করুণা, মমতা, ক্ষমা, সমদর্শিতা নিয়ে তিনি আসেন, দেখেন ও দেখান, হাসেন ও হাসান। গণশা-দলপতির ষড়-রত্ন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এই দৃষ্টি সক্রিয়। নির্মল কৌতুকরসে সিক্ত 'বরযাত্রী' ও 'বাসর' বই—দুটির গল্পগুলি।" (পৃ.২৮০)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আকর্ষণ হিউমর-এর প্রতি। 'বরযাত্রী' গল্পে ত্রিলোচন, রাজেন, গণশা, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা আর কে গুপ্ত এই ছয়জন বন্ধু নিয়ে একটি গ্রুপ। এরা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। এদের কাজ-কর্ম দেখে পাঠকদের না হেসে উপায় নেই। এখন আমরা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' গল্পের কৌতুকরসের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরব। নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো—

গণশা, রাজেনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—"তিলুর বিয়েতে আমি যাব না। এরপর আমার নি-নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গ গণশা তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই চা-চাকরির খোঁজ করগে।" ত্রিলোচন বাসরঘরের কথা প্রসঙ্গে বলেছে—"ছ জনে মিলে, আর এ একলা। ... গোঁফ জোড়াটা নয় ফেলে দোব গণশা, যতটা হালকা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন—" তার উত্তরে গোরাচাঁদ বলেছে—"তা হলে তো নাক কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।" এই পরিপ্রেক্ষিতে গণশা উত্তর দিয়েছে—"বরং ক-ক্বন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে, বরের গ-গ গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।" পুরুত ঠাকুরের সম্পর্কে ঘোঁৎনার মন্তব্যে হাসির উদ্রেক হয়েছে। "ঘোঁৎনা বলিল, পুরুত-ঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!"

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' গল্পে দেখা যায়—ত্রিলোচনের বিয়ে উপলক্ষে দুই পরিবারে সাজো সাজো রব উঠেছে। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা বিভিন্ন ধরনের। গণশা তোতলা প্রকৃতির। রাজেন কবি স্বভাবের, কে. গুপ্ত ফুটবল খেলতে ভালোবাসে, পেটুক গোরাচাঁদ খাদ্যরসিক, আর ঘোঁৎনা আনন্দ বিলাসী। এই ছয়টি চরিত্রের কার্যকলাপে ছোটগল্পটিতে হাস্যরস অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। "গণশা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাব ব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিল—

মূহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি
চিত মোর ব্যা-ব্যা-ব্যা

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল—

ব্যাকুল হোয়,
নয়না নিদ জানত নেহি,
মানত নেহি

গণশা গাইতেছিল—জা-জ্জা-জ্জানত নে-ন্নে-রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, তুই থাম্, এগিয়ে যাচ্ছিস তা—ত্তাড়াহুড়ো করে।” ত্রিলোচন বরের আসনে বসে রয়েছে। গণশা, রাজেনের লেখা গানের সুর ত্রিলোচনকে রপ্ত করিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘কালের পুত্তলিকা গ্রন্থে’ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—“স্থূল রসিকতা নয়, নির্মম ব্যঙ্গ নয়, মনের অতি-সূক্ষ্ম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশরূপে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হাসিকে দেখতে ও পেতে চেয়েছেন।” (পৃ. ২৭৯)

বাসরঘরে স্ত্রী আচার দেখাকে কেন্দ্র করে দুইটি জানলা ত্রিলোচনের বন্ধুরা দখল করেছে। একটিতে রয়েছে রাজেন আর গণশা, অপরটিতে রয়েছে ঘোঁৎনা আর কে গুপ্ত। অপরদিকে গোরাচাঁদের পা দুইটি হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবর-গাদায় ডুবে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে “গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোঁৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—না, হয় না, ফেলে দে। —বলিয়া ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষ বদ্ধ করিল।” উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে লেখকের হাস্যরসের প্রকৃতি বড়ই নির্মল।

অন্যদিকে ডাকাত পড়ার ভয়ে কন্যাপক্ষের লোকজন খুব চিৎকার শুরু করেছে। অনেকেই লাঠি-শোটা, বন্দুক নিয়ে ডাকাত ধরবে বলে হাজির হয়েছে। একসময় গণেশ, রাজেন, গোরাচাঁদ বরের বন্ধু হিসেবে কিছুতেই চিহ্নিত হতে পারেনি, তখন তারা লজ্জিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ত্রিলোচনের বাবা ভবতারণবাবুর সংলাপ আমাদের হাসির উদ্রেক করেছে। “অনেক ডাকাডাকি এবং ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু ‘উ’ করিয়া এক শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, দেখুন তো, এই কি আপনাদের বরযাত্রী? অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্ত্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড়া দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করলেন; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার একটু মর্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, কে বাবা, লন্দি-ভিরিঙ্গি, থিলোচনের বরযাত্র এশ্চো? এক শিলিম্ চড়াও তো বাবা।” বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ গল্পের উদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করে জানা যায়, তিনি ছিলেন ‘জাত-হাস্যশিল্পী’।

‘বরযাত্রী’ গল্পের শেষে দেখা যায়—“কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়া পেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্টি ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।” বাসরঘরে নারীদের কৌতুকপূর্ণ কাজকর্ম দেখার জন্য ত্রিলোচনের বন্ধুদের ছিল অনেক উদ্যম ও উৎসাহ। সেই কৌতূহলের বশেই চার বন্ধুর জন্য বাসরঘর থেকেই এক কিশোরীর হাত দিয়ে এসেছে নারীদের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ। কন্যেপক্ষের লোকেরা পরবর্তীকালে ত্রিলোচনের বন্ধুদের বাসরঘরে প্রবেশের জন্য সকৌতুক আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ‘বরযাত্রী’ গল্পে, ত্রিলোচনের বাসরঘর দেখাকে কেন্দ্র করে—পাঁচ বন্ধু রাজেন, গোরাচাঁদ, গণশা, ঘোঁৎনা, আর কে. গুপ্তর কথোপকথন নির্মল হাসির উদ্রেক করেছে। এক সাক্ষাৎকারে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে বলেছেন—“বিয়ে আমি করিনি বটে তবে দিয়েছি প্রচুর। বিয়ে করিনি বলে তার প্রত্যক্ষ ভালমন্দের দিকটা হয়ত বর্ণনা করতে পারব না কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের যত অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি তা বোধকরি নিজে বিবাহিত হলে সম্ভব হত না।”

পরিচালক সত্যেন বোসের ‘বরযাত্রী’ ১৯৫১ সালে ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। বন্ধুর বিয়ের জন্য বরযাত্রী সেজে নানারকম ছেলেমানুষি করার গল্প কখনই পুরনো হওয়ার নয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি পরিবর্তিত হলেও বরযাত্রীদের আচার-আচরণ দেখে এখনও বিয়ের আসরে উপস্থিত সকলকে হাসতে দেখা যায়। সবশেষে বলা যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে কৌতুকরসের বই হিসেবে চির নতুন হয়ে মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে।

২.৬.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' গল্পের সাধারণ পরিচিতি আলোচনা করো।

২। 'বরযাত্রী' গল্পের নামকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩। 'বরযাত্রী' গল্পের হাস্যরস সম্পর্কে আলোকপাত করো।

২.৬.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

২। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—বীরেন্দ্র দত্ত

৩। বাংলা ছোটগল্প—শিশিরকুমার দাশ

৫.৫.১৩.১.৫ : ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যে একটি অতি প্রিয় নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা ছোটগল্পের স্বনামধন্য শিল্পী ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র প্রতিভা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। 'বনফুল' ছদ্মনামেই যিনি পাঠকদের

কাছে অধিকতর পরিচিত। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। আর সাহিত্যজীবনে তাঁর চমকে দেওয়ার বিষয় ছিল ছোটগল্পের আঙ্গিক। জীবনের খণ্ডাংশকে তিনি পোস্টকার্ডের সাইজের মতো ছোটগল্পে তুলতে ধরতে পেরেছেন। সেইজন্য ছোটগল্পের সংযম তাঁর লেখনীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কথাসাহিত্যিক বনফুল নাটকের জগতেও তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সর্বোপরি বনফুলের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর জীবনদর্শন। বনফুলের জীবনবোধের অভিনবত্বকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিজ্ঞানী মেজাজের ' ও বলেছিলেন। অবশ্যই তাঁর সাহিত্যে জীবনবোধের মূলে রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা। তাঁর উপন্যাসের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে—'তৃণখণ্ড', বৈতরণী-তীরে', 'কিছুক্ষণ', 'মৃগয়া' থেকে শুরু করে 'দ্বৈরথ', 'নির্মোক', 'রাত্রি' , 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'জঙ্গম', 'ডানা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বনফুলের ছোটগল্পেই রয়েছে, তার নিজস্বতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর। সমালোচকদের মতে বনফুলের উপন্যাসের থেকে ছোটগল্পের পরিচিতি পাঠকদের কাছে বেশী করে নজর কেড়েছে। তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পরীতি ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। সেইজন্য তিনি সুন্দর গল্প পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন। বনফুলের গল্প রচনায় আমরা দেখেছি, তিনি পাঠককে দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেন। গল্পের কাহিনী গঠনে বেশী কথা যেমন তিনি বলেন না, তেমনি স্বল্প কথায় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোকে তুলে ধরেন। বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে বিভিন্ন গল্পে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'না বলা বাণী যেমন বলা বাণীর থেকে বেশি বলে' তা বোধকরি বনফুলের ছোটগল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বনফুলের গল্পের প্রকৃতি বুঝতে পারা যাবে এই গল্পগুলি পাঠ করলে —'অজান্তে' 'সমাধান', ক্যানভাসার 'ছোটলোক', 'বুধনী', বৈষ্ণব-শাক্ত', 'তপন' 'লাল বনাত', 'নিমগাছ' প্রভৃতি।

৫.৫.১৩.১.৬ : ক্যানভাসার—সাধারণ পরিচিতি

বনফুলের 'আরও গল্প' (১৯৩৮) সংকলনে 'ক্যানভাসার' অনুগল্পটি স্থান পেয়েছে। ক্যানভাসার যাদের জীবিকা, তাদের নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই নামে একটি গল্প আছে। গল্পটির নাম 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল'। আর আমাদের এখন আলোচ্য বিষয় বনফুলের 'ক্যানভাসার' গল্পটি।

বনফুল একেবারে ভিন্ন স্বাদের কাহিনী সংযোজন করেছেন 'ক্যানভাসার' গল্পে। এই গল্পটির প্রধান চরিত্রের নাম ক্যানভাসার হীরালাল। তাছাড়াও রয়েছে বিবাহিত ভৈরব ও তার স্ত্রী কাত্যায়ণী। ভৈরব অর্থনৈতিক সংকটের কারণে স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দিতে পারেনি। ভৈরবের কাছে এই পরিস্থিতিতে তার স্ত্রীর শাড়ি চাওয়া আবদার বলে মনে হয়েছে। কেননা সংসার সুখের হয় দু'জনের গুণে। তাই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর-পরস্পরের মনোভাব বুঝে চলবে, তা না হলে কিসের পরিবার-পরিজন। গল্পপাঠে আমরা জানতে পেরেছি 'কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়ণী'। বেকার ভৈরব অর্থনৈতিক হাহাকারের জন্য কাত্যায়ণীর শখ মেটাতে পারে না। কাত্যায়ণীর ইচ্ছে ছিল একটি শৌখিন শাড়ি কেনার। সংসারের চাপে তা আর হয়ে উঠেনি। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বেঁধেছে। তারপর ঝগড়া-ঝাটির পরে ঐ দম্পতির মনের অবস্থাও ভালো ছিল না। এইসময় হঠাৎ করে ক্যানভাসার হীরালালের অনর্গল চিৎকার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। তখন ভৈরব রেগে গিয়ে ''খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চর্তুদিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন

ভাঙিল।” এমন সময় ক্যানভাসার হীরালালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হীরালাল চিৎকার করে হাঁকতে হাঁকতে ফেরি করে ‘মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন’।

বেকার ভৈরব তার গ্রামের মধ্যে এক অচেনা লোককে দাঁতের মাজনের ব্যবসা করতে দেখে রেগে যায়। এর আগে হীরালাল এই পল্লীগ্রামে কোন দিন আসেনি। হীরালাল দাঁতের মাজনের ব্যবসা করে শহরের রাস্তায়। কিন্তু ট্রেন বিভ্রাটের কারণে বেচারা এখানে নেমে পড়েছে। ‘‘সন্ধ্যার আগে ফিরিবাব ট্রেন নাই। যদি কিছু বিজ্‌নেস হয়, এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।” তাই ভৈরবের মুখোমুখি হয়ে ক্যানভাসার হীরালাল কিছু বিক্রি করার চেষ্টা করেছে। তাই ভৈরবকে কিছু নেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছে, আর হেঁকে চলেছে—‘‘মাজন আছে —ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ-সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে।”

এরপর গল্প পাঠ করে আমরা জানতে পারি ক্যানভাসার হীরালালের সঙ্গে ভৈরবের কথা কাটাকাটি হয়েছে। আসলে যার যেটা বৃত্তি, সে তো চেষ্টা করবে উপার্জন করার জন্যে। তাই হীরালাল, খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভৈরবকে। এ যেন নিমের দাঁতনের সঙ্গে আধুনিক দাঁতের মাজনের লড়াই শুরু হয়ে গেল। সেই পরিস্থিতিতে গল্পকার হীরালালকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—‘‘আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?” তখন হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলি দেখে ভৈরবের হিংসা হল। এমনকী সে ভাবতে থাকে তাহলে নিমের দাঁতনের যতই পুষ্টিগুণ থাকুক, বোধহয় আধুনিক জীবনধারণ পদ্ধতির কারণে লোকে আর নিমের দাঁতন ব্যবহার করবে না। কাজেই মানুষের মধ্যে এর প্রচার বন্ধ করা উচিত। এমনকী ক্যানভাসার হীরালালের মতো মানুষদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। ‘‘বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে! ওসব মাজন—ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।”

আসলে হীরালালও তো রক্ত-মাংসের মানুষ। বেকার ভৈরবের মতো ওর তো অর্থনৈতিক হাহাকার রয়েছে। সেইজন্যেই তো ক্যানভাসারের জীবিকা গ্রহণ করে কিছু অর্থ উপার্জন ওর মূল লক্ষ্য। কিন্তু ভৈরব চায়, এখনি হীরালাল এই গ্রাম থেকে বের হয়ে যাক্। এই নিয়ে সে যুবক-যুবতীদের ক্ষেপাইয়া তুলেছে। যেখানে দু’বেলা দু’মুঠো পেট ভরে খাবার জোটে না, সেখানে বিলাসিতা করতে দাঁতের মাজন ব্যবহার ভৈরবকে হতাশ করেছে। তখন প্রতিবাদের ফলস্বরূপ ভৈরব হীরালালের গালে চড় মারলে বাঁধানো দাঁত খুলে পড়ে যায়। ‘‘চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।” গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি ক্যানভাসার হীরালালের কাছে শুধু দাঁতের মাজন নয়, চুলের কলপও পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সকলের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ। এই পরিস্থিতিতে বনফুল ‘ক্যানভাসার’ গল্পটি শেষ করেছেন এইভাবে—‘‘স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ—জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ-এই ক’রে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।” হীরালালের কথাশুনে ভৈরব নিজেই এক কৌটা দাঁতের মাজন কিনে নেয়। গল্পকার বনফুল, গল্পটি এখানেই শেষ করেছেন। একটু আগে ভৈরব আধুনিক যুবক-যুবতীদের দাঁতের মাজন ব্যবহারকে বিলাসিতা বলে চালালেও পরিবেশ-পরিস্থিতির বির্বতনে বেকার ভৈরবও সেই রীতি-নীতিতে, জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

৫.৫.১৩.১.৭ : নামকরণ

বনফুলের ‘ক্যানভাসার’ গল্পে আমরা দেখি ক্যানভাসার হীরালাল নিজের অর্থ উপার্জনের জন্য সব কিছু করতে রাজী। কারণ বুড়ো বয়সে বেকার হবার যে জ্বালা, তাতে করে ক্যানভাসিং করে জীবিকা নির্বাহ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। এমনকী তার উপযুক্ত ছেলে ছিল, সেও মারা গেছে। এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জীবন ধারণের জন্য তার সামনে সহজ পদ্ধতিতে ক্যানভাসিং করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। তাছাড়া এই ব্যবসায় এখান-ওখান ঘুরে, মানুষের মন জয় করতে হয় ঠিকই। তবে ব্যবসার ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ কোম্পানীর কাছ থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে মাল নিয়ে, বিক্রি করে তারপর অর্থ শোধ করলেও চলে যায়। সবদিক বিচার করে এই গল্পের নামকরণ ‘ক্যানভাসার’ যথোপযুক্ত হয়েছে। এমনকী এই গল্প পড়ে, গল্পের পরিণামে যে হাস্যরসের উদ্রেক হয়েছে, সেই দিকটির প্রতিও বনফুল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৫.৫.১৩.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

১। সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। বাংলা ছোটগল্প—ভূদেব চৌধুরী

৩। ছোটগল্পের কথা— রথীন্দ্রনাথ রায়

৪। বাংলা ছোটগল্প— শিশির কুমার দাশ

৫। কালের পুত্তলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম-২য় খণ্ড) —বীরেন্দ্র দত্ত

৭। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি—সোহারাব হোসেন

৫.৫.১৩.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাশীবাসিনী গল্পের বাৎসল্য রসের পরিচয় দাও।

৩। গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৪। বনফুলের ক্যানভাসার গল্পের মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।

৫। বনফুলের ক্যানভাসার গল্পের হাস্যরসের পরিচয় দাও।

একক ১৪

প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প

উপএকক - ২

প্রেমেন্দ্র মিত্র—সংসার সীমান্তে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—টোপ

বিন্যাসক্রম

৫.৫.১৪.২.১ : ভূমিকা

৫.৫.১৪.২.২ : ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

৫.৫.১৪.২.৩ : সংসার সীমান্তে—সাধারণ পরিচিতি

৫.৫.১৪.২.৪ : নামকরণ

৫.৫.১৪.২.৫ : ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫.৫.১৪.২.৬ : টোপ—সাধারণ পরিচিতি

৫.৫.১৪.২.৭ : নামকরণ

৫.৫.১৪.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

৫.৫.১৪.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৫.১৪.২.১ : ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত ধারায় প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে এই এককে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটগল্পকার হিসেবে দু'জনেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। বিশ শতকের দু-এর দশক ও তিনের দশকের পর মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, বেকারী ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার মধ্যেই গল্পকারের গল্প রচনার সূত্রপাত। স্বাভাবিক কারণেই সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি দুই গল্পকারের গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময় বাংলা কথাসাহিত্যে এক দল তরুণ লেখক হাজির হয়ে নানামুখী ভাবে সাহিত্য সৃজন করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে নাম করতে পারি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রাক্ চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পের লেখকরা তাঁদের গল্প বিষয়কে স্বতন্ত্র করে অঙ্কন করেছেন। বর্তমান আলোচনায় আমাদের নির্বাচিত গল্পকারদের, গল্প-বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।

৫.৫.১৪.২.২ : ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিশিষ্ট এই কারণে যে, দুই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র বহুবিধ সংকট তৈরি হয়েছিল। তার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। একদিকে হাহাকার, শূন্যতা কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। সেইসময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক মনীষ ঘটক, গোকুলচন্দ্র নাগ, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক সাহিত্য সৃজনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকতেই 'রবীন্দ্র-উত্তর' যুগের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল এঁদের হাতেই। তার ফলে রবীন্দ্রোত্তর কালের এক অনন্য ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র উঠে এলেন। কবিতার জগতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র বিচরণ করেছেন, তার ফলে কবি হিসেবে ও তাঁর খ্যাতি জগৎ জোড়া। সর্বোপরি বলা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন কল্লোলের লেখক। ''বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ গ্রন্থে'' বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন— ''আসলে তিনি ছিলেন মনে -প্রাণে কল্লোলীয়। অর্থাৎ 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের কালে 'কল্লোলের' জন্মের মূলে; প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো, যে মানসভূমি রচিত হচ্ছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসিকতা তার ঘনিষ্ঠ অনুবর্তী ছিল।'' (পৃ: ৬২৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত হয়ে, মানব মনস্তত্ত্বের কথাকে ছোটগল্পের মধ্যে রূপ দিলেন। মানব মনোজগৎ রহস্যময়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই মনস্তত্ত্বকে ছোটগল্পে চিন্তার আলোকে ধরেছেন। তারফলে গোটা মানুষের মানে খুঁজতেই তিনি একের পর এক জীবনপর্বে অগ্রসর হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম ছোটগল্প 'শুধু কেরাণী'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৩ খ্রিঃ। তারপর কয়েকদিন পর 'কল্লোল' পত্রিকায় 'শুধু কেরাণী' গল্পের সমালোচনা বের হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেকগুলি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের গল্প, মনস্তাত্ত্বিক গল্প, সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের গল্প ইত্যাদি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পুন্নাম, ভবিষ্যতের ভার, হয়তো, সাগরসংগম, মৃত্তিকা, অনাবশ্যক, মহানগর, জনৈক কাপুরুষের কাহিনী, কুয়াশায়, সংসার সীমান্তে, পুনর্মিলন, ভস্মশেষ, শৃঙ্খল, স্টোভ, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন প্রভৃতি।

৫.৫.১৪.২.৩ : সংসার সীমান্তে —সাধারণ পরিচিতি

প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষের পায়ের তলার মাটি সরতে আরম্ভ করেছিল বহুবিধ কারণে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে সেই সংকটের চেহারাটি লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পগুলির মধ্যে। তিনি একে একে লিখে গেছেন—পুন্নাম, হয়তো, সাগর সঙ্গম, সংসার সীমান্তে, স্টোভ, মহানগর, তেলেনাপোতা আবিষ্কার প্রভৃতি ছোটগল্প।

আমাদের আলোচ্য 'সংসার সীমান্তে' গল্পে রজনী ও অঘোর সমাজের দুই বঞ্চিত নারী-পুরুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। সমাজের নীচের তলায় বসবাস করে বলে এদেরকে কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। আবার তাদের জীবনে অর্থনৈতিক হাহাকার ও নানা সমস্যা শূন্যতায় ভরে উঠেছিল। তারফলে তাদের জীবনে নেমে আসে কালো ধোঁয়া। গল্পের শুরুতে রজনীর জীবনের একটি দিক তুলে ধরেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র— ''বৃষ্টির ঝাপটা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরোসিনের ধুমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অন্ত নাই। কিম্বা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোন অর্থই আর নেই।''

'সংসার সীমান্ত' গল্পের পাকা চোরের নাম অঘোর দাস। হঠাৎ ঝড়-জলের রাতে তাড়া খেয়ে অঘোর দাস রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়িতে থাকার জন্য রজনীকে ভাড়া বাবদ সে দিয়েছে এক টাকা। কিন্তু রাতের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার আগে ঐ এক টাকা নিয়ে অঘোর দাস পালিয়ে গেছে। রজনীর হতাশা হওয়ার কিছু নেই, সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের থেকে এরকম ব্যবহার পাবে, তাতে আর নতুনত্ব কি? ''মানুষের কাছ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে।'' আবার এক দিনে কি মনে করে দুপুরবেলায় রজনীর কাছে অঘোর হাজির হয়েছে। তারপর জনগণের হাতে প্রচণ্ড মার খাবার পরিবেশ তৈরি হলেও বেঁচে গেছে। যদিও মার খাওয়ার মূলে অবশ্য রজনী। ''রজনীর সাহস বাড়িয়াছে। রাগের মাথায় সে বলে, হ্যাঁ, হাতে হাত কড়া সবাই দিচ্ছে। যা না তুই পুলিশে। আমি ও বলতে জানি, সিঁদকাঠি নিয়ে প্রথমদিন ঘরে ঢুকেছিলি মনে নেই।'' তারপর অঘোর দাসও রেগে গিয়ে রজনীকে কথা শুনিয়েছে। সে বলেছে, অঘোর দাস কাউকে ভয় পায় না। তখন রজনী আবার বলতে শুরু করেছে—''দেখিনি আবার, সেদিন পুঁটলির ভিতর কি ছিল? তাড়া খেয়ে আমার ঘরে তো ঢুকেছিলি লুকোতে। বুঝি না আমি কিছু।''

মানুষকে মারধর করা উচিত নয়। মানুষ যে চুরি করে, তা নিজের ইচ্ছেয় করে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে চুরি করতে বাধ্য করে। 'সংসার -সীমান্তে ' গল্পের অঘোর দাস ও সামাজিক সংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে ও এই পরিস্থিতিতে কি করবে, কি খাবে, কিছুরই ঠিক-ঠিকানা করতে পারছে না। তাই রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে বলে দোষের কিছু নয়। তখন রজনী অন্য লোকদের বুঝিয়ে অঘোরকে মারধর করতে নিষেধ করেছে। এমনকী রজনী, অঘোর দাসের সেবা-শুশ্রুষার দায়িত্ব নিয়েছে। ''কিন্তু হপ্তা কাবার হইবার পরও লোকটার যে সারিবার লক্ষণ নাই। রজনীর ধৈর্য আর কতদিন থাকে।''

রজনী ও অঘোর দাস সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সেইজন্য তাদের জীবন-ধারণ পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র শহরের অলিতে-গলিতে যে জীবনকে দেখেছেন, সেই জীবনের খণ্ডচিত্রকে 'সংসার -সীমান্তে' ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। গল্পের রজনী ও অঘোর দাস সুস্থ ও সুন্দরভাবে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। দু'জন, দু'জনকে কাছে পেয়ে যেমন মনের কথা বলেছে, তেমনি পরস্পরের ভালোবাসারও প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। দু'জন অপরিচিত হলেও ধর্ষণের শিকার হয়নি বরঞ্চ নিখাদ ভালোবাসা ও সীমান্তের বিশ্বাস নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। নগরের বিশাল জনারণ্যের মধ্যে যৌবনের সীমান্তে তারা পরস্পর সবকিছু বুঝে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। ''বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারও ঘর বাঁধতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদের সাধ যায়।'' কিন্তু সংসার সীমান্ত রেখায় দাঁড়িয়ে, দুটি নর-নারী সংসারে প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু অস্তিত্বের সংকটের কারণে শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। পরিবেশ-পরিস্থিতি সংকটজনক হওয়া সত্ত্বেও দুটি নর-নারী নিঃস্ব হয়েও আশায় বুক বাঁধতে চেয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। অঘোর দাস আবার কুড়ি টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আর কুড়িটা টাকা থাকলে বাড়ি ভাড়া শোধ করে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। কিন্তু তা আর হল না। ''সে হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছে যে সত্যিই আর সে এমন কাজ করিবে না। এ পথ ছাড়িয়া দিতে সত্যই সে চায়। এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।''

দুটি নর-নারী সব কিছু পরিত্যাগ করে, সবুজ মন নিয়ে সংসারের যাতাকলে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের পরিহাসে তারা দিক্‌ভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে দু'জনের এখন অস্তিত্বের সংকট। বিচারক চুরির দায়ে অঘোর দাসকে পাঁচ বছরের জেলের রায় দিয়েছেন। সেই রায় শুনে অঘোর দাস মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। তারপর বিচারককে দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছে—"হঠাৎ কাঠগড়া হইতে হুংকার দিয়া লাফ মারিয়া উঠিয়া বিচারককে সে আক্রমণ করিয়াছে।" সেই পরিস্থিতিতে বিচারকের আইনের বাইরে কিছু করার নেই। তারও হাত-পা বাঁধা। আইনের চোখে সবাই সমান। সেইজন্য বিচারকও কিছু করতে পারেননি।

'সংসার সীমান্তে' গল্পটির এই উপস্থাপন কৌশলে লেখক ভেবেছেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকটের চেহারাটি তুলে ধরার জন্য। গল্পের শেষে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন— "অঘোর দাস এখনও জেলে পচিতেছে। .....ডিবিয়ার ধূম শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয় বিগত যৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাতের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।"

৫.৫.১৪.২.৪ : নামকরণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র এ গল্পের নামকরণ করেছেন 'সংসার সীমান্তে'। সংসার সীমান্তে, বিচিত্র জীবন জটিলতায় মানুষ কত অসহায় তা লেখক দেখাতে চেয়েছেন এ গল্পে। গল্পের শুরুতেই লেখক পাঠককে আহ্বান জানিয়েছেন—তখনই বোঝা গেছে তিনি সামাজিক সংকটের গল্প শোনাতে বসেছেন। সমাজের যারা অবহেলিত, যারা লাঞ্ছিতা, হাল ভাঙা, পালছেড়ার মতো যাদের কোমর ভেঙে গেছে, তারা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে উঠে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সংসারের সেইসব মানুষদের জীবন-ধারণ পদ্ধতি তুলে ধরেছেন গল্পটির মধ্যে। সমাজের যাদের জন্য, ঐ নিরন্ন মানুষগুলির এমন দুর্দশা লেখক তাঁর অনুসন্ধান করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বারবার ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন, তারই প্রকাশ তাঁর সাহিত্য রচনায় লক্ষ্য করা গেছে। অর্থনৈতিক হাহাকারে যাদের নিজের বাড়ি নেই, বাড়ির ঠিকানা নেই। এমনকী টাকার অভাবে বাড়ী ভাড়া পর্যন্ত নিতে পারে না। শেষপর্যন্ত তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয় ভদ্রসমাজের রাস্তার ধারে।পথই তখন তাদের শেষ সম্বল। পথই রজনীর মতো মানুষদের শেষ ঠিকানা। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই গোটা মানুষের মানে খুঁজতে একের পর এক বন্দরে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর 'প্রথমা' কাব্যের 'মানে' কবিতায় বলেছেন—

"মানুষের মানে চাই—
গোটা মানুষের মানে।
রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা
ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত
গোটা মানুষের মানে চাই।"

মানুষের মানে খুঁজতে খুঁজতে তিনি পথের শেষ প্রান্তে যদি কিছু থেকে থাকে তাঁর চেষ্টায় ব্যস্ত থেকেছেন। যৌবনের সীমান্তে বা সংসারের অপরপারে যে জীবন রয়েছে, তাঁর চুরচেরা বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। সংসার সীমান্তে রজনীর পথ চলা কিন্তু শেষ হয়নি। তাই জীবন পর্বে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে যাওয়ার পর যদি কোনদিন

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ পান, তাহলে তার সুদিন আসবে। সেই আশাতেই জীবনের স্থায়ী ঠিকানা আপাতত সংসার সীমান্তে, সেই দিক থেকে নামকরণ সার্থক।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে' গল্পের চরিত্র গুলির প্রতি লেখকের সমবেদনা গভীর। মার্কসবাদী কবি ও গল্পকার এখানেও মেহনতী মানুষের পাশে তাদেরই হয়ে থাকতে চেয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র পতিতা রজনী ও বিড়ম্বিত চোর অঘোর দাসের জীবনের বির্বতন শুনিয়েছেন 'সংসার সীমান্তে' গল্পে। আমাদের ভদ্রসমাজের বাইরে দুটি নর-নারী অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে থেকেছে। ''শহরের এক প্রান্তের রাস্তাটিতে আমাদের গল্প শুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায়।" গল্পকার এইভাবেই কাহিনী শুরু করে দিয়েছেন। তিনি কিছুক্ষণ পরেই আবার বলেছেন—''রাস্তাটির নাম নাই বলিলাম—দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপরিগুলি তাহার শোভাবর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।" এর থেকে বোঝা যায় গল্পকার ভদ্রসমাজের বাইরের চাল চিত্র তুলে ধরেছেন। এমনকী গল্পের রজনী ও অঘোর দাস ভদ্র পরিবারের কেউ নয়, তা বলতে ভুল করেননি। এই নর-নারী দুটিকে নিয়েই গল্পকার কাহিনীর অগ্রসর ঘটিয়েছেন। ''মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নেই।...এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মত দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়।" প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমবেদনা ছিল বলেই এরকম কথা বলতে পারেন। গল্প পাঠ করে আমরা অনুভব করেছি সংসারের প্রান্তবর্তী রজনী ও অঘোর দাসের করুণ পরিণতি এই গল্পের মূল উপজীব্য। নির্যাতিতা মানুষদের প্রতি গল্পকারের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সুধী সমালোচক অন্নদাশঙ্কর রায় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে একবার বলেছিলেন— "Broken hearted dreamer" । অন্নদাশঙ্করের বিশ্লেষণ ছিল যে ভগ্ন হৃদয় স্বপ্নদর্শী প্রেমেন্দ্র। কিন্তু আমাদের পাঠ্য 'সংসার সীমান্তে' ছোট গল্পে রজনী ও অঘোর দাস সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু পরিস্থিতির চাপে আর সংসার করা হলো না। সেই দিকেও 'সংসার সীমান্তে' নামকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.৫.১৪.২.৫ : ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ছিলেন বাংলাসাহিত্যের প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। যে কোন সৃজনশীল মানুষের মতই তাঁর গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির সঙ্গে মিলে মিশে আছে নিজের জীবন অভিজ্ঞতার কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুধু প্রতিভাবান সাহিত্যিক ছিলেন না, প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রতিনিধি স্থানীয়ও বটেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রূপে ও রসে, ভাবনায় ও বেদনায় তিনি অগ্রণী শিল্পী। তারফলে নিজের জীবনদর্শন দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জন্য স্বতন্ত্র এক জগৎ তৈরি করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভা নব নব দিগন্তে প্রসারিত হয়ে পাঠককুলের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ। সমরেশ মজুমদারের ভাষায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন—''সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাষ্টারমশাই নারায়ণবাবুর বাইরে আর একজন নারায়ণবাবু আমাকে আকর্ষণ করতেন, তিনি এক রোমান্টিক পুরুষ।" প্রথম জীবনে কবিতা লিখলেও, ছোটগল্পের জগৎই তাঁকে স্থায়ী আসন এনে দিয়েছে। কালক্রমে তিনি অনেকগুলি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— 'উপনিবেশ' (১৯৪৪), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৪৪), 'মন্দ্রমুখর' (১৯৪৫), 'শিলালিপি' (১৯৪৯), 'লালমাটি' (১৯৫১), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫১), 'বৈতালিক' (১৯৫৫) প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'নিশীথের মায়া'। গল্পটি প্রথম দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর একে একে তিনি লিখেছেন— 'বীতংস', 'জন্মান্তর', 'ভাঙ্গাবন্দর', 'দু:শাসন' প্রভৃতি গল্প গ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল—'নক্রচরিত', 'কালোজল', 'পুষ্করা', 'মৃত্যুবান', 'ভোগবতী', 'হাড়', টোপ', 'ভাঙাচশমা', 'বনতুলসী', সৈনিক' প্রভৃতি গল্প। জীবন পথে চলতে গিয়ে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন। তারপর সাহিত্য সৃজন করে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের নানা স্বাদের ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন। ''বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ" গ্রন্থে,বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন— ''নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে তাঁর সময়কে পাশে নিয়ে মানুষ আর জীবনের বাঁচার কথা স্পষ্ট করে বলারই প্রয়াস একমাত্র সত্য। এই বাঁচা মূলত যৌনতার বিকৃতি থেকে বাঁচা, পেটের ক্ষুধা থেকে বাঁচা, মানুষের জন্য মানুষের বাঁচা, জীবনকে বলিষ্ঠ এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঁচা, নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম সম্পর্কের সুস্থতার জন্য বাঁচা।" (পৃ: ২৮৪)

৫.৫.১৪.২.৬ : টোপ—সাধারণ পরিচিতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পটি খুব বিখ্যাত ছোটগল্প। 'টোপ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মাছ ধরার সময় তাকে লোভ দেখিয়ে বঁড়শিতে বিদ্ধ করতে যা ব্যবহার করা হয়। এ গল্পের রামগঙ্গা এস্টেট-এর জমিদার রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর বাসনা হল শিকার করা। লেখক গল্পের শুরুতেই বলেছেন—''এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার-কাহিনী।" আর শিকার দেখতে আসা কথককে শিকারের আগে রাজাবাহাদুর জানিয়েছেন—''দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।" গল্পের পরিণতিতে আমরা জানতে পেরেছি রাজাবাহাদুর যে শিকার করেন মাছ, তা ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে। ''কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গাম।" গল্পপাঠে বোঝা যায় মাছ শিকার করার জন্য যে টোপ ব্যবহার করেন, তা আসলে 'জীবন্ত দু'বছরের মানবশিশু'। ছাগ শিশু নয়,গরুর বাচ্চা নয়, একেবারে মানবশিশু ব্যবহারের মধ্যে গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের করুণ দুর্দশার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মন্বন্তর, দাঙ্গা, অনিশ্চয়তা বহুবিধ সংকট প্রকটভাবে আছড়ে পড়েছে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে। তারফলে দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পের পরিণতিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন, সন্দেহ, অবিশ্বাস, হতাশা-ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে নিম্নবিত্ত মানুষের কোন মান-মর্যাদা নেই। তারা মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। তারফলে নিম্ন শ্রেণির মানুষকে নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। রাজাবাহাদুরের মতো আমাদের সমাজের মানুষেরা নেশা করে, গরিব মানুষকে অত্যাচার করে। এমনকী বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে ভোগবাদী জীবন কামনা করেছে। তাই রাজাবাহাদুরের হিন্দুস্থানী কীপারের মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলি খুবই অনাদরে, অবহেলায় দিন কাটালেও এদের কোন মাথা-ব্যথা নেই। ঐ সব মাতৃহীন শিশুরা ঠিকমতো খেতেও পায় না। তবুও রাজাবাহাদুরের মতো মানুষরা নিরন্ন মানুষগুলিকে খাবার দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন না। কেননা এরা হল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিভু। তাই গরিব মানুষগুলোকে অতিরিক্ত খাটালেও যেমন বেশি পারিশ্রমিক দেন না তেমনি নিজেদের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট কাজের বাইরেও মজদুর শ্রেণির মানুষকে কাজে লাগিয়েছেন। 'টোপ'

গল্পেও দেখা যায় রাজাবাহাদুর কীপারকে কখনও কখনও শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজের কাজ হাসিল করার জন্য। সেই পরিস্থিতিতে ''মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের।দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।" রাজাবাহাদুর বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে, কীপারের অনুপস্থিতিতে তারই একটি দু'বছরের সন্তানকে 'টোপ' হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। রাজাবাহাদুরের শিকারের আয়োজন দেখে গল্প কথকও স্তম্ভিত। ''দু খানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।"

কিছুক্ষণ পরে টোপের পুটলি থেকে ছোট শিশুর স্পষ্ট গোঙানি শুনতে পেয়েছেন গল্পের কথক। চারশো ফুট নিচে থেকে সেই শব্দটা ভেসে আসছে। আবার কীপারের সন্তানকে শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অথচ দু'জন বেয়ারা সব দেখেশুনেও চুপ থেকে গেছে। তারা রাজাবাহাদুরের প্রতি প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। এর থেকে মনে হয়, একই শ্রেণির মানুষ হলেও কাউকে শোষণ করা, আবার কাউকে বেশি করে পাইয়ে দেওয়ার যে রাজনীতি আমাদের সমাজে শুরু হয়েছে, তার পরিণতি কিন্তু ভয়ংকর। ''আমার বুকে রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ।" গল্পকার কাহিনীকে এখানে শেষ না করে, এই ঘটনার আটমাস পরে রাজাবাহাদুর কথককে একটি উপহার পাঠিয়েছেন ডাকযোগে। ''আট মাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন আমাদের সমাজে রাজাবাহাদুরের মতো মানুষ যেমন দোষী তেমনি সেই শ্রেণির মানুষকে যারা সমানভাবে তোষামোদ করে তারাও দায়ী। কেননা কথক নিজে প্রতিবাদ করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। বাঘের চামড়ার চটির আরামের পিছনে যে সামাজিক সংকট বা মানবিক সংকট রয়েছে গল্পের কথক তাতে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। তারফলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে শ্রেণি বিভাজন চলেছে, তার থেকে আমাদের মুক্তি নেই। সবাই নিজের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে, তার বাইরে যে সমাজ রয়েছে, মানুষের অত্যাচার রয়েছে, মানবিকতার সংকট রয়েছে, তার দিকে আমরা খেয়াল পর্যন্ত করি না। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'টোপ' গল্পের মধ্যে দিয়ে সেই অস্তিত্বের সংকটকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

৫.৫.১৪.২.৭ : নামকরণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পের বিষয়টি একটি শিকারকাহিনী। রামগঙ্গা এস্টেট এর জমিদার রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর শিকারের আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন গল্পের কথক। টোপ ফেলে মাছ ধরেছেন রাজাবাহাদুর। সেই পরিবেশে দেখা যায়— ''ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শাল পাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য।" যেখানে ছাগশিশুকে টোপ হিসেবে কাজে না লাগিয়ে দু'বছরের মানব শিশুকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে শিকার করা হয়েছে। তারপর আনন্দে আট্‌খানা হয়ে বাঘের চামড়া দিয়ে চটিজুতো পরার যে আরাম প্রিয়তা সেই দিকটিকে লেখক ব্যঞ্জনার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ''কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে

গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরে ছিলেন রাজাবাহাদুর —লোককে ডেকে দেখানোর মতো।”

আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবজীবনে নানা সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। ধনতন্ত্রের প্রভাবে বিশ্বের মানবসমাজ টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত। মানুষের মনে তখন কোনো সুখ ছিল না। এমনকী হতাশা, নৈরাশ্য ও ক্লান্তি মানুষকে ঘিরে ধরেছিল। তারফলে অস্তিত্বের সংকট মানুষের জীবনে এমনভাবে নেমে এসেছে, তখন তার যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘টোপ’ গল্পের মধ্যে দিয়ে হত দরিদ্র মানুষগুলির অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে উঠতে না পারাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। রাজাবাহাদুর এন.আর.চৌধুরীর মতো সুবিধাবাদী মানুষরা, সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষের কথা ভাবেন না। তারা সাধারণ মানুষদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের প্রয়োজনে তাদেরকে ‘টোপ’ হিসেবে ব্যবহার করেছে। সেইদিক থেকে ‘টোপ’ গল্পটির নামকরণ সার্থক। তবে মানুষে— মানুষে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আদান-প্রদানের মধ্যেই রচিত হয়েছে সুস্থ সামাজিক জীবন। আর তা থাকে না বলেই মানবজীবনে সংকট নেমে আসে। ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন ভালোবাসার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে জীবনের আলোকময় দিকটিকে। আর তা যদি না হয়, তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণি সাধারণ মানুষকে নানা দিক থেকে ‘টোপ’ হিসেবে কাজে লাগাবে। তারফলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়ংকর। আর মানুষ দিন দিন শোষিত হয়েই থেকেই যাবে। একদিকে দারিদ্র্য আর অপরদিকে বিলাসিতার ছবির মাধ্যমে লেখক গল্পের মূল রসকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

৫.৫.১৪.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা ছোটগল্প—শিশিরকুমার দাশ

২। কালের পুত্তলিকা— অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৩। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম-২য়খণ্ড)—বীরেন্দ্র দত্ত

৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি—সোহরাব হোসেন

৫। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য— হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৫.৫.১৪.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দাও

২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পে সমাজ ও মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।

৩। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পের সামাজিক সংকটের পরিচয় দাও।

জি ই সি / সি বি সি এস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়

পর্যায় গ্রন্থ - ২, একক - ৬

উপএকক - ৩ বিমল কর : নিষাদ

<u>বিন্যাসক্রম</u>

২.৬.৩.১ : ভূমিকা

২.৬.৩.২ : নিষাদ গল্পের কাহিনি সংক্ষেপ

২.৬.৩.৩ : নামকরণ

২.৬.৩.৪ : প্রতীকী গল্প

২.৬.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৬.৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

<u>২.৬.৩.১ : ভূমিকা</u>

বিমল কর উত্তর ২৪ পরগণার টাকীতে জন্মগ্রহণ করেন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। লেখকের বাবার নাম—জ্যোতিষচন্দ্র কর এবং লেখকের মায়ের নাম—নিশিবালা কর। জব্বলপুর, হাজারিবাগ, গোমো, ধানবাদ, আসানসোল প্রভৃতি জায়গায় তাঁর শৈশব কেটেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এক ক্রান্তিলগ্নে। কর্মসূত্রে তাঁকে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে, তবে কলকাতা শহরে বেশি সময় কাটিয়েছেন। বিমল করের লেখা প্রথম গল্প 'অম্বিকানাথের মুক্তি', গল্পটি ১৯৪৪ খ্রি: 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিমল করের ভাষায়—

> "গত চল্লিশ বছরে আমি কত গল্প লিখেছি তার সঠিক হিসেব আমার জানা নেই। শয়ের কাছাকাছি হতে পারে। একদা আমার যেসব গল্পগ্রন্থ পাওয়া যেত, এখন আর পাওয়া যায় না। নিজের সংগ্রহেও কোনও কপি নেই। যা লিখেছি আর যা জোগাড় করতে পেরেছি তার থেকে বাছাই করে পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে এই গল্পসংকলন। এটিকে আমার স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ বলা যায়। লেখকের পছন্দ, ভাল-মন্দ লাগার সঙ্গে পাঠকের মনের মিল নাও হতে পারে। উপায় কী। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে। এই পঞ্চাশটি গল্পই লেখকের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। এর বেশি নাই বা থাকল।"

বিমল কর ‘ইদুঁর’, ‘মানবপুত্র’, ‘দুইবোন’, ‘আঙুরলতা’, ‘যযাতি’, ‘বাঘ’, ‘সুধাময়’, ‘নিষাদ’, ‘গগনের অসুখ’, ‘জননী’, ‘বসন্ত বিলাপ’, ‘এরা ওরা’ প্রভৃতি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে বিমল কর অন্তর্মুখী লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ‘বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ গ্রন্থে’ বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

> “বিমল কর মন্বন্তরের মৃত্যু, যুদ্ধের মৃত্যু—এমন সব অসহায়তার মৃত্যু ভাবনাকে মনের নির্জন নিঃশব্দ কোণে নিজের মতো গ্রহণ করেছিলেন।” (পৃ. ৪০২)

বিমল করের অধিকাংশ গল্পে মৃত্যুচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখা ‘আঙুরলতা’ গল্পে নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যু, ‘নিষাদ’ গল্পে ছাগল ছানার মৃত্যু উল্লেখযোগ্য বিষয়। ‘পঞ্চাশের দশকের কথাকার’ গ্রন্থে, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদনা) বলেছেন—গল্পকার বিমল কর প্রথম থেকেই চরিত্রের আত্মমগ্নতায় ডুব দিয়েছেন। আর সেই আত্মমগ্নতায় তিনি এক গভীর জীবন-দর্শনকে ধরতে চেয়েছেন। সেটি হল জীবনের একাকিত্ব ঘরে বিচরণ এবং পরিণামী মৃত্যুর পরোয়ানায় জীবনকে অবলোকন।” (পৃ. ৩৩৩) গত চল্লিশ বছরেরও বেশি কাল ধরে বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিমল কর স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিমল করের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল ‘দেওয়াল’। উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়াও তিনি লিখেছিলেন—‘বনভূমি’ (১৯৫৭), ‘মল্লিকা’ (১৯৬০), ‘যদুবংশ’ (১৯৬৮), ‘অসময়’ (১৯৭২), ‘সংশয়’ (১৯৮০) প্রভৃতি উপন্যাস। বিমল কর ৮২ বছর বয়সে ২৬শে আগস্ট ২০০৩ খ্রি: বিধাননগরের বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

২.৬.৩.২ : নিষাদ গল্পের কাহিনি সংক্ষেপ

বিমল করের ‘নিষাদ’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘নিষাদ’ গল্পটি মুদ্রিত হয়েছিল ঐ একই বছরে জুলাই মাস নাগাদ। বিমল করের ‘নিষাদ’ গল্পে অভিমানী, জেদী বালক জলকু-র ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যাওয়ার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। জলকু-র মৃত্যু বর্ণনার পাশাপাশি তার প্রিয় ছাগলছানা মানিক ও তার তরুলতা পিসির প্রেমের অনুষঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। গল্প পাঠে আমরা জানতে পারি জলকু প্রতিদিন আক্রোশের বসে রেললাইনে পাথর ছুঁড়তে থাকে। ‘নিষাদ’ গল্পের কথক বলেছেন—“ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে। হয়তো আজ কিংবা কাল।” গল্প পাঠে জানা যায় নিয়তির মতো এক

অমোঘ মৃত্যুর চোরাটান বয়ে যেতে থাকে গল্পের কাহিনির অগ্রগতিতে। বিমল করের 'নিষাদ' গল্পে মৃত্যু, শূন্যতা, একাকীত্ব, নির্জনতাবোধ গল্পের সমাপ্তিতে এসে লক্ষ্য করা গেছে। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ গ্রন্থে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন—" 'নিষাদ' গল্পে অবশ্যই মৃত্যু এমন আশাবাদে রূপ পায়নি। গল্পের কথকের আত্ম-যন্ত্রণাদগ্ধ রূপের, শূন্যতার আস্বাদময়তা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে তা অন্তর্মুখ থেকেছে। গল্পের প্রথমেই তাই এই উদ্ধৃতি—"You begin by killing a cat and you end by killing a man." আপনি একটি বিড়াল হত্যা করে কাহিনি শুরু করেন এবং আপনি একজন মানুষকে হত্যা করে কাহিনি শেষ করেন। এই ধারণা ও ভাবনা অবশ্যই 'নিষাদ' গল্পে কোনো বর্ণনায়, ঘটনাদির সূত্রবদ্ধ কোনো টানা আখ্যানে ধরা হয়নি। কথকের মনোলোকেই তার দ্বন্দ্বময় একাধিক প্রতিক্রিয়ার উৎস থেকে উঠে আসে গভীর স্বভাবে, নিঃশব্দে, নির্জনে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'আত্মস্থমগ্নতা' বিমল করের লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। বিমল করের গল্পে মনন প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেইসঙ্গে বিষাদ-ঘন পরিবেশও পাঠকের হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তোলে।

'নিষাদ' গল্পটি একটি বালক জলকু আর একটি রেললাইনের। বালকটির নাম জলকু, বারো বছর বয়স। এখানকার দেহাতি ছেলেদের মতনই দেখতে। জলকুর গায়ের রঙ গাঢ় কালো। "মুখটা গোল, ফোলা ফোলা গাল, চিবুকের ডৌলটুকু এখনও ফোটেনি, কারিগরের হাত পড়েনি বোধহয়। নাকটি মোটা, বসা। পুরু মোটা মোটা ঠোঁট। জোড়া ঘন ভুরুর তলায় বড় বড় দুই চোখ। কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব। কালো শান্ত চোখের তারা আর সাদাটে জমিটা যেন জলে জলে ভেসে উঠেছে। জলকুর কপাল আছে কি নেই বোঝা যায় না চট করে। মাথা ভর্তি একরাশ চুলে কপাল, ঘাড়, কানের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে থাকে।" ছেলেটা একেবারে জংলী। সব সময় খালি গায়ে থাকে। বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় পায়ে জুতো পর্যন্ত পরে না। কথক বলেছেন—"ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে। হয়ত আজ ... কিংবা কাল। এই এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার। আগে ছিল না।" জলকু টিলা থেকে নেমে রেললাইনে চলে যেতে শুরু করেছিল। আর নতুন যে খেলা খেলতে শুরু করেছিল তা বাস্তবিক নতুন নয়, কিন্তু দিনে দিনে কেমন এক ভয়ংকর খেলা হয়ে উঠেছিল। রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে বিদ্বেষের বশে লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়ে ফেলার খেলা জলকুকে পেয়ে বসেছে। "আজকাল প্রতিদিন সে এই খেলা খেলছে, প্রতিদিনই। আর এই খেলায় তার ক্লান্তি নেই,

বিরক্তি নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ্দুরে, তাপে, লু-য়ে জলকু পাথর ছুঁড়ছে, রেললাইনে তাক করে। আর প্রায় রোজই ওকে ধরে আনতে হয়।”

জলকুর বাবা পঙ্গু মানুষ। জলকুর মা রোগা, রুগ্ন, কালো, অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া গ্রাম্য প্রকৃতির। গল্পের কথক বলেছেন—“জলকুদের একতলা ছোট টালিছাওয়া বাড়ির পশ্চিমটা আমার, ভাড়া পাওয়া। পুবটা তাদের। আমার এলাকায় একটি মাঝারি, অন্যটি ছোট ঘর, সামনে পিছনে সামান্য বারান্দা, খাপরা-ছাওয়া একফালি রান্নাঘর।”

জলকুর পিসির নাম তরুলতা। সবাই তাকে তরু বলেই ডাকে। ঢেঙা রোগাটে গড়ন তার। তরুর মুখের ছাঁদটি লম্বা ধরনের। গায়ের রঙ খুবই কালো। বয়স কুড়ি বছর অতিক্রম করেছে, তবুও বিয়ে হয়নি। “একটি দুটি বসন্তের না মেলানো দাগের সঙ্গে হতাশা এবং কাতরতা মাখানো সেই মুখ কেমন যেন রিক্ত শূন্য অবোধ দেখাত।” গল্পের কথকের সঙ্গে সঙ্গে তরুর মেলামেশা গল্প গুজব ছিল না। তাদের দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হলে জলকুর খোঁজ নিয়ে তরু চলে যেত। গল্পের কথক গ্রামোফোন বাজালে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনত। তরু লেখাপড়া জানতো বলে কখনও আবার বাংলা মাসিক পত্রিকা চেয়ে নিয়ে পড়তে ভালো লাগতো। কথক বলেছেন—“গল্প করতে, গান শুনতে তরু এলে আমি বোধহয় অখুশি হতাম না। পরে সে-কথা বুঝেছি। আর যখন কথাটা স্পষ্ট করে বুঝছি, তখন থেকে জলকু তার সর্বনেশে নতুন খেলা শুরু করল।”

জলকুর মানিক মারা যাওয়ার পর রেললাইনের প্রতি আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। জলকু মনে করেছিল তার প্রিয় ছাগল মানিক বোধহয় রেললাইনে কাটা পড়ে মরেছিল। সেইজন্য জলকু একটার পর একটা পাথর কুড়োচ্ছে, আর রেললাইন থেকে আর ছুঁড়ছে, এভাবেই ছুড়ে মারছে রেললাইনে। ছেলেটা যেন রাগের মাথায় একেবারে পাগলের মতো পাথর ছুঁড়ে চলেছে। জলকু কোনদিকে তাকাচ্ছে না, কথা পর্যন্ত বলছে না, মাথাও নাড়ছে না। এইভাবেই তীব্র বিরূপতার মধ্যে রেললাইনে পাথর ছুড়তে লাগল। কিছুদিন পর এক বিকেলে জলকুর অসুখ ধরা পড়েছে। “জ্বরের ঘোরে বারবারই জলকু তার মানিককে খুঁজেচে। বউদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে, জলকু তাই বুকের কাছে জাপটে ধরে ....” জলকুর শরীর খারাপের সময় জ্বরের বিকারে ভুল বকেছে, কথক বলেছেন—মানিক নামের পোষা একটি ছাগল জলকুর খুব প্রিয় ছিল। তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরেছে। গল্পে দেখা যায়—“জলকুর মানিক? সে তো,

সে তো জলকুর সোহাগের একটা ছাগলছানা। মরেছে। পাপ চুকেছে। বড্ড জ্বালাতন করত। আমার বহু পরিশ্রমের ফল, টবের দুটি ডালিয়াও একেবারে গোড়া পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। অকালের ফুল, বহু সাধ্যসাধনা করে পেয়েছিলাম।" গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি জলকুর প্রিয় ছাগল মানিক মরেছে কথকের গ্রামোফোনের হ্যাণ্ডেল ছুঁড়ে মারার কারণেই। "জলকু, কে জানত গ্রামোফোনের দম দেওয়া অতটুকু হ্যান্ডেল ছুঁড়ে মারলে তোমার মানিক মরে যাবে। ... একটুকুতেই কত কি যে মরে যায়! আশ্চর্য।"

বিধির বিধান বিমল করের সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ। চল্লিশের দশকে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত অজস্র মানুষের মৃত্যু যেমন তিনি দেখেছিলেন, তেমনি ব্যক্তি জীবনেও উপলব্ধি করেছিলেন নিঃসঙ্গতা, জীবনের অনিশ্চয়তাকে। 'নিষাদ' গল্পে দেখা যায়, জলকুর প্রিয় ছাগল মানিককে কথক ছেঁড়া এক টুকরো চটে জড়িয়ে নিয়ে গভীররাতে টিলার ওপারে রেললাইনের ওপর ফেলে দিয়ে এসেছিল। নিয়তির লীলাখেলায় সেই একই জায়গাতে জলকুও মারা গেছে, লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে। গল্পে দেখা যায়—"আমি জীবনে কখনও এই রঙ দেখিনি, কখনও নয়। এত ঘন, জীবন্ত ভাষাময় হতে পারে রঙ আমি জানতাম না। এখন জানলাম। দেখলাম। দেখলাম-টিলার তলায় অসাড় রেললাইন। এক ঝলক সেই আলো। হিংস্র ধারালো ইস্পাতের ওপর মুঠো-মাপের জায়গাটুকুতে আলোটা ছিল। আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাল তারপর উড়ে গেল। ছায়ার মধ্যে তালগোল পাকানো কালো জামা পরা জলকুর একটু চিহ্ন। পাথরের গায়ে গায়ে আর সব নিশ্চিহ্ন।" 'নিষাদ' গল্পে জলকু ক্রমশ এগিয়ে গেছে নিয়তিরূপী মৃত্যুর কাছে। যার নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নেই। মানবজীবনের নানাবিধ সংকটের মধ্যে বিমল কর উপলব্ধি করলেন আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা ও শূন্যতার আস্বাদময়তা। সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে জীবনের বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছে না বলেই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে সময়ের কাছে। গল্পের শেষে দেখা যায়—"ছেলেটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মরেছে। আজ ...।" জলকু হয়তো অসাবধানতা বশত ঐ একই জায়গায় ট্রেনে কাটা পড়েছে। সাধারণ মানুষ মানসিক শান্তির জন্য সবই অদৃষ্টের দোষ বলে চালিয়ে দিয়েছে। আসলে মানুষ অসহায়, তার কিছুই করার থাকে না। সেইজন্য দৈব্য বা ভাগ্যের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে কোনক্রমে বেঁচে থাকতে চায়।

২.৬.৩.৩ : নামকরণ

মৃত্যুভাবনা বিমল করের সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ। আমরা সকলেই জানি ‘নিষাদ’ শব্দের অর্থ হল প্রাচীন আরণ্যক জাতি বিশেষ। আবার নিষাদ অর্থে ‘ব্যাধ’। আর এই ব্যাধ শুধু প্রাচীন অরণ্যেই থাকে না, বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত আধুনিক মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতির মধ্যেও ঘোরাফেরা করে। মানব চরিত্র, মানবমন, মানবজীবন প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দাঙ্গা—দেশভাগের পরবর্তী সময়ে অস্থিরভাবে, সংকটের বার্তা বহন করে এনেছে। সেইজন্য মানুষ বড় অসহায়, একমুঠো ভাতের জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ দিশেহারা। বিমল করের ‘নিষাদ’ গল্পে জলকুও অসহায়ভাবে দিন অতিবাহিত করেছে। জলকুর বাবা কী রোগে পঙ্গু হয়েছেন বোঝা খুব মুশকিল। গল্পের কথক বলেছেন—“জলকুর মাকে আমি কমই দেখেছি। চেহারা মুখ কিছুই ভাল করে দেখতে পাইনি, ধারণাও করতে পারি না সেই অবয়ব। অত্যন্ত ঝাপসাভাবে যেটুকু আকার তৈরি করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়—জলকুর মা রোগা, রুগ্ন, কালো, অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া গ্রাম্য। মুমূর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুঁকছে।” এই অবস্থায় জলকু অসহায়ভাবে একাকীত্বের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে। বাবা-মায়ের সঙ্গ না পেয়ে জলকু তার প্রিয় পোষা ছাগল মানিককে সম্বল করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু কথকের গ্রামোফোনের হ্যাণ্ডেলের আঘাতে মানিকের মৃত্যু জলকুকে একাকীত্বের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পারিবারিক জীবনে একজন বালকের সব দিক থেকে নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা তো তাকে প্রতিবাদী করেই ছেড়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতিতে সুস্থভাবে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ না পেলে খুবই অসহায় মনে হয়। মনকে তখন নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য মানুষ ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। নিজেই কিছু করার উদ্যোগ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, বাধা পেলে প্রতিবাদ করে। কথকের হঠাৎ মনে হল আজ, জলকু যেন অন্য কিছুকে তার ওই অন্ধ উন্মত্ত আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত করে মারতে চাইছে।” জলকু একটার পর একটা পাথর কুড়োচ্ছে রেললাইন থেকে আর ছুঁড়ছে, ছুঁড়ে মারছে রেললাইনে। জলকুর নিঃসঙ্গতাবোধ, অসহায়তার কারণেই তার স্বভাব প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। জলকুর জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার যন্ত্রণার ভারী পাথর। তার রেললাইনের প্রতি আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। তীব্র বিদ্বেষ মাথায় নিয়ে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে প্রতিবাদী হওয়ার দৃশ্য দেখে বোঝা যায় গল্পের নাম ‘নিষাদ’ সার্থক হয়েছে। গল্পের কথক জলকুর প্রিয় ছাগল মানিককে গ্রামোফোনের

ব্যান্ডেল ছুঁড়ে মেরেছে। সেক্ষেত্রে গল্পের কথককেও আমরা নিষাদ বলতে পারি। 'নিষাদ' গল্পের কথক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জলকুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। তরুলতার সঙ্গে কথকের সম্পর্ক ভালোবাসারই। সেইসব ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনের দ্বারা তাড়িত হয়ে গল্প কথক টিলার উপর উঠে এসেছে। আত্মিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। কথকের মনে হয়েছে মানিককে না মারলে, জলকুর এমন পরিণতি হতো না। জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি টানাপোড়েনে আমাদের কিছুই করার থাকে না। গল্প পাঠে আমরা জানতে পারি জলকু যেখানে মারা গেছে। "চাঁদের আলোর স্বচ্ছতার সাথে সাথে তার মনেও স্বীকারোক্তির আকুতি জেগে ওঠে, জলকুর মৃত্যুর কারণ কিছুটা হলেও সে-ই।" তাই নিষাদ নাম যুক্তিসংগত।

<u>২.৬.৩.৪ : প্রতীকী গল্প</u>

বিমল কর 'নিষাদ' গল্পটি শুরু করেছেন এইভাবে—"You begin by killing a cat and you end by killing a man." (আপনি একটি বিড়াল হত্যা করে কাহিনি শুরু করেন এবং আপনি একজন মানুষকে হত্যা করে কাহিনি শেষ করেন।) তারপর আর একটি বাক্য "ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিংবা কাল ...।" 'নিষাদ' গল্পটি জলকু নামের বছর বারো বয়সের বালক আর একটি রেললাইনের। গল্পে দেখা যায়—"ছেলেবেলায় কে না এই খেলা খেলেছে। রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে আমরাও লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়েছি। দেখেছি, টিপটা কি রকম; হাতের জোর কতটা, লাইনের গায়ে পাথরের চোট লেগে ফুলকি জ্বলে কিনা, শব্দটা কেমন হয়।" অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে বলেছেন—" 'নিষাদ' গল্পের নায়ক বাচ্চা ছেলেটির আক্রোশ রেললাইনের উপর-কারণ রেলগাড়িতে কাটা পড়েছে তার প্রিয় ছাগলছানাটি। তাই অন্ধ আক্রোশে সে সারাদিন রেললাইনের উপর ঢিল ছুঁড়ছে। অথচ হত্যাকারী অন্য লোক, ছেলেটি তা জানতো না। ছেলেটি ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিপজ্জনক রেললাইনের কাছে, সে মরবে, এই-ই তার নিয়তি।" (পৃ. ৪১৯)

জলকুর বাড়িতে তার শয্যাশায়ী বাবা রয়েছে। ওর বাবা পঙ্গু। মা রুগ্ন, মুমুর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। "রান্নাঘর আর উনুন, মসলা বাটা, ঘর ঝাঁট, কুয়োতলায় বসে বাসন মাজা—সংসারের এই শ'খানেক অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে জলকুর মা-র ভোর শুরু হয় এবং স্বামীর অসাড় দুর্গন্ধ শরীরে মালিশ মাখাতে মাখাতে মাঝরাতের বেহুঁশ ঘুমে ঢুলে পড়ে দিনটা তার

ফুরিয়ে যায়।" জলকুর বছর কুড়ি উর্ত্তীণ ঢ্যাঙা রোগা গড়নের পিসি রয়েছে। তার নাম তরুলতা। "গায়ের রঙ মাজা কালো। সাপের মতন লম্বা বেণীটি ঘাড় থেকে খসে পিঠের ওপর দুলত।" জলকুদের টালির চালের বাড়িরই একটি ঘরে ভাড়া থাকে বছর তিরিশের যুবকটি। সেই 'নিষাদ' গল্পের কথক। জলকু প্রায় দিনই উধাও হয়ে যায়। আর তার পিসি তাকে খুঁজতে অবধারিতভাবে যুবকটির দরজায় কড়া নাড়ে। "তরু বাইরে এসে খুঁজছে, ডাকছে, জলকু-জলকু। বাড়ির মধ্যে বসে সে-ডাক আমি স্পষ্টই শুনতে পাই। প্রথমটায় গরজ দেখাতে ইচ্ছে করে না; ভালোও লাগে না উঠতে। ডাক যখন বাড়তে বাড়তে ঘুরে ফিরে আমার বারান্দার কাছে এসে পৌঁছায়, উঠতে হয় আমায়। আমি জানি জলকু কোথায় আছে।" জলকু যেখানেই থাক, যুবকটি তাকে খুঁজে বের করবে ও ধরে নিয়ে আসবে। সে জানে জলকু এখন বিদ্বেষের কারণে রেললাইনে, লাইন থেকে পাথর তুলে লাইনের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। রোজ রোজ এভাবে রেললাইনে পালিয়ে যায়। "আমার অগোছালো কথা, তরুর তিক্তবিরক্ত ভাব, সব মিলে মিশে জলকুর একটি ভবিষ্যৎ পরিণতি যেন দুজনের চোখেই লহমার জন্যে ভেসে এলো।" কী বিপজ্জনক! জলকু মরবে; মরবে একদিন হতভাগা। লাইনে কাটা পড়ে মরবে। রেললাইনে পাথর দিয়ে বারবার আঘাত করা, তার অন্ধ উন্মত্ত আক্রোশ ধরা পড়েছে। এই আক্রোশ গল্পে প্রতীকী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

'নিষাদ' গল্পে জলকুর পিসি তরুলতার সঙ্গে কথকের মেলামেশার বর্ণনা নেই, কিন্তু রাত্রে কথকের ঘরে গ্রামোফোন বাজলে, তরুলতা গান শোনে। আবার কথকের কাছ থেকে ডাকে আসা মাসিক পত্রিকাও তরুলতা চেয়ে নিয়ে যেত। আর জলকু উধাও হয়ে গেলে তরুলতা কথকের দরজায় এসে উপস্থিত হতো। কথকের সঙ্গে তরুলতার সম্পর্ক প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

গল্পে দেখা যায়—"সমস্ত আকাশটাই যেন জ্বলন্ত সূর্য, আগুনের ঝলসানিতে গনগনে আঁচের মত রঙ ধরেছে শূন্যে। টিলার পাথরে শরীরটা পুড়ছে, কাঁকরের স্তুপ ধকধক করে জ্বলছে, রেললাইনের পাথর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল, অসহ্য উজ্জ্বল। আমার গাল মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল ভীষণভাবে, গলার কাছে বুকের তলায় দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আর চোখে মুখে নাকে ঠিকরে এসে লাগছিল সেই জ্বলন্ত দুঃসহ তাপ। অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ, লোহা, স্লিপার সবই সমস্ত কিছু এক ভয়ঙ্কর দহনের ঝলসানিতে জ্বলছে।"

জলকু পাথর ছুঁড়ছে লাইনের গায়ে, বারবার আঘাত করেছে। উপরোক্ত প্রকৃতির ভয়ঙ্কর স্বভাবের সঙ্গে জলকুর প্রতিবাদী মনোভাব নির্মম একাকীত্বের প্রতীক বহন করে চলেছে। জলকুকে রেললাইনে যাওয়ার জন্য নিষেধ করলেও সে কারো কথা শোনো না। গল্পে দেখা যায়— "ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিম্বা কাল।" কথকের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে উদ্ধৃত লাইনটির প্রতীকী তাৎপর্য অন্য মাত্রা পেয়ে যায়।

গল্পে দেখা যায়, কথক ফুল আর গান ভালোবাসে। গল্পের কথকও তরুলতাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। "সেই যে একদিন এক ঘন মেঘলার আঁধার হয়ে আসা দুপুরে তরু অসাড় পায়ে আমার ঘরে এসেছিল, আমি ছিলাম ... সে ছিল, ঝোড়ো ধুলোর ভয়ে জানলা বন্ধ ছিল ... পাশাপাশি বসে ... ঘর ভরা মেঘলার ঘনতা ...। জলকু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তরু চমকে উঠল, আমি চমকে উঠলাম। জলকু তার মানিককে খুঁজছে। ঝড় উঠেছে কিনা তাই। মানিকের সেই দ্বিতীয় অপরাধ।" জলকুর প্রিয় ছাগল মানিক গ্রামোফোনের আঘাতে মরেছিল। সেই শোকে জলকু জ্বরে পড়েছিল। মানিককে কথক মারতে চায়নি, পরিস্থিতির চাপে জলকুর প্রিয় মানিক মরে গেছে। তারপর প্রায় সারারাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা মানিককে কেমন করে লুকিয়ে ছেঁড়া এক টুকরো চটে জড়িয়ে রেললাইনে কথক ফেলে দিয়েছিল। রেললাইনে ফেলার একটিই উদ্দেশ্য ছিল, যেন লাইনে কাটা পড়েছিল মানিক। জলকু মনে করেছিল মানিক রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়েছে, জলকু সেই আক্রোশে রেললাইনে পাথর ছোঁড়ার নাম করে প্রায়ই ঘরের থেকে উধাও হয়ে যেত। নিঃসঙ্গ জলকু কোনদিনই বুঝতে পারেনি তার প্রিয় মানিককে কথক মেরে ফেলেছে। প্রচন্ড আক্রোশ থেকে রেললাইনে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে জলকুও মরে গেল লাইনে কাটা পড়ে। গল্পে দেখা যায়—"তারপর চাঁদ একটু উজ্জ্বল হল, মুহূর্তের জন্যে ...। এক মুঠো করুণ বিষণ্ণ আলো দুলে দুলে রেললাইনের একটু জমিতে কাঁপল। যেমন কাঁপা জলে আলো কাঁপে। জলকুর রক্ত বুঝি ওখানেই ছিল। কিংবা ... মানিকের রক্ত বুঝি পাশেই ছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল কবে। কবেই।" এই পরিস্থিতিতেও গল্পকার রক্তের চিহ্নকে প্রতীকী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।

রেললাইনের উপর ক্রোধের বশেই শেষপর্যন্ত জলকু মারা গেছে। জলকুর প্রিয় ছাগল মানিক গ্রামোফোনের আঘাতে মারা না গেলে, জলকুও মরত না। "ছেলেটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মরেছে। আজ ...।" 'নিষাদ' গল্পের কথক গল্পের মধ্যেই তিনবার বলেছে—"ছেলেটা

মরবে, লাইনে কাটা পড়ে মরবে। হয়তো আজ কিংবা কাল।” কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও বিষণ্ণতা বা নৈরাশ্য নয়, জীবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক দুর্দম আশা, এক গভীর হৃদয়সঞ্চারী আলো। ‘নিষাদ’ গল্পে জলকুর ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে যায় জলকুর প্রিয় ছাগল মানিকের ও তার পিসির প্রেমের অনুষঙ্গ। জলকু জীবনকে ভালোবেসে, মানিককে আদর করে বাঁচতে চেয়েছিল আরো অন্তত এক মুহূর্ত বেশী বেঁচে থাকতে। পরিবেশ পরিস্থিতি তখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্রই অসহযোগিতা থাকার জন্য সে কি পেরেছে? না পারেনি। আক্রোশের বসে লাইনের উপর পাথর ছুঁড়তে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়েছে। চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হয়ে জীবনের মানেটা লেখক বুঝে গেছেন বলে প্রতীকের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। নিয়তির অমোঘ খেলাই কেড়েছিল জলকুর প্রাণ। মৃত্যু অমোঘ সত্য। এর হাত থেকে কেউই বাঁচতে পারে না। তাই জীবন-মৃত্যুর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই থেকে গেল রেললাইনের গতি প্রবাহ। সবশেষে বলা যায় কী আশ্চর্য প্রতীকী এক গল্প বিমল করের ‘নিষাদ’। অথচ গল্পের শেষে একটি শান্ত চিত্র লেখক দিয়েছেন—“শেষ বেলায় চারদিকে মাঠঘাটে ছায়া পড়েছে। তবু ছেলেটি যেখানে রেলে কাটা পড়েছে সেখানে সামান্য একটু রোদ অপেক্ষা করছে। এই অসামান্য ইঙ্গিতই গল্পের পরিণতি। কোথাও চিৎকার করে বলা হয়নি, তবু অনুভব করা যায়—নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণই ‘নিষাদ’ গল্পের মূল বিষয়।

<u>২.৬.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী</u>

১। পঞ্চাশটি গল্প—বিমল কর

২। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)—বীরেন্দ্র দত্ত

৩। বাংলা ছোটগল্প—শিশিরকুমার দাশ

৪। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

<u>২.৬.৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী</u>

১। নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ-ই ‘নিষাদ’ গল্পের মূল বিষয়—আলোচনা করো।

২। ‘নিষাদ’ গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

৩। প্রতীকী গল্প হিসেবে ‘নিষাদ’ গল্পটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

৪। ‘নিষাদ’ গল্পের সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৫.৫.১৫.১.৫ : ছোটগল্পকার রমাপদ চৌধুরী

বর্তমান আলোচনায় আমরা চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্পকার হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২- ২০১৮) অবদান স্মরণ করতে পারি। রমাপদ চৌধুরী খড়্গপুরে কিছুদিন থাকার পর পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় চলে এলেন। মেদিনীপুর জেলার রেলশহর খড়্গপুর, সত্যিই 'মিনি ইণ্ডিয়া'। সেই শহরের নানা অভিজ্ঞতার কথা, জীবনে বড় হয়ে ওঠার কাহিনী প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর'—এ আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়াও 'বনপলাশীর পদাবলী' স্রষ্টা রমাপদ চৌধুরী সাহিত্য চর্চা করার সুবাদে কলকাতা শহরেই থেকে গেলেন। তবে জীবিকার জন্য তিনি কিছুদিন বাইরে থেকেছেন। ১৯৪৪ খ্রিঃ 'উদয়াস্ত' নামে রমাপদ চৌধুরী একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। তারপর একে একে তিনি লিখলেন—'রত্নকূট' ,'সহযোগ', 'বনবাতাস', 'কুসীদাশ্রিত' চন্দ্রভস্মের মতো বিখ্যাত সব গল্প। তাছাড়াও স্বাধীনতার পর, তার যেসব গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল— 'বাবুই', 'তিনতারা', 'স্বর্ণমারীচ', 'আতসী উজ্জ্বল', 'তীর-ধনুক' 'রক্তবীজ', 'জলরঙ', 'রাঙা পিসীমা', 'নির্জনতা নেই,' 'লীলাময়ী ' প্রভৃতি।

বিশ শতকের চারের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাহিত্য রচনায় রমাপদ চৌধুরীর অগ্রগতি ঘটে। সেই সময় বহুবিধ সংকট নিজে দেখেছেন ও সেই বিষয়গুলিকে নিয়ে সাহিত্য সৃজন করেছেন। ভারতবর্ষের অস্থিরতার সময়, লেখক নিজে মন্বন্তর ও গণবিক্ষোভ এর সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি—আর্ত মানুষদের দু:খ-যন্ত্রণাকে নিজে অনুভব করেছিলেন। আর জীবনের নানা ঘটনা থেকে রমাপদ চৌধুরী যে অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছিলেন, তারই প্রেরণা রূপে সাহিত্যের প্রবহমান গতিতে তিনি টিকে আছেন। সর্বোপরি বলা যায় গল্পকার হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, তা জোর দিয়েই বলা যায়। রমাপদ চৌধুরী 'এখনই' উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্র পুরষ্কার পেয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর লেখা উপন্যাসগুলি হল— 'বাহিরি', 'চড়াই' 'স্বজন', 'দ্বিতীয়া', 'রূপ', 'বীজ', 'হৃদয়', 'লজ্জা', 'খারিজ', 'পিকনিক', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'পরাজিত সম্রাট', 'লালবাঈ', প্রভৃতি উপন্যাস। রমাপদ চৌধুরী আনন্দ পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন।

৫.৫.১৫.১.৬ : আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া—সাধারণ পরিচিতি

'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পটিতে একান্নবর্তী পরিবারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সংসারে সবার পরিবারটির প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। বাবা-কাকা, বড় জা, ননদ, ভাইপো-ভাইঝি প্রত্যেকেরই চাহিদা আছে ও কর্তব্য আছে পরিবারটির প্রতি। পরিবারের কর্মকতারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রচুর পরিশ্রম করে সংসার প্রতিপালন করেছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান একটু নীচে তা গল্পকার দেখিয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবারে শ্বশুর-ভাসুরকে যেমন মেনে চলতে হয়েছে, তেমনি মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরবার করতে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি—''বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি। " এর থেকে বোঝা যায়, গল্পকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমাজে নারীদেরকে বিয়ের নামে চলেছে নিপীড়ন, অত্যাচারের কাহিনী, মুখ বুজে তারা সব সহ্য করেও শেষপর্যন্ত তাদের পরিণতি হয়েছে খুবই দুর্বিষহ। এই ভাবেই প্রতিটি পরিবারের নারীদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

গল্পটিতে একান্নবর্তী পরিবারের নব বর-বধূ পুরীতে বেড়াতে গেছে। আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'হানিমুন' করতে যাওয়া। ছোট ঠাকুরপোর নাম গৌতম। বড় জা ও ভাশুর যখন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল তখন এইসবের বালাই ছিল না। শুধু সংসারের নানারকম কাজকর্ম করে তাদের জীবন চলে যেত। বড় জা বলেছে—''দেখ্, নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এরপর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।" তখনকার দিনে পরিবারে নতুন বউ এলে, নাম ধরে ডাকার রীতি ছিল না। সবাই তখন নতুন বউ বলে ডাকত। নতুন বউ এর থেকে বড় জার বয়স অনেক বড়। কেননা পূর্ববর্তী সময়ে পরিবারের মহিলাদের সখ-আহ্লাদ বলে কিছু ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তারা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে সংসারটিকে ধরে রেখেছে। এরপর গল্প পাঠে জানা যায়—নতুন বৌ ও গৌতম বেড়াতে গেল, পুরীতে । তারা সমুদ্রের গা ঘেষে একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। ''সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না।" সমুদ্রের তীরের সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ, ঢেউগুলো যখন তীরে আঘাত করছে তার সৌন্দর্য দেখে নতুন বউ ও গৌতম অভিভূত হয়ে গেছে। কেউ আবার সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক কুড়ুচ্ছে— ''দেখলাম ছোট বড় নানারকমের সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়েছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিক চিক করছে বালির ওপর।" ওরা যে নব বর-বধূ তা ওদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কেননা বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের চেহারার অন্যরকম একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নতুন বউয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেও বোধহয় সিঁথিতে সিঁদুর একটু বেশী দিয়ে ফেলেছে।

আমরা জানি, সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। তা না হলে অনেকেই নুলিয়া সঙ্গে নিয়েও স্নান করে। নুলিয়ারা দু আনা পয়সা পেলেই খুশী হয়। তাই সঙ্গে নুলিয়া নিলে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু গৌতম ও নতুন বৌ সমুদ্র স্নানে গেছে, কোন নুলিয়া না নিয়ে। নতুন বৌ আবার সমুদ্রে স্নান করতে ভয় পায় বলে বেশী দূরে যাবে না। তখন— "গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।" গৌতম আর একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে স্নান করবে বলে মনস্থির করেছে—গৌতমের মনে তখন— "বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়।" এরপর গৌতম একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, ঢেউ ভেঙে দূরে চলে গেছে। গৌতম এত দূরে যাচ্ছে দেখে নতুন বৌ ভয় পর্যন্ত পেয়েছে। এমনকী অন্যান্য যাত্রীরা গৌতমের প্রশংসা পর্যন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নতুন বউয়ের মনে হয়েছে—"গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।" এইরকম ভয়ানক পরিবেশে নতুন বউ তখন কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। তখন নতুন বৌ নুলিয়ার কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে সেই ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা দিতে লাগল। নুলিয়া তখন এক বিন্দু দেরী না করে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর নুলিয়া একটার পর একটা ঢেউ পার করে গৌতমকে সমুদ্র থেকে তীরে নিয়ে এসেছিল ও প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

নুলিয়ার কাজের জন্য পুরস্কার স্বরূপ তখন নতুন বউ তাকে সোনার চুড়ি দিতে চাইলেও, মন তাতে সায় দিল না। নতুন বউ মধ্যবিত্ত জীবনধারণ পদ্ধতিতে অভ্যস্থ হয়ে সংসার পেতেছে। তাই তাদের বিপদে যে ব্যক্তি সাহায্য করলো, তখন তার কাজকে কর্তব্য বলে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই নুলিয়াকে সোনার চুড়ি দিতে পারল না। কেননা সমুদ্রে কেউ ডুবে গেলে, নুলিয়াদের কাজ মানুষকে বাঁচানো। নুলিয়াটা সত্যিই গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। "শুনলাম গরমেন্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।" ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো নুলিয়াদের কাজ। তাছাড়াও তারা ডিঙি করে মাছধরে নিয়ে আসে, তারপর বাজারে বিক্রি করে। তার থেকে যা অর্থ উপার্জন হয় তাতে তাদের কোনরকমে চলে যায়। মধ্যবিত্ত মানুষদের অনেক অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও হাতে অর্থ এলে সোনার আংটি, চুড়ি, বালা গড়িয়ে রাখে। তাই সোনার জিনিসের প্রতি মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষদের একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। আসলে বেঁচে থাকার জন্য জীবনে কত কষ্ট করে তিল তিল করে অর্থ উপার্জন করতে হয়। তাই হাত থেকে সহজেই টাকা বেরুবার সময় তো একটু কষ্ট হবে। নতুন বউ, নুলিয়াটার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হাতের সোনার চুড়ি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারল না। আর স্টেশনে ট্রেন ধরার সময় ঐ নুলিয়াটার সঙ্গে দেখা হলে তার হাতে এক টাকার নোট দিয়েই নবদম্পতি খুশী থেকেছে। "বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।" মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ হিসেব করে সংসার চালায়। তারা জীবনে সুবিধা নিতে ভালোবাসে। কিন্তু তার পরিবর্তে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত তা তারা জানে না। আসলে প্রতিটি মানুষই নিজের স্বার্থ দেখে বাঁচে। নতুন বউয়ের ক্ষেত্রেও তাই। সেও বটুয়া খুলে এক টাকার পরিবর্তে বেশি টাকা দিতে পারল না। কেননা-'স্টেশনে পৌঁছেই তো রিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।" নুলিয়ারা তো সমুদ্রে চান করাতে গেলে দু'আনা করেই নেয়। আর আমি আসার সময় তো

তাকে এক টাকাই বকশিশ দিয়ে এলাম। তাহলে কি বেশি টাকা দেওয়া হয়ে গেল। এসব সাত-পাঁচ ভেবে নতুন বৌ আর স্থির থাকতে পারলো না। তখন আবার সে ভাবতে শুরু করেছে—"সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না।" আসলে নুলিয়াটা, গৌতম ডুবে যাচিছল দেখে ঝাপিয়ে পড়েছে। "কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।"

৫.৫.১৫.১.৭ : নামকরণ

রমাপদ চৌধুরীর 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পের নামকরণ যথাযথ হয়েছে। লেখক মধ্যবিত্ত মানসিকতার জীবনচিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি পুরীর সমুদ্র সৈকতের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানকার পরিবেশ—পরিস্থিতি, সমুদ্র দর্শনার্থীদের আচার-আচরণ ও তাদের স্নান করার বর্ণনা সবই কিন্তু নিখুঁতভাবে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পের কাহিনীর প্রথম দিকে বড় জার কথা এলেও তা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর পুরীর হোটেলে বেড়াতে যাওয়া সাজুন্তি ও তার স্বামীর কথাও প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে। কিন্তু গল্পের মূল কাহিনী এগিয়ে গেছে নতুন বৌ, তার স্বামী গৌতম ও একটি নুলিয়া চরিত্রকে কেন্দ্র করে। তাই সবদিক বিচার করে গল্পের নামকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে বলা চলে। গল্পের নামকরণে নুলিয়া চরিত্রটির নির্লোভ, ত্যাগী ও কর্মব্রতী ভাবনা ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে 'নুলিয়া'দের শত চেষ্টায় কত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়ার দিকটিও লক্ষণীয় বিষয়।

ব্যঞ্জনা : 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পের কাহিনী চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, যখন গৌতম সমুদ্রে ডুবে যাচিছল। "গৌতমের সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকদের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে।" ঐ গুজবটা সারা হোটেলে রটে গিয়েছিল, সবাই এসে সমবেদনা ও জানিয়েছিল। কিন্তু নুলিয়াটা না থাকলে গৌতমের কি যে হতো সেই চিন্তাতেই নতুন বউয়ের চিন্তার শেষ ছিল না। গল্পকার গল্পের শেষে বলেছেন— "কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।" তখন মনে হয় নুলিয়াদের কথা বলতে গিয়ে লেখক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষকে আঘাত করেছেন। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, আর অপরকে সাহায্য করার সময় দশবার ভাববে। অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রেই হোক বা হাহাকারের সময়ই হোক মধ্যবিত্ত মানুষের আর একটি গুণ অপরকে জ্ঞান দেওয়া। তখন তারা বলে সব কাজ মন দিয়ে করা উচিত। প্রতিটি মানুষের নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত অথচ নিজে সব সুবিধা ভোগ করে স্বার্থপরের মতো বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। আমাদের আলোচ্য গল্পের মধ্যবিত্ত শ্রেণির নতুন বউ কিন্তু পারতো নুলিয়াকে বেশি করে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে, কিন্তু তা করেনি। দু:সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর নতুন বউয়ের নুলিয়ার টাকা দেওয়াকে কেন্দ্র করে লেখক যে মনস্তাত্ত্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডুবন্ত গৌতমকে বাঁচিয়েছিল বলে নতুন বৌ নুলিয়া সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে—"কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।" অথচ নিজের কর্তব্য সম্পর্কে নতুন বউয়ের মতো আমরাও সকলেই উদাসীন।

সবশেষে একথা বলা যায়, মানবতার স্পষ্ট চিহ্ন খেটে খাওয়া নুলিয়াদের স্বভাবধর্মের মধ্যে ছিল। সমুদ্রসৈকতে কোন প্রলোভনে তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে মানবিকতা নষ্ট হয়ে যায়নি। বরঞ্চ তাকে পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছায়, আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরা বারবার দ্বন্দ্বে পড়েছে। তাকে পুরস্কার না দিলেও ওর কিছু এসে যায়

না। ওর কর্তব্যও ঠিক পালন করেছে ও আগামী দিনেও পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নুলিয়াকে গয়না দিলেও নতুন বউয়ের অনেক লোকসান হয়ে যাবে, আবার বেশি টাকা দিলেও অর্থের অপচয় হবে। সেইসঙ্গে আবার নতুন বউকে রিক্সা ভাড়া দেওয়ার কথাও ভাবতে হয়েছে। গল্পকার মধ্যবিত্ত মানুষদের বহুমুখী দ্বন্দ্বকে ছোটগল্পের উপযোগী ব্যঞ্জনাধর্মিতা এবং একমুখিনতা দিয়ে গল্পটিতে রক্ষা করেছেন। গল্পকার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রথাবদ্ধ জীবনযাত্রার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। তিনি মনে করেন, মধ্যবিত্ত বাঙালি কোনো কাজের কাজ করে না, শুধু বিলাসে-বিশ্রামে সময় নষ্ট করে। তাই মনে হয় মধ্যবিত্ত বাঙালির অতি শান্ত, আয়েসী ও হিসেবী জীবনযাত্রার প্রতি গল্পকার ধিক্কার জানিয়েছেন। সর্বোপরি 'আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পটিকে সমাজ ভাবনাশ্রয়ী গল্প বলা যেতে পারে। লেখক যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর-নারীর দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে শুধু নুলিয়ার কথা ভেবে মনে মনে গর্ববোধ করেছেন।

৫.৫.১৫.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা ছোটগল্প—শিশির কুমার দাশ

২। কালের পুত্তলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৩। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— বীরেন্দ্র দত্ত

৪। পঞ্চাশের দশকের কথাকার —উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত

৫। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য—হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৬। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি -প্রকৃতি— সোহারাব হোসেন

৫.৫.১৫.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪। গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৫। রমাপদ চৌধুরীর আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া গল্পের মনস্তত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।

জি ই সি / সি বি সি এস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়

পর্যায় গ্রন্থ - ২, একক - ৬

উপএকক - ৪ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : একটি তুলসী গাছের কাহিনি

বিন্যাসক্রম

২.৬.৪.১ : ভূমিকা

২.৬.৪.২ : ছোটগল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

২.৬.৪.৩ : কাহিনি সংক্ষেপ

২.৬.৪.৪ : রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

২.৬.৪.৫ : প্রতীকী গল্প

২.৬.৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৬.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৬.৪.১ : ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওপার বাংলার এক মুসলিম পরিবারে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের খুব কাছেই ষোলশহরে লেখকের পূর্বপুরুষেরা বসবাস করতেন। লেখকের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও শিক্ষিত মার্জিত ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৩৯ খ্রি. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪১ খ্রি: ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। লেখকের মামাবড়িতে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির চর্চা ছিল। তিনি বি.এ. পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পড়া শেষ করেননি। কলকাতা নগরীতে থাকার সুবাদে এপার বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতার বসবাসের সময় লেখকের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল। কলকাতায় থাকার সময় তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সৈয়দ ওয়ালাউল্লাহ ১৯৪৫ খ্রি: কলকাতার ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ খ্রি: দেশ বিভাগের পর পত্রিকা দপ্তরের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঢাকা শহরে ফিরে আসেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের লেখা উপন্যাসের মধ্যে ‘লালসালু’ (১৯৪৮), ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪), ‘কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) উল্লেখযোগ্য। ‘বহিপীর’ (১৯৬০), ‘তরঙ্গভঙ্গ

’ (১৯৬৪) ও ‘সুড়ঙ্গ’ (১৯৬৪) নাটক তিনি রচনা করেছিলেন। লেখকের প্রথম গল্প সংকলন ‘নয়নচারা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রি:। ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ খ্রি:। কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৭১ খ্রি: ১০ই অক্টোবর প্যারিসে পরলোক গমন করেছিলেন।

২.৬.৪.২ : ছোটগল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন উপন্যাস রচনা করেছেন, তেমন তাঁর সৃজন-প্রতিভার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় গল্পকার হিসেবেও। লেখকের পিতা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। তার ফলে ওপার বাংলার নানা স্থানে পিতার সঙ্গে কর্মসূত্রে তাঁকে যেতে হয়েছিল। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মূল্যবান সময়গুলো ওখানকার মানুষের সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। তারফলে নিজের দর্শন-মনন দিয়ে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত মানুষের জীবনকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছিল। পরবর্তীকালে সাহিত্য সৃজনের সময় চোখে দেখা জীবনকে ভেবেছেন। চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সেই জীবন সমস্যাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমাজের নানারকম কুসংস্কার ও ধর্মীয় ভণ্ডামীকে নানা গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছিলেন। “সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণ ও সমগ্রভাবে তাঁর বিপুল সংখ্যক গল্প, তিনটি উপন্যাস ও ত্রয়ী নাটকেই আবিষ্কার করা যায়। বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথমে গল্পকার, মধ্যপর্বে ঔপন্যাসিক এবং অতঃপর নাট্যকার; আর এ জন্যই তাঁর সাহিত্যকর্ম বিবেচনা ও বীক্ষণে গল্পই প্রথম প্রাধান্য ও গুরুত্ব লাভ করে।” (পৃ. ৩৩) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহে্র অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে ‘নয়নচারা’, ‘মৃত্যুযাত্রা’, ‘রক্ত’, ‘সেই পৃথিবী’, ‘জাহাজী’, ‘পরাজয়’,‘খুনী’ ইত্যাদি। ‘নয়নচারা’ গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রি:। তারপর বিশ বছর পর প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘দুইতীর ও অন্যান্য গল্প’ ১৯৬৫ খ্রি:। সৈয়দ ওয়ালীউলাহে্র এই সংকলনের মধ্যে ‘দুইতীর’, ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’, ‘পাগড়ি’, ‘কেরায়া’, ‘নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা’, ‘গ্রীষ্মের ছুটি’, ‘মালেকা’, ‘স্তন’ ও মতিউদ্দিনের প্রেম উল্লেখযোগ্য গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনসমস্যা ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় গল্পগুলির মূল বিষয়।

২.৬.৪.৩ : কাহিনি সংক্ষেপ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” ছোটগল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে—“ধনুকের

মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠালগাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছা আবৃত মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ।" বাড়িটির বর্ণনায় আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। সেই খালি জায়গায় একটি বাগান তৈরি করা থাকলে বাড়িটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেত বলে আমাদের মনে হয়েছে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সেই খালি বাড়িটায় উপস্থিত হয়ে স্থায়ী আবাস বানিয়ে নিয়েছে— মতিন, বদরুদ্দীন, ইউনুস, মোদব্বের, এনায়েৎ মুকসুদ প্রমুখ চরিত্ররা। এরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে বড় বাড়িটি দখল করে বসবাস শুরু করেছে। গল্পে দেখা যায়—"বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ-শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশ পলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। অবশ্য সে-ভয় কাটতে দেরি হয় না। সে-দিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রই-রই আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে।" আমরা সকলেই জানি, ১৯৪৭ খ্রিঃ অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠিত হয়েছিল, আর অপরদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। সেইসময় বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালীরা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। অপরদিকে ভারতবর্ষ থেকেও অনেক মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ পাড়ি দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। দুই দেশ থেকে আগত সাধারণ মানুষ তখন আশ্রয় নিয়েছিল খোলা আকাশের নীচে, রেলস্টেশনে, বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলে। এমনকী নিজেদের দেশ ছেড়ে আসা ঐসব উদ্বাস্তু মানুষদের অনেকেই তখন আশ্রয় নিয়েছিল অপরপক্ষের ফেলে-যাওয়া বাড়িঘরে। দলে-দলে সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশের ফেলে যাওয়ার আশ্রয়স্থলে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে দেখা যায়—"বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নেই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে

ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখনতো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুটের চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।" শহরের অন্যান্য মানুষদের কাছেও খবর জানাজানি হয়ে গেছে, তখন তারাও এসেছে বাড়িটি দখল করার জন্য। কিন্তু মতিন, আমজাদ, বদরুদ্দীনরা আগে এসে পরিত্যক্ত বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়েছে বলে অন্যান্য মানুষদের আর জোর জবরদস্তি করে লাভ নেই। তখন তারা চলে গেছে। মতিনরা নানাভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে তাদেরকে বোঝাতে শুরু করেছে। শহরের এই পরিত্যক্ত খালি বাড়ি দখলদারির ঘটনাটি সমাজে গোপন থাকেনি, নানা লোকের মাধ্যমে প্রচার হতে হতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মতিন, কাদেররা ভয় পেলেও কিছুতেই জবর দখল করা বাড়িটি তারা ছাড়তে রাজি নয়। "যথা সময়ে বে-আইনি বাড়ি দখলর ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে।" পুলিশকে দেখে তারা অনুনয়-বিনয় করে বলতে শুরু করেছে—"আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।" সেই সময় পুলিশের দল সমাজের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছে ও নানাভাবে তদন্ত করে দেখেছে। কিন্তু মতিনদের বাড়ি ছাড়া করেনি। কাদেরের সঙ্গে অন্যান্যদের কথোপকথনে জানা যায় কেউ নালিশ করেছে বলেই জবরদখল করা বাড়িটি সাব-ইন্সপেক্টরেরা তদন্ত করতে নেমে পড়েছে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সংকটময় পরিস্থিতিতে শখ করে তারা এই বাড়িতে আশ্রয় নেয়নি। তখন তাদের কথা সাব-ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে শোনার পর অফিসে ফিরে গেছে। গল্পে দেখা যায়—"সদলবলে সাব-ইন্সপেক্টর ফিরে গিয়ে না হক না বেহক না-ভালো না-মন্দ, গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেওয়া শ্রেয় মনে করে।" কাদের হাসির ছলে চোখ টিপে দখল করা বাড়িটির অন্যান্য সদস্যদের বলেছে—"সাব-ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বোলো না কাউকে কিন্তু।" পুলিশ তদন্ত করে চলে যাওয়ার পর পরিত্যক্ত বাড়িটির অন্যান্য সদস্যদের আপাতত বাড়িটি ছেড়ে দিতে হয় না। সেইসময় পুলিশও দখলদারীদের হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। ফলে প্রকাণ্ড বাড়িটিতে তারা নিজের ইচ্ছে মতো থেকেছে। বসবাসের সময় সকলে মিলে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করেছে। খোলা-মেলা ঝরঝরে তকতকে এ-বাড়িতে বসবাস করার ফলে তারা নতুন জীবনে স্বাদ পেতে শুরু করেছে। নিজেদের দেশে যখন তারা বসবাস করতো তখন তারা সেই পরিবেশে সুস্থভাবে

বসবাস করতে পারতো না। "এদের অনেকেই কলকাতার ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তুলনায় এ-বাড়ির বড়ো বড়ো কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরও পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম কাঁঠালের বাগান এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন।" এপার বাংলায় বসবাসের সময় তারা পারিবারিক সংকটের মধ্যে দিন কাটিয়েছিল। তারা যেখানে বসবাস করতো সেই পরিবেশ বসবাসের অনুপযুক্ত ছিল। কিন্তু কোন সুরাহা ছিল না বলে ঐ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল।

আর এপার বাংলার জবরদখল করা বাড়িটির পরিবেশ ছিল খুবই স্বাস্থ্যকর। বাড়িটিতে বসবাস করার সময় তাদের মনে হয়েছে এত আলো-বাতাস কখনও তারা উপভোগ করেনি। মতিন ও তার বন্ধুরা জীবনে বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম চাহিদাটুকু এপার বাংলার এই পরিত্যক্ত বাড়িটিকে আশ্রয় করে পেয়েছে। সেইজন্য তারা নিজেদের জীবনকে ধন্য ধন্য করেছে। গল্পে দেখা যায়—"তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনিতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দু-হাজার ওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জৌলুস আসবে, দেহ ও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপট্‌কা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনাভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতালা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁৎসেতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে।" অনেকের কাছে শুনেছে, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। সেইজন্য দুর্গন্ধটা সে সহ্য করেছে কিন্তু তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। কলকাতার ঘিঞ্চি পরিবেশ ত্যাগ করে নতুন জায়গায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা সঠিকভাবে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। তখন তারা গল্প করে, খাওয়া-দাওয়া করে, গান গেয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছে। তবে এ সুখ তাদের জীবনে বেশিদিন টিকল না। কিছুদিন পর ঐ বাড়িতে আবার পুলিশ এসেছিল।

গল্পের কাহিনি বিস্তারে আমরা জানতে পারি—হঠাৎ এক রবিবারের সকালে মোদব্বের উঠানে পায়চারি করছিল, এমন সময় চিৎকার করে উঠে বাড়ির সবাইকে ডাকতে থাকে—"রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ হাত উঁচু ইঁটের তৈরি একটি মঞ্চের উপর তুলসী গাছটি

তাদের দৃষ্টিগত হয়।" বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তখন সাপ খোপ দেখবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু তাদের নজরে পড়ল একটি তুলসীগাছ। আমরা সকলেই জানি তুলসীগাছ সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী মানুষের কাছে একটি পবিত্র উদ্ভিদ হিসেবে সমাদৃত। প্রাচীন কাল থেকে অধিকাংশ বাড়িতে তুলসীগাছ লাগানো থাকতো এবং সকাল-সন্ধে বাড়ির মা-ঠাকুমারা তুলসীতলায় পূজা করতেন। গল্পে দেখা যায় মোদব্বের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বলে তলুসীগাছটি ছিঁড়ে ফেলার, উপড়ে ফেলার কথা অন্যান্য সদস্যদের বলেছে। "উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।" জবরদখল করা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা সবাই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হলেও মোদব্বের কথা কেউ শুনতে রাজি হয়নি। গল্পে দেখা যায়—"যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন একসময়ে রেলওয়েতে কাজ করত। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ার রেলওয়ে পট্টিতে সে মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্ণভাবে সে শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনও শেষ হয়েছে কী হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।" আমরা সকলেই জানি তুলসীগাছ বহুগুণ প্রকৃতির হয়। সর্দিকাশিতে তুলসী গাছের পাতা চিবিয়ে খেলে সর্দিকাশি কমে যায়। মানুষের শরীরে তুলসী গাছের হাওয়া রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হিন্দুবাড়িতে তুলসীগাছকে অত্যন্ত শুভ বলে মন করা হয়। হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীগাছকে প্রণাম করে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস তুলসীগাছ বাড়িতে রেখে পুজো করলে বাড়িটি সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এইসব কথা মনে মনে স্মরণ করে সর্দি-কাশিতে ভোগা ইউনুস, মৌলবী ধরণের মানুষ এনায়েত, দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মুকসুদ মোদাব্বের কথার প্রতিবাদ করেছে। সেইজন্য তুলসীগাছটিকে নষ্ট করার কথা তারা কেউই ভাবতে পারেনি। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারও হাত এগিয়ে আসেনি। তখন মোদাব্বের শুধুমাত্র অন্যদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

জবর দখল করা বাড়িটির পরিবেশে তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই দিনের পর দিন বাড়তে থেকেছে। "তুলসীগাছের তলে যে-আগাছা জন্মেছিল সে আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে-গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রঙ ধরেছিল, সে পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসীগাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে-লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে।" গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি—অবশেষে জবরদখল করা বাড়িটিতে পুনরায় পুলিশ এসেছে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় সবার উদ্দেশ্যে বলেছেন—"আপনারা বে-আইনিভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।" সরকারের হুকুম, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাদের এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, তা না হলে সরকার অন্যরকম ব্যবস্থা নেবে। গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে। সেই কথা শোনার পর বাড়ির প্রতিটি সদস্যের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট নেমে এসেছে। প্রকাণ্ড সে-বাড়িতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেমে এসেছে। তাদের মুখে নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা গেলেও তাদের করার কিছুই নেই। পরের দিন অবশ্য মোদাব্বের জানিয়েছে, তাদের বাড়ি ছাড়ার মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে সাতদিন করা হয়েছে। তবুও এ যাত্রা যে আর রক্ষে নেই তা সকলেই বুঝে গিয়েছে। জবরদখল করা বাড়িটিতে তখন সর্বত্র গভীর ছায়া নেমে এসেছে। সেই পরিস্থিতিতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মতিন, মোদাব্বের, বদরুদ্দিন, মকসুদ ও অন্যান্য সদস্যরা—"তারপর দশম দিনে তারা সদল বলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়।" গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'একটি তুলসীগাছের কাহিনি' গল্পের একেবারে শেষে বলেছেন—"উঠানের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রঙ। সে দিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারও মনে পড়েনি। কেন পড়েনি সে কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।"

২.৬.৪.৪ : রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে দেখা যায়—১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের কিছু দিন পরে ওপার বাংলার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে মতিন, বদরুদ্দীন, মোদব্বের, এনায়েৎ, মুকসুদ প্রমুখ মানুষগণ বসবাস শুরু করেছে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে এরা সকলেই কলকাতা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ওপারবাংলায় প্রবেশ করেছে। আমরা সকলেই জানি

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এবং ইসলামধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ছিল সংখ্যালঘু। অপরদিকে পূর্ববাংলায় ইসলামধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি এবং হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী জনগণ ছিল সংখ্যালঘু। সংকটময় পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু জনগণ দিশেহারা হয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। ১৯৪৭ খ্রি: দেশ বিভাগের সময় দুইধর্মে বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজের ভিটে-মাটি ছাড়তে হয়েছিল। একমুঠো ভাতের জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কেননা পেটের জ্বালা মানুষের বড় জ্বালা। ওপার বাংলায় শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট লাঘব করার উপায় খুঁজে না পেয়ে তখন পূর্ববাংলার সংঘ্যালঘু হিন্দুরা নিজের বাড়ি ছেড়ে এপারবাংলায় চলে এসেছে। অপরদিকে ভারতবর্ষ থেকেও অনেক ইসলামধর্মে বিশ্বাসী মানুষ সেইসময় বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর ভারতবর্ষের ইসলামধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন অপরপক্ষের ফেলে যাওয়া বাড়িঘরে। যে আবাসগুলিতে তখনো বর্তমান রয়েছে বাংলাদেশে বসবাসকারী নিজ জন্ম ভিটে ছেড়ে যাওয়া হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতির নানা চিহ্ন। যে বাড়িটিকে কেন্দ্র করে বসবাসকারী মানুষের সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কত ব্যস্ততা ছিল, পরিত্যক্ত বাড়িটিতে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত চিহ্ন তখনো পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষদের অসহায়তা, জীবনযন্ত্রণা ধরা পড়েছে আমাদের আলোচ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ের 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পে।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেইসময় বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষকে আশ্রয় এবং পুনর্বাসন দেওয়া ছিল সরকারের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। সেই পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু জনগণ খুবই অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় সেইসময় ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যা পরিকাঠামো জনিত সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। তবে ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক শরনার্থী সেইসময় রেল স্টেশনে, ফুটপাতে, খোলা আকাশের নীচে বস্তি অঞ্চলে এবং বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। একইসময়ে ভারতবর্ষ থেকেও অনেক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ওপার বাংলায় পাড়ি দিয়েছিলেন। ওপার বাংলার কোনো এক জবরদখল করা আবাসকে কেন্দ্র করে লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ আমাদের পাঠ্য 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটি রচনা করেছিলেন। একটি তুলসীগাছের কাহিনির মধ্য দিয়ে লেখক মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। গল্পটির মধ্য

দিয়ে উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনযন্ত্রণার কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য গল্পটিতে দেশকাল ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। সেইসময় দুই বাংলার বসবাসকারী মানুষের সহযোগিতা খুবই জরুরি ছিল। গল্পের কাহিনি বিস্তারে আমরা লক্ষ্য করেছি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে লেখক মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন।

২.৬.৪.৫ : প্রতীকী গল্প

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখা 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটি অবশ্যই প্রতীকী। গল্পকার গল্পের শেষে বলেছেন—"সে-দিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারও মনে পড়েনি। কেন পড়েনি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।" গল্পকার মানবতার সূত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মিক বন্ধনকে আরও মজবুত করতে চেয়েছেন। তুলসীগাছ বাড়ির পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত, সেইজন্য প্রতিটি মানুষেরই উচিত তুলসীগাছের পরিচর্যা করা। সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে দুই বাংলার মানুষ পরস্পর-পরস্পরকে সম্মান জানিয়ে এসেছে। দুই বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও আদর্শগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে তুলসীগাছের কাহিনির মতো একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তুলসীগাছের নির্মল বাতাস প্রতিটি মানুষকে সবুজ মানসিকতা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। গল্পকার বলতে চেয়েছেন—মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে মানুষ বহুমুখী সংকট থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে। তুলসী গাছটি যত্নের অভাবে, পরিচর্যার অভাবে শুকিয়ে যেতে যেতেও জলের স্পর্শে যেমন বেঁচে উঠেছে তেমন মনুষ্যত্বের কারণে বিভিন্ন সামাজিক সংকট থেকে সমগ্র জাতি রক্ষা পেয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ 'একটি তুলসীগাছের কাহিনি' প্রতীকীর মাধ্যমে সে কথায় বলতে চেয়েছেন। একটি তুলসীগাছের কাহিনি প্রতীকীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মানবতাকে আরও সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন। বিভিন্ন ফুল দিয়ে যেমন মালা তৈরি করা হয়, তেমনি সুতো দিয়ে সেই ফুলগুলিকে গাঁথা হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করেছে। লেখক মনে করেন প্রতিটি মানুষকে মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারলে তবেই দুই দেশের মানুষ সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারবে। হিংসা মারামারি ভুলে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষকে ভাই বলে সম্বোধন করতে হবে। একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয় বরঞ্চ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

২.৬.৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গল্পসমগ্র—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্—সম্পাদনা—পবিত্র সরকার

২। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)—বীরেন্দ্র দত্ত

৩। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম—জীনাত ইমতিয়াজ আলী

৪। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য—হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৫। ছোটগল্পের বিষয়-আশায়—সুমিতা চক্রবর্তী

২.৬.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

২। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের সামাজিক সংকটের পরিচয় দাও।

৪। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটিকে প্রতীকী গল্প বলা যায় কিনা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু

বিন্যাসক্রম

৫.৫.১৬.২.৫ : ছোটগল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

৫.৫.১৬.২.৬ : স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু—সাধারণ পরিচিতি

৫.৫.১৬.২.৭ : নামকরণ

৫.৫.১৬.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৫.১৬.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৫.১৬.২.১ : ভূমিকা

৫.৫.১৬.২.৫ : ছোটগল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক কিংবদন্তী পুরুষ। তিনি ১৯৩৫ খ্রিঃ ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ শতকের ছয়ের দশকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম ছোটগল্প 'জলতরঙ্গ' ১৯৫৮খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন 'অবেলায়', 'আমার মেয়ের পুতুল', 'আমাকে দেখুন', 'উকিলের চিঠি', খেলা, 'ডুবুরি', 'নীলুর দুঃখ, 'পরপুরুষ', লক্ষীপেঁচা', স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু', 'হাতুড়ি', প্রভৃতি ছোটগল্প। 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার' গ্রন্থে, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—''শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের অঞ্চল এই বাংলাদেশ, তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী বিভিন্ন বয়সের বাঙালি নারী-পুরুষ যারা 'স্পেস' ও 'টাইমের' পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে স্বাভাবিকভাবে, অথচ গাঢ়তম অনুভবে একান্ত বাঙালি। বারবার মনে হয়, নির্মম 'ন্যারেটার' অথবা নিরপেক্ষ বিশ্লেষক -এর দূরত্ব মানতে পারেননি শীর্ষেন্দু।" (পৃ. ২৫২)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রিঃ। প্রথম উপন্যাসে সমাজ -সমস্যার কথা যেমন আছে, তেমনি চরিত্রগুলির আত্মিক সংকট লক্ষণীয়। তাছাড়াও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একের পর এক লিখে চলেছেন, 'পারাপার', ফুলচোর (১৯৮২), 'গোলাপের কাটা' (১৯৮৫) , উজান' (১৯৮৬), 'কাঁচের মানুষ' (১৯৮৭), 'চোখ' (১৯৮৮), 'মানব জমিন' (১৯৮৮) প্রভৃতি উপন্যাস।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ''জীবনের একটা গভীরতম তাৎপর্য আছে।" তাই সে জীবনকে জানার জন্যেই লেখক বিচিত্র সম্পর্কের, চেনা-সংসারের জটিলতাকে বাংলা কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এখন ৮৪ বছর বয়স হলেও তাঁর লেখনী কিন্তু থেমে নেয়। এখনও তিনি নিয়মিত নিজের জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন।

৫.৫.১৬.২.৬ : স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু—সাধারণ পরিচিতি

গল্পের শুরুতে দেখা যায়— মাখনলালকে অফিসে একটানা কাজ করতে হয়েছে, সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত সে ব্যস্ত থেকেছে। এরফলে অনেকদিন মাখনলাল অফিসের বাইরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়নি। ''চারদিকে জনশূন্য নি:শব্দ ঘরটা প্রকাণ্ড হয়ে আছে। মনে হল তাকে অন্যমনস্ক রেখে সারা বিকেল ধরে তার জ্বর এসেছে।'' অফিসের দারোয়াণ রামজীবন চাবির গোছা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কথা না বলে কাশির শব্দ করছে। তার গলার আওয়াজ থেকে জানা যায়, সে অফিসের কাছাকাছি আছে। মাখনলাল এরপর পুরনো অফিস বাড়িটার ভিতরে প্রবেশ করেছে। গল্পে দেখা যায়— ''বাইরের হাওয়ায় দোকানের উজ্জ্বল আলো আর লোকজনের ভিড়ের ভিতরে নেমে এসে হঠাৎ ঘুম এবং স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়, তার তেমনি সবকিছু খুব অচেনা লাগছিল।'' এদিকে মাখনলালের স্ত্রী ললিতা তার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করে রয়েছে। মাখনলালের খিদে পেয়েছে, তা এখন টের পেল। কেননা অন্যদিন, এইসময় মাখনলালের বাড়ি পৌঁছে খাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু মাখনলাল আজকে বাড়ি ফিরতে চাইছে না। তখন তার মনে হয়েছে—'কতকাল সে কলকাতার রাস্তায়, ময়দানে, এসপ্ল্যানেডে ঘুরে বেড়ায়নি, দোকানের শো— কেসে সাজানো জিনিস, আলো, লোকজন দেখতে দেখতে দু'পয়সার বাদাম শেষ করে খামোকা কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েনি।''

এই পরিস্থিতিতে গল্প করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন, মাখনলাল অনেকদিন পর চোখ তুলে লাল আকাশ দেখেছে। ওজন নেওয়ার যন্ত্রের ভিতর পয়সা ফেলে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এমনকী লিভারের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মাখনলাল যন্ত্রটার জেগে ওঠা টের পেয়েছে। লেখক বলেছেন, ''একটুক্ষণের জন্য জেগে ওঠে, তারপর জাগরণ ক্লান্তিকর দেখে যন্ত্রটা আসতে আসতে আবার তার শীতল চিন্তাহীন ঘুম এবং স্বপ্নের ভিতরে চলে গেছে।'' সেই পরিস্থিতিতে মাখনলাল ওজন করার টিকিটের মধ্যে একটি মেয়ের ছবি দেখতে পেয়েছে। এমনকী মাখনলাল হিসেব করে দেখেছে, তার বয়স অনুযায়ী যতটা ওজন হওয়া উচিত, তার চেয়ে এখন ওজন অনেকটাই কম।

এরপর মাখনলাল রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করেছে। খিদেও পেয়েছে অথচ রেস্টুরেন্টের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে অস্বস্তি অনুভব করেছে। তখন মাখনলালের মনে হয়েছে— ''এইসব আলো, গান, মেয়ে, তার জন্যে নয়। মনে হল— সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভাবল ফিরে যাই।'' তার কিছুক্ষণ পর খাবার না খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে সে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে অনুভব করলো, খিদের কারণে তার মাথা ঘুরছে, এমনকী হাতে-পায়ে বশ পর্যন্ত নেই। সেই মুহূর্তে মাখনলালের স্তম্ভিত ফেরে, যে এই সময় অন্যদিন এতক্ষণ সে বাড়ি ফিরে যেত। মাখনলাল আরো ভাবতে থাকে— ''তার দেরি দেখে নিশ্চিত ললিতা এখন ছয় বছরের বুকুকে পাশে নিয়ে মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। সে ফিরলে উঠে দরজা খুলে দিতে ললিতার ঘুমন্ত মুখ বেয়ে পড়া চুল, স্খলিত আঁচল দেখা যাবে।''

এই পরিস্থিতিতে মাখনলাল খানিকটা ঘুমের ভিতরে হেঁটে গেল। মনে পড়ার মধ্যে স্মৃতির গোপন কাজটুকু রয়ে গিয়েছে। মাখনলাল তবে রেস্টুরেন্টে কার চোখ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, হয়তো কেউ ছিল। এই

ভাবনাতেই মাতালের মতো টলে টলে পড়ে আর দোল খায়। আবার পরক্ষণেই চোখের চাউনি নিষ্ঠুর ছিল বলে, মাখনলালের পছন্দ হয়নি। 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার গ্রন্থে', বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ''তাঁর গল্প -উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভিতরে ও বাইরে কথার স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ে না সমানভাবে। বেশিরভাগ সময়েই অন্তরের গভীরে কথার পাহাড়। তাই বিপুল আন্দোলন না তুলে তাঁর গল্পে গ্রীষ্মের দগ্ধপথে বৃষ্টি পড়ে হাজারটা থার্মোমিটার ভেঙে পড়ার মতো। আবার এই তিনিই বৃষ্টির গন্ধ খোঁজেন। সে গন্ধ ভালোবাসার গন্ধ নয়, নেশাড়ু গন্ধ নয়, তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নয়, এই গন্ধ বড্ড মন খারাপ করে দেয়।" (পৃ.২৫২) এভাবেই মাখনলালও নি:সঙ্গ মানুষ হিসেবে জীবন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাখনলাল বৃষ্টির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। তখন মাখনলালের কাছে চেনা রাস্তাও অচেনা মনে হয়েছে। ''এই বৃষ্টি যেন তার চেনা-পরিচয়কে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন সে এক অদ্ভুত পর্দার আড়ালে আছে, পর্দা সরালেই দেখতে পাবে-বিদেশ।" গল্পকার এখানে মাখনলাল চরিত্রে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের অনুভবকে শিল্পিত করতে চেয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে মাখনলাল এমনই অন্যমনস্ক ছিল যে তার জুতোয় ফুটপাথ থেকে জল চলকে উঠে বয়ে যাচ্ছিল, সে খেয়াল পর্যন্ত করল না। এর থেকে মনে হয় মাখনলাল আত্মমগ্ন ছিলেন। তার পরিবার -পরিজন থাকা সত্ত্বেও সে ছিল নিঃসঙ্গ। সেইভাবে ভাবতে ভাবতে মাখনলালের মনে হয়েছে, কতদিন সে অবহেলা করে জীবনকে কাটিয়ে দিয়েছে। নিজের অফিসের কাজের কথা ভেবে, সংসারের কথা ভেবে, জীবনকে সে ঠিকমতো বুঝতেই পারেনি। এমনকী জীবনের আনন্দকে উপভোগ পর্যন্ত করতে পারেনি। তখন মনে হয় মাখনলালের নিজের দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। সেইজন্য একঘেয়ে, রুটিন মাফিক জীবন থেকে মাখনলাল মুক্তি পেতে চেয়েছে। তখন মাখনলাল আত্মিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে উপলব্ধি করেছে—''কতদিন সে বৃষ্টিতে ভেজেনি, রোদে আপাদমস্তক পোড়েনি। মনে হয় প্রেমহীন প্রকৃতিহীন কতগুলো দিন সে স্বপ্নের ভিতরে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনও ফিরেও দেখেনি দিনগুলি।"

মাখনলালের পরিবারে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তার বড় একা মনে হয়েছে। কেননা নিজের কাজ -কাজ করেই সে এতদিন সময় কাটিয়ে দিয়েছে। এর বাইরে যে জীবন রয়েছে, পথ চলাতে আনন্দ রয়েছে তা সে অনুভব করতে পারেনি। সর্বোপরি মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে সব কিছুর পরিবর্তন করে নিতে পারে। সংসারে-সমাজে এমন কোন কাজ নেই, যা মানুষ পারে না। তেমনি মাখনলালও যা মনে করবে, তাই করতে পারবে। শুধুমাত্র নিজের গণ্ডির মধ্যে থেকে বাকি জীবনটা সে নিজের ইচ্ছে মতো চালিয়ে নেবে। তখনই মাখনলালের দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেছে। তখন মাখনলালের মনে হয়েছে — ''কে যেন তাকে ধীরে টেনে নিচ্ছিল ঘুমে স্বপ্নের ভিতরে! " শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই গল্পের মাখনলাল চরিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সেই সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন যে অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি আমরা সকলে।

তাই লেখক মনে করেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে, কর্মরত হয়ে বাধাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবনে শান্তি কোথাও মেলে না। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয় এই আত্মিক সংকটে আমরা জর্জরিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু' গল্পের মাখনলালকে ও এইভাবে অসহায়তার মধ্যে, নি:সঙ্গতার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। তখন আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে মাখনলালের মনে হয়েছে

—"বহুকাল ধরে একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে কোথায় একটা সিগারেট জ্বলছে— সে খুঁজছে, খুঁজছে।" এই খোঁজার মধ্যে দিয়ে সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে। চেনা-জানা মানুষগুলিকে নিয়ে জোটবদ্ধভাবে চেষ্টা করেছে সর্ব-বিধ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে, মানুষকে জোটবদ্ধভাবে তা করতে হবে। গল্পের মাখনলালদের মতো মানুষরাও সেই সিগারেটের আগুনের খোঁজ পেলে সমস্ত অরাজকতার বিষয় পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। তার ফলে মানুষের দ্বারাই আবার নতুন পথ আবিষ্কৃত হবে, যে পথে থাকবে না কোন পাথর, যেখানে থাকবে শুধুই ফুল বিছানো।

৫.৫.১৬.২.৭ : নামকরণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' গল্পের মাখনলাল চরিত্রে যে কষ্ট আছে তা পাঠকদের কাছে করুণার উদ্রেক করেছে। কেননা নাগরিক ছন্দে বিশ্বাসী মাখনলাল আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে । সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রুটিন মাফিক জীবনে প্রচুর কাজ করলেও অর্থ উপার্জনের বাইরে সে কিছু চিনত না। তারফলে মাখনলালের জীবন থেকে আনন্দ হারিয়ে যেতে বসেছিল। আর রুটিন মাফিক কাজ তার কাছে জটিল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিয়ম মাফিক জীবন থেকে মাখনলাল বেরিয়ে এসেছে। তারফলে অফিসের ছুটির পর বাড়ি না ফিরে কলকাতার ময়দান এলাকায় কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানে মাখনলালের অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে—"বুকের পাশে একটা অস্পষ্ট ব্যথা ডাক-টিকিটের মতো লেগে আছে। মনে হল স্বপ্নগুলো এখনও তার মাথা থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়নি। কোথাও খুব কাছাকাছি তারা অপেক্ষা করে আছে। সুযোগ পেলেই স্বপ্নের ভিতরে— ঢাকনা খুলে রাখা ম্যানহোলে টেনে নিয়ে যাবে।"

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠক, লেখকের জীবনদর্শনের সন্ধান পেয়েছে। গল্পে মাখনলালের জীবনের যে সংকটের কথা তুলে ধরেছেন, তা তিনি মানুষকে ভালোবেসেই করেছিলেন। ফলে লেখকের দর্শন গভীর মানবিকতা বোধে পৌঁছে গেছে। লেখক দ্রষ্টা হয়ে যেমন সমাজের বহুবিধ সমস্যার ভয়াবহ রূপ দেখেছিলেন, তেমনি স্রষ্টা হয়ে গল্পে তার বাস্তব ও শিল্পিত চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষে তিনি বলেছেন— "তখন তটভূমি ছেড়ে দিয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে যাওয়ার মতো মাঝ সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিল মাখনলাল।" গল্পকার মাখনলালকে নি:সঙ্গতা থেকে দূরে সরিয়ে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এমনকী তিনি বলতে চেয়েছেন ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল পশ্চিমবঙ্গে এসে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তারা বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলে দিন কাটালেও মনে শান্তি ছিল না। তারফলে উদ্বাস্তু, মানুষরা ছিলেন চরম সংকটের সম্মুখীন। মাখনলালের মতো মানুষকে লেখক সেই জনসমুদ্রে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। তারফলে সমস্ত মানবজাতি একসঙ্গে লড়াই করবে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মানবজীবনের গভীরতর লোকে ডুব দিয়ে সংকটের মধ্যে ও মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই আশাবাদী জীবনদর্শন পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এমনটা সম্ভব হতো না। সেইজন্য মনে হয়, গল্পের নামকরণ 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.৫.১৬.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। কালের পুত্তলিকা—অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

২। পঞ্চাশের দশকের কথাকার — উজ্জ্বলকুমার মজুমার সম্পাদিত

৩। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য— হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি -প্রকৃতি — সোহারাব হোসেন।

৫.৫.১৬.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

২। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাফের’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাফের’ গল্পের সামাজিক সংকটের পরিচয় দাও।

৪। গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৫। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৬। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’ গল্পের মাখনলাল চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার করো।

—ঃঃ—

পর্যায় গ্রন্থ ৩ : প্রয়োগের বাংলা ভাষা

একক ৭. বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

ক. ভাষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য

খ. বাংলা ভাষা ও বাঙালি

গ. সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা

একক ৮. বাংলা ভাষার প্রয়োগগত দিক

ঘ. পরচর্চার-পরনিন্দার ভাষা

ঙ. সম্প্রচারের ভাষা

চ. বিজ্ঞাপনের ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে বলা যায়, যার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা হয় তাকেই ভাষা বলে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে আকার ইঙ্গিত বা বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমেও মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সবসময় এই ধরনের আকার ইঙ্গিত সৃষ্টির জন্য মানুষেরও প্রয়োজন হয় না। তবে কী সেক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করাকে ভাষা বলা যাবে? নিশ্চয়ই না। তার কারণ পৃথিবীতে একমাত্র মানবজাতিই ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে। ভাষার সংজ্ঞা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক বা ভাষাতাত্ত্বিক দিয়েছেন। এবারে কয়েকজনের দেওয়া ভাষা সম্পর্কিত সংজ্ঞা তুলে দেওয়া হল।

এক. সংজ্ঞা

ভাষা বলতে তাহলে আমরা কী বুঝব? বিষয়টা আলোচনা করার আগে বিভিন্ন দার্শনিক বা ভাষাবিজ্ঞানীর বক্তব্যগুলি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

ম্যাক্সমুলার :

ম্যাক্সমুলার ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—“language is the auto-biography of the human mind.” ম্যাক্সমুলারের দেওয়া এই সংজ্ঞা থেকে বলা যায় যে, মানুষের মনন যত প্রাচীন ততটাই প্রাচীন মানুষের ভাষা। আর তখন থেকেই মানুষের বাগেন্দ্রীয়গুলি আস্তে আস্তে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ মুখগহ্বর, ঠোঁট, জিহ্বা, শ্বাসনালী প্রভৃতি সাধারণ ইন্দ্রিয় বাগেন্দ্রীয়তে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলেই ভাষার সাহায্যে মানুষ তাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটিয়েছে।

গ্যয়টে:

জার্মান দার্শনিক গ্যয়টে এই বিষয়ে বলেছেন—"Language makes people of more than people language." অর্থাৎ ভাষাই মানুষকে ভাষাভাষী মানুষে রূপান্তরিত করেছে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়:

এবার আসা যাক নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়। তিনি বলেছেন—"কণ্ঠের ধ্বনি দিয়ে মানুষ যে অর্থবান ভাষা সৃষ্টি করেছে, সেই ভাষাকেই সে করে তুলেছে জীবনযাত্রার প্রধান হাতিয়ার।" নৃপেন্দ্রনারায়ণের এই কথা থেকে স্পষ্ট, ভাষার সঙ্গে সমাজের একটা অভিযোগ আছে। মানুষের জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দ ভাবে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ভাষা অপরিহার্য।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়:

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—"মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।" এখানে পরিষ্কার ভাষাচার্যের সংজ্ঞায় বাগ্‌যন্ত্র, সমাজ ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে।

সুকুমার সেন:

সুকুমার সেন এই বিষয়ে বলেছেন— "মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।" সুকুমার সেনের এই কথা থেকে স্পষ্ট, ভাষার প্রথম ও প্রধান কাজ হল মানুষের মনে স্পৃহা ও অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। ভাষাবিজ্ঞানীদের দেওয়া এইসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেও ভাষার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কারণ কোনও বক্তব্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

স্টার্টেভান্ট:

তবে এই ব্যাপারে ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য—"A Language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of social group co-operate and interact."

দুই. স্বরূপ

স্টার্টেভান্টের দেওয়া এই সংজ্ঞা থেকে বলা যেতে পারে, ভাষা হল মানুষের উচ্চারিত প্রণালীবদ্ধ ধ্বনি সংকেত। যা দিয়ে সামাজিক মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে। এর থেকে বলা যায়, একজন মানুষ তার চাহিদা মেটানোর জন্যে যখন অন্যের শরণাপন্ন হয়, অন্য মানুষ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে আগের মানুষটির বলা কথা শুনে। স্টার্টেভান্টের দেওয়া এই সংজ্ঞাটি এতটাই বিজ্ঞানসম্মত, এতটাই সর্বজনগৃহীত যার ফলে এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করা সম্ভব। স্টার্টেভান্ট প্রথমেই বলেছেন, 'Language is a...vocal symbols.' এর থেকে পরিষ্কার, ভাষা হল বাগ্‌যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বাগ্‌যন্ত্র থাকে একমাত্র মানুষের মধ্যেই। সুতরাং মানুষ ছাড়া কেউই ভাষার মাধ্যমে কথা বলতে পারে না। মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যেসব কথা বলে তা শব্দ দ্বারা গঠিত। শব্দগুলি আবার কতগুলি ধ্বনির সমষ্টি। সুতরাং মানুষের কথার মধ্যে যদি ধ্বনি বা শব্দ না থাকে তবে সেগুলি ভাষা নয়।

এখানে বলে রাখা ভাল, ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করলেই যে ভাষা হবে তার কোনও মানে নেই। কারণ ধ্বনির দ্বারা সৃষ্ট শব্দগুলিকে অবশ্যই কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতীক হতে হবে। তাই সম্ভবত স্টার্টেভান্ট 'Symbol' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন ধরা যাক্ 'আম' শব্দটি। এখানে 'আম' বলতে বাঙালিরা একটা বিশেষ সময়ের রসালো ফলকে বোঝে। কিন্তু শব্দটির ধ্বনিগুলি এদিক-ওদিক করে যদি 'মআ' লেখা হয় তবে তার কোনও অর্থই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না।

আর 'মআ' কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতীক নয়। এই ধরনের শব্দ বলে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা যায় না।

এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসে কোনও শব্দের অর্থ কী কার্যকারণ সূত্রে সবসময় একই থাকে? উত্তরে বলা যায়, না। কারণ মানুষ খেয়ালখুশি মতো কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর অর্থ বোঝাতে শব্দ ব্যবহার করে। বেশির ভাগ সময়ই সেটা একটা বিশেষ অঞ্চল ব দেশে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় সেটার বিভিন্ন নাম হয়। যেমন 'জল' শব্দটি। অঞ্চল বা দেশ ভেদে এটি 'পানি', 'ওয়াটার', 'অ্যাকোয়া', 'হৃদর' ইত্যাদি নামে পরিচিত। তার জন্যেই সম্ভবত স্টার্টেভান্ট বলেছেন 'arbitrary vocal symbols' কথাটি। সামাজিক মানুষ খেয়ালখুশি মতো কোনও শব্দ বা ধ্বনিকে কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর জন্যে নির্বাচন করে। কিন্তু সমাজে একবার স্বীকৃত হয়ে গেলে সেটিকে আর সহজে পাল্টানো যায় না। ভাষার ক্ষেত্রে এই প্রণালীবদ্ধ নিয়মটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে ভাষা সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? মানুষ না সমাজ? উত্তরে বলা যায়, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই ভাষা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিকশিত হওয়ার মূলে সমাজ। সামাজিক মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানই ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বিকশিত করেছে। তাই সদ্যোজাত শিশু সমাজ থেকে বহিস্কৃত হলেও সে কখনও ভাষা শিখতে পারে না। এখানে স্টার্টেভান্টের বলা 'members of social group co-operate and interact.' কথাটি মানানসই।

স্টার্টেভান্টের দেওয়া এই সংজ্ঞা থেকে ভাষার বৈশিষ্ট্যই নিরূপণ করা গেল। তা ছাড়াও ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন— অন্যান্য জীব থেকে ভাষাই মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ভাষার দ্বারাই মানুষ শিল্পমুখী, মননমুখী। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াও ভাষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সরকারি স্বীকৃতি। বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, মরাঠি ইত্যাদি ভাষা সমাজের পাশাপাশি সরকারি স্বীকৃতিও পেয়েছে। কিন্তু এইসব সমৃদ্ধ ভাষারিল উপভাষার কোনও সরকারি

স্বীকৃতি নেই। যে কোনও সমৃদ্ধ ভাষার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য উপভাষায় বিশ্লিষ্ট হওয়া। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে এই ভাষাটি ইতিমধ্যে পাঁচটি উপভাষায় বিভাজিত হয়ে আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে। যেমন—রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, কামরূপী ও বরেন্দ্রী। কিন্তু এর আদর্শ চলিত রূপটি বাঙালিদের কাছে সর্বজনীন। প্রত্যেক স্বীকৃত ভাষার মৌখিক রূপের মতো লিখিত রূপ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

তিন. বৈশিষ্ট্য

ভাষা সম্পর্কে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষের কথা বলা ছাড়াও বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিত, শব্দ সৃষ্টি যথেষ্ট। যেমন পশুপাখি তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে ডাকে, হিংস্রতা প্রকাশের জন্যে গর্জন করে বা বিভিন্ন যানবাহন পথ চলার সময় পথচারীকে হর্ন মেরে সতর্ক করে, এগুলিও এক ধরনের মনের ভাব প্রকাশক। তবে এগুলো কেন ভাষার পর্যায়ে পড়বে না? ভাষার সাধারণ সংজ্ঞায় জানা যায়, যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হয়, তাকেই বলে ভাষা। উপরোক্ত বিষয়গুলি তো মনের ভাবই প্রকাশ করছে। এ ক্ষেত্রে স্টার্টেভান্টের দেওয়া ভাষার সংজ্ঞা পড়লেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে—

- ভাষা অবশ্যই মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে সৃষ্টি হতে হবে। কিন্তু মানুষ ছাড়া পশুপাখির কোনও বাগ্‌যন্ত্র নেই। তাই তাদের উল্লাস, গর্জন, চিৎকার কখনওই ভাষার পর্যায়ে পড়ে না। অর্থাৎ সেগুলি শুধুই শব্দ, ভাষা নয়।

- মানুষ যে সব শব্দ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে, তা কতগুলি ধ্বনি দ্বারা গঠিত। আর সেই সব ধ্বনি একটি নির্দিষ্ট ভাষার ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত। শব্দসমূহের একটা নির্দিষ্ট অর্থও আছে। পশু-পাখি বা জীবজন্তুর

চিৎকারে কোনও সুনির্বাচিত ধ্বনিসমূহ নেই। তা সেই নির্দিষ্ট ভাষার বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃতও নয়।

- মানুষেরা যে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রকাশ করার জন্যে প্রতীকের সাহায্য নেয়। সেটি লোকসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু জীবজন্তু বা পশু-পাখির প্রতীক বা symbol সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

- মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ভাষা সৃষ্টি করেছে। সমাজ তাকে বিকশিত করেছে। অর্থাৎ বলা যায় প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ভাষার সৃষ্টি দাবিদার হলেও পরোক্ষভাবে ভাষার সৃষ্টিকর্তা সমাজ। মানুষ এককভাবে সমাজ ব্যতিরেকে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না। সুতরাং বোঝাই যায় ভাষার ক্ষেত্রে লোকসমাজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পশুপাখি বা জীবজন্তু নির্দিষ্ট কোনও সমাজ নেই। আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে দলবদ্ধভাবে দেখলেও তারা সামাজিক নয়। জীবজন্তুর কখনও একা, কখনও দলবদ্ধভাবে চিৎকার করলেও সেটি ভাষা হতে পারে না।

- মানুষের ভাষা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বলেই তারা বৃহৎ সমাজের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারে। কিন্তু পশু-পাখি বা জীবজন্তুর দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

- অনেক সময় ট্রেন, ট্রাম বা মোটর গাড়ির হর্ন বাজিয়ে ড্রাইভার মানুষকে সচেতন করে। উল্লেখ্য এটাও এক ধরনের মনের ভাব প্রকাশ। এখানে বলা যেতে পারে ড্রাইভারের আসনে বসা মানুষই কিন্তু তার মনের ভাব প্রকাশ করে হর্ন বাজিয়ে। মনের ভাব প্রকাশ করাটা নিশ্চয়ই ভাষা। কিন্তু হর্নের

শব্দে ভাষার অস্তিত্ব নেই। কারণ এটা সম্পূর্ণরূপেই যান্ত্রিক। এর মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত কোনও নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিসমষ্টি নেই। তা ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতীকও নয়। হর্নের শব্দে শুধুমাত্র 'পথ ছেড়ে দাও' এইরকম ভাবই প্রকাশ করা সম্ভব। মানব-জীবনের বিচিত্রভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর ওই শব্দ মানুষের বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা সৃষ্টিও নয়। উল্লেখ্য পশু-পাখি বা জীবজন্তুর চিৎকার, গর্জন হয়তো তাদের সামান্য ভাবকেই প্রকাশ করে। কখনওই তা মানব জীবনের বিচিত্র অনুভূতিকে নয়।

- মানুষের ভাষার মধ্যে পশু-পাখি বা জীবজন্তুর ডাক সরকার স্বীকৃত নয়। এর কোনও লিখিত রূপ নেই। এগুলি জীবন্ত ভাষার মতো উপভাষায় বিশ্লিষ্ট হয় না। তবু আধুনিক কালে পশু-পাখি বা জীবজন্তুর চিৎকার-গর্জন নিয়ে গবেষণা চলছে। তাদের ডাককে বোঝার চেষ্টা করে বিভিন্ন বই লেখা হচ্ছে। মানুষও তাদের মত চিৎকার বা গর্জন করে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। পশু-পাখিদের পোষ মানিয়ে নিচ্ছে। তবুও এগুলিকে ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

এ ছাড়া বলা যায় মানবভাষা সহজাত নয়, অর্জন করতে হয়। মানবভাষা গতিশীল, পরিবর্তনশীল। পাঁচশো বছর আগেকার ভাষা থেকে বর্তমানের ভাষা অনেক স্বতন্ত্র। এই ভাষার কালগত বৈচিত্র যেমন আছে, তেমনি স্থানিক, আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও আছে। তাই একই ভাষা অঞ্চলভেদে আলাদা হয়ে যায়। মানব ভাষায় অঞ্চল ভেদে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। মানবভাষায় সংযোগের মূলে আছে বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্স। কারণ মানুষের মস্তিষ্কে সেরিব্রাল্‌ হেমিস্ফিয়ার আছে। মানব ভাষাকে অনেক সময় অধিক ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলতে ভাষাতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি সহায়তা করে।

মানেবতর প্রাণিদের ধ্বনিগত উপাদান নেই। এটা সহজাত, অর্জন করতে হয় না। এদের সংযোগের উপাদান স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয়। পাঁচশো বছর আগে জীবজন্তুর ডাক যেমন ছিল এখনও তেমনটিই রয়েছে। এদের ধ্বনিগত, কালগত বৈচিত্র যেমন নেই, তেমন স্থানিক, আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও নেই। অঞ্চল ভেদে পশু-পাখির ডাকের কোনও পার্থক্য নেই।

অন্যক্ষেত্রে বলা যায় মানবেতর প্রাণির সংযোগ মাধ্যমে আঞ্চলিকতা নেই। তাই বছরের পর বছর ধরে একই ডাক, কোনও পার্থক্য নেই। এদের ধ্বনি অতীতকে স্মরণ বা প্রকাশ করতে পারে না। আসলে এদের সংযোগ পদ্ধতিতে Paralanguage নেই। এদের সংস্কৃতি নেই বলে ভাষারও কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে বলা যায় এদের কন্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির গঠন ও অর্থের দিকটা সীমাবদ্ধ। এদের সংযোগ মাধ্যমে কোনও বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্স নেই, তার কারণ ওদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্কিয়ার নেই। তাই মানুষের মতো এরা ভাষা সৃষ্টি করতে পারে না। এদের সংযোগ ব্যবস্থায় ধ্বনিতিরিক্ত কোনও অঙ্গভঙ্গিও তাই কাজ করে না।

বাংলা ভাষা ও বাঙালি

বাংলা ও বাঙালির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাঙালির উদ্ভব কবে হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে আজও। কারও মতে আগে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। আবার কেউ বলেন আগে বাঙালি এসেছে, তাদের ব্যবহৃত ভাষাই বাংলা। বাঙালি ও বাংলার অস্তিত্বের কথা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া গেছে। 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-সহ কালিদাসের 'রঘুবংশম'-এ রয়েছে। আরও একটু পেছনে তাকালে দেখব 'বঙ্গ' কথাটি 'ঐতেরেয় আরণ্যক' গ্রন্থেও আছে। অনেকে দাবি করেছেন খ্রিস্টের জন্মের আগেও বাঙালির অস্তিত্ব ছিল। শুধু ভারতবর্ষেই নয়; অধুনা পাকিস্তান এমনকি আফগানিস্তানেও বাঙালি থাকত। তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হয়, বাঙালি একুশ শতকে এসেও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই তো বাঙালির জয়জয়কার। সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলো, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সর্বত্রই বাঙালি চলে এসেছে একদম প্রথম সারিতে। লোকসংখ্যার বিচারেও! ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা ভাষা এখন পৃথিবীর ষষ্ঠ-সপ্তম স্থানে রয়েছে।

বাঙালি জাতি :

শুরুতেই বলা ভালো, বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। ভারত তথা বাংলায় আর্যরা আসার পর থেকেই বাঙালি তার মৌলিকতা হারিয়েছে। আমরা সবাই জানি, আর্যরা আসার আগে ভারতের এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বসবাস করত অনার্যরা। অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয় ইত্যাদি বংশোদ্ভূতরা। আর্যরা বঙ্গভূমিতে এসে রাতারাতি সবাই

যে বাঙালি হয়ে গেল, তা হতেই পারে না। বরং বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী অনার্যরা, আর্যদের সংমিশ্রণে ধীরে ধীরে বাঙালি হয়ে গিয়েছিল, এমন সম্ভাবনাই বেশি। এই মিশ্রণ একদিনে হয়নি, দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। অনুমান করা যায়, বিবাহ সূত্রে যেমন রক্তমিশ্রণ ঘটে, পাশাপাশি সংস্কৃতির মিশ্রণও হয়েছিল।

বৈদিক যুগে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ আছে। মূলত ঐতেরেয় আরণ্যকে। এই বঙ্গে যারা বসবাস করত, তারাই বঙ্গবাসী বা বাঙালি। বঙ্গদেশের প্রধান নদী যে গঙ্গা তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। খ্রিস্ট পূর্ব যুগে বিদেশি লেখকদের লেখা 'জর্জিকাস', 'আরগনটিকা' ইত্যাদি গ্রন্থে 'গঙ্গা-রাঢ়' দেশের নাম আছে। এখানে বসবাসকারী মানুষের বীরত্বের কথাও তাতে আছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, খ্রিস্ট পূর্ব যুগেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তারা বাংলাতে কথা বলত কিনা তা কোথাও লেখা নেই। সিন্ধু সভ্যতার বিবরণে প্রাপ্ত সিলমোহরেও বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্ন বিদ্যমান। বাঘ সিংহের ছবির পাশাপাশি ওখানকার মানুষের সর্ষের তেলের ব্যবহার বাঙালি মানসিকতারই পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, রেশমবস্ত্র, চাল, মাছ ইত্যাদির ব্যবহার দেখেও অনুমান করা যায় সেখানে বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল।

বাল্মীকি রামায়ণে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতির কথা আছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় দেশ হিসেবে বঙ্গকে মান্যতা দিয়েছেন। ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম-এর উল্লেখ। এখানে অবশ্য বঙ্গ কোনও দেশের নাম নয়। রানি সুদেষ্ণার পুত্র বঙ্গ। কালিদাসের রচনায় যেমন দক্ষিণ রাঢ়ের কথা আছে তেমনই হিউয়েন সাঙ-এর রচনাতেও বঙ্গদেশ, বাঙালি ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাঙালি ছিলই। তাদের ভাষাও নিশ্চয়ই ছিল। সেটা কোন ভাষা, সেটাই প্রশ্ন।

সেই সময়ের বাঙালির বীরত্বের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত। নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন, তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে স্বভাবতই কৃষিকাজকে তারা বেছে নিয়েছিল। তবে এর পিছনে ছিল মূলত আর্যদের ভূমিকা। তারাই যেহেতু অনার্য (অস্ট্রিক) বঙ্গবাসীদের আর্যে রূপান্তরিত করেছিল, তেমনই কৃষিকাজেও হাত মিলিয়েছিল। অনার্যরা আর্য হয়ে গেলেও কিন্তু অস্ট্রিক পুজো-আচ্চা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি ছাড়তে পারেনি। তবে 'আর্য-বাঙালি' উৎসের পেছনে অনেকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, এই দুই সংস্কৃতির মিশ্রণও দেখতে পেয়েছেন। যাই হোক, আর্য হয়েও এই বাঙালি অনার্য সংস্কৃতির গাছ, পাথর ইত্যাদি পুজোর বিষয়টা ছাড়তে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানও অনার্য ভাবনাপ্রসূত। তাই অনেকের মতে অনার্যদের পুরোপুরি না পাল্টে আর্যরাই বরং অনার্যদের ধর্ম, সংস্কৃতি, উৎসব ইত্যাদিকে নিজেদের আপন করে নিয়েছিল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এখনকার বাঙালি জাতির উদ্ভব হিসেবে অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী বা অস্ট্রিকভাষী মানুষদেরই মনে করেছেন। এখনকার বাঙালিরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, রীতিনীতি বজায় রাখলেও ভাষাটা তারা গ্রহণ করেছে আর্যদের। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"...অনার্য্যের ধর্ম মরিল না, অনার্য্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতা বাদে, পৌরাণিক পূজা দিতে, যোগচর্য্যার তান্ত্রিক মতবাদ ও অনুষ্ঠানে আর্য্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলিইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল। উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেক বেশি, কেবল আর্য্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল।"

বাংলা ভাষা :

জীবন্ত মানুষই বাঁচিয়ে রাখে ভাষাকে। কোনও সমাজের মানুষ কোনও ভাষায় কথা বললেই বোঝা যায় সেই ভাষাটি বেঁচে আছে। যখন আর কেউ একটা ভাষায় কথা বলে না, তখন বুঝতে হবে সেই ভাষার মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কিছু সমৃদ্ধ ভাষা রয়েছে, যে ভাষায় আর কেউ কথা বলে না। এমন দুটি ভাষা হল সংস্কৃত ও ল্যাটিন। শুধু তাই নয়, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানুষও তাদের মাতৃভাষা একশো বছরের মধ্যে (১৮০০-১৯০০) ভুলে গেছে। তার পরিবর্তে তারা ইংরেজিতে কথা বলে। এদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের মতোই ভাষারও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। তবুও মানুষ নিজস্ব ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এ বড় মায়ার বাঁধন। বাঙালিরা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যদিও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তর যথেষ্ট হয়েছে; আর এর মধ্যে দিয়েই বেঁচে আছে বাংলা ভাষা। এই মুহূর্তে হাজার বছর অতিক্রান্ত আমাদের বাংলা ভাষা। অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষাও বেঁচে আছে মানুষের মুখে এবং পাশাপাশি লেখকের রচনায়। বিভিন্ন উপভাষাকে সঙ্গে নিয়েও তা বেঁচে রয়েছে আদর্শ কথ্য বাংলায়। শিষ্টজনের মুখে, বই ও পত্রপত্রিকায়।

ঐতিহাসিকদের মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে আছে আর্যরা। আর্যরা আনুমানিক খ্রি: পূর্ব ১৫০০ অব্দে ভারতবর্ষে আসে। সেইসময় ভারতবর্ষে শুধুই অনার্যরা বাস করত। তাদের খাওয়া-দাওয়া, ভাষা, আচার-আচরণ খুব একটা উন্নত মানের ছিল না। বুদ্ধিও কমই ছিল। আর্যরা সেই সুযোগে ধীরে ধীরে গোটা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। তাদের বৃত্তি ছিল মূলত পশুপালন। যাযাবরের মতো তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করলেও তাদের ভাষা ও সাহিত্য ছিল সমৃদ্ধ। ফলে

সহজেই তারা অনার্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তারা গোটা ভারতবর্ষে ক্রমশ প্রভাব ফেলতে থাকে। এইসব বিভিন্ন দলের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মিলের জায়গাই ছিল বেশি। অনুমান করা হয় তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। শুরুর দিকে তারা নানান দেব গীতিমূলক কাব্য রচনা করেছিল। যেমন—বেদ, উপনিষদ, ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতি। এই বৈদিক দেবগীতিমূলক ভাষা থেকে একদিনে বাংলা বিবর্তিত হয়নি। সময় লেগেছিল অনেক। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যেমন তা প্রায় আড়াই হাজার বছর।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষদের আদি বাসভূমি হিসেবে অনেকেই দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশকে চিহ্নিত করেছেন। আবার কারও মতে মধ্য এশিয়ার কিরগিজ মরুভূমি। আবার কেউ বলেছেন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল। অর্থাৎ এরই মধ্যে কোনও একটা জায়গা থেকে তারা ভারতে প্রবেশ করে। আর্যরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করত, সেই ভাষাতে নিশ্চয়ই কথা বলত না। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, কথা বলার সময় তারা অনার্যদের সংস্পর্শে এসেছিল। এর ফলে অনার্যদের সঙ্গে কথা বলা, আলাপ-চারিতায় তাদের বৈদিক ভাষার মধ্যে প্রচুর অনার্য শব্দ, শব্দাংশ, বাক্য-বাক্যাংশ ঢুকে যায়। ফলস্বরূপ বৈদিক লেখ্য ভাষা অবিকল থাকলেও কথ্যরূপ অনেক বদলে যায়। তখন অবশ্য এই বিরাট ভূখণ্ডে শিক্ষিতের হারও অনেক কম ছিল। তাই লেখ্যরূপ স্বল্প মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কথ্যরূপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে।

অনুমান করা হয়, ভারতবর্ষের চারটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কথ্যরূপ আবর্তিত হয়। সেগুলি হল— প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। এগুলি স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তিত হয়েছিল। আর এই সূত্রেই উদ্ভব হয় মধ্যভারতীয় আর্যের।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, আর্যরা সকলে একসঙ্গে ভারতবর্ষে আসেনি। বিভিন্ন পর্বে এ দেশে তাদের আগমন। প্রথম দফায় যারা এসেছিল, কয়েক শো বছর এখানে টানা থাকার ফলে তারা নিজেদের অনেকটাই বদলে নিয়েছিল। তাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, ভাষা, আচার-ব্যবহার সবই অনার্যদের সঙ্গে মেলামেশায় কথ্য হয়েছিল। এ কথা অনুমান করাই যায় যে তাদের আগমনের পাঁচশো বছর পর যে আর্যরা ভারতবর্ষে আসে, তাদের সঙ্গে পূর্বোক্তদের আচার-আচরণ, রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা, ভাষা সব কিছুরি একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। ফলে সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। সেই সংঘাত এড়াতে কিংবা পরাজিত হয়ে কিছু আর্য ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে সরে আসে। এই কারণেই ভারতের পূর্বাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চল বা অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের বিস্তর প্রভেদ। জানা গেছে, আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল বর্তমান আফগানিস্তানের পথ ধরে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং পঞ্জাব দিয়েই তারা ভারতে প্রবেশ করে। অতঃপর তারা ক্রমেই সরে আসতে থাকে পূর্ব দিকে। অর্থাৎ মধ্যদেশ হয়ে মগধ-রাঢ়-বরেন্দ্র-কামরূপ ইত্যাদি প্রাচ্য অঞ্চলে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, অনার্য ভাষাও বহু বৈচিত্রময় ছিল। বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন অনার্য বসতি ছিল। তাদের ভাষার মধ্যেও নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল। এই রকমফেরই প্রাচ্য উপভাষাকে দু ভাগে বিভাজিত করে দেয়। এই দুটি বিভাগ হল প্রাচ্য মধ্যা ও প্রাচ্যা। এরপর এই প্রাচ্যারূপই ধীরে ধীরে মাগধী প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ হয়ে বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অবশ্য এক দিনে এই রূপান্তর সাধিত হয়নি। পরিবেশ, জলবায়ু, সমাজ ইত্যাদি এই ভাষার দুটি ধারা সৃষ্টি করেছে। একদিকে মাগধী অন্যদিকে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের দুটি ধারা পুর্বী ও পশ্চিমা। কালক্রমে রাজ্যের সীমানা কিংবা শাসকের অনুশাসনে পূর্ব ধারা ভেঙে রূপ পেয়েছে বঙ্গ-অসমিয়া ও ওড়িয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি,

সাম্প্রদায়িকতা, স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি কারণে বঙ্গ-অসমিয়া ভেঙে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যা ও কথা বলার নিরিখে যে ভাষার স্থান বর্তমানে বিশ্বে ষষ্ঠ-সপ্তমে। অনুমান করা হয়, বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক পদকর্তাদের লেখা চর্যাপদই হল বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।

আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষার যে রেখচিত্র এঁকেছেন, তা নিচে দেওয়া হল—

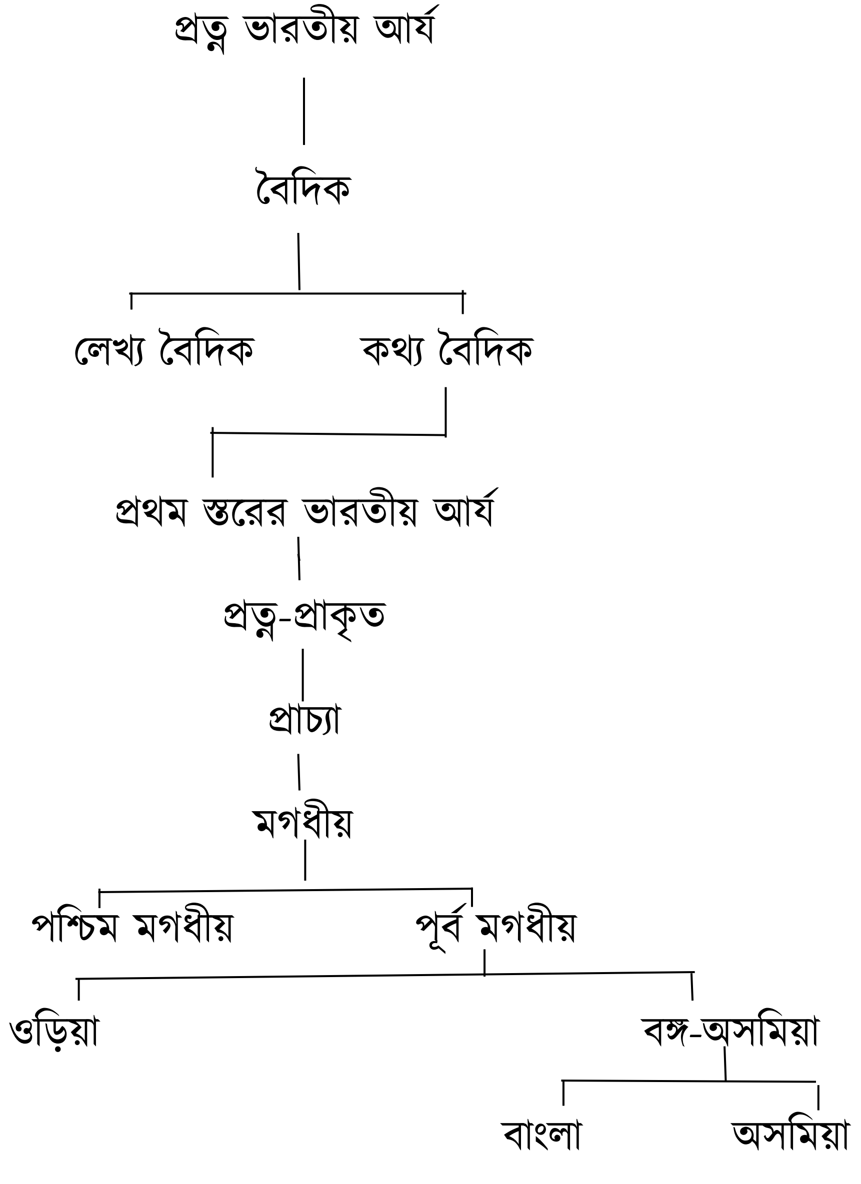

সুকুমার সেন তাঁর রেখচিত্রে মগধীয় ভাষার উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিষয়টির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস অনুযায়ী, আর্যরা যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তখন মগধ রাজশক্তির জয়জয়কার। সেখানে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রভাব যথেষ্ট। এরই মাঝে যেন মগধ রাজশক্তির প্রতিনিধিত্ব করতেই বাংলাদেশে এল আর্য ভাষা এবং আর্য ভাষাভাষী জনতা। এই আর্যকেই সুকুমার সেন স্বীকৃতি দিয়েছেন মগধীয় ভাষা হিসেবে। কারণ এই ভাষাই ছিল মগধের রাজার ভাষা, তার সংস্কৃতির ভাষা, তার ধর্মের ভাষা। ফলে রাজশক্তির ভাষার কাছে বাংলাদেশী অনার্য ভাষা পেরে ওঠেনি। সব দিক থেকেই তারা পরাজিত হয়। আর্য-পূর্ব ভাষা ছেড়ে দিয়ে তখনকার বাঙালি সম্ভবত বাধ্য হয়েই মগধরাজ স্বীকৃত ভাষাকে গ্রহণ করে। সুকুমার সেন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের বাংলাদেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা দেখে অনুমান করা যায়, সেইসময় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই আর্য ভাষাভাষী হয়ে উঠেছিল।

অনেকের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি একান্তই আর্য সংস্কৃতি। এই ধারণা একেবারেই যথার্থ নয়। কারণ আর্য ও অনার্যের মিলনেই ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তবে অবশ্যই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে ক্ষমতাশালীর আর্য ভাষাই। সেখানেও অবশ্য অনার্য ধ্বনি, শব্দ, ব্যাকরণের রূপরীতি অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সমৃদ্ধ হয় আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি। আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আর্য ভাষার মধ্যে এই অনার্য ভাষার রূপরীতি ঢুকে যাওয়ার ফলেই কিন্তু আর্য ভাষা ভেঙে তৈরি হয় প্রাকৃতজনের ভাষা বা লোকসাধারণের ভাষা। সংক্ষেপে তাকেই বলা হয় প্রাকৃত ভাষা। সুকুমার সেনের মতে প্রত্ন-প্রাকৃত থেকেই প্রাচ্যের মধ্যে দিয়ে আর্য ভাষা মগধীয় রূপ লাভ করে। অন্যদিকে অবশ্য সুকুমার সেনের আগেই স্যার আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ও

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, প্রাকৃত (প্রাচ্য অঞ্চলের কথ্য ভাষা) থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ হয়ে প্রাচীন বাংলার সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ--

প্রাকৃত > মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > প্রাচীন বাংলা > মধ্য বাংলা > আধুনিক বাংলা

কিন্তু মহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য (আদিম প্রাকৃত)। সেখান থেকে প্রাচ্য প্রাকৃত, তারপরের রূপ হল গৌড়ীয় প্রাকৃত। আর এখান থেকেই গৌড়ীয় অপভ্রংশ হয়ে প্রাচীন বাংলার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ--

আদিম প্রাকৃত > প্রাচ্য প্রাকৃত > গৌড়ীয় প্রাকৃত > গৌড়ীয় অপভ্রংশ > প্রাচীন বাংলা > মধ্য বাংলা > আধুনিক বাংলা

কিন্তু ভাষা বিশেষজ্ঞরা গ্রিয়ারসন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতটিই গ্রহণ করেছেন।

অত্যাধুনিক বাংলা ভাষা

ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়সীমাকে আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা ধরা হয়। আধুনিক বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে বিশেষ করে অত্যাধুনিক বাংলা ভাষা ব্যাপক বৈচিত্র্যময়। ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগঠনগত ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যের নানা দিক থেকেই এই পর্বের ভাষা আধুনিক বাংলা থেকে ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক লেখকদের রচনা, বিজ্ঞাপনের ভাষা, সংবাদপত্র-ম্যাগাজিনের ভাষা, টেলিভিশনের ভাষা, এখনকার মানুষদের কথ্য ভাষা ইত্যাদি এই পর্বের বড় নিদর্শন। গত কুড়ি বছরে এই পরিবর্তন ব্যাপক রূপ নিয়েছে। শব্দ, বাক্য, ছন্দ সব ক্ষেত্রেই এই ভাষায় নতুনত্ব। বলা যেতে পারে এই পর্বের ভাষা আসলে অত্যাধুনিক বাংলা ভাষা। এই পর্বের জীবন্ত নিদর্শন মানুষের মুখের ভাষা।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

এক. অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ অভিশ্রুতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গেল। উদাহরণ—

রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে

বলিয়া > বইল্যা > বলে

দুই. অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতির বহুল ব্যবহার সূচিত হল। যেমন—

পুজা > পুজো

ভিখারি > ভিখিরি

বিয়া > বিয়ে

বিলাত > বিলেত

হিসাব > হিসেব

সুপারি > সুপুরি

তিন. অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ ছাড়া প্রায় সব শব্দেই 'ঈ'-কারের বদলে 'ই'-কার, মূর্ধন্য (ণ) এর বদলে দন্তন্য (ন) এবং 'ষ' বদলে 'শ' বা 'স' এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেছে। উদাহরণ—

কাহিনী > কাহিনি

শ্রেণী > শ্রেণি

রানী > রানি

ষ্টেশন > স্টেশন

চার. ইংরেজির মতো করে বাংলা শব্দ উচ্চারণের প্রবণতা এই সময়ের বাংলা ভাষার বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন— স্যাংস্কৃত, বেঙ্গলি ইত্যাদি

পাঁচ. বাংলা ভাষায় হিন্দি, ইংরেজির মতো নানা ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে কথা বলার প্রবণতা যেমন—

না নিলেই 'লস'। (ইংরেজি)

'বহুত' দূরের ব্যাপার সেটা। (হিন্দি)

কাল 'রেজাল্ট' দেবে। (ইংরেজি)

ছয়. 'য' ফলার ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে। অবশ্য যেখানে প্রয়োজন হচ্ছে না সেখানে। উদাহরণ—

সূর্য্য > সূর্য

অমর্ত্য > অমর্ত

ভট্টাচার্য্য > ভট্টাচার্য

সাত. অত্যাধুনিক কালের বাংলা ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে সরলীকরণের প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ—

সম্বর্ধনা > সংবর্ধনা

উল্টো > উলটো

পাল্টানো > পালটানো

আট. খণ্ড (ৎ), বিসর্গ ঃ (এবং হস( )চিহ্নের প্রায় লোপ লক্ষণীয় যেমন—

উচিৎ > উচিত

বিশেষতঃ > বিশেষত

দোকান্ > দোকান

নয়. দ্বিত্বব্যঞ্জন যেমন 'ত্ত', 'জ্জ'-এর ব্যবহার অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় কমে গেছে। যেমন—

চক্রবর্ত্তি > চক্রবর্তী

ব্যানার্জ্জী > ব্যানার্জি

মুখার্জ্জী > মুখার্জি

দশ. সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি দ্বিস্বর ধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন—

আইল > এলো

এগারো. আধুনিক বাংলায় নিত্য নতুন ভাব প্রকাশের জন্য নিত্য নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রবণতা দেখা গেছে। কখনও বা দুটি শব্দের সহযোগে একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন—

চাকুরিরতা > অচাকুরিরতা

(যিনি চাকরি করেন) (যিনি চাকরি করেন না)

আবার বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনের জন্য করা ফোনকে একসঙ্গে বলা হয় 'বিজ্ঞাফোন'।

বারো. এই পর্বের বাংলা ভাষায় বাক্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি শব্দসহ ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ—

ইংরেজি—ফোন, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

ফরাসি—বুর্জোয়া প্রভৃতি।

পর্তুগিজ—আলমারি, আলপিন ইত্যাদি।

রুশ—সোভিয়েত প্রভৃতি।

এ ছাড়া নিত্য নতুন শব্দ তো ব্যবহৃত হচ্ছেই। যেমন— ল্যাপটপ, কম্পিউটার, আইপড, কমপ্লেক্স, মাল্টিমিডিয়া, কর্পোরেট, ফান্ডা, বিন্দাস ইত্যাদি।

তেরো. আটপৌরে দেশজ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার আধুনিক বাংলায় দেখা যায়। যেমন—

থুত্থুরে, গঞ্জের, রোববার, বিষ্যুদবার প্রভৃতি।

চোদ্দ. খণ্ডিত শব্দের ব্যবহার এই পর্বে লক্ষণীয়। যেমন— মোটরবাইক > বাইক, একজামিনেশন > একজাম, ল্যাবরেটারি > ল্যাব, আডভারজাইটিং > অ্যাড ইত্যাদি।

পনেরো. সম্বন্ধ বা সম্বোধনসূচক পদগুলিতেও সমব্যাঞ্জনের একটি লোপ হয়ে চলেছে। যেমন—

কাকা > কা

বাবা > বা

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এক. এই পর্বের বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া ক্রিয়ার সঙ্গে বিদেশি শব্দ যোগ করে অন্য ধরনের যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন— মার্ডার করা, মুভ করা, রেপ করা, রেকর্ড করা ইত্যাদি।

দুই. উভয় লিঙ্গ শব্দের লিঙ্গভেদের চেষ্টা অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় দেখা গেছে। যেমন—

ছেলেবেলা=(মেয়ে বা ছেলের 'শৈশব কাল')

কিন্তু তসলিমা নাসরিন লিখেছেন—আমার মেয়েবেলা।

তিন. শব্দদ্বৈতের ব্যাবহারে নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন— নতুন নতুন জায়গা, লাল লাল ফুল, গরম গরম খাবার, অল্প অল্প বৃষ্টি ইত্যাদি।

চার. বর্ণদ্বিত্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—সবাই > সব্বাই, চারিদিক > চাদ্দিক, সকলে > সক্কলে প্রভৃতি।

পাঁচ. বাক্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমিয়ে দেয়ার প্রবণতা। বিশেষ করে সংবাদপত্রের শিরোনামে ক্রিয়াপদহীনতা লক্ষণীয়। যেমন—বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরি। এখানে ক্রিয়াপদ ছাড়াই বাক্য গঠিত হয়েছে।

ছয়. এই পর্বে অনেক ইংরেজি ইডিয়ম ফ্রেজের অনুবাদমূলক রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন—

Bed of Roses > ফুলের বিছানা, From head to tale > আপাদমস্তক

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য:

এক. এই পর্বের বাংলা ভাষায় কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির পাশাপাশি দাড়ি বা পূর্ণছেদের ব্যবহার বেশি।

দুই. একটি শব্দ বা কেবল ক্রিয়া (Verb)-র উপর নির্ভর করে বাক্য গঠিত হচ্ছে। উদাহরণ—'দেখুন। ভাবুন'। আবার কর্তাকে উহ্য রেখে কর্ম ও ক্রিয়াপদ বা শুধু যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করে বাক্য গঠিত হচ্ছে ।যেমন—'এবিপি আনন্দ। বাঙালির। বাংলার। (এবিপি আনন্দ)

তিন. ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমিয়ে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বাক্যকে শক্তিশালী ও চমক সৃষ্টি করার প্রবণতা এখানে দেখা যায়। যেমন—পাত্রের বিয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষা—

কায়স্থ 35+/6, M.Sc, ব্যবসা 60,000 পাত্রের সুন্দরী Slim ফর্সা অনূর্ধ্বা 24 সঃ/অসঃ কাম্য। (M) 0502515855

চার. সাধারণত ‘এবং’ দুটি বাক্যকে জুড়তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় ‘এবং’ দিয়েই বাক্য শুরু হয়। অর্থাৎ ‘এবং’ সবসময় এখানে সংযোজক অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। যেমন—

বাক্য: এবং আমিও গেলাম কংসাবতীর তীরে।

বাদল সরকারের একটি নাটকের নাম— ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’।

পাঁচ. সম্প্রতিতে বাংলা শব্দের মধ্যে ভিন্ন শব্দ বসিয়ে সংলাপ লেখার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—

ক. ‘নার্সারিতে শুরু, হাফ প্যান্টে গুরু, ফুল প্যান্টে মহাগুরু।’

খ. ‘মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে।’

ছয়. অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় দেখা যায় অনেক ছোট ছোট বাক্য। কখনও আবার একটা শব্দ দিয়েই বাক্য গঠন করা হয়। যেমন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ঔপন্যাসিক। প্রাবন্ধিকও ।

তিনি কবি। দার্শনিক। চিত্রশিল্পী।

সাত. সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দুটি শব্দের মাঝে সংযোজক অব্যয় ‘ও’ কে ইংরেজি বর্ণ ‘o’ দিয়ে লেখা হচ্ছে। উদাহরণ— কালি ‘o’ কলম।

আট. বর্তমান কালের বাংলা ভাষায় একটি নতুন উপভাষায় সন্ধান পাওয়া গেছে। যার নাম— ‘দোক্‌না’ মূলত ইংরেজি ও বাংলার মিশ্রণে বাংরেজি। কেউ একে দোকনাও বলেছে। রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, কামরূপী ও বরেন্দ্রীর পাশাপাশি এই ভাষাতেও বর্তমানের মানুষেরা কথা বলছে।

নয়. বাক্যের দ্বারা কোনও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে আবেগ, উচ্ছ্বাস বর্জনের প্রবণতা আধুনিক বাংলা ভাষায় লক্ষ করা গেছে। উদাহরণ—

ছেলেটি ভীষণ গরিব। তবে পড়াশোনায় ভালো।

কি সুন্দর জায়গা।

'ভীষণ গরিব' বা 'সুন্দর জায়গা' কথাটিতে বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!) না দিয়ে দাড়ি (।) দেওয়া হয়েছে।

দশ. সবচেয়ে বড় কথা অত্যাধুনিক বাংলায় মানুষের মুখের ভাষাই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। জয় গোস্বামীর কবিতায়—

"বেণীমাধব, বেণীমাধব তোমার বাড়ি যাব
বেণীমাধব, তুমি কি আমার কথা ভাবো।"

[মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়]

এগারো. এখনকার বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র বা বিনোদনের জগতে অথবা সাংবাদিকতার জগতে বড়দের 'নাম ধরে' 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—

"বিরাট আপনার অধিনায়কত্ব চলে যাওয়ার কারণ কী থাকতে পারে বলে মনে হয়?"

বারো. অত্যাধুনিক বাংলা ভাষায় সাধুরীতি একেবারেই উঠেই গেছে বলা যায়। এখন চলিত রীতিতেই সমস্ত সাহিত্য লেখা হচ্ছে। সেটাও অত্যাধুনিক রূপ পেয়েছে।

ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য:

ছন্দে বিপ্লব ঘটেছে অত্যাধুনিক বাংলায় ভাষায়। পদ্যের পাশাপাশি গদ্য ছন্দেরও বৈচিত্র্য এই সময়ের বাংলায় দেখা গেছে। পুরনো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও

গৈরিশ ছন্দের জন্ম হয়েছিল। অত্যাধুনিক বাংলায় দেখা গেল কবিতায় গদ্যছন্দের সূচনা ও বিস্তৃতি। বাংলায় সহজ-সরল গদ্য ছন্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যাবার পর জয় গোস্বামী লিখেছিলেন—

বিরোধিতা করলাম অনেক।
তোমার সুস্পষ্ট বিরোধিতা
আজ, তোমার মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে
মনে হয় ভুল-ই করেছি।...

আগের বাংলা ভাষার মতো এখানকার ভাষায় অনুপ্রাসের ঝনঝনানি, অলংকারের তীব্রতা, গুরুগম্ভীর শব্দ তো নেইই, বরং ছন্দ হয়েছে পুরোপুরি গদ্যভাষার মতো। যেমন শ্রীজাতের কবিতায়—

"হুকের বোতাম খুলেছে মেগাসিটি।"

বিজ্ঞাপনের ভাষা

আধুনিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞাপন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সকালে ঘুম ভেঙ্গে ওঠা রাত শুতে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিশে আছে বিজ্ঞাপন। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে চোখ মেললেই দেখা যায় বিজ্ঞাপনের বিচিত্র ধরন। রাস্তাঘাটে, দোকান বাজারে, বাড়ির ছাদে, দেওয়ালে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে বিজ্ঞাপন নেই। কত বিচিত্র রকমের বিজ্ঞাপন। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন, বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন, চাকরির বিজ্ঞাপন, গোপন রোগের চিকিৎসার বিজ্ঞাপন, বশীকরণ বিজ্ঞাপন আরও কত কি। অফলাইন, অনলাইন, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার সমস্ত কিছুতে বিজ্ঞাপনের দাপট। বিজ্ঞাপন সবকিছুতে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যা না থাকলে বিষয় ভাবনা বিবর্ণ হয়ে পড়ে। ধরা যাক কোনও পত্রিকার প্রসঙ্গ, পাতার পর পাতা উল্টে যদি একটা বিজ্ঞাপনও চোখে না পড়ে পাঠকের মন খারাপ হয়ে যায়। রেডিও বা টিভির কোনও অনুষ্ঠান যদি বিজ্ঞাপন ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অনুষ্ঠান একঘেয়ে হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায় বিজ্ঞাপনের প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ চিরকালই রয়েছে।

বিজ্ঞাপনের স্বরূপ :

বিজ্ঞাপন বলতে আমরা বুঝি বিশেষভাবে জ্ঞাপন। পাঠক, শ্রোতা বা দর্শককে কোনও বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বিশেষভাবে জানানো। আরও বিস্তৃত করে বললে বলা যায় পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের কাছে বিজ্ঞাপিত জিনিসটি পৌঁছে দেওয়া বা তাদের মনে ধরানোর কৌশল। বিজ্ঞাপন দাঁড়িয়ে আছে ভাষার জাদুতে। এর ভাষা পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকদের মোহিত করে। শঙ্খ ঘোষ ‘মুখ ঢুকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কথাটি বললেও মানুষ কেবল মুখ নয় সমস্ত শরীরটা বিজ্ঞাপনে ঢেকে দিতে চায়। বিজ্ঞাপন আসলে

টার্গেট, জনসাধারণের চাহিদাকে পূরণ করার টার্গেট। আর সেই জন্য তাকে সর্বাগ্রে জেনে নিতে হয় তাদের চাহিদা ঠিক কী? সেগুলিকে নির্দিষ্ট করে সেই অনুযায়ী গাঁথতে হয় বিজ্ঞাপনের শরীর। মূলত জৈবিক ও মানসিক এই দুটি ভাবনাকে সামনে রেখেই বিজ্ঞাপনের ভাষাকে সাজানো হয়। ফলে বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠে বিচিত্রধর্মী। কোনওটা নিবেদনমূলক, কোনওটা প্রচারমূলক, কোনওটা আবেদনের, কোনওটা সংশোধনমূলক, কোনওটা আবার তথ্যনির্ভর। তবে সমস্ত বিজ্ঞাপনের ভাষাই নির্ভর করে কোন মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে তার উপরে। অর্থাৎ টিভির পর্দায় নাকি পত্রিকায় কিংবা বেতারে। কোন পণ্যের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে ঠিক কাদের চাহিদা পূরণ করা হবে এই সমস্ত কিছুর উপরই বিজ্ঞাপনের ভাষা নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন তিনটি মাধ্যমে দেওয়া হয় অডিও, অডিও-ভিস্যুয়াল ও প্রিন্ট মিডিয়ায়। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার যোগ লক্ষণীয়। বিজ্ঞাপন এখন বাণিজ্যের পাশাপাশি শিল্পের স্তরে উন্নীত।

পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন:

প্রথমেই আসা যাক পত্র-পত্রিকার কথায়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনের রীতি অনেক দিনের। এই ধরনের বিজ্ঞাপনে নতুন নতুন শব্দ তৈরির পাশাপাশি প্রচলিত শব্দেরও নানান অর্থ করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতারা এখানে নিজস্ব স্টাইলে পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনী ভাষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদহীনতা। সংবাদপত্রে চোখ মেললেই দেখা যায় ক্রিয়াপদহীন বাক্যের প্রাচুর্য। পাত্রীর বিয়ের বিজ্ঞাপন—

“32/5.4’ M.Com, MNC-তে কর্মরতা Slim, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কলিকাতা/ সংলগ্ন নিবাসী প্রগতিশীল বাঙালি অনূর্ধ 40 অধ্যাপক/ ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার কাম্য। বক্স নম্বর : P-307”

উপরের বিজ্ঞাপনটিতে যেমন কোনও ক্রিয়াপদ নেই, তেমনই সেভাবে কোনও বিরতি চিহ্ন নেই। বাংলার মাঝে ইংরেজি শব্দ Slim। মেয়েটি যদি প্রকৃত অর্থে সুন্দরী নাও হয়, তবুও বিজ্ঞাপনটি রাতারাতি তাকে সুন্দরী বানিয়ে দিয়েছে।

যে কোনও কিছুরই মান ও দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে, প্রচার বস্তুর গুণগত মান বর্ধনের অন্যতম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনে, বাসে, ট্রামে, সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়শই চোখে পড়ে ৫ মিনিটে বশীকরণ, কালা জাদু সিদ্ধ জ্যোতিষী অথবা তান্ত্রিকের ছবি। বাস্তবে এসবের সত্যতা আছে কিনা সেসব নিয়ে বিচার বা আলোচনা করার কোনও দরকার পড়ে না। চটকদারি ভাষা প্রিয় মানুষটিকে বশীকরণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে বশীকরণ বিজ্ঞাপন পাঠক বা নিত্য যাত্রীর উপরে কার্যকর হয়। আর এরপরই বিজ্ঞাপনের পাঠক হিতাহিত জ্ঞান হারায় বিজ্ঞাপনের সত্যতা বা বিজ্ঞাপন দাতার কিছুই খোঁজ নেন না। শুধুমাত্র চটকদারি ভাষার আকর্ষণেই ছুটে চলে আগুনের দিকে পতঙ্গের মতো। আরেকটি বিজ্ঞাপনের কথা বলা যাক—

“পুরুষ টাক মহিলা টাক
এক ঘণ্টায় চুলে ভরে যাক”

নীচে মোবাইল নম্বর ও ঠিকানা। পরচুলার এমন বিজ্ঞাপন পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে তো বটেই সেই সঙ্গে টাক ব্যক্তির মাথা ভর্তি চুলের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে

তোলে। আসলে এই ধরনের বিজ্ঞাপনে মানুষের দুর্বলতায় আঘাত দেওয়া হয়। এই ধরনের আরও একটি বিজ্ঞাপন—

"Sex প্রবলেম?
—গ্যারান্টি সহ
দু'সপ্তাহে ২১ বছরের
যুবক হয়ে যান।"

প্রথমের দুটি শব্দই কিন্তু ইংরেজি। প্রথমটি ইংরেজিতে লেখা। দ্বিতীয়টি বাংলায়। ইংরেজি শব্দ দিয়ে বিষয়টাকে সর্বজনীন করার চেষ্টা হয়েছে। এরপরে মাত্র দু'সপ্তাহে যে কোনও বয়স্ক লোককে ২১ বছরের যুবক করার কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চিতরূপে অসম্ভব। তবুও ওই বিজ্ঞাপনের ভাষা বৃদ্ধ লোকের মনেও আশার-সঞ্চার করে। তাদের যৌন উন্মাদনা বাড়িয়ে দেয়। কথার চমক এখানে নান্দনিকতা সৃষ্টি না করলেও বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্যকে সফল করেছে। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন আসলে সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক।

আবার এমন কিছু বিজ্ঞাপন আছে যা পাঠকের চিন্তাশক্তি বাড়ায়। মানুষকে সচেতন করে তোলে। সামাজিকতা, নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যেমন—

ক. আমার মাটি আমার মা,
ময়লা হতে দেবো না।
খ. বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও।

উপরিউক্ত উদাহরণ দুটি বাণিজ্যিকভাবে মূল্যহীন হলেও সমাজে এর মূল্য অপরিসীম। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প ও সমাজে নারী শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করেছে।

বেতারের বিজ্ঞাপন :

বেতারের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনের অনেক পার্থক্য আছে। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন একাধিকবার পড়ে বোঝার উপায় থাকলেও বেতারের বিজ্ঞাপনে সেই অবকাশ একদম নেই। বেতারে পাঠক থাকে না, কেবল শ্রোতা। শ্রোতৃমণ্ডলীকে কানে শুনে বিষয়কে বুঝতে হয়। তাই বেতারের বিজ্ঞাপনকে হতে হয় শ্রুতিমধুর। কথাগুলোকে অনেক সচেতনভাবে সাজাতে হয়। এখানে ছবিও নেই, লেখা নেই, শুধু রয়েছে কণ্ঠস্বর ও স্বরক্ষেপণ।

শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকই পত্র-পত্রিকার পাঠক। অপরদিকে শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর, সাক্ষর সকলেই বেতারের শ্রোতা। বারবার শোনার সুযোগও এখানে কম বলে একবারেই বুঝে নিতে হয় শ্রোতাকে। যে কোনও কাজ করতে করতেই শ্রোতা বেতারের কথকতা শুনতে পারে। বেতারে বিজ্ঞাপনের ভাষা সহজ সরল হলেও কোনও জটিল বিষয়ের বিজ্ঞাপন এখানে দেওয়া যায় না।

বেতারে বিজ্ঞাপন উপস্থাপন চাররকম ভঙ্গিতে হয়ে থাকে—সরাসরি, গানে গানে, অনুপ্রবিষ্টরূপে ও নাটকীয়ভাবে। কথায় সুর দিয়ে বিজ্ঞাপন নতুন কিছু নয়। ধরা যাক বোরোলীনের বিজ্ঞাপন—

"সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম বোরোলীন।"

আপামর জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত এই বিজ্ঞাপন। তথ্যকে ছাপিয়ে সুরই এই বিজ্ঞাপনটিকে নান্দনিক করে তুলেছে। 'সুরভিত' অর্থাৎ ক্রিমটি সুগন্ধময়। এটি কাটা

ছেঁড়ায় ওষুধের কাজ করে তাই অ্যান্টিসেপ্টিক। তারপরে ক্রিমটির নাম ‘বোরোলীন’। ভাষার কারুকার্যে, সুর সংযোজনে বিজ্ঞাপনটি বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এফ.এম প্রচার তরঙ্গকে জনপ্রিয় করার জন্যে একটি বিজ্ঞাপন একসময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটি ছিল 91.9 ফ্রেন্ডস্ এফ এমের বিজ্ঞাপন। সেটির প্রথম দুই লাইন এইরকম— “সকাল আসে তোমার গানের সুরে
একলা দুপুর তোমার কথাই ভাবে...।”

টিভির বিজ্ঞাপন :

একই সঙ্গে দেখা ও শোনার কাজটি করায় টিভি। অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপন খবরাখবর সব ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। এটা ঠিক, যে কোনো বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য হল ক্রেতাকে আকর্ষণ করা। সেই কারণে বিজ্ঞাপন রচয়িতাকে নজর রাখতে হয়, কোনও অর্থ বুঝতে যাতে দর্শকদের অসুবিধা না হয় সেই দিকে। সেজন্য সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হয় সাদামাটা সাবলীল শব্দ। কখনও আবার তৈরি করতে হয় নতুন শব্দকে। তবে যে শব্দের প্রতি ঝোঁক বেশি, যা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তা বিজ্ঞাপনে রাখা হয়। টিভি বিজ্ঞাপনে যেহেতু দর্শন ও শ্রুতি উভয়ে একই সাথে ঘটে তাই বিজ্ঞাপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘সিনেমাটিক কাট’বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থাপক-উপস্থাপিকার পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। কারণ কথ্যভাষার পাশাপাশি চিত্রভাষা, শরীরী ভাষা ইত্যাদিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ টিভি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। অল্প সময়ে অনেক কথা বলে দর্শকের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলাই টিভি বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য। দর্শক যেন কখনওই মনে না করে পণ্যটি তাঁর সাধ্যের বাইরে।

টিভি-র বিজ্ঞাপন দাতারা সবসময়ই চেষ্টা করে শব্দ, ছবি, সাংগীতিক আবহের মাধ্যমে দর্শককে আকর্ষণ করতে। সেখানে ব্যাকরণের নিয়ম মানতে হবে এমন

কোনও কথা নেই। শব্দ সেখানে কীভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে সেটাই শেষ কথা। আর সে কারণেই প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনের বাক্‌বিন্যাসে নতুনত্ব চোখে পড়ে। ক্রিয়াহীন, বিরতিহীন ছোট্ট ছোট্ট বাক্য তৈরি হচ্ছে অবিরত। যা মুখের ভাষাকেও প্রভাবিত করছে। ইংরেজি বাংলার মেলবন্ধন ঘটেছে বিজ্ঞাপনের ভাষাতে। তবে পত্রিকা বা টিভি-র বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শব্দ বা কথাই সবসময় মুখ্য হয়ে ওঠে তা নয়। ছবিও এখানে অনেক কথা বলে। শাড়ির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে শাড়ি পরিহিতা মডেলের ছবি অন্য মাত্রা এনে দেয়। আদি ঢাকেশ্বরী, যশোরেশ্বরী, প্রিয়গোপাল বিষয়ী, আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল—এদের বিজ্ঞাপনগুলি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। শাড়ির বিজ্ঞাপনের কাব্যিকতা যেন মনে উন্মাদনা বয়ে আনে—

> “মোরা সেই দোকানে চলি
> যার নাম ট্রেডার্স এসেম্বলি
> গড়িয়াহাটের মোড়ের শোভা
> ট্রেডার্স এসেম্বলি।”

আরও একটি বিজ্ঞাপনের উদাহরণ এখানে দেওয়া যাক—

> “জীবন মানে জি বাংলা”

চ্যানেলের মূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক বেশি এই বিজ্ঞাপন। এই চ্যানেলের বিচিত্র অনুষ্ঠান ছোট বড় সকলের জীবনকেই প্রাণবন্ত করে তুলেছে। জি-বাংলার জি-কে জীবনের Z-তে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে বিজ্ঞাপনদাতা। বাণিজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে নান্দনিকতার পরশে পাঠক হৃদয়ে স্নিগ্ধ আবেশ তৈরি করে দিয়েছে বিজ্ঞাপনটি।

সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন:

বর্তমানে সোশ্যাল সাইটে বিজ্ঞাপনের বহর প্রচণ্ড পরিমানে বেড়ে গেছে। মানুষ তার ক্রিয়াকর্ম, প্রতিভা বা যে কোনও কিছুকে কখনও লিখে, কখনও ছবি কখনও বা ইমোজির সাহায্যে প্রতিনিয়ত তুলে ধরছে। বিজ্ঞাপন যে একটি শিল্প সেখানেও যে নান্দনিকতা আছে একথা ভুলে গেছে মানুষ। নিজেকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞাপনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে তারা। সোশ্যাল সাইটে বিজ্ঞাপনের অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে আমাকে দেখুন, আমার পোস্টকে লাইক করুন, আমাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিন। সকাল থেকে রাত অবধি এইভাবেই বিজ্ঞাপিত হয়ে চলেছি আমরা। এবারে বিজ্ঞাপনী ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল—

১) বিজ্ঞাপনী ভাষায় চমক সৃষ্টিকারী শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

২) এই ভাষা ব্যাকরণের নিয়মনীতি মেনে চলে না।

৩) শব্দের রকমারিতে এই ভাষা সমৃদ্ধ। বড়ো বড়ো বাক্যার বদলে অনেক সময় একটি ইংরেজি শব্দের সাহায্যে ভাষাকে সমৃদ্ধ করার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।
৪) অল্প কথায় বেশি বলার প্রবণতা এই ভাষায় লক্ষণীয়।

৫) এই ভাষা ক্রিয়াহীন, বিরতিহীন, উপমাহীন, অলংকারহীন। এই ভাষায় গুরুত্ব পেয়েছে বিশেষণ।

৬) বিজ্ঞাপনী ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

৭) বিজ্ঞাপনের হাত ধরেই বাংলা ভাষার একটি দিক ক্রমশই সাংকেতিক হয়ে উঠছে।

৮) বিজ্ঞাপনের ভাষা একদিকে যেমন ইনফরমেটিভ, অন্যদিকে তেমনই কমার্শিয়াল। বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে এই ভাষার যোগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সম্প্রচারের ভাষা

'সম্প্রচার' শব্দটি বেতার বা টিভির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু ইংরেজি 'Broadcast' ও 'Telecast' শব্দদ্বয়ের একটাই বাংলা পারিভাষিক। তা হল সম্প্রচার। সংবাদপত্রে অবশ্য সম্প্রচার শব্দটি বোঝানো হয়েছে ইংরেজি 'Circulation' দিয়ে। পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাদের কাছে কোনও বিষয়কে যথাযথ, সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে সম্প্রচারের সার্থকতা। অবাক হতে হয় এই ভেবে, একই বাংলা তবুও প্রয়োগ বা ব্যবহারে তার কত রূপ। কথ্যে একরকম, লেখ্যে একরকম আবার সম্প্রচারে অন্যরকম। দেখা গেছে মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে তখন সবসময় সুষ্ঠু বা যথাযথভাবে কোনও বিষয়কে উপস্থাপনের প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে পাঠকের কাছে লেখকের একটা দায়বদ্ধতা থাকে। 'Broadcast' বা 'Telecast' -এ যেহেতু বেতার বা টিভির যোগ রয়েছে তাই সরকারি দায়বদ্ধতা তো রয়েইছে। এখন অ**বশ্য** অনেক বেসরকারি এফ.এম. ও টি.ভি. চ্যানেল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের দায়বদ্ধতাকেও অস্বীকার করা যায় না।

এক. সম্প্রচারের স্বরূপ

সম্প্রচারের খবর একসময় শুধুই **দেখ**তাম বা শুনতাম। এখন দেখিও। টিভি চ্যানেলের দৌলতে এখন অবশ্য খবর দেখা যায়, পড়া যায়, শোনাও যায়। খবরের কাগজে লেখকরা যেমন অদৃশ্য থাকে তেমনই পাঠকেরা। অর্থাৎ উভয়ের মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ নেই যোগাযোগ শুধু লেখা পড়ার মাধ্যমে। বেতারেও অবশ্য তাই। রেকর্ডিং প্রোগ্রাম চালানোর ক্ষেত্রে সঞ্চালক-শ্রোতা উভয়েই উভয়ের কাছে অদৃশ্য থাকে। তবে ইদানীং লাইভ প্রথা ফোন-ইন প্রোগ্রামের অনেকটা চল হয়েছে। ফলে সঞ্চালক ও শ্রোতার মধ্যে 'Interact'-টা বেড়েছে। টিভির অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ফোন-ইন ছাড়া সব অনুষ্ঠানেই দর্শক ও সঞ্চালকের কোনও যোগাযোগ হয় না। ফোন-ইন প্রোগ্রামে সরাসরি দর্শক-সঞ্চালক-বিশেষজ্ঞের কথাবার্তা হয়।

দুই. সম্প্রচারে শব্দ নির্বাচন

বেতার, টিভি বা সংবাদপত্র গণমাধ্যম। এই সব মাধ্যম থেকে মানুষ যেমন দেশ বিদেশের খবর নেয়, তেমনই বিনোদনও। গণমাধ্যমে রয়েছে সকলের সমান

অধিকার। অতি আধুনিক, ভদ্রলোকেরা যেমন এই মাধ্যমগুলি থেকে রসদ নিতে পারে তেমনই অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিতরাও। মুটে, মজুর, চাষি, হকার সকলের কথা ভেবে এই সব গণমাধ্যমে শব্দ নির্বাচন করতে হয়। অবশ্যই আটপৌরে পরিচিত শব্দ। অবশ্যই তা যথাযথ ও প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। যে সব শব্দ কষ্টকল্পিত বা স্বল্পব্যবহৃত তার কোনও মূল্য নেই গণমাধ্যমে। আলঙ্কারিক শব্দেরও কোনও দাম নেই। আলঙ্কারিক শব্দ সচরাচর অল্পই তাই প্রত্যক্ষ ভাব বোঝাতে বাধা দেয়। কাব্যিকতা তো একদম নয়। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখতে হয় ওইসব শব্দ যেন কোনও মতেই বাক্য বা বর্ণিত বিষয়কে বাধা না দেয়। যেমন—'আমার মনে হচ্ছে তিনি নিশ্চয়ই আজ দিল্লি যাবেন'। এই ধরনের বাক্য সঞ্চালক বা সাংবাদিক ব্যবহার করতে পারে না। এতে 'মনে হচ্ছে', 'নিশ্চয়ই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে অস্পষ্টতা রয়েছে। বাক্যটি প্রত্যক্ষের বদলে অপ্রত্যক্ষ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ অবশ্য সঞ্চালকের প্রশ্নের উত্তরে এইরকম করে বললেও বলতে পারেন। অস্পষ্ট নির্বস্তুক শব্দের চেয়ে সুনির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহারই গণমাধ্যমে হওয়া উচিত। যেমন—'দোষক্ষালন', 'পাপক্ষালন', 'শুদ্ধ্যশুদ্ধি', 'প্রিয়তমাসু', 'প্রাণভোমরা' ইত্যাদি। তৎসম শব্দ অবশ্যই ব্যবহৃত হবে, যা কি না পরিচিত। যেমন— জল, আকাশ, ফল, প্রদীপ ইত্যাদি। কিন্তু যেগুলো দুর্বোধ্য ও অপরিচিত সেগুলির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। যেমন— বক্ষ্যমাণ, অনুপদীনা, বৃংহণ ইত্যাদি শব্দ। শব্দ বা শব্দের ব্যবহার যেন রুচিহীন হয়ে না পড়ে।

পারিভাষিক বাংলা শব্দের ক্ষেত্রেও এসে যায় পরিচিতির প্রসঙ্গ। সাইকেল, চেয়ার ইত্যাদি শব্দ ইংরেজি। শিক্ষিতরা সাইকেলকে জানে 'সাইকেল' বা 'দ্বিচক্রযান' হিসাবে। আবার চেয়ারকে জানে 'চেয়ার' বা 'কেদারা' নামে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বাংলা পারিভাষিক শব্দের চেয়ে ইংরেজি শব্দ 'সাইকেল' বা 'চেয়ার' শব্দেই বেশি অভ্যস্ত। এখন প্রশ্ন পরিভাষার ক্ষেত্রে কোন রূপটি প্রযোজ্য হবে, উত্তরে বলা যায় সঞ্চালক বা লেখক যেখানে স্বচ্ছন্দ বা যে রূপটি সহজ সেটাই গ্রহণ করবেন। তাই 'ইমপিচমেন্ট', 'সার্টিফিকেট অব ফিটনেস' ইত্যাদির বাংলা পরিভাষা যথাক্রমে 'অভিশংসন', 'ক্ষমতত্বপত্র' চালু হয়নি। কিন্তু অসংখ্য বিদেশি শব্দ

যেমন– থার্মোমিটার, টিকিট, মোবাইল ইত্যাদির উচ্চারণ স্বচ্ছন্দ বলে তা চালুও হয়েছে।

তিন. সম্প্রচারে উচ্চারণ

বেতার বা টিভির ক্ষেত্রে উচ্চারণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সংবাদপত্রে উচ্চারণের চেয়ে বিশুদ্ধ বানানটা জরুরি। আমরা তো জানিই বাংলা ভাষার উচ্চারণ সবসময় বানান অনুযায়ী হয় না। সমস্যাটা দেখা যায় 'অ'—'ও', 'এ'— 'অ্যা', 'ই'—'য়', 'স'—'ষ', 'শ' ইত্যাদির ক্ষেত্রে। যেমন 'অপু' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ 'ওপু', 'বেলা' (সময়) শব্দটি 'ব্যালা', আবার 'বেলা' নাম হলে হবে 'বেলা'। এইরকম বহু নিয়ম তো আছেই। তা ছাড়া সঞ্চালককে খেয়াল রাখতে হয় 'রায়'-এর উচ্চারণ যেন 'রাই' হয়ে না যায়। 'বাস' (পরিবহন) যেন 'বাঁশ' হয়ে না ওঠে। রেফ-এর উচ্চারণেও প্রচণ্ড গণ্ডগোল দেখা যায়। যেমন— 'মাতৃভাষা' বা 'কর্তৃত্ব'। 'র'-ফল্যার ক্ষেত্রেও ভুলের সম্ভাবনা থাকে। যেমন— 'প্রার্থনা' হয়ে যায় 'পার্থনা' 'প্রলয়' থেকে 'পলয়' ইত্যাদি। ঋ-এর উচ্চারণেও নজর থাকা উচিত। যেমন অসাবধানবশত 'আবৃত্তি' রূপান্তরিত হচ্ছে 'আববৃত্তি'-তে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে কখনও অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু আসে কখনও আবার আবশ্যিক চন্দ্রবিন্দু পড়ে না। যেমন— শব্দটি 'কাঁচ' নয় 'কাচ'। আবার শব্দটি 'পাঁচ', 'পাচ' নয়। সঞ্চালক বা সংবাদ পাঠক হঠাৎই সংবাদ পড়তে পড়তে 'ঠ'-এর উচ্চারণ 'ট' করে 'হঠাৎ' বলে উঠলেই কেলেঙ্কারির শেষ থাকে না। আবার কিছু কিছু উচ্চারণ সঠিক কী হবে সেটা জানতেই সঞ্চালক অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যায়। যেমন—'পথনির্দেশ', 'করতল', 'জলচর', 'মতবিরোধ'-এই শব্দগুলির উচ্চারণ হবে যথাক্রমে 'পথোনির্দেশ', 'করোতল', 'জলোচর' ও 'মতোবিরোধ'। কিন্তু যেমন বানান তেমনই উচ্চারণ হবে 'পথবদল', 'মতবদল' ইত্যাদি শব্দের। আবার কিছু শব্দ আছে যেগুলো দু'ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন— 'দূরদর্শন' (দূরোদর্শন), 'বাসভবন' (বাসোভবন), 'বনসৃজন' (বনোসৃজন) ইত্যাদি। 'সুষ্ঠ্‌' শব্দটা 'সুষ্ঠু' উচ্চারণে তেতো হয়ে গেছে। 'স্থগিত' শব্দটি 'স্থগিতো' এবং 'আহবান' শব্দটির উচ্চারণ 'আওভান' হওয়াই যথাযথ।

বেতারে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে উচ্চারণের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বাংলা বানানের ভুলভ্রান্তি ধরার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু টিভি অনুষ্ঠানে বা

সংবাদপত্রের খবরে বাংলা বানানের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত গণ্ডগোল হয় হস্ব-ই, দীর্ঘ-ই, শ-ষ-স, ন-ণ ইত্যাদির মধ্যে বানানে কোনটি বসবে। কিছু দিন আগে টিভির একটি অনুষ্ঠানে 'শ্যামশ্রী' শব্দটির বানান লেখা দেখা গেল 'শ্র্যামশ্রী'। 'শ', 'ষ' বা 'স' ঠিক কোথায় বসবে তা নিয়ে যেন প্রযোজকদের ভাবনার অন্ত নেই। কখনও 'ন'-এর বদলে 'ণ'-এর 'ন' হামেশাই বসছে। 'হস্ব-ই' বা 'দীর্ঘ-ই'-এর প্রয়োগগত ভুল এখন বিশ্বজনীন সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু লেখক বা টিভির প্রযোজকরাই বাংলা বানান লিখনে বিভ্রান্ত নয়, পড়ুয়ারাও বিভ্রান্ত। বাংলা বানানের নিয়মবিধি তিন রকম। যেমন অকাদেমি স্বীকৃত বানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত বানান ও আনন্দবাজার পত্রিকা স্বীকৃত বানানবিধি। যে মানুষ ক্লাসের বই পড়ছে সে-ই যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি দেখছে তখন হকচকিয়ে যাচ্ছে। আবার সে-ই যখন সংবাদপত্রে লেখা বাংলা বানানের উপর চোখ বুলোচ্ছে তখন তো হতবাক্। ওরে বাবা—এ কোন দেশে এলাম। তার উপর তো অজ্ঞতা বা ভুলবশত বানানের লঙ্কাকাণ্ড আছেই। তা ছাড়া অনেক বড় বড় শিক্ষককেও দেখা গেছে ভুল বানানে উৎসাহী হতে। যেমন— এতদ্বারা, আকাঙ্খা, স্বচ্ছল, মনীষ, সার্ব্বজনীন, সখ্যতা, উৎকর্ষতা, সমৃদ্ধশালী ইত্যাদি শব্দ। আসলে সেগুলি হবে— এতদ্দ্বারা, আকাঙ্ক্ষা, সচ্ছল, মণীশ, সর্বজনীন, সখ্য, উৎকর্ষ, সমৃদ্ধিশালী ইত্যাদি। একবার বহুবচনের রূপ দিলে যে আর দ্বিতীয় বারের কোনও প্রয়োজন নেই সেটাও আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। তাই ভুলবশত লিখে ফেলি 'সেইসব মানুষেরা', 'সকল লোকগুলি', 'সব অধ্যায়গুলি' এই সব খণ্ড বাক্য। এই তো কদিন আগে অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী একটি চ্যানেলে জানালেন, 'সেই সব পরিবারগুলো'। প্রশ্ন হল সেইসব দিলে কেন মানুষেরা? 'অধ্যায়গুলি' দিলে কেন 'সব'-এ প্রসঙ্গ? সুতরাং হওয়া উচিত 'সেইসব মানুষ / মানুষেরা', 'সকল লোক / লোকগুলি' অথবা 'সব অধ্যায় / অধ্যায়গুলি'। কিন্তু জয় গোস্বামী তাঁর একটি উপন্যাসের নামকরণ করেছেন 'সেই সব শেয়ালেরা'। লেখা বা বলার সময় আমরা মাঝে মধ্যেই ভুল করি 'ওনার' শব্দে। আসলে ওটা হবে 'ওঁর'। অনেকের মনে হতে পারে বোধহয় ভদ্রলোককে 'ওনার' না বলে সম্মান দেওয়া গেল না। আসলে

তা নয় ‘ওঁর’-টাই মান্য। যদিও সত্যজিৎ তাঁর লেখায় ‘ওনার’ শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

চার. সম্প্রচারের বাক্য

অনেক সময় মিডিয়াতে বিশেষ কোনও ব্যক্তির পরিচয় দেবার ক্ষেত্রে বিশেষণে বিশেষণে ভরিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ধরা যাক এই বাক্যটি। ‘পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় জানালেন’—এইরকম বাক্যের কোনও প্রয়োজন নেই সম্প্রচারের ভাষায়। অবলীলায় বাদ দেওয়া যায় ‘মাননীয়’, ‘মহাশয়’ ইত্যাদি শব্দ। পরিবর্তে বলা হয়— ‘পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানালেন’ অথবা ‘বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানালেন’ বা ‘বুদ্ধদেব জানালেন’। অথবা কোনও স্টেটমেন্টের শেষে যেমন ‘আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে : বুদ্ধ’ অথবা ‘সারদা নিয়ে তৎপরতা সবই কেন্দ্রের চক্রান্ত : মমতা’ এইরকম বলা বা লেখা হয়ে থাকে। কোনও সম্প্রচারে একবার সম্বোধন করলে বারবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী না বলে ‘মমতা বলেছেন’, ‘মমতা জানালেন’—এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়। সম্প্রচারের সময় কারও প্রয়াণে আলঙ্কারিক উপমা প্রয়োগ না করাই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ ‘অমর ধামে যাত্রা করেছেন’ ‘দেহ রেখেছেন’ ‘পরলোকে চলে গেলেন’ ইত্যাদির বদলে ‘প্রয়াত হয়েছেন’ এইটুকু বলা যথার্থ। আসলে অকারণ আলঙ্কারিক প্রয়োগ ভাষার সুরকে অস্পষ্ট করে দেয়। প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষের দিকে নিয়ে যায়।

যে কোনও সম্প্রচারে সঞ্চালক অল্প বলবেন, তাঁর কাজ হবে বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তথ্য বা মতামত বের করা। প্রশ্ন হবে অবশ্যই সরল সোজা তবে তরল নয়। এমন কোনও বাক্য তিনি ব্যবহার করবেন না যা বুঝতেই বিশেষজ্ঞের কালঘাম ছুটে যায়। সঞ্চালক কখনওই নিজেকে জ্ঞানী বা পণ্ডিত ভেবে নিয়ে বিশেষজ্ঞের উপর কর্তৃত্ব ফলাবেন না। এতে দর্শক বা শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে Knob ঘুরিয়ে বেতার বা টিভির স্টেশন চেঞ্জ করে দিতে পারে। আলোচনা যত ক্যাজুয়াল হবে ততই কিন্তু দর্শক বা শ্রোতা আনন্দ পাবে। সংবাদপত্রের সম্প্রচার পাঠকদের একাধিক বার পড়ার সুযোগ থাকলেও কিন্তু বেতার বা টিভিতে সেই সুযোগ নেই। সেখানে দেখা বা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পরের ছবি বা বিষয় চলে আসে। আলোচনা বা টক শো যদি প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে দর্শক বা শ্রোতার কাছে তা

হবে চরম বিরক্তির। মনে হবে সাজানো। ফলে সঞ্চালকের গ্রহণযোগ্যতাও হ্রাস পাবে। সুতরাং সঞ্চালক প্রথম থেকেই বিষয়টা ক্যাজুয়াল নেবেন। সেই মতো আসরটা সাজাবেন। উত্তরের ধরন বা অভিমুখকে সামনে রেখেই সঞ্চালক আলোচনায় যোগ দেবেন। এবং অতি সন্তর্পণে তাঁর **কাঙ্ক্ষিত** উদ্দেশ্যটা সফল করবেন। এতে দর্শক, শ্রোতা, সঞ্চালক, বিশেষজ্ঞের ভালো তো লাগবেই, সর্বোপরি অনুষ্ঠানটাও ভালো হবে।

পাঁচ. সম্প্রচারের ব্যাকরণ

সম্প্রচারের ভাষায় নাটকীয়তার কোনও স্থান নেই। স্থান নেই অতিকথনেরও। অর্থাৎ খুশির সংবাদে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বা দুঃখের সংবাদে ভার গলায় বলারও প্রয়োজন নেই। সম্প্রচারের লক্ষ্য দর্শক তথা শ্রোতাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা। মতামত জানানো নয়। তার জন্যে বিশেষজ্ঞরা আছেন। সম্প্রচারে বড়দের বলা হয়ে থাকে দাদা বা দিদি। অথবা অমুকবাবু আপনি বলুন? আর ‘আপনি’, ‘তুমি’, ‘তুই’-এর ক্ষেত্রে ‘আপনি’-ই সুপ্রযুক্ত। অনেক সময় সম্বোধন না করেও বালা হয়, ‘**রোহিত**, আসন্ন ইংল্যান্ড সফর নিয়ে আপনি কী বলবেন?’ এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয় ‘**রোহিত**দা’ বা **রোহিত**বাবু তাহলে ছন্দপতন মাত্রাছাড়া হয়ে পড়ে। তবে ছোটদের ক্ষেত্রে তো বটেই, অনেক সময় বড়দের ক্ষেত্রেও তুমি সম্বোধন সম্প্রচারের ভাষায় এসে পড়ে। সেটা আসলে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সঞ্চালকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তবে কখনওই ‘তুই’ না। কিন্তু একসময় ঋতুপর্ণ ঘোষ টক শোতে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ‘তুই’ সম্বোধনের সূচনা করেছিলেন। সেটি বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। বলা যায় বাংলা ভাষায় নতুন ট্রেন্ড এসেছিল সম্প্রচারের জগতে। যদিও ঋতুপর্ণের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সেই ‘তুই’ ট্রেন্ডের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানের বাংলা সিনেমায় প্রেমিক-প্রেমিকার কথাবার্তা, গানের কলিতে ‘তুই’-এর ব্যাপারটা জাঁকিয়ে বসেছে।

ঘটমান বর্তমান খবর সম্প্রচারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে টিভি চ্যানেলগুলি। বেতারের ক্ষেত্রে কিছুটা সম্ভব হলেও সংবাদপত্রে তার কোনও অবকাশ নেই। টিভির ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যায়। ঘটনার সাক্ষি হয়ে থাকার ফলে সেই খবর বা মতামতের উপর কোনও সন্দেহ বা

প্রশ্নচিহ্ন থাকে না। সে ক্ষেত্রে কিন্তু সঞ্চালকের ভাষা হবে বিশুদ্ধ, ঋজু ও স্বচ্ছ। অকারণ বাহুল্য, অস্বচ্ছতা, লঘুতা এড়িয়ে চলেই সরাসরি সম্প্রচারকে নিয়ন্ত্রণ করবেন কর্তৃপক্ষ। বড়ো বড়ো সমাসবদ্ধ পদের বদলে ছোটো ছোটো শব্দের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে মূল অনুষ্ঠানকে মান্যতা দেবে।

অনেক সময় টিভি বা বেতারে সঞ্চালকরা বিশেষজ্ঞদের বলে থাকেন, 'আপনাদের কাছে আমাদের আরও অনেক কিছু জানার ছিল কিন্তু সময়াভাবে তা জানা সম্ভব হল না' এই গোছের বাক্য। বিরক্তিকর এই কথাগুলি একাধিকবার বলে সঞ্চালক যে মূল অনুষ্ঠানের কতটা সময় নষ্ট করে দেন, তা ধারণার অতীত। মোটেই এগুলি সম্প্রচারের ভাষা নয়।

সম্প্রচারের ভাষার ক্ষেত্রে জরুরি যেটা, সেটা হল নির্দিষ্ট ভাষার সাংস্কৃতিক ব্যাকরণ জানা। তবেই সম্প্রচারে কথার পুনরাবৃত্তি হবে না। শব্দ নির্বাচন, বানান, উচ্চারণ, মিতভাষণ সবই তবে সম্প্রচারে চলে আসবে। অনুষ্ঠান হবে যথাযথ, প্রত্যক্ষ, আন্তরিক। এগুলির রসায়ন যথাযথ বা সুষ্ঠু করতে না পারলে ভাষার প্রয়োগ বা ব্যবহা**রে** অস্পষ্ট থেকে যাবে। তখন গলার স্বর, সঞ্চালকের রূপলাবণ্য, সেটের ঝলকানি, ক্যামেরার নিপুণতা কিছুতেই কিছু হবে না।

পরনিন্দা-পরচর্চার ভাষা

অন্যজনকে নিন্দা করার ভাষা। অপরজনকে নিয়ে চর্চা করার ভাষা। অর্থাৎ পরকে নিন্দা ও চর্চার মধ্যেই নিহিত পরনিন্দা-পরচর্চার ভাষা। প্রথমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা ঘটনাকেন্দ্রিক কথার স্রোতে, মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসবে শব্দের ফোয়ারা। গসিপ ভাঙার শেষে কান পাতলে শোনা যাবে— 'ছাড় তো, আমাদের আর কী! সময় এলে ঠিক টের পাবে।'

এক.

একথা তো বহুল প্রচলিত, ঘটনার চেয়ে রটনার গতিবেগ বহু গুণ বেশি। আর ভাতঘুমের মতোই বাঙালিজীবন পি-এন-পি-সি-তে ভরা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।' তবে এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয় যে, পরনিন্দা-পরচর্চার বিষয়টিকে মেয়েদের একচেটিয়া বিচরণের ক্ষেত্র হিসেবে দাগিয়ে দেবার একটা প্রবণতা হামেশাই লক্ষ করা যায়। যা আদপে সমাজের একচোখামি। পরনিন্দা-পরচর্চা আসলে অফিসে-পাড়ায়-রাস্তায়-আড্ডায়-চায়ের ঠেকে বিনামূল্যে বিনোদন জোগায়। সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক মজাদার বিষয়। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে শতকরা নব্বই ভাগ মানুষই পরনিন্দা করে। তারা প্রত্যেকেই বলে থাকে, 'পি-এন-পি-সি করা বাবা আমার ধাতে নেই! অত সময় কোথায়?'

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসে, লোকে পরচর্চা করে কেন? পরনিন্দা-পরচর্চা করে তারা পায় কী? আসলে এর উত্তর কখনওই একটা বাক্যে দেওয়া সম্ভব নয়। পরচর্চার গভীরে লুকিয়ে থেকে একের অধিক কারণ।

প্রথমত, এক ধরনের ঈর্ষাজনিত মনস্তত্ত্ব এই মানসিকতার পেছনে দায়ী। আমার যা হয়নি, আমি যা পাইনি, তা যখন আমারই পাশের মানুষটির কাছে আছে

দেখতে পাই অথবা তার নিজস্ব অর্জনে তার সন্ধান পাই; তখন আমাদের মধ্যে এক চোরাগোপ্তা হিংসে বা ঈর্ষা কাজ করে। তখনই অপর পক্ষকে চেঁচিয়ে শোনাতে ইচ্ছে করে 'আমরা ভাল লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারী বিশ্রী।'

দ্বিতীয়ত, অন্যদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা মহান মনে করা। অন্যরা সবাই পিছিয়ে, আমি একাই বিরাট কিছু বা কেউকেটা। এই বাড়াবাড়ি রকমের আত্মপ্রীতি থেকে পরচর্চা করার মনের জন্ম।

তৃতীয়ত, নিছক সময় কাটাতে অনেকেই পি-এন-পি-সি-তে ডুব দিয়ে থাকে। কার স্কার্টের ঝুল কতখানি, কে লো-ওয়েস্ট জিন্স পরল, কার স্কিন ক'পরত মেক-আপে ঢেকেছে— এইসব অকারণ হিসেবে সামনে কফির কাপ আর মুচমুচে স্ন্যাক্স সহযোগে কত যে বিকেল-সন্ধে গড়িয়ে যায়, তার থৈ মেলে না।

চতুর্থত, অনেক সময়েই অন্যের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে তার কথার সুরে হ্যাঁ-তে হ্যাঁ-মেলানোয় পরনিন্দার ঝোঁক জাঁকিয়ে বসে। আসলে আমরা পছন্দ করি না আত্মসমালোচনা, নিজেদের দোষ-ত্রুটি শুধরে নেওয়ার অবকাশ মেলে না আমাদের। কিন্তু ড্রয়িংরুমের ঠান্ডা হাওয়ায় মখমলের কার্পেটে পা রেখে অন্যের জীবন নিয়ে আলটপকা মন্তব্য ছুঁড়তে আমরা সদা প্রস্তুত থাকি, অন্যের পায়ের জুতোর পেরেক তো আর আমাদের পা' দুটোকে রক্তাক্ত করছে না!

পঞ্চমত, অপরের জীবন সম্পর্কে অকারণ কৌতূহল। আমরা চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তার চেয়ে অন্যের হাঁড়ির খবরে নাক গলানোর স্বভাবটুকু চলে যায়নি এই অতি আধুনিক স্মার্টফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও। অন্যের প্রতি সহমর্মী না হয়ে বরং ছলে-বলে-কৌশলে তাকে আঘাত করার হীন মানসিকতা থেকে আজও আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। ফলস্বরূপ অফিসের সহকর্মীর প্রমোশন লেটার দেখে আমরা তার উপস্থিতিতে দেঁতো হাসি হেসে ভ্রূ কুঁচকে,

আড়চোখে চেয়ে, ইশারায় কথা বলি আর তার অনুপস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে পি-এন-পি-সি-তে মেতে উঠি।

ষষ্ঠত, মনে পুষে রাখা রাগ-ঝাল মেটাতে পরনিন্দা-চর্চার জুড়ি মেলা ভার। শাশুড়ি-বৌমা, অফিসের বস-কর্মচারী, মালিক-ভাড়াটে এই ধরনের নির্দিষ্ট কিছু জুটিদের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে মনে করতেই পারি। নিজ নিজ গোষ্ঠীতে একের বিরুদ্ধে অন্যের ধারালো বাক্যবাণের দিকে একটু কর্ণপাত করলেই আমরা বুঝে নিতে পারি পরনিন্দার ভাষার আদল। যেমন— অফিসে কারও প্রমোশন হলে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়: 'অমন সারাক্ষণ বসের সঙ্গে লেগে থাকলে প্রমোশন তো হবেই। আমি বাবা অত অয়েলিং পারি না!'

কারও বাচ্চা স্কুলের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে শোনা যায়: 'আমার ছেলে তো আর ক্লাস টিচারের কাছে পড়ে না। সর্বাণীর ছেলে কি আর এমনিই ফার্স্ট হয়েছে? ওদের কোচিং-এ তো সব কোশ্চেন পরীক্ষার আগেই বলে দিয়েছে।'

দুটি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েও চলে অযৌক্তিক কাটাছেঁড়া আর নিন্দেমন্দ-র অশ্লীল ফোয়ারা— 'ওই তো রূপের ছিরি! বাবার একমাত্র মেয়ে কি না! বাপ মরলে সব তো মেয়েই পাবে। টাকা দিয়েই অমন কার্তিকের মতো সুন্দর ছেলেটাকে বশ করেছে।'

আবার গেট-টুগেদার, উৎসব-অনুষ্ঠানেও সমানতালে চলে পরচর্চার বাঁধনহারা কানাকানি। অনেক সময়েই দেখা যায় মেয়ের বাবা সাধ্যের বাইরে গিয়েও খুব জাঁকজমক করেই মেয়ের বিয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে। কিন্তু নিন্দুকের দল তো সর্বত্র বিরাজমান। এরা মাংস-ভাত খেয়ে বেনারসি মিষ্টি পানটি মুখে পুরতে না পুরতেই শুরু করে দেন মাংস রন্ধনের হাল-হকিকত প্রসঙ্গ অথবা মেয়ের গায়ের গয়না যেন পালকের মতন হালকা। আবার কখনও-বা পাত্র-পাত্রীর রূপ-গুণের

তুল্যমূল্য বিচারে ভরিয়ে তোলে বিবাহবাসর— ‘মেক-আপে আর বুঝবে কী? মেয়ের গায়ের রং কিন্তু বেশ চাপা, বুঝলে কি না।’

ইসলামিক ধর্ম মতে এই পরচর্চা-পরনিন্দা বা ‘গীবত’-কে পাপ হিসেবে মনে করা হয়। ‘গীবত’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল দোষারোপ করা, পরচর্চা বা পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা। অথবা কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কটু মন্তব্য করাকেই মূলত ‘গীবত’ বলা হয়। পরচর্চা যে করে আর পরচর্চাকারীর থেকে যে মন্তব্যগুলো শোনে এবং উপভোগ করে, উভয়ই সমান পাপী। আসলে মানব প্রবৃত্তির একটি বৈশিষ্ট্যই হল ‘গীবত’ করার দিকে ছুটে যাওয়া ঠিক যেমন আগুনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রথমত, আত্মসমালোচনা অপেক্ষা অন্যের দোষ আলোচনা অনেক বেশি উপাদেয় এবং ‘টাইমপাস’-এর উপযোগী বিষয়। দ্বিতীয়ত, নিজেকে ভাল এবং শ্রেষ্ঠতম প্রতিপন্ন করার সহজ উপায় ‘গীবত’। এর মাধ্যমে অন্যদের কাছে নিজস্ব গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং অপরকে হীন প্রমাণ করে, দোষের ভাগীদার করে নিজের মহত্ত্ব জাহির করা যায়।

যুগে যুগে মনীষীরা সকলে মিলেমিশে আনন্দ করে জীবনকে উপভোগ করার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। মা সারদার বাণী— ‘পরনিন্দা, পরচর্চা কখনো করবি নে। উহাতে নিজেরই ক্ষতি হয়। যদি শান্তি চাও, পরের দোষ দেখ না, দোষ দেখ নিজের।’ কিন্তু আম-পাবলিক ভালবাসে সন্ধ্যাবেলায় চানাচুর-মুড়ির সঙ্গে মুচমুচে গসিপ। পাঁচজনেতে জটলা করে কোনো গঠনমূলক আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্তি নেই। বরং অপরকে হেয় করার লক্ষ্যে পরনিন্দার আসর বসাতে আমাদের আগ্রহ অন্তহীন।

আসলে পরনিন্দা-পরচর্চার মতো বিনামূল্যে বিনোদনের আয়োজন আর কীসে আছে? মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে সিনেমা দেখা হোক বা মাঠে গিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ দেখা অথবা থিয়েটারে গিয়ে নাটক দেখা—সবেতেই তো ‘ফেলো কড়ি, মাখো

তেল।' কিন্তু ঘরোয়া আড্ডায়, অফিসের নিভৃত কোণে অথবা এককালীন রিচার্জের ভিত্তিতে অনন্ত সময়ব্যাপী চ্যাটিং-মেসেজিং-এর স্রোতে পরনিন্দা-পরচর্চার পালে হাওয়া লাগানোর মতো বিনে পয়সার বিনোদন আর ক'টা মেলে?

তবে একথা মানতে হবে, পরনিন্দা-পরচর্চা করতেও চাই বিশেষ ধরনের দক্ষতা। পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেম সম্পাদনে কুট্টিনী বড়াই-এর ভূমিকা অথবা কৈকেয়ীর কানে বিষ ঢালতে কুঁজি মন্থরার দূতীগিরি। পরনিন্দা আর পরচর্চার সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। নিউজ পেপারের পেজ থ্রি, গসিপ ম্যাগাজিনের পাশাপাশি নেটপাড়া জুড়ে চলে গাল-গল্পের ফোয়ারা। আসলে জার্নালিস্ট জানেন এই ধরনের খবরের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। লাইক-কমেন্ট-শেয়ারের ঢল নামে এইসব পোস্টে। স্বাভাবিক নিয়মে যত বেশি পরচর্চার ফোয়ারা, তত বেশি মানুষের আনাগোনা, ততই চড়চড়িয়ে ওঠে 'ভিউ'-এর পারদ।

দুই.

পি-এন-পি-সি-র চর্চা কেবল যে মুখের ভাষার ওপর একশো শতাংশ নির্ভরশীল এমন নয়। এর সঙ্গে চাই যথোপযুক্ত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। বাঁকা হাসি, চোরাগোপ্তা দৃষ্টি, তীর্যক মুখভঙ্গি, ঢেউখেলানো ভ্রূ-যুগলের সমভিব্যাহারে পি-এন-পি-সি-র আসর হয়ে ওঠে আরও বেশি জমজমাট।

এই ভার্চুয়াল দুনিয়ায় পরনিন্দা পরচর্চার অভিমুখও স্বভাবতই ভার্চুয়ালগামী। এর আগে যেমন আমরা খবরের কাগজের পাতায় বা ভোটের আগে পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে বা বাড়ির দেওয়ালে ভোট বিষয়ক রঙ্গব্যঙ্গ, বাজেট-বিভ্রাট, মুদ্রাস্ফীতি, রাজনীতির লড়াই ইত্যাদি নিয়ে কার্টুনচর্চা চলত; এখন এসব নিয়েই নেটপাড়া সরগরম। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটনাগরিকদের দেওয়াল ভরে উঠছে হরেক কিসিমের 'মিম'-এর সরস চর্চায়। আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার দাপাদাপিতে মানুষ

দিন দিন নার্সিসিজমে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। একুশ শতকের এ এক নতুন ব্যাধি। সেলফি-ভরা জীবনে সেল্‌ফ-কে চেনার বা জানার অবকাশ আমাদের আর নেই। সেলফিরও আবার হরেক রকম-সকম। কখনও পাউট, কখনও-বা ক্যান্ডিড। সহজেই এই সেলফি-তুলিয়েরা হয়ে ওঠে মিম-প্রণেতাদের বাক্যবাণের শিকার। 'রোস্ট ভিডিও' বানানোর মাধ্যমে কখনো আবার নিন্দেমন্দ করার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় শালীনতার অন্তিম সীমাটুকুও।

একুশ শতকের আন্তর্জালকেন্দ্রিক যুগে মানুষ ছুটে চলেছে ক্রমাগত, তার দু'দণ্ড সামনে বসে গল্প করার ফুরসত কোথায়! হাতে আছে স্মার্টফোন, চোখ আটকেছে ফোন স্ক্রিনের ব্রাইটনেসে। ফেসবুক-হোয়্যাটসঅ্যাপে মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে প্রোফাইল পিকচার, কভার স্টোরি। সামনাসামনি বসে কথা না-বললেও পোস্টের তলায় জমছে 'লাইক', 'লাভ', 'ওয়াও' রিয়্যাকশন আর কমেন্ট সেকশনে বইছে প্রশস্তির বন্যা। পরক্ষণে হাত থেকে ফোন নামিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্তব্য : 'ওয়াও না কচু! নিয়ন গ্রিনে শাঁখচুন্নি লাগছে জাস্ট। তবু ওর ছবিতে লাভ না দিলে আমার ছবিতে যদি না দেয়!' নিখাদ ভালবাসা আর প্রশংসার দিন ভুলে যাও বস! এখন কেবলই চলছে দেয়া-নেয়ার খেলা।

অন্যের প্রতি তীব্র আক্রমণ না শানিয়ে আমরা এক মুহূর্ত চলতে পারছি না আর। এই যান্ত্রিকতার জটিলতা আমাদের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে মারাত্মক বিষ। তাই টিভি খুললে বিজ্ঞাপনেও দেখা যাচ্ছে নিজেদের ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টকে সেরার সেরা প্রমাণ করতে অন্যকে ঠেসে দাও দেওয়ালে। 'শুধু এই সাবানেই পাবেন পঁচিশটি জড়িবুটি দিয়ে তৈরি আয়ুর্বেদিক গুণসম্পন্ন কার্যকারিতা আর বাকি সব ক্ষারযুক্ত সাবান ত্বককে করবে রুক্ষ আর শুষ্ক' অথবা 'অমুক হ্যান্ডওয়াশ মারে ৯৯.৯৯% জীবাণু আর বাকি সব সাবান স্লো'। প্রশ্ন ওঠে, নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চাবিকাঠি তাহলে অন্যকে হেয় করায়?

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে গসিপের মাধ্যমে রাগ, আক্রোশ, মানসিক চাপ থেকে পাওয়া যায় সাময়িক মুক্তি। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, গসিপ করলে নাকি শরীর থাকবে চাঙ্গা, মন থাকবে ভারমুক্ত, হালকা। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গসিপ ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ তা অন্য কাউকে সিরিয়াসলি ক্ষতি করছে না। গসিপের সময় এমন কোনও শব্দপ্রয়োগ উচিত নয় যা অপর মানুষটির মনের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের আঘাত করে। কাজেই পরচর্চা চলুক, সঙ্গে চলুক আত্মসমালোচনাও।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১) ভাষার ইতিবৃত্ত (পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৬) : সুকুমার সেন

২) সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৬) : ড. রামেশ্বর শ্ব

৩) প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (প্রথম খণ্ড ২০০৯) : সুখেন বিশ্বাস

৪) প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড ২০১০) : সুখেন বিশ্বাস

৫) ভাষা : প্রয়োগে ব্যবহারে (২০১৫) : সুখেন বিশ্বাস সম্পাদিত

৬) বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে (২০১৮) : শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত

৭) বহুরূপে ভাষা (তৃতীয় খণ্ড ২০১৬) : শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

নাটক ও নাট্যমঞ্চ

একক ১০

মুক্তধারা

বিন্যাসক্রম

৫.৪.১০.১ : রচনাকাল

৫.৪.১০.২ : পেক্ষাপট

৫.৪.১০.৩ : নাট্যবস্তু

৫.৪.১০.৪ : জনচরিত্র

৫.৪.১০.৫ : রূপক-সাংকেতিক নাটক

৫.৪.১০.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.৪.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.১০.১ : রচনাকাল

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি পৌষসংক্রান্তির দিন মুক্তধারা রচনা শেষ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক সপ্তাহ ধরে নাটকটি লেখেন এবং শেষ করার পরদিনই আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান; একবার নয়, দু'বার। এরপর প্রকাশিত হয় মুক্তধারা।

৫.৪.১০.২ : প্রেক্ষাপট

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মে থেকে ১৯২১ এর ১৬ জুলাই প্রায় চৌদ্দ মাস যাবৎ রবীন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিশ্বের নানা প্রান্তে — ইংল্যাণ্ডে, প্যারিসে, নেদারল্যাণ্ডসে, বেলজিয়ামে, আমেরিকায়। এর আগে তিনি দেখে এসেছেন জাপান। এই পর্বে তিনি বিশেষভাবে চিন্তান্বিত নিজের দেশের অসহযোগ নিয়ে, চিন্তামগ্ন বিশ্বভারতী বিষয়ে।

১৯২১ এর ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য যান শিলাইদহতে এবং সেখানে দিন সাতেক থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ লেখেন মুক্তধারা; জানান রাণু অধিকারীকে, 'আমি ছোট

একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করেছি'। স্বদেশে এই নাটকটি সমাদৃত হবে কিনা, এ বিষয়ে কুণ্ঠা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, ডাকঘর নাটকে 'চিরকাল এর যে বেদনাটি আছে দেশে তা কারোর কানে পৌঁছায়নি, কিন্তু বিদেশের সর্বত্র তার সমাদর হয়েছে। এই পথ-মুক্তি নাটকটাও সেখানে সকলে গ্রহণ করবে।'

আসলে যন্ত্রসভ্যতাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ, যন্ত্র এবং মানবতার মধ্যে যে সংঘাত লক্ষ্য করেছিলেন তিনি, যে যন্ত্রের নিষ্ঠুর পেষণে মানুষ দানবতা-আক্রান্ত, তার বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মুক্তধারা, রক্তকরবী। এ-কথা ঠিকই, মুক্তধারার ভারকেন্দ্র এই একটি বিষয় নয়, এটিকে কাহিনিসূত্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাকে ছড়িয়ে ফেলেছেন নানা দিকে; তবুও এই যন্ত্র অর্থাৎ বাঁধ নির্মাণ এবং বাঁধ-ভাঙা — এই ঘটনার ওপরেই তো মূল গল্পের কাঠামো নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জোনিয়েছেন 'machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।' এরপরে রবীন্দ্রনাথ ওই চিঠিতে যন্ত্রের প্রতীকী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

বিদেশ পরিভ্রমণপর্বে যন্ত্রের এই গ্রাস পীড়িত করেছিল তাঁকে। এ-কথাও ভাবা যেতে পারে যে এই সময়ে তিনি দেখেছিলেন বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মাণ করে কীভাবে সহজ জলস্রোত রোধ করা হচ্ছিল। প্রকৃতির সহজ চলার ছন্দপতন ঘটছিল। হয়তো বা তাঁর সহজাত দার্শনিক এবং কাব্যময় চেতনায় এই বাঁধই প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ইংল্যাণ্ডে ও ইটালিতে, অনেক বড়ো বাঁধ তৈরি হয়েছিল। ১৯০০ সাল নাগাদ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডে তৈরি হয় প্রায় ২০০টি বাঁধ। ১৯১১ সালে আমেরিকায় অস্টিন নামে এক পার্বত্য শহরে বাঁধ ভেঙে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সেই বাঁধে ছিল ফাটল, তার ফলেই সেই বিপর্যয় হতে পেরেছিল। এ-ঘটনার সঙ্গে 'মুক্তধারা'র কাহিনীর দূর-সম্পর্ক কল্পনা বোধহয় খুব অযৌক্তিক হবে না।

৫.৪.১০.৩ : নাট্যবস্তু

পার্বত্য প্রদশ উত্তরকূটের রাজা রণজিতের সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছরের চেষ্টায় বাঁধ নির্মাণ করে, মুক্তধারার ঝরণাকে বেঁধে, এনেছেন আপন আয়ত্তে। বিদ্রোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে সেই রাজ্যের জল সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। নাটকের পট-উন্মোচন সেই অভ্রভেদী অসুরোপম দানবরূপী বাঁধের লৌহযন্ত্র দিয়ে। মন্দিরের প্রতিস্পর্ধী এই যন্ত্র। ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীরা যন্ত্রের কাছে নতজানু।

প্রকৃতির অকৃপণ উজাড় করা দান হঠাৎ রুদ্ধ হয়েছে এই বাঁধ নির্মাণে। মানবশক্তি গ্রাস করেছে মানবকল্যাণ। নাগরিক—পথিকের কথোপকথনে যন্ত্রের স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হয়—'মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা'। বিধ্বস্ত অম্বা, সে ছেলে সুমুনের খোঁজে। মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে গিয়েছিল তার ছেলে সুমন, আর সে ফেরেনি।

এদিকে উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎকে নিয়ে রাজা বিভ্রান্ত। সে রাজার নিজের পুত্র নয়, মুক্তধারা ঝরণাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল তাকে। তার কথায় পাই বাঁধনছেঁড়া সুর—'আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।'

একসময় অভিজিৎ সংঘাত-বিরোধ-আপোষের প্রেক্ষিতে 'বন্দী' হয়ে রাজার বন্দিশালায়। মোহনগড়ের রাজ খুড়ো মহারাজ বিশ্বজিতের কৌশলে অভিজিৎ মক্তি পান। এমন সময় কুমার সঞ্জয় সংবাদ আনে—'অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন। মুক্ত ধারার স্রোতে তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।" এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৫.৪.১০.৪ : জনচরিত্র

পথের ওপর নাটকটি জমাট বাঁধতে থাকে। উত্তরকূট ও শিবতরাই এর সাধারণ মানুষের বাক্‌বিতণ্ডায় নাটক জমে ওঠে। পথিক এবং নাগরিকের সংলাপে গল্প শুরু হয়। উত্তরকূটের নাগরিকেরা পুজোর সমারোহে মুখর। অন্যপক্ষে শিবতরাই-এর প্রজাদের মনে ক্রমশ বিরোধ ঘনায়। উত্তরকূট ও শিবতরাই-এর সংঘাত স্পষ্ট হয় এদের হাসিঠাট্টায়। শিবতরাই প্রশ্ন করে, 'পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?' উত্তরকূট উত্তর দেয়, 'দেবতাক ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।' গণেশ বিভূতির দেবত্বকে ব্যঙ্গ করে, শিবতরাই বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, উত্তরকূট ওদের মরণ কামনা করে।

➢ অম্বা ও বটুক (বটু)

জনচরিত্রের মধ্যে বিশেষ জনাই গাঁয়ের অম্বা, বটুক বুড়ো যার গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উসকোখুসকো। অম্বা তার সন্তান সুমনকে হারিয়েছে, বটুক হারিয়েছে তার দুই 'জোয়ান' নাতিকে। সহজ সরল অম্বা নিজের উপলব্ধিতে কিছু সহজ কথা বলে; বটুক বুড়ো অনেক বেশি সচেতন। সকলকে সে সাবধান করে বলে, 'সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে।' উত্তরের ভৈরবের মন্দির তৃষ্ণাদানবীর দখলে —এ-কথা চিৎকার করে বটুক জানিয়ে দেয় সকলকে। তার নাতিদের কেন বলি দেওয়া হয়েছে — সেটাও তার কাছে স্পষ্ট — 'প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন?" অর্থাৎ মৃত্যু যদি জীবনের ইঙ্গিত না হয়, তাহলে তো পৃথিবী ক্রমশ শূন্যতার দিকে এগিয়ে যাবে। এজন্যই বটুকের জোয়ান নাতির মৃত্যু ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক। বটুক যেন অনেকটা 'বিবেক'।

➢ ছাত্র এবং গুরুমশায়

উত্তরকূটের গুরুমশায় রাজভক্ত; কখনও অমান্য করেন না রাজা রণজিৎকে। জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে, চেতনে-অচেতনে গুরুমশায় রাজার 'দাস'। ছাত্ররা গুরুর প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছায়া। গুরুর অসমাপ্ত কথা ছাত্ররা সম্পূর্ণ করে। গুরুমশায়ের 'দাসত্ব', প্রশ্নহীন রাজ-আনুগত্য এবং যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রকট করে এই কথোপকথন। গুরু চান, 'উত্তরকূটের গৌরবে' ছাত্ররা যেন 'শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে'। তাই তিনি যন্ত্ররাজ বিভূতির শিরোপা পাওয়ার অনুষ্ঠানে ছত্রদের নিয়ে চলেছেন।

অল্প সময়ের জন্য গুরু-ছাত্রদের প্রবেশ, কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ছাত্ররা উত্তরকূটের ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং তাদের যথার্থ নাগরিক তৈরি করার দায়দায়িত্ব গুরুমশাইয়ের। সেই গুরু এবং ছাত্রদের দল যখন অন্ধ অনুকরণে চোখবাঁধা হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে এগিয় চলে, যখন তারা প্রশ্নহীন হয়ে যায়।

➢ **ধনঞ্জয় বৈরাগী**

মুক্তধারা নাটকে শিবতরাই এর প্রজাদের পুরোধা হলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’ গান গাইতে গাইতে বৈরাগী প্রবেশ করেন মঞ্চে। ধনঞ্জয় বৈরাগী রবীন্দ্রনাথের অহিংসনীতির প্রতীক। কবি বহুদিন ধরেই চাইছিলেন যে ভারতের যিনি নায়ক হবেন, তিনি হবেন সর্বত্যাগী, ফকির। সেই আদর্শায়িত নেতার মূর্তি হল ধনঞ্জয় বৈরাগী।

করবন্ধ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজশক্তির অন্যায়ের বিরোধিতা ও তার জন্য কষ্ট বরণের যে চিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রে ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে গন্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাদৃশ্য খোঁজা অস্বাভাবিক নয়।

➢ **অভিজিৎ ও অন্যান্য**

অভিজিৎ রাজার পালিত পুত্র। রাজচক্রবর্তী লক্ষণ দেখে মুক্তধারার ঝরণাতলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তার রাজবিরোধী কার্যকলাপে রাজা যারপরনাই অনুশোচনাগ্রস্ত। নিজের আত্মাহুতি দিয়ে রাজদন্তের প্রতীক ‘মুক্তধার বাঁধ’ ভেঙে সে শিবতরাইকে রাজ ‘দন্ত’ থেকে মুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।’ অভিজিৎ হল লেখকের ভাষায় ‘মানুষ’।

রণজিৎ বিরক্ত মোহনগড়ের রাজা খুড়ো বিশ্বজিতের উপর। কারণ ‘অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য।’ বিশ্বজিৎ যেন শুভ্রতার প্রতীক — শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ তাঁর। রাজাকে ভৎর্সনা করেন খুড়ো, বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করেন। উত্তরভৈরবের পুজো গ্রহণ করবেন না দেবতা এমন কথা বলেন বিশ্বজিৎ। অভিজিতের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন — ‘ভাবীকালের পথ’, ‘দূরকে নিকট করবার পথ’।

সঞ্জয় অভিজিতের অনুগামী। অভিজিৎ অনুগমনকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, তবুও সঞ্জয় থাকেন তাঁর সঙ্গে। অভিজিৎ এর মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনেন সঞ্জয়।

➢ **বিভূতি**

বিভূতি যন্ত্ররাজ, উত্তরকূটের রাজসভার অন্যতম ক্ষমতাকেন্দ্র; পঁচিশ বছরের চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করেছেন এই যন্ত্রী; মুক্তধারা ঝরণায় বাঁধ তৈরি করেছেন। বিভূতি এবং যন্ত্র এখানে একাকার, যেন বিভীষিকা। বিকটদর্শন অসুরোপমযন্ত্র আসলে বিভূতির নির্মমতাকেই প্রকট করেছে। বিভূতি সৃষ্টির আনন্দে মত্ত। কত মানুষের প্রাণ গেল, তাতে বিচলিত নন তিনি। বাঁধ সম্পূর্ণ করার জন্য এ প্রাণদান তো সঙ্গত এবং স্বাভাবিক — মনটাই তাঁর মত। বড়ো কাজের জন্য এমন নরবলি তো অন্যায় নয়! শ্লাঘা বোধ করেছেন তিনি এই ভেবে যে ‘কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?’

৫.৪.১০.৫ : রূপক-সাংকেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিখ্যাত নাট্যকার। নাট্যসাহিত্যেও তিনি একজন কালজয়ী পুরুষ। অনেক বিখ্যাত নাটক বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর বিখ্যাত সাংকেতিক নাটক ‘মুক্তধারা’।

এই নাটকের নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ বহুবার — পথ, পথমোচন, মুক্তধারা। দ্বিতীয় বারের পর নাটকটির নাম দেন 'মুক্তধারা'। সারাজীবন তাঁর মুক্তমনা স্ববাবের পরিচয় আমরা পাই। কোনোরকম বন্ধনে বেঁধে থাকার মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। তাঁর মুক্ত স্বভাবের একটি বিখ্যাত নিদর্শন হলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তধারা নাটকটি বিখ্যাত একটি সাংকেতিক নাটক। মুক্তধারা আসলে একটি ঝরণা। যার জলে উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের মানুষ পুষ্ট। যার জলে শিবতরাইয়ের মানুষ খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকত। আর সেই মুক্তধারার পায়ে লোহার শিকল পড়িয়ে দিয়েছে যন্ত্ররাজ বিভূতি। শিবতরাইয়ের মানুষকে শাস্তি দেবে বলে। হিংসার এক রাজনৈতিক প্রসঙ্গও রবীন্দ্রনাথ এনেছেন। কিছু মানুষের কষ্ট ও হাহাকার এই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির পায়ে শিকল পরিয়ে বিভূতি সকল শিবতরাইবাসীকে চরম কষ্টের মুখে ফেলেছিল। তাদের মুখের অন্ন, জল বিভূতি কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু উত্তরকূটের যুবরাজ রাজা রঞ্জিতের পুত্র অভিজিৎ তা হতে দেয় না।

অভিজিৎ মুক্তমনা। পথের থেকে যে ডাক এসেছে সেই ডাক সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। বেরিয়ে পরে পথে। স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ছে যে অমৃত সুধা তাকে মুক্ত করতে। শিবতরাইবাসীর মধ্যে সেই জল পৌঁছে দিতে। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেন অভিজিৎ। মুক্তধারাকে মুক্ত করে সে। বিভূতির বসানো শিকলের আঘাতেমারা যায় অভিজিৎ। ভেসে যায় ঝর্ণার জলের স্রোতে। নিজের জীবনের বদলে হাজারো মানুষের প্রাণ বাঁচান তিনি।

আসলে অভিজিৎ কোনো কিছুতে ভয় পেত না। ও পথে বেরোবার ডাক পেয়েছিল। বহু বছরের সাধনায় বিভূতি যে বাঁধটা তৈরি করেছিলেন তাতে লেগেছিল হাজার যৌবনের ক্লান্ত নিশ্বাস। এই বাঁধ তৈরি করতে উত্তরকূটের প্রতিটি ঘরের ১৮ বছরের উর্ধ্বে ছেলেরে কাজে লাগানো হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ কেউই আর ঘরে ফেরেনি। যৌবনের তাজা রক্ত জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিভূতি সেদিন গড়ে তুলেছিল এই বাঁধ। বহু মায়ের কোল খালি হয়েগিয়েছিল সেদিন। তারমধ্যে অন্যতম অম্বার ছেলে সুমন। যাকে অম্বা আজও খুঁজছে। নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি মুক্তির বার্তা এনেছেন। তাইতো তাঁর নাটকের নাম 'মুক্তধারা'। প্রকৃতির কোনোকিছুকেই বেঁধে রাখা যায় না। প্রকৃতি মুক্ত। তাই বিভূতির বহু বছরের প্রচেষ্টা এক লহমায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যুবরাজ অভিজিৎ।

এই পথের শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। শুধু পথ হাঁটা তার স্বভাব। কখনই কোনো বাধা অভিজিতকে বাঁধতে পারেনি। কারণ অভিজিৎ মুক্তধারারই কোলার সন্তান। কোনো মা তাকে জন্ম দিয়ে ওই ঝরণাতলায় ফেলে রেখে গিয়েছিলো। রাজা রণজিৎ তাকে পালন করেছেন মাত্র। এই কথাটি কোনো কারণে অভিজিৎ জেনে যায় এবং তারপরই সে মুক্তধারার পায়ের শিকল খুলতে পথে বেরিয়ে পরে। এ যেন কোনো সন্তানের নিজের মায়ের প্রাণ রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা এবং সেই চেষ্টায় সফল হয়ে শিবতরাইয়ের মানুষের জীবন বাঁচানো।

লোহার বাঁধ ভাঙতে গিয়ে অভিজিৎ আহত হলেন এবং মুক্তধারা মা তাঁর আহত দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে গেল। ঘুচে গেল সব বন্ধন। আপন প্রাণে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে গেল মুক্তধারা। বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয় রবীন্দ্রনাথ নাটকটির ইংরাজি অনুবাদও করেন। নাম দেন 'The waterfall'. 'সাংকেতিক নাটক' বা 'symbolic drama' হিসাবে এটি একটি বিখ্যাত নাটক।

৫.৪.১০.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১) ‘মুক্তধারা’ নাটকটি নাট্যকার কখন রচনা করেন?

২) নাটকটির নাম ‘মুক্তধারা’ হলো কেন নাট্যবস্তুর আলোকে তা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৩) নাটকের প্রেক্ষাপট হিসাবে ‘মুক্তধারা’ নাটকের প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৪) মুক্তধারা নাটকটি নাট্যকারের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে বলে তোমার মনে হয়।

৫) ‘রূপক-সাংকেতিক’ নাটক হিসাবে ‘মুক্তধারা’ কতদূর সার্থক হয়েছে বলে তুমি মনে করো।

৬) ‘মুক্তধারা’ নাটকের চরিত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৫.৪.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ‘মুক্তধারা’ (১৯২২)—বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

২) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা — নীহাররঞ্জন রায়।

৩) রবীন্দ্রজীবনী — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪) রবিজীবনী — প্রশান্তকুমার পাল।

৫) রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৬) রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী।

৭) রবি প্রদক্ষিণ — মোহিতলাল মজুমদার।

৮) কাব্য পরিক্রমা — অজিতকুমার চক্রবর্তী।

৯) রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১২

নাট্যমঞ্চ

বিন্যাসক্রম

৫.৪.১২.১ : ভূমিকা

৫.৪.১২.২ : নাট্যমঞ্চের কালানুক্রমিক ইতিহাস

৫.৪.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.৪.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৪.১২.১ : ভূমিকা

প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন রুশ মনীষী লেবেদেফ। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) তিনি 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করে ২৭ নভেম্বর কাল্পনিক সংবদল নামক একটি বাংলা অনুবাদ-নাটক মঞ্চস্থ করেন। এর আগে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত দুটি নাট্যমঞ্চ ছিল, যেখানে কেবল ইংরেজি নাটকই অভিনীত হতো।

লেবেদেফের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উনিশ শতকে বাঙালিরা কলকাতায় বেশ কয়েকটি নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন, যেমন : হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১), ওরিয়েন্টাল থিয়েটার (১৮৫৩), জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৫৪), বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ (১৮৫৭) ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষভাগে ঢাকায়ও কয়েকটি নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়, যেমন : পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি (১৮৬৫), ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ (১৮৯০-৯২ এর মধ্যে), ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার (১৮৯৭) ইত্যাদি। এ সময় মুন্সিগঞ্জ শহরে 'জগদ্ধাত্রী নাট্যমঞ্চ' নামে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়, যা এখনও বর্তমান। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি মঞ্চ নির্মিত হয়, যেমন : খুলনা থিয়েটার (১৯০৫), করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (টাঙ্গাইল, ১৯১১) ইত্যাদি। এ সময় টাঙ্গাইলের সন্তোষ, এলেংগা, শিবপুর, আলোয়া ও করটিয়ার জমিদাররা বেশ কয়েকটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫.৪.১২.২ : নাট্যমঞ্চের কালানুক্রমিক ইতিহাস

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকায় নির্মিত হয় মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট (১৯৫০)। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকায় স্বতন্ত্র কোন নাট্যমঞ্চ নির্মিত না হলেও বেশ কয়েকটি সাধারণ মঞ্চ বিশেষভাবে নাট্যাভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে, যেমন : মহিলা সমিতি মিলনায়তন, গাইড হাউস মিলনায়তন ইত্যাদি। সম্প্রতি ঢাকার গুলিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬০০ আসনবিশিষ্ট 'ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চ'। এখানে প্রধানত নাট্যাভিনয় হয়। এগুলি ছাড়া ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নাটকের

অভিনয় হয়, যেমন : ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তন, গণগ্রন্থাগার মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন, কচিকাঁচা মিলনায়তন ওয়াপদা মিলনায়তন, অশ্বিনীকুমার টাউন হল (বরিশাল, ১৯৩০), জে. এম. সেন হল (চট্টগ্রাম), মুসলিম হল (চট্টগ্রাম), ইত্যাদি। উভয় বঙ্গের কয়েকটি প্রধান নাট্যমঞ্চের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ—

এমারেল্ড থিয়েটার — ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলুটোলা নিবাসী গোপাললাল শীল-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে থিয়েটারের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করান এবং গ্যাসের আলোর পরিবর্তে ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠা বছরেই ৮ অক্টোবর থিয়েটারের উদ্বোধন দিবসে কেদারলাল চৌধুরীর একখানি পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ হয়; কিন্তু দক্ষ পরিচালনার অভাবে থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এমতাবস্থায় গোপাল শীলের আমন্ত্রণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েকখানি পুরাতন ও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন। সেগুলির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিছুদিন পরে প্রখ্যাত মঞ্চাধ্যক্ষ ধর্মদাস সুর এর মঞ্চসজ্জায় নিযুক্ত হন। কিন্তু খেয়ালি মানুষ গোপাল শীল দু'বছরের মাথায় থিয়েটার বিক্রি করে দেন। তার পরেও বিভিন্ন মালিকানায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। কেদারলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় ৪০ খানা নাটক এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। এর প্রধান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, মহেন্দ্র বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, বনবিহারিণী, ক্ষেত্রমণি, সুকুমারী, কুসুম, গুল্ফন হরি প্রমুখ।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার — ১৮৫৩ সালে কলকাতার ২৬৮ নং গরানহাটা, চিৎপুরে গৌরমোহন আড্ডির ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অভিনয়ের জন্য মি. ক্লিঞ্জার ও মিসেস এলিস ছাত্রদের শিক্ষা দেন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় এবং এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ৫ অক্টোবর।

১৮৫৪ সালের ২ ও ১৭ মার্চ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় মার্চেন্ট অফ ভেনিস। মিসেস গ্রেইর্গ নামে জনৈকা মহিলা 'পোর্সিয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরের বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি শেক্সপীয়রের হেনরি ফোর্থ ও হেনরি পার্কার মেরিডিথের এ্যামেচার নাটক দুটি অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালের মে মাসে শেক্সপীয়রের আর একখানি নাটক অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকরে।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ব্যয় নির্বাহ হতো টিকিট বিক্রয়ের অর্থ দিয়ে, যেহেতু এটি কোন বিত্তবানের প্রাসাদের থিয়েটার ছিল না। এর নাট্যভিনয়ের বিজ্ঞাপন এবং বিবরণসমূহ সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল হরকরা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, দি মর্নিং ক্রনিকল, দি সিটিজেন ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ — ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে কোনও এক সময় পুরান ঢাকার নবাব বাড়ির সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রথমে ছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চ; কিন্তু এই গোষ্ঠীর কার্যক্রম বন্ধহয়ে গেলে ক্রাউন থিয়েটার সেটি ভেঙে নতুন করে মঞ্চ নির্মাণ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে মঞ্চটি এক সময় ইসলামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রাউন থিয়েটারের

কতিপয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সেখানে যোগ দেন এবং এর ফলে ক্রাউনের কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছুকাল পরে ক্রাউন থিয়েটার চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করলে নাট্যমঞ্চ হিসেবে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গাইড হাউস মিলনায়তন — ঢাকার নিউ বেইলী রোডে বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত। আশির দশক থেকে এই মঞ্চটি নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনীর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নাট্য প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন নতুন নাট্যদলের উদ্ভব, নাটকের দর্শক সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গাইড হাউস মিলনায়তনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ঢাকা শহরে এখানেই প্রথম দর্শনীয় বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনী শুরু হয়।

গাইড হাউস মিলনায়তনে বিভিন্ন নাট্যদল কর্তৃক মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রধান নাটক হলো : বহুবচনের প্রজাপতির লীলালাস্য (১৯৭২), ইডিপাস (১৯৮২); থিয়েটারের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৮); ঘরে-বাইরে (১৯৮৫); কোকিলারা (১৯৮৯); আন্তিগোনে (১৯৯২); ঢাকা থিয়েটারের শকুন্তলা (১৯৭৮); নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের দেওয়ান গাজীর কিস্সা, বিসর্জন (১৮৯৫); সুবচন নাট্য সংসদের জীবন ঘষে আগুন (১৯৮৬); লোক নাট্যদলের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯১), মহাপ্রয়াণ (১৯৯৪), একাত্তরের দিগুলো (১৯৯৫); সময় সাংস্কৃতিক নাট্যকেন্দ্রের বিছু (১৯৯১), লালসালু (১৯৯১), তুঘলোক (১৯৯২); সড়কের হ্যালুসিনেশন (১৯৯২); ঢাকা লিটল থিয়েটারের মার্চেন্ট অব ভেনিস (১৯৯৩); থিয়েটার আর্টের কোর্ট মার্শাল (১৯৯৩), কালান্তর (১৯৯৪), গোলাপজান (১৯৯৫); কণ্ঠশীলনের পুতুল খেলা (১৯৯৩), ভৃত্য রাজকতন্ত্র (১৯৯৫); ঢাকা সুবচন নাট্যদলের বিবিসাব (১৯৯৪); ঢাকা পদাতিকের ফেরা (১৯৯৪); জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের পাবলিক (১৯৯৫) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দলীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ ঢাকা প্যান্টোমাইম (১৯৮৯) গাইড হাউস মঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে ১৯৯১-৯৩ সালের মধ্যে মঞ্চস্থ করে মানব ও প্রকৃতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, ভাষা আন্দোলন, নদী পাড়ের জীবন, মাদকাশক্তি এবং স্বাধীনতা শীর্ষক মূকাভিনয়। নাটক ও মূকাভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এ মঞ্চে দর্শনীয় বিনিময়ে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার — ১৮৭৩ সালে ভুবনমোহন নিয়োগী কর্তৃক কলকাতার বিডন স্ট্রিটে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের স্থলে) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চটি লিজ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচালনা করেন; কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যেই কৃষ্ণধন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ভুবনমোহন পুনরায় থিয়েটারটি নিজের হাতে নিয়ে পূর্ব নামেই চালাতে থাকেন। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃতলাল বসুর হীরকচূর্ণ ও উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক এখানে অভিনীত হয়। হীরকচূর্ণ নাটকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রথম রেলগাড়ি দেখানো হয়। পরবর্তীকালে এ মঞ্চে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো : প্রকৃত বন্ধু, সরোজিনী, বিদ্যাসুন্দর, গজদানন্দ ও যুবরাজ, কর্ণাটকুমার ইত্যাদি।

গজদানন্দ ও যুবরাজ একটি কৌতুক নাটক; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) ১৮৭৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এলে তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হয়। এতে সরকারি মহলে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং পুলিশ এর প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ পুলিশকে বিদ্রূপ করে The Police of Pig and Sheep নামে আরও একটি কৌতুক নাটক রচনা করেন এবং ১৮৭৬ সালের ১ মার্চ নাটকটি এখানে মঞ্চস্থ হয়। এর পরিণতি হিসেবে নাট্যাভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ঐ বছরই অভিনয়

নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। এভাবে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি কারণে ভুবনমোহন সর্বস্বান্ত হয়ে থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং অন্যরাও থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। ১৮৮০ সালে প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এটি ক্রয় করে গিরিশ ঘোষকে পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা-১ — প্যারীমোহন বসু কর্তৃক ১৮৫৪ সালে তাঁর কলকাতাস্থ জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ৩ মে এই মঞ্চে শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকটি অভিনীত হয়। মহেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণধন দত্ত, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ প্রভাকর (৫ মে, ১৮৫৪) পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রায় চারশত ভারতীয় ও ইংরেজ দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা (১১ মে, ১৮৫৪) নাট্যশালার নিকট বাঙালি দর্শকদের জন্য বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব দেয়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা-২ — ১৮৬৫ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালের বিখ্যাত গোপাল উড়িয়ার যাত্রাগান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মঞ্চাভিনয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলীর সহায়তায় এ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা এবং গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবুবিলাস নাটক অভিনীত হয়। এরপর উদ্যোক্তাগণ সমকালীন সমাজের সমস্যা নিয়ে রচিত নাটক আহ্বান করে পুরস্কারসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। বিচারকদের বিচারে রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটক শ্রেষ্ঠরূপে নির্বাচিত হয় এবং নাট্যকারকে একটি রূপার থালায় ২০০ রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি নাটকটি অভিনীত হয়। অক্ষয় মজুমদার, সারদা গাঙ্গুলী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এতে অভিনয় করেন। ৯ জানুয়ারি ন্যাশনাল ও ২৮ জানুয়ারি সোমপ্রকাশ পত্রিকায় উক্ত প্রযোজনার উচ্চ প্রশংসা করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালার শেষ অভিনয়।

ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার — জমিদার কিশোরীলাল রায়চৌধুরী কর্তৃক ১৮৯৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোরীলাল প্রথমে ক্রাউন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু এক সময় এর শিল্পী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতার অভাব দেখা দিলে তিনি ক্রাউনেরই কতিপয় শিল্পী নিয়ে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরনো ঢাকার ইসলামপুরে বর্তমান লায়ন সিনেমা হলের জায়গায় এ মঞ্চটি নির্মিত হয়েছিল।

ডায়মণ্ড কলকাতা থেকে অভিনেত্রী এনে, স্থানীয় বাইজিদের দিয়ে অভিনয় করাত। এ মঞ্চে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো : দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরানী, বিজয় বসন্ত, আলীবাবা, নবীন তপস্বিনী, বিল্বমঙ্গল, নন্দদুলাল, তরুবালা ইত্যাদি। এর টিকেটের হার ছিল দুই টাকা, এক টাকা, আট আনা ও চার আনা। ঢাকায় পেশাদার থিয়েটার প্রচলনের পেছনে ডায়মণ্ড ডুবিলি থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

ন্যাশনাল থিয়েটার — ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের সভ্যগণ সর্বশ্রেণির দর্শকদের সুবিধার্থে একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী এটি নির্মিত হয়। এ কারণে মঞ্চটি প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসেবে খ্যাত।

রঙ্গালয়ের টিকেট বিক্রয়ের অর্থে শুধু নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার ব্যয়টুকু নির্বাহ করাই ছিল ন্যাশনালের

কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে ৩৩ নং চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের মন্দির ভবনে একটি অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হয় এবং মঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। কিন্তু এরূপ একটি অস্থায়ী ও যৎকিঞ্চিৎ সজ্জিত মঞ্চের 'ন্যাশনাল' নাম নিয়ে দলপতি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ সভ্যদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি দলত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় কার্যনির্বাহকের দায়িত্ব পালন করেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। প্রতিষ্ঠা বছরেরই ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রথম দিকে প্রতি শনিবার এখানে অভিনয় হতো; পরের দিকে সপ্তাহে দু'দিনও হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র ছাড়াও শিশিরকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র ব্যানার্জী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রামনারায়ণ তর্করত্নেরও কয়েকটি নাটক ন্যাশনালে অভিনীত হয়েছে। মাঝে মাঝে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি হাস্যরসাত্মক প্যান্টোমাইম পরিবেশন করতেন। উল্লেখযোগ্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দু মুস্তফি, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি হিন্দুমেলা নাটকে অভিনয়ের জন্য গিরিশচন্দ্র পুনরায় এতে যোগ দেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে যে অভিনয় হয় ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ। এর অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় এবং নতুন দলের নাম হয় 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'। সমকালীন সুলভ সমাচার, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান মিরর, ইংলিশম্যান ইত্যাদি পত্রিকায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি — ১৯৬৫ সালে (মতান্তরে ১৮৭০–৭২ সালের মধ্যে) পুরান ঢাকায় বর্তমান জগন্নাথ কলেজের স্থানে জমিদার মোহিনীমোহন দাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে কেন্দ্র করে একটি নাট্যসমাজও গড়ে উঠেছিল। ১৮৭২ সালে রামাভিষেক নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে এই রঙ্গমঞ্চই ঢাকায় প্রথম দর্শনীয় বিনিময়ে নাট্যাভিনয় শুরু করে। টিকেটের হার ছিল চার, দুই ও এক টাকা, যা সময়ের বিবেচনায় ছিল অনেক বেশি। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত রামাভিষেক নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'— (১৮৬১) নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে অভিনয় করত। তবে এ মঞ্চে শুধু নাটকই প্রদর্শিত হতো না, ঢাকার অধিকাংশ সভাও এখানেই অনুষ্ঠিত হতো। এদিক থেকে এটি তখন টাউন হলের প্রয়োজন মিটিয়েছে। ১৮৭৩ সালে মোহিনীমোহন দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, যেমন কর্ম তেমন ফল, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ভারত মাতা ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৮৭৬ সালে নবাব আবদুল গনির আমন্ত্রণে মুম্বাই থেকে একটি দল ঢাকায় এসে হিন্দি নাটক ইন্দ্রসভা মঞ্চস্থ করে। গন্নুবাঈ, আন্নুবাঈ ও নবায়ন এই তিনবোন ইন্দ্রসভায় অভিনয় করেন। ঢাকায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম। তাঁরা যদুনগর নামে অপর একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেন। ১৮৮৪ সালে এখানে অভিনীত হয় উত্তররামচরিত।

বঙ্গ নাট্যালয়-১ — ১৮৫৯ সালে জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টায় তাঁদের কলকাতাস্থ পাথুরিয়া ঘাটা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা বছর জুলাই মাসে কালিদাসের সংস্কৃত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর অভিনয়ের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। পরের বছর ৭ জুলাই অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত উক্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ। এরপর পাঁচ বছর এই নাট্যশালার কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন নতুন দল গঠন করে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। এরপরেই

অভিনীত হয় বুঝলে কিনা ব্যঙ্গনাট্য। পরবর্তীকালে অভিনীত নাটকগুলি সবই রামনারায়ণকৃত: যেমন কর্ম তেমন ফল, চক্ষুদান, মালতীমাধব, উভয়সঙ্কট ও রুক্মিণীহরণ।

বঙ্গ নাট্যালয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্য ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মদনমোহন বর্মণ, মহেন্দ্র মুখার্জী, রাধাপ্রসাদ বসাক, কৃষ্ণধন ব্যানার্জী প্রমুখ। ১৮৭২ সালে এর কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গ নাট্যালয়-২ — বলদেব ধর ও চুনিলাল ধরের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৬৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেরই মার্চ মাসে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে কলকাতার ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেনের (বহুবাজার) গেবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে এর যাত্রা শুরু হয়। উমাচরণ ঘোষ, অম্বিকা ব্যানার্জী, বিহারীলাল ধর, বলদেব ধর, আশুতোষ চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী পাঁচ বছর বঙ্গ নাট্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ১৮৭৪ সালে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রসহ কয়েকজন নাট্যামোদী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় পুনরায় এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৭ জানুয়ারি তাঁরা মনোমোহন বসুর সতী নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একই নাট্যকারের হরিশচন্দ্র নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে এবং এটিই ছিল বঙ্গ নাট্যালয়ের শেষ প্রযোজনা। বঙ্গ নাট্যালয়ই প্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রবেশপত্র ব্যবহার করে।

বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ — ১৮৫৭ সালে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো সিংহ বাড়িতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ। প্রতিষ্ঠা বছর ১১ এপ্রিল ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার-এর রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বঙ্গানুবাদের অভিনয়ের মাধ্যমে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং 'ভানুমতী' নামে একটি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেন। সংবাদ প্রভাকর (১৫ এপ্রিল) পত্রিকায় এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসাসহ সংবাদ পরিবেশিত হয়।

এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক কালীপ্রসন্ন অনূদিত কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় (২৪ নভেম্বর)। কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহেন্দ্রনাথ মুখার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে অভিনয় করেন।

বেঙ্গল থিয়েটার — ১৮৭৩ সালর ১৬ আগস্ট আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কলকাতার ৯ নং বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস লুইস-এর চৌরঙ্গীর 'লাইসিয়াম' থিয়েটারের অনুকরণে শরৎচন্দ্র থিয়েটার বাড়িটি নির্মাণ করেন। নিজস্ব জমির ওপর নির্মিত বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এটিই প্রথম।

শরৎচন্দ্র এই নাট্যশালাটি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনীষীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে এখানে মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকটি অভিনীত হয়। তারপর সুদীর্ঘ ২৮ বছরের পথপরিক্রমায় বেঙ্গল থিয়েটার ১১০টিরও বেশি নাটক মঞ্চস্থ করে। স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ের জন্য এই থিয়েটারেই প্রথম জগত্তারিণী, এলোকেশী, গোলাপ (সুকুমারী) এবং শ্যামা নামে চারজন মহিলা অভিনেত্রীকে নিযুক্ত করা হয়।

বেঙ্গল থিয়েটার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদসহ বহু প্রখ্যাত নাট্যকারের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক এবং ব্যঙ্গনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি

মঞ্চস্থ করে। শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চ্যাটার্জী, অমৃতলাল বসু, খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মহেন্দ্রলাল বসু, এলোকেশী, গোলাপ, শ্যামা, জগত্তারিণী, কুসুম কুমারী এবং আরও অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত অভিনেত্রী বিনোদিনী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু করেন। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রমোদরঞ্জনী নাটকখানির অভিনয়ের পর বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গলী থিয়েটার প্রথম বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ মনীষী হেরাসিম লেবেদেফ কর্তৃক কলকাতার ২৫ নং ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) প্রতিষ্ঠিত হয়। লেবেদফ তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় এটি নির্মাণ করেন। তিনি দি ডিসসাইজ ও লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর নামক দুটি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। গোলকনাথের প্রস্তাবে দি ডিসগাইজ-এর বাংলা অনুবাদ কাল্পনিক সংবদল মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। এ ব্যাপারে ক্যালকাটা গেজেট-এর ২৬ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, টিকিট বিক্রির হার ছিল এরূপ : বক্স ও পিট-৮ টাকা এবং গ্যালারি-৪ টাকা। পরের দিন ২৭ নভেম্বর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

বেঙ্গলী থিয়েটারে যে নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। এদিন বিশেষ আসনের মূল্য ছিল এক স্বর্ণমুদ্রা। বেঙ্গলী থিয়েটারে সপ্তাহে মাত্র দুটি প্রদর্শনী হতো। উল্লেখ্য যে, লেবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটারই প্রথম এশীয় ভাষায় প্রসেনিয়াম থিয়েটার-রীতি প্রয়োগ করে।

বেলগাছিয়া থিয়েটার — ১৮৫৮ সালে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁদের বেলগাছিয়া ভিলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরদাস বসাক ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠা বছর ৩১ জুলাই রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত সংস্কৃত নাটক রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ মঞ্চায়নের মাধ্যমে বেলগাছিয়া থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার্থে মধুসূদন ইংরেজিতে নাটকের সারাংশ লিখে দেন।

পরের বছর ৩ সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয় মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক। প্রিয়নাথ দত্ত, হেমচন্দ্র মুখার্জী, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ অভিনেতা মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বাংলা থিয়েটারে এই প্রথম ভারতীয় ঐকতান বাদন ব্যবহৃত হয়; এতে নেতৃত্ব দেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল। তৎকরালীন সংবাদ প্রভাকর ও হিন্দু পত্রিকায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে বেলগাছিয়া থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

মহিলা সমিতি মিলনায়তন — ঢাকা বেইলী রোডে অবস্থিত। এর মঞ্চটি সাধারণভাবে ‘মহিলা সমিতি মঞ্চ’ নামে পরিচিত এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে এটি ঢাকার নাট্যচর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রুপ থিয়েটার-চর্চাভিত্তিক নাট্যমঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন নাট্যদল নিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চস্থ করে আসছে। ঢাকায় নাটকের দর্শক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মঞ্চে প্রদর্শিত নাট্যসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, যদিও নাট্যমঞ্চায়নের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই। এ মঞ্চে নাট্যপ্রদর্শনী ব্যতীত অন্য কোন সভা-সমাবেশ কিংবা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয় না বললেই চলে।

১৯৭৩ সালে এ মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় বার্নাড শ' রচিত এবং ড্রামা সার্কল প্রযোজিত দান্তের মৃত্যু নাটকটি। এই দলের পরবর্তী দুটি প্রযোজনা হলো মনেজ মিত্রের সাজানো বাগান (১৯৮০) এবং বিজয় তেণ্ডুলকারের চুপ আদালত চলছে (১৯৮৪)। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ১৯৭৩ সালে মঞ্চস্থ করে বিদগ্ধ রমণীকুল, তৈল সঙ্কট, ক্রস পারপাস ও নিষিদ্ধ পল্লীতে। এভাবে আরণ্যক নাট্যদল, ঢাকা থিয়েটার, নান্দনিক নাট্য সম্প্রদ্রায়, ঢাকা পদাতিক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (নাটক বিভাগ), বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, লোকনাট্যদল, ঢাকা লিটল থিয়েটার, সড়ক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, লায়ন থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

বাংলাদেশের প্রথম মূকাভিনয় দল ঢাকা প্যান্টোমাইম (১৯৮৯) মহিলা সমিতি মঞ্চে ১৯৯০ সালে প্রদর্শন করে বখাটে ছেলের পরিণতি, বালক ও পাখি, জেলে, প্রেম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক মূকাভিনয়। ঢাকাভিত্তিক নাট্যদল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি নাট্যদল, একাধিক ভারতীয় নাট্যদল এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আই.টি.আই), বাংলাদেশ কেন্দ্র আয়োজিত উৎসবে আগত বিদেশি কয়েকটি নাট্য সংগঠনের নাটকও এই মঞ্চে দর্শনীয় বিনিময়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট — ১৯৫০ সালে পুরনো ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ বিজয়া-র প্রদর্শনী দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক জবানবন্দি মঞ্চস্থ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ। ১৯৫২ সালে মঞ্চস্থ হয় সিকান্দার আবু জাফরের ঐতিহাসিক নাটক সিরাজউদ্দৌলা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডক্টরস ক্লাব ও কলেজ ছাত্র-সংসদ যথাক্রমে মানময়ী গার্লস স্কুল ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বীপান্তর এবং অগ্রদূত নাট্যসঙ্ঘ বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাটির ঘর মঞ্চস্থ করে। নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি এ মঞ্চে অন্যান্য সভা-সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।

মিনার্ভা থিয়েটার — ১৮৯৩ সালে কলকাতার ৬ নং বিডন স্ট্রিটস্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেরই ২৮ জানুয়ারী নগেন্দ্রভূষণ মুখার্জীর অর্থানুকুল্যে গিরিশচন্দ্র অনুদিত শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য নাট্যকার রচিত প্রায় ৬০ খানা নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক পুনর্গঠিত হয়ে তাঁর ব্যবস্থাপনায় ১৯২২ সাল পর্যন্ত এটি পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে মিনার্ভায় বিভিন্ন ধরনের পঞ্চাশোর্ধ্ব নাটক অভিনীত হয়। ১৯২২ সালের ১৮ অক্টোবর এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মিনার্ভা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

১৯২৫ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের নেতৃত্বে মিনার্ভা পুনর্নির্মিত হয় এবং ৮ আগস্ট মহাতাপচন্দ্র ঘোষের আত্মদর্শন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা পরিচালনা করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর হেমেন্দ্র মজুমদার, দিলোয়ার হোসেন, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী, এল. সি. গুপ্ত, রাসবিহারী সরকার প্রমুখ ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবে মিনার্ভাকে সুষ্ঠুভাব পরিচালিত করেন।

১৯৫৯ সালে শম্ভু মিত্র মিনার্ভায় নাট্য প্রযোজনা করেন। ঐ বছর জুন মাসে উৎপল দত্ত তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে নিয়মিতভাবে পেশাদারি ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনা শুরু করলে মিনার্ভা থিয়েটারের আমূল পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘ এক দশক উৎপল দত্ত অনূদিত ও পরিচালিত শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকসহ ছায়ানট, নীচের মহল, অঙ্গার,

ফেরারী ফৌজ, ভি-আই-পি, তিতাস একটি নদীর নাম, কল্লোল, মানুষের অধিকার প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৮ সালে লিটল থিয়েটারের প্রস্থানের পর মিনার্ভায় এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়; তবে অদ্যাবধি থিয়েটারের ভগ্নপ্রায় বাড়িটি উনিশ শতকের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করছে।

মেট্রোপলিটন থিয়েটার — হিন্দু 'বিধবা বিবাহ' প্রথা প্রচলনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার মানসে ১৮৫৯ সালে মুরলীধর সেন কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত বক্তা ও সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন, ধর্মীয় নেতা রেভারেন্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৩ এপ্রিল কলকাতার চিৎপুর সিঁদুরিয়া পট্টির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে উমেশচন্দ্র সেনের নাটক বিধবা বিবাহ মঞ্চায়নের মাধ্যমে এটি উদ্বোধিত হয়। বিহারীলাল চ্যাটার্জী, অক্ষয় মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কুঞ্জবিহারী সেন প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন অভিনয় পরিচালনা করেন কেশবচন্দ্র সেন এবং দৃশ্যপট অঙ্কন করেন ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী মি. ইল বাইন। সংবাদ প্রভাকর (১৪ মে) পত্রিকায় এ অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

রঙমহল থিয়েটার — ১৯৩১ সালে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) রবীন্দ্রনাথ রায় (রবি রায়) ও সতু সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ও রবি রায় পরিচালকের এবং অমর ঘোষ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও ষষ্ঠী গাঙ্গুলী, নির্মলচন্দ্র, এস আহমেদ, ডি. এন. ধর, হরচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দে প্রমুখ মিলে রঙমহল থিয়েটারকে একটি যৌথ কোম্পানির চরিত্র দান করেন।

প্রতিষ্ঠা বছরের ৮ আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে রঙমহল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী এর পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯৩২ সালের ১৭ জানুয়ারি রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় বিজয়িনী নাটক; ২ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের বনের পাখি এবং ২৫ জুন উৎপলেন্দু সেনের সিন্ধুগৌরব। বনের পাখি নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নাটকে অভিনয় করেন রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্তোষ সিংহ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, চরুবালা, শশীবালা, শেফালিকা, সরযূবালা দেবী প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই সেকালের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিল অভিনীত হয় অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নাটক মহানিশা। এ নাটকটিও জনপ্রিয় হয় এবং এতেই সতু সেনের প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতায় প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

এরপর বহু ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে রঙমহল থিয়েটার অগ্রসর হয়। থিয়েটারের মালিকানাও পরিবর্তিত হয় এবং অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিবর্তন ঘটে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গ্যবিষয়ক নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। কোন কোন নাটক (যেমন উল্কা) একাদিক্রমে ৫০০ রজনী অভিনীত হয়ে বাংলা থিয়েটারে সাড়া জাগিয়েছে। পরবর্তীকালে এই মঞ্চ যাঁরা নাট্য পরিচালনা করেন কিংবা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) প্রমুখ। মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রধান নাটক হলো : শতবর্ষ আগে, কবি, দুই পুরুষ, মায়ামৃগ, একমুঠো আকাশ, এক পেয়ালা কফি, সাহেব বিবি গোলাম, অনর্থ, চক্র ইত্যাদি। ১৯৭৫ সাল থেকে ক্যাবারে নৃত্য চালু হলে রঙমহলের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়; রুচিবান অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী রঙমহল ত্যাগ করেন এবং এর ব্যবস্থাপনাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রঙমহল থিয়েটার এখনও টিকে আছে।

লায়ন থিয়েটার — ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ শতকের প্রথম দিকে মীর্জা আবদুল কাদের ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার ক্রয় করে এর নতুন নামকরণ করেন লায়ন থিয়েটার। এখানে বাংলা নাটকের পাশাপাশি উর্দু নাটকও মঞ্চস্থ হতো। উর্দু নাটকগুলির মধ্যে ছিল জালমা ও পারস্তা, বুলবুল এ বিমার ইত্যাদি। ঢাকার নাট্যকার যোগেন গুপ্তের চিড়িয়াখানা এবং বিপিন বিহারী চামের লাঞ্ছনা নামক দুটি প্রহসনও এখানে মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে ঢাকায় ফিল্মের আবির্ভাব হলে লায়ন থিয়েটারে নাটক প্রদর্শন বন্ধ করে 'লায়ন সিনেমা' নামে এটিকে প্রেক্ষাগৃহে পরিণত করা হয় এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়।

স্টার থিয়েটার-১ — ১৮৮৩ সালে কলকাতার ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে (বর্তমান বিডন স্ট্রিট ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর সংযোগস্থল) প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। গুর্মুখ রায় নামে জনৈক অবাঙালি যুবক থিয়েটারে অর্থলগ্নী করেন। তিনি সুন্দরী নটী বিনোদিনীর নামানুসারে 'বি' থিয়েটার নামকরণের শর্ত আরোপ করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত 'স্টার' থিয়েটার নাম হয়।

প্রতিষ্ঠা বছর ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে স্টার থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে গুর্মুখ রায় থিয়েটার বিক্রি করে দিলে অমৃতলাল বসু, দাসু নিয়োগী ও হরি বোস এটি ক্রয় করেন এবং ১৮৮৭ সালর পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে পরিচালন করেন। এরপর স্টার থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

স্টার থিয়েটারে মোট ২০ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং সেসবের অভিনয় অংশগ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল হয়, অমৃত মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পী। একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধর্মীয় নাটক চৈতন্যলীলা দেখতে এসে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। ১৮৮৭ সালের ৩১ জুলাই স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

স্টার থিয়েটার-২ — ১৮৮৮ সালে কলকাতার হাতিবাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার পর মূলত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মীদের উদ্যোগেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মদাস সুর এবং ইঞ্জিনীয়ার যোগেন গুপ্তের নকশা অনুযায়ী থিয়েটার হাউস ও তার মঞ্চ নির্মিত হয়। এক সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষও এর সঙ্গে যুক্ত হন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৫ মে 'সেবক' ছদ্মনামে গিরিশ ঘোষ রচিত নসীরাম নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে নবনির্মিত হাতিবাগান স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

১৯৮৮ সালে স্টার থিয়েটার তার গৌরবের একশ বছর পূর্ণ করে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বহুবার স্টারের মালিকানা পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এর সংস্কার ও আধুনিকীকরণও হয়েছে। শেষদিকে এর মঞ্চটি ছিল ঘূর্ণায়মান। গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্তসহ ৮০ জনেরও বেশি নাট্যকারের প্রায় ২৫০টি বাংলা নাটক এ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। হিন্দি নাটক অভিনীত হয়েছে ১২টিরও বেশি। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, গঙ্গামণি, কাদম্বিনী, অমর দত্ত, দানীবাবু, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, অপরেশচন্দ্র, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা, সরযূবালা, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, অনুপকুমার প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পী স্টারে অভিনয় করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯১ সালের ১৬ অক্টোবর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঐতিহ্যমণ্ডিত এ থিয়েটার হাউসটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হিন্দু থিয়েটার — ১৮৩১ সালে কলকাতার প্রান্তে শুঁড়ো-নারিকেলডাঙ্গায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও এ মঞ্চে কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি প্রতিষ্ঠা বছর ২৮ ডিসেম্বর শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং ভবভূতির সংস্কৃত নাটক উত্তররামচরিতম্-এর প্রথম অঙ্কের ইংরেজি অনুবাদ অভিনয়ের মাধ্যমে এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। গঙ্গাচরণ সেন, রামচন্দ্র মিত্র, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৩২ সালের ২৯ মার্চ নাথিং সুপারফ্লুয়াস নামে একখানি ইংরেজি প্রহসন অভিনীত হওয়ার পর হিন্দু থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়, কারণ এটি বাঙালি দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেনি।

৫.৪.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১) বাংলা নাটকের ইতিহাসে নাট্যমঞ্চের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২) বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চগুলির কালানুক্রমিক বিবরণ দাও।

৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যমঞ্চগুলির অবদান লেখো।

৪) বাংলা নাটকের বিবর্তনে উভয় বঙ্গের নাট্যশালাগুলির গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৫) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো — গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বঙ্গ নাট্যালয়, মিনার্ভা থিয়েটার, বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ, বেঙ্গল থিয়েটার, বেলগাছিয়া থিয়েটার, লায়ন থিয়েটার, স্টার থিয়েটার।

৫.৪.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১) বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক — পুলিন দাস।

২) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫–১৯২০) –— শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

৪) নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ — পবিত্র সরকার।

জি ই সি / সি বি সি এস

পর্যায় গ্রন্থ - ৫, বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

একক - ১১ চলচ্চিত্রের স্বরূপ

<u>বিন্যাসক্রম</u>

৫.১১.১ : চলচ্চিত্রের স্বরূপ

৫.১২.২ : বাংলা সাহিত্য, চিত্রনাট্য

৫.১৩.৩ : চলচ্চিত্রে জীবন ও সমাজ

৫.১৪.৪ : চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা

৫..৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

<u>৫.১১.১ : ভূমিকা</u>

অন্যান্য শিল্পের মতই চলচ্চিত্র বিশেষ ধরনের শিল্প। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, অভিনয় ও চিত্রকলার যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু পার্থক্যও আছে প্রচুর। চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পের মতো একক শিল্প নয়। এটি একটি যৌথ বা মিশ্র শিল্প। অনেক শিল্পের অনেক দিককে মন্থন করে চলচ্চিত্র শিল্প পদবাচ্য হয়েছে। সঙ্গীতের ছন্দ, চিত্রকলার কম্পোজিশন, টোন, রং, ফটোগ্রাফীর বাস্তবতা, স্থাপত্যের গঠন, উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের অভিনয়—সব কিছু আত্মসাৎ করে তার অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। আরো স্থূলভাবে দেখতে গেলে তার সেট তৈরী এবং আঁকাতে রয়েছে স্থাপত্য ও চিত্রকলা, চিত্রনাট্য রচনায় উপন্যাসের সংকেত, তার গতির মধ্যে রয়েছে স্থির আলোকচিত্রের সমষ্টি, উপরন্তু তাতে প্রত্যক্ষভাবে নৃত্য-গীতের ব্যবহার। এছাড়া এই শিল্পটির সঙ্গে অন্য শিল্পের প্রধান পার্থক্য, চলচ্চিত্রের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে এবং শিল্পটি একান্তভাবে যন্ত্রনির্ভর। এই শিল্পসভায় চলচ্চিত্র এল সবার শেষে। এর আবির্ভাব কাল উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরু। পৃথিবীর সব প্রাচীন শিল্পগুলির কাছ থেকে তিল তিল উপাদান সংগ্রহ করে চলচ্চিত্র এলো সবার শেষে শিল্প সভায় শিল্পের তিলোত্তমা সেজে।

সিনেমা প্রথম তৈরী হয় পাশচাত্যে। সিনেমা বলতে তখন Film Strip বা ছোটো টুকরো বোঝাত। তাতে ধরা পড়ত ছোটো ঘটনা—যেমন ট্রেন এসে স্টেশনে থামছে, ঘোড়া

দৌড়াচ্ছে বা এরকমই দৈনন্দিন জীবনের টুকরো দৃশ্যাবলি। দুই ভাই—অগাস্ট এবং লুই লুমিয়ের (লুমিয়ের ব্রাদার্স) প্রথম সিনেমা তৈরি এবং প্রদর্শনের কাজটি করেন। ভারতে তথা বাংলায় ১৮৯৮ সালে হীরালাল সেন এবং তার ভাই মতিলাল সেন রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি তৈরি করেন। সেই সময়কার মঞ্চসফল নাটকগুলি ('আলিবাবা', 'সরলা', 'ভ্রমর') থেকে বিভিন্ন টুকরো টুকরো দৃশ্য নিয়ে তাঁরা একটা ছায়াছবি তৈরি করলেন।

এই প্রসঙ্গেই বলি চলচ্চিত্রের দুইরূপ, নির্বাক ও সবাক। উভয়ের শিল্প প্রকৃতি আলাদা। মনে রাখতে হবে সবাক ছবি নির্বাক ছবির উন্নত সংস্করণ নয়। এ দুটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। এদের ভাষা, প্রকাশরীতি, আঙ্গিক সবই পৃথক। দুই ছবির পার্থক্য প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটক বলেন—

"চলচ্চিত্র বলতে সাধারণত নিঃশব্দ ও সশব্দ দু'ধরনের ছবিকে আমরা একই মানেতে ধরে নিই। এটা মোটেই ঠিক নয়। নিঃশব্দ ছবি হচ্ছে একটা একেবারে আলাদা শিল্প। তার গতিপ্রকৃতি, তার সূত্রগুলি, তার শব্দরূপ, ধাতুরূপ অন্য অংকের।"

বাংলায় সিনেমা দেখানোর ব্যাপারটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় জে. এফ ম্যাডান নামে এক পারসি ব্যবসায়ীর উদ্যোগে। ১৯০২ সালে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস নামে প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখাতে শুরু করেন প্রথম দিকে ইংরাজি ছবি দেখালেও ১৯১৩ সালে বম্বেতে দাদাসাহেব ফালকে 'রাজা হরিশচন্দ্র' তৈরি করার পর ম্যাডান হিন্দি সিনেমা দেখাতেও আরম্ভ করে। ১৯১৯ সালে ম্যাডান কোম্পানির প্রযোজনায় প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র 'বিল্বমঙ্গল' তৈরি হয়। এছাড়াও 'বিষবৃক্ষ', 'প্রফুল্ল', 'শিবরাত্রি', 'জনা' ইত্যাদি মোট ৬২টি ছবি ম্যাডানের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল। ম্যাডানের উদ্যোগেই ১৯২৮ এর ডিসেম্বরে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে হলিউডের ইউনিভার্সাল কোম্পানির 'মেলোডি অব লাভ' দেখানো হয়। এটিই ভারতে প্রদর্শিত প্রথম সবাক ছবি। এই সবাক ছবি এসে সিনেমার বাঁক-বদল ঘটালো। কেননা শব্দ এসে যাওয়ায় পুরানো যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ল। নতুন যন্ত্র, নতুন শব্দবিরোধী স্টুডিয়ো, দক্ষ কলাকুশলীর প্রয়োজন হল, তখন থেকেই চলচ্চিত্র শিল্প বা Industry রূপে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিতে শুরু করল। ১৯১৩ সালের ১১ই এপ্রিল ম্যাডানের প্রযোজনায় প্রথম বাংলা টকি (সবাক সিনেমা) 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তি পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য প্রথম ভারতীয় টকি (হিন্দি) 'আলমআরা' ১৯৩১ এ বম্বেতে প্রদর্শিত হয়।

লেখকের যেমন কালি ও কলম, চিত্রশিল্পীর যেমন রং আর তুলি, ভাস্করের যেমন ছেনি, হাতুড়ি আর প্রস্তরখন্ড, চলচ্চিত্রকারের হাতে তেমনি ক্যামেরা আর শব্দযন্ত্র। লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি ও শব্দ। এই দুইয়ে মিলে যে ভাষা সেই ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা। তা হলেই দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্র হলো চিত্রময়, শব্দময়, গতিশীল রচনা। চলচ্চিত্রের প্রধান বিশেষত্ব হলো—এই শিল্পটি অত্যন্ত বাস্তব। সাহিত্যের মা যেমন করে কাঁদে, বাস্তবের মা তেমন করে কাঁদে না। কিন্তু চলচ্চিত্র বড় বেশি বাস্তব। যে কারণে চলচ্চিত্রের ঘোড়া আর যামিনী রায়ের ঘোড়া এক নয়।

চলচ্চিত্রের Subjective Expression খানিকটা সম্ভব হয় সঙ্গীতের দ্বারা। সঙ্গীত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প। যা অন্য সমস্ত শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না, তাকেই প্রকাশ করে সঙ্গীত। তাই চলচ্চিত্রও যখন তার প্রকাশ ক্ষমতার প্রত্যন্ত সীমায় এসে পৌঁছয় তখনি সঙ্গীত এসে তার ভাবপ্রকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। যে ভাব ব্যক্তিগত বা বাহ্য ঘটনার অন্তর্নিহিত তাকে মূর্ত করে দেয়, যা দৃশ্য, যা বর্ণনীয় তাতে অদৃশ্য অনির্বচনীয়কে মূর্ত করে, চলচ্চিত্রের প্রকাশ ক্ষমতা অবশেষে সম্পূর্ণতা পায়। চলচ্চিত্রের এই Subjective Expression এ এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে মন্টাজের যোগও দেখা যায়। মন্টাজ চলচ্চিত্রের ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মন্টাজ বলতে বোঝায় দুটি স্বতন্ত্র এমন কি বিপরীত চিত্রের সংঘাত থেকে যে অভূতপূর্ব তাৎপর্য সৃষ্টি হয়, সেই অভূতপূর্ব তাৎপর্যটিকে। সত্যজিৎ রায়ের কথায়—

"... যে শটের কোনো স্পষ্ট অর্থ নেই, সে শটও অন্য আরেকটি অর্থহীন বা অর্থবোধক শটের সঙ্গে জুড়লে দুইয়ে মিলে একটা সৃষ্ট ভাব ব্যক্ত করা যায়। এরই নাম মন্টাজ।"

এইভাবে চলচ্চিত্রে ছবি, শব্দ, সঙ্গীতের প্রয়োগ কৌশলের উপর চলচ্চিত্রকারের যেমন Subjective Expression সম্ভব হচ্ছে তেমনি সম্ভব হচ্ছে চলচ্চিত্র স্রষ্টার পক্ষে তাঁর পারিপার্শ্বিক নির্জীব নিরপেক্ষ দৃশ্যবস্তুকে চৈতন্য দিয়ে দেখা। কবির মত Visual Perception থেকে Intellectual Perception এ পৌঁছনো চলচ্চিত্রকারের পক্ষেও সম্ভব।

চলচ্চিত্রে আজ ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আজকের সিনেমায় সনাতনী উপন্যাস রচনাও যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব জেমস জয়েসের ইউলিসিস রচনার।

আজকের ফরাসী চলচ্চিত্র এই নবীন শিল্পের ভাষাকে আরও বিস্তৃত করেছে। তাকে প্রায় জীবন নিয়ে আধুনিক ভাস্কর্য বলা চলে। তাই চলচ্চিত্র যন্ত্রযুগের সার্থক ভাষা। যেহেতু চলচ্চিত্রের ভাষা হলো ছবি—সেহেতু চলচ্চিত্রের ভাষা এক হিসেবে আন্তর্জাতিক। যন্ত্রময় বিশ শতকের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, ভাবের আদানপ্রদান এ হলো সব চাইতে উপযুক্ত বলিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম। যা সাহিত্য পারে না, যা পারে না সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—তাই পারে চলচ্চিত্র। এত ব্যাপক ভাবে জীবন্ত করে প্রকাশ ক্ষমতা আর কোনো শিল্পেরই নেই।

একক - ১২ - বাংলা সাহিত্য, চিত্রনাট্য

৫.১১.২ : বাংলা সাহিত্য, চিত্রনাট্য

চিত্রনাট্য আসলে এক বিশেষ ধরনের শিল্পরচনা। এও এক বিশেষ ধরনের নাটক—গল্প বলার বিশেষ পদ্ধতি। এই বিশেষ শ্রেণীর নাটকের মধ্য দিয়ে এমন একটি গল্প বলা হয় যা দিয়ে দর্শক মনে কোনো একটি বিশেষ রসের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেও নাটকীয় উপাদানগুলি বজায় থাকে। মঞ্চ নাটক এবং চিত্রনাট্য উভয়ই Action ধর্মী রচনা। মঞ্চ নাট্যকারের ন্যায় চিত্রনাট্যকারকে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের সাহায্যে রস সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু নাটক ও চিত্রনাট্য এক নয়। মঞ্চ নাটকের সঙ্গে চিত্রনাট্যের প্রধান পার্থক্য হল, মঞ্চ নাটক সংলাপধর্মী কিন্তু চিত্রনাট্য চিত্রধর্মী রচনা। সত্যজিৎ রায়ের কথায়—

“চিত্রনাট্য হল ছবির কাঠামো। ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা পর্দায় যা ব্যক্ত হবে, এ হল তার লিখিত ইঙ্গিত।”

অর্থাৎ, চিত্রনাট্য যেন এককথায় ছবির নক্সা।

চিত্রনাট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তার একদিকে আছে পরস্মৈপদী রূপ আর অপরদিকে আছে আত্মনেপদী রূপ। একদিকে সে একটি শিল্পের সাহায্যকারী শিল্প অপরদিকে সে নিজেই একটি শিল্পকর্ম। চিত্রনাট্যকে সাহিত্য সভায় আনা হবে কিনা, এই নিয়ে চলচ্চিত্র স্রষ্টা ও রসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের পর্যায়ে না ফেললেও এর পাঠ্যমুল্য স্বীকার করেন। আবার নাট্যকার মন্মথ রায় চিত্রনাট্যের পাঠ্যমূল্য এবং সাহিত্যমূল্যকে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি রসসৃষ্টি হয়, তবে চিত্রনাট্যও রসসৃষ্টি করে। তাহলে চিত্রনাট্য সাহিত্য পদবাচ্য হবে না

কেন? একটু চেষ্টা করলেই চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের একটি নতুনতর মাধ্যম বা শিল্পরীতিরূপে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা যায়। চিত্রনাট্য লেখা হবে, ছবি তোলা নয় শুধু পড়ার জন্যে গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো। কিন্তু তা বলে এর স্বরূপ বদল হবে না, নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টিতে লেখা হবে না। লেখকদের ভাবনাও রচনাভঙ্গি থাকবে চলচ্চিত্রের, লেখা হবে পাঠের উদ্দেশ্যে। বলা যেতে পারে পদ্ধতিটা মিশ্র বা দ্বৈত : বাসনালোক চলচ্চিত্রের, প্রকাশ সাহিত্যরূপে। সত্যজিৎ রায়ের কৃত উদাহরণের সাহায্যে সাহিত্য ও চিত্রনাট্যের বিষয়টি আলোচনা করা হল—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়ে'র প্রথম 'ঘটনা' হল উমাপদর প্ররোচনায় ভূপতির খবরের কাগজ প্রকাশে উদ্যোগী হওয়া। এই কাগজে লিপ্ত থাকার ফলে ভূপতি জানতে পারল না, কখন তাঁর বালিকা-বধূ চারুলতা যৌবনে পদার্পণ করল। কিন্তু সিনেমার শুরু হিসাবে এ পরিকল্পনা দুর্বল। তাই চারুর নিঃসঙ্গ অবস্থা দিয়েই ছবির শুরু হলো। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে অমলের প্রথম উল্লেখ পাই, তার আগেই রবীন্দ্রনাথ চারুর নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন। অর্থাৎ—এ হল নিঃসঙ্গতার পরের অবস্থা, যেখানে চারু অমলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে ভূপতি-সান্নিধ্যের অভাব কিছুটা মিটিয়ে নিচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা দিয়ে ছবি শুরু করতে গেলে অমলকে রাখা চলে না। অমল আসবে পরে এবং এই আসার মুহূর্তটির জন্য একটি নতুন দৃশ্যের প্রয়োজন হবে।

কাহিনিতে এর পরের ঘটনা হল মন্দাকিনীর আগমন। মূল গল্পে এর প্রস্তুতি হচ্ছে এইভাবে—

"যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি সচেতন হইয়া কহিল—তাই তো চারুর একজন সঙ্গিনী থাকা উচিত—ও বেচারার কিছু করিবার নাই।"

রবীন্দ্রনাথ যদি 'নষ্টনীড়' গল্পটি চিত্রনাট্য হিসেবে রচনা করতেন, তাহলে এই 'কোনো আত্মীয়া' তাতে স্থান পেতেন কিনা সন্দেহ। কারণ সিনেমায় এ ধরনের অস্পষ্টতার কোনো স্থান নেই। অথচ শুধু 'মনোযোগ আকর্ষণ' করার জন্য একটা নতুন চরিত্র রচনা করাও চলে না।

সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই বাস্তবধর্মী সংলাপ রচনায় পারদর্শী। তেমনি অনেক চিত্রনাট্যকারের রচনার মধ্যে সাহিত্যরস খুঁজে পাওয়া যাবে যদি সেগুলি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে। চিত্রনাট্য রচনার রীতি স্থায়ী সাহিত্যের উপরও কিছু কিছু প্রভাব ফেলছে। চিত্রনাট্যে প্রযুক্ত ভাষা ভঙ্গিমা, বাক্যগঠন, শব্দচয়ন প্রভৃতিও বিশেষ লক্ষ্মীয়। সাহিত্যিক সংলাপ থেকে যদি কোনো চিত্রনাট্যকার প্রস্তুতি নিতে চান তবে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে অনুসরণ করতে পারেন। সত্যজিৎ রায়ের কথায়—

"... চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনায় এত বড় গুরু আর কেউ নেই। এ-সংলাপ এতই চরিত্রোপযোগী, এতই revealing যে, লেখক নিজে চরিত্রের আকৃতির কোনো বর্ণনা না দিলেও কেবলমাত্র সংলাপের গুণেই চরিত্রের চেহারাটি যেন আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।"

একক - ১৩ - চলচ্চিত্রে জীবন ও সমাজ

৫.১১.৩ : চলচ্চিত্রে জীবন ও সমাজ

চলচ্চিত্র এক বিস্ময়কর শিল্প। সেই বিস্ময়ের পর্দা সরিয়ে তার আত্মাকে বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে কতগুলি বিষয় আমাদের সামনে এসে পড়ে। সংগীত বা চিত্রকলার সঙ্গে তুলনায় চলচ্চিত্র অনেক বেশি শক্তিশালী, কেননা তার প্রকাশক্ষমতা তাকে স্বতন্ত্র এক শিল্পমাধ্যম করে তুলেছে। অন্য যে কোনও শিল্পমাধ্যমের চেয়ে চলচ্চিত্র অনেক বেশি সামাজিক শিল্প বা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ শিল্প। চলচ্চিত্র হচ্ছে বাস্তবতার শিল্প। ফটোগ্রাফির মতো চলচ্চিত্রও বাস্তবতার প্রতি তন্নিষ্ঠ। একটি সৎ চলচ্চিত্র মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারে, নতুন এক সুস্থতর জগৎ গড়তে অনুপ্রাণিত করতে পারে, স্থিতিস্থাপক সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে পারে, এককথায় বিপ্লবের সূচনা করতে পারে।

চলচ্চিত্র শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উপভোগ্য বস্তু নয়—একই সঙ্গে চলচ্চিত্র একটি দেশের ঐতিহাসিক মানবমুক্তির জন্য দায়বদ্ধ। কোনও বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিল্পীর শৈল্পিক, সামাজিক, ব্যক্তিক চেতনার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়বস্তু নিরূপিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই বিষয়বস্তু কোথা থেকে আসবে? অবশ্যই শিল্পীর নিজের ও পরিপার্শ্বের জীবন ও জগতের বাস্তবতা থেকে। তা নিশ্চয়ই মনগড়া হবে না এবং এর একটা সামাজিক ও বাস্তবিক ভিত্তি থাকবে। সুতরাং বিষয়বস্তু অবশ্যই একটি সামাজিক উপাদান। সেই উপাদানটিই শিল্পের ভাষা, আঙ্গিক, রূপ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়।

‘চলচ্চিত্রের ভাষা—সেকাল ও একাল’ শীর্ষক নিবন্ধে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন কীভাবে নতুন নতুন বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার তাগিদে চলচ্চিত্রের নতুন নতুন ভাষা ও ফর্ম সৃষ্টি হয়েছে। তিনি লিখেছেন—“চলচ্চিত্রের ভাষা বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ নয়।”

ফিল্মে সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বগত অবস্থানের মূল কথাটি হল—“চলচ্চিত্রের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবজীবন, কাজেই মানব-ইতিহাসের সঙ্গে তার ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গী গ্রথিত। মানব সমাজের প্রতিটি পরিবর্তন তার চিহ্ন রেখে গেছে চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে। (চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়, শিরোনাম—‘বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র’।) ফিল্মের স্রষ্টা যে শিল্পী, মানব-ইতিহাসের তথা মানব-সমাজের বাস্তবতাকে শিল্পিত প্রকাশে নিয়ে যাওয়ার দায় আছে তাঁর। এই মানবেতিহাস ও মানব-সমাজ দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট রূপ নেয়। এই বাস্তবতার মর্মকে সত্যজিৎ তাঁর নির্মিত ফিল্মগুলিতে কেমনভাবে দেখিয়েছেন, তা এখন বুঝতে চেষ্টা করব।

‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ (১৯৭৭) ছবিটি শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তির গ্রাসে চলে যাওয়া একের পর এক চেরিফলের অ্যানিমেশন দৃশ্যে। শেষ হয় ইংরেজ সৈন্য অবাধে অযোধ্যায় ঢুকছে—আর গাছতলায় জমজমাট দাবা খেলার দৃশ্য। অযোধ্যায় যা ঘটছে সে প্রকৃতপক্ষে মুঘল শাসন ভেঙে যাবার আখ্যান। দেশ ক্রমে নৈতিক অবক্ষয়ের চরমে চলে গেল। উত্তরণের সম্ভাবনা হারানো এক সমাজ, সে সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থার নেতৃ-ভূমিকায় রয়েছে আত্মমর্যাদা হারানো ফাঁপা মানুষ। এই ছবিতে স্বদেশের এক ক্রান্তিকালের শোচনীয় বাস্তব দৃশ্যমান হয়ে আছে।

‘পথের পাঁচালী’র ইন্দির ঠাকরুনের মুখে আমরা দুর্গত ভারতবর্ষের মুখ যেন ফুটে উঠতে দেখি। হরিহরের পরিবারের দারিদ্র্য, সর্বজয়া-ইন্দির সম্পর্কের দ্বন্দ্ব—এই সবকিছুই আমাদের আসলে বিদ্ধ করে। ইন্দির উঠোনে পা রাখলে সর্বজয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইন্দিরের বাস্তু নেই। সে নিরাশ্রয়। কে-ই বা নয়? হরিহরও সুদিনের স্বপ্ন দেখে, শেষ অবধি পায়ের নীচে মাটি পায় না। বাস্তু হারিয়ে যায়। গল্পের ভেতরের গল্পে গেলে বুঝতে পারি এই হল উপনিবেশের ইতিহাস। ‘অশনি সংকেত’ (১৯৭৩)-এ মন্বন্তরের তাড়নায় ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়ার সেই নিয়তি ফিরে আসে।

সত্যজিতের ছবিতে দ্বন্দ্ব বহুমুখী। দেশ ধ্বস্ত হল যে শাসনের চাপে, সেই ঔপনিবেশিক প্রভাব তথা আধুনিকতার মোড়ককে সত্যজিৎ বিদ্রূপ করেছেন—'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ'-এর (১৯৬৫) 'মহাপুরুষ' পর্বে পরশুরামের গল্পের বয়ান ধরে। গুরুপদ মিত্রর শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব মুহূর্তেই উবে যায় বিরিঞ্চিবাবার উৎকট অলৌকিক মহিমায়। ঠিক যেমন 'দেবী' (১৯৬০)-তে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস কালীকিঙ্কর রায়কে বিকৃতির চরমে নিয়ে যায়। বাড়ির ছোট বউ দয়াময়ীর ওপর দেবীত্ব চাপানোর জের এক নিষ্করুণ ট্র্যাজিডিতে সমাপ্ত হয়।

ফিরে যাই, অপুর আখ্যানে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছিল সংবেদনশীল মন আর কিছু স্বপ্ন। ঔপনিবেশিক ভারতে সেই স্বপ্ন কতখানি সীমাবদ্ধ, তা দেখতে পাই 'অপরাজিত' (১৯৫৬) আর 'অপুর সংসার' (১৯৫৯)-এ। গ্রাম আঁকড়ে থেকে সে বাবার মতোই পুরোহিতবৃত্তি করতে পারত। কিন্তু আধুনিক বিদ্যার স্বাদ তার মধ্যে বিদ্রোহ আনে। সর্বজয়াকে উপেক্ষা করে সে কলেজে পড়তে যায়। গ্রামের দরিদ্র ছেলে চাকুরে মধ্যবিত্তে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক মন্দার চাপে চাকরির সংকটের ছবি পেয়েছি 'মহানগর' (১৯৬৩) ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০)-তে। ক্রমে নৈতিক মেরুদণ্ডে ঘুণ লাগার ভয়াবহ দিকগুলি তুলে ধরলেন যার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিল 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), 'জনঅরণ্য' (১৯৭৬), 'শাখা প্রশাখা' (১৯৯২) -র মতো ছবি।

ঋত্বিক ঘটকের ছবির ক্ষেত্রে গল্পের বুনোট, চিত্রনাট্যের বাঁধুনি, দৃশ্যগ্রহণের বাঁধা রীতি ইত্যাদি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। কাহিনির যুক্তিযুক্ত কাঠামো ভেঙে মেলোড্রামায় যাওয়ায় তাঁর কোনও সংকোচ ছিল না। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির নীতা গোটা পরিবারের ওপরে ডানা মেলে থাকে রক্ষয়িত্রী মায়ের মতো। এতে ধরা পড়েছে নৈতিক সংকট, আর্থিক সামাজিক বিপর্যয়, দেশভাগ। সেই বেদনার উৎস থেকেই নীতার কমনীয় চরিত্রটি আসে। ছবিটি শেষ হয় অন্তহীন বিষাদে।

'সুবর্ণরেখা'-য় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটির ভাঙাচোরা উড়োজাহাজের স্তূপে দুটি ছেলেমেয়ের ছুটোছুটির দৃশ্য, মেয়েটির হঠাৎ কালী সাজে বহুরূপীর সামনে পড়ে গিয়ে আতঙ্ক—এই দৃশ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—

“সেই এরোড্রোমের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশাহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালক বালিকা তাদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ দুটি প্রাণী! তারা জানে না তাদের জীবনে যে-সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ওইরকম আরো কতগুলো বিমানপোত। চতুর্দিকের ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ।”

শিল্পচৈতন্যের বিকাশে ঋত্বিক স্বদেশ এবং সন্নিহিত বাস্তবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-য় এসেছে নকশালপন্থী যুবকদের প্রসঙ্গ। অন্যদিকে, মহাকাব্যিক সৃষ্টি ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ তিতাস পাড়ের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় নদী-নিয়তির কাছে অসহায়ত্বের শিকার হয়েছে—সেই যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছে।

সমসাময়িক পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ঋত্বিকের মতোই জীবনদর্শনে মার্কসবাদী হয়েও নিরন্তর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধতায় শিল্পীসত্তার বিকাশ অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছেন। কীভাবে কোনও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে দেখা হবে, সমকালের জটিল বাস্তবকে কীভাবে ধরা যাবে—এই তত্ত্বগত ভাবনা থেকে তিনি বিষয় নির্বাচন করেছেন। তাঁর ছবিতে এসেছে দারিদ্র্য, মন্বন্তর, মানুষের নৈতিক ভাঙনের কথা। (‘কলকাতা ৭১’, ‘মৃগয়া’, ‘পদাতিক’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।)

অন্যান্য শিল্পের মতোই চলচ্চিত্রের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। শিল্পে প্রতিফলিত বাস্তবতার মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী অনিবার্য ভাবেই থাকবে। যতদিন শ্রেণি থাকবে, ততদিন থাকবে শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গী। যেহেতু চলচ্চিত্র হল একটি গণমাধ্যম, তাই তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাস্তবনিষ্ঠতা। চলচ্চিত্র এক সামাজিক শিল্প, তাই চলচ্চিত্রকারের আলোচনায় তাঁর দেশ, সমাজ, মূল্যবোধ, সংস্কার, পুরানো ঐতিহ্য, সমকালীন প্রস্তাব এসবকিছুকে যথাসাধ্য আনতে হয়।

‘বাংলার সমাজচিত্র ও বাংলার চলচ্চিত্র’ শীর্ষক একটি অধ্যায়ে ঋত্বিক ঘটক বলেছেন—“শিল্পকে সৌন্দর্যনিষ্ঠ হতে হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎপূর্বে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। সত্য সামাজিক প্রয়োজননিষ্ঠ না হলে কোনো শিল্পই শিল্প পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। কথাটা যেন আমরা মনে রাখি।” (চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু/ঋত্বিক ঘটক)

একক - ১৪ - চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা

৫.১১.৪ : চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা

শিল্প-সাহিত্যের অভিজ্ঞতা থেকেই নন্দনতত্ত্বের বিকাশ। যদিও নতুন অভিজ্ঞতা এই তাত্ত্বিক কাঠামো ভেঙে দেয়। গ্রিক নাটকের একাঙ্ক অভিজ্ঞতা অ্যারিস্টটলের নন্দনতত্ত্বের পটভূমি, ঠিক যেমন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অলংকার শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি হল প্রাচীন ভারতীয় কাব্য। নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা তথা দৃষ্টিভঙ্গি শৈল্পিক-সাহিত্যিক নির্মাণকে স্পষ্টতর করে তোলে। কিন্তু সৃষ্টি তো সর্বদা তত্ত্বকে মেনে চলে না। শিল্পে এমন উপাদান থাকে তা সমস্ত নির্দেশ ছাপিয়ে যায়। আবার শিল্পের বিভিন্ন শাখার, সাহিত্যের নিজস্ব উপাদান, মাধ্যমের অনিবার্য ভিত্তিতে নন্দনতত্ত্বের রূপ ও জিজ্ঞাসা ভিন্নতর হয়। প্রতিটি শিল্পের নিজ উপাদান থেকে তার নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে।

একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, ইউরোপজাত নন্দনতত্ত্ব কখনোই ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব হতে পারে না। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য চাই পৃথক নন্দনতত্ত্ব, এ নন্দনতত্ত্বে ইউরোপ আত্তীকৃত হতে পারে, কিন্তু তার ভিত্তি ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস, জীবন, সমাজ, মানব, প্রকৃতি। চলচ্চিত্রের মতো প্রত্যক্ষ ও ভিস্যুয়াল শিল্পকর্ম দেশজ মাটি ছাড়া বাঁচতে পারে না।

চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের বিষয়টিকে বুঝতে আমাদের দু'একজন চলচ্চিত্রকারের কথা মাথায় রাখতে হবে। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় ছবির এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি শুদ্ধ চলচ্চিত্রের অন্বেষক। তাঁর ছবি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সাহায্য করে, তাতে চলচ্চিত্রের কয়েকটি উপাদান না থাকলেই ভালো, যেমন—মেলোড্রামা, নাচগান, ভাবাবেগের অকপট প্রকাশ, শিথিল এপিসোডিক গঠন, প্রত্যক্ষ ভয়ঙ্করতা। ইঙ্গিতে, চিত্রকল্পে, প্রতীকে তিনি তাঁর চলচ্চিত্রীয় নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকে বাঁধেন। 'পথের পাঁচালী'-তে ইন্দির ঠাকরুণের ঘটি ডুবে যাওয়ার মৃত্যুদৃশ্যে বল্লালী বালাই যুগের অবসান অথবা 'চারুলতা' ছায়াছবিতে চারুর হাতে ধরা অপেরা গ্লাসের মাধ্যমে ভূপতিকে দেখা আসলে সম্পর্কের দূরত্বের নির্দেশকবাহী তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের নন্দনতত্ত্বের নিরিখে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের বিচার করা খুব একটা সমীচীন বিষয় নয়। 'অপরাজিত' বা 'গুপী গায়েন'কে বুঝতে হলে ভারতীয় চলচ্চিত্রবোধ দরকার। তাই ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক পরম্পরায়, সমাজ ইতিহাসে, মানুষের বাস্তব পটভূমিতে নির্মিত হোক অন্য নন্দনতত্ত্ব, যা ইউরোপকে প্রত্যাখ্যান করে না, কিন্তু ইউরোপের অনুকারী

নয়। ১৯৪৯-এর পরবর্তী নান্দনিক জিজ্ঞাসায় আত্মসচেতন দ্বান্দ্বিক আধুনিকতার প্রয়োজন ছিল। সে কারণে “Chamber quality of a literature influenced by Ibsen and western critical realism” আনতে হয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এই গুণ বা মাত্রা স্পষ্ট—বিভূতিভূষণের আপাতশিথিল গঠন ও বীক্ষা যে কাটাকাটিভাবে সংহতি পায় ফিল্ম ‘পথের পাঁচালী’র কীর্তিতে তার মূলে উনিশ শতকে পশ্চিম থেকে আসা সমালোচনামূলক বাস্তববাদ। সত্যজিতের ছবির সংহত কাঠামোতে এই বাস্তববাদী দৃষ্টিই পরিলক্ষিত হয়। ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম-এর অনুসারী বলে তিনি কখনো ন্যারেশন ভাঙেন না।

চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের বিষয়টিকে আরেকটু বুঝে নিতে আমরা ‘অপরাজিত’ ছবিটিকে সামনে রাখছি। এক বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এই ছবির প্রাথমিক বাস্তব। গ্রাম ছেড়ে কাশীতে আশ্রয় গ্রহণ এবং সেখানেই সত্যজিৎ সচেতনভাবে ভারতীয় বাস্তবসম্মত বিষয়কে হাজির করেন, খুব সতর্কভাবে দৃশ্যাবলির নির্বাচনের মাধ্যমে—কাশীর গঙ্গার ঘাট কিংবা হনুমানদের ঘন্টা নাড়ার দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে পৌঁছতে চান ভারতীয় বাস্তবের গভীরে। গ্রাম বাংলার আকাশের মেঘমন্দ্রিত আকাশ, গুরু গুরু গর্জন, ঝমঝম বৃষ্টিপাতের শব্দ—এইসবকিছুই আসলে আবহ তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে। আবার, অপুর গ্লোব হাতে বাহির বিশ্বে বেরিয়ে, জগৎকে জয় করবার, অপরাজিত হবার যে ইচ্ছে, তা-ও আসে ঐ সময়কার মধ্যবিত্ত সামাজিক-ঐতিহাসিক পট থেকে। অন্যদিকে সর্বজয়ার অসামান্যতা পর্দায় পর্দায় সত্যজিৎ এঁকে যান—মা-ছেলের দ্বন্দ্ব, ছেলের বড়ো হয়ে ওঠার সমস্যাকেও ছবিতে দেখানো হয় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই। সর্বজয়ার মৃত্যু সংবাদে অপুর রাস্তার ওপর বৃহৎ বৃক্ষের গোড়ায় বসে পড়া থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের ছিন্নমূল হয়ে যাওয়াই যেন আভাসিত হয়। অশৌচ অবস্থানে, মৃত জননীর সব কিছু পিছনে ফেলে অপুর নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাঙালি মধ্যবিত্তের গ্রামীণ মূল ছিন্ন করে শিকড়হীন ভেসে যাওয়ার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়।

অপর এক দৃশ্যকল্পে গভীর অন্ধকারে সর্বজয়ার অপুর জন্য আর্তনাদে পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের হাহাকার এক সামাজিক হাহাকারে পরিণত হয়। বাইরের গাঢ় অন্ধকারে জোনাকির চমকানি তাকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে—প্রেসের কাজে নিরত শিক্ষালোভাতুর অপুর বাঙালি মধ্যবিত্ত চেতনায় এ হাহাকার কোনো সাড়া তোলে না। সে কালীঘাটেই মায়ের শ্রাদ্ধ করবে বলে চলে যায় কলকাতার পথে।

এই ঐতিহাসিক বাস্তবকেই ‘অপরাজিত’তে রূপ দেওয়া হয় কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাস্তব শুধুমাত্র তত্ত্ব বা সমসাময়িক ঘটনার চিত্র হয়ে থাকত যদি না শিল্পরূপের দ্বান্দ্বিক বাস্তবে তাকে ধরা হত, যদি না উপযুক্ত শিল্প আধারে একে সর্বকালের হাতে সঁপে দেওয়া হত। মনে করা যাক, হরিহরের মৃত্যুদৃশ্যটি কিংবা তারও আগে দুধের সর খেয়ে হরিহরের তৃপ্ত হাসি কিংবা সর্বজয়া গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তটি। রূপের বাস্তবের অন্বেষাতেই ‘অপরাজিত’ হয়ে উঠেছে এক মহৎ শিল্প। অন্যদিকে ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণরেখা’-য় সেই বহুরূপীর সঙ্গে বালিকা সীতার সাক্ষাৎকারও এই রূপের বাস্তবতার জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছে। অথবা মৃণাল সেনের ‘ভুবন সোম’-এও, ‘ভুবন সোম’-এর বাইরের পোশাক খোলার পূর্ণ সিকোয়েন্সটিই এই রূপের বাস্তবতাতে উজ্জ্বল।

এই ঐতিহাসিক বাস্তব এবং রূপের বাস্তব—এই দুয়ের টানাপোড়েনেই শিল্প নির্দিষ্ট রূপ পায় এবং তার মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সেই কারণেই এই দুটি ধারণার প্রয়োগ সহায়তা করে। এই দুই যখন এক বিন্দুতে মিলিত হয়, তখনই ফিল্ম হয়ে ওঠে উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি।

৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

চলচ্চিত্রের স্বরূপ:

এক. চলচ্চিত্র একক না মিশ্র শিল্প? তোমার উত্তরে সমর্থনে যুক্তি দাও।

দুই. বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাপর্বের ইতিহাস বিবৃত করো।

তিন. চলচ্চিত্রের আধুনিকতার একটি অন্যতম দিক প্রযুক্তি—বক্তব্যটি কতদূর সঙ্গত?

চলচ্চিত্র ও সমাজ:

এক. চলচ্চিত্রের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবজীবন—সেই জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজের পরিচয় দাও।

দুই. তোমার দেখা একটি বাংলা চলচ্চিত্রে বর্ণিত সমাজের চিত্রটি পরিস্ফুট করো।

তিন. চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিরূপণ করো।

চলচ্চিত্র ও চিত্রনাট্য :

এক. সাহিত্য ও চিত্রনাট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি নিজের ভাষায় লেখো।

দুই. চলচ্চিত্রের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়? কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

তিন. একটি সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রনাট্যের সম্পর্কটি পরিস্ফুট করো।

চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা

এক. চলচ্চিত্রের ভাষা চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা সৃষ্টিতে কীভাবে সহায়তা করে তা বর্ণনা করো।

দুই. চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা সৃষ্টিতে চিত্রনাট্য, সংলাপ, সঙ্গীত দৃশ্যনির্মাণের ভূমিকা আলোচনা করো।

তিন. সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের এপিসোডিক গঠনে নান্দনিকতা কীভাবে ধরা পড়েছে—দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বিষয় চলচ্চিত্র—সত্যজিৎ রায়

২। বাংলা সাহিত্য ও বাঙলা চলচ্চিত্র (প্রথম খণ্ড)—নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়

৩। আখ্যানের চলচ্চিত্রয়ণ—সুশীল সাহা (সংকলন ও সম্পাদনা)

৪। চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব—পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়